উচ্চ-মাধ্যমিক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ডঃ শোভনলাল মুখোপাধ্যায়

অমিতি ব্যানার্জী

পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নব-প্রবর্তিত উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে লিখিত

উচ্চ-মাধ্যমিক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

[প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র সম্পূর্ণ]

ডঃ শোভনলাল মুখোপাধ্যায়

এম. এ., পি. আর. এস্., পি-এইচ্. ডি., ডি. লিট্.

প্রধান অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়; ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক, হুগলি মহসিন কলেজ, শিবপুর বি. ই. কলেজ [মানবতা-বিভাগ], ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও সেনেট্ সদস্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বেলজিয়ামের আন্তর্জাতিক আইন-সংস্থার প্রথম ভারতীয় ফেলো এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বহু বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা

বিচিন্তা ভবন

৩৭/৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই, ১৯৮৫

মূল্য ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

প্রকাশ করেছেন ৩৭/৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ থেকে শ্রীসন্দীপন আচার্য ও শ্রীদীপঙ্কর আচার্য, প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রীঅরুণ গুপ্ত, ছেপেছেন সারদা প্রেসেস, ৫/১, কাশী বোস লেন, কলকাতা-৬ থেকে শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী

গ্রন্থখানির অসাধারণ বৈশিষ্ট্য

- উচ্চ-মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংশোধিত পাঠ্যসূচী [১৯৮৫—৮৭] অনুসারে লিখিত
- পাঠ্যসূচীর অনুসরণে বিষয়-বিন্যাসে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের ধারানুক্রমিকতা অনুসৃত : যাতে গ্রন্থখানি পাঠে সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে একটি অখণ্ড এবং সম্পূর্ণ ধারণার সৃষ্টি হয়
- প্রতিটি পর্যায়ের ওপর সমান গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে ; তত্ত্বটির সঠিক উপস্থাপনা এবং তার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন অংশ থেকে তথ্য চয়ন করে যথাযোগ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে
- প্রতিটি পর্যায়ে প্রভূত Points প্রদত্ত ; যা শ্রেষ্ঠ উত্তর-রচনার সহায়ক
- রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সকল মনীষীর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত ও বিশ্লেষিত হয়েছে এবং আধুনিক ও মৌল দৃষ্টিভঙ্গিতে সেগুলির মূল্যায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া বিশ্বের এবং ভারতের সাম্প্রতিকতম রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যাও করা হয়েছে, সর্বত্র প্রদত্ত হয়েছে নিরপেক্ষ ও সর্বাধুনিক মতামত
- Inner Margin-এ প্রতিটি Point উল্লিখিত যা দ্রুত পরীক্ষার প্রস্তুতি ও স্বল্পায়াসে সার্বিক ধারণা সৃষ্টির ব্যাপারে বিশেষ কার্যকর হবে
- সরল, সাবলীল ও সহজবোধ্য, অথচ বলিষ্ঠ একটি প্রকাশভঙ্গি, যা রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রন্থজগতে সম্পূর্ণ নতুন
- শাসনতন্ত্র পর্যায়ে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা, চরিত্র, আধুনিকতম বিশ্লেষণসহ সকল ধারার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা
- রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতন্ত্র অধ্যায়-শেষে সুলিখিত সারাংশ প্রদত্ত হয়েছে, যা দ্রুত পরীক্ষা-প্রস্তুতির সহায়ক
- প্রতিটি পর্যায়ে প্রাচীনতম থেকে সাম্প্রতিকতম সমস্ত তত্ত্বের নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণসহ অবতারণা করা হয়েছে
- বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যের দুর্বোধ্যতার পরিবর্তে উচ্চ-মাধ্যমিক বর্গের ছাত্রছাত্রীদের গ্রহণ-সামর্থ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে সহজবোধ্যতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে
- প্রতিটি ক্ষেত্রে পরীক্ষায় উন্নত মানের উত্তর রচনার সমস্ত উপকরণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সুবিন্যস্ত হয়েছে ; তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর-সাফল্যলাভ প্রত্যাশিত

- গ্রন্থখানির সর্বত্র শোভন উপস্থাপনা এবং সুরুচিসম্পন্ন অধ্যায়-সজ্জার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে ; যাতে গ্রন্থখানিতে আলোচিত বিষয়সমূহ বিদ্যার্থীদের কাছে সহজে আকর্ষণীয় হয় এবং তাদের মনে রাখা সহজ হয়
- গ্রন্থখানির সঠিক অনুসরণে আশি-শতাংশ নম্বর প্রতিশ্রুত

প্রকাশক

ভূমিকা

উচ্চ-মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নতুন প্রবর্তিত পাঠ্যসূচীর [১৯৮৫—৮৭] অনুসরণে গ্রন্থখানি রচিত হল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে অধ্যাপনা ও গবেষণা করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তার সবটাই গ্রন্থটিতে ব্যবহার করেছি।

সহজ, সরল, বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত ভাষা পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে সাফল্যের দিগন্তকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তোলে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থের ভাষা এমন করা হয়েছে, যা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের জটিল তত্ত্ব ও তথ্যগুলিকে বিদ্যার্থীদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলে। বিষয়বস্তু যতই কঠিন হোক্ না কেন, তার মৌল বক্তব্যকে যদি সঠিক ও নিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, এবং তার উপস্থাপনা যদি হৃদয়গ্রাহী হয়, তাহলে আলোচনাটি যেমন বাস্তবধর্মী হয়ে ওঠে, তেমনি তা বোধশক্তি-বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর হয়। বিশেষতঃ, রাজনীতির ক্ষেত্রে, যেখানে "মত" ও "পথে"র অতিমাত্রিকতা সুবিদিত, সেখানে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রাসঙ্গিকতা তর্কাতীত। তবুও, গ্রন্থখানিতে এভাবে ঘরোয়া পরিবেশ গড়ে তুললেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে কোথাও অতি-সরলীকরনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় নি। বরং প্রতিটি বিষয়বস্তুকেই বইটির মুদ্রণক্ষণ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের দ্বারা সমৃদ্ধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে সব রকম মানের ছাত্রছাত্রীগণই উপকৃত হবেন, এ বিশ্বাস রাখি।

গ্রন্থটিতে আলোচিত প্রত্যেকটি বিষয়ের অন্তর্গত প্রতিটি অনুচ্ছেদের বাঁদিকে ছোট হরফে সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা এমনভাবে দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রত্যেক অনুচ্ছেদের মর্মার্থ উপলব্ধিতে সুবিধা হয়। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে প্রদত্ত "সারাংশ" পরীক্ষার্থীদের দ্রুত প্রস্তুতির ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হবে, আশা করি। বইটির শেষে এ-যাবৎ অনুষ্ঠিত সমস্ত উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দুটি পত্রের প্রশ্নসম্ভার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য আরও অতিরিক্ত সম্ভাব্য প্রশ্ন উত্তর-সংকেতসহ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। দীর্ঘ রচনাধর্মী, সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক—তিন প্রকার প্রশ্নের নমুনাই উত্তরসহ সাজানো হয়েছে। বিদগ্ধ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ / অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ও প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সাহায্যে আরও নতুন-নতুন প্রশ্ন তৈরী করে সুকোমলমতি শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন—এ আশা রাখি। আমার অসংখ্য কৃতী ছাত্রছাত্রী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় নানাস্থানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষাদানের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। আমার পূর্ব-প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের মত এ গ্রন্থখানিও যদি তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করতে সমর্থ হয়,

তাহলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব। তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে।

নানা অনিবার্য কারণে মাত্র সাড়ে চার মাসের মধ্যেই গ্রন্থখানির মুদ্রণকার্য সমাপ্ত করতে হয়েছে। এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন "বিচিন্তা ভবনে"র তরুণ উদ্যোক্তাগণ। তাঁদের মধ্যে শ্রীমান্ সন্দীপন আচার্য ও শ্রীমান্ দীপংকর আচার্যের তৎপরতার তুলনা মেলা ভার। অধ্যাপক পি. আচার্যের সাহায্য না পেলে বইটির ভাব ও ভাষা অনেকাংশে অর্ধস্ফুট বা অপরিস্ফুট থেকে যেত, বইটিকে নানা দিক থেকে সুরুচিসম্পন্ন করে তোলাও যেত না।

আমার পত্নী শ্রীমতী প্রীতি মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যও বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। পুত্রগণ (শ্রীমান্ সন্দীপ, জয়দীপ ও রণদীপ) নানাভাবে সাহায্য করেছেন। শ্রীমান্ অলক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন কয়েকটি অতি-আধুনিক বই সংগ্রহ করে দিয়েছেন, গ্রন্থখানির বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনার ক্ষেত্রে যেগুলি অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। আমার পরম স্নেহাস্পদ কৃতী ছাত্র, বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশকালীন অধ্যাপক ডক্টর দেবেশ রায়চৌধুরীর সঙ্গে বহু আলোচনা গ্রন্থখানির মানোন্নয়নে বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। গ্রন্থখানির দ্বারা উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে যদি উপকৃত হন, তবেই আমার এই প্রয়াস সার্থক হবে। নমস্কারান্তে

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
২৩ শে আষাঢ়, ১৩৯২ সন
৮ই জুলাই, ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ

বিনীত
শোভনলাল মুখোপাধ্যায়

NEW SYLLABUS

for

Higher Secondary Course in

POLITICAL SCIENCE

[Effective from the academic session 1985-87]

PAPER I. Marks 100, External Assessment = 90 ;
Internal Assessment = 10.

1. What is Political Science ? Definition, Nature and Scope—Relation with other Social Sciences : History, Economics, Sociology, Psychology and Ethics.
2. The State—Definition of the State : Characteristics of the State.
3. Sovereignty : its characteristics.
4. Theories of State Origin :
   (a) Divine Origin Theory.
   (b) Force Theory.
   (c) Social Contract Theory.
   (d) Evolutionary Theory.
5. Nationality, Nation and Nationalism ; Right of Self-determination, Nationalism and Internationalism.
6. The United Nations—Objects, structure and functions.
7. Citizenship—Definition of a citizen—Acquisition and loss of citizenship ; Rights and Duties of a citizen—Civil and Political Rights : Fundamental Rights and duties of an Indian citizen—Economic and Social Rights ; Directive Principles in the Indian Constitution.
8. Some major Political Theories : Liberalism, Marxism Democratic Socialism—Basic Principles.

PAPER II. Marks 100, External Assessment = 90 ;
Internal Assessment = 10,

1. Constitution—Classification—Nature of the Indian Constitution : Salient features of the Indian Constitution.
2. Forms of Government—Unitary and Federal ; Nature of the Indian Federation—Presidential and Parliamentary ;

Nature of the Indian Government—Presidential or Parliamentary ? Monarchy—Republic—India as a Republic.

3. Democracy—Its different forms—Merits and Demerits—Conditions for the success of Democracy—Dictatorship—Merits and Defects.
4. Organs of Government ; Functions of the different Organs of Government—Theory of Separation of Powers—Executive—Functions of Political Executive—Union and State Executives in India—President of India ; powers and position—Prime Minister ; powers and position of the Prime Minister—Legislature : Unicameral and Bicameral. Union Legislature of India : Its composition and functions—West Bengal Legislature ; its composition and functions—Process of Law Making—Judiciary. Independence of the Judiciary—The Indian Judiciary.
5. Public Opinion ; Its importance in a Democracy—Different Organs of Public Opinion—Party system—types of Multiparty System—Importance of the Party System in Democray.
6. Adult Franchise ; Arguments for and against.

সূচীপত্র

প্রথম পত্র

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

শাসনতন্ত্র

দ্বিতীয় পত্র

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

'মানুষেরা বার-বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে ;
নব-নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে ;
তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয় স্বপনের সফলতা-নবীনতা-শুভ্র মানবিকতার ভোর ?
নচিকেতা জরাথুস্ট্র লাওৎ-সে রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে ?'

—জীবনানন্দ দাশ

১ অবতরণিকা

"Whenever living beings enter into or maintain willed relations with one another, there society exists."

—R. M. MacIver

॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি ও কেন ॥

মানুষ চিরকালই স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। আদিমকালে সে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকত। প্রয়োজন তার ছিল সামান্য, কিন্তু সেই সামান্য প্রয়োজনই মেটাবার পথে বাধা ছিল অসংখ্য। এই বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা করতে গিয়েই মানুষ বুঝতে পারল—সে বড় একাকী। সে বুঝল এককভাবে এই বাধা অতিক্রম করা সম্ভব নয়, সংগী চাই। সমজাতীয় কারো সংগলাভের আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। এই আকাঙ্ক্ষাপূরণে সহায় হল তার ভাষা। তার ভাষা তাকে মুখর করে তুলল। অপরের সঙ্গে ভাববিনিময়, অপরের সুখ-দুঃখের শরিক হওয়া তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠল প্রকৃতিপ্রদত্ত তার এই বাগ্‌ভঙ্গির সাহায্যে। এই ভাবেই দেখতে পাই আদিমকাল থেকেই প্রকৃতি মানুষকে সমাজসৃষ্টির পথে প্রবৃত্ত করেছে। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল্ (Aristotle) ঠিকই বলেছেন—মানুষ স্বাভাবিক কারণে সামাজিক জীব। নিঃসঙ্গ মানুষ—সে তো হয় পশু, নয় দেবতা। ("He who is not able to live in society, or has no need for it because he is sufficient for himself, is either a beast or God.")।

নিঃসংগতা থেকে মুক্তিলাভের জন্য আদিম মানুষের সমাজ-বদ্ধতা ঃ ভাষা তার সহায়ক

মর্গান (Morgan) প্রমুখ জীবতত্ত্ববিদ্, মার্ক্‌স্ (Marx), এঙ্গেল্‌স্ (Engels) প্রভৃতি সাম্যবাদী সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ এবং জিডিংস (Giddings), মেরিয়াম (Merriam) প্রভৃতি মার্কিন সমাজ-দার্শনিকদের একই বক্তব্য—নিঃসঙ্গ মানুষের প্রথম সামাজিক পরিকল্পনা তার পরিবারকে কেন্দ্র করে। পশুপাখী যেমন তাদের নিজেদের শাবকদের ধীরে ধীরে লালন-পালন করে তোলে, আদিম মানুষেরও তেমনি নিতান্ত জান্তব প্রয়োজনেই দরকার হল মায়ের স্নেহ, পিতার অভিভাবকত্ব।

মর্গান, মার্ক্‌স্, এঙ্গেল্‌স্, জিডিংস্, মেরিয়াম প্রভৃতির মত

কিন্তু পশুর মত কেবল যান্ত্রিকভাবে বেঁচে থাকা বুদ্ধিসম্পদে সম্পন্ন মানুষের

পছন্দসই হল না। সে আরও প্রসারিত, আরও সচল হয়ে উঠতে চাইল। নিজের পরিবারের সঙ্গে অন্যান্য পরিবারের মিলন অভাবমোচনের সূত্র থেকে ভাববিনিময়ের রাখীবন্ধনের মধ্য দিয়ে আরও দৃঢ়, আরও অর্থবহ হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে পরিবারের প্রসারে তৈরী হল সমাজ। তাই প্রখ্যাত প্রবীণ মার্কিনী সমাজতত্ত্ববিদ্ ম্যাক্‌আইভারের (Mac-Iver) কথাটি ঠিক—মানুষ যখনই যেখানেই স্বেচ্ছায় মিলিত হয়েছে, তখনই সেখানেই সমাজ জন্ম নিয়েছে। সমাজের সঙ্গে নিজের জীবনের সম্পর্ক বোঝাপড়ার জন্য মানুষ সৃষ্টি করে চলল অজস্র সংগঠন। রাষ্ট্রও এমনই একটা সামাজিক সংগঠন। সমাজজীবনের শুরু জীবনরক্ষার প্রয়োজনে, রাষ্ট্রিক জীবনের আরম্ভ জীবনকে উন্নততর করার জন্য। সমাজ যেন জীবনকেন্দ্রিক একটা প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র হল মনন-সমৃদ্ধ ভাস্বরতর একটা সংস্থা।

নিছক জৈবিক তাগিদের ঊর্ধ্বে পূর্ণতর মননসমৃদ্ধ সমাজজীবনের চাহিদাঃ ফল—রাষ্ট্রের উদ্ভব

দৈনন্দিনের তুচ্ছ তৈলতণ্ডুলের ঊর্ধ্বে অতীতের মানুষকে পূর্ণতর জীবনযাত্রার সন্ধান দেয় **রাষ্ট্রবিজ্ঞান**। সমাজের জীবন রাষ্ট্রের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। নবীন যুগের মানুষের নতুন জীবনের দিশারী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। আগামী দিনের মানুষের বাঁচার জন্য আজকের মানুষকে তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুশীলন করতেই হবে। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এবং বর্তমানের সঙ্গে অতীতের যে বিচিত্র রামধনু-সেতু মানুষকে ছোট্ট বর্তমান থেকে বিশাল ভবিষ্যতে পদক্ষেপের প্রেরণা জোগায়, সেই জীবনবেদই হল **রাষ্ট্রবিজ্ঞান**।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রেরণা

যা বলা হল, তা প্রাচীন এবং নবীন কথা ও কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার। ধরা যাক্, মহাভারতের পৃথু ও বেণ-রাজার গল্প। দেবব্রত ভীষ্ম কত সুন্দরভাবেই না সমাজ থেকে রাষ্ট্রের এ হেন রূপান্তরের কাহিনী বর্ণনা করলেন ঃ অনেক, অনেক বছর আগে না ছিল রাজা, না রাজ্য, না রাজদণ্ড। দণ্ড পাবার লোকই বা কই ? ভীষ্ম বললেন, মানুষ তখনও কতকগুলো বোঝাপড়ার ওপর ভিত্তি করে পরস্পরকে রক্ষা করত। তাই ছিল তার ধর্ম। কিন্তু মোহের গ্রাসে এরকম ধর্ম-বলয়ও ভেঙ্গে গেল। প্রজাপতি ব্রহ্মা এক নতুন নীতিশাস্ত্র তৈরী করলেন। রাজা ও রাজ্য গড়ে উঠল।

মহাভারতের বক্তব্য

ওপেনহাইমার (Oppenheimer) এই কথাটাই অন্যভাবে বললেন ঃ সমাজের গর্ভে থেকেই রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ। পৃথিবীর বহু অনুন্নত জায়গায় এখনও আদিম মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে শিকারী বা রাখালের বেশে। ওপেনহাইমার বলেন যে, এরকম আদিম সমাজের মানুষ ক্রমে ক্রমে অপরকে শোষণ ও লুঠ করবার উদ্দেশ্যে লিপ্ত হয়। ফলে ধনী ও দরিদ্রের অনুপাতে সমাজে শ্রেণীভেদ দেখা দেয়। যে শুধু দুমুঠো অন্নের সন্ধানে দিন কাটায়, সে তখন অন্যের দাসে পরিণত হয়। প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক মানুষের ওপর মানুষের ক্ষমতাপ্রয়োগের সবচেয়ে সাধারণ একটা ক্ষেত্র। রাষ্ট্রতত্ত্বের ভূমিকা তৈরী হল তখনই।

ওপেনহাইমারের বক্তব্য

মার্ক্স্ প্রমুখ সাম্যবাদী দার্শনিকগণ প্রধানতঃ তিনটি স্তরে সমাজের ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম—আদিম সাম্যবাদী সমাজ। এ সমাজে পরিবার বলতে বোঝাত সমাজে এক বা একাধিক গোষ্ঠীপতি বা কুলপতিকে। সমাজের সমস্ত শিশু, সমস্ত নারী, সমস্ত পুরুষ ঐ এক বা একাধিক বিরাট গোষ্ঠীর অংগীভূত বলে ধরা হত। কৃষিব্যবস্থা শুরু হওয়ার সংগে সংগে আদিম মানুষকে তার যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে দিতে হল। গড়ে উঠল কৃষিনির্ভর সমাজ। সেখানে ক্রমে ক্রমে সামন্ত-প্রথার সঞ্চার হল। জমিদার ও তার প্রজা এই দুই শ্রেণীতে আদিম মানুষ বিভক্ত হল। এক দল হলেন মালিক, অপর দল মালিকের আজ্ঞাবহ ভাগচাষী।

পরিবারের বিবর্তন ঃ মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্সের মত

মার্ক্স্ বলেন যে, সমাজজীবনের তৃতীয় ও চরম পরিণতি পুঁজিবাদ বা Capitalism-এর চরম বিকাশের মধ্যে। ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে যে শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution) ঘটে, তার ফলে বিজ্ঞানের সাহায্যে অল্প সময়ে কম খরচে অনেক বেশী উৎপাদন হতে লাগল। ভূস্বামীরা জমির বদলে বৃহৎ শিল্পে তাঁদের পুঁজি বিনিয়োগ করতে থাকেন। লেনিনের (Lenin) মতে, এই পুঁজিবাদী সমাজ চরম শোষকের ভূমিকা গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদের (Imperialism বা Colonialism) সাহচর্যে। উপনিবেশগুলি থেকে শিল্পের জন্য কাঁচা মাল আসতে থাকে। আবার শিল্পজাত দ্রব্যগুলির বাজার হিসাবেও ঐ উপনিবেশগুলি কাজ করতে থাকে। ফলে আর এক রকম প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে পুঁজিবাদকে কেন্দ্র করে। মার্ক্স্ প্রমুখ সাম্যবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে, পুঁজিবাদী সমাজের শোষণের প্রধান মাধ্যম হল রাষ্ট্র। তাই তাঁদের সাম্যবাদী দর্শনের প্রধান বক্তব্য হল রাষ্ট্রের উচ্ছেদ। সেটা সম্ভব হয় কেবল যখন শোষিতরা শোষক পুঁজিপতিদের বিদ্রোহের দ্বারা অপসৃত করে তখনই। ফলে শ্রেণীবিহীন সাম্যবাদী সমাজের সৃষ্টি হয়।

ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে বুর্জোয়া বা ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করে

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, মার্ক্স্বাদ রাষ্ট্রের উচ্ছেদ কামনা করলেও সোবিয়েত রাশিয়া, চীন প্রভৃতি যে আধুনিক দেশগুলিতে সাম্যবাদ কায়েম হয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রের উচ্ছেদ হয় নি, বরং রাষ্ট্র আগের চেয়ে অনেক বেশী সুগঠিত এবং ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন (Democratic Centralism) দেখা দিচ্ছে। কাজেই সাম্যবাদী দর্শন রাষ্ট্রবিহীন সমাজের কথা কল্পনা করলেও সাম্যবাদী দেশগুলি এখনও পর্যন্ত আরও অধিক রাষ্ট্র-নির্ভর হয়ে উঠছে।

সাম্যবাদীরা চান রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঃ তা কি সম্ভব ? বর্তমান অভিজ্ঞতা

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্আইভার (MacIver) বলেন যে, কোন অঞ্চলের কোন সংগঠিত সমাজে যখনই প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে একই রকম শাসন-শৃংখলা প্রচলিত হয় এবং সেখানে যখন আইন-অমান্যকারীদের শাস্তি দেবার ও আবেদন নিবেদন গ্রহণ করার কতকগুলো বিধিব্যবস্থা প্রচলিত থাকে, তখনই সেখানে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

ম্যাক্আইভারের বক্তব্য

সুতরাং প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত আমরা যতই সমাজের বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন কাঠামো নিয়ে ভাবতে থাকি, ততই আমরা সমাজে রাষ্ট্রের প্রাধান্য এবং ক্ষমতালাভ, ব্যক্তির সংগে তার যোগাযোগ ও সংঘর্ষ, রাষ্ট্রবিহীন, এমন কি আন্তরাষ্ট্রিক মানবিক সংগঠন ইত্যাদি কোন কিছুর কথা বাদ দিতে পারি না। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ রয়েছে, সমাজ তৈরী হয়েছে, রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে।

অবলুপ্ত নয়, রাষ্ট্রের উপস্থিতি একটি বাস্তব ঘটনা

রাষ্ট্র তাহলে তত্ত্বগতভাবে একটা বাস্তব সত্য। তেমনই বাস্তব সত্য হল রাষ্ট্রতত্ত্ব বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science) যা নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদ্ যুগে যুগে আমাদের সচেতন করেছেন, আমাদের সাহায্য করেছেন। সেজন্য বলা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলন ছাড়া মানুষের সমাজজীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

তা হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুশীলন অত্যন্ত প্রয়োজন

॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও আলোচনা-পরিসর ॥

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মৌল লক্ষ্য রাষ্ট্র। "পলিটিক্স্" (Politics) এই ইংরাজী শব্দটি গ্রীক "পলিস্" (Polis) কথাটি থেকে উদ্ভূত। কারণ, প্রাচীন গ্রীসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ নগর-রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। তাদের জীবনযাত্রাই রাজনীতির পণ্ডিতদের এই শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। রাষ্ট্র জনজীবনে যে ব্যাপকতা লাভ করেছে, তা আলোচিত যে শাস্ত্রে, তা-ই হল **রাষ্ট্রবিজ্ঞান**। রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, রাষ্ট্র কিভাবে নাগরিকদের নানারকম সুযোগসুবিধা দেয়, কেন দেয়, সেগুলির সীমা কি, নাগরিকদের পরস্পরের প্রতি ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব কতটা, সে দায়িত্বপালনে তারা অসমর্থ হলে রাষ্ট্র কিভাবে দণ্ডাদেশ দেয়, এক কথায় যে বিস্তীর্ণ ক্ষমতার এলাকা রাষ্ট্রকে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান করে তুলেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেই ক্ষমতাজালের সঙ্গে পরিচিতির সহায়ক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

পোলক (Pollock) রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন—তত্ত্বগত ও প্রয়োগমূলক। তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে পড়ে রাষ্ট্র ও সরকারের কার্যাবলী এবং আইনপ্রণয়নের নীতি। প্রয়োগমূলকভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু হল বিভিন্ন শ্রেণীর সংবিধান, গণশাসনব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রকারের অনুশাসন, কুটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রিক তৎপরতা ইত্যাদি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান—তত্ত্বগত, প্রয়োগমূলক : পোলকের শ্রেণীবিভাজন

পোলকের ব্যাখ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জগৎকে অনেকটা পরিস্ফুট করে। কিন্তু ল্যাস্কি (Laski), লিপ্সন (Lipson) প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণ আধুনিক সমাজতত্ত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জগতের আরও নতুন বহু দিক উন্মোচিত করে দিয়েছেন। ল্যাস্কি বলেছেন যে, শুধুমাত্র রাষ্ট্রই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু নয়। আধুনিক রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব (Political Sociology) অনুসারে **বিস্তীর্ণ জনজীবনের অসংখ্য**

দিক নিয়ে বহু সংস্থা গড়ে উঠেছে দেশে দেশে এবং রাষ্ট্রের সংগে তারা নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত। এ বিষয়গুলিও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র বিস্তীর্ণ : ল্যাস্কি ও লিপ্‌সনের মত

ব্যবহারিক সামাজিক জীবনে কিভাবে নাগরিক সুনাগরিককে পরিণত হতে পারে, তার হদিশও মেলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। অতএব মানুষের মনস্তত্ত্ব, তার কার্যকলাপের মূল উৎস, তার অনুপ্রেরণা ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য। এই মনস্তত্ত্বের পটভূমিকা নিয়েই লাস্‌ওয়েল্‌ (Lasswell) বলেছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রধানতঃ মানুষের ক্ষমতালিপ্সারই আলোচনা—কিভাবে সে ক্ষমতা পেতে চায়, কেন পেতে চায়, ক্ষমতা লাভের বাধাগুলি সে কি করে দূর করে ইত্যাদি তার আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু।

এ সম্পর্কে লাস্‌ওয়েলের মত

বলা বাহুল্য, মানুষের মনোজগতের সঙ্গে মিলিয়ে রাষ্ট্রের বহির্জগৎকে দেখলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক বিষয়ের তথাকথিত জটিলতা বহুল পরিমাণে দূর হয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে, অনেক সহজ ও সার্থক হয়। সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে রাষ্ট্রিক চেতনার উন্মেষ, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মেনে চলার মত শৃংখলাবোধ, তার শুভাশুভ সম্পর্কে ধ্যানধারণা, স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপনের ফলাফল সম্বন্ধে স্বচ্ছ ভাবনা, পারস্পরিক সহনশীলতা, সহযোগিতা ও অবিরোধিতার অনুশীলন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ব্যাপক সংজ্ঞার সাহায্যে সম্ভব হয়।

গত ১৯৪৮ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর (UNESCO) সভায় আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞানির্ণয় প্রসংগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সুবিস্তীর্ণ আলোচনাক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছে। সভার মতে, আধুনিক মানবজীবনের বিশালতা ও জটিলতার জন্যই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ব্যাপক আলোচনাসূচী গ্রহণ করতে হবে। দরকার হলে একাধিক বিষয়ের সংগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার মত পদ্ধতি (inter-disciplinary method) অনুসরণ করতে হবে। সভার মতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে—প্রথমতঃ, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও তার ক্রমবিকাশ। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও অনুশাসন পর্ব, স্থানীয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং তুলনামূলক সংবিধানতন্ত্র। তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক দল, উপদল, বিবিধ সংস্থা, জনমতগঠনে এবং রাষ্ট্রপরিচালনায় তাদের চাপসৃষ্টি, চাপের পরিমিতি। চতুর্থতঃ, আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক সংগঠন ও শাসনব্যবস্থা।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি : ইউনেস্কো সভার সিদ্ধান্ত

ইউনেস্কো সভা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রকে শুধু যে ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করেছে, তাই নয় ; জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় ক্ষমতার লড়াইয়ে এ দুই সমাজ কিভাবে সম্পর্কিত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের তাও ব্যাখ্যা করতে বলেছে ; এই দুই সমাজ কিভাবে সরকারের বা সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতার পিরামিডের ওপর নির্ভর করে থাকে, তারও হদিশ জানতে চেয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আলোচনাক্ষেত্র

আধুনিক কর্মকাণ্ড যে কত সুদূরপ্রসারী, তা এর চেয়ে স্পষ্টতর ভাবে বোধ হয় আগে উদ্‌ঘাটিত হয় নি।

অ্যালান্ বল্ (Alan Ball) প্রভৃতি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, সমাজবদ্ধ মানুষদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণ এবং তার মীমাংসার সন্ধানই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। তাই তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে এক প্রকার সামাজিক বলবিদ্যারূপে ব্যাখ্যা করতে চান। আধুনিক মার্কিনী আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণও (Behavioural Political Scientists) "ক্ষমতা" (Power) এবং "প্রভাব" (Influence) এর দিক থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রবার্ট ডাল্ (Robert Dahl) বলেন—প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ কিভাবে রাষ্ট্রকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তার আলোচনা হয়। সুতরাং চাপগোষ্ঠী, স্বার্থগোষ্ঠী ইত্যাদি স্বার্থান্বেষীদের কার্যকলাপও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্গত হওয়া উচিত। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও বলা হয় যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আলোচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, রাষ্ট্রের সাহায্যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সামন্ত বা পুঁজিপতিগণ নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ চরিতার্থ করতে চেষ্টা করে।

অ্যালান বল্ প্রমুখের মত

মার্কিনী ও মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি

॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি ধরনের বিজ্ঞান ? ॥

ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ (Comte) বলেছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে খাঁটি বিজ্ঞান বলা যায় না, কারণ, প্রথমতঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এর প্রয়োগ, নীতি ও সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে একমত নন। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলিতে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সত্যের ক্রমিক প্রতিষ্ঠার মত কোনও ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি খাঁটি বিজ্ঞান ? কোঁৎ বলেন—না

পোল্যাণ্ডের সমাজতত্ত্ববিদ্ গুমপ্লোভিজ (Gumplovicz) বলেছেন, রাষ্ট্র নিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলে না, কারণ সরকারী ক্ষমতা দখল করা নিয়ে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী যেভাবে লড়াই করে, মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে তা মানুষের যুক্তিবাদী মনের বাইরের ভাবগতিকের দ্বারা পরিচালিত।

গুমপ্লোভিজের মত

ইতালীয় দার্শনিক মস্কা (Mosca) বলেন যে, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ঘটনাবলী নিয়ে সম্যক্ পর্যালোচনা চলে না, সুনির্বাচিত কোনও পদ্ধতি এখানে অনুসরণ করা হয় না, বৈজ্ঞানিক যুক্তি খাটিয়ে প্রচলিত সাধারণ ধারণার ওপরে এর আলোচ্যমান ঘটনাবলীকে নিয়ে

মস্কার মত

যাওয়ার চেষ্টা হয় না এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী এর তত্ত্বগুলিকে সুসংবদ্ধ করাও যায় না। তাই তাঁর মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান "বিজ্ঞান" নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকতা নিয়ে যখন এ ধরনের মতভেদ দেখা যায়, তখন "বিজ্ঞান" সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। **"বিজ্ঞান"** কথাটি "বিশেষ জ্ঞান" সূচিত করে। টমাস্ হাক্স্লি (Thomas Huxley) বলেন যে, এই "বিশেষ জ্ঞান" লাভ করতে হলে দুটি প্রধান পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক। প্রথমটি হল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণের পদ্ধতি (Empirical অথবা Inductive Method), দ্বিতীয়টি হল উপনীত সিদ্ধান্তগুলি বিবিধ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পদ্ধতি (Deductive Method)। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে একই ধরনের বিভিন্ন ঘটনার পর্যবেক্ষণ থেকে তার কার্যকারণ সম্বন্ধে সাধারণ তত্ত্ব খুঁজে বার করা হয়। গাছ থেকে ভূপৃষ্ঠে আপেল ফলের পতন দেখে নিউটন (Newton) এই পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁর বিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথম পদ্ধতির সাহায্যে উপনীত সিদ্ধান্তগুলি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। বলা বাহুল্য—এ দুটি পদ্ধতিই বৈজ্ঞানিক সত্যের তাত্ত্বিক ও ফলিত দুটি দিকই প্রদর্শন করে এবং নিটোল বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান সফল করে তোলে। দুটি পদ্ধতিই পরস্পর নির্ভরশীল, একে অন্যের পরিপূরক।

বিজ্ঞানের সংজ্ঞা

দার্শনিকগণ বিজ্ঞানকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—গাণিতিক বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান। **গাণিতিক বিজ্ঞানের** ক্ষেত্রে (যেমন পদার্থবিদ্যায় বা রসায়নশাস্ত্রে) পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল উপাদানগুলি অবিকল একই ভাবে অনুরূপ কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় থাকে। তাই এই উপাদানগুলির সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যে সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হওয়া যায়, সেগুলি নিখুঁতভাবে সঠিক, অব্যর্থ ও চিরন্তন সত্যের সূচনা করে। যেমন ধরা যাক, জলের রাসায়নিক উপাদান পৃথিবীর সর্বত্রই এক, ফলে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ঐ উপাদানগুলির সঠিক আণবিক সংযোজনে জল ছাড়া অন্য কিছুই উৎপাদিত হয় না।

গাণিতিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

কিন্তু **প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের** ক্ষেত্রে (যেমন উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় বা ভূগোলে) পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল উপাদানগুলি ঠিক একই ভাবে অনুরূপ কার্যক্ষেত্রে সর্বদা সক্রিয় থাকে না। প্রকৃতির কোন্ এক অদৃশ্য হাতের ছোঁয়া লেগে এগুলি অনেক সময় প্রত্যাশিত ফলাফলের বাইরে অন্য কোনও কার্যক্ষেত্র রচনা করে। শীতপ্রধান দেশের ফল চাষের জন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বৈজ্ঞানিক তাঁর সুপরিকল্পিত বাগানে ঐ ফল উৎপাদনের জন্য নিখুঁতভাবে আলো, বাতাস, উত্তাপ ও সারের ব্যবস্থা করলেও হয়ত দেখা যাবে যে, ফলন আশানুরূপ হল না। তা বলে কিন্তু উদ্ভিদ্‌বিদ্যার মত কোনও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অসত্য প্রমাণিত হল না। শুধু এইটুকু প্রমাণিত হল যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

গাণিতিক বিজ্ঞানের সত্যগুলির মত নিখুঁতভাবে প্রমাণিত ও প্রযোজ্য সূত্রাবলী নয় ; কিন্তু সেগুলির বৈজ্ঞানিকতা অস্বীকার করার উপায় নেই, কেননা সেগুলি মোটামুটিভাবে প্রযোজ্য সূত্র।

তৃতীয় প্রকার বিজ্ঞান হল **সমাজীবজ্ঞান**। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি হল এর অন্তর্ভুক্ত। এই বিজ্ঞানগুলির ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল উপাদানগুলি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূল উপাদানগুলির চেয়ে আরও পরিবর্তনশীল ও জটিল, কারণ এ ক্ষেত্রে **সমাজ ও মানুষ** এই দুই প্রধান উপাদানের প্রত্যেকটিই নানা দেশে, নানা কালে খুব বিচিত্র, অত্যন্ত ভিন্নমুখী। তবুও সমাজবিজ্ঞানীরা এই নিদারুণ আপেক্ষিকতার সীমা মেনে নিয়েও বিভিন্ন প্রকার সমাজবিজ্ঞানের নানা ধরনের সিদ্ধান্ত বার করেছেন ও করেন।

সমাজবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও ইতিহাসের প্রাচীন, বৈচিত্র্যময় গবেষণাগার থেকে বার বার একই ধরনের সামাজিক পটভূমিকায় একই রকমের ঘটনাবলীর পারম্পর্য অবলোকন করে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণপ্রণালীর সাহায্যে, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতি ও প্রয়োগমূলক পদ্ধতি এ দুইয়ের সার্থক সমন্বয়ে নানা প্রকার সত্যের সন্ধান দিয়ে থাকেন। ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্বৈরাচারী, একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিভাবে জনগণ সোচ্চার হয়ে ওঠে, তার বিস্তর নজির পাওয়া যায়। তাই ত' রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রকে আদর্শ শাসনতন্ত্র বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, কারণ এ শাসনব্যবস্থা জনগণের স্বার্থে জনগণ নিজেরাই বেছে নেন, নিজেরাই পরিচালনা করে থাকেন। জনগণের সন্তুষ্টি এরকমভাবে এত সুন্দর করে কোনও বিকল্প শাসনব্যবস্থায় সাধিত হয় না। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা গণতন্ত্রকে আদর্শ শাসনতন্ত্র রূপে ঠিক বৈজ্ঞানিক সত্যের মতই লোকসমাজে তুলে ধরেন। অবশ্য তাঁরা গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য কতকগুলি অনুকূল অবস্থা ও পরিবেশের ওপর জোর দেন, এ অবস্থা ও পরিবেশের আনুকূল্যও তাঁরা ইতিহাস কর্তৃক বার বার পরীক্ষিত, সুনির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত বলে দাবী করে থাকেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজবিজ্ঞান

সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান গাণিতিক বিজ্ঞানের মত চরমভাবাপন্ন অর্থাৎ নিখুঁত সিদ্ধান্তসম্বলিত বিজ্ঞান না হলেও একে বিজ্ঞান বলা হয় সেই বিশিষ্ট অর্থে যে অর্থে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূত্রগুলি বিজ্ঞানভিত্তিক, অর্থাৎ মোটামুটিভাবে প্রযোজ্য সূত্রসম্বলিত বিজ্ঞান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই বৈজ্ঞানিকতা আপেক্ষিকতার সীমায় সীমিত, ঠিক অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের মতই।

কি অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞান "বিজ্ঞান"

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে এই বিশেষ অর্থে "বিজ্ঞান" চিহ্নিত করলেও তার বৈজ্ঞানিকতাকে অস্বীকার করা হয় না। বরং এই খুব সূক্ষ্ম বিচারের ভিত্তিতে কোঁৎ, মস্কা প্রভৃতি লেখকদের মতামতের প্রত্যুত্তর দেওয়া সম্ভব হয়। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রনীতিকে "বিজ্ঞান" মনে করতেন। তিনি তাঁর সমকালীন গ্রীসের ১৫৮টি

বিভিন্ন সংবিধান পর্যবেক্ষণ করেন এবং তার ভিত্তিতে তাঁর "রাষ্ট্রতত্ত্ব" গ্রন্থে বিপ্লবের কারণ এবং বিপ্লবের প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত মতামত ব্যক্ত করেন। সম্ভবতঃ এ ধরনের পর্যবেক্ষণভিত্তিক রাষ্ট্রতত্ত্বের কথা মনে রেখেই মার্কিনী লেখক লাস্‌ওয়েল্‌ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পর্যবেক্ষণভিত্তিক বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন, একে পরীক্ষানির্ভর বিজ্ঞান বলতে তিনি ইচ্ছুক নন। লর্ড ব্রাইস্‌ (Lord Bryce) বলেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি বহু উপাদান থেকে সংগৃহীত হলেও একে পদার্থবিদ্যা বা রসায়নশাস্ত্রের তুল্য বলা চলে না। এ যুগের প্রসিদ্ধ নাট্যকার বার্নার্ড শ (Bernard Shaw) রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞান বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, মানব-সভ্যতার বর্তমান সংকট থেকে তাকে মুক্ত করতে হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দ্বারাই তা ঘটানো সম্ভব।

কেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান "বিজ্ঞান" ঃ আরিস্টটল্‌, ব্রাইস্‌, বার্নার্ড শ, মার্ক্সের মত

আপেক্ষিক বিজ্ঞানরূপে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কেউ কেউ "অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান" বলার পক্ষপাতী। লর্ড ব্রাইস্‌ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আবহবিদ্যার (Meteorology) মত অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান বলতে চেয়েছেন। কারণ গাণিতিক বিজ্ঞানের সূত্রগুলি সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নয়। কিন্তু সমস্ত বিজ্ঞানের মতই রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা, শ্রেণীবিভক্তিকরণ প্রভৃতি বিশ্লেষণপদ্ধতির সাহায্যে রাষ্ট্রের বিবর্তন, নাগরিকদের ভূমিকা, রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা ও এগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মার্ক্সবাদীগণ মনে করেন যে, সাধারণভাবে ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান ও দর্শনের সিদ্ধান্ত ও সূত্রগুলিকে ব্যবহার করে সঠিক সমাজতন্ত্র (Scientific Socialism) নামে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সন্ধান মেলে। সুতরাং এই পদ্ধতির সাহায্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে প্রগতিশীল বিজ্ঞানরূপে চিহ্নিত করতে কোন বাধা নেই।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রগতিশীল বিজ্ঞান

॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি সূত্রনির্ণায়ক বিজ্ঞান ? ॥

সূত্রনির্ণায়ক বিজ্ঞান (Normative Science) বলতে বোঝায় এমন একটা বিজ্ঞান, যা কতকগুলি প্রযোজ্য সূত্রের সন্ধান দেয়। এই সূত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ-ক্ষেত্রে অবিকৃতভাবে ব্যবহার করা চলে। এইভাবে এই সূত্রগুলির সাহায্যে এমন একটি বিস্তীর্ণ তত্ত্বক্ষেত্র রচিত হয় যা অন্যান্য প্রয়োগক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে ঐ নতুন ক্ষেত্রের অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করে দেয়। সুতরাং সূত্রনির্ণায়ক বিজ্ঞান যেন মানদণ্ডের মত, সূত্রগুলি যেন বিভিন্ন মানের সূচক। ঐ মানদণ্ডের সাহায্যে কোনও সিদ্ধান্ত অন্য সিদ্ধান্তের তুলনায় কতটা সত্য বা ভ্রান্ত, তা নির্ণীত হয়।

সূত্রনির্ণায়ক বিজ্ঞান কাকে বলে?

খাঁটি সূত্রনির্ণায়ক বিজ্ঞান বলতে গাণিতিক বিজ্ঞানগুলিকেই বোঝায়। কেন

না, গণিত হল প্রধানতঃ কতকগুলি সূত্রের সমষ্টি। এই সূত্রগুলির সাহায্যে মানুষ সহজেই নানারকম হিসাবনিকাশ করতে পারে, নানারকম পরিমাপ করতে পারে। এই নিখুঁত সূত্রনির্ণায়ক গণিতের ওপর ভিত্তি করেই বর্তমান কম্পিউটারের যুগে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প দাঁড়িয়ে আছে, প্রযুক্তিবিদ্যা বা পদার্থবিদ্যা বা রসায়নশাস্ত্রের গবেষণাগারে হাজারো ধরনের অন্বেষণ নিরীক্ষণ ঠিক না ভুল, তা ধরা পড়ছে।

উদাহরণ : গাণিতিক বিজ্ঞান

রাষ্ট্রবিজ্ঞান মূলতঃ একটা গুরুত্বপূর্ণ সমাজবিজ্ঞান। সমাজ ও মানুষ কিভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের সংগে দৈনন্দিন জীবনে জড়িয়ে পড়ছে তার তাৎপর্য নির্ণয় করাই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের প্রধান কাজ। কিন্তু মনে রাখা দরকার, খাঁটি সূত্রনির্ণায়ক বিজ্ঞান হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত কোন সমাজবিজ্ঞান কোনদিনই স্থায়ী রূপ লাভ করতে পারে না। আদিম মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে যে মানবসভ্যতার শুরু, তা অদূর ভবিষ্যতে মানুষকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে কোথায় নিয়ে যাবে—কেউ সে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহসী হবেন না। আজ আণবিক যুগের মানুষ চাঁদে তার চরণচিহ্ন রেখে এল। এর পরের যুগ কি রকম, মানুষ তার অদম্য শ্রম, অশেষ অধ্যবসায় ও দুরন্ত কৌতূহল নিয়ে ভবিষ্যতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সে কথা কেউ জানে না। তাই আজকের যুগের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি আগামীকালের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মুখে কি রূপান্তর পরিগ্রহণ করবে, সে কথাও বলা যায় না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সূত্রনির্ণায়ক বিজ্ঞান নয়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজবিজ্ঞান

আসল কথা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত যে-কোন সমাজবিজ্ঞানেরই সূত্রগুলি সব সময় আপেক্ষিক। তার প্রধান কারণ, মানুষ সব সময় প্রগতিশীলতার পথে ধাবিত। গুহাবাসী আদিমানব আজকের বহুতল অট্টালিকায় স্বচ্ছন্দচারী মানুষ থেকে কি প্রচণ্ড পৃথক! কিন্তু একটা ব্যাপার এখনও বদলায় নি। সেটা হল মানুষের নিজের জীবনকে, নিজের পরিবারের জীবনকে, নিজের সমাজের জীবনকে, নিজের পরদেশী বন্ধুবান্ধবদের জীবনকে উন্নত থেকে উন্নততর লক্ষ্যে নিয়ে যাবার সুবিপুল প্রচেষ্টা। এই প্রগতিশীলতাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কোনদিনই মামুলি, বাঁধাধরা কতকগুলো সূত্রের বেড়াজালে আবদ্ধ রাখবে না। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russell) মানুষের এই অসীম অগ্রগতির ভূমিকা কল্পনা করে ঠিকই বলেছেন যে, সমাজশাস্ত্রের সূত্রগুলি চিরদিনই যেন অসমাপ্ত। আজ যদি মানুষ তার দম্ভ ও আস্ফালনে বলীয়ান্ হয়ে সমাজবিজ্ঞানের সূত্রগুলো চিরদিনের মত সঠিক, নিখুঁত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে রাখতে চায়, তাহলে এই পরিসমাপ্তি টানার প্রয়াস সূচনা করবে মানুষের, পরিবারের, সমাজের, রাষ্ট্রের, সভ্যতার চির-পরিসমাপ্তি। এর অর্থ সভ্যতার মহাপরিনির্বাণ নয়, সভ্যতার অপমৃত্যু।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত সমাজ-বিজ্ঞানের সূত্রগুলি সবই আপেক্ষিক ; সূত্রনির্ণায়ক বিজ্ঞানের মত শাশ্বত, অভ্রান্ত, সর্বজনীন নয়

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে

গাণিতিক বিজ্ঞানের মত একটা নিখুঁত সূত্রনির্ণায়ক বিজ্ঞানরূপে দাঁড় করাবার যে চেষ্টা করেছিলেন, তাকে বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়। তিনি বলেছিলেন যে সমাজশাস্ত্রের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম স্তর হল একটি ধ্রুববাদী স্তর (Positive Stage)।

এ বিষয়ে ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ এর বক্তব্য ও তার ত্রুটি

সভ্যতার ক্রমোন্নতির শেষ ধাপ হল এই স্তর। এই স্তরে সমাজশাস্ত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন সূত্রগুলো চরমতম বিকাশ লাভ করে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শেষ অবস্থায় পরিণত হয়। এই হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত সব সমাজবিজ্ঞানের শেষ স্তর। কোঁৎ চেয়েছিলেন সমাজশাস্ত্রকে চরম সূত্রনির্ণায়ক বিজ্ঞানে পরিণত করতে। কিন্তু সবচেয়ে বড় বিপদ হল এই যে, এর ফলে সমাজশাস্ত্রীয় জ্ঞানরাজ্যে একটা চরম একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন মানুষের স্বাধীন সত্তা, স্বাধীন চিন্তা অত্যন্ত বিঘ্নিত হবে। একের মধ্যে বহুর বর্ণ-বৈচিত্র্যে সুশোভিত মানব-সভ্যতা একমুখিতার সংকীর্ণ ফল্গুস্রোতে পরিণত হবে, যা পবিত্র হলেও আগামী দিনের মানবমননের চাহিদার তুলনায় হবে নিতান্ত অপ্রতুল।

আধুনিক ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ক্যাট্‌লিন (Catlin) বলেছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত সূত্রনির্ণায়ক বিজ্ঞান হিসাবে দাঁড় করাতে গেলে তাকে নীতিশাস্ত্রের

এ বিষয়ে ক্যাট্‌লিনের মত ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ ঃ আচরণবাদী বনাম নব্য-আচরণবাদী

প্রভাব থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে (Politics is irrelevant to Ethics)। আর্থার বেণ্ট্‌লি (Arthur Bentley), রবার্ট্‌ ডাল্‌ (Robert Dahl) প্রমুখ আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণও (Behavioural Political Scientists) এই ধরনের মত সমর্থন করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অধিকতর বিজ্ঞানমুখী করে তোলা হলে তাতে হয়ত জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে কিছু লাভ হতে পারে, তবে মানুষের প্রগতিশীলতার পথে হবে চরম বিপদ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কখনই নীতিশাস্ত্রকে উপেক্ষা করে চলতে পারে না। কারণ শুধু নাগরিকের কথাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ভাবা হয় না, ভাবা হয় সুনাগরিকের কথাও। শুধু রাষ্ট্রের কথাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ভাবা হয় না, ভাবা হয় আদর্শ রাষ্ট্রের কথাও। শুধু আন্তর্জাতিক সংস্থার কথাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ভাবা হয় না, ভাবা হয় পরমোৎকৃষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার কথাও। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্রগুলি আপেক্ষিক সূত্রাবলী, এগুলি কখনই নিখুঁত সূত্রনির্ণায়ক বিজ্ঞানের অংশীভূত হতে পারে না, হওয়া উচিতও নয়। তাই দেখা যায় যে ডেভিড্‌ ইস্টনের (David Easton) মত মধ্যপন্থী নব্য আচরণবাদীগণ (Neo-Behaviouralists) স্বীকার করেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানকে কখনই নীতিশাস্ত্রবিমুখ করা চলে না। মূল্যবোধ প্রভৃতির আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কাছে তাৎপর্যহীন নয়।

॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রনীতি ॥

রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রনীতি এই তিনটি শব্দ রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনায় অনেক সময় বিশেষ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। যে শাস্ত্রে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের

সংগে রাষ্ট্রযন্ত্রের সম্পর্ক নিয়ে স্বচ্ছন্দ আলোচনা করা হয়, তাকে বলা হয় **রাষ্ট্রবিজ্ঞান** (Political Science)। **রাষ্ট্রদর্শন** (Political Philosopy) বলতে বোঝায় রাষ্ট্রসম্পর্কিত কতকগুলি দার্শনিক তত্ত্ব।* কি কি নীতির ও আদর্শের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় বা হওয়া উচিত, সেগুলির বিশ্লেষণই রাষ্ট্রদর্শনের প্রধান কাজ। এতে আলোচিত হয় রাষ্ট্রনৈতিক ভাবাদর্শ (ideologies), রাষ্ট্রিক কার্যকলাপের তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক চিন্তাধারার গতিপথ ইত্যাদি। এ দিক থেকে বিচার করলে সহজেই বোঝা যায় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি রাষ্ট্রদর্শনের পরিধির চেয়ে অনেক ব্যাপক। রাষ্ট্রদর্শনকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অংশ বলা চলে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বনাম রাষ্ট্রদর্শন : রাষ্ট্রদর্শন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ

রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতি (Politics) কথাটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সহজসাধ্য নয়। এ কথাটির উৎপত্তি প্রাচীন গ্রীসে। গ্রীক শব্দ "পলিস্" (Polis) থেকে এ কথাটির প্রচলন। "পলিস্" কথাটির তৎকালীন গ্রীক অর্থ ছিল—"নগর"। তখন গ্রীসে এক একটি ছোটখাটো নগরকে কেন্দ্র করেই "রাষ্ট্রে"র পত্তন হত। তাই গ্রীক রাষ্ট্র বলতে তখন বোঝাত "নগর-রাষ্ট্র" (city-state)। তাই সে যুগে "রাষ্ট্রনীতি" বলতে গ্রীসে বোঝাত নগরশাসনের রীতিনীতি। এগুলি তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক—দুরকমেরই হতে পারত। কিন্তু গ্রীক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যারিস্টটল্ "রাষ্ট্রনীতি" কথাটি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুরকম আলোচনারই আধাররূপে কল্পনা করে এর প্রচলন করে গেছেন। সেই অর্থে অর্থাৎ অ্যারিস্টটলীয় অর্থে "রাষ্ট্রনীতি" ও "রাষ্ট্রবিজ্ঞান" এ দুইয়েরই আলোচনাক্ষেত্র ও প্রয়োগক্ষেত্র একই দাঁড়িয়ে যায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বনাম রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি : উভয়ের আলোচনাক্ষেত্র ও প্রয়োগ-ক্ষেত্র এক

কিন্তু সাধারণ মানুষ "রাষ্ট্রনীতি" কথাটি এমনভাবে ব্যবহার করে যাতে রাষ্ট্রকে একটা আটপৌরে ব্যবহার্যের রূপ দেওয়া হয়। দৈনিক জীবনে রাষ্ট্রযন্ত্র সরকারের প্রেরণায় ও প্রচেষ্টায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। সরকার চালিত হয় কিছু লোকের দ্বারা, এবং কতকগুলো নিয়মকানুন, প্রকল্প, কার্যক্রম অনুসারে। জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ প্রায়ই নানারকম মতামত ব্যক্ত করে থাকে। তারা চায় সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রকে সেই-সেই দিকে পরিচালিত করুক। নানা দল, প্রতিদল, উপদল, ইত্যাদি রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রকে অর্থাৎ সরকারকে নানাভাবে দখল করার চেষ্টাও চালিয়ে যায়। বাস্তব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য এবং এ বিষয়ে প্রযোজ্য নীতি বা আদর্শ সম্বন্ধে সংগঠিত জনসমাজের বিভিন্ন সভ্যদের এ ধরনের চল্তি কাজকর্মগুলিকেই অনেকে "রাষ্ট্রনীতি" বলে থাকেন। কিন্তু এই অর্থে রাষ্ট্রনীতির পরিপ্রেক্ষিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতের তুলনায় স্বতন্ত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের রাষ্ট্রিক জীবনযাত্রার বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর আলোচনা। রাষ্ট্রনীতি প্রচলিত অর্থে সম্পূর্ণ বাস্তবমুখী কর্মকাণ্ড, যার মধ্যে হয়ত

কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আটপৌরে, ব্যবহারিক রূপ হল রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতি

সময় সময় যুক্তির চেয়ে আবেগের, তত্ত্বের চেয়ে ফলিতের, বড়ো সূক্ষ্ম আদর্শের চেয়ে সংকীর্ণ, স্থূল সুবিধাবাদের প্রভাব বেশী। সে দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রনীতির চেয়ে অনেক উন্নত, সূক্ষ্ম, মানবধর্মী।

॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সম্বন্ধ ॥

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস

সিলী ও উইলোবির ধ্রুপদী চিন্তা : ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত

ইংরেজ লেখক সার জন সিলী (Sir John Seeley) বলেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছাড়া ইতিহাসের অধ্যয়ন ও অনুশীলন নিষ্ফল, আবার ইতিহাস ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান অমূলক। উইলোবি (Willoughby) বলেছেন যে, ইতিহাস যেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃতীয় পরিভাগ (third dimension)।

ইতিহাস সাল তারিখের, রাজারাজড়ার তালিকা নয় : ইতিহাস মানবসভ্যতার, মানুষের ক্রমিক অগ্রগমনের মহাকাব্য

ইতিহাস্ মানবসমাজের শুরু থেকে তার ধারাবাহিক বিকাশ ও পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা করে। গল্প হলেও সত্যি এর কথামালা। মহাকালের জপমালা এক একটি যুগে যেন একাধিক রাষ্ট্রের উত্থানপতনের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ অদৃশ্য মহাশক্তির হাতে ঘুরে ফিরে চলে। এক যুগের রাষ্ট্রিক ভগ্নস্তূপের ওপর গড়ে ওঠে নতুন এক রাষ্ট্রব্যবস্থার সৌধ, সমারোহ। কত না রাজারাজড়ার অক্ষমতার কাহিনী ঐতিহাসিক বর্ণনা করে চলেন ঠিক তেমনি নিরাসক্তভাবে, যেমনভাবে তিনি তুলে ধরেন সফলকাম শাসকের গৌরবোজ্জ্বল ঘটনাবলী। মানবসভ্যতার ইতিহাসে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সব রকমের ইতিহাসই সক্রিয় অংশীদার, রাষ্ট্রীয় ইতিহাস ত' বটেই। তাই ইতিহাসের বিশাল গবেষণাগার সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কাছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সত্যগুলি বার বার যে মানবিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক উপাদানগুলির ওপর নির্ভরশীল, সেই মৌলিক উপাদানগুলিই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে ইতিহাস সরবরাহ করে চলে অকৃপণ হাতে। ইতিহাস শুধু সাল, তারিখের, রাজারাজড়ার তালিকা নয়, ইতিহাস মানবসভ্যতার ইতিহাস, মানুষের ক্রমিক অগ্রগমনের সাফল্য ও ব্যর্থতার মহাকাব্য।

এ বিষয়ে লিপ্‌সনের বক্তব্য

লিপ্‌সন্ (Lipson) বলেছেন যে, ইতিহাস বিভিন্ন যুগের নানা প্রকারের পরিবর্তনের সময়ানুগ ব্যাখ্যা প্রদান করে। ফলে ঐতিহাসিকের কাছ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গোটা সামাজিক পরিবর্তনের প্রণালী সম্বন্ধে একটা সুগভীর প্রজ্ঞাদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন, ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটা ঊর্ধ্বমুখী রাষ্ট্রদর্শনের জগতে উন্নীত করে।

জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ (John Stuart Mill) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ইতিহাসকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান পরীক্ষা-নিরীক্ষার (Empirical analysis) মাধ্যম বলে মনে

করেন। লর্ড্ অ্যাক্টন্ (Lord Acton) তাই বলেছেন যে, ইতিহাসের অবিরাম প্রস্রবণ অজস্র বালুরাশির ওপরে যে সুবিস্তীর্ণ স্বর্ণস্তর স্থাপন করে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল সেই অক্ষয় সম্পদ। তাই ইতিহাস ছাড়া আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা কল্পনাই করতে পারি না।

মিল্ ও অ্যাক্টনের বক্তব্য

আবার অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইতিহাসের ওপরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে স্থান দিয়েছেন। গিল্ক্রাইস্ট্ (Gilchrist) বলেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা উদ্দেশ্যমূলক (teleological) দিক আছে। ইতিহাস শুধু রাষ্ট্রকে, মানুষকে ও সমাজকে কেন্দ্র করে আগেকার দিনের কতকগুলো ঘটনার পারম্পর্য নির্দেশ করে। এ তো শুধু ছক সাজানো। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাঁর যুগোপযোগী সমাজচেতনার প্রভাবে কতকগুলো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ও দার্শনিক সমীক্ষার সূত্রপাত করেন। সেই অর্থে ইতিহাসের কাজ যেখানে শেষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গতি সেখানে শুরু। ইতিহাসের চেয়ে তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র অনেক বিস্তীর্ণ।

গিলক্রাইস্টের মত ঃ
ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের
মধ্যে মিল ও গরমিল

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল (Hegel) ও কার্ল মার্ক্স্ (Karl Marx) ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিহাসের উচ্চতর দার্শনিক দিকটির ওপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কাছে ইতিহাসের চেয়ে "ইতিহাস-দর্শনই" (Philosophy of History) বেশী অর্থবহ ও মূল্যবান। হেগেল এবং মার্ক্স্ দুজনেই ইতিহাসের ঘটনাবলীর অবশ্যম্ভাবিতার (Determinism) ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হেগেলের মতে ভাব-জগতে যেমন চিন্তা-ভাবনার ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে সম্পূর্ণ চেতনাচিত্র গড়ে ওঠে, জাগতিক ক্ষেত্রেও ঘটনাবলীর ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে, এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের সংঘর্ষের ও অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে মানবজাতির রাষ্ট্রিক জীবনযাত্রার ধারাবাহিকতাও সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে।

ইতিহাসদর্শন
না
ইতিহাসবিজ্ঞান ?

মার্ক্স্ কিন্তু হেগেলের আদর্শবাদের বিরুদ্ধে জড়বাদের প্রাধান্য ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে ইতিহাস হল মানবসমাজের শোষক-শোষিতের বেদনাদীর্ণ সংঘাতের ইতিহাস। যে কোন সমাজব্যবস্থা, যে কোনশাসন-ব্যবস্থা, যে কোন রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ সবই এমন একটা চরম অবশ্যম্ভাবিতার পথে শেষ পর্যন্ত শোষিতদের ধাবিত করে যে তারা বাধ্য হয়ে বিপ্লবমুখী হয়ে ওঠে। বিপ্লবের ইতিহাসের এই চরম অবস্থাটিই হল শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিতদের নিদারুণ সংগ্রাম, যার শেষে তারা শ্রেণীবিহীন, সাম্য-বাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে। মার্ক্সের মতে, ইতিহাস ও অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি অবলম্বনেই ইতিহাসদর্শন বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রবাদের (Scientific Socialism) জন্ম দেয় এবং সেই অর্থে মার্ক্সীয় ইতিহাসদর্শন ইতিহাস-বিজ্ঞান।

মার্ক্সীয় ইতিহাসদর্শন
ফলতঃ ইতিহাসবিজ্ঞান

এটা সকলেই স্বীকার করবেন যে, ইতিহাসের সব কিছুই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাছে সমান প্রয়োজনীয় নয়। মুদ্রার প্রচলনের ইতিহাস বা সামরিক আদবকায়দার ইতিহাস বা চারুকলার ইতিহাস প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই মতটিই সুস্পষ্ট আকারে বার্কারের (Barker) লেখায় দেখা যায়। তাঁর মতে ইতিহাসের ওপর নির্ভর না করেও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের মোটামুটি সন্তোষজনক একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করা যায়। কথাটা খুব বেশী একতরফা হলেও এর মধ্যে অনেকখানি সত্য রয়েছে।

বার্কারের সিদ্ধান্ত

২. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান

রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে। অর্থনীতি প্রধানতঃ মানুষের অসংখ্য অভাব দূর করার জন্য সীমাবদ্ধ উপায়গুলির কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে। এই কার্যকলাপগুলির সাফল্য নির্ভর করে কত সুষ্ঠুভাবে সমাজে ধন উৎপাদিত হয়, উৎপাদন বণ্টিত হয়ে ভোগ হয় এবং মানুষ পরস্পর নিজেদের পৃথক পৃথক শ্রম বিনিময়ের দ্বারা নিজেদের এবং সমগ্রভাবে সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের ধ্রুপদী সংজ্ঞা :

প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতগণ রাজনীতি ও অর্থশাস্ত্রকে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করতেন। লক্ (Locke) রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্মবৃত্তান্তও আলোচনা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে "ফিজিওক্র্যাট্স্" (Physiocrats) সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণ অর্থনীতিকে রাজনীতির একটি শাখারূপে কল্পনা করেন। ধনতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার অ্যাডাম্ স্মিথ্ (Adam Smith) বলেন যে, জনগণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্বসংগ্রহ ও গণপ্রশাসনে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থব্যয় রাজনৈতিক অর্থব্যবস্থার (Political Economy) প্রধান লক্ষ্য।

লক্, ফিজিওক্র্যাট্স্ ও অ্যাডাম্ স্মিথ্

আধুনিক অর্থনৈতিক জীবন যেমন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে গেছে, তেমনি আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনও ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে যাচ্ছে। সেদিক থেকে বিচার করলে অ্যারিস্টটলের মত ধ্রুপদী পণ্ডিতদের বক্তব্য এখনও গ্রহণ-যোগ্য। তাঁর মত হল ধনবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা শাখা। জটিলতা ছাড়াও উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করলেও ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান দুটিরই মূল সামাজিক লক্ষ্য এক—ব্যক্তির ও সমাজের মঙ্গলসাধন।

এ বিষয়ে ধ্রুপদী বক্তব্য : অ্যারিস্টটল্

আজকাল মার্ক্স্বাদের প্রভাবে সমাজতন্ত্রবাদ বা সোস্যালিজম্ রাষ্ট্রের প্রধান

উদ্দেশ্য বলে গৃহীত হচ্ছে। সমাজতন্ত্রবাদী ল্যাস্কি (Laski) বলেছেন যে, রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ কতকগুলি মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয়। ফলে রাষ্ট্রের আইনকানুন ক্ষমতাবান মুষ্টিমেয় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয়।সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নানারকম অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে নাগরিকদের অর্থনৈতিক জীবনে সাম্য আনবার চেষ্টা করে।

এ বিষয়ে ল্যাস্কি প্রমুখ সমাজতন্ত্রীদের মত

আবার ধরা যাক্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশের কথা। সেখানে সরকার ধনতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী নাগরিকদের অবাধ বাণিজ্যিক স্বাধীনতা প্রভৃতি রক্ষা করে। রাষ্ট্র সেখানে নাগরিকদের অর্থনৈতিক জীবনের ওপর সোবিয়েত রাশিয়ার মত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রদের অনুসৃত কোন বিধিনিষেধ আরোপ করে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা

রাষ্ট্রের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ প্রধানতঃ অর্থনীতিকে নিয়ে। সমাজের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে অর্থনীতি শ্রমিকদের প্রত্যেকের দৈনন্দিন পরিশ্রমের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়। কিন্তু উপযুক্ত আইন ছাড়া শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও স্বার্থের ওপর এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয় না। রাষ্ট্রের অধীন আইনসভা এই আইন প্রচলন করে, নির্বাহী বিভাগ এই আইন বলবৎ করে এবং বিচার বিভাগ নজর রাখে যেন এই আইন সকলে সমানভাবে মেনে চলে।

ব্যক্তির দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান দুই শরিক

আধুনিক যুগে যে **কল্যাণকর রাষ্ট্রের** (Welfare State) কথা কল্পনা করা হয়েছে, তার দুটি দিক আছে—রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক। রাষ্ট্রিক দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, এই ধরনের রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য নাগরিকদের নানারকম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত আইনসভার দ্বারা গৃহীত আইনকানুনের মারফত দেশে অর্থনৈতিক সাম্য এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার কায়েম করার চেষ্টা করে। অর্থনৈতিক দিক থেকে চিন্তা করলে বলা যায় যে, কল্যাণকর রাষ্ট্রগুলি প্রয়োজন হলে সমাজতন্ত্রবাদের অনেক জনহিতকর নীতি গ্রহণ করে। যেমন, দরকার হলে শ্রমিকদের নানা রকম সুযোগসুবিধা দেওয়া, বেকার-ভাতা বা বেকার-বীমার ব্যবস্থা করা, রেল, টেলিফোন, বিমান প্রভৃতি নাগরিকদের নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাগুলির ওপর রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। সুতরাং জনকল্যাণকর রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা এবং কর্মসূচী নিয়ে চিন্তা করলেই বোঝা যায় কিভাবে ব্যক্তির এবং জাতির বৃহত্তর মঙ্গলসাধনের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান উভয়ের নীতিগুলোর ফলিত রূপদান সম্ভব হয়, কিভাবে সমাজতন্ত্রবাদ ও ধনতন্ত্রবাদের সাধারণ মঙ্গলকর কর্মসূচীর সার্থক সমন্বয়সাধন সম্ভব হয়।

আধুনিক যুগের কল্যাণকর রাষ্ট্রের উদাহরণ

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান—এই দুটি প্রধান সমাজবিজ্ঞানের পটভূমিকা, উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী এক। এখনও অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি ইংলন্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অনেক ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে "অর্থনীতি" বলতে "রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি" (Political Economy) বোঝায় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে তার সহ-অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়।

আধুনিক পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে

কিন্তু ধনবিজ্ঞানের সব কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়। আজকাল অর্থনীতিবিদদের মধ্যে একটা ফ্যাশান দেখা যায় যে, তাঁরা ধনবিজ্ঞানের যুক্তি-তর্ক ও সিদ্ধান্তগুলি এমনভাবে উচ্চপর্যায়ের গণিতে রূপান্তরিত করেন যে, মনে হয় যেন অর্থবিজ্ঞান নিখুঁত সূত্রনির্ণায়ক গাণিতিক বিজ্ঞানে পরিণত হল। সূক্ষ্ম বিজ্ঞানচর্চার নমুনা হিসাবে তাঁদের এই প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখলেও তার সংগে ব্যক্তির বা সমাজের কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, ধনবিজ্ঞানের নামে এই অভুতপূর্ব গণিতচর্চা আর যা-ই কিছু হোক, সমাজবিজ্ঞান নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরও সহযাত্রী নয়। কথাটি দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার চাপে পিষ্ট তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলিতে অর্থবিদ্যা-চর্চার রূপরেখা নির্ণয়ের সময় বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত-পার্থক্য

৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব

সমাজতত্ত্ব (Sociology) সভ্য, অসভ্য নির্বিশেষে সমাজের সমস্ত মানুষের সব রকম সংঘ-জীবনের আলোচনা করে। মানুষের এই সংঘবদ্ধতার বিভিন্ন দিকগুলি সমাজতত্ত্ব ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণমূলকভাবে ব্যাখ্যা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু সমাজবদ্ধ সভ্য মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। এই অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজতত্ত্বের সন্তানস্বরূপ। সিজউইক (Sidgwick) বলেছেন, সমাজতত্ত্ব সাধারণভাবে ও ব্যাপকভাবে মানবসমাজ নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু সভ্য মানুষের শাসিত সমাজজীবন নিয়ে আলোচনা করে। এই শাসিত সমাজজীবন রাষ্ট্র ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে জড়িত। তাই সিজউইকের মতে, সমাজতত্ত্বের আলোচনার পরিধি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধির চেয়ে অনেক বড়। সমাজতত্ত্ব ব্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংকীর্ণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রধানতঃ রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য অসংখ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করে। কারণ, সমাজের বিস্তৃত কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা সীমাবদ্ধ।

সমাজতত্ত্বের কয়েকটি ধ্রুপদী সংজ্ঞা ঃ সিজউইক

ডানিং (Dunning)-এর মতে, আদিম মানুষের সমাজজীবনের বিবর্তনের ধারা

সম্পূর্ণভাবে সমাজতত্ত্বের অন্তর্গত। এর সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধই নেই। রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পর মানুষের রাষ্ট্রমুখী সমাজজীবনের আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্গত। তাই ডানিং মনে করেন যে, সভ্য মানুষের জীবনে সমাজতত্ত্বের সূত্রপাত বহু আগে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানবজীবনের বিবর্তনের ইতিহাসে অনেক পরে স্থান পেয়েছে। পল্ জানে (Paul Janet) এই মত সমর্থন করতেন।

সমাজতত্ত্বের ধ্রুপদী সংজ্ঞা: ডানিং ও পল্ জানের মত

গিল্‌ক্রাইস্ট্ (Gilchrist) মনে করেন যে, সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পারস্পরিক সীমারেখা নির্ণয় করা খুব কঠিন হলেও মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, সমাজতত্ত্ব সমাজসম্পর্কিত বিজ্ঞান, আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রসম্পর্কিত বিজ্ঞান। ("Sociology is the Science of Society ; Political Science is the Science of the State")। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তিনি বলেছেন যে, সমাজতত্ত্বের চেয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র অনেক বেশী বিশেষজ্ঞতার (Expertise বা Professionalism) দাবী রাখে। অর্থাৎ, সমাজতত্ত্বের চেয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা অনেক বেশী বিশিষ্ট।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে মিল ও গরমিল: গিলক্রাইস্টের বক্তব্য

ক্যাট্‌লিনের (Catlin) মতে, সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা পরস্পরের অনুপূরক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যখন রাজনৈতিক দলগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়, তখন যদি সেই বিশিষ্ট রাজনৈতিক সমাজের একটা শ্রেণীভিত্তিক (অর্থাৎ, সমাজতাত্ত্বিক) আলোচনা পাশাপাশি রাখা হয়, তা হলে সেই সমাজে কোন বিশেষ সময়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই নির্দিষ্ট বিষয়টির আলোচনা অনেক বেশী সম্পূর্ণ, তথ্যনির্ভর এবং বাস্তববাদী হয়ে উঠতে পারে। অতি-আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের (Political Sociology) উদ্ভবের এটাই প্রধান কারণ।

এ বিষয়ে ক্যাট্‌লিনের মত: অতি-আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের অনুপ্রবেশ

ক্যাট্‌লিনের মতামতের সঙ্গে প্রখ্যাত মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক গিডিংসের (Giddings) মতের খুব মিল দেখা যায়। গিডিংস্ বলেছেন যে, নিউটনের বিখ্যাত গতিতত্ত্ব না শিখে যেমন শিক্ষার্থী জ্যোতির্বিজ্ঞান কিংবা তাপসঞ্চালন সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারে না, সমাজতত্ত্ব না শিখে তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ ধারণা করাও অসম্ভব। তাই সমাজবিজ্ঞান সমাজকে নিয়ে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রকে নিয়ে জড়িত। একটির সাহায্য ছাড়া অপরটির আলোচনা চলে না, একে অপরের পরিপূরক।

উপসংহার: কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত

৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান

আধুনিক জার্মান মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েডের (Sigmund Freud) মনো-বিশ্লেষণ (Psychoanalysis) বিষয়ক মতবাদ প্রচারিত হবার ফলে বর্তমান যুগে সমাজশাস্ত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেন নতুন দৃষ্টিকোণ উন্মুক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও এর প্রভাব অনস্বীকার্য।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, তৃপ্তি-অতৃপ্তি, ধ্যান-ধারণা—সবই মনোবিজ্ঞানের (Psychology) আলোচ্য। মনোবৈজ্ঞানিকদের মতে, মানুষের বাহ্য রূপের অন্তরালে লুকিয়ে আছে আর এক মানুষ। এই দ্বৈত রূপের ফলে প্রায়ই সংঘাত লাগে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা যায় মানুষের চেতন (conscious) এবং অবচেতন (sub-conscious) মনের সংঘাত। একই মানুষের মনোভাবে এই দ্বৈততা প্রায়ই চোখে পড়ে। যে মানুষের আলাপে, আচরণে, চিন্তায় ও চেষ্টায় এ ধরনের দ্বৈততা নেই, সে-ই হল মোটামুটিভাবে ব্যক্তি হিসাবে অপেক্ষাকৃত সুস্থ, সহজ ও সমন্বিত ব্যক্তিত্ব (integrate personality)। ফ্রয়েড বলেন যে, যার মধ্যে এই সংঘাত যত তীব্র, ব্যক্তি হিসাবে সে তত বেশী অসুস্থ, জটিল ও অসংলগ্ন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কাছে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের গুরুত্ব

ফ্রয়েডের মতে, শৈশবকাল থেকেই মানুষের মনে চেতন ও অবচেতনের সংঘাত চলতে থাকে। যে শিশু কৈশোর ও যৌবনে পিতা বা মাতার অতিরিক্ত কর্তৃত্বের অধীনে থাকে, সে বড় হয়ে ওঠে হয়ত নিতান্ত ভীরু স্বভাবের হয়ে। কিংবা বড় হয়ে কর্মক্ষেত্রেও সে হয়ত কর্মকর্তার ন্যায়সংগত যুক্তিসিদ্ধান্তও মেনে নেয় না, সে হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। এই সকল কারণে ফ্রয়েডপন্থীরা শিশুর সুষ্ঠু মানসিক গঠনের জন্য উপযুক্ত পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ তৈরীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মানবজীবন ও মানবমনন: ফ্রয়েডের দৃষ্টিভঙ্গি

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে কোনও বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা অনেকটা কাজে লাগান যায়। ধরা যাক্—গণতন্ত্রের কথা। গণতন্ত্র (Democracy) একনায়কতন্ত্রের (Dictatorship) চেয়ে অনেক বেশী কাম্য বলে প্রচার করা হয়। তার প্রধান কারণগুলি হল মনস্তাত্ত্বিক। যেমন বলা হয় যে, গণতন্ত্র দেশের সমস্ত মানুষের কল্যাণবৃদ্ধির চেষ্টা করে। গণতন্ত্র যেহেতু জনগণের দ্বারা তাদের স্বার্থে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা, তাই দেশের সকলের আশা, আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ ও মূর্ত হয়ে ওঠে এই শাসনব্যবস্থায়। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থা স্থায়ী শাসনব্যবস্থা, জনগণের সন্তোষই এর স্থায়িত্বের প্রধান ভিত্তি। অপর পক্ষে বলা হয় যে, একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থায় এক বিশেষ নেতার (যিনি দেশের একচ্ছত্র শাসক) ও তাঁর সমর্থিত মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির ও তাঁদের স্বার্থান্বেষী বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতা লাভ করে। ফলে দেশের বহু

ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

লোক ক্রমে ক্রমে অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাই ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় যে, স্বৈরাচারী সরকার চিরদিনই স্বল্পায়ু।

শুধু তাই নয়। তুলনামূলকভাবে একনায়কতন্ত্রী সরকারের চেয়ে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা বিচার করা হয় মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক দিয়ে। বলা হয় যে, গণতন্ত্র নাগরিকদের ব্যক্তিত্ববিকাশের সহায়ক। এই শাসনব্যবস্থা তাদের চরিত্র গঠনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে, তাদের আত্মনির্ভর, স্বাবলম্বী, পরমতসহিষ্ণু, দেশপ্রেমিক সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলে। অপর পক্ষে একনায়কতন্ত্রী সরকারের প্রতি জনগণের আনুগত্য সাময়িক, অস্বাভাবিক। তাৎক্ষণিক নায়কের পতনের পর তাঁর রচিত রাষ্ট্রযন্ত্রের কাঠামো তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে।

গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র ঃ ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ

ফ্রয়েড্ সমাজের ও রাষ্ট্রের কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিজীবনকে স্বাভাবিক, সহজ ও সরল করে তোলার উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু রাষ্ট্রের ভূমিকা শুধু ব্যক্তি-জীবনকে সহজ ও সরল করে তোলার মধ্যেই শেষ হয় না। সমাজজীবন নানাভাবে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মানুষের দলবদ্ধ জীবন (Group life) আজ ব্যক্তিকে সমাজের কাছে অধিকতর অগ্রগামী করে রাখছে। অতি-আধুনিক মনোজগতের সঙ্গে অতি-আধুনিক সমাজজীবনের এই অপরূপ যোগসূত্রটির পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক অধ্যাপক ম্যাক্‌ডুগাল্ (McDougal)। মানুষ সংঘবদ্ধভাবে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের শরিক হয়ে ওঠে দলনির্ভর হয়ে। বিদ্যালয়, কারখানা, খেতখামার প্রভৃতি আধুনিক জনজীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে যে দলীয় মনস্তত্ত্ব সক্রিয় হয়ে ওঠে, তা অনেক সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার মুখ্য অংশ হয়ে দাঁড়ায়, সন্দেহ নেই।

ম্যাক্‌ডুগালের বক্তব্য

শুধুমাত্র "বিপ্লব" (Revolution) সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীকে মনোবিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে হয়। আরিস্টটল্ বলেছেন যে, বৈষম্যজনিত অতৃপ্তি বিক্ষুব্ধ মানবগোষ্ঠীকে বিপ্লবমুখী করে তোলে। মার্ক্সবাদীগণ মনে করেন যে, শ্রেণীবৈষম্যের ফলে যে শ্রেণীসংগ্রাম (class-struggle) দেখা দেয়, সেই শ্রেণীগত দ্বন্দ্বের ব্যাপক ও সহিংস প্রকাশ হল বিপ্লব। সর্বহারাগণ (Proletariat) বিপ্লবের দ্বারাই শ্রেণীহীন সমাজ (Dictatorship of the Proletariat) কায়েম করে ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং প্রোলেতারীয় বিপ্লব ও বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের অবলুপ্তি জনগণের বিপ্লবচিন্তার পরিণতি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে যদি গণতন্ত্রের আলোচনা বলে মনে করা হয়, তা হলে জনমত সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের পারস্পরিক পরিপূরক সম্বন্ধটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মনোবিজ্ঞানীর চোখে বিপ্লবতত্ত্ব

বিপ্লববাদ ও গণতন্ত্র

ফরাসী মনোবিজ্ঞানী তার্দে (Tarde) এবং লে বঁ (Le Bon) মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের আনুগত্য ও আস্থার প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। জনমত, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি রাষ্ট্রিক বিষয়গুলি প্রধানতঃ মনস্তাত্ত্বিক, সন্দেহ নেই।

তার্দে ও লে বঁ

বার্কার (Barker), গ্রাহাম্ ওয়ালাস (Graham Wallas) এবং ওয়ার্ড্ (Ward) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ওয়ালাস এবং ওয়ার্ড্ মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, বিভিন্ন যুগের মানুষের অচেতন মনের সাধারণ ভাবভাবনা কিভাবে যৌথ অবচেতনারূপে (Collective Unconscious) সমাজে স্থায়িত্বলাভ করে ও সভ্যতার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়, তা বেশ বোঝা যায়।

উপসংহার ঃ অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীদের বক্তব্য

কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য আছে। মনোবিজ্ঞান নৈতিক প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অনেক সময় তা করতে হয়। ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা নিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন যে, রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজের ঘাতপ্রতিঘাতগুলি সব সময় ব্যক্তির আদিম প্রবৃত্তির তাড়না বলে মনে করা ভুল। তা ছাড়া, চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে জড়িত মনোবিদ্যা (Clinical Psychology) রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কাছে সরাসরি প্রয়োজনীয় নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে মিল ও গরমিল

৪. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র

প্রাচীন দার্শনিকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্রের (Ethics) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত বলে মনে করতেন। প্লেটো (Plato), আরিস্টটল্ প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকগণ এই মত পোষণ করতেন। প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকগণও এই মত সমর্থন করতেন।

গ্রীক ও হিন্দুদের মত

বিখ্যাত ইতালীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাকিয়াভেলি (Machiavelli) রেনেসাঁস, (Renaissance) যুগের ঠিক পূর্বে প্রথম ন্যায়-অন্যায় আদর্শের বাইরে সক্রিয় পৃথক্ রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মাকিয়াভেলির মত

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই আবার প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের অনুরূপ মত প্রকাশ করে থাকেন। তাঁদের মতে, উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে বিচার করলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র উভয়ের লক্ষ্য এক। রাষ্ট্রবিজ্ঞান চায় সুনাগরিক গড়ে তুলতে, নীতিশাস্ত্র চায় সুন্দর মননশীল নাগরিক সৃষ্টি করতে।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মত

আইভর ব্রাউন্ (Ivor Brown) বলেন যে, নীতিশাস্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান অসার্থক। কেননা, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে পারে না। আর সমাজবদ্ধরূপে বাস করতে গেলে মানুষকে কিছু নৈতিক আদর্শও মেনে চলতে হবে। বার্কারও তাই বলেছেন যে, ন্যায়বিচার শুধু রাষ্ট্রিক মানদণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা মূল্যবোধের ওপরও প্রতিষ্ঠিত।

আইভর ব্রাউন্ও বার্কারের মত : রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা

গেটেল্ (Gettel) আইন এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে সমানভাবে এগিয়ে চলেছে মানুষের রাষ্ট্রিক ও নৈতিক জীবন। যে ন্যায়-অন্যায় বোধের ওপর সভ্য মানুষের মানসিকতা পরিচ্ছন্ন, সুরুচিসম্পন্ন রূপ লাভ করে, তা একাধারে রাষ্ট্রিক ও নৈতিক শাস্ত্রদ্বয়ের যৌগিক প্রচেষ্টার ফল। আজকের আইন হল গতকালের নৈতিক ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রকাশ।

এর সমর্থনে গেটেলের মত

ভারতের জাতীয় জনক গান্ধীজীর আদর্শ ছিল রাষ্ট্র এবং নৈতিকতার মধ্যে সমন্বয় স্থাপন। **গান্ধীবাদের** একটি প্রধান আদর্শ হল সামাজিক, রাষ্ট্রিক বা অর্থ-নৈতিক লক্ষ্য যেমন পবিত্র থাকা দরকার, সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার মাধ্যমগুলোও সমান ন্যায়সংগত ও পবিত্র হওয়া দরকার। তাই গান্ধীজীর রাষ্ট্রীয় আদর্শের সঙ্গে অহিংসা, সত্যাগ্রহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধর্মীয় উপদেশের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও সুপরিস্ফুট। গান্ধীজী ব্যবহারিক দিক থেকে রাজনীতিকে যেভাবে নীতিশাস্ত্র-নির্ভর করতে চেয়েছিলেন, বিখ্যাত মানবতাবাদী জার্মান দার্শনিক কান্ট্ (Kant) তত্ত্বগতভাবে তাই চেয়েছিলেন। তাঁর মত ছিল এই যে, নীতির কাছে নতি স্বীকার নয়, বিবেকের অনুশাসনে প্রাণিত হওয়াই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কর্তব্য। বর্তমানকালে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে যে বিরোধ, তা শুধু অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রতাত্ত্বিক বিরোধ নয়, তার সংগে আদর্শগত বিরোধও সুস্পষ্ট। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে রাষ্ট্রের চাপে ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা খর্বিত হতে পারে। অপরপক্ষে সমাজতন্ত্রবাদীরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া ব্যক্তিকে অবাধ স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। এই আদর্শগত বিরোধের যে সমাধান প্রস্তাব করা হয়, তাও নৈতিক আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে। অনেক দেশে আজকাল যে **কল্যাণকর রাষ্ট্রের** (Welfare State) পত্তন হয়েছে, তা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের গ্রহণযোগ্য মূল আদর্শগুলির সমন্বয়ে গঠিত। তাই ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি আধুনিক জনকল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এখানে ব্যক্তিকে নানারকম মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়। তার ফলে, ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়। আবার, মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের কুচক্র ও কায়েমী স্বার্থের আঘাতে যাতে জনজীবনের

গান্ধীবাদ ও রাষ্ট্রীয় সমাজদর্শন : কান্টের প্রভাব

স্বচ্ছন্দ গতি বাধা না পায়, তার জন্যেও রাষ্ট্র বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে জনগণের সাধারণ স্বার্থে শিল্প ইত্যাদির রাষ্ট্রীয়করণের কাজে সর্বদা সচেষ্টা থাকে।

অতি-আধুনিক যুগের আচরণবাদী বনাম নব্য-আচরণবাদী

অতি-আধুনিক যুগে আচরণবাদীগণ (Behaviourists) রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে খাঁটি বিজ্ঞান (Pure Science) রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ নীতিনিরপেক্ষ (value-free) করতে চেয়েছেন। আর্থার বেন্টলি (Arthur Bentley), রবার্ট ডাল্ (Robert Dahl) প্রভৃতির নাম এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ডেভিড্ ইস্টন (David Easton) প্রভৃতি নব্য-আচরণবাদীগণ (Neo-Behaviourists) তাঁদের এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করেন না।

কোথায় কোথায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র স্বতন্ত্র

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। নীতিশাস্ত্র প্রধানতঃ মানুষের চিন্তাধারা অর্থাৎ মানুষের অন্তর্জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ উদ্দেশ্য, ভালমন্দ ইচ্ছা প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য। সেজন্য নীতিশাস্ত্রকে আদর্শবাদী শাস্ত্র (Teleological Study) বলা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান আলোচনাক্ষেত্র নাগরিকের বহির্জীবন। কোন ব্যক্তি যদি মনে মনে কাউকে খুন করার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে নীতিশাস্ত্রের চক্ষে সে নিন্দনীয়। কিন্তু যতক্ষণ না সে প্রকৃত খুনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, ততক্ষণ সে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অর্থাৎ আইনের আওতায় পড়ে না।

উভয় শাস্ত্রের পরিধির মধ্যে গুণগত বিভেদ

নীতিশাস্ত্রের আলোচনার পরিসর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক, আপেক্ষিক ও বিচিত্র। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নীতিবোধ একইভাবে সক্রিয় হয়। প্রধানতঃ ধর্মীয় অনুশাসনের ফলে তা ঘটে। কিন্তু সেই দেশগুলিতে একই ধরনের আইনকানুন প্রচলিত নয়। রাষ্ট্র ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর সুবিধা-অসুবিধাকে কেন্দ্র করেই মুখ্যতঃ আইনকানুন রচনা করে, নীতিবোধের প্রভাব সেখানে বহু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ।

সারাংশ

জন্মসূত্রে ভাষার অধিকারী আদিম মানুষ নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সমাজ গঠন করতে প্রেরণা পেল। আরিস্টটলের বিখ্যাত উক্তি স্মরণীয়—মানুষ স্বাভাবিক কারণে সামাজিক জীব। সমাজ-গঠনের তাগিদে জন্ম নিল সন্তানস্নেহ, বন্ধুত্ব প্রভৃতি দলবদ্ধ জীবদের জৈবিক প্রেরণা। এ ধরনের জন্তু-প্রতিম, আদিম জীবনের যান্ত্রিকতা দূরীকরণে প্রাচীনতম সামাজিক সংগঠন হিসাবে পরিবারের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সামাজিক বিবর্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ধর্ম, বাহুবল, পরিবারপ্রসারণ প্রভৃতি

মানুষকে ক্রমশঃ অধিকতর সমাজসচেতন করে তুলল। ধীরে ধীরে এই সমাজসচেতনতার বাস্তব পরিণতি হিসাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হল। মহাভারতের পৃথু ও বেণ-রাজার গল্প থেকে শুরু করে আধুনিক যুগে ওপেনহাইমার, ম্যাকাইভার প্রভৃতি সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের ব্যাখ্যা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রায় একই সামাজিক পটভূমিকার প্রসঙ্গ নির্দেশ করে। মার্ক্‌স্‌, এঙ্গেল্‌স্‌ প্রভৃতি সমাজতন্ত্রবাদীগণও এই কথাগুলিই অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে কৃষিনির্ভর সমাজে ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রভৃতি শ্রেণীবৈষম্যমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল, শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব দেখা দিল। রাষ্ট্রযন্ত্রকে কেন্দ্র করে পূর্বে সামন্তগণ ও বর্তমানে পুঁজিপতিগণ সর্বহারাদের শোষণের চেষ্টা করতে লাগল। সুতরাং মার্ক্‌সবাদীগণ শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রের অবলুপ্তি চান।

কিন্তু সত্যিই কি রাষ্ট্রের অবলুপ্তি সম্ভব? না কাম্য? চীন, সোবিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ত দূরের কথা, সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকতর কেন্দ্রীভবন (Democratic Centralism) হচ্ছে। সুতরাং, রাষ্ট্র ধীরে ধীরে গড়ে উঠলেও রাষ্ট্র থাকছে এটা একটা বাস্তব ঘটনা। বরং সমাজ ও রাষ্ট্র, বা রাষ্ট্র ও সরকার অনেক সময় সমার্থক হয়ে উঠছে।

জনজীবনে রাষ্ট্র যে ব্যাপকতা লাভ করেছে, তা যে শাস্ত্রে আলোচিত হয়, তাকে **রাষ্ট্রবিজ্ঞান** বলে। পোলকের ব্যাখ্যা অনুসারে এর দুটি ভাগ—তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত। রাষ্ট্র ও সরকারের কার্যাবলী, আইনপ্রণয়নের নীতি ইত্যাদি প্রথম ভাগের অন্তর্গত। বিভিন্ন শাসনতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা, গণ-প্রশাসনব্যবস্থা, কূটনৈতিক তৎপরতা ইত্যাদি দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত।

আধুনিক রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব (Political Sociology) অনুসারে বিস্তীর্ণ জনজীবনের নানা দিক নিয়ে যে অসংখ্য সংস্থা রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে সক্রিয়, ব্যবহারিক সামাজিক জীবনে কিভাবে নাগরিক সুনাগরিকে পরিণত হতে পারে—এ সমস্তই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য। ১৯৪৮ সালে ইউনেস্কো সভাতেও এই মত ব্যক্ত হয়েছে এবং একাধিক বিষয়ের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে বলা হয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি ধরনের বিজ্ঞান? পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি গাণিতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল উপাদানগুলি অপরিবর্তনশীল। সুতরাং এই বিজ্ঞানশাখার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ও সূত্রগুলি অভ্রান্ত। ভূগোল, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূত্রগুলির মত চূড়ান্তভাবে অভ্রান্ত না হলেও তারা মোটামুটিভাবে সত্য। **রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত সমাজবিজ্ঞানের সূত্রগুলিও আপেক্ষিকভাবে বা মোটামুটিভাবে প্রযোজ্য।** ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র—এই নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। দেশকালপাত্র ভেদে এই তিনটিই নিয়ত পরিবর্তনশীল। তবুও পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য অন্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেভাবে বিশ্লেষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তা হয়। সুতরাং **রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি বিশিষ্ট সমাজ-বিজ্ঞান।** সেজন্যই গাণিতিক বিজ্ঞানের মত রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সূত্রনির্ণায়ক বিজ্ঞান (Normative Science) বলা চলে না—ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ত এতই প্রগতিশীল।

সমাজবদ্ধ মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক **রাষ্ট্রবিজ্ঞানের** (Political Science) আলোচ্য। রাষ্ট্রনৈতিক ভাবাদর্শ, মতাদর্শ (Ideologies) ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে **রাষ্ট্রদর্শন** (Political Philosophy)। সুতরাং রাষ্ট্রদর্শনের চেয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি অনেক ব্যাপক, রাষ্ট্রদর্শন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশবিশেষ। রাষ্ট্রচিন্তাকে একটা আটপৌরে ব্যবহারিক রূপ দেয় **রাষ্ট্রনীতি** (Politics)।

ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃতীয় পরিভাগ (third dimension)। উপরন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কাছে ইতিহাস একটা বিশাল গবেষণাগার। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণপদ্ধতি (Empirical Methodology) অনুসরণ করে চলে। উভয়েই উদ্দেশ্যমূলক (teleological)। কিন্তু উভয়ের মধ্যে এত মিল ও ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও দুটির মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। হেগেল **ইতিহাসদর্শনের** ওপর জোর দিয়েছেন। মার্ক্‌স **ইতিহাসবিজ্ঞানের** ওপর জোর দিয়েছেন ; কারণ, মার্ক্‌সের কাছে ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক সূত্রানুসারী সমাজতন্ত্রই হল বিজ্ঞানী ভঙিক

সমাজতন্ত্র (Scientific Socialism)। তবে ইতিহাসের সব কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজে লাগে না, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সব কিছু ইতিহাসের কাজে লাগে না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। উভয়েই সমাজবিজ্ঞান। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ অধিকাংশই রাষ্ট্রের উদ্যোগে চলে রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই দুটি মতাদর্শের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক দিক আছে। বর্তমান যুগে ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর বহু ক্ষেত্রে জনকল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রসারিত হতে চলেছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজতত্ত্বের অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং **সমাজতত্ত্ব ব্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংকীর্ণ।** সমাজতত্ত্বের সাহায্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বহু আলোচনা স্বচ্ছতর ও অধিকতর বাস্তববাদী হতে পারে। অতি-আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের (Political Sociology) উদ্ভবের এটাই প্রধান কারণ। কিন্তু সমাজতত্ত্বের তুলনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রে অনেক বেশী বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজন। সমাজতত্ত্বের চেয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা অনেক বেশী বিশিষ্ট।

আধুনিক **ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাছে মনোবিজ্ঞানকে অনেক বেশী অপরিহার্য করে তুলেছে।** আশৈশব অবদমিত আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্তি, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি পরিণত বয়সে নাগরিককে বিকৃতমনা, অসুস্থ (Split personality) করে তোলে। কিভাবে ব্যক্তিমননকে সুস্থ, সহজ ও সমন্বিত ব্যক্তিত্বের (Integrate personality) করে তোলা যায়, মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় ফ্রয়েড্ তার হদিশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও আদর্শ নাগরিক গঠনের জন্য, ব্যক্তিচরিত্রের উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্রকে সুগঠিত ও সুরক্ষিত করতে চান। অ্যারিস্টটল্ থেকে মার্ক্স্ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বলেছেন যে, বৈষম্যজনিত অতৃপ্তি বিক্ষুব্ধ মানবগোষ্ঠীকে বিপ্লবমুখী করে তোলে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে। ফ্রয়েডীয় চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে জড়িত মনোবিদ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাছে সরাসরি প্রয়োজনীয় নয়।

রেনেসাঁস যুগের ঠিক পূর্বে ইতালীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভেলি প্রথম রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতি-নিরপেক্ষ শাস্ত্র বলে প্রচার করেন। অতি-আধুনিক যুগে আচরণবাদীগণও (Behaviourists) রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে খাঁটি বিজ্ঞানরূপে (Pure Science) প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। কিন্তু নব্য-আচরণবাদীগণ তাঁদের এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করেন না। গান্ধীবাদীগণ মনে করেন যে, সামাজিক, রাষ্ট্রিক বা অর্থনৈতিক লক্ষ্য যেমন পবিত্র থাকা দরকার, সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার মাধ্যমগুলিও সমান, ন্যায়সংগত ও পবিত্র হওয়া দরকার। আধুনিককালে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রগুলি জনকল্যাণের মত একটি নৈতিক আদর্শ মেনে চলেন। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পূর্ণ মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ (Value-free) হতে পারে না। অর্থাৎ, **রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।** কিন্তু উভয়ের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে। নীতিশাস্ত্র মানুষের আভ্যন্তরীণ দিকটি নিয়ে জড়িত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যক্তির বহির্জীবন নিয়ে জড়িত। উপরন্তু নীতিশাস্ত্রের আলোচনার পরিসর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক, আপেক্ষিক ও বিচিত্র।

২

রাষ্ট্র : সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

"The State, as a concept of Political Science and Public Law, is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so of external control, and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience."

—Garner

॥ রাষ্ট্রের কয়েকটি ধ্রুপদী সংজ্ঞা ॥

নাগরিক জীবনের কেন্দ্রস্থল দখল করে আছে **রাষ্ট্র**। সমাজবদ্ধ সভ্য মানুষ তার ব্যক্তিত্বের নানা দিকের পূর্ণতম বিকাশের জন্য সমাজে যে অসংখ্য সংস্থা সৃষ্টি করেছে, তাদের মধ্যে রাষ্ট্রই হল সবচেয়ে প্রধান। রাষ্ট্র ছাড়া নাগরিকের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের পূর্ণতালাভ অসম্ভব। তাই আরিস্টটল্ বলেছেন যে, রাষ্ট্রের বাইরে যে বসবাস করে, সে পশু কিংবা অতি-মানব। সুস্থ, স্বাধীন, স্বাভাবিক, সহজ জীবনযাপনের জন্য যে কোনও সভ্য সমাজের অধিবাসীদের একটা রাষ্ট্রের প্রয়োজন। **মানবজীবনের সার্থকতার জন্য চাই রাষ্ট্র।** আবার, রাষ্ট্রের মত কোনও উচ্চতম নিয়ামক শক্তি জটিল, চলমান সমাজজীবনের কর্তৃত্বে না রাখলে **সুন্দর, সার্থক সমাজজীবন** কখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

রাষ্ট্র নাগরিক ও সামাজিক জীবনের কেন্দ্রস্থল : রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তির ও সমাজের জীবন সার্থক, সুন্দর হয়ে ওঠে না

প্রাচীন গ্রীক ও রোমান্ দার্শনিকগণ যথাক্রমে "পোলিস্" (Polis) ও "সিভিটাস্" (Civitas) কথার দ্বারা রাষ্ট্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতেন। এই দুটি কথার দ্বারাই নগরকেন্দ্রিক সমাজজীবনের সঙ্গে তৎকালীন রাষ্ট্রিক জীবনকে অভিন্ন বলে মনে করা হত। উভয়কে নিয়ে মানবজীবন। টিউটন্ যুগ থেকে "স্ট্যাটাস্" (status) কথাটির প্রচলন সুরু হল, সঠিকভাবে রাষ্ট্র (State) কথাটির প্রচলন তখন থেকেই। ইউরোপে মধ্য-যুগের ঠিক পরেই ইতালীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **মাকিয়াভেলিই** প্রথম "রাষ্ট্র" ("State") কথাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন।

গ্রীক "পোলিস্" ও রোমান্ "সিভিটাস্"; মাকিয়াভেলি প্রথম "রাষ্ট্র" কথাটি ব্যবহার করেন

আরিস্টটলের মতে, কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি যখন স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন-

যাপনের জন্য একত্রিত হয়, তখনই **রাষ্ট্রের সূচনা** হয়। কিন্তু তাঁর এই সংজ্ঞা আজকের রাষ্ট্রের ও সমাজের জটিলতা ব্যাখ্যা করার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নয়। আজকাল সমাজে রাষ্ট্র ছাড়াও নানারকম পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক সংগঠন বর্তমান। এদের সকলকেই রাষ্ট্রের পর্যায়ভুক্ত করা অবাস্তব। অবশ্য গ্রীক দার্শনিকদের মতে, নাগরিকদের পূর্ণাঙ্গ, স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে পরিবার, পাড়া, তালুক, ব্লক বা গ্রামের সমবায়কে রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান হিসাবে ধরা ভুল নয়। **রাষ্ট্র মানুষের সুসংগঠিত, সমষ্টিবদ্ধ জীবনের প্রধান পরিচয়, সমাজজীবনের একমাত্র কেন্দ্রীয় ও মৌলিক সংগঠন।**

পরিবার সম্প্রসারণের মধ্যেই রাষ্ট্রের সূচনা : আরিস্টটলের মত

প্রাচীন ভারতে মৌর্য যুগের (চতুর্থ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) প্রখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ্ **কৌটিল্য** তাঁর 'সপ্তাঙ্গতত্ত্বে" রাষ্ট্রের ৭টি "অঙ্গের" উল্লেখ করেছেন ; যথা, স্বামী (সার্বভৌম মহারাজ), অমাত্য (মন্ত্রী), জনপদ (রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড), দুর্গ (সুরক্ষিত নগরী বা রাজধানী), কোষ (রাষ্ট্রীয় ধনাগার), দণ্ড (সেনানী) এবং মিত্র (বন্ধুরাষ্ট্র)। কৌটিল্যের এই সংজ্ঞা ভারতে সে সময়ে প্রচলিত রাজতন্ত্রের কাঠামো অবলম্বন করে রচিত। তবে **রাষ্ট্রের এই অঙ্গভিত্তিক** (structural) **বিশ্লেষণ** আধুনিক যুগেও সমভাবে প্রযোজ্য, কারণ, আধুনিক রাষ্ট্র গণতন্ত্রের বা প্রজাতন্ত্রের ভিত্তিতে স্থাপিত হলেও, বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি ঘটলেও এবং বর্তমান জনজীবনের জটিলতা বহুভাবে বৃদ্ধি পেলেও আজকালকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও **রাষ্ট্রের কর্মভিত্তিক** (functional) **আলোচনার** সঙ্গে রাষ্ট্রের গঠনভিত্তিক আলোচনাকেই উপস্থাপিত করেন। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের (Alexander) গৃহশিক্ষকরূপে আরিস্টটলও কৌটিল্যের প্রায় সমকালীন দার্শনিক বলা চলে এবং এই প্রখ্যাত ধ্রুপদী দার্শনিকদ্বয়ের রাষ্ট্রচিন্তার মূল সূত্রটি এক বলে ধরে নেওয়া যায়।

রাষ্ট্র সম্পর্কে কৌটিল্যের বিখ্যাত সপ্তাঙ্গতত্ত্ব ; তাঁর অঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণ আজও গুরুত্বপূর্ণ ; তবে এখন রাষ্ট্রের কর্মভিত্তিক বিশ্লেষণও সমান গুরুত্বপূর্ণ

বিখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনবিদ্ হল্ (Hall) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য বিশিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত, বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত জনসমাজকে "রাষ্ট্র" বলা হয়। বস্তুতঃ, এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্থায়ী, শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজজীবন স্থাপন ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং হল্ আরিস্টটল্ ও কৌটিল্যের বক্তব্যকেই প্রকারান্তরে সমর্থন করেছেন।

হলের সংজ্ঞা : আরিস্টটল ও কৌটিল্যের বক্তব্যের সমর্থন

॥ রাষ্ট্র সম্পর্কে উড্রো উইল্‌সনের সংজ্ঞা ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক **উড্রো উইল্‌সন** (Woodrow

Wilson) রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেটি মোটামুটিভাবে গ্রাহ্য—রাষ্ট্র এমন একটি জনসমষ্টি যা আইন অনুসারে অর্থাৎ সার্বভৌম সরকার নিয়ে গঠিত এবং নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ("A State is a people organized for law within a definite territory")। রাষ্ট্রের এই সংজ্ঞাটি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের চারটি মৌলিক উপাদান হল—জনসমষ্টি (population), স্থায়ী ভূখণ্ড (territory), সরকার (Government) এবং সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)।

রাষ্ট্র সম্পর্কে প্রচলিত উক্তি
উইলসনের সংজ্ঞা : রাষ্ট্রের ৪টি উপাদান : জনসমষ্টি, ভূখণ্ড, সরকার, সার্বভৌমত্ব

জনসমষ্টি না থাকলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্র হল মানবসমাজের এক বিশিষ্ট সুসংবদ্ধ রূপ। কাজেই অধিবাসী নিয়েই রাষ্ট্র। নির্জন দ্বীপে বা মরুভূমিতে কিংবা দুর্গম অরণ্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিছক কল্পনামাত্র। **আরিস্টটলের** মতে, একটি নগর-রাষ্ট্রে (City-state) যত লোক রাখা সেখানকার আর্থিক ব্যবস্থায় সম্ভব, ততটাই সেই রাষ্ট্রের জনসমষ্টি হওয়া উচিত। কর্সিকার উপযোগী আদর্শ সংবিধান প্রসঙ্গে ফরাসী দার্শনিক **রুশো** (Rousseau) মন্তব্য করেন যে, মোটামুটি দশ হাজার লোক রাষ্ট্রের জনসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বর্তমান কালে রাষ্ট্রের বাঞ্ছনীয় (optimum) জনসংখ্যা সম্বন্ধে এধরনের সীমানির্দেশ সম্ভব নয়। কোন রাষ্ট্রের পক্ষে আদর্শ জনসংখ্যা কী হওয়া উচিত, তা নিয়ে আগে যতই আলোচনা হোক, বর্তমান যুগে তা নিরর্থক। প্রাচীনকালে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ হয়নি আজকের মতো। জীবনযাত্রাও জটিল হয়ে ওঠে নি এখনকার মতো। দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহে শিল্পনির্ভরতাও ছিল নামমাত্র। সেকালে রাষ্ট্রগুলির বেশীর ভাগই ছিল গ্রামীণ, কৃষিভিত্তিক। তাদের জনসমষ্টিও ছিল সামান্য, লোকেদের জীবনযাত্রা ছিল সহজ ও অনাড়ম্বর। চীন, ভারত, জাপান, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো কোটি কোটি জন-অধ্যুষিত রাষ্ট্রের কথা সেদিনকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কল্পনাতেও স্থান পেতো না। অবশ্য আজকালও রাশিয়া, চীন, ভারত প্রভৃতি জনবহুল রাষ্ট্রের পাশাপাশি বেলজিয়াম, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ প্রভৃতি স্বল্প জনসমষ্টি নিয়ে গঠিত ছোট রাষ্ট্রও দেখা যায়। সুতরাং **কার্ল ফ্রিডরিশ** (Karl Friedrisch) প্রভৃতি শাসনবিজ্ঞানী মনে করেন যে, রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কিংবা ভূখণ্ড ততটাই হওয়া উচিত, যতটা সেই সংগঠনকে রাষ্ট্ররূপে চালু (viable) রাখতে পারবে। এই মতকে রাষ্ট্র চালু রাখার তত্ত্ব (Viability Theory) বলে। এই আধুনিক তত্ত্বের সঙ্গেই ধ্রুপদী ইংরেজ দার্শনিক **বেন্থামের** (Bentham) মতটি তুলনীয়। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বা ভূখণ্ড এমন হওয়া চাই যে, সেই সমাজের ওপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বের ধারাবাহিকতা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হল দিল্লীর মত কেন্দ্রীয় রাজধানী থেকে সাম্রাজ্যের বহু-

জনসমষ্টি : তার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই : এ বিষয়ে আরিস্টটল, রুশো, বেন্থাম ও কার্ল ফ্রিডরিশের মত

দূরবর্তী অঞ্চলে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে যানবাহনের অত্যাশ্চর্য অগ্রগতির ফলে এই ধরনের ঘটনা আর সমস্যা বলে মনে হয় না। তাই আধুনিক যুগে ইংরেজদের পক্ষে সমগ্র পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ শাসন করাও অসম্ভব হয় নি।

রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ করা হয়—**নাগরিক** এবং **বিদেশী**। **নাগরিকরা** রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা, রাষ্ট্রের দ্বারা প্রদত্ত সব রকম অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করে। কিন্তু **বিদেশীরা** যে রাষ্ট্রে অস্থায়ীভাবে বসবাস করে, সে রাষ্ট্রের সাধারণ আইনকানুন তাদের মেনে চলতে হলেও সে রাষ্ট্রের প্রতি তারা আনুগত্য (loyalty বা allegiance) প্রদর্শন করে না, তাদের আনুগত্য থাকে স্বীয় রাষ্ট্রের প্রতি। সেজন্য যে রাষ্ট্রে তারা সাময়িকভাবে বাস করে, সে রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রাপ্য রাজনৈতিক অধিকার তারা ভোগ করে না।

রাষ্ট্রের জনসমষ্টির দুটি ভাগ—নাগরিক ও বিদেশী

নির্বাচনব্যবস্থা সুপরিচালনার জন্য আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি দুভাগে জনসমষ্টিকে ভাগ করে—যাঁরা ভোটদাতা এবং যাঁরা ভোটদাতা নন। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণ, বিদেশীগণ এবং অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত কিছু লোক ভোটদাতার সংখ্যার মধ্যে পরিগণিত হন না।

জনসমষ্টিকে অন্য দুভাগেও ভাগ করা যায়—ভোটদাতা ও যাঁরা ভোটদাতা নন

স্থায়ী ভূখণ্ড রাষ্ট্রের আর একটি অপরিহার্য উপাদান। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই কার্যকলাপ এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে কেন্দ্রীভূত। এই ভূখণ্ডের পরিমাণ কতটা হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। এ বিষয়ে বেন্থাম্ ও কার্ল্ ফ্রিড্রিশের বক্তব্য সুবিদিত।

ভূখণ্ড ঃ তার স্থায়িত্ব ঃ বেন্থাম্ ও কার্ল্ ফ্রিড্রিশের মত

আগেকার দিনে মানুষ যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করত। প্রধানতঃ এক একটা অঞ্চলে খাদ্যের সহজলভ্যতা মানুষকে সেই অঞ্চলের বাসিন্দা করে রাখত। শিকারের জন্য পর্যাপ্ত পশুপাখী বা ফলমূল তার খাদ্যরূপে দরকার হত। খাদ্যের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হলেই সে অন্যত্র সদলে প্রস্থান করত। কিন্তু **কৃষিকার্যের আবিষ্কার** আদিম মানুষের এই যাযাবরী মনোবৃত্তি দূর করল, মানুষকে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করতে বাধ্য করল। কৃষিকার্যের জন্য চাই জলের অফুরন্ত সরবরাহ। আর বীজবপনের পর থেকে শস্যসংগ্রহ পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে কৃষকের বসবাস করা অবশ্য কর্তব্য। তাই দেখা গেল প্রাচীন আর্য, মিশরীয়, সুমেরীয় প্রভৃতি নদীমাতৃক সভ্যতার উদ্ভব এবং নদীর আশেপাশে শক্তিশালী, সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের পত্তন। এই রাষ্ট্রগুলি মূলতঃ আঞ্চলিক বাসিন্দাদের জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণের ওপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয়েছিল। **জন্মভূমির প্রতি আনুগত্যই হল দেশপ্রেম**। দেশপ্রেমকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে **জাতীয়তাবোধ**। নদীমাতৃক

রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড কিভাবে স্থায়িত্ব লাভ করল—এ ব্যাপারে কৃষি-ব্যবস্থা, দেশপ্রেম, জাতীয়তা-বোধের ভূমিকা

সভ্যতার ধারে ধারে তাই ক্রমে জাতীয় চরিত্রে, ঐতিহ্যে, ইতিহাসে, সংস্কৃতিতে বিশিষ্ট এক-জাতীয় রাষ্ট্রের (Nation State) সংগঠন ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপায়িত হল।

আধুনিক যুগের **আন্তর্জাতিক আইনের** (International Law) লেখকগণ বলেন যে, রাষ্ট্রের **ভূখণ্ড কথাটি** আজকাল খুব **ব্যাপক** অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রের উপকূল থেকে অন্ততঃ আঠার মাইল পর্যন্ত জলভাগ, সমুদ্রের উপকূলস্থ মহীসোপান (Continental Shelf) প্রভৃতি অঞ্চল ও রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের ওপর অন্ততঃ কিছুদূর পর্যন্ত আকাশপথ সেই রাষ্ট্রের এলাকাভুক্ত বলে ধরা হয়। ১৯৭৬ সালের আইন অনুসারে ভারতের ভৌগোলিক জলসীমা (territorial waters বা maritime belt) সমুদ্রোপকূল থেকে ১২ মাইল পর্যন্ত এবং নিজস্ব অর্থনৈতিক অঞ্চল (exclusive economic zone) উপকূল থেকে ২০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তারিত করা হয়েছে। বর্তমানে বহু রাষ্ট্র সমুদ্র-উপকূল থেকে ৩০০/৩৫০ মাইল পর্যন্ত জলভাগ নিজেদের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অন্তর্গত বলে মনে করে। ১৯৮৪ সালে সদ্যসমাপ্ত আন্তর্জাতিক সমুদ্র-আইন চুক্তি (Law of the Sea Treaty) এই ঝোঁককে মোটামুটি স্বীকার করে নিয়েছে। রাষ্ট্রে যে বৈদেশিক দূতাবাস থাকে এবং মহাসমুদ্রের ওপর কোন দেশের জাহাজ যদি পরিভ্রমণ করে, তাহলে সেই দূতাবাস বা জাহাজকেও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের এলাকাভুক্ত বলে ধরা হয়।

রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড সম্পর্কে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাপক ব্যাখ্যা : মহীসোপান, ভৌগোলিক জলসীমা ও অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিস্তৃতি রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডেরই বিস্তৃতি : ১৯৮৪ সালের আন্তর্জাতিক সমুদ্র-আইন সম্পর্কিত চুক্তির বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন গ্রীকরা একটি নগরকেই রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের পক্ষে পর্যাপ্ত বলে মনে করতেন। অবশ্য রোমক ও ভারতীয় রাজন্যবর্গ সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হতে চাইতেন। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এ ধরনের বক্তব্যকে অবান্তর বলে মনে করেন। কার্ল্ ফ্রিড্রিশ্ তাই ঠিকই বলেছেন যে, সকল রাষ্ট্রেরই ভূখণ্ড ও জনসংখ্যার মধ্যে এমন একটি ভারসাম্য থাকা উচিত যে রাষ্ট্রপরিচালনা সাবলীল, সম্ভাব্য এবং বাস্তবভিত্তিক (viable) হয়ে ওঠে। বর্তমান যুগে সোবিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র— বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিদ্বয়ের মধ্যে ক্ষমতার মেরুকরণের (polarisation of power) ফলে পৃথিবীর ছোটবড় রাষ্ট্রগুলি সকলেই উভয় শক্তির যে-কোনটির সঙ্গে জোটবদ্ধ। এই অতি-আধুনিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রগুলিকে "ছোট না বড়" এই ধ্রুপদী নিরিখে বিচার করা অত্যন্ত অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

মার্কিন ও সোবিয়েত বৃহৎশক্তিদ্বয়ের মধ্যে ক্ষমতার মেরুকরণঃ ফলে জোটবদ্ধ ছোটবড় রাষ্ট্রগুলির আয়তন বিচার্য নয় : কার্ল্ ফিড্রিশের মত

রাষ্ট্রগঠনের জন্য আর একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হল **সরকার** (Government)। রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি সরকারের মারফত বাস্তব রূপ ধারণ করে। সরকার রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার পরিচালক। অর্থাৎ, সমষ্টিগতভাবে বলা যায় যে, **সরকার হল রাষ্ট্রের প্রধান পরিচালকমণ্ডলী**। অন্যান্য সংগঠন যেমন পরিচালকমণ্ডলীর দোষে

ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সরকারবিহীন রাষ্ট্রও তেমনি বিচ্ছিন্ন জনতায় পর্যবসিত হয়। হাল ছাড়া যেমন নৌকা চলে না, তেমনই সরকারকে রাষ্ট্রতরীর হাল বলে মনে করলে ভুল করা হয় না। শাসনক্ষমতা পরিচালনা, আইনপ্রণয়ন, নিয়মশৃংখলা বজায় রাখা, নাগরিকদের জীবন ও ধন-সম্পত্তি তদারক করা, আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি সরকারের প্রধান কাজ। এই কাজগুলি সুষ্ঠু-ভাবে পরিচালনার জন্য সরকারের কাজ তিনটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা হয়—আইনসভা (Legislature), শাসনবিভাগ বা নির্বাহী বিভাগ (Executive) এবং বিচারবিভাগ (Judiciary)।

সরকার ঃ রাষ্ট্রের প্রধান পরিচালকমণ্ডলী ; সরকারের ৩টি বিভাগ—আইনসভা, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ

আগেকার দিনে সরকার বলতে কোন রাজা বা মন্ত্রিমণ্ডলীকে বোঝাত। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিকতার যুগে সরকার গঠিত হয় রাষ্ট্রের বেশীর ভাগ লোকের আনুগত্যের (legitimacy) ওপর ভিত্তি করে। রাজনৈতিক দলব্যবস্থা (Party-system) প্রচলিত থাকায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সংখ্যালঘিষ্ঠ দল দায়িত্বশীল বিরোধী দলের (Opposition Party) ভুমিকা গ্রহণ করে। এইভাবে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসক ও শাসিতদের মধ্যে সুনিবিড় সম্পর্ক রচিত হয়।

গণতান্ত্রিক সরকার ব্যক্তির আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ঃ সরকারে নির্বাচনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দলব্যবস্থার ভূমিকা

আধুনিক যুগে নাগরিকদের জীবনযাত্রা ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে যাচ্ছে বলে সমাজ-জীবনে জটিলতাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই **সরকারের নানারকম রূপ** দেখা যায়। ইংলণ্ডে একই সংগে রাজতন্ত্র ও মন্ত্রিসভা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা কার্যকর। ভারতে প্রজাতন্ত্র ও মন্ত্রিসভা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। সোভিয়েত রাশিয়ায় এবং চীনা প্রজাতন্ত্রে সাম্যবাদী একদলীয় সরকার প্রচলিত।

সরকার নানা প্রকার হতে পারে

সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। এক কথায় বলা যায়, **রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তি তার সার্বভৌমত্ব।** রাষ্ট্রের ক্ষমতা সার্বভৌম ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রের নামে পরিচালনা করেন। সেই অর্থেই অনেকে "সরকার" এবং "রাষ্ট্র"কে একই প্রতিষ্ঠান বলে ভুল করেন, কারণ সরকারই সর্বত্র রাষ্ট্রের পক্ষে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ করে থাকে।

সার্বভৌমত্ব ঃ রাষ্ট্রের জীবনীশক্তি বা প্রাণশক্তি

বিখ্যাত ইংরেজ আইনবিদ্ **অস্টিন** (Austin) সার্বভৌমত্বের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, সার্বভৌম শক্তি হল সেই শক্তি যার প্রভাবে রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ রাষ্ট্রিক কর্তৃত্বকে বাধ্যতামূলকভাবে স্বীকার করে নেন। এই বাধ্যতামূলক আনুগত্যই শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় আইনের অনুশাসন মেনে নিতে প্ররোচিত করে। ফলে, নাগরিকদের বাধ্যতামূলক আনুগত্যই রাষ্ট্রের প্রতি তাদের স্বভাব-সুলভ বা অভ্যাসজনিত আনুগত্য হয়ে দাঁড়ায়।

অস্টিনের সার্বভৌমত্ব ঃ যে স্বাধীন শক্তির প্রভাবে অধিবাসীগণ রাষ্ট্রিক কর্তৃত্বকে বাধ্যতামূলকভাবে স্বীকার করে নেন, তাই সার্বভৌমত্ব

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন সার্বভৌমত্বের বলে রাষ্ট্র নাগরিকদের আনুগত্যলাভের অধিকারী, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি রাষ্ট্র অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মানতে বাধ্য নয়। এমন কি, বর্তমান যুগে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) স্থাপিত হবার পরেও প্রত্যেক রাষ্ট্রকে পরস্পরের সমতুল্য বলে মেনে নিয়ে রাষ্ট্রের বাহ্য সার্বভৌমত্বকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সার্বভৌমত্ব

ল্যাস্কি (Laski), **ম্যাক্আইভার** (MacIver) প্রভৃতি লেখকগণ অবশ্য অদ্বৈতবাদী (Monistic) সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে **বহুত্ববাদী** (Pluralistic) **সার্বভৌমত্ব** সমর্থন করেছেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে সমাজের শেষ ও চরম শক্তি বলে মেনে নেওয়ার অর্থই হল রাষ্ট্রকে মানবজীবনের একমাত্র শুভ প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নেওয়া। তা হলে রাষ্ট্রিক স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, উপরন্তু মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্থাগুলির যে ভূমিকা ব্যক্তিজীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমান, তাকে অস্বীকার করা হয়। বহুত্ববাদীদের মতে, সমাজ রাষ্ট্রের চেয়ে বড় এবং আন্তর্জাতিক সমাজে স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রের ওপর আন্তর্জাতিক আইন কর্তৃত্ব প্রয়োগ করার অধিকারী।

ল্যাস্কি, ম্যাক্আইভার্ প্রভৃতির দ্বারা সমর্থিত বহুত্ববাদী সার্বভৌমত্ব ঃ রাষ্ট্র ছাড়াও সামাজিক সংস্থাগুলিকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম রাখা উচিত

॥ রাষ্ট্র সম্পর্কে আধুনিক সংজ্ঞা ঃ গার্নারের সংজ্ঞা ॥

উড্রো উইল্সনের প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে রাষ্ট্রের প্রধান উপাদানগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায় ঠিকই, কিন্তু এই সংজ্ঞাও আধুনিক রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ও শাসনতাত্ত্বিক জটিলতার সঙ্গে সমানভাবে তাল রেখে চলতে পারে নি। ধরা যাক্, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংলণ্ডের প্রাক্তন উপনিবেশগুলির কথা। এগুলি বর্তমানে **স্বায়ত্তশাসিত ডোমিনিয়ান্** (Dominion) নামে পরিচিত। এগুলি নামেমাত্র ইংলণ্ডের রাজমুকুটের (British Crown) শাসনাধীন। এই দেশগুলির সর্বপ্রধান শাসকনিয়োগের ক্ষেত্রে কিংবা এখানকার আইনসভা কর্তৃক আইনগুলি গৃহীত হবার পরেও ইংলণ্ডের রাজমুকুটের চূড়ান্ত অনুমোদন দরকার হয়। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রেও এই দেশগুলির আইনসভা ও মন্ত্রিসভা যা সিদ্ধান্ত নেয়, ইংরেজ সরকার তাই মেনে নেন। অর্থাৎ, ইংলণ্ডের রাজমুকুট যেমন নিজের দেশে আইনসভা ও মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক শাসকরূপে কাজ করেন, ডোমিনিয়ান্গুলির ক্ষেত্রেও তাই। তা ছাড়া আইনের সূক্ষ্ম বিচারে ডোমিনিয়ান্গুলি ইংলণ্ডের রাজমুকুটের নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার করলেও এবং সেই কারণে এদের সার্বভৌমত্ব না থাকলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে এরা সবরকম পররাষ্ট্রিক ব্যাপারে স্বাধীন রাষ্ট্রের

স্বায়ত্তশাসিত ডোমিনিয়ান্গুলি কি রাষ্ট্র ?—এ বিষয়ে ১৯২৬ সালের সভার ও ১৯৩১ সালের ওয়েস্ট্মিন্স্টার চুক্তির ব্যাখ্যা

মত কাজ করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। এরা যুদ্ধবিগ্রহ, সন্ধি প্রভৃতি বিষয়ে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা চালাতে পারে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে দূতবিনিময় করতে পারে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্য হিসাবে স্বাধীন রাষ্ট্রের মত কাজ করতে পারে। ১৯২৬ সালে ইংলণ্ডে যে সভা হয় (Imperial Conference of 1926) সেখানে, এবং ১৯৩১ সালের ওয়েস্ট্‌মিন্‌স্টার চুক্তি (Statute of Westminster, 1931) অনুসারে এই ডোমিনিয়ান্‌গুলি ইংলণ্ডের অধীন নয়, বরং এরা সবাই সমান। উপরন্তু ডোমিনিয়ান্‌গুলি যে-কোন সময়ে নিজেদের স্বাধীন প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করতে পারে। **ভারত ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৫০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত ডোমিনিয়ান্‌রূপে পরিগণিত হত। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে ভারত সার্বভৌম,** গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা লাভ করেছে। তাই ভারতে ২৬শে জানুয়ারী তারিখটি প্রজাতন্ত্র দিবসরূপে স্মরণীয়।

তা হলে ডোমিনিয়ানের মত কোন প্রায়-স্বাধীন প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণ রাষ্ট্রের মর্যাদা না দেওয়ার অর্থ কঠিন বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। সেজন্য উড্রো উইল্‌সনের রাষ্ট্রসম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার বদলে আজকাল মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **গার্নারের** (Garner) **সংজ্ঞা**-টিকে সকলে গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র এমন একটি শাসনব্যবস্থা যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট জনসমষ্টি নিয়ে স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন সরকারের অধীনে জনগণের স্বাভাবিক আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ("The State, as a concept of Political Science and Public Law, is a community of persons, more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so, of external control and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience")। এখানে এটা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, গার্নারের সংজ্ঞা অনুযায়ী ডোমিনিয়ান্‌গুলির মত প্রায়-স্বাধীন দেশগুলিকেও রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া যায়। **সেজন্য রাষ্ট্র সম্পর্কে উইল্‌সনের সংজ্ঞার চেয়ে গার্নারের সংজ্ঞা অধিকতর বাস্তববাদী।**

গার্নার বলেন—রাষ্ট্র এমন একটা শাসনব্যবস্থা যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট জনসমষ্টি নিয়ে স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন সরকারের অধীনে জনগণের স্বাভাবিক আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত : গার্নারের সংজ্ঞা অত্যন্ত বাস্তবানুগ

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ উইল্‌সনের বা গার্নারের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের চারটি প্রধান উপাদান ছাড়াও অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতিকে (Recognition by other States) রাষ্ট্রস্থাপনার অন্যতম প্রধান মানদণ্ড বলা হয়। স্মরণ করা যায় যে, দীর্ঘ-

গার্নারের সংজ্ঞার বিস্তৃতি : অন্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতিও রাষ্ট্র-গঠনে আবশ্যক

দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি না পেয়ে সাম্যবাদী চীনা প্রজাতন্ত্র পূর্ণরাষ্ট্ররূপে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হতে পারে নি।

আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনবিদ্গণ আরও মনে করেন যে, রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হতে হলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রটির স্থায়িত্বের (Permanence) ওপর বিশেষ জোর দেওয়া দরকার। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, কোন রাষ্ট্রে আকস্মিক বিপ্লব (coup d' etat) বা সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হলে তখনই সেই রাষ্ট্রের সরকার পরিবর্তিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয় না। কারণ, নতুন সরকার যে নতুন শাসনব্যবস্থার পত্তন করল, তা দীর্ঘস্থায়ী না-ও হতে পারে। ১৯৩৩ সালে অনুষ্ঠিত মন্টেভিডিও চুক্তি (Montevideo Convention, 1933) এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

তা ছাড়া চাই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ঃ এ বিষয়ে ১৯৩৩ সালের মন্টে-ভিডিও চুক্তির ব্যাখ্যা

তবে এ কথা মনে করাও ঠিক নয় যে, রাষ্ট্র চিরস্থায়ী বা সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে কত পুরাতন রাষ্ট্র ভেঙে কত নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ইংরেজ-শাসিত অবিভক্ত ভারত বিভক্ত হল ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি পৃথক্ রাষ্ট্রে। ১৯৭১ সালে আবার প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রী পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাকে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত করে বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রে পরিণত হল। সম্প্রতি ইরানে স্বৈরাচারী শাহের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আয়াতুল্লাহ্ খোমেইনির নেতৃত্বে সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শাহ্তন্ত্রের পতন ঘটে ও ইরানে ঐশ্লামিক প্রজাতন্ত্র (Islamic Republic) স্থাপিত হয়। তাই মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, সরকারের পরিবর্তন ঘটে অপেক্ষাকৃত দ্রুত, আর রাষ্ট্রের পরিবর্তন ঘটে দীর্ঘকালের ব্যবধানে, কালক্রমিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

অবশ্য রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব আপেক্ষিক ঃ বিপ্লব বা আন্দোলন সরকার ও রাষ্ট্র—উভয়েরই রূপান্তর ঘটায় ঃ খোমেইনির নেতৃত্বাধীন বর্তমান ইরানের নজির

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও চরিত্রচিত্র সম্পর্কে উড্রো উইলসনের ও গার্নারের বক্তব্যের আধুনিক রূপ পাওয়া যায় প্রখ্যাত ইংরেজ রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ **র‍্যাফায়েলের** (Raphael) সংজ্ঞার মধ্যে। তাঁর মতে, যে সঙ্ঘ তার সার্বভৌম কর্তৃত্বের দ্বারা ও চালু রাখার যোগ্য নিয়মকানুনের দ্বারা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে শৃঙ্খলা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে, তাকেই রাষ্ট্র বলে (The State may be defined "as an association designed, primarily to maintain order and security, exercising universal jurisdicition within territorial boundaries by means of law backed by force and recognised as having sovereign authority")।

রাষ্ট্র সম্পর্কে ৩টি সংজ্ঞার তুলনা ঃ উইল্সন্, গার্নার ও র‍্যাফায়েলের সংজ্ঞা

॥ রাষ্ট্র সম্পর্কে আধুনিক ভাবনাচিন্তা ॥

গড্‌উইন, ক্রোপোট্‌কিন্, তল্‌স্তয় প্রভৃতি দার্শনিকগণ মানবতাবাদী নৈরাজ্যবাদের সমর্থক : তাঁদের মতে ব্যক্তি রাষ্ট্রের ঊর্ধে

উইলিয়াম্ গড্‌উইন্ (William Godwin) **ক্রোপোট্‌কিন্** (Kropotkin), **তল্‌স্তয়** (Tolstoy) প্রভৃতি নৈরাজ্যবাদী মনীষীগণ (Anarchists) মনে করেন যে, রাষ্ট্র সাধারণতঃ ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করে থাকে। তাই তাঁরা ব্যক্তিজীবনকে সম্পূর্ণ অবাধ, উন্মুক্ত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা রাষ্ট্রের অবলুপ্তি কামনা করেন। তাঁদের মানবতাবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে সরকারের চেয়ে ব্যক্তি বড়, রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজ বড়। গান্ধীজীও এই ধরনের মতের সমর্থক ছিলেন। এই ধরনের মানবতাবাদী নৈরাজ্যবাদকে "দার্শনিক নৈরাজ্যবাদ" (Philosophical Anarchism) বা "আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদ" (Intellectual Anarchism) বলা হয়।

এঁদের বক্তব্যের বিপরীত হল হিংসাশ্রয়ী নৈরাজ্যবাদীদের মতবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ইতালী, হাঙ্গেরী, সুইজারল্যান্ড্ প্রভৃতি রাষ্ট্রে এক ধরনের হিংসাশ্রয়ী নৈরাজ্যবাদ (Violent Anarchism) দেখা দিয়েছিল। এই নৈরাজ্যবাদীগণ রাজনৈতিক হত্যা, বোমাবাজী প্রভৃতি গোপন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের অন্তর্গত সার্বিয়া রাষ্ট্রে সেরাজেভো শহরে এক যুবরাজকে হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

প্রকৃত অর্থে মানবতাবাদী আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদীগণ রাষ্ট্রের রূপান্তরই চান, তার অবলুপ্তি চান না

দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদীগণ কিছুটা কল্পনাবিলাসী হলেও তাঁরা হিংসাশ্রয়ী নৈরাজ্যবাদের দ্বারা সমর্থিত বিশৃঙ্খলা কোন-মতেই বরদাস্ত করেন না। তাঁদের বক্তব্য অনেকটা ফরাসী দার্শনিক রুশোর মত। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি চান না, চান রাষ্ট্রের সামাজিক রূপান্তর।

কম্যুনিজ্‌ম্ কি নৈরাজ্যবাদ ?—এর সমর্থনে মার্ক্‌স্ প্রভৃতির বক্তব্য

সাম্যবাদ বা কম্যুনিজ্‌ম্‌কেও (Communism) অনেকে এক ধরনের নৈরাজ্য-বাদ বলে থাকেন। মার্ক্‌স্, এঙ্গেল্‌স্, লেনিন্ প্রভৃতি সাম্যবাদী সমাজবিজ্ঞানীগণ ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বুর্জোয়া (Bourgeois) বা ধনিক শ্রেণীর শোষণযন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতে দেখে রাষ্ট্রের অবলুপ্তির কথা প্রচার করেছেন। তাঁদের মতে, এ ধরনের শ্রেণীশোষণের হাতিয়ারকে সাম্যবাদী বিপ্লবের দ্বারা ধ্বংস করে সর্বহারা প্রোলেতারিয়ত্ শ্রেণী (Proletariat) শ্রেণীবিহীন, রাষ্ট্রবিহীন সাম্যবাদী সমাজ স্থাপন করবে। সোবিয়েত রাশিয়া, চীনা প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি দেশে যে সাম্যবাদী কর্মসূচী রূপায়ণের চেষ্টা চলছে, তার প্রধান লক্ষ্য হল প্রাক্-বিপ্লবী বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা হরণ করে সমবায় (Co-operatives),

"কমিউন্" (Commune) প্রভৃতি জনসেবামূলক ও স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর রাষ্ট্রীয় বা সরকারী কার্যকলাপ পরিচালনার ভার অর্পণ।

কিন্তু লক্ষণীয় যে, সোবিয়েত রাশিয়ায় বা চীনা প্রজাতন্ত্রে এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রের চরম অবলুপ্তি ঘটে নি। বরং দেশের একমাত্র স্বীকৃত রাজনৈতিক দল হিসাবে এই দেশগুলিতে কম্যুনিস্ট্ পার্টির একাধিপত্য ও রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনায় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বা ঘনীভবনের লক্ষণ বিদ্যমান। কম্যুনিস্ট্ রাজনীতিবিদ্গণ অবশ্য মনে করেন যে, মার্ক্সীয়-লেনিনীয় রাষ্ট্রদর্শনের আদর্শ অনুযায়ী ক্ষমতার এই কেন্দ্রীকরণ বা ঘনীভবনের ফলে আধুনিক সাম্যবাদী দেশগুলিতে "গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের" (Democratic Centralism) ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে, কারণ মেহনতী জনতার মুখপাত্ররূপে এই দেশগুলির কম্যুনিস্ট্ পার্টি দেশের একমাত্র স্বীকৃত রাজনৈতিক দল হলেও তার কর্তা বা কর্মীগণ সরকারের সমস্ত কর্মস্তরে পার্টির মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে দায়ী থাকেন। পার্টি সেখানে গণমুখী।

সোবিয়েত রাশিয়া ও চীনের অভিজ্ঞতা : সেখানে কম্যুনিস্ট্ দলের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব থাকলেও কম্যুনিস্ট্রা মনে করেন তার ফলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বদলে আসলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে

সম্প্রতি প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনবিদ্ অধ্যাপক ফিলিপ্ জেসপ্ (Phillip C. Jessup) ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক সমাজ কিভাবে "রাষ্ট্রবিহীন" (Stateless) হয়ে যেতে পারে, তার একটা সুন্দর রূপকল্প উপস্থিত করেছেন। জেসপের মতে, বিশ্বযুক্তরাষ্ট্র গঠন এখনও সুদূর ভবিষ্যতের অভ্যন্তরে থাকলেও ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর বর্তমান রাষ্ট্রগুলির অনেকেই জাতীয় সীমারেখা অতিক্রান্ত হয়ে একটা অভিনব সমাজব্যবস্থায় পেঁছে যাচ্ছে। এই সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আইন (Municipal Law) বা আন্তর্জাতিক আইন (International Law) কার্যকর হতে পারে না, এখানে "রাষ্ট্রাতীত আইন" ("Transnational Law") প্রযোজ্য। ব্যক্তি একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ ধরনের রাষ্ট্রাতীত আইনের আওতায় পড়ে, বহুজাতিভিত্তিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলিও (Multinational Corporations) এই রকম রাষ্ট্রাতীত আইনের কর্তৃত্বে পড়তে পারে। জেসপের সুপরিকল্পিত ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে, বিশ্বযুক্তরাষ্ট্র ভবিষ্যতে গঠিত হলে বর্তমান সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকে তার অঙ্গরাজ্যে পরিণত হবে ও তাদের নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গড়ে উঠবে যা হবে আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের সমতুল্য। এই স্তরে আন্তর্জাতিক সমাজ পেঁছানো পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সময় অবধি (transitional stage) রাষ্ট্রাতীত আইনব্যবস্থা কাজে লাগবে। সুতরাং ভাবীকালের আন্তর্জাতিক সমাজও রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে চলতে পারবে বলে মনে হয় না।

ফিলিপ্ জেসপের ব্যাখ্যা : ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক আইন এক ধরনের "রাষ্ট্রাতীত আইনের" দ্বারা চালিত হলেও বিশ্বযুক্তরাষ্ট্র কখনই রাষ্ট্রবিহীন হতে পারে না

॥ যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি কি রাষ্ট্র ? ॥

বিখ্যাত শাসনতন্ত্রবিদ্ ডাইসির (Dicey) সংজ্ঞা অনুসারে, যে শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য ঐ ক্ষেত্রদুটিকে নিয়ে দু'রকম সরকার রাখা হয়, সেই সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে **যুক্তরাষ্ট্র** (Federation) বলে।

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য—দু'রকম সরকার থাকে

লিখিত সংবিধানে উভয় প্রকার সরকারের ক্ষমতা ও অধিকার নির্দিষ্ট করে দলিলবন্ধ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সোবিয়েত ইউনিয়ন (সোবিয়েত প্রজাতন্ত্র), সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, **ভারত** প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা ভারতে "রাষ্ট্র" ("State") বলা হয়। সুইজারল্যান্ডে এগুলিকে বলে 'ক্যান্টন্' (Canton), কানাডায় বলা হয় 'প্রদেশ' (Province)। সোবিয়েত প্রজাতন্ত্রে এগুলি "ইউনিয়ন রিপাব্লিক" (Union Republic) বলে অভিহিত হয়। সুতরাং **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে** নিউ ইয়র্ক, আলাস্কা, ক্যালিফোর্ণিয়া প্রভৃতি ৫০ টি অঙ্গরাজ্য, **সুইজারল্যান্ডে** জেনিভা, জুরিস্ প্রভৃতি, **কানাডায়** কুইবেক্, ম্যানিটোবা প্রভৃতি, **সোবিয়েত ইউনিয়নে** ইউক্রেন, আজারবাইজান প্রভৃতি, **অস্ট্রেলিয়ায়** ভিক্টোরিয়া, নিউ সাউথ্ ওয়েল্স্ প্রভৃতি এবং **ভারতে** পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মহারাষ্ট্র, গুজরাত প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশ বা অঙ্গরাজ্য, যে নামেই তাদের ডাকা হোক না কেন। সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় এই অঙ্গরাজ্যগুলিকে "স্টেট্" (State) বলা হয় বটে, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এবং সাংবিধানিক আইনকানুনের সূক্ষ্ম বিচারবিশ্লেষণে এগুলিকে "রাষ্ট্র" বা "State" বলা যায় না। এর প্রধান কারণ হল যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সেই সংস্থাকে "রাষ্ট্র" বলা হয়, যা সার্বভৌম সংস্থা। প্রচলিত অর্থে "রাষ্ট্র" বলা হলেও সার্বভৌমত্বহীন যুক্তরাষ্ট্রীয় এই অংশগুলিকে "অঙ্গরাজ্য" বলাই সাংবিধানিক লক্ষণ-বিচারে ও আইনগত কারণে শ্রেয়ঃ, কোন কারণেই এদের "রাষ্ট্র" বলা চলে না।

ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা সুইজারল্যান্ডের নজির

সাংবিধানিক লক্ষণবিচারে ও আইনগত কারণে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলি 'রাষ্ট্র' নয়

॥ পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কি রাষ্ট্র ? ॥

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, সিকিম, অন্ধ্র প্রভৃতি ২২টি অঙ্গরাজ্য (State) এবং ত্রিপুরা, আন্দামান, ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দিল্লী প্রভৃতি ৯ টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (Union Territory) নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। যে অর্থে মার্কিন বা অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মত রাষ্ট্রগুলির অঙ্গরাজ্যগুলিকে খাঁটি রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে "রাষ্ট্র" (State) বলা যায় না, সেই অর্থে পশ্চিমবঙ্গ বা অন্যান্য ভারতীয় অঞ্চলকেও "রাষ্ট্র" বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে জনসমষ্টি, স্থায়ী

পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য, ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

ভূখণ্ড ও সরকার বর্তমান থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সার্বভৌমত্ব নেই। এরা সকলেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক একক ("territorial units")। এদের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের "অঙ্গরাজ্য" বলাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবধর্মী। পশ্চিমবঙ্গ বা সিকিম অঙ্গরাজ্যরূপে এবং ত্রিপুরা, দিল্লী, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলরূপে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে সকলেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধীন। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এরা কেন্দ্রের নিয়মকানুন মানতে বাধ্য। বৈদেশিক ক্ষেত্রে এরা কেউই অন্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন বা দূত আদানপ্রদান করতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গ বা ত্রিপুরা—কেউই "রাষ্ট্র" নয়

॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কি রাষ্ট্র? ॥

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত রাশিয়া, চীনা প্রজাতন্ত্র এবং ফরাসী প্রজাতন্ত্র—এই পাঁচটি বিজয়ী রাষ্ট্রের যৌথ উদ্যোগের ফলে পৃথিবীতে শান্তিস্থাপন, ভবিষ্যতে যুদ্ধের সম্ভাবনা দূরীকরণ এবং বিশ্বের সর্বত্র শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, বিজ্ঞান, সম্পদ ও স্বাস্থ্যের সুসম বিস্তারের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বৈষম্য নিবারণের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক (New York) শহরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপিত হয়। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের "স্থায়ী ভূখণ্ড" আছে। এর বিভিন্ন শাখাপ্রতিষ্ঠানের দপ্তরগুলি অন্য রাষ্ট্রে অবস্থিত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে (U. N. Charter) বর্ণিত এর বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং এর কার্যক্রম সম্পাদনার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের "সরকার"ও আছে। তার নমুনা পাওয়া যায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ বা স্বস্তি পরিষদ (Security Council), সাধারণ পরিষদ (General Assembly), মহাসচিব (Secretary-General), বিশ্ববিচারালয় (World Court বা International Court of Justice) প্রভৃতি প্রশাসনিক সংগঠনের মধ্যে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের প্রস্তাবনায় "WE, THE PEOPLE OF THE UNITED NATIONS" বাক্যাংশের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে যে, এই আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যরাষ্ট্রের (Member-States) জনগণের মিলিত ইচ্ছাশক্তি এর সনদের মধ্যে প্রকাশিত। সেই দিক দিয়ে দেখলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের "জনসমষ্টি" রয়েছে বলে ধরা যায়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান যতই মহান্ উদ্দেশ্যপালনের জন্য গঠিত হোক না কেন, এর সার্বভৌমত্ব নেই বলে সমস্ত লক্ষণ বিচারে একে রাষ্ট্ররূপে অভিহিত করতে অনেকে অনিচ্ছুক। তাঁদের মতে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কেবল কতকগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মিলিত সংস্থা ("an association of sovereign states")।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্ভব ও তার অঙ্গাভিত্তিক বিশ্লেষণ

তাছাড়া এর অ-রাষ্ট্রত্ব প্রমাণ করার জন্য অনেকে বলেন—(১) এর দপ্তরগুলিকে

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রচলিত অর্থে "সরকার" বলা যায় না ; (২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রের ব্যক্তিবর্গকে সে "নাগরিকত্ব" দিতে পারে না, যেমন রাষ্ট্র তার জনগণকে দিতে পারে ; (৩) রাষ্ট্র ছাড়া বিশ্ব রেড্ ক্রশের (International Red Cross) মত সংস্থা বা ইউক্রেন্ বা বাইলোরাশিয়ার মত সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি এর "সদস্য" হতে পারলেও তারা কেউই এর অন্য সদস্য-রাষ্ট্রের মত এর নির্দেশ বা সুপারিশ মানতে বাধ্য নয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সার্বভৌমত্ব নেই : তাই একে "রাষ্ট্র" বলা যায় না

প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনবিদ্ হান্স্ কেল্সেন্ (Hans Kelsen), কুইন্সি রাইট্ (Quincy Wright) প্রভৃতি প্রখ্যাত প্রবীণ বিশেষজ্ঞগণ কিন্তু এই যুক্তিগুলির সবগুলি স্বীকার করেন না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি প্রয়োগ করে এই প্রতিষ্ঠান আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিজস্ব ফৌজ পাঠিয়ে কাশ্মীর, কঙ্গো প্রভৃতি বহুক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার চেষ্টা করেছে ও যুদ্ধের সম্ভাবনা নানাভাবে দূর করার চেষ্টা করেছে। কেল্সেন্ তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, অন্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের মত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তার সদস্য-রাষ্ট্রগুলির ওপর সার্বভৌম ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে প্রয়োগ করার অধিকার ("force monopoly of Nations") লাভ করেছে ও তার সনদে স্বাক্ষরকারী সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্রই এই ঘটনা স্বীকার করে তার সদস্য হয়েছে।

কিন্তু কেল্সেন্, কুইন্সি রাইট্ প্রমুখ আন্তর্জাতিক আইনের বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে যে বিপুল ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে সে সার্বভৌম

॥ রাষ্ট্র ও সমাজ ॥

সভ্যতার আলো মানুষের জীবনকে ক্রমশঃ অধিকতরভাবে সংঘবদ্ধ করে তুলল। তার আগে পর্যন্ত মানুষের জীবন ছিল স্বার্থপর, ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আরিস্টটল্ (Aristotle), এঙ্গেল্স্ (Engels) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর এবং মর্গান্ (Morgan), ম্যালিনাওস্কি (Malinowski), মার্গারেট্ মিড্ (Margaret Mead) প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিদ্দের মতে, পরিবারের (Family) সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে আদিম মানুষ ক্রমশঃ নিজের স্বার্থের ক্ষুদ্র এলাকার বাইরে বৃহত্তর সমাজজীবনের আস্বাদ লাভ করতে পারল। পরিবার, গোষ্ঠী (clan), উপজাতি (tribe), জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র (Nation-State)—এই স্তরপরম্পরার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ (Socialisation of the individual) সম্ভব হয়েছে।

আরিস্টটল্ এঙ্গেল্স্ প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও মর্গান্, ম্যালিনাওস্কি, মার্গারেট্ মীড্ প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদগণের ধারণা—সমাজের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র গঠিত

রাষ্ট্র (State) ও সমাজ (Society) উভয়েই পরস্পরের পরিপূরক এবং তাদের

এই সম্পর্ককে "একটি অবিচ্ছিন্ন, ঐতিহাসিক ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক" ("a unique intimacy") বলে বর্তমান যুগের মানবতাবাদী সভ্যতার ইতিহাসরচয়িতা উইল্ ডুরাণ্ট্ (Will Durant) সপ্রশংসভাবে অভিহিত করেছেন। প্রাচীন ভারতের জনপদ, গ্রীক যুগের নগর-রাষ্ট্র ইত্যাদি স্তর অতিক্রম করে সংঘবদ্ধ জনজীবন আধুনিক বৃহত্তর জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের স্তরে এবং অতি-আধুনিক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে পরিকল্পিত বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রের স্তরে পেঁছেছে—ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে মানব-সমাজের এই ক্রমিক অতি-রাষ্ট্রীয় (Super-State) মার্গে উত্তরণের সব ইতিহাসই রাষ্ট্র ও সমাজের যৌথ উদ্যোগে সম্ভব হয়েছে।

উইল্ ডুরাণ্টের মতে রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক "একটি অবিচ্ছিন্ন, ঐতিহাসিক ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক"

রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে এই নিবিড় সম্পর্কের কতকগুলি বিশেষ কারণ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা গড়ে উঠেছে। উভয়েই ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে পরিপুষ্ট। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও সম্প্রসারণ সমাজেরই উৎপত্তি ও সম্প্রসারণের ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায়।

রাষ্ট্র ও সমাজের ঘনিষ্ঠতার কারণ: (১) ঐতিহাসিক বিবর্তনজনিত ঘটনাপ্রবাহ

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র ও সমাজ দুটি প্রতিষ্ঠানই পরস্পরের নিয়ন্ত্রক। সমাজের অসংখ্য সংস্থার মধ্যে কেবল রাষ্ট্রেরই সার্বভৌমত্ব আছে। সেই শক্তিই রাষ্ট্রকে প্রচণ্ড শক্তিশালী করে তুলেছে। কারণ, রাষ্ট্রের নির্দেশই আইন, তা না মানলে অবাধ্যতার শাস্তি হয়। প্রাণদণ্ড পর্যন্ত রাষ্ট্রের দণ্ডাদেশ বিস্তৃত। আবার, সমাজও কম শক্তিশালী নয়। সুদীর্ঘকাল ধরে নানা প্রকার প্রথা, রীতিনীতি নিয়ে সমাজ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে দেশাচার, লোকাচার ইত্যাদি সামাজিক পরিকল্প বা মীথ্ (Folk Myth বা Totem) এবং বিধিনিষেধ (Taboo বা Folk More) গড়ে ওঠে। প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড্ গোষ্ঠী বা প্রজাতির আদিম যুগের কৌলিক স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে এগুলির ভূমিকা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কোথাও কোথাও লোকাচার বিশুদ্ধ লোকসংস্কৃতির অমূল্য উপাদান। আবার, ডিকেন্স্ (Dickens), দস্তয়ভ্স্কি (Dostoevsky), শরৎচন্দ্র, মুন্সী প্রেমচাঁদ প্রভৃতি যুগন্ধর ঔপন্যাসিকগণ লোকাচার কুসংস্কারে পরিণত হলে কিভাবে সমাজের ক্ষতিসাধন করে, তার বহু নজির দিয়েছেন তাঁদের সাহিত্যে।

(২) একে অপরের পরিপূরক ও নিয়ন্ত্রক: পরিকল্প (টোটেম্ বা মীথ্) ও বিধিনিষেধের (ট্যাবু) ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা: রাষ্ট্রিক সার্বভৌমত্ব ও সামাজিক লোকাচার সমান শক্তিশালী: ডিকেন্স্, দস্তয়ভ্স্কি, শরৎচন্দ্র, মুন্সী প্রেমচাঁদ প্রভৃতির উপন্যাসে লোকাচারের প্রভাব নির্দেশ

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে উদ্দেশ্যগত মিলও যথেষ্ট দেখা যায়। ব্যক্তি-জীবনকে ও গোষ্ঠীজীবনকে সুন্দরতর, সমৃদ্ধতর করে তোলা উভয়েরই মূল উদ্দেশ্য।

আদর্শগতভাবে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়েই রাষ্ট্রের সামাজিক পটভূমিকা, উদ্দেশ্য ও বিধেয় রচনা করে, যদিও তাদের পদ্ধতি বিপরীত। কিন্তু সাধারণভাবে মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রাষ্ট্র তার সার্বভৌম শক্তির আশ্রয় নেয়। ফলে, গড়ে ওঠে আইন-কানুনের বেড়াজাল, দণ্ডবিধির বৈচিত্র্য। সেইভাবে সমাজও তার জনকল্যাণকর উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য তার লৌকিক শক্তির আশ্রয় নেয়। রাষ্ট্রকে না চিনলেও গ্রামবাসীরা সরকারের প্রতিনিধি 'দারোগাবাবু'র মত গ্রামের মোড়ল বা মাতব্বরকে খুবই মান্য করে চলে। প্রাচীন সমাজের ও বর্তমান উপজাতি সমাজের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রভাব স্মরণীয়।

(৩) রাষ্ট্র ও সমাজের উদ্দেশ্য এক—ব্যক্তিজীবনের উৎকর্ষসাধন

চতুর্থতঃ, আইনব্যবস্থার মধ্যেই রাষ্ট্র-সমাজ সম্পর্ক (State-Society interaction) বেশ বোঝা যায়। মেন্ (Maine) প্রভৃতি আইনবিদ্ ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলেছেন যে, রাষ্ট্রীয় আইনের প্রাচীনতম ও প্রধানতম উৎস হল সমাজের প্রচলিত প্রথাগত রীতিনীতি। রাষ্ট্রীয় আইন এগুলিকেই সরকারী ও সার্বিক বৈধতার রূপ দেয়। সুতরাং সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় বিধি সমাজে প্রচলিত ন্যায়-নীতিবোধের বিপরীত হয় না, হলে সমাজ রাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করে সেই আইন রদ করার বা বদলের ব্যবস্থা করে। তেমনি, রাষ্ট্রীয় আইনকানুন সামাজিক প্রথাগত বিধানের দ্বারা সৃষ্ট কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করে। আধুনিক ভারতে সতীদাহ প্রথা নিবারণে রামমোহনের ও বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ব্রিটিশ্ সরকার এইভাবে আইন প্রণয়ন করে। এই রাষ্ট্রীয় কানুন আপাতদৃষ্টিতে সমাজবিরোধী মনে হলেও প্রকৃত অর্থে সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক বলেই বিবেচিত।

(৪) মেন্ প্রভৃতি আইনবিদ্ বলেন—রাষ্ট্রীয় আইনে যেমন সমাজের প্রভাব থাকে, সামাজিক লোকাচারের ওপরও রাষ্ট্রীয় আইনকানুনের প্রভাব থাকে

রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও উভয়ের মধ্যে বহু পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, রাষ্ট্র সমগ্র সমাজের একটি অংশ, বলা যেতে পারে প্রধান অংশ। তাই সমাজের কর্মক্ষেত্রের তুলনায় রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র অনেক নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তিজীবনের ওপর সমাজের প্রভাব বেশী, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ এতটা সর্বাত্মক নয়।

রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে বৈসাদৃশ্যই বেশী ; কারণ (১) সমাজ রাষ্ট্রের তুলনায় বেশী বিস্তৃত

দ্বিতীয়তঃ, সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে সমাজ রাষ্ট্রপূর্ব প্রতিষ্ঠান। মানুষের রাজনৈতিক চেতনার পূর্বে সঞ্চারিত হয়েছিল তার সমাজবোধ, সামাজিক চেতনা। সর্বাত্মক, সামাজিক বিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব, কিন্তু সমাজের উদ্ভব আদিম মানুষের মনে স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ংসঞ্চারিত। কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ্ সেই অর্থে সমাজকে স্বাভাবিক (Natural) ও রাষ্ট্রকে কৃত্রিম (Artificial) বলে থাকেন।

(২) সমাজ রাষ্ট্রপূর্ব প্রতিষ্ঠান ; রাষ্ট্রের উদ্ভব ধীরে ধীরে ঘটেছে, কিন্তু তার তুলনায় সমাজের উদ্ভব স্বতঃস্ফূর্ত

তৃতীয়তঃ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ। এই ভূখণ্ড জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলির অধীন। কোন বিশেষ রাষ্ট্রের কথা ভাবলেই সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত এই ভৌগোলিক সীমারেখা কল্পিত হয়। কিন্তু সমাজের কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ভূখণ্ড নেই। তা সত্ত্বেও সমাজ গঠিত হতে পারে। ভারতের তামিলসমাজ সাম্প্রদায়িক স্বার্থে শ্রীলংকার তামিলসমাজের সঙ্গে সামাজিক কারণে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে।

(৩) রাষ্ট্রের পরিধি তার ভূখণ্ডের দ্বারা সীমিত, সমাজের পরিধি পরিব্যাপ্ত

চতুর্থতঃ, সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, তার উদ্দেশ্য কার্যকর হয়। সেরকমভাবে বলতে গেলে সমাজের এধরনের কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নেই। দক্ষিণ কলকাতার কেরলীয় সমাজম্ স্থানীয় জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি উপ-সমাজ, তার কার্যনির্বাহক পরিষদকে "সরকার" মনে করা ভুল। কারণ, সরকারী নির্দেশ যে অর্থে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতীক, কেরলীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান সেই অর্থে কোন সার্বভৌম শক্তিকে চিহ্নিত করে না।

(৪) রাষ্ট্রের সরকার সার্বভৌমত্বের প্রতীক, সমাজের যে কোন কার্যনির্বাহী পরিষদ অ-সার্বভৌম

পঞ্চমতঃ, সমাজ সমাজবদ্ধ জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠনগুলির যোগফল। কিন্তু রাষ্ট্র একটি বাধ্যতামূলক সংগঠন। তার কারণ—রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আছে, সমাজের নেই। সুতরাং যে অর্থে রাষ্ট্রীয় আইনকানুন বাধ্যতামূলক, সেই অর্থে, অর্থাৎ আইনের চোখে, সামাজিক রীতিনীতি, লোকাচার ইত্যাদি বাধ্যতামূলক নয়। রাষ্ট্র আইন-অমান্যকারীদের প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারে, সমাজ তা পারে না।

(৫) সমাজ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংস্থা, রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক সংগঠন

ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্র ও সমাজের উদ্দেশ্য এক—জনগণের মঙ্গলসাধন। কিন্তু নিজেদের এই জনহিতকর উদ্দেশ্য পালন করার ক্ষেত্রে উভয়ের পদ্ধতি বিভিন্ন। রাষ্ট্র মানুষের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জীবনপ্রবাহের একটি স্রোতকেই নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু ব্যক্তিজীবনের নানা দিক নিয়ে জড়িত থাকার ফলে সমাজ ব্যক্তিজীবনের বহু স্রোতকে প্রভাবিত করে।

(৬) ব্যক্তির কল্যাণসাধন রাষ্ট্র ও সমাজের উভয়ের সাধারণ উদ্দেশ্য হলেও উভয়ের প্রচেষ্টা বিভিন্ন

সপ্তমতঃ, ম্যাক্আইভারের (MacIver) মত বহুত্ববাদী সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ (Pluralists) রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য সামাজিক সংগঠনকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সার্বভৌম সংস্থা করে তোলার পক্ষপাতী। তাঁরা বলেন যে, রাষ্ট্রের এলাকায় অবস্থিত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির মূল প্রেরণা ও প্রচেষ্টা বৃহত্তর সমাজের কাছ থেকে উৎসারিত। এগুলির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোন ভূমিকা নেই, কোন ভূমিকা থাকা উচিতও নয়। সেজন্য ম্যাক্আইভার বলেছেন যে, "সামাজিক" এবং "রাষ্ট্রীয়" এই দুটি ক্ষেত্রকে অভিন্ন কল্পনা করা ("to identify the social with the political") রীতিমত অন্যায়।

(৭) ম্যাক্আইভারের মত বহুত্ববাদীরা বলেন—"সামাজিক" ও "রাষ্ট্রীয়" ক্ষেত্রগুলি বিভিন্ন

অষ্টমতঃ, মার্ক্সবাদী ও গান্ধীবাদীগণ উভয়েই বিশেষ কারণে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি কামনা করেন ও তার পরিবর্তে সমাজের অভিভাবকত্ব সমর্থন করেন। মার্ক্সবাদীরা বলেন যে, ধনিক বুর্জোয়া শ্রেণীর শোষণের হাতিয়ার হল রাষ্ট্র। তাই মেহনতী মানুষ সর্বহারার দলে মিলিত হয়ে সাম্যবাদী বিপ্লবের সাহায্যে ধনতান্ত্রিক সমাজে সবচেয়ে সংগঠিত বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে অবলুপ্ত করে। তার পরিবর্তে বিপ্লবোত্তর যুগে "সর্বহারার একনায়কতন্ত্র" (Dictatorship of the Proletariat) নামক শ্রেণীবিহীন সমাজ গঠিত হয়। অপরপক্ষে, গান্ধীবাদীগণ মনে করেন যে, রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ সরকারী প্রলোভনের জন্য দুর্নীতিপরায়ণ প্রতারকের ভূমিকা গ্রহণ করে। ফলে, লোভ, অসংযম ইত্যাদি অমানবিক প্রবৃত্তিগুলি রাষ্ট্রের দ্বারা দমিত হবার সম্ভাবনা থাকে না। সেই চরম অবস্থায় "দলবিহীন সমাজ" (Partyless Society) স্থাপন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজ সকলের পক্ষেই একমাত্র ভরসা।

৮) মার্ক্সবাদ ও গান্ধীবাদ—উভয়েই রাষ্ট্রের পরিবর্তে সমাজের অভিভাবকত্বের সমর্থক

॥ রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক সংস্থা ॥

বিখ্যাত ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ স্যার আর্নেস্ট্ বার্কার (Sir Ernest Barker) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি সর্বাধুনিক দিকের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। তা হল এই যে, বর্তমানে সমাজকে পরস্পরবিচ্ছিন্ন জনসমষ্টি রূপে দেখা হয় না, বরং ধরে নেওয়া হয় যে, সমাজ অজস্র সংস্থার মাধ্যমে সম্মিলিত একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান। বার্কার এইভাবে বহুত্ববাদ সমর্থন করেছেন। ল্যাস্কিও (Laski) এই ধরনের যুক্তির দ্বারা বহুত্ববাদের প্রতি তাঁর সমর্থন জানিয়েছেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, আধুনিক বহুত্ববাদ (Pluralism) রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জনমানসে ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং এইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বাস্তবধর্মী আলোচনার ক্ষেত্রে উপলক্ষ সৃষ্টি করেছে।

বহুত্ববাদী ল্যাস্কি ও স্যার আর্নেস্ট্ বার্কারের বাস্তবধর্মী মত : সমাজ অজস্র সংগঠনের সমবায়

বহুত্ববাদীগণেরও মতে, রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজ অধিকতর ব্যাপক ও বৃহৎ। ব্যক্তিজীবনের অসংখ্য চাহিদা পূরণ করে থাকে অজস্র সামাজিক সংস্থা। ফুটবল ক্লাব, কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের "ইউনিয়ান," শ্রমিক সংঘ ইত্যাদি এর ফলে গড়ে ওঠে।

বহুত্ববাদীদের চোখেও রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজ অধিকতর ব্যাপক ও বৃহৎ

রাষ্ট্র ও সামাজিক সংঘগুলির মধ্যে যে সাদৃশ্যগুলি দেখা যায়, সেগুলি হল—প্রথমতঃ, উভয়ের সাংগঠনিক সাদৃশ্য। রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থা উভয়েরই তার নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর্মক্ষেত্র, জনসমষ্টি ও সরকারের প্রয়োজন। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের দ্বারা সীমিত, সামাজিক সংস্থার ক্ষেত্রেও তার কার্যক্ষেত্রকে এক রকমের "ভূখণ্ড" বলা চলে। রাষ্ট্রের যেমন জনসমষ্টি আছে, সামাজিক সংস্থারও তেমনি সভ্য রয়েছেন।

রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থার মধ্যে সাদৃশ্যঃ (১) সাংগঠনিক সাদৃশ্য উভয়েরই জনসমষ্টি ও সরকারের প্রয়োজন

রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্য চাই সরকার। সামাজিক সংস্থার পরিচালনার ভারও একটি কার্যনির্বাহক সমিতির ওপর ন্যস্ত থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থা উভয়েই নিজের কর্তৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ওপর নিজের সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের ওপর শৃঙ্খলা ও বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকে। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতার নাম সার্বভৌমত্ব। সামাজিক সংস্থাও তার সদস্যদের ওপর তার গঠনতান্ত্রিক নিয়মাবলীর দ্বারা এক ধরনের চরম প্রভাব খাটাতে পারে। মোহনবাগান ক্লাব তার নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন বা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অপরাধে কোন খেলোয়াড়কে ক্লাব থেকে বহিষ্কৃত করে শাস্তি দিতে পারে।

(২) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আছে, সামাজিক সংস্থার আছে গঠনতান্ত্রিক নিয়মাবলী

কিন্তু রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থাগুলির মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে পার্থক্যই বেশী। পার্থক্যগুলি হল—প্রথমতঃ, মানবসমাজের ব্যাপক সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। আদিম যুগ থেকে সমাজবদ্ধ মানুষ তাদের সকলের ওপর সাধারণভাবে চরম কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য রাষ্ট্রকে একটি বাধ্যতামূলক প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তুলল। ফলে, সমাজবদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্রের সভ্যপদ লাভ তার ইচ্ছাধীন নয়, সেটা সম্পূর্ণভাবে আবশ্যিক। কিন্তু সামাজিক সংস্থা ব্যক্তির কাছে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান (Voluntary association)।

কিন্তু রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থাগুলির মধ্যে বৈসাদৃশ্যই বেশী, বৈসাদৃশ্য—(১) উভয়েই বিবর্তনপ্রসূত, কিন্তু রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংস্থা সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান

দ্বিতীয়তঃ, বাধ্যতামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জনসমক্ষে রাষ্ট্রের পরিচিতি ঘটে তার সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রের এই বাধ্যতামূলক রূপটি সরকারী আইন-কানুন, হুকুমনামার মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়। সরকার রাষ্ট্রের চরম দণ্ডের, এমন কি মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিয়ে খুনী অপরাধীর শাস্তি দিতে পারে। এটা রাষ্ট্রেরই একচেটিয়া অধিকার। সমস্ত সামাজিক সংস্থাই এই রাষ্ট্রীয় ও সরকারী কর্তৃত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সংস্থাগুলির শাস্তি দেবার চরম ক্ষমতা বড় জোর অশিষ্ট সভ্যকে সংস্থার সভ্য-পদ থেকে বিচ্যুত করা, এর বেশী কিছু নয়। কোন দৈহিক দণ্ড কোন সংস্থা কাউকে দিতে পারে না।

(২) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এত চরম যে, সে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারে ; সামাজিক সংস্থা বড় জোর অশিষ্ট সদস্যকে সংস্থা থেকে বিতাড়িত করতে পারে

তৃতীয়তঃ, সামাজিক সংস্থাগুলির তুলনায় রাষ্ট্র বেশী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। সংস্থাগুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। ফলে, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজন হলে কোন সন্ত্রাসবাদী বা জনস্বার্থবিরোধী সংস্থাকে ভেঙে দিতে পারে। সমাজে নিত্য অসংখ্য সংস্থার জন্ম ও অপমৃত্যু ঘটে থাকে। তার কারণ, এই সংস্থাগুলির উদ্দেশ্য সীমিত, আর্থিক কারণেও তারা স্বল্পায়ু। কিন্তু রাষ্ট্র নিজেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রভৃতির মারফত নিজেকে একটি স্বনির্ভর, স্বশাসিত,

(৩) সামাজিক সংস্থাগুলির তুলনায় রাষ্ট্র বেশী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান

স্থায়ী সার্বভৌম সংগঠনরূপে গড়ে তুলতে সমর্থ। সাংবিধানিক ব্যাখ্যাকারগণ মনে করেন যে, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সরকারের পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু সাংবিধানিক আইনের চোখে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটে না। অবশ্য মার্কস্-বাদীগণ এই যুক্তি মানেন না। তাঁদের বক্তব্য হল এই যে, ধনতন্ত্রী সমাজে ধনিকগণের কর্তৃত্বে শোষণের যন্ত্ররূপে রাষ্ট্র ব্যবহৃত হয়। ফলে, সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে সাম্যবাদী বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ("withering away of the State") ঘটে। তার বিকল্পরূপে "সর্বহারার একনায়কতন্ত্র" নামক রাষ্ট্রবিহীন সমাজের জন্ম হয়।

অবশ্য মার্কস্‌বাদীগণ রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান—তাঁরা এর অবলুপ্তি চান

চতুর্থতঃ, সামাজিক সংস্থাগুলির তুলনায় রাষ্ট্রের অধিকতর স্থায়িত্বের কারণ হিসাবে বলা যায় যে, রাষ্ট্র বহু-উদ্দেশ্যমুখী সামাজিক প্রতিষ্ঠান ("the State is a multi-purpose social institution")। কিন্তু সামাজিক সংস্থাগুলি তাদের সীমিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী নিয়ে সীমাবদ্ধ কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় থাকে। শ্রমিকসংঘের উদ্দেশ্য শ্রমিকদের কল্যাণসাধন, কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থরক্ষা।

(৪) রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের মূল কারণ—রাষ্ট্র বহুউদ্দেশ্যমুখী প্রতিষ্ঠান ; কিন্তু সামাজিক সংস্থা বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত

পঞ্চমতঃ, নাগরিকের পক্ষে রাষ্ট্রের সভ্যপদ শুধু আবশ্যিক নয়, এক ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক রাষ্ট্রের সভ্য হতে পারেন না। অপরপক্ষে, কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হতে পারেন, ক্রীড়ামোদীরূপে তিনি মোহনবাগান ক্লাবের সভ্য হতে পারেন, আবার বুদ্ধিজীবীরূপে তিনি গণনাট্য সংস্থার মত কোন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংস্থারও সভ্য হতে পারেন। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে নাগরিকত্বলাভের আইনগুলির নানা বৈষম্য থাকার ফলে অবশ্য একই ব্যক্তি একই সঙ্গে জন্মস্থানগত নাগরিকত্ব ও জন্মগত নাগরিকত্ব—দুপ্রকার নিয়মের ভিত্তিতে আগে দুটি রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারতেন। কিন্তু সম্প্রতি এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইনের সংশোধনের জন্য এ ধরনের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

(৫) পূর্বে নাগরিকত্বলাভের আইনের বিভিন্নতার দরুণ এক ব্যক্তি একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারতেন ; এখন সে নিয়মগুলি এক ধরনের হওয়ায় তা পারেন না ; কিন্তু এক ব্যক্তি একাধিক সংস্থার সভ্য হতে পারেন

ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে সীমিত। তার বাইরের অন্য কোনও এলাকা থেকে কোন ব্যক্তি সেই রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক হতে পারে না। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক রেড্ ক্রস্ প্রভৃতি জনসেবামূলক সামাজিক সংস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে তাদের জনকল্যাণকর কর্মসূচী রূপায়িত করতে পারে।

(৬) রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড তার ভূখণ্ডের মধ্যে সীমিত ; সামাজিক সংস্থার কর্মক্ষেত্র বিশ্বব্যাপ্ত হতে পারে

সপ্তমতঃ, রাষ্ট্র যে-কোন সংস্থাকে যেভাবে খুশী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যে-কোন সংস্থা ভেঙে দিতে পারে, আবার বহু নতুন সংস্থা সৃষ্টি করতেও পারে। এর প্রধান কারণ হল—রাষ্ট্রের হাতেই সমস্ত সার্বভৌম শক্তি কেন্দ্রীভূত। কিন্তু সমস্ত সামাজিক সংস্থাই অ-সার্বভৌমিক এবং তার ফলে তারা সকলেই রাষ্ট্রের সার্বিক নিয়ন্ত্রণের অধীন।

(৭) সংস্থার ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সীমাহীন ; কারণ, রাষ্ট্রের মধ্যে তার সার্বভৌম শক্তি কেন্দ্রীভূত

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থাগুলির মধ্যে তাদের সংগঠনগত ও কর্মপদ্ধতিগত কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এদের মধ্যে বৈসাদৃশ্যই বেশী দেখা যায়।

উপসংহার ঃ রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থার মধ্যে বৈসাদৃশ্যই বেশী

॥ রাষ্ট্র ও সরকার ॥

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্র ও সরকার এই কথাদুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হত। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই (Louis XIV) গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করতেন, "রাষ্ট্র ? সে ত' আমিই" ("L'etat c'est moi" অর্থাৎ "I am the State")। ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট বংশীয় স্বৈরাচারী রাজাগণও এই মনোভাব পোষণ করতেন। সে বংশের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের গৃহশিক্ষক প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টমাস্ হবস্ (Thomas Hobbes) ইংলণ্ডের রাজাদের তৎকালীন স্বৈরাচারতন্ত্রের সমর্থনে এই ধরনের মন্তব্য করেছেন।

স্বৈরাচারী ফরাসী ও ইংরেজ স্টুয়ার্ট রাজাগণ রাষ্ট্র, রাজা ও সরকার এক ও অভিন্ন বলে আস্ফালন করতেন ঃ এর সমর্থনে হবসের বক্তব্য

কিন্তু প্রাচীন ভারতে মৌর্যযুগের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কৌটিল্য তাঁর সপ্তাঙ্গতত্ত্বে রাষ্ট্রের যে ৭টি "অঙ্গের" উল্লেখ করেছেন, তাতে স্পষ্টভাবে "রাষ্ট্র" এবং "সরকার" এই দুটির স্বাতন্ত্র্য তিনি বুঝিয়েছেন।

কিন্তু কৌটিল্যের বিখ্যাত সপ্তাঙ্গতত্ত্বে রাষ্ট্র ও সরকারকে পৃথক্ বলা হয়েছে

রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্যগুলি নানা দিক থেকে লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, রাষ্ট্র যে চারটি উপাদান নিয়ে গঠিত, সরকার তার অন্যতম অংশমাত্র। অংশ সমগ্রের সঙ্গে সমান—এ কথা কখনও বলা যায় না।

রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য ঃ
(১) সরকার রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম উপাদান

দ্বিতীয়তঃ, ব্লুন্‌টশ্লি (Bluntschli) প্রভৃতি জৈবমতবাদীগণ রাষ্ট্রকে মানবদেহের (organism) সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে, রাষ্ট্র যদি মানবদেহ হয়, তা হলে সরকার তার মস্তিষ্কস্বরূপ। কিন্তু এই উপমাটিরই যাথার্থ্য বিচার করে গার্নার বলেছেন যে, সরকার রাষ্ট্রের পরিচালক, কিন্তু রাষ্ট্র নয়, ঠিক যেমন জীব মস্তিষ্কের নির্দেশে তার সচল অস্তিত্বকে বজায় রাখে এবং সেজন্য সমস্ত মস্তিষ্ককে জীবদেহ বলা অ-বৈজ্ঞানিক।

(২) ব্লুন্টশ্লি প্রভৃতি জৈব মতবাদীগণের মতে—রাষ্ট্র মানবদেহ, সরকার তার মস্তিষ্ক ; গার্নারের সমালোচনা

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র প্রতীকমাত্র, সরকার এই প্রতীককে বাস্তবে রূপায়িত করে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বেশ বোঝা যায়। কোন নাগরিক যখন রাজদ্রোহের অপরাধে (sedition) অভিযুক্ত হয়, তখন রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রপ্রধানের পদের নামে তাকে অভিযুক্ত করা হয়। এ কথা সত্য। যেমন ধরা যাক, ইংলণ্ডে মামলার বয়ান "সাম্রাজ্ঞী বনাম উইলিয়াম্" (Regina versus William)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডে রাজা বা রাণী নিয়মতান্ত্রিক শাসক। তাই তাঁর নামে মামলা হলেও সে মামলায় অভিযোগকারী কার্যতঃ ব্রিটিশ সরকারের কোন মন্ত্রী। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রেও এ ক্ষেত্রে কেন্দ্র বা অঙ্গরাজ্যকে অভিযোগকারীরূপে ধরে নিয়ে মামলা হয়। কিন্তু আসল অভিযোগকারী হল সংশ্লিষ্ট সরকার। সুতরাং নাগরিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা করতে বা বিদ্রোহ করতে পারে না, কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে পারে।

(৩) রাষ্ট্র প্রতীকমাত্র, সরকার তার বাস্তবরূপ

চতুর্থতঃ, ল্যাস্কি (Laski) প্রভৃতি বহুত্ববাদী রাজনীতিবিদ্‌গণ (Pluralists) বলেন যে, রাষ্ট্রই সার্বভৌম, সরকারকে সূক্ষ্ম বিচারে সার্বভৌম বলা যায় না। তাঁদের একজনের মতে, চাঁদ যেমন সূর্যের আলোয় আলোকিত, চাঁদের নিজস্ব আলো নেই, তেমনি সরকারও রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতাকে (Derived power) নিজের সার্বভৌম ক্ষমতা বলে জাহির করে।

(৪) ল্যাস্কি প্রভৃতি বহুত্ববাদীদের মতে, রাষ্ট্রই সার্বভৌম, সরকারের চরম ক্ষমতা রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত

পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রের জনসমষ্টি সরকারী কর্মচারীদের থেকে অনেক, অনেক বেশী। সরকারের তিনটি বিভাগ—আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ। সব ক্ষেত্রেই কিছু আমলা প্রত্যেক বিভাগের কাজকর্মে সহায়তা করেন। অর্থাৎ, সরকারের জনসমষ্টি বলতে বোঝায় সীমিতসংখ্যক পরিচালক বা কর্মী। এই সংখ্যা রাষ্ট্রের জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র।

(৫) রাষ্ট্রের জনসমষ্টির মধ্যে তার এলাকার সকলেই অন্তর্ভুক্ত; সরকারী কর্তা বা কর্মী রাষ্ট্রীয় জনসংখ্যার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ

ষষ্ঠতঃ, যে অর্থে রাষ্ট্রের ভূখণ্ড আছে, সেই অর্থে সরকারের ভূখণ্ড তার জনসমষ্টির মত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সরকারের ভূখণ্ড বলতে বোঝায় সরকারী অফিস, কাছারী, সেরেস্তা, থানা, কারাগার, হাসপাতাল প্রভৃতি এলাকাগুলি। তাই সংক্ষেপে বলা যায় যে, সরকারের সাংগঠনিক চিত্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সাংগঠনিক চিত্রের কোন সাদৃশ্যই দেখা যায় না।

(৬) রাষ্ট্রের ভূখণ্ড নির্দিষ্ট ও পরিব্যাপ্ত; সরকারের ভূখণ্ড বলতে গেলে সরকারী অফিস প্রভৃতির সীমিত এলাকাকে বোঝায়

সপ্তমতঃ, সকল রাষ্ট্রের উপাদানগুলি একই। অর্থাৎ প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই উপাদান হল—ভূখণ্ড, জনসমষ্টি, সরকার, সার্বভৌমত্ব, স্থিতিশীলতা এবং অপর রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। কিন্তু দেশকালভেদে সরকারের নানা রূপ দেখা যেতে পারে। যেমন স্বৈরাচারী ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গণতন্ত্র। অথবা—এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, মন্ত্রিসভাচালিত ও রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ইত্যাদি।

(৭) ধ্রুপদী ও আধুনিক ব্যাখ্যায় রাষ্ট্রের উপাদানগুলি একই; কিন্তু দেশকালভেদে সরকারের নানা রূপ প্রতিভাত

অষ্টমতঃ, রাষ্ট্রকে আধুনিক যৌথ মূলধনী কারবারের (Joint Stock Company অথবা Limited Company) সঙ্গে সমতুল্য বলে কল্পনা করা হয়। এই ব্যবসায়িক সংগঠনে বহু শেয়ারক্রেতার ক্রীত শেয়ারের টাকা মিলিয়ে কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহ করা হয়, তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ (Limited liability)। অর্থাৎ, কোম্পানীর লোকসান হলে শেয়ারক্রয়কারীদের প্রত্যেকের টাকার পরিমাণের চেয়ে বেশি অর্থ কোম্পানীর পাওনাদারগণ তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারেন না। শেয়ারক্রয়কারীগণ একদল কর্মচারীকে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীরূপে (Board of Directors) নির্বাচন করে। কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর মতই রাষ্ট্রের সরকারের ভূমিকা। আইনের চোখে এই পরিচালকমণ্ডলীর সত্তা কোম্পানীর সত্তা থেকে পৃথক্। সরকারের সত্তাও সেইভাবে রাষ্ট্রের সত্তার সঙ্গে এক নয়।

(৮) রাষ্ট্রকে যদি যৌথ মূলধনী কারবারের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে সেই কারবারী সংগঠনের পরিচালকমণ্ডলী হল সরকার; পরিচালকগণই মূল সংগঠন নন

নবমতঃ, রাষ্ট্রকে একটা "ধারণা" (Idea) বলে ধরা হয়, আর সরকারকে তার "বাস্তব প্রতিভূ" (actual agent) বলে কল্পনা করা হয়। অর্থাৎ "মানুষ" শব্দটির মধ্য দিয়ে যেমন সমস্ত মানবগোষ্ঠীর অন্তর্গত কতকগুলি সাধারণ গুণবিশিষ্ট এক শ্রেণীর বিশেষ জীবকে বোঝায়, তেমনি "রাষ্ট্র" বলতে কয়েকটি গুণযুক্ত এক শ্রেণীর বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়। আইনবিদ্ অস্টিনের (Austin) ভাষায় রাষ্ট্রকে "রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান" ("political community") বলে। মানুষের হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে যেমন মানুষের বিশেষ বিশেষ জৈবিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে বিশিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত করে দেখা হয়, তেমনি রাষ্ট্রের অন্তর্গত সরকারকে রাষ্ট্রনামধারী প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি বিশেষ কাজকর্ম সম্পাদনার জন্য রাষ্ট্রের প্রধান সম্পাদকীয় অংশ বলে মনে করা হয়।

(৯) রাষ্ট্রকে যদি একটা "ধারণা" বলে মনে করা হয়, তা হলে সরকার হল তার "বাস্তব প্রতিভূ"

দশমতঃ, রাষ্ট্র অপরিবর্তনশীল ও স্থায়ী, সরকার পরিবর্তনশীল। সরকার রাজনৈতিক দলব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত। তাই সরকারী ভাঙ্গাগড়ার খেলায় সরকারী ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটে। কিন্তু বিরাট, বৃদ্ধ বটবৃক্ষের মত রাষ্ট্র অপরিবর্তিত থাকে। ১৯১৭ সালে বল্‌শেভিক্ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় জার (Czar) শাসনতন্ত্রের অবসান হয়, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটে। তখন থেকেই সেখানে সাম্যবাদী সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত। ফলে, রুশ সরকারের পরিবর্তন হল, কিন্তু রুশ রাষ্ট্রের পরিবর্তন হল না। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের ফলে ভারতে কংগ্রেস দলের পরিবর্তে জনতা দল কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে। কিন্তু এর ফলে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের কোন পরিবর্তন দেখা যায় নি। আবার, ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের ফলে বিজয়ী বামফ্রন্ট সরকার সমগ্র পশ্চিম বঙ্গ অঙ্গরাজ্যে

(১০) রাষ্ট্র অপরিবর্তনশীল ও স্থায়ী, সরকার পরিবর্তনশীল ও অস্থায়ী : ১৯১৭ সালের বিপ্লবে রুশ সরকারের রূপান্তর হয়, কিন্তু রুশ রাষ্ট্র স্থিত রয়েছে; ১৯৭৭ সালে ভারতে কংগ্রেসদলের বদলে জনতাদলের ও পশ্চিম বঙ্গে বামফ্রন্ট্ সরকারের ক্ষমতালাভঃ এর ফলে যথাক্রমে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় বা পশ্চিম বঙ্গের অঙ্গরাষ্ট্রীয় কোন পরিবর্তন হয় নি

কংগ্রেসের বদলে সরকার গঠন করে। কিন্তু এজন্য পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

একাদশতঃ, মার্কসবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রকে সনাতন, শাশ্বত চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করেন না। বরং তাঁরা বলেন যে, সাম্যবাদী বিপ্লবের দ্বারা সুগঠিত সর্বহারা শ্রেণী বা প্রোলেতারিয়েত (Proletariat) রাষ্ট্র নামক বুর্জোয়া শ্রেণীর শোষণযন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটায় ও শ্রেণীবিহীন সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলে। তাই সাম্যবাদীর কাছে রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বেশী।

(১১) মার্কসবাদীগণ রাষ্ট্রের অবলুপ্তি চান, রাষ্ট্রের বদলে সমাজের রূপান্তর ও প্রাধান্য-লাভ তাঁদের লক্ষ্য

সারাংশ

রাষ্ট্র নাগরিক ও সামাজিক জীবনের কেন্দ্রস্থল। রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তির ও সমাজের জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে না।

রাষ্ট্রের কয়েকটি ধ্রুপদী সংজ্ঞা আছে। গ্রীক "পোলিস" ও লাতিন "সিভিটাস" কথা দুটি যথাক্রমে গ্রীক ও রোমান দার্শনিকগণ রাষ্ট্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে ব্যবহার করতেন।

ইতালীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাকিয়াভেলিই "রাষ্ট্র" কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন।

আরিস্টটলের মতে, পরিবার সম্প্রসারণের মধ্যেই রাষ্ট্রের সূচনা।

রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত সপ্তাঙ্গ-তত্ত্বে ভারতে চতুর্থ খ্রীস্টপূর্বাব্দে মৌর্য যুগে কৌটিল্য রাষ্ট্রের অঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রচার করেন। তাঁর বিশ্লেষণ আজও গুরুত্বপূর্ণ। তবে বর্তমানে রাষ্ট্রের অঙ্গ-ভিত্তিক বিশ্লেষণের সঙ্গে তার কর্মভিত্তিক বিশ্লেষণের ওপরও জোর দেওয়া হয়।

বিখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনবিদ হল রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা আরিস্টটল ও কৌটিল্যের বক্তব্যকেই প্রকারান্তরে সমর্থন করেছে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে প্রচলিত উড্রো উইলসনের সংজ্ঞায় রাষ্ট্রের চারটি উপাদানের উল্লেখ আছে। যথা—জনসমষ্টি, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব।

জনসমষ্টি : রাষ্ট্রের জনসমষ্টির কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। এ বিষয়ে আরিস্টটল, রুশো, বেন্থাম ও কার্ল ফ্রিডরিশের মত। রাষ্ট্রের জনসমষ্টির দুটি ভাগ : নাগরিক ও বিদেশী। তা ছাড়া জনসমষ্টিকে অন্য দুভাগেও ভাগ করা যায়। যথা—ভোটদাতা ও যাঁরা ভোটদাতা নন।

ভূখণ্ড ও তার স্থায়িত্ব—এ বিষয়ে বেন্থাম ও কার্ল ফ্রিডরিশের মত। রাষ্ট্রের স্থায়ী ভূখণ্ড কিভাবে স্থায়িত্বলাভ করল—এ ব্যাপারে কৃষিব্যবস্থা, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধের ভূমিকা। রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড সম্পর্কে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাপক ব্যাখ্যা। মহীসোপন, ভৌগোলিক জলসীমা ও অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিস্তৃতি রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডেরই বিস্তৃতি। ১৯৮৪ সালের আন্তর্জাতিক সমুদ্র-আইন সম্পর্কিত চুক্তির বৈশিষ্ট্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মার্কিন ও সোবিয়েত বৃহৎশক্তিদ্বয়ের মধ্যে ক্ষমতার মেরুকরণের ফলে জোটবদ্ধতা। ছোটবড় রাষ্ট্রগুলির আয়তন এখন বিচার্য নয়। এ বিষয়ে কার্ল ফ্রিডরিশের মত।

সরকার হল রাষ্ট্রের প্রধান পরিচালকমণ্ডলী। সরকারের তিনটি বিভাগ—আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যক্তির আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ সরকারে নির্বাচনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দলব্যবস্থার ভূমিকা। সরকার নানাপ্রকার হতে পারে।

সার্বভৌমত্বকে রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তি বলা যায়। অস্টিনের সার্বভৌমতত্ত্ব—তাঁর মতে যে স্বাধীন শক্তির প্রভাবে অধিবাসীগণ রাষ্ট্রিক কর্তৃত্বকে বাধ্যতামূলকভাবে স্বীকার করে নেন, তাকেই সার্ব-

ভৌমত্ব বলে। সার্বভৌমত্ব দুদিকে প্রকাশিত—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ক্ষেত্রে। ল্যাস্কি, ম্যাক্‌আইভার্‌ প্রভৃতির দ্বারা সমর্থিত বহুত্ববাদী সার্বভৌমত্বের মতে রাষ্ট্র ছাড়াও সামাজিক সংস্থাগুলিকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম রাখা উচিত।

রাষ্ট্র সম্পর্কে আধুনিক সংজ্ঞার আলোচনা—স্বায়ত্তশাসিত ডোমিনিয়ান্‌গুলি কি রাষ্ট্র ?—এ বিষয়ে ১৯২৬ সালের সভার ও ১৯৩১ সালের ওয়েস্ট্‌মিন্‌স্টার চুক্তির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এরা "প্রায়-স্বাধীন।" সুতরাং রাষ্ট্র সম্পর্কে গার্নারের সংজ্ঞাটি মেনে নিলে এ জাতীয় রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিক গোলমালের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। তিনি বলেন—রাষ্ট্র এমন একটা শাসনব্যবস্থা যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট জনসমষ্টি নিয়ে স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন সরকারের অধীনে জনগণের স্বাভাবিক আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। গার্নারের সংজ্ঞা অত্যন্ত বাস্তবানুগ। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রায়-স্বাধীন ডোমিনিয়ান্‌দের "রাষ্ট্র" বলে অভিহিত করে একটা বাস্তব ঘটনাকে স্বীকার করে নেওয়া যায়। সুতরাং রাষ্ট্র সম্পর্কে উইল্‌সনের সংজ্ঞার চেয়ে গার্নারের সংজ্ঞা অধিকতর বাস্তববাদী।

গার্নারের সংজ্ঞার বিস্তৃতি—অন্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতিও রাষ্ট্রগঠনে আবশ্যক। তা ছাড়া চাই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব : এ বিষয়ে ১৯৩৩ সালের মন্টেভিডিও চুক্তির ব্যাখ্যা। অবশ্য রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব আপেক্ষিক। বিপ্লব বা আন্দোলন সরকার ও রাষ্ট্র উভয়েরই রূপান্তর ঘটায়। আয়াতুল্লাহ্‌ খোমেইনির নেতৃত্বাধীন বর্তমান ইরানের নজির।

রাষ্ট্র সম্পর্কে ৩ টি সংজ্ঞার তুলনা—উইল্‌সন্‌, গার্নার ও র‍্যাফায়েলের সংজ্ঞা।

রাষ্ট্র সম্পর্কে আধুনিক ভাবনাচিন্তা—(১) গড্‌উইন্‌, ক্রোপোট্‌কিন্‌, তলস্তয় প্রভৃতি দার্শনিকগণ মানবতাবাদী আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদের সমর্থক। তাঁদের মতে ব্যক্তি রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে। তাঁদের বক্তব্যের বিপরীত হল হিংসাশ্রয়ী নৈরাজ্যবাদীদের মতবাদ। প্রকৃত অর্থে মানবতাবাদী আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদীগণ রাষ্ট্রের রূপান্তরই চান, তার অবলুপ্তি চান না। (২) কম্যুনিজম্‌ কি নৈরাজ্যবাদ ?—এর সমর্থনে মার্ক্‌স্‌ প্রভৃতির বক্তব্য। সোবিয়েত রাশিয়া ও চীনের অভিজ্ঞতা—সেখানে কম্যুনিস্ট্‌ দলের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব থাকলেও কম্যুনিস্ট্‌রা মনে করেন—তার ফলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বদলে আসলে "গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ" গড়ে উঠেছে। (৩) ফিলিপ্‌ জেসপের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক আইন এক ধরনের "রাষ্ট্রাতীত আইনের" দ্বারা চালিত হলেও বিশ্বযুক্তরাষ্ট্র কখনই রাষ্ট্রবিহীন হতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত নিউইয়র্ক, আলাস্কা, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি) সার্বভৌমত্ব নেই। ফলে তারা "রাষ্ট্র" নয়।

একই যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ২২ টি অঙ্গরাজ্য এবং ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দিল্লী প্রভৃতি ৯ টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলকে "রাষ্ট্র" বলা যায় না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বশান্তি সুরক্ষার জন্য স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সার্বভৌমত্ব নেই। তাই একে "রাষ্ট্র" বলা যায় না, এটি কেবল কতকগুলি রাষ্ট্রের মিলিত সংস্থা। কিন্তু কেল্‌সেন, কুইন্সি রাইট্‌ প্রমুখ আন্তর্জাতিক আইনের বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে যে বিপুল ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে, তার ভিত্তিতে সে সার্বভৌম।

রাষ্ট্র ও সমাজ—অ্যারিস্টটল্‌, এঙ্গেল্‌স প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও মর্গান, ম্যালিনাওস্কি, মার্গারেট্‌ মীড্‌ প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা - সমাজের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। উইল্‌ ডুরাণ্টের মতে, রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক "একটি অবিচ্ছিন্ন, ঐতিহাসিক ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক"।

রাষ্ট্র ও সমাজের ঘনিষ্ঠতার কারণ : (১) ঐতিহাসিক বিবর্তনজনিত ঘটনাপ্রবাহ ; (২) একে অপরের পরিপূরক ও নিয়ন্ত্রক—সামাজিক পরিকল্প (টোটেম্‌ বা মীথ্‌) ও বিধিনিষেধের (ট্যাবু) ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা—রাষ্ট্রিক সার্বভৌমত্ব ও সামাজিক লোকাচার সমান শক্তিশালী—ডিকেন্স্‌, দস্তয়ভ্‌স্কি, শরৎচন্দ্র, মুন্সী প্রেমচাঁদ প্রভৃতির উপন্যাসে লোকাচারের প্রভাব নির্দেশ। (৩) রাষ্ট্র ও সমাজের উদ্দেশ্য এক—ব্যক্তিজীবনের উৎকর্ষসাধন। (৪) মেন্‌ প্রভৃতি আইনবিদ্‌ বলেন যে, রাষ্ট্রীয় আইনে যেমন সমাজের প্রভাব থাকে, সামাজিক লোকাচারের ওপরও রাষ্ট্রীয় আইনকানুনের প্রভাব থাকে।

কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে বৈসাদৃশ্যই বেশী। সেগুলি হল—(১) সমাজ রাষ্ট্রের তুলনায় বেশী বিস্তৃত; (২) সমাজ রাষ্ট্রপূর্ব প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের উদ্ভব ধীরে ধীরে ঘটেছে, কিন্তু তার তুলনায় সমাজের উদ্ভব স্বতঃস্ফূর্ত। (৩) রাষ্ট্রের পরিধি তার ভূখণ্ডের দ্বারা সীমিত, সমাজের পরিধি পরিব্যাপ্ত। (৪) রাষ্ট্রের সরকার সার্বভৌমত্বের প্রতীক, সমাজের যে কোন কার্যনিবাহ পরিষদ অ-সার্বভৌম। (৫) সমাজ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংস্থা, রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক সংগঠন। (৬) ব্যক্তির কল্যাণসাধন রাষ্ট্র ও সমাজের উভয়ের সাধারণ উদ্দেশ্য হলেও উভয়ের প্রচেষ্টা বিভিন্ন। (৭) ম্যাক্‌আইভারের মত বহুত্ববাদীরা বলেন যে, "সামাজিক" ও "রাষ্ট্রীয়" ক্ষেত্রগুলি বিভিন্ন। (৮) মার্ক্‌স্‌বাদ ও গান্ধীবাদ—উভয়েই রাষ্ট্রের পরিবর্তে সমাজের অভিভাবকত্বের সমর্থক।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক সংস্থা—বহুত্ববাদী ল্যাস্কি ও স্যার আর্নেস্ট্‌ বার্কারের বাস্তবধর্মী মত—সমাজ অজস্র সংগঠনের সমবায়। বহুত্ববাদীদের চোখেও রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজ অধিকতর ব্যাপক ও বৃহৎ।

রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থার মধ্যে সাদৃশ্য—(১) সাংগঠনিক সাদৃশ্য—উভয়েরই জনসমষ্টি ও সরকারের প্রয়োজন। (২) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আছে সামাজিক সংস্থার আছে গঠনতান্ত্রিক নিয়মাবলী।

কিন্তু রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থাগুলির মধ্যে বৈসাদৃশ্যই বেশী। যথা—(১) উভয়েই বিবর্তনপ্রসূত, কিন্তু রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংস্থা সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান। (২) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এত চরম যে সে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারে; সামাজিক সংস্থা বড় জোর অশিষ্ট সদস্যকে সংস্থা থেকে বিতাড়িত করতে পারে। (৩) সামাজিক সংস্থাগুলির তুলনায় রাষ্ট্র বেশী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। অবশ্য মার্ক্‌স্‌বাদীগণ রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান—তাঁরা এর অবলুপ্তি চান। (৪) রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের মূল কারণ-রাষ্ট্র বহুউদ্দেশ্যমুখী প্রতিষ্ঠান, কিন্তু সামাজিক সংস্থা বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত। (৫) পূর্বে নাগরিকত্বলাভের আইনের বিভিন্নতার দরুণ এক ব্যক্তি একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারতেন, এখন সে নিয়মগুলি এক ধরনের হওয়ায় পারেন না। কিন্তু এক ব্যক্তি একাধিক সংস্থার সভ্য হতে পারেন। (৬) রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড তার ভূখণ্ডের মধ্যে সীমিত; সামাজিক সংস্থার কর্মক্ষেত্র বিশ্বব্যাপ্ত হতে পারে। (৭) সংস্থার ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সীমাহীন। কারণ, রাষ্ট্রের মধ্যে তার সার্বভৌম শক্তি কেন্দ্রীভূত।

উপসংহার—রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থার মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশী।

রাষ্ট্র ও সরকার—স্বৈরাচারী ফরাসী ও ইংরেজ স্টুয়ার্ট রাজাগণ রাষ্ট্র, রাজা ও সরকার এক ও অভিন্ন বলে আস্ফালন করতেন। এর সমর্থনে হব্‌সের বক্তব্য। কিন্তু কৌটিল্যের বিখ্যাত সপ্তাঙ্গতত্ত্বে রাষ্ট্র ও সরকারকে পৃথক বলা হয়েছে।

রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য—(১) সরকার রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম উপাদান। (২) ব্লুণ্টশ্‌লি প্রভৃতি জৈব মতবাদীগণের মতে—রাষ্ট্র মানবদেহ, সরকার তার মস্তিষ্ক; গার্নারের সমালোচনা। (৩ রাষ্ট্র প্রতীক-মাত্র, সরকার তার বাস্তব রূপ। (৪) ল্যাস্কি প্রভৃতি বহুত্ববাদীদের মতে—রাষ্ট্রই সার্বভৌম, সরকারের চরম ক্ষমতা রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত। (৫) রাষ্ট্রের জনসমষ্টির মধ্যে সকলেই তার এলাকার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সরকারী কর্তা বা কর্মী সমগ্র রাষ্ট্রীয় জনসংখ্যার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। (৬) রাষ্ট্রের ভূখণ্ড নির্দিষ্ট ও পরিব্যাপ্ত। সরকারের ভূখণ্ড বলতে গেলে সরকারী অফিস প্রভৃতি সীমিত এলাকাকে বোঝায়। (৭) ধ্রুপদী ও আধুনিক ব্যাখ্যায় রাষ্ট্রের উপাদানগুলি একই; কিন্তু দেশকালভেদে সরকারের নানা রূপ প্রতিভাত। (৮) রাষ্ট্রকে যদি যৌথ মূলধনী কারবারের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে সেই কারবারী সংগঠনের পরিচালক-মণ্ডলী হল সরকার; পরিচালকগণই মূল সংগঠন নন। (৯) রাষ্ট্রকে যদি একটা "ধারণা" বলে মনে করা হয়, তা হলে সরকার হল তার "বাস্তব প্রতিভূ"। ও (১০) রাষ্ট্র অপরিবর্তনশীল ও স্থায়ী, সরকার পরিবর্তনশীল ও অস্থায়ী। ১৯১৭ সালের বিপ্লবে রুশ সরকারের রূপান্তর হয়, কিন্তু রুশ রাষ্ট্র স্থিত রয়েছে। ১৯৭৭ সালে ভারতে কংগ্রেস দলের বদলে জনতাদলের ও পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্ট সরকারের ক্ষমতা-লাভ। এর ফলে যথাক্রমে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় বা পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গরাষ্ট্রীয় কোন পরিবর্তন হয় নি। (১১) মার্ক্‌স্‌বাদীগণ রাষ্ট্রের অবলুপ্তি চান, রাষ্ট্রের বদলে সমাজের রূপান্তর ও প্রাধান্যলাভ তাঁদের লক্ষ্য।

৩ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব : তার বিশেষত্ব

"...Sovereignty means supreme coercive power ; and, without this, the State cannot enforce a will to which it is compelled by the class-relations it exists to maintain." —Laski

ধ্রুপদী ব্যাখ্যায় রাষ্ট্রের যে চারটি মূল উপাদানের উল্লেখ করা হয়, সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্যক্তি, সংস্থা প্রভৃতির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, সংঘাত দূর করার জন্য সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক খেলায় একটা নিরপেক্ষ পরিচালকের (referee in the political game) ভূমিকা নিতে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নাগরিকত্বই ব্যক্তির প্রধান পরিচিতি। সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়েই রাষ্ট্র বিশ্বের দরবারে তার আঞ্চলিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার দাবী জানাতে সক্ষম হয়। সুতরাং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য দুটি ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের দুটি দিক : অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য

ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী রাজনীতিজ্ঞ জাঁ বোদ্যাঁ (Jean Bodin) সর্বপ্রথম আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব প্রচার করেন। তাঁর সংজ্ঞা অনুসারে, যে চরম ক্ষমতার দ্বারা নাগরিক ও প্রজাদের ওপর রাষ্ট্র তার কর্তৃত্ব আরোপ করে, তাকেই সার্বভৌমত্ব বলে ("the supreme power of the State over citizens and subjects, unrestrained by law")। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন ষোড়শ শতাব্দীর ওলন্দাজ আইনবিদ্ হুগো গ্রোটিয়াস্ (Hugo Grotius)। তিনি বলেছেন যে, যে শক্তির বলে ছোটবড়ো-নির্বিশেষে সমস্ত রাষ্ট্রই স্বাধীনভাবে নিজের পরিমণ্ডলের মধ্যে অসীম ক্ষমতার অধিকারী ও অপর রাষ্ট্রের কাছে সমান মানমর্যাদার দাবীদার হতে পারে, তাকে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি বলে।

রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব: বোদ্যাঁর মত

আন্তর্জাতিক সার্বভৌমত্ব : হুগো গ্রোটিয়াসের মত

॥ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব : অস্টিনের তত্ত্ব ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত ইংরেজ আইনবিদ্ জন্ অস্টিন্ (John Austin) সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে যে মতামত প্রচার করেন, তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ভাষায় বলা যায় যে, যদি কোনও সমাজে কোনও বিশিষ্ট

উচ্চতম মানবিক কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সেই সমাজের অন্য কারুর বশ্যতা স্বীকার না করেন, অথচ সমাজের বেশীর ভাগ লোক যদি তাঁকে স্বভাববশতঃ মান্য করে চলেন, তা হলে সেই উচ্চতম মানবিক কর্তৃপক্ষ সেই সমাজের সার্বভৌম এবং সেই উচ্চতম কর্তৃপক্ষকে নিয়ে সংশ্লিষ্ট সমাজটিকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলা হয় ("If a determinate human superior not in the habit of obedience to a like superior receive habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is the sovereign in that society, and the society, including the superior, is a society political and independent")।

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে অস্টিনের সংজ্ঞা

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে অস্টিনের মতবাদের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ, এই মতবাদ সার্বভৌমত্বকে রাষ্ট্রের চরম শক্তিরূপে ব্যাখ্যা করে রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী হবার পথ প্রশস্ত করেছে। অস্টিন্ বলেছেন, সার্বভৌমের আজ্ঞাই হল 'আইন' ("Law is the command of the sovereign attended with a sanction")। কিন্তু জনসাধারণের পরোক্ষ বা প্রচ্ছন্ন সম্মতি ছাড়া আইন কখনও সাধারণের মান্যতা লাভ করে না। এই প্রসঙ্গে হেন্‌রি মেন্ (Henry Maine) ঐতিহাসিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিচার করতে গিয়ে বলেছেন যে, পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের মত প্রতাপশালী নেতাও শিখ-সমাজের প্রথাগত বিধানগুলি অমান্য করতে সাহসী হন নি। অস্টিন্ প্রথাগত বিধিগুলিকে "আইন" বলে স্বীকার করেন নি। কিন্তু অস্টিন্‌পন্থীগণ বলেন যে, প্রথাগত বিধিগুলি সার্বভৌমের স্বীকৃতির আদেশ পেলেই রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা লাভ করে থাকে।

অস্টিনের মতের সমালোচনা ঃ (১) হেন্‌রি মেন্ বলেন ঃ অস্টিন্ প্রথাগত বিধানের গুরুত্ব স্বীকার করেন নি

দ্বিতীয়তঃ, সার্বভৌম শক্তি সবক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ না-ও হতে পারেন। অস্টিন্ স-পরিষদ রাজশক্তিকে (the King-in-Parliament অথবা the Queen-in-Parliament) ইংলণ্ডের সার্বভৌম বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু অস্টিনের সংজ্ঞা সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগ করলে তাকে সার্বভৌম বলা যায় না, কারণ, ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের ক্ষমতা সেখানকার প্রথা, রীতিনীতি ইত্যাদির দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত।

(২) সার্বভৌম শক্তি সর্বদা নির্দিষ্ট না-ও হতে পারে ঃ ইংলন্ডের নজির

তৃতীয়তঃ, অস্টিনের তত্ত্ব আইনের দিক থেকে সার্বভৌমত্বকে ব্যাখ্যা করেছে, কিন্তু সার্বভৌমত্বের রাজনৈতিক বা নীতিগত ব্যাখ্যার দিক থেকে তাঁর মতামত সন্তোষজনক নয়। তাঁর আইনগত বিশ্লেষণ অনুসারে রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের দ্বারা ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় আইনকানুন মানতে বাধ্য করে। কিন্তু সার্বভৌমের প্রণীত আইনকানুন ব্যক্তি যে অভ্যাসজনিত আনুগত্যের ফলে মেনে চলে, তা

(৩) সার্বভৌম শক্তির আইনানুগ ব্যাখ্যা ছাড়াও এর নৈতিক ব্যাখ্যাও দরকার

মূলতঃ রাজনৈতিক কারণে। এটা বলপ্রয়োগের প্রভাব নয়। ব্যক্তি রাষ্ট্রকে মান্যতা প্রদানের উপযোগী, অভিভাবকতুল্য একটা সাধারণ, জনহিতকর সংস্থা বলে মনে করে বলেই সে রাষ্ট্রকে মেনে চলে, তার সার্বভৌম শক্তিকেও মেনে চলে।

চতুর্থতঃ, ল্যাস্কি (Laski), বার্কার (Barker), দুগুই (Duguit) প্রভৃতি বহুত্ববাদী (Pluralists) লেখকগণ অস্টিনের সার্বভৌমত্ব তত্ত্বকে অদ্বৈতবাদী (Monistic) বলে ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী এক অসম্পূর্ণ এবং বিপজ্জনক মতবাদ রূপে বর্ণনা করেছেন। মানুষের বহুমুখী ব্যক্তিত্ববিকাশে সহায়তার জন্য সমাজে রাষ্ট্র ছাড়াও ক্লাব, শ্রমিকসংস্থা, শিক্ষকসংস্থা প্রভৃতি অসংখ্য বিচিত্র প্রতিষ্ঠান আছে। একমাত্র রাষ্ট্রই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বে থেকে শিক্ষক, শ্রমিক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের নাগরিকদের প্রত্যেকের পৃথক, বিশিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধান করতে সমর্থ বলে মনে করা অন্যায় ও অবাস্তব। বৈদেশিক ক্ষেত্রেও বহুত্ববাদীদের মতে অস্টিনের মত, অনুসারে রাষ্ট্রকে সার্বভৌম বলে স্বীকার করার অর্থ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের যথেচ্ছাচার স্বীকার করে নেওয়া। এর অর্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহকে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নেওয়া। ফলে, আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হতে বাধ্য। এই সকল কারণে বহুত্ববাদী লেখকগণ প্রস্তাব করেছেন যে, সার্বভৌমত্বকে শুধু রাষ্ট্রের মধ্যে কেন্দ্রীভূত না রেখে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলিকেও নিজ নিজ এলাকায় সার্বভৌম করে দেওয়া প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বহুত্ববাদী লেখকগণ রাষ্ট্রকে উচ্চতম একটি বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রের (World Federation) অধীনে রাখার পক্ষপাতী।

(৪) ল্যাস্কি, বার্কার, দুগুই প্রভৃতি বহুত্ববাদীদের মতে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব বিভাজ্য

কিন্তু সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে অস্টিনের মতবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা হলেও বাস্তববাদী লেখকগণ বহুত্ববাদী মতবাদকে সমর্থন করেন না। তাঁরা বলেন যে, আইনের চুলচেরা বিচারে অস্টিনের মত অভ্রান্ত। মনে রাখা দরকার যে, অস্টিন্ তৎকালীন ইংলণ্ডে প্রচলিত হিতবাদের (Utilitarianism) সমর্থক ছিলেন। এই মতবাদে বলা হয় যে, ব্যক্তির পক্ষে হিতকারী আইনকানুনই মান্যতা পাবার যোগ্য। তাই আইনবিদ্ হিসাবে সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে অস্টিন্ যা বলেছেন, তাকে গণতন্ত্রবিরোধী বলা ঠিক নয়।

উপসংহার ঃ অস্টিন্ হিতবাদী ছিলেন ; সুতরাং সার্বভৌমত্বের গণতান্ত্রিকতা তিনি অস্বীকার করেন নি

একথাও মনে রাখা দরকার যে, সমাজের বিভিন্ন সংস্থাকে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী করার অর্থ রাষ্ট্রিক ব্যাপারে চরম বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দেওয়া। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের অধীনে এদের না রাখলে এই বিশৃঙ্খলা দূর হবে না। রাষ্ট্র এই ক্ষেত্রে যেন খেলার মাঠে বিভিন্ন দলের খেলায় রেফারীর (referee) বা চূড়ান্ত বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। এ খেলা অত্যন্ত চমকপ্রদ, সম্পূর্ণ অভিনব এক রাজনৈতিক খেলা।

রাষ্ট্রের সংহতি, শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাঁর আইনগত ব্যাখ্যা গ্রাহ্য

॥ বহুত্ববাদী সার্বভৌমত্ব ॥

অস্টিনের সার্বভৌমত্বকে একত্ববাদী বা অদ্বৈতবাদী (Monistic theory) বলা হয়। কারণ, তিনি রাষ্ট্রকেই একমাত্র সার্বভৌম শক্তি বলে ঘোষণা করেছেন এবং এই সার্বভৌম শক্তিকে অবিভাজ্য, অসীম, শাশ্বত বা চিরন্তন বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে, এই ক্ষমতা হস্তান্তর-যোগ্য নয়, রাষ্ট্রই শুধু এই ক্ষমতার একমাত্র প্রকাশক। সুতরাং অস্টিনের সার্বভৌমতত্ত্ব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীয় প্রবণতা বা কেন্দ্রীভবনের সমর্থক।

বহুত্ববাদীগণ অস্টিনের একত্ববাদী মতের কেন্দ্রপ্রবণতার বিরোধী

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমাজতন্ত্রবাদের (Socialism) অগ্রগতির ফলে উৎপাদনের উপাদানগুলি রাষ্ট্রীয়করণের জন্য জোরালো যুক্তি দেখানো শুরু হয়। অবাধ প্রতিযোগিতা ও ব্যক্তিগত উদ্যম সমর্থন করার ফলে ধনতন্ত্র চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য এনে দেয়। তাই ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকানা ইত্যাদি পুঁজিপতিদের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করার পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়। ফলে, ধনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যুক্তি বাদ দেবার কথা উঠল।

বহুত্ববাদের ওপর সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব

কিন্তু রাষ্ট্রের হাতে অধিকতর ক্ষমতা দিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে। তাই সমাজতন্ত্রী হয়েও ল্যাস্কি, কোল্ (G. D. H. Cole) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের বিরুদ্ধে ব্যক্তি ও সংস্থাকে স্বনিয়ন্ত্রণের (autonomy) অধিকার দিতে প্রয়াসী হলেন। কোল্ শ্রমিকসংস্থাকে (Trade Union বা Guild) এই ধরনের "সার্বভৌমত্ব" দিতে চেয়েছিলেন। ইতালী, ফ্রান্স্ প্রভৃতি দেশের অতি-আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদীগণ "ইউরোকম্যুনিস্ট্" (Euro-communist)। তাঁদের অনেকের মতে, রাষ্ট্রের বদলে শ্রমিকসংস্থাকে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতা দিলে সমাজতন্ত্র সফল হবে।

বহুত্ববাদের পক্ষে অর্থনৈতিক যুক্তি : ল্যাস্কি ও কোলের মত

ল্যাস্কি বা কোল্ **অর্থনৈতিক যুক্তির দ্বারা** শ্রমিকসংস্থা বা "গিল্ড্" কে সার্বভৌম অধিকার প্রদান করে বহুত্ববাদী সার্বভৌমত্ব (Pluralistc theory of Sovereignty) সমর্থন করেছেন। তেমনি ম্যাক্আইভার (MacIver), বার্কার (Barker) ফিগিস্ (Figgis), গীর্কে (Gierke), দুগুই (Duguit) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **সমাজতাত্ত্বিক যুক্তির দ্বারা** রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাকে সার্বভৌম করে তুলে বহুত্ববাদী সার্বভৌমত্ব তত্ত্বকে সমর্থন করেছেন।

বহুত্ববাদের পক্ষে সমাজতত্ত্ববিদ দের যুক্তি

ম্যাক্আইভার বলেন যে, মানুষের জীবনের নানাপ্রকার চাহিদা মেটাবার জন্য অসংখ্য সামাজিক সংস্থা আছে। এগুলির সদস্য হওয়া সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির স্বেচ্ছা-প্রণোদিত। তাই এগুলি ব্যক্তির কাছে স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান (Voluntary asso-

ciations) রূপে দেখা দেয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটির বিশিষ্ট উদ্দেশ্য অনুযায়ী এগুলি ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য স্বয়ংসৃষ্ট। রাষ্ট্র এদের স্রষ্টা নয়, এদের নিয়ন্ত্রকও নয়। কারণ, রাষ্ট্র নিজেই এরকম একটি সংস্থা। তাই নিজের সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ করে এগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রের কোন অধিকার নেই। ফিগিস্ ও গীর্কে গির্জার মত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্বাধিকারের জন্য সুপারিশ করেছেন।

ম্যাক্‌আইভার, ফিগিস্, গীর্কে ও বার্কারের যুক্তি

ফরাসী আইনবিদ্ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দুগুই রাষ্ট্রীয় আইনের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, "আইন রাষ্ট্রের ওপরে" ("Law is above the State")। কারণ, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য আইনপ্রণয়ন করে। রাষ্ট্র শুধু সেই আইনের আনুষ্ঠানিক অনুমোদনকর্তা (formal enacting authority)। ব্যক্তি সচেতনভাবে রাষ্ট্রের এই ভূমিকা মেনে নেয় বলেই রাষ্ট্র তার সার্বভৌম শক্তির প্রাপক। বার্কার ব্যক্তির সামাজিক সত্তা ছাড়াও গোষ্ঠীসত্তাকে স্বীকার করেছেন ও উভয়ের মানমর্যাদা সমান বলে ঘোষণা করেছেন।

সাধারণভাবে বহুত্ববাদীগণ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে বিভাজ্য বলে মনে করেন। কারণ, সংস্থাগুলির নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাদের স্বাধিকার প্রয়োগের অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র একটা ব্যাপক, বহু-উদ্দেশ্যমুখী বিরাট প্রতিষ্ঠান। বহু রকম সংস্থার বিশিষ্ট সমস্যাগুলির মীমাংসার ভার শুধু রাষ্ট্রের ওপর দিলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটার আশংকা। বহুত্ববাদীরা চান ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation of Power)।

সাধারণভাবে বহুত্ববাদীগণ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুত্ববাদী সার্বভৌমত্বের মুখ্য প্রবক্তা ল্যাস্কি। তিনি উগ্র, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার সঙ্গে সমগোত্রীয় বলে মনে করেন। কারণ, আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে সার্বভৌম বলে মেনে নেওয়ার অর্থ হল প্রত্যেক রাষ্ট্রের যথেচ্ছাচারী হবার অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল—সবল রাষ্ট্রগুলি দুর্বল রাষ্ট্রদের নিয়ে জোটবদ্ধ হতে পারে এবং আন্তর্জাতিক সমাজ কতকগুলি যুদ্ধবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুসারে অস্বাভাবিক ও অশান্তিপূর্ণ পথে পরিচালিত হবে। বর্তমান আণবিক যুগে ক্ষমতার মেরুকরণের (Polarisation of Power) ফলে ল্যাস্কির এ আশংকা তাঁর পরবর্তীকালেও যেন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুত্ববাদের গোঁড়া সমর্থক হিসাবে ল্যাস্কি বর্তমান সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলিকে একটি বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রের (World Federation) অধীনস্থ অঙ্গরাজ্য রূপে গড়ে তুলতে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে, জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে আন্তর্জাতিকতাই আগামী দিনের মতাদর্শ, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার বদলে বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রের পটভূমিকাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুত্ববাদের যুক্তি : ল্যাস্কির বক্তব্য

এই সমস্ত যুক্তি দেখিয়ে ইংরেজ রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ লিণ্ডসে (Lindsay) সিদ্ধান্ত করেছেন যে, "ঘটনার দিকে তাকালে বেশ বোঝা যায় যে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম তত্ত্ব বিধ্বস্তপ্রায়" ("If we look at the facts it is clear that the theory of Sovereign State has broken down")। ল্যাস্কির সিদ্ধান্তও একই রকম। তাঁর মতে, "সার্বভৌমত্বের সমস্ত তত্ত্বটি বাতিল করলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পক্ষে স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হবে" ("It would be of lasting benefit to Political Science if the whole concept of Sovereignty were surrendered")।

লিন্ডসে ও ল্যাস্কির মধ্যে মতের মিল

॥ বহুত্ববাদী সার্বভৌমতত্ত্বের সমালোচনা ॥

বহুত্ববাদী সার্বভৌমতত্ত্বের সমর্থকগণ অস্টিনের অদ্বৈতবাদী সার্বভৌমতত্ত্বের বিরুদ্ধে যে যে বিষয়ে সমালোচনা করেছেন, সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে অতিশয়োক্তি ও অবাস্তব বলে ধরে নিয়েছেন। প্রথমতঃ, এ কথা সত্য যে, রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যের যেমন আইনগত দিক আছে, তেমনি এর দার্শনিক, এমন কি সমাজতাত্ত্বিক দিকও আছে। র‍্যাফায়েলের (Raphael) ভাষায়, ব্যক্তির চোখে রাষ্ট্রের মান্যতালাভের উপযুক্ততা ("legitimacy of the authority of the State") নিয়ে স্বতন্ত্র তত্ত্ব রয়েছে। তার নাম দেওয়া যেতে পারে —"রাষ্ট্রানুগত্যের বাধ্যতাতত্ত্ব" (Theory of Political Obligation)। বহুত্ববাদীগণ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমতত্ত্ব এবং এই বাধ্যতাতত্ত্ব অভিন্ন বলে মনে করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ দুটি মতবাদ সম্পূর্ণ এক নয়।

বহুত্ববাদের সমালোচনা: (১) বহুত্ববাদীগণ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও ব্যক্তির আনুগত্য—এ দুটিকে অভিন্ন মনে করেন; কিন্তু তারা ভিন্ন

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য, এ দুটিকে বিভিন্ন বলে ধরে নিলেও রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বিভাজনের সুপারিশ করে বহুত্ববাদী দার্শনিকগণ রাষ্ট্র ও ব্যক্তিকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কল্পনা করেছেন। আসলে তারা প্রতিযোগী নয়, তারা সহযোগী।

(২) রাষ্ট্র ও ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্র ও সংস্থা—পরস্পর প্রতিযোগী নয়, সহযোগী

তৃতীয়তঃ, বহুত্ববাদীগণ আইনপ্রণয়নের উৎস হিসাবে বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকার কথা বলেছেন। তাঁদের যুক্তি স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে, সংস্থাগুলি নিজেদের উপযোগী আইনকানুন রচনা করলেও সেই আইনগুলিকে বলবৎ করার জন্য রাষ্ট্রশক্তির মত চরম শক্তির প্রয়োজন। অর্থাৎ, বহুত্ববাদীগণ আইনকানুনের নীতিপ্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণ প্রণালী দুটির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দুরকম ভূমিকাকে অভিন্ন বলে ধরে নিয়েছেন। আসলে, এ দুটি প্রণালী এক নয়।

(৩) রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণ প্রণালী ও নীতিপ্রয়োগ প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য আছে

চতুর্থতঃ, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সম্ভাব্য ও স্বাভাবিক ঘাত-প্রতিঘাতের নিষ্পত্তির জন্য তাদের মান্যতাপ্রাপ্ত একটি উচ্চতর সংগঠন বা শক্তি থাকা দরকার। রাষ্ট্র সেই উচ্চতর সংগঠন, সার্বভৌমত্ব সেই উচ্চতর শক্তি। অন্যান্য খেলার মত রাজনৈতিক খেলা পরিচালনার জন্যও যে নিরপেক্ষ বিচারক (neutral referee) থাকেন, রাষ্ট্রের তরফে সরকারের সেই চরম শক্তির মালিক ও প্রযোজক হল সার্বভৌম রাষ্ট্র। অন্যভাবেও এই কথা বলা যায়—রাষ্ট্র যেন সমাজের শীর্ষে স্থিত এক সাধারণ সর্বজনীন অভিভাবক ("common guardian of the society at the apex"), বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সংস্থার সঙ্গে ব্যক্তিজীবনকে সমন্বিত করার একটি জনসংযোগকারী মাধ্যম ("a public relations media-network")।

(৪) রাজনৈতিক খেলার নিরপেক্ষ বিচারক হল রাষ্ট্র ; অথবা, সমাজের শীর্ষস্থিত সাধারণ অভিভাবক

পঞ্চমতঃ, আধুনিক যুগে সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) প্রসার লাভ করার ফলে ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের (Welfare State) আবির্ভাবের দরুণ সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলি অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছে। বহুত্ববাদী ল্যাস্কিও সমাজতন্ত্রবাদীরূপে রাষ্ট্রের এই পরিবর্তিত ভূমিকার ও সেজন্য তার প্রাধান্যের পক্ষে যুক্তি স্বীকার করে নেন ও গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (Democratic Socialism) সমর্থন করে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। বার্কারও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার (Justice) প্রতিষ্ঠার জন্য জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ভূমিকাকে প্রশংসা করেছেন। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রধান ইংরেজ সমর্থক হলেন লর্ড বেভারিজ (Lord Beveridge), টিটমাস (Titmuss), লর্ড রবিনস (Lord Robbins) ও রবসন (Robson)। এঁরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, আধুনিক যুগে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ("from cradle to grave") ব্যক্তিজীবন প্রগতিশীল রাষ্ট্রের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত।

(৫) বহুত্ববাদীগণ আধুনিক রাষ্ট্রের জনকল্যাণকর দিক সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত

ষষ্ঠতঃ, বিখ্যাত ইংরেজ শাসনতত্ত্ববিদ হুয়্যার (Wheare) বলেছেন যে, জনকল্যাণকর ভূমিকা পালনের জন্য, বেকারত্ব, যুদ্ধ প্রভৃতি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রগুলি (Federal governments) প্রায় সকলেই কেন্দ্রপ্রবণ হয়ে উঠেছে। এই কেন্দ্রমুখিতা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা-বিভাজন (distribution of powers between the Centre and the States)। তাদের এই এককেন্দ্রিকতা বহুত্ববাদীদের বিকেন্দ্রীকরণের যুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী একটি বাস্তব ঝোঁক।

(৬) হুয়্যার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের মতে আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রগুলি প্রায়ই কেন্দ্রপ্রবণ

উপসংহার : বহুত্ববাদী সার্বভৌম তত্ত্বকে নানা কারণে অবাস্তব বলে সমালোচনা করা হলেও **বহুত্ববাদ** আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে **কতকগুলি মূল্যবান সিদ্ধান্তের প্রতি**

গুরুত্ব আরোপ করেছে। যেমন—প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation of Power)। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ না হলে রাষ্ট্রের নামে সরকার ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে এবং আমলাতন্ত্র যথেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বাধিকারকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে স্বীকার করে নেওয়া উচিত ও তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকা উচিত। তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত না করলে ভবিষ্যতে বিশ্বযুক্তরাষ্ট্র গঠন অসম্ভব। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) সাফল্য ব্যাহত হবার প্রধান কারণই হল রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ক্ষমতার মেরুকরণের ফলে এই দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যেকটির সঙ্গে ছোটবড় রাষ্ট্রগুলির জোটবদ্ধতা দেখা যায়। পৃথিবীতে যুদ্ধ বন্ধ করতে ও শান্তি স্থায়ী করতে হলে এই প্রবণতাগুলি দূর করা খুবই জরুরী।

উপসংহার : বহুত্ববাদীদের যুক্তির মূল্যায়ন : ১) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ চাই ; (২ গোষ্ঠীগত স্বাধিকার চাই ; (৩) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বযুক্ত রাষ্ট্রের উপযোগিতা স্বীকার্য

॥ লোকায়ত সার্বভৌমত্ব ॥

লোকায়ত সার্বভৌমত্ব মতবাদের (Theory of Popular Sovereignty) মূল কথা জনগণের হাতে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকার যুক্তিটি মেনে নেওয়া। মধ্যযুগে ইতালীর পাদুয়ায় মারসিগ্‌লিও (Marsiglio of Padua),সল্‌স্‌বেরীর জন্ (John of Salisbury), অক্‌হামের উইলিয়াম্ (William of Ockham), পরে জন্ লক্ (John Locke) এই মত সমর্থন করেছেন। কিন্তু বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক **রুশোই** হলেন এই মতের প্রধান সমর্থক। আধুনিক যুগে রিচি (Ritchie)ও এই মত সমর্থন করেন। সাধারণভাবে এই লেখকদের মত হল এই যে, জনগণই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতার মূল উৎস এবং তাদের কাছ থেকে এই সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা যায় না। লকের মতে, সার্বভৌম রাজা নিয়মতান্ত্রিক শাসক, তিনি জনগণের স্বার্থের বিরোধী হলে তাঁরা তাঁকে পদচ্যুত করার অধিকারী।

লোকায়ত সার্বভৌমত্বের মধ্যযুগীয় সমর্থকগণ

রুশোর মতে রাষ্ট্র সকলেরই কল্যাণসাধনের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। তাই রাষ্ট্রের ইচ্ছার অর্থাৎ তার সার্বভৌম শক্তির প্রকাশে সর্বসাধারণের সমান অধিকার। অর্থাৎ, সকলে সমষ্টিগতভাবে সার্বভৌম শক্তির প্রয়োগকর্তা।

রিচি বলেছেন যে, আধুনিক গণতন্ত্রেও জনগণ তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করে। প্রত্যক্ষভাবে এই ক্ষমতা প্রয়োগের নজির মেলে সুইজারল্যাণ্ডের মত প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে। এখানে গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative), পদচ্যুতি (Recall) প্রভৃতির দ্বারা জনগণ নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বাক্ষরের ভিত্তিতে আইনের খসড়ার ওপর ভোট নেয়, নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং অবাঞ্ছিত বিধায়কদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। পরোক্ষভাবে লোকায়ত সার্বভৌমত্বের

রিচির বক্তব্য

বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় জনসভা, সংবাদপত্র, বিপ্লব প্রভৃতি জনমত প্রকাশের সুসংগঠিত মাধ্যমগুলির মধ্যে। জনমত বিপ্লবমুখী হলে সার্বভৌম শক্তিকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

লোকায়ত সার্বভৌমত্ব সূক্ষ্ম আইনের বিচারে সার্বভৌমত্বই নয়। অস্টিন সার্বভৌমত্বের যে চুলচেরা আইনানুগ বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে সার্বভৌমত্বের কোন বৈশিষ্ট্যই সঠিকভাবে লোকায়ত সার্বভৌমত্বের মধ্যে পাওয়া যায় না। অস্টিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সার্বভৌমত্ব হল কোন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের সর্বশক্তিমান ইচ্ছাশক্তি। কিন্তু লোকায়ত সার্বভৌমত্বে এই ক্ষমতা বিশাল, অনির্দিষ্ট জনমণ্ডলীর বহু ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী ইচ্ছাশক্তির ঘাত-প্রতিঘাতমাত্র।

অস্টিনের মতের ও লোকায়ত মতের মধ্যে পার্থক্য

রুশো জনগণের সমষ্টিগত মঙ্গলভাবনাকে রাষ্ট্রের সাধারণ ইচ্ছাশক্তি (General Will) বলেছেন। এই শক্তিকেই তিনি সার্বভৌমত্বের অধিকারী বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সমাজের কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও যদি এই শক্তি মান্য না করে, তবে তিনি এই শক্তি অপরকে মান্য করতে বাধ্য করাবার কর্তব্য সম্বন্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠদের অবহিত করেছেন। রুশোর সাধারণ ইচ্ছাশক্তির তত্ত্ব এই পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে দাঁড়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠের কঠোর দমন-পীড়ন। জনগণের বিপ্লব একটা রাজনৈতিক ঘটনা। তাকে সার্বভৌমত্বের প্রকাশ বলা চলে না, কারণ সার্বভৌমত্ব আইনগত ধারণা। তা ছাড়া সার্বভৌম শক্তি সংগঠিত ও সুনির্দিষ্ট জনশক্তি, তা নয়। "জনগণ" কথাটি খুবই অস্পষ্ট। তাই গার্নার (Garner) লোকায়ত সার্বভৌমত্বকে বিভ্রান্তিকর বলে সমালোচনা করেছেন।

রুশোর সাধারণ ইচ্ছাশক্তির তত্ত্বঃ তার সমালোচনা ঃ গার্নারের মত

তবে আধুনিক গণতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার অবশ্যই স্বীকার করে নেওয়া হয়। সেই অর্থে রিচির লোকায়ত সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব কিছুটা বাস্তবধর্মী এবং গণতান্ত্রিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় যে, নির্বাচকমণ্ডলী মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ এবং তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের স্বারা গঠিত সংসদ বা (পার্লামেণ্ট) সেই অর্থে সমগ্র জনসমষ্টির একটি সীমিত অংশের সার্বভৌমত্বের প্রকাশক।

লোকায়ত সার্বভৌমত্বের বর্তমান তাৎপর্য—সার্বিক ভোটাধিকারের স্বীকৃতি

১৭৭৬ সালে মার্কিন উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পরে জয়ী হয়ে তারা স্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করে। ১৭৮৯ সালে ফরাসী জনগণ স্বৈরাচারী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে, ফরাসীদেশে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পতন সূচিত হয় এবং সেখানে সর্বপ্রথম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকের মতে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকায় ও ফরাসীদেশে এ দুটি জনবাদী আন্দোলনের ("Populist movement") ওপর লোকায়ত সার্বভৌমত্ব বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সুতরাং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রে বা প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার ক্ষেত্রে,

১৭৭৬ সালের মার্কিন উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ ও ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের ওপর লোকায়ত সার্বভৌমত্বের প্রভাব

গণতন্ত্রের আদর্শকে প্রসারিত ও প্রোজ্জ্বল করে তুলতে এবং সাম্রাজ্যবাদের অবলোপের ক্ষেত্রে লোকায়ত সার্বভৌমতত্ত্বের বিরাট, চিরস্থায়ী ভূমিকা রয়েছে, সন্দেহ নেই।

॥ সার্বভৌমত্বের কতকগুলি বিশেষ রূপ ॥

(১) আইনানুমোদিত বনাম নামমাত্র বা উপাধিসূচক বা নামসর্বস্ব সার্বভৌমত্ব

(১) যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইনের চোখে অর্থাৎ সাংবিধানিক দিক দিয়ে বিচার করলে সার্বভৌম বলে স্বীকার্য, তাকে আইনানুগ বা আইনসঙ্গত বা **আইনানুমোদিত সার্বভৌম** (Legal বা De jure Sovereign) বলে ধরে নেওয়া হয়। ইংলণ্ডে সপরিষদ রাজা (অথবা রাণী) (the Crown-in-Parliament) আইনানুগ সার্বভৌম। রাজা বা রাণী মন্ত্রিসভার কর্তৃত্বে ইংলন্ডে সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ করেন। পূর্বের স্বৈরাচারী রাজশক্তি এখানে নিয়মতান্ত্রিক রাজশক্তিতে পরিণত হবার ফলে ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী প্রকৃতপক্ষে **নামমাত্র উপাধিসূচক বা নামসর্বস্ব সার্বভৌম** (Titular Sovereign)। কিন্তু আইনসভাই প্রকৃত সার্বভৌম (Actual Sovereign অথবা De facto Sovereign)। স্বৈরাচারতন্ত্রে বাস্তবে স্বৈরাচারী শাসকই একাধারে আইনানুগ এবং প্রকৃত সার্বভৌম।

(২) রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব

(২) সাধারণতঃ আইনসঙ্গত সার্বভৌম শক্তির পশ্চাতে যে সার্বভৌম শক্তি প্রভাব বিস্তার করে, তাকেই **রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব** (Political Sovereignty) বলে। আজকাল সভ্য রাষ্ট্রমাত্রেই গণতান্ত্রিক প্রথায় পরিচালিত। তাই সাধারণ অর্থে কোনও দেশের বিরাট নির্বাচকমণ্ডলী (Electorate) যখন ভোটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত করেন, তখন তাঁরাই হলেন রাজনৈতিক সার্বভৌম।

রিচির বক্তব্য

রিচি (Ritchie) বলেন যে, অনেক সময় দেশের নির্বাচকগণের রাজনৈতিক সচেতনতা তেমন সুস্পষ্ট না থাকায় সেখানে আইনসঙ্গত সার্বভৌমকে তাঁরা মেনে চলেন না। তা ছাড়া, রিচির মতে এ দুটির মধ্যে সূক্ষ্মভাবে সীমারেখা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু সেজন্য রাষ্ট্রিক সার্বভৌমকে মোটেই উপেক্ষা করা চলে না। রাষ্ট্রিক সার্বভৌমত্বের হয়ত একটা বিশিষ্ট, সাধারণ রূপ সব সময়ে সব দেশে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রসিদ্ধ ইংরেজ আইনবিদ্ ডাইসি (Dicey) বলেছেন যে, বহু ক্ষেত্রে আইনসঙ্গত সার্বভৌম রাষ্ট্রিক সার্বভৌমের কাছে মাথা নত করেন। আইনগত সার্বভৌম এবং রাষ্ট্রিক সার্বভৌমের মধ্যে সংঘর্ষের চরম পরিণতি হল বিপ্লব। তার ফলে রাষ্ট্রিক সার্বভৌম শেষ পর্যন্ত জয়ী হন। তাই রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বকে অনেকে জনমত বলে অভিহিত করেন।

(৩) কোন কোন রাজনীতিবিদ্ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের দুটি দিক উদ্ঘাটিত করেন। একটি হল **আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব** (internal sovereignty), অপরটি **বাহ্য সার্বভৌমত্ব** (external sovereignty)। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়

সার্বভৌমত্বের অর্থ হল—রাষ্ট্রের আইনকানুন তার অধিবাসীগণ মানতে বাধ্য, না মানলে রাষ্ট্র তাকে দণ্ড দিতে পারে। বাহ্য সার্বভৌমত্বের অর্থ হল যে, রাষ্ট্র অন্য কোনও রাষ্ট্র বা বৈদেশিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন আদেশ গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। অর্থাৎ, বাহ্য সার্বভৌমত্বকেই আন্তর্জাতিক আইনবিদ্‌গণ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বলে গণ্য করে থাকেন। লক্ষণীয় যে, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সার্বভৌমত্ব দুটিই খুব ব্যাপক ও চূড়ান্ত ক্ষমতা। কিন্তু এই ক্ষমতা রাষ্ট্র শেষ পর্যায়ে ব্যবহার করে।

(৩) আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সার্বভৌমত্ব : এ দুটির সীমাবদ্ধতা—এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইনবিদ্‌দের বক্তব্য : ভুটানের নজির

যেমন—আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত নাগরিককে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারে। তেমনি বাহ্য সার্বভৌমত্বের প্রকাশ দেখা যায় যখন কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে বা তার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আন্তর্জাতিক আইনবিদ্‌গণ মনে করেন যে, কোন রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সার্বভৌম হলেও তার বাহ্য সার্বভৌমত্ব না-ও থাকতে পারে। আশ্রিত বা রক্ষিত রাষ্ট্রের (Protectorate) ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে। ১৯৪৯ সালের চুক্তি (Indo-Bhutanese Treaty, 1949) অনুসারে, ভুটান ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের আশ্রিত রাজ্য। ফলে, এই চুক্তির শর্ত অনুসারে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভুটান সার্বভৌম, কিন্তু তার বাহ্য সার্বভৌমত্ব ভারতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাহ্য সার্বভৌমত্ব না থাকলেও রাষ্ট্র সম্পর্কে গার্নারের প্রচলিত সংজ্ঞা অনুসারে ভুটানকে "প্রায়-স্বাধীন" রাষ্ট্র ("independent or nearly so") বলা যায় এবং অতি-আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে ভুটানের বিশেষ পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও তাকে "রাষ্ট্রতুল্য" প্রতিষ্ঠান বলতে বাধা নেই, কেননা এ ধরণের আইনগত জটিলতার মীমাংসাও অতি-আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে সম্ভব। অতএব বলা যায় যে, রাষ্ট্রের বাহ্য সার্বভৌমত্ব একমাত্র আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

॥ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য ॥

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে অস্টিনের ধ্রুপদী সংজ্ঞা থেকে সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়। (১) সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের মৌলিক শক্তি, পূর্ণ, অসীম, নিরঙ্কুশ ও অনিয়ন্ত্রিত (original, complete, infinite and absolute)। এর ফলে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের তরফে সরকার যে সমস্ত আইনকানুন প্রণয়ন করে, নির্দেশ জারী করে, সেগুলি চালু রাখতে ও বলবৎ করার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, ব্যক্তি সেগুলি মানতে বাধ্য।

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য : (১) মৌলিকতা, পূর্ণতা, অসীমতা

সেগুলি না মানলে সে রাষ্ট্রের দণ্ড লাভ করে। বাহ্য ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের চরমতা প্রমাণিত হয় যখন দেখা যায় যে, এই শক্তির দ্বারা বলীয়ান্ হয়েই রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে, সন্ধিস্থাপন করতে পারে, কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।

কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিশেষ অর্থে সীমাবদ্ধ। প্রথমতঃ, ব্লুনট্‌শ্লি ও বার্কার মনে করেন যে, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব তার নিজস্ব প্রকৃতি, কর্মপদ্ধতি, জনমত এবং নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত বিধিগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দ্বিতীয়তঃ, কেল্‌সেন্‌ প্রমুখ আন্তর্জাতিক আইনবিদ্‌গণের মতে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা সীমিত। পৃথিবীর অন্য রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক নীতি, বিশেষতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত রাশিয়া, চীনা প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তির বৈদেশিক কার্যক্রম, বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির জনমত ইত্যাদি ক্ষেত্রবিশেষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের বাহ্য সার্বভৌমত্বের নিয়ন্ত্রক। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সাবভৌমত্ব শুধু চরম পর্যায়ে ব্যবহৃত ক্ষমতা। নাগরিকগণ নিয়মানুগ হলে ও রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, নিয়মকানুন মেনে চললে রাষ্ট্রের পক্ষে এই চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করার প্রয়োজন না-ও হতে পারে। চতুর্থতঃ, হেন্‌রি মেনের মতে, আইন-বহির্ভূত নৈতিক বিষয়গুলি রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির দ্বারা মীমাংসিত হতে পারে না। যেমন—অশ্লীল সাহিত্য বা বিজ্ঞাপন প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার প্রশ্ন। পঞ্চমতঃ, মেন্‌ বলেন যে, প্রথাগত রীতিনীতি, আইনকানুন রদবদলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সীমিত। তাই দেখা যায় যে, নাগা প্রভৃতি ভারতের উপজাতীয় সমাজে (tribal society) প্রচলিত রীতিনীতি রদবদলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হয়। ষষ্ঠতঃ, উইলোবি ও জেলিনেক্‌ (Jellinek) মনে করেন যে, সাংবিধানিক আইনকানুন (Constitutional Law) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রিত করে না, কারণ এই আইনকানুন রাষ্ট্র তার সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ করে নিজেই ইচ্ছামত পরিবর্তিত করতে পারে। কিন্তু সেদিক থেকে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্বনিয়ন্ত্রিত (auto-regulated)।

কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগত সার্বভৌমত্ব কিভাবে সীমাবদ্ধ—আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ; নীতিগত বিধানের ক্ষেত্রে ; স্বনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে

(২) রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অনন্ত, সর্বজনীন ও ব্যাপক (infinite, universal, comprehensive)। এর অর্থ — রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম শক্তির ঊর্ধ্বে অন্য কোন শক্তি না থাকার ফলে রাষ্ট্রীয় এলাকার মধ্যে সমস্ত ব্যক্তি, ব্যক্তিসংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ওপর সার্বভৌম শক্তির কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সার্বভৌমত্বের সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, রাষ্ট্র যথেচ্ছভাবে তার সার্বভৌমত্বকে ব্যক্তি বা সংস্থার ওপর চাপিয়ে দিতে পারে না। সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই আইনের অনুমোদন দরকার হয়। দ্বিতীয়তঃ, কেল্‌সেনের মতে, আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সীমিত। যেমন, ১৯৬১ সালের ভিয়েনা চুক্তির (Vienna Convention of 1961) ফলে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্থিত বৈদেশিক কূটনৈতিক প্রতিনিধি, দূতাবাস ইত্যাদি সম্পর্কে সুদীর্ঘকাল ধরে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও বোঝাপড়ার খাতিরে আন্তর্জাতিক আইনের যে প্রথাগত বিধিগুলি গড়ে উঠেছে,

(২) সার্বভৌমত্বের সর্বজনীনতা ও ব্যাপকতা ঃ তার সীমাবদ্ধতা—আইনের অনুমোদনগত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রগত

সেগুলি চূড়ান্ত রূপ লাভ করল। তার ফলে এগুলির ওপর রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করা চলে না। অনুরূপভাবে বিদেশের রাষ্ট্রপ্রধান, বিদেশী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন জাহাজ ও বিদেশী সৈন্যগণও আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাদের নিজ রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রের অধীন নয়।

(৩) রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল তার চিরস্থায়িত্ব (Stability)। যতদিন কোন রাজনৈতিক সংগঠন সার্বভৌম শক্তির অধিকারী,কেবল ততদিনই সে রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হয়। পূর্বে কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে যুদ্ধে পরাজিত করে নিজের এলাকার অন্তর্ভুক্ত করলে অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটত। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে (U. N. Charter) এ ধরনের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী কার্যকলাপকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। সনদে বলা হয়েছে যে, সনদস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য চুক্তিবন্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকা (South Africa) যখন দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার (South West Africa) ভূখণ্ড নিজের এলাকাভুক্ত করার চেষ্টা করেছিল, তখন আন্তর্জাতিক আদালত (World Court) সেই অপচেষ্টাকে বেআইনী ঘোষণা করে। সত্তর দশকের মামলাটির এই রায় সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা রোধের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার জনগণ বর্তমানে নামিবিয়া (Namibia) নামে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য গণসংগ্রামে লিপ্ত।

(৩) চিরস্থায়িত্ব : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের নির্দেশ ; নামিবিয়া সংক্রান্ত মামলায় আন্তর্জাতিক আদালতের রায়

(৪) অ-হস্তান্তরযোগ্যতা (Inalienability) রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লিবেয়ার (Lieber) বলেছেন যে, গাছ যেমন তার শাখা-প্রশাখা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, রাষ্ট্রও তেমনি তার সার্বভৌমত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। একমাত্র স্বেচ্ছায় নিজের বিলুপ্তিসাধন না ঘটালে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হয় না। ফলে, তার সার্বভৌমত্ব কখনই হস্তান্তরযোগ্য হতে পারে না। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের হস্তান্তরিত হওয়া তার পক্ষে আত্মহননেরই সমতুল্য।

(৪) অ-হস্তান্তরযোগ্যতা : লিবেয়ারের মত

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক ছিল চরম রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের যুগ। চরম রাজতন্ত্রের সমর্থনে তখন ইংরেজ দার্শনিক হবস্ প্রচার করেন যে, সমাজের শুরুতে সার্বভৌম শক্তি জনগণের কর্তৃত্বাধীন ছিল, রাষ্ট্র গঠিত হবার পর এই শক্তি চরম রাজতন্ত্রের মহানায়ক রাজার কাছে হস্তান্তরিত হল। কিন্তু লোকায়ত সার্বভৌমত্বের সমর্থক রুশো এই মতের বিরোধিতা করেন। আধুনিক যুগ গণতন্ত্রের, প্রজাতন্ত্রের যুগ। সুতরাং এ যুগের জনপ্রতিনিধিগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার কখনও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে হস্তান্তরিত করতে চাইবে না।

১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর ঘটনাবলী : হবসের মতে সার্বভৌমত্ব রাজার হাতে হস্তান্তরিত হয়েছিল

লক্ষণীয় যে, সার্বভৌম সংস্থা হিসাবে রাষ্ট্র নিজের ভূখণ্ডের কোন অংশ চুক্তির দ্বারা অন্য রাষ্ট্রকে সমর্পণ করতে পারে। কিন্তু এর দ্বারা সার্বভৌম শক্তির হস্তান্তর বোঝায় না। ভারত সরকার পাকিস্তানের কাছে চুক্তির মাধ্যমে বেরুবাড়ী হস্তান্তর করেছিল, কিন্তু এর ফলে তার সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরিত হয় নি।

চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র তার ভূখণ্ড অন্য রাষ্ট্রকে দিলে সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরিত হয় না—বেরুবাড়ী

কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনে এমন অনেক ঘটনার নজির দেখানো যায় যেখানে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম শক্তি হস্তান্তরযোগ্য বলে মনে হয়। এই ধরনের পরিস্থিতিও অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমন—১৯৪৯ সালের চুক্তি (Indo-Bhutanese Treaty, 1949) অনুসারে ভুটানের বাহ্য সার্বভৌমত্ব ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের কাছে হস্তান্তরিত হল। ফলে ভুটান আন্তর্জাতিক আইনের বিচারে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত না থাকলেও গার্নারের ভাষায় "প্রায়-স্বাধীন" ("independent or nearly so") বলে পরিগণিত।

কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তির ফলে সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরযোগ্য ঃ ভুটানের নজির ঃ আন্তর্জাতিক আইনে এটা অবৈধ নয়

(৫) রাষ্ট্রিক সার্বভৌমত্বকে অখণ্ড, অবিভাজ্য (total, indivisible) বলা হয়। রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনগণের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য সরকারের মারফত রাষ্ট্রকে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়। এইভাবে আইন অনুযায়ী সংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ জনসমাজরূপে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

(৫) অখণ্ডতা, অবিভাজ্যতা ঃ রাষ্ট্রের সংহতি বজায় রাখার জন্যই সার্বভৌমত্ব

আধুনিক যুগে বহুত্ববাদী সার্বভৌমত্বের সমর্থকগণ (Pluralists) রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে বিভাজ্য বলে স্বীকার করতে বলেছেন। রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত অসংখ্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষামূলক সংস্থা আছে। তাঁরা সেগুলিকে স্বশাসনের অধিকার (autonomy) দেবার পক্ষপাতী। তাঁরা মনে করেন যে, এইভাবে একটা বহুসাংস্কৃতিক সমাজ (culturally pluralist society) গঠন করা সম্ভব ও সমীচীন। কিন্তু বহুত্ববাদীদের এই যুক্তিকে অবাস্তব বলা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ও সংস্থার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য, তাদের মধ্যে সংহতি (co-ordination) বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের মত একটি সর্বোচ্চ সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজনীয়তা ল্যাস্কি, বার্কার প্রমুখ বহুত্ববাদীগণও স্বীকার করেছেন। রাষ্ট্র সমাজের সকলের অভিভাবকস্বরূপ ("common guardian of the community"), রাজনীতির খেলায় যেন একজন নিরপেক্ষ বিচারক ("neutral referee in the game of politics")। সুতরাং বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রিক সার্বভৌমত্বকে বিভাজ্য বলা চলে না, বলা উচিতও নয়।

বহুত্ববাদীদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিভাজ্য ; কিন্তু তাঁদের মত অবাস্তব বলে পরিত্যক্ত

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্যের সরকারের মধ্যে সার্বভৌমত্ব বিভক্ত থাকে—এ ধারণা নিতান্ত ভুল। যুক্তরাষ্ট্রে উভয় প্রকার সরকারের মধ্যে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সরকারী ক্ষমতা বণ্টিত হয়, সার্বভৌমত্ব বণ্টিত হয় না। সরকার ও রাষ্ট্র দুটির মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে সকলের সচেতন থাকা দরকার। ফলে, প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অর্থও ভিন্ন। শাসনতন্ত্রবিদ্‌গণের মতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধানকে সার্বভৌম বলার অর্থই হল এ ক্ষেত্রে কেন্দ্র বা অঙ্গরাজ্য কাউকেই সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে সার্বভৌমত্বের অধিকারী না বলা ও সংবিধানের মত একটি অখণ্ড ব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্রের অবিভাজ্য সার্বভৌমত্বের আধার ও প্রতীক বলে ধরে নেওয়া।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নজির ঃ সেখানে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতার বণ্টনের অর্থ সার্বভৌমত্বের বিভাজন নয়; যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই সার্বভৌম

॥ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ঃ মার্ক্‌স্‌বাদী বিশ্লেষণ ॥

মার্ক্‌স্‌, এঙ্গেল্‌স্‌, লেনিন্‌ প্রভৃতি সমাজতন্ত্রবাদীগণ মনে করেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সমর্থনে যে ধ্রুপদী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তার দ্বারা বুর্জোয়া পুঁজিপতিগণ (Bourgeois capitalists) সর্বহারাদের (Proletariat) ওপর তাদের শোষণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দান, নানাপ্রকার অর্থনৈতিক সংস্কার ইত্যাদি তথাকথিত জনকল্যাণকর প্রকল্পের দ্বারা উদারপন্থী গণতন্ত্রের (Liberal Democracy) নেতারূপে পুঁজিপতিগণ তাদের শ্রেণীস্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহারের চেষ্টা করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, কলকারখানার ওপর পুঁজিপতিদের একচেটিয়া মালিকানার কর্তৃত্ব-লাভ ইত্যাদি ঘটনাকে মার্ক্‌স্‌বাদীরা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে তাঁদের যুক্তির তথ্যভিত্তিক প্রমাণ বলে হাজির করেন।

মার্ক্‌স্‌বাদীগণ রাষ্ট্রের উচ্ছেদ চান, কারণ সার্বভৌমত্বের ধ্রুপদী ব্যাখ্যার রাষ্ট্রযন্ত্রকে বুর্জোয়া শ্রেণী সর্বহারার শোষণে ব্যবহার করতে পারে

কিন্তু ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে বুর্জোয়া ও সর্বহারার মধ্যে বৈপ্লবিক সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিপ্লবের দ্বারা মেহনতী মানুষ সংগঠিতভাবে ধনতান্ত্রিক কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ সার্বভৌম রাষ্ট্রের উচ্ছেদ (the State "withers away") করে এবং বিপ্লবোত্তর কালে শ্রেণীবিহীন সাম্যবাদী সমাজ স্থাপন করে। এর নাম "সর্বহারার একনায়কতন্ত্র" (Dictatorship of the Proletariat)। এই সমাজব্যবস্থা রাষ্ট্রবিহীন (Stateless), এখানে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রপ্রবণতার নীতি (Democratic Centralism) গ্রাহ্য হয়। কারণ শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণই এই সমাজব্যবস্থার সর্বময় পরিচালক।

রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ধনতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার ফলে অবশ্যম্ভাবী

আন্তর্জাতিক দিক থেকেও মার্ক্‌স্‌বাদীগণ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বদলে

আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদী আন্দোলনের সফল পরিণতিস্বরূপ একটি বিশ্বসাম্যবাদী শ্রমিকসংস্থার সর্বময় কর্তৃত্বকে মেনে নিতে চান। লেনিন্, স্তালিন্, ব্রেঝনেভ্ প্রভৃতি মার্ক্স্‌বাদী নেতাগণ এই সাম্যবাদী দৃষ্টি থেকেই আধুনিক যুগের আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির পর্যালোচনা করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, সারা দুনিয়ায় পুঁজিপতিগণ যতই আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে (International Bourgeoisie) সংগঠিত হতে থাকবে, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণীও শ্রেণীগত সহধর্মিতার ফলে বিশ্বশ্রমিক-শ্রেণীরূপে (International Proletariat) ততই সংগঠিত হতে থাকবে। ফলে ভবিষ্যতে পুঁজিবাদী শ্রেণীর দ্বারা তাদের একচেটিয়া শ্রেণীস্বার্থে পরিচালিত সার্বভৌম রাষ্ট্রের বদলে সার্বভৌম বিশ্বশ্রমিক সমাজ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সার্বভৌম রাষ্ট্রের বদলে মার্ক্স্‌বাদীগণ চান সার্বভৌম বিশ্বশ্রমিকসমাজ

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ধ্রুপদী ব্যাখ্যার এই সমালোচনা করে মার্ক্স্‌বাদীগণ যে বক্তব্য পেশ করেছেন, তা এখনও কার্যকর হতে পারে নি। তাঁরা বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে ও তাদের আক্রমণ থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিপ্লবোত্তর সময়ের ঠিক পরেই কম্যুনিস্ট্ দেশগুলিতে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটে নি। বরং এই দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রপ্রবণতার (Democratic Centralism) মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্বে ও নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্রের হাতে একচ্ছত্রভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। রাষ্ট্রের অবলুপ্তি সেখানে এখনও ঘটে নি, রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটেছে ও ঘটছে।

উপসংহার ঃ কিন্তু সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলির আত্মরক্ষার তাগিদে ও শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য গণতান্ত্রিক কেন্দ্রপ্রবণতার ফলে সেখানে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি এখনও ঘটে নি, রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটেছে ও ঘটছে

সারাংশ

সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা। সার্বভৌমত্বের দুটি দিক—আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক। বোদ্যাঁ ও হুগো গ্রোটিয়াস্ যথাক্রমে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সার্বভৌমত্বের দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

অস্টিনের মতে, অপরের বশ্যতা স্বীকার করেন না অথচ দেশের সকলের মান্যতা লাভ করেন—এ ধরনের চরম ক্ষমতাই "সার্বভৌমত্ব" এবং এরকম শক্তিসম্পন্ন জনসমাজ রাজনৈতিক অর্থে "রাষ্ট্র।"

অস্টিনের মতের সমালোচনা—(১) হেন্‌রি মেন্ বলেন যে, অস্টিন্ প্রথাগত বিধানের গুরুত্ব স্বীকার করেন নি। (২) সার্বভৌম শক্তি সব সময় নির্দিষ্ট নাও হতে পারে। (৩) সার্বভৌমত্বের নৈতিক ব্যাখ্যাও দরকার। (৪) ল্যাস্কি, বার্কার প্রভৃতি বহুত্ববাদীদের মতে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ক্ষেত্রেই সার্বভৌমত্ব বিভাজ্য।

উপসংহার ঃ হিতবাদী অস্টিন্ সার্বভৌমত্বের গণতান্ত্রিকতা অস্বীকার করেন নি। রাষ্ট্রের সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাঁর আইনগত তত্ত্ব গ্রাহ্য। বহুত্ববাদীগণ সাধারণভাবে অস্টিনের একত্ববাদী মতের কেন্দ্রপ্রবণতার বিরোধী। অর্থনৈতিক যুক্তির সাহায্যে তাঁরা বলেন যে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বেশী থাকলে ব্যক্তি-

স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। তাঁদের সমাজতাত্ত্বিক যুক্তি হল—সমাজবদ্ধ ব্যক্তির বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য সমস্ত স্বেচ্ছামূলক সংস্থাকে স্বশাসনের—অধিকার দেওয়া দরকার। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ল্যাস্কির মতে সার্বভৌম রাষ্ট্র বিশ্বশান্তির পরিপন্থী। তাই তিনি বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক।

বহুত্ববাদী সার্বভৌম তত্ত্বের সমালোচনা—(১) রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও ব্যক্তির আনুগত্য এক নয়। (২) রাষ্ট্র ও ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্র ও সংস্থা পরস্পর প্রতিযোগী নয়, সহযোগী। (৩) রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণ ও নীতিপ্রয়োগ প্রণালী দুটি পৃথক। (৪) রাষ্ট্র হল রাজনৈতিক খেলার নিরপেক্ষ বিচারক (রেফারী), বা সমাজের শীর্ষস্থিত সাধারণ অভিভাবক। (৫) বহুত্ববাদীগণ আধুনিক রাষ্ট্রের জনকল্যাণ-কর দিক সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত। (৬) হয়্যার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের মতে আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রগুলি প্রায়ই কেন্দ্রপ্রবণ।

বহুত্ববাদীদের যুক্তির মূল্যায়ন—ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও গোষ্ঠীগত স্বাধিকার চাই। বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রও দরকার।

লোকায়ত সার্বভৌমত্ব মধ্যযুগের রাজনীতিবিদ্‌গণ সমর্থন করেন। তবে পরবর্তীকালে লক্‌ ও রুশোর নাম এবং আধুনিক যুগে রিচির নাম এই মতের সমর্থকরূপে উল্লেখযোগ্য। রুশো জনগণকে রাষ্ট্রীয় সাধারণ ইচ্ছাশক্তির অধিকর্তারূপে লোকায়ত সার্বভৌমত্ব সমর্থন করেন। রিচি সুইজারল্যান্ডের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে এই মতের নজির দেখেছেন।

লোকায়ত সার্বভৌমত্ব আইনের সূক্ষ্ম বিচারে—সার্বভৌমত্বই নয়। রুশোর সাধারণ ইচ্ছাশক্তির তত্ত্ব কার্যতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের সার্বভৌমত্বকেই বোঝায়। তবে এই মত সার্বিক ভোটাধিকারের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে অগ্রগামী করে দিয়েছে। মার্কিন উপনিবেশগুলির স্বাধীনতাসংগ্রাম (১৮৭৬) ও ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) এই মতের দ্বারা প্রভাবিত।

সার্বভৌমত্বের কতকগুলি বিশেষ রূপ উল্লেখযোগ্য। যেমন—(১) আইনানুমোদিত, নামমাত্র বা নামসর্বস্ব বা উপাধিসূচক সার্বভৌম। (২) রাজনৈতিক সার্বভৌম। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সার্বভৌম—ভারত-ভুটান চুক্তির (১৯৪৯) তাৎপর্য।

সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য—(১) মৌলিকতা, পূর্ণতা, অসীমতা। কিন্তু আভ্যন্তরীণ, আন্তর্জাতিক, নীতিগত ও স্বনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব সীমিত। (২) সর্বজনীনতা ও ব্যাপকতা—কিন্তু আইনের, বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব সীমাবদ্ধ। (৩) চিরস্থায়িত্ব—এ বিষয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের বক্তব্য ও নামিবিয়া মামলায় আন্তর্জাতিক আদালতের রায়। (৪) অ-হস্তান্তর-যোগ্যতা—লিবেয়ারের মত। চুক্তি করে অন্য রাষ্ট্রকে ভূখণ্ড দিলে সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরিত হয় না—বেরু-বাড়ীর নজির। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ভারতের কাছে তার আশ্রিত রাষ্ট্র ভূটানের সার্বভৌমত্ব অছি রাখা অবৈধ নয়। (৫) অখণ্ডতা, অবিভাজ্যতা, রাষ্ট্রের সংহতি বজায় রাখার জনাই সার্বভৌমত্ব। বহুত্ব-বাদীদের মতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব বিভাজ্য। কিন্তু তাঁদের মত অবাস্তব বলে পরিত্যক্ত। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতার বণ্টনের অর্থ সার্বভৌমত্বের বিভাজন নয়। যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই সার্বভৌম।

মার্ক্সবাদীগণের বিশ্লেষণ অনুযায়ী সার্বভৌমত্বের ধ্রুপদী সংজ্ঞা বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণীকে সর্বহারাদের শোষণের জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করতে সাহায্য করেছে। তাই মার্ক্সবাদীগণ রাষ্ট্রের উচ্ছেদ চান। তাঁদের মতে ধনতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার ফলে রাষ্ট্রের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মার্ক্স-বাদীগণ সার্বভৌম রাষ্ট্রের বদলে চান সার্বভৌম বিশ্বশ্রমিকসমাজ। কিন্তু সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলির আত্ম-রক্ষার তাগিদে ও শ্রমিকদের স্বার্থে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রপ্রবণতার (Democratic Centralism) ফলে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিতে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি এখনও ঘটে নি, রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটেছে ও ঘটছে।

৪ রাষ্ট্রের উদ্ভব : কয়েকটি মতবাদ

"Underlying all other elements in State formation including kinship and religion, is political consciousness, the supreme element."
—Gilchrist

মানুষের চরিত্রে দুটি প্রবণতার দ্বন্দ্ব দেখা যায়—বিচ্ছিন্নতা এবং সঙ্ঘবদ্ধতা। আদিম মানুষ ক্রমশঃ নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে শিখল যে, বিচ্ছিন্ন জীবন তার কাম্য নয়। সমাজে পাশাপাশি সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করেই তার ব্যক্তিজীবনকে উন্নত করে তুলতে হবে। ফলে সঙ্ঘবদ্ধতার ঝোঁক তাকে গোষ্ঠীবদ্ধ, সমাজবদ্ধ করে তুলল। তাই আরিস্টটল্ বলেছেন যে, স্বাভাবিক কারণেই মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সঙ্ঘবদ্ধতার ঝোঁকই তাকে ক্রমশঃ অসংখ্য স্বেচ্ছামূলক সংস্থা, প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে প্রবৃত্ত করল। রাষ্ট্রও এইরকম ধীরে-ধীরে-গড়ে-ওঠা সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

মানুষ স্বভাবতঃই সামাজিক জীব, তার গোষ্ঠীপ্রীতির জন্যই সে সঙ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্গে সামিল হল

কিভাবে রাষ্ট্র ক্রমশঃ পরিণত হল, তা জানার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ছাড়াও নৃতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকগণের কৌতুহলের অন্ত নেই। কারণ, রাষ্ট্রের পরিণতিলাভের ইতিহাস মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা, আজ্‌টেক্ ও সুমেরীয়, গ্রীক-রোমান সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে হাজার হাজার বছর আগের মানবসভ্যতার নানা নিদর্শন চোখে পড়ে। সে যুগের ঘরবাড়ী, স্নানাগার দেখে তখনকার স্থাপত্য ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে জানা যায়, মঠ, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ থেকে প্রাচীন মানুষের ধর্মীয় জীবনের পূর্বাভাস মেলে, গুহা বা দেয়ালের কারুকার্য থেকে সে সময়ের মানুষের শিল্পবোধ, লিপিকুশলতা সম্বন্ধে জানা যায়। ফসিল্ বা জীবাশ্ম থেকে তখনকার যুগের নরনারীর শারীরিক গঠন ইত্যাদি বোঝা যায়। এ থেকেই জানা যায় যে, মানুষ আদিম যুগ থেকেই নিজের জীবনকে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সঙ্গে একাকার করে গড়ে তুলেছে। সমাজের সার্বিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সে নিজেকে অভিন্ন বলে মনে করেছে। তার মধ্যে ঐক্যমুখী হবার একটা সচেতনতা বেশ লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক সচেতনা (Political consciousness) মানুষের ঐক্যমুখী, সমাজমুখী হবার সর্বাত্মক সচেতনতার একটা নিদর্শন। এই রাজনৈতিক সচেতনাই মানুষকে

রাষ্ট্রের উদ্ভব ব্যাখ্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও ইতিহাসের যৌথ ভূমিকা : মহেঞ্জোদরো, হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ অতীত সভ্যতার নিদর্শন ; তার সাক্ষ্যপ্রমাণ পুরাকালের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের মানুষের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের খণ্ড খণ্ড পরিচিতি

স্বাভাবিকভাবে ধীরে ধীরে "রাষ্ট্র" নামক একটা সর্বজনীন, কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সাহায্য করল।

নৃতত্ত্ব (Anthropology), প্রাচীন ইতিহাস (Ancient History), প্রত্নতত্ত্ব বা পুরাতত্ত্ব (Archaeology) ইত্যাদির সাহায্যে সমাজের বিবর্তনে (social evolution) রাষ্ট্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের (origin and development of the State) ব্যাখ্যা করা হয়। বলা বাহুল্য, সমাজবিজ্ঞানের এই শাখাগুলির আলোচনায় অনেক সময় তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধানের ক্ষেত্রে বাহ্য নিদর্শন ইত্যাদি ছাড়াও বেশ কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। তবে অতীত যুগের মানব-সভ্যতার বাহ্য নিদর্শন থাকার ফলে এ ক্ষেত্রে সমাজ-বিজ্ঞানীর কল্পনা বাহ্য বাস্তবতাকে উপেক্ষা করতে পারে না। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও তার ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করার সময়েও তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণকে বহু ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যুক্তির সঙ্গে কল্পনা বা অনুমানকে মিশ্রিত করে নিতে হয়। ফলে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মতবাদগুলি গড়ে উঠেছে, সেগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, অনুমানভিত্তিক মতবাদ (speculative theory); দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানভিত্তিক মতবাদ (scientific theory)। বিধাতৃবিধানের তত্ত্ব (Theory of Divine Origin), শক্তিবাদ (Force Theory) এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory) রাষ্ট্রের উদ্ভব ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কল্পনাশ্রয়ী মতবাদ। ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ (Historical বা Evolutionary Theory) রাষ্ট্রের উদ্ভব ও তার ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বিশ্লেষণ প্রণালী অনুসরণ করেছে। তাই এই মতটিকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক মতবাদ বলে।

ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান—সকলেরই বক্তব্য এক : সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে; এই উদ্ভব ব্যাখ্যার জন্য অনুমানভিত্তিক ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক দুরকম মতামত প্রচার করা হয়

॥ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ ॥

বিখ্যাত জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্লুনট্শ্লি (Bluntschli) রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনটি ঐতিহাসিক অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন—প্রাথমিক অবস্থা, মধ্য-অবস্থা, এবং বাহ্য-অবস্থা। প্রাথমিক অবস্থায় (Original stage) পূর্বে গঠিত কোন একটি সংস্থা থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। মধ্য-অবস্থায় (Secondary stage) বাইরের চাপে কোন একটি নির্দিষ্ট জনসমষ্টি রাষ্ট্র গঠন করে। বাহ্য-অবস্থায় (Derived stage) রাষ্ট্র গঠিত হয় সম্পূর্ণ বাইরের শক্তির দ্বারা।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্লুনট্শ্লির ৩টি ঐতিহাসিক অবস্থার বর্ণনা

ব্লুনট্শ্লি ঐতিহাসিক উদাহরণের সাহায্যে তাঁর বক্তব্য বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। রোম নগর যেভাবে রাষ্ট্রে পরিণত হয়, সেই গল্পের ওপর ভিত্তি করেই

তিনি রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক অবস্থার উদাহরণ দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় যেভাবে রাষ্ট্র গঠিত হয়, তাকে তিনি রাষ্ট্রগঠনের মধ্যাবস্থারূপে চিহ্নিত করেছেন। যখন কোন দেশ অন্যত্র উপনিবেশ স্থাপন করে, অথচ সেই উপনিবেশের শাসনতন্ত্রে বা সমাজব্যবস্থায় কোনরকম মৌল পরিবর্তন ঘটায় না, অথবা যখন জাতীয়তাবাদের মত বহির্মুখী কোন শক্তির চাপে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়, রাষ্ট্রগঠনের সেই অবস্থাকে ব্লুনট্শ্‌লি বাহ্য-অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্রগঠনের সাধারণ তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর এই পর্যালোচনাকে শুধু কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার বিচ্ছিন্ন বিবরণী বলে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এ ধরনের আলোচনার ওপর কোনরকম গুরুত্ব দিতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু ইতিহাসের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁর এই প্রচেষ্টা কিছুটা বিজ্ঞানসম্মত বলে নিশ্চয়ই অভিনন্দন পাবার যোগ্য।

ব্লুনট্শ্‌লির বর্ণনার ঐতিহাসিক মূল্য

॥ বিধাতৃবিধানের তত্ত্ব ॥

বাইবেলের প্রাচীন সংহিতায় (Old Testament) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিধাতৃবিধান তত্ত্ব (Theory of Divine Origin of the State) ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তখন থেকে ইউরোপ মহাদেশে প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই তত্ত্ব সমর্থিত হত। ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট্ বংশীয় (Stuart dynasty) এবং ফরাসীদেশের বুরবঁ বংশীয় (Bourbon dynasty) রাজারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বৈরশাসন সমর্থনের প্রধান যুক্তিরূপে এই তত্ত্বটি প্রচার করতেন। মধ্যযুগে ইউরোপে যাজকশ্রেণী ও রাজন্যবর্গের মধ্যে একটা রফা হয়। তার ফলে উভয় শক্তিই খ্রীস্টধর্মীয় ব্যাপারে পোপের চরম কর্তৃত্ব ও পার্থিব ব্যাপারে রাজন্যবর্গের চরম কর্তৃত্ব নিজ নিজ শ্রেণীস্বার্থে মেনে নেন। প্রাচীন ভারতের নৃপতিগণও নিজেদের চান্দ্র বা সৌর বংশ থেকে উদ্ভূত বলে নিজেদের কোন না কোন ঐশী শক্তির প্রতিনিধি বলে প্রচার করতেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত এইভাবে মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা রাজ্যাভিষেক বা রাজতিলক (Coronation) শেষে রাজার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিতেন। দক্ষিণ আমেরিকার আজটেক বংশীয় (Ajtec) রাজারা, মিশরীয় ফারাও-রা (Pharaoh) ও চীন-জাপানের সম্রাট্রাও এইভাবে নিজেদের অলৌকিক, স্বর্গীয় শক্তির প্রতিভূরূপে প্রচার করতেন। ইংরেজ দার্শনিক হুকার (Hooker) এবং রবার্ট্ ফিল্মার (Robert Filmer) এই মতের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। যাজকদের মধ্যে মার্টিন্ লুথার (Martin Luther), ও ক্যাল্ভিন্ (Calvin) এই মতের সমর্থক ছিলেন। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে "পবিত্র চুক্তিতে" (Holy Alliance) স্বাক্ষর দিয়ে প্রুশিয়া,রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সম্রাট্গণ ঈশ্বরের অর্থাৎ ধর্মের নির্দেশে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে প্রতিশ্রুত হন।

বিধাতৃবিধানের তত্ত্ব ও তার ধারাবাহিক ইতিহাসে একটি বক্তব্যই সুপরিস্ফুট : রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্ট একটি অলৌকিক প্রতিষ্ঠান

এই মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র বিধাতার বিধানে সৃষ্ট ও তাঁরই ইচ্ছায় তাঁর পার্থিব প্রতিনিধি রাজার নির্দেশে পরিচালিত। সুতরাং রাজাকে মান্য করার অর্থ ঈশ্বরকেই মান্য করা। ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন শক্তি বা ব্যক্তির কাছে রাজা দায়ী নন। সুতরাং রাজদ্রোহের অর্থ ঈশ্বরের অব-মাননা অর্থাৎ পাপ। রাজার অবর্তমানে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করার অধিকারী। এইভাবে মধ্যযুগের রাষ্ট্রগুলি ধর্মীয় রাষ্ট্রে (Theocracy) এবং বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে (Hereditary Monarchy) পরিণত হল।

মধ্যযুগে ধর্মীয় রাষ্ট্রের আবির্ভাব

সমালোচনা ঃ কিন্তু পরবর্তীকালে বিধাতৃবিধান তত্ত্ব তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। প্রথমতঃ, বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্বেচ্ছাচারী রাজার বিরুদ্ধে জনগণের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বের অসারতা প্রতিপন্ন হয়েছে। এই মত অগণতান্ত্রিক। ফলে, রাজার বিরুদ্ধে বারবার গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। ইংলণ্ডে স্টুয়ার্ট বংশের রাজত্বকালে রাজা ও প্রজার মধ্যে সুদীর্ঘ সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচারী রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ ঘটায়। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের পর স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পতনের ঘটনার জন্যও একই কারণে এই মতবাদ ফরাসীদেশে জনপ্রিয়তা হারায়। বলশেভিক বিপ্লবের সময় ১৯১৭ সালে রাশিয়ার স্বৈরাচারী জার (Czar of Russia) বিদ্রোহী জনতার আক্রমণে নিহত হন। তাই দেখা যায় যে, রাজাকে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত বলে যে মতবাদটি বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বৈরাচারী শাসনের পক্ষে জাহির করতেন তা জনগণের রক্তাক্ত সংগ্রামের সাফল্যের মধ্য দিয়ে পরিত্যক্ত হয়েছে।

বিধাতৃবিধান তত্ত্বের সমালোচনা ঃ
(১) এই মত স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের অনুপূরক ; ইতিহাস স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র ত্যাগ করে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছে

দ্বিতীয়তঃ, বিধাতৃবিধানের তত্ত্ব সঙ্কীর্ণতা দোষে দুষ্ট। এই তত্ত্ব শুধু স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকেই গ্রহণযোগ্য আদর্শ শাসনব্যবস্থা রূপে স্বীকার করে। কিন্তু বর্তমান যুগে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। ইংলণ্ড, সুইডেন প্রভৃতি সামান্য যে-কয়টি দেশে রাজতন্ত্র নামসর্বস্ব রূপে বর্তমান, সেখানেও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত এবং প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই সর্বজনস্বীকৃত। বর্তমান যুগে তৈমুর লং বা নাদির শাহকে ঈশ্বরের দূত কল্পনা করা শক্ত।

(২) এই মত সঙ্কীর্ণতা দোষে দুষ্ট ; স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র আদর্শ শাসন নয়

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র একটি মানবিক প্রতিষ্ঠান। মানুষ নিজের ও নিজ গোষ্ঠীর সুবিধার জন্যই রাষ্ট্রকে সৃষ্টি করেছে। হিন্দুগণের বিশ্বাস—প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাদের অনুরোধে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেন। জাপানীগণ অনেকে এখনও এ ধরনের অলৌকিক ঘটনাকে সত্য বলে মনে করেন। রাষ্ট্রের মত লৌকিক প্রতিষ্ঠানের ওপর ঐশী অলৌকিকত্ব আরোপ করা উচিত নয়।

(৩) রাষ্ট্র অলৌকিক প্রতিষ্ঠান নয়, রীতিমত মানবিক প্রতিষ্ঠান

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রকে মানবিক সংগঠনরূপে স্বীকার না করার ফলে বিধাতৃবিধানের তত্ত্ব ইতিহাস-বহির্ভূত ঘটনার সাহায্যে এর উৎপত্তি ও ক্রম-পরিণতি ব্যাখ্যা করেছে। সুতরাং এই মতবাদ অনৈতিহাসিক।

(৪) এই মত অনৈতিহাসিক

পঞ্চমতঃ, এই মতবাদ ধর্মতত্ত্বেরও বিকৃত ব্যাখ্যা করে। সব ধর্মেরই সার কথা—ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি প্রজাদের কল্যাণ কামনা করেন। সেই যুক্তি দেখালে ঈশ্বরের দূতরূপে দায়িত্বজ্ঞানহীন, স্বৈরাচারী রাজার দমনপীড়নকে ধর্মের দোহাই দিয়ে সমর্থন করা যায় না। কাজেই এই মত ধর্মীয় যুক্তির বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন" নাটকে রাজা গোবিন্দমাণিক্য "আদর্শ রাজা" সম্বন্ধে এ ধরনের উক্তি করেছেন।

(৫) এই মত ধর্মতত্ত্বের বিকৃত ব্যাখ্যা করে ঃ স্বৈরাচারী রাজা কি মঙ্গলময় ঈশ্বরের দূত হতে পারেন ?

ষষ্ঠতঃ, বহু ধর্মীয় গ্রন্থ ও যাজকদের অনেকে এই মতের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এর সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেছেন। মহাভারতের "অনুশাসন পর্বে" দেবব্রত ভীষ্ম ঘোষণা করেছেন—"যে রাজা প্রজাপালনের প্রতিশ্রুতি মান্য করেন না, তিনি উন্মত্ত কুকুরের তুল্য, প্রজাদের উচিত তাঁকে হত্যা করা।" মনুসংহিতায় মনু বলেছেন—"ধর্ম হতে বিচ্যুত হলে পারিষদগণের সঙ্গে রাজাও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবার যোগ্য।" বাইবেলের প্রাচীন সংহিতার (Old Testament) ঈশ্বরের বাণী—"সীজারের (অর্থাৎ রাজার) প্রাপ্য তাঁকে মিটিয়ে দাও, ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও" ("Render unto Caesar the things that are Caesar's, unto God the things that are God's")। অনেকের মতে, ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এই প্রথম ধর্ম-নিরপেক্ষভাবে (secular) রাষ্ট্রীয় শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হল এবং রাষ্ট্রকে একটি লৌকিক ও লোকায়ত প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকার করা হল। ধর্মযাজক লুথারও বিধাতৃবিধানের তত্ত্ব সমর্থন করতে গিয়ে তার এই লৌকিক সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নেন।

(৬) এ বিষয়ে মহাভারত,মনু-সংহিতা ও বাইবেলের নির্দেশ

তবে বিধাতৃবিধান তত্ত্বের **ঐতিহাসিক মূল্য** আছে। প্রথমতঃ, এই মতবাদে রাষ্ট্রের মত পার্থিব ব্যাপারে পরম কারুণিক বিধাতার প্রভাবের কথা বলে রাষ্ট্রের নৈতিক উদ্দেশ্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মীয় অনুশাসন মানার ফলেই প্রাচীনকালে মানুষ ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় অনুশাসন মানতে অভ্যস্ত হল। অতীতের নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ও অরাজক-তার স্থানে দেখা দেয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য ও নিয়মানুবর্তিতা। তৃতীয়তঃ, এই তত্ত্বের সাহায্যে মধ্য-যুগের শেষের দিকে তৎকালীন ইউরোপে রাজশক্তি প্রবল ধর্মীয় সংগঠনের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলতে সমর্থ হয়। এর বিরুদ্ধে স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়ারূপেই আধুনিক যুগে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State) বা অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র (Non-Communal State) গঠিত হয়। চতুর্থতঃ, এখনও সুসভ্য আধুনিক রাষ্ট্রে বীরপূজা বা নেতৃপূজার

এই তত্ত্বের ঐতিহাসিক মূল্য ঃ
(১) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য শুভ ;
(২) ধর্মীয় অনুশাসন অতীতে শৃঙ্খলাবোধ এনেছে ;
(৩) ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পত্তনে পরে এর ভূমিকা ;
(৪) বীরপূজার দ্বারা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব গঠন ; (৫) ধর্ম রাজনৈতিক চেতনা আনে

রীতি (cult of hero-worship) দৈববলে বলীয়ান্ প্রাচীন সম্রাটের জয়ধ্বনির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পঞ্চমতঃ, আদিম মানুষের মনে সামাজিক প্রবৃত্তির উৎস স্বভাবতঃই সৃষ্টি করেছিলেন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ। সহজাত প্রবৃত্তি আদিম যুগের মানুষকে সময়বিশেষে অনেকখানি রাষ্ট্রানুগ করে তুলতে সাহায্য করেছিল। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে মহাভারতের শান্তিপর্ব, অনুশাসনপর্ব ও মনুসংহিতার সূত্রাবলীর মূল্য অনেক, যদিও খ্রীস্টানদের নব্য সংহিতায় (New Testament) এ মতটির সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই।

উপসংহার ঃ সামন্ততন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের সঙ্গে যতদিন রাজতন্ত্রের আপোষ ছিল, ততদিন বিধাতৃবিধান তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। ধনতন্ত্র বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ও উদারপন্থী গণতন্ত্র (Liberal Democracy) ধীরে ধীরে গড়ে ওঠার ফলে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রও সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রে পরিণত হল। এর অনুষঙ্গ হিসাবে বিধাতৃবিধানের তত্ত্বও ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হল। মার্ক্সবাদীগণ এই ঘটনাগুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution) ঘটার আগে পর্যন্ত শোষক সামন্তশ্রেণী (Feudal Lords) প্রজাদের (serfs) ওপর তাদের শোষণকে স্থায়ী করার জন্য নিজেদের স্বার্থে রাজশক্তির সঙ্গে ঐশ্বরিক শক্তিকে মিলিত করে শোষিতদের ভয় দেখাত। পরবর্তীকালে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রাধান্য লাভ করতে লাগল। মধ্যবিত্তশ্রেণী বিধাতৃবিধানের তত্ত্ব ত্যাগ করে লোকায়ত সার্বভৌমত্ব নীতির প্রতি সমর্থন জানাতে লাগল। জনগণের নামে মধ্যবিত্ত শ্রেণী "দেবদূত" রাজার বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করল। এই নব্য ধর্মযুদ্ধে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও বিধাতৃবিধান তত্ত্ব দুটিই বাতিল হয়ে গেল। পরবর্তী যুগে মধ্যবিত্তশ্রেণীর নেতৃত্বেই উদারপন্থী গণতন্ত্রের আদর্শ প্রসারলাভ করেছে।

উপসংহার ঃ ধনতন্ত্রের আবির্ভাবে সামন্ততন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের অবলুপ্তি ঃ মধ্যবিত্তদের নেতৃত্বে উদারপন্থী গণতন্ত্রের ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সূচনা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দুর্দান্ত অগ্রগতির ফলে মানুষ বর্তমানে অলৌকিকতার পরিবর্তে লৌকিকতার ওপরই বেশী আস্থাবান্ হয়ে উঠছে। তা সত্ত্বেও আজকাল বিশ্বের নানা স্থানে "ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র" (Theocracy) গড়ে উঠছে। সম্প্রতি ইরান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে "ঐস্লামিক রাষ্ট্র" (Islamic States) গড়ে উঠেছে। ইরানে স্বৈরাচারী শাহের পতনের পর আয়াতুল্লাহ্ খোমেইনির নেতৃত্বে মৌলিক ইস্‌লামকে (Islamic Fundamentalism) ভিত্তি করে এক ধরনের ধর্মাশ্রিত প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান বলবৎ হয়েছে। বাংলাদেশে শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর অনুচরবর্গের হত্যার পর সেখানে সামরিক শাসন চালু হয়েছে। সেই সামরিক সরকার বাংলার বদলে উর্দুকে বাংলাদেশে ভাষারূপে চালু রাখতে চান ও ইস্‌লামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে প্রচার করেছে। পাকিস্তানেও তাই চলছে। এভাবে প্রাক্তন বিধাতৃ-

কিন্তু এখনও ধর্মীয় রাষ্ট্র লুপ্ত নয় ; ইরান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ঐস্লামিক রাষ্ট্রের নজির ঃ অবশ্য এরা ধর্মাশ্রয়ী রাজতন্ত্র নয়, কোথাও শুধু ধর্মীয়, কোথাও বা জঙ্গী ও ধর্মীয় প্রজাতন্ত্র

বিধানের তত্ত্বকে আজকাল রাজনীতিতে পুনঃপ্রয়োগের চেষ্টা চলছে। তবে পূর্বে বিধাতৃবিধানতত্ত্বের সঙ্গে চরমপন্থী রাজতন্ত্র জড়িত ছিল। কিন্তু বর্তমান ঐস্লামিক রাষ্ট্রগুলি সবই প্রজাতান্ত্রিক, যদিও সেখানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জঙ্গী একনায়কতন্ত্র চালু রয়েছে।

॥ শক্তিবাদ ॥

শক্তিবাদ (Force Theory) অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও তার ভিত্তি শুধু বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভর করে। এই মতবাদের সমর্থকগণ বলেন যে, মানুষ সামাজিক জীব বটে, কিন্তু সে যেমন হিংসুটে ও কলহপ্রিয়, তেমনি ক্ষমতালোভী ও হিংস্র। তার চরিত্রে জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীর বহু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ক্ষমতা-প্রয়োগের ইচ্ছা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। প্রাচীনকালে দুর্বল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর বলপ্রয়োগ করে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী নেতা বা গোষ্ঠী তাদের বশীভূত করত। এইভাবে ছোটখাট যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, উপজাতি ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে একত্রিত বা প্রসারিত হয়ে বৃহত্তর রাষ্ট্রিক ঐক্য স্থাপন করেছে।

এই মতের বক্তব্য ঃ ব্যক্তিমানসের দুর্বলতা দূর করার জন্য চাই সবলের নেতৃত্ব, বীরপুরুষের নেতৃত্বে রাষ্ট্রের উদ্ভব

পৌরাণিক যুগেরও আগে থেকে শক্তিবাদ সমর্থিত। উপনিষদের যুগে "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ" নামক বৈদিক সাহিত্যে বলা হয়েছে যে, যুদ্ধের তাগিদেই রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে প্রায়ই ক্ষমতার লড়াই দেখা দিত। সুরাসুরের দ্বন্দ্বে একবার পরাভূত দেবতাগণ বুঝলেন যে, রাজার সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবেই অসুরগণ তাঁদের পরাজিত করেছেন। তখন দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বলীয়ান্ ইন্দ্র "দেবরাজ" পদে অভিষিক্ত হলেন।

এ বক্তব্যের সমর্থন ঃ পৌরাণিক যুগে ঃ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বক্তব্য

মহাভারতের শান্তিপর্বেও অধর্ম ও অশান্তি দূর করার জন্য রাষ্ট্রের ও রাজার উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে। কারণ, শক্তিশালী রাজাই অরাজকতা দূর করতে পারেন। গীতায় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—সাধুদের ত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাসের জন্য, ধর্ম স্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই ("সম্ভবামি যুগে যুগে")। হোমারের মহাকাব্যেও শক্তিশালী রাজার প্রশস্তি রয়েছে।

মহাভারতের ও হোমারের বাণী

হেরাক্লিটাস্ (Heraclitus) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ ভাবতেন যে, বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়েই বিপথগামীদের সঠিকভাবে চালিত করা যায়।

হেরাক্লিটাসের যুক্তি

মধ্যযুগের খ্রীস্টান ধর্মযাজকগণ যাজকশক্তিকে শ্রেয় এবং রাজশক্তিকে হেয় প্রমাণ করার জন্য শক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁরা প্রচার করেন যে, খ্রীস্টধর্ম স্বয়ং মঙ্গলময় ভগবানের সৃষ্টি, কিন্তু রাষ্ট্র রাজার বলপ্রয়োগের ফল। সুতরাং রাজশক্তি পশুশক্তির সমতুল্য।

মধ্যযুগের খ্রীস্টান যাজকগণের বিবৃতি

আধুনিক যুগে লীকক্ (Leacock), জেঙ্কস্ (Genks), ব্লুনট্শ্লি (Bluntschli), ওপেনহাইমার (Oppenheimer) প্রভৃতি রাজনীতিবিদ্গণ শক্তিবাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁরা নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা করেছেন।

এ মতের আধুনিক সমর্থন : লীকক্, জেংক্স, ব্লুনট্শ্লি, ওপেনহাইমার

জেঙ্কস্ বলেন যে, আদিম সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের পক্ষে জীবিকানির্বাহের উপকরণগুলির অভাব দেখা দিল। তখন শক্তিশালী সেনাপতির রণকুশলতার সাহায্যে রাজা পার্শ্ববর্তী রাজ্য আক্রমণ ও অধিগ্রহণ করতে সমর্থ হলেন। এর ফলে রাজা বৃহত্তর এলাকার শীর্ষে পেঁছুলেন। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত হল। শক্তিবাদের সাহায্যে জেঙ্কস্ খুব সুন্দরভাবে রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান, তার সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামরিক পটভূমিকার ব্যাখ্যা করেছেন। তাই তিনি বলেছেন—"নিঃসন্দেহে আধুনিক রাষ্ট্রগুলি সবই সার্থক রণকৌশলের ফল" ("There is not the slightest difficulty in proving that all political communities of the modern type owe their existence to successful warfare ")।

জেংক্সের বক্তব্য : শক্তিশালী সেনাপতি ও তাঁর রণকুশলতাই প্রাচীন জনসমাজের আঞ্চলিক প্রসারতার কারণ : ফলে রাষ্ট্র নামক সুবৃহৎ সংস্থার উদ্ভব

ওপেনহাইমার বাহুবলের সাহায্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও তার স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দুটি স্তরে শক্তিপ্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র যে শুধু বলপ্রয়োগের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে, তাই নয় ; রাষ্ট্রের আবির্ভাবের প্রাথমিক পর্যায়ে রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে ও অপরিহার্যভাবে বিজিত ব্যক্তিবর্গের ওপর বিজেতাদের বলপ্রয়োগের ফলে ক্রমশঃ একটি স্থায়ী সামাজিক প্রতিষ্ঠান রূপে দেখা দিয়েছে।

ওপেনহাইমারের বক্তব্য : বাহুবল রাষ্ট্রের জনক ও শুরুতে তার স্থায়িত্বের প্রধান অবলম্বন

জার্মান রাজনীতিবিদ্গণের লেখনীতে শক্তিবাদ নতুনভাবে প্রকাশিত হল। হেগেল্ (Hegel) তাঁর আদর্শবাদী দর্শনে (Idealistic Philosophy) রাষ্ট্রকে চরম ক্ষমতার দাবিদাররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। ফিস্টের (Fichte) মতে জাতির মান-মর্যাদা, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক প্রভুত্ব সব কিছুর মূলে রয়েছে রাষ্ট্রশক্তি। ট্রাইট্স্কে (Treitschke) ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তি বিমূর্ত। নীট্সে (Nietzsche) বলেন যে, সুযোগ্য অতিমানবের (Superman) নেতৃত্বে রাষ্ট্র তার সুপ্ত ক্ষমতাকে সঠিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। এই রাজনীতিবিদ্গণ শক্তিবাদের মারফত যুদ্ধবাদকেও সমর্থন জানাতে থাকেন। জার্মান দার্শনিকগণ এইভাবে নানাদিক থেকে

শক্তিবাদের সমর্থনে জার্মান রাজনীতিবিদ্গণ : হেগেলীয় আদর্শবাদ ; ট্রাইট্স্কের কল্পনায় রাষ্ট্রশক্তির প্রতিমূর্তি : নীট্সের অতিমানবতত্ত্ব ; ফিস্টের ব্যাখ্যায় শক্তিবাদ জাতীয় মানমর্যাদার ভিত্তি ; হিট্লারের জঙ্গী নেতৃত্ব : ২য় মহাযুদ্ধ : শক্তিবাদ ও যুদ্ধবাদ

রাষ্ট্রীয় শক্তির জয়গান করার ফলে প্রুশিয়ার জনগণ অনুপ্রাণিত হল। প্রুশিয়ার নেতৃত্বে পরবর্তীকালে ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্য বিস্তৃত ও ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। আধুনিক যুগে হিটলার জার্মান প্রজাতন্ত্রকে ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেষ্টা করেন ও তার ফলে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটে।

ডারউইনপন্থী হার্বার্ট স্পেনসারের ব্যাখ্যায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থনে শক্তিবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রখ্যাত ইংরেজ জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের (Charles Darwin) জীবতত্ত্বের যুক্তিগুলির সাহায্যে হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের (Individualism) সমর্থনে শক্তিবাদকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। ডারউইনের মতে জীবকুলের মধ্যে যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the fittest) একটি বাস্তব জৈবিক ঘটনা। এই উদ্বর্তন ঘটে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক কারণে, দুর্বলের অবলুপ্তির জন্য। কারণ জীবকুলের মধ্যে একটা জীবনসংগ্রাম (Struggle for existence) অনবরত চলে। স্পেনসার উন্নয়নশীল মানবসমাজের মধ্যেও এই ঘটনাগুলির সাদৃশ্য দেখিয়েছেন।

মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে শক্তিবাদ ঃ তাঁদের মতে ধনিক বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রের সাহায্যে বলপূর্বক সর্বহারাদের শোষণ করে ; তাই মার্কসবাদীরা চান রাষ্ট্রের অবলুপ্তি

মার্কস, লেনিন প্রভৃতি সাম্যবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণের মতে বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণী সর্বহারাদের ওপর শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য রাষ্ট্রকে তাদের শ্রেণীস্বার্থে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে। মুষ্টিমেয় হলেও বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রশক্তির বলে বলবান। সুতরাং মার্কসবাদীগণের মতে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ধ্বংস করার জন্য চাই রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ("withering away of the State")। সর্বহারা শ্রেণী সাম্যবাদী বিপ্লবের দ্বারা রাষ্ট্রশক্তির উচ্ছেদ সম্ভব করে তোলে ও তাদের নেতৃত্বে শ্রেণীবিহীন, সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠা করে।

নৈরাজ্যবাদীরা আরেক অর্থে রাষ্ট্রশক্তির কবল থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করতে চান

গডউইন (Godwin), বাকুনিন (Bakunin) প্রভৃতি নৈরাজ্যবাদীরা (Anarchists) ছিলেন চরমভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। তাঁদের মতে রাষ্ট্রের পাশব শক্তি থেকে ব্যক্তিজীবনকে মুক্ত করতে না পারলে ব্যক্তির সার্বিক মুক্তি সম্ভব নয়।

শক্তিবাদের লৌকিক সমর্থন ঃ (১ "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা', (২) 'জোর যার মুলুক তার ;' ভারতের গ্রামে গ্রামে এখনও ঔপনিবেশিকতার জের ঃ থানার বড়বাবু, হাকিম সাহেব ইত্যাদি রাজশক্তির আঞ্চলিক প্রতীক

লৌকিক অর্থেও রাষ্ট্রের শক্তির আধাররূপে সরকারকে দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বলে প্রচার করা হয়। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা," "জোর যার মুলুক তার" প্রভৃতি প্রবাদবাক্য কালের অনুশাসনে লোকাচারকেও প্রভাবিত করে থাকে। ভারতে ইংরেজ আমলের ঔপনিবেশিক শাসনের জের হিসেবে থানার বড়বাবু, বি ডি ও, হাকিম সাহেব ইত্যাদি উচ্চ রাজকর্মচারীগণ এখনও গ্রামবাসীদের কাছে ভয় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকেন, কারণ এঁরা প্রত্যেকে নিজের নিজের আঞ্চলিক ক্ষেত্রে রাজশক্তির প্রতীক।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও তার স্থায়িত্বের প্রধান উপলক্ষ্য হিসাবে শক্তিবাদ বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে সমর্থিত হলেও শক্তিবাদের কঠোর **সমালোচনা** হয়েছে। প্রথমতঃ, বল-প্রয়োগই রাষ্ট্রকে গড়ে তোলার ও তাকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানরূপে চালু রাখার একমাত্র পন্থা নয়। মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই রাষ্ট্রের জন্ম। মানুষের স্বাভাবিক সমাজবোধ, ধর্মীয় বন্ধন, রাজনৈতিক চেতনা, অর্থনৈতিক অভাবের তৃপ্তিসাধন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ মানুষকে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রস্থাপনে উদ্যোগী করে তুলেছে। এমন কি এই মতের সমর্থক লীকক্ পর্যন্ত এ কথা স্বীকার করে বলেছেন যে, রাষ্ট্রের উদ্ভবের ক্ষেত্রে শক্তি অন্যতম উপাদান হলেও এই অন্যতম উপাদানকে "একমাত্র উপাদান" মনে করা ভুল (The Force Theory "errs in magnifying what has been only one factor in the evolution of society into the sole controlling force")।

সমালোচনা :
(১) বলপ্রয়োগই রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও স্থায়িত্বের একমাত্র কারণ নয় : অর্থনৈতিক কারণ, ধর্মীয় বন্ধন, রাজনৈতিক চেতনা ইত্যাদির এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ও আছে—লীককের নিজেরই স্বীকৃতি

দ্বিতীয়তঃ, নিছক শক্তিকেই রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিরূপে কল্পনা করা উচিত নয়। ইংরেজ দার্শনিক গ্রীনের (Green) একটি উক্তি চিরস্মরণীয়। তিনি বলেছেন—"শক্তি নয়, জনগণের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি" ("Will, and not Force, is the basis of the State")। রাষ্ট্রের প্রধান অবলম্বন হল সচেতন, সতর্ক জনমত। শক্তিবাদের উগ্র সমর্থকগণ এ কথাটি ভুলে যান। এই বক্তব্যটিই ম্যাক্আইভার অন্যভাবে পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "সার্বভৌমত্বের অধিকারী বলে রাষ্ট্র একটা বাধ্যতামূলক প্রতিষ্ঠান বটে, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য প্রদর্শনের মাপকাঠিরূপে সার্বভৌমত্বকে ধরা যায় না" ("Coercive power is the criterion of the State, but not its essence")। সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "বাহুবল ও বাক্যবল" শীর্ষক প্রবন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, সেটি সঠিক। তাঁর কথায়, "বাহুর বল পশুর বল। প্রজার শক্তিতেই রাজা শক্তিমান, নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত ?"

(২) গ্রীন্ বলেন—শক্তি নয়, জনগণের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি : ম্যাক্আইভারের উক্তিও অনুরূপ

তৃতীয়তঃ, শক্তিবাদের পেছনে নৈতিক সমর্থন নেই। কারণ, এই মতবাদ রাষ্ট্র-শক্তির প্রয়োগের নামে সরকারী স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি ও কুশাসনের সমর্থনে ব্যবহৃত হতে পারে। এই মতবাদের সমর্থকগণ নীচতা, ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা প্রভৃতি ব্যক্তি-চরিত্রের খারাপ দিকগুলির ওপর জোর দিয়ে থাকেন। তাঁদের যুক্তিগুলি হব্‌সের (Hobbes) কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়। চরমপন্থী রাজতন্ত্রের মারফত ইংলণ্ডে ষোড়শ শতাব্দীতে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা দূর করার জন্য হব্‌স্ লোভ, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি অসামাজিক প্রবণতা দমনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু মানুষ দয়া, মায়া, স্নেহ,

(৩) এই মতবাদ নীতিবিরোধী; হব্‌স্ মানুষের চরিত্রের খারাপ দিকগুলির ওপরই জোর দিয়ে শক্তিবাদী রাজতন্ত্র সমর্থন করেন

ভালবাসা, ত্যাগ, সহানুভূতি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নানারূপ সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিও তার ঝোঁক প্রকাশ করে থাকে, বিবেকের তাড়নায়, লোকভয়ে ভীত হয়ে সে অনেক সময় সৎপথে চলতে প্রবৃত্ত হয়। তাই মানবতাবাদীগণ শক্তিবাদকে "মানবনিন্দার মতবাদ" ("a misanthropic theory") বলে সমালোচনা করে থাকেন। শক্তিবাদ স্বাধীনতা, গণতন্ত্র প্রভৃতি সুমহান, গৌরবোজ্জ্বল মানবিক ও রাজনৈতিক আদর্শগুলির ঘোরতর বিরোধী।

(৪) এই মত যুদ্ধবাদী, বিশ্বশান্তির পরিপন্থী

চতুর্থতঃ, শক্তিবাদ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধবাদ সমর্থন করে। তাই এই মতবাদ আন্তর্জাতিক শান্তি, সংহতি ও সম্প্রীতি ব্যাহত করতে পারে। হেগেল প্রভৃতি জার্মান দার্শনিকগণের সমর্থন লাভ করে এ ধরনের মতবাদ জার্মানীকে যুদ্ধবাদী, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করে ও তার ফলে জার্মানীর আগ্রাসী কার্যকলাপের দরুন ১৯১৪ এবং ১৯৩৯ সালে দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখা দেয়।

(৫) এই মত অগণতান্ত্রিক, এর দ্বারা একনায়কতন্ত্রী স্বৈরাচার সমর্থিত

পঞ্চমতঃ, শক্তিবাদ সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism) এবং একনায়কতন্ত্রের (Dictatorship) সমর্থক। কিন্তু ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে এগুলি সবই পরিত্যক্ত। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে, ১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ১৭৮৯ সালে ফরাসীদেশে, ১৯১৭ সালে রাশিয়ায়, বিংশ শতাব্দীতে ভারতে এবং সত্তরের দশকে বাংলাদেশে নানাভাবে বিক্ষুব্ধ জনতা স্বৈরাচারতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ও জঙ্গী একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সাম্যের নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে।

(৬) গিলক্রাইস্টের মত ; গান্ধীজীও অহিংসা ও নৈতিক শক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন

ষষ্ঠতঃ, গিলক্রাইস্ট যথার্থই বলেছেন, মানবসমাজে পশুশক্তির ওপরে নৈতিক শক্তির স্থান। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতারূপে গান্ধীজী অহিংসা ও সত্যাগ্রহের মধ্যে স্বাধীন মানবাত্মার আত্মিক প্রকাশের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, প্রমাণ করেছেন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের পশুশক্তি এর কাছে কত দুর্বল ছিল।

(৭) ডারউইনপন্থী স্পেনসারের যুক্তি পরিত্যক্ত ঃ প্রতিভাবান প্রতিবন্ধীদের কি কোন স্থান নেই ?

সপ্তমতঃ, স্পেনসার প্রভৃতি ডারউইনপন্থীদের মত আজ পরিত্যক্ত। সমাজে যদি শুধু শক্তিশালী বীরপুঙ্গবদের আধিপত্য মেনে নেওয়া হত, তা হলে মানবসভ্যতা মিলটন (Milton), নিউটন (Newton), বিদ্যাসাগর, গান্ধী প্রভৃতি প্রতিবন্ধী বা দুর্বলদেহী নেতৃবৃন্দের চিরস্থায়ী অবদান থেকে চিরকাল বঞ্চিত হত।

উপসংহার ঃ শক্তিবাদের মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত আছে। আদিম যুগে গোষ্ঠী সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও বিদেশীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য

বীর নেতাদের নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল। এখনও সাধারণের রক্ষক ও পালক হিসাবে "দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন" রাষ্ট্রের প্রধান নীতি। তবে এ নীতি গণতান্ত্রিকতার আদর্শে পরিচালিত হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি তার ক্ষমতার প্রধান উৎস—সন্দেহ নেই। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও অধ্যাপক উড্রো উইলসনের কথায় বলা যায়, "শেষ ব্যাখ্যায় সরকার বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের সংগঠিত শক্তি।" তাই সরকারের আরক্ষাবিভাগ (পুলিশ), কারাগার, প্রতিরক্ষাদপ্তর (সামরিক বাহিনী) ইত্যাদির উপযোগিতা অবশ্যস্বীকার্য। রাষ্ট্রশক্তির আদর্শ সামনে না রাখলে নাগরিকদের দেশপ্রেম জাগ্রত হয় না।

উপসংহার : রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে অতীতের বীর নেতাদের কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য; শেষ ব্যাখ্যায় আরক্ষা, প্রতিরক্ষা, কারাগার রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক; কিন্তু এ সবই গণতান্ত্রিক নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত

॥ সামাজিক চুক্তি মতবাদ ॥

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory) অতি প্রাচীন। মহাভারতের শান্তিপর্বে, ভারতের বৌদ্ধ জাতকে বা নিকায় গ্রন্থে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, খ্রীস্টানদের প্রাচীন সংহিতায় (Old Testament) এই মতবাদের পরোক্ষ বা অর্ধপরিস্ফুট সমর্থন পাওয়া যায়। রোমান্ আইনবিদ্ উল্‌পিয়ান্ (Ulpian) এবং একাদশ শতাব্দীর ইংরেজ লেখক ও ধর্মযাজক মেনগোল্ড্ (Manegold) এই মত সমর্থন করেন। সামন্ততন্ত্র, যাজকতন্ত্র ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সম্মিলিত অনাচারের ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপে জনগণের অসন্তোষ ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। এই নাটকীয়, ঐতিহাসিক পটভূমিকার ওপর ভিত্তি করে ক্রমে ক্রমে গণতান্ত্রিক দিক থেকে ইউরোপে রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শুরু হয়। ধীরে ধীরে ইংলণ্ডে হব্‌স্ (Hobbes), লক্ (Locke), হিউম্ (Hume), ফরাসীদেশে রুশো (Rousseau), হল্যাণ্ডে হুগো গ্রোটিয়াস্ (Hugo Grotius) ও স্পিনোজা (Spinoza) এবং জার্মানীতে পুফেনডর্ফ্ (Pufendorf) ও কাণ্ট্ (Kant) সামাজিক চুক্তি মতবাদ সমর্থন করেন।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের ইতিহাস : মহাভারত, বৌদ্ধ জাতক ও নিকায়, কৌটিল্য, বাইবেলের প্রাচীন সংহিতায় এ মতের সমর্থন : উল্‌পিয়ান্, মেনগোল্ড্, হব্‌স্, লক্, হিউম্, রুশো, গ্রোটিয়াস্, স্পিনোজ, পুফেনডর্ফ ও কাণ্টের সমর্থন

॥ সামাজিক চুক্তি মতবাদ : হব্‌সের ব্যাখ্যা ॥

টমাস্ হব্‌স্ (১৫৮৮-১৬৭৯) ইংলণ্ডের একজন প্রখ্যাত দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ্। তিনি ১৬৫১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত "লেভিয়াথান্" (Leviathan) নামে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করেন।

হব্‌সের "লেভিয়াথান্"

খ্রীস্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে "লেভিয়াথান্" নামে এমন এক সামুদ্রিক প্রাণীর বর্ণনা আছে, যা অতিকায় তিমির চেয়েও বিশাল। এটা হল "লেভিয়াথান্" কথাটির বাচ্যার্থ। এ কথাটির লক্ষ্যার্থ হল—রাষ্ট্র নামক বিরাট প্রতিষ্ঠান এবং তাকে উপলক্ষ করে তার উৎপত্তি ও স্বরূপ-বিশ্লেষণ।

"লেভিয়াথান্" কথাটির বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ : সার্বভৌম রাষ্ট্রই যেন লেভিয়াথানের বা সামুদ্রিক জীবের মত অতিকায়

হব্‌স্ ছিলেন ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট্‌বংশীয় রাজা দ্বিতীয় চার্ল্‌সের (Charles II) গৃহশিক্ষক। স্টুয়ার্ট্ বংশীয় রাজাগণ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের উগ্র সমর্থক ছিলেন। তাঁরা প্রচার করতেন যে, রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি এবং রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সুতরাং ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে প্রজাদের মান্যতা পাবার অধিকার (Divine right of kings) রাজার অবিনশ্বর অধিকার। স্টুয়ার্ট্ বংশীয় রাজা প্রথম চার্ল্‌সের (Charles I) সঙ্গে পার্লামেন্টের সংঘর্ষ বাঁধে, ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রী দুটি দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। অবশেষে ১৬৪৯ সালে রাজা ১ম চার্লসের শিরশ্ছেদ হয়। তারপর ১৬৫৩ থেকে ১৬৫৮ সাল পর্যন্ত অলিভার ক্রমওয়েলের (Oliver Cromwell) নেতৃত্বে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম প্রজাতন্ত্র চালু হয়। ইংলণ্ডে ঐ সময়ের চরম অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার অবসানের জন্য হব্‌স্ রাজতন্ত্রের পুনরভ্যুত্থান চাইছিলেন। "লেভিয়াথান্" গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থনের মধ্য দিয়ে তিনি ইংলণ্ডের তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে চরম রাজতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব প্রার্থনা করেন।

হব্‌সের মতের ঐতিহাসিক তাৎপর্য : ইংলণ্ডে রাজা ১ম চার্ল্‌সের শিরশ্ছেদ, ক্রমওয়েলের প্রজাতন্ত্র, গৃহযুদ্ধ—সার্বিক অশান্তি; এ অবস্থা দূর করতে হব্‌স্ স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্রের সমর্থনের জন্য উপদেশ দিলেন

হব্‌স্ বলেন যে, রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে মানুষ একটি প্রাকৃতিক রাজ্যে (state of nature) বাস করত। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিদের সঙ্গে লড়াই করত, জীবন ছিল "নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, ঘৃণ্য, পাশবিক ও ক্ষণস্থায়ী" (The state of nature became "a state of war of all against all" and this made life "solitary, poor, nasty, brutish, short")। এই দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য আদিম মানুষেরা নিজেদের মধ্যে চুক্তিতে আবদ্ধ হল। তারা একটি রাষ্ট্র স্থাপন করল এবং কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা সমর্পণ করল।

হব্‌সের মত : প্রাক্‌রাষ্ট্রীয় প্রাকৃতিক রাজ্যের অধিবাসীগণ নারকীয় জীবনের সমাপ্তির জন্য সামাজিক চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র সৃষ্টি করল

হব্‌সের সামাজিক চুক্তি **মতবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি** হল, প্রথমতঃ, রাজা স্বয়ং বা ব্যক্তিসংসদ সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হলেন। আত্মরক্ষার অধিকার ছাড়া সমস্ত প্রাকৃতিক অধিকার আদিম মানুষ সার্বভৌমকে অর্পণ করল।

হব্‌সের মতের বৈশিষ্ট্য : (১) একটিমাত্র সামাজিক চুক্তি

দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক চুক্তি হয়েছিল একটি আদিম মানুষদের পরস্পরের মধ্যে। রাজা বা ব্যক্তিসংসদ চুক্তির শর্তের বাইরে ছিলেন। সুতরাং তিনি বা তাঁরা চুক্তির দ্বারা কোনভাবে আবদ্ধ ছিলেন না। ফলে, প্রজাগণ চুক্তিভঙ্গের অজুহাতে সার্বভৌমকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারতেন না।

(২) ফলে চরম সার্বভৌম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা

তৃতীয়তঃ, প্রজাগণও চুক্তিভঙ্গ করতে সাহসী হতেন না। কারণ, তাঁরা চুক্তিভঙ্গ করলে পুনরায় পূর্বের প্রাকৃতিক রাজ্যের অবস্থা ফিরে আসবে। সুতরাং নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই প্রজাগণ চুক্তির শর্ত মেনে চলবেন।

(৩) প্রজাগণ চুক্তিভঙ্গ করবেন না, কারণ তা করলে ভয়াবহ পূর্বাবস্থার পুনরাবির্ভাব

চতুর্থতঃ, সার্বভৌম ক্ষমতা এমন চরম ও অসীম ছিল যে, প্রজাগণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারতেন না। সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর-যোগ্য ছিল না।

(৪) সার্বভৌমত্ব অহস্তান্তরযোগ্য

পঞ্চমতঃ, সার্বভৌমের আদেশই আইন বলে গণ্য হতে লাগল।

(৫) সার্বভৌমের আদেশই আইন

ষষ্ঠতঃ, চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে প্রজাদের স্বাধীনতা সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ হল। সার্বভৌমের আইনকানুন এই সীমা নির্দিষ্ট করে দিল। অর্থাৎ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা সার্বভৌমেরই দান।

(৬) ব্যক্তিস্বাধীনতা সার্বভৌমেরই দান

হব্‌সের সামাজিক চুক্তি **মতবাদের সমালোচনা** করা হয়। প্রথমতঃ, স্যাবাইনের (Sabine) মতে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর চাপে হব্‌স্ চরম রাজতন্ত্রের সমর্থন করতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু কার্যতঃ প্রজাতন্ত্রের সমর্থনও তাঁর মতের মধ্যে পাওয়া যায়। সামাজিক চুক্তির পর রাষ্ট্র গঠিত হলে আদিম মানুষ কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিসংসদকে সার্বভৌম শক্তি প্রদান করে—হব্‌সের এই বক্তব্যই তার প্রমাণ। কারণ, ব্যক্তিসংসদ বলতে "প্রজাদের সংসদকেই" বোঝায়।

হব্‌সের মতের সমালোচনা ঃ
(১) হব্‌স্ কি সত্যিই চরম রাজতন্ত্রের সমর্থক ? স্যাবাইনের মতে হব্‌স্ "ব্যক্তিসংসদকেও" সার্বভৌম বলে স্বীকার করেছেন

দ্বিতীয়তঃ, কোন চুক্তি কখনই দুটি পক্ষ ছাড়া সম্পাদিত হতে পারে না। কিন্তু হব্‌স্ কল্পনা করেন যে, সামাজিক চুক্তি হয়েছিল একটি-মাত্র পক্ষেরই ব্যক্তিদের মধ্যে। তাই হব্‌সের চুক্তিকে অবাস্তব ও অস্বাভাবিক ঘটনা বলে গণ্য করা হয়।

(২) কোন চুক্তিই এক পক্ষীয় নয়

তৃতীয়তঃ, হব্‌স্ তাঁর মতবাদে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি গুরুতর দিক উপেক্ষা করেছেন। সেটি হল—রাষ্ট্র চিরস্থায়ী, সরকার পরিবর্তনশীল। স্বৈরাচারী রাজার পতনের পর আদিম প্রাকৃতিক রাজ্যের অস্বস্তিকর জীবনের পুনরাবির্ভাব ঘটবে—এই সাবধানতার বাণীর দ্বারা হব্‌স্ প্রজাদের সামাজিক চুক্তি লঙ্ঘন করতে নিষেধ করেন। কিন্তু এই আশঙ্কার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ, রাষ্ট্র ও সরকার—দুটিরই পৃথক সত্তা আছে।

(৩) রাষ্ট্র ও সরকার অভিন্ন নয়

চতুর্থতঃ, হব্‌সের সার্বভৌম তত্ত্বের ব্যাখ্যা ঠিক যেন অস্টিনের সার্বভৌমতত্ত্বের ব্যাখ্যার অনুরূপ। এর কারণ হল—হব্‌স্‌ ও অস্টিন্‌ দুজনেই সার্বভৌমত্বের আইনগত দিকটি বিশ্লেষণ করেছেন, সার্বভৌমত্বের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করেন নি।

(৪) হব্‌স্‌ ও অস্টিনের মধ্যে মতগত সাদৃশ্য : দুজনেই আইনগত সার্বভৌমত্বের ব্যাখ্যাকার

পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের (political and social psychology) ওপর গুরুত্ব দেবার ফলে হব্‌স্‌ মানুষের আদিম, অসামাজিক প্রবৃত্তির দিকেই বেশী দৃষ্টি দিয়েছিলেন। সমাজবোধ, বিবেক, প্রেম, প্রীতি, সহানুভূতি ইত্যাদি ব্যক্তিমানসের মানবিক ও সামাজিক প্রবৃত্তিও প্রবণতাগুলি তিনি উপেক্ষা করেছেন।

(৫) হব্‌স্‌ ব্যক্তিমানসের অশুভ প্রবণতার ওপরই জোর দিয়েছেন

কিন্তু **হব্‌সের মতবাদের ঐতিহাসিক মূল্য** আছে। প্রথমতঃ, আইভর ব্রাউন্‌ (Ivor Brown) বলেন যে, রাজনৈতিক জীবনে শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা স্থাপন প্রথম হব্‌স্‌ই সমর্থন করেন। দ্বিতীয়তঃ, গেটেলের (Gettel) মতে, হব্‌স্‌ যেভাবে চরম রাজতন্ত্র এবং আধুনিক গণতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চেষ্টা করেন, তা সত্যিই খুব প্রশংসার দাবী রাখে।

হব্‌সের মতের ঐতিহাসিক মূল্য : শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার গুরুত্ব (আইভর ব্রাউন্‌) ; চরম রাজতন্ত্র ও আধুনিক গণতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় (গেটেল্‌)

॥ সামাজিক চুক্তি মতবাদ : লকের ব্যাখ্যা ॥

জন্‌ লক্‌ (John Locke) (১৬৩২—১৭০৪) হব্‌সের মত একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক ছিলেন। তিনি ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁর "সরকার সম্বন্ধীয় দুটি নিবন্ধ" ("Two Treatises of Civil Government") প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্পর্কে তাঁর মৌলিক বক্তব্য প্রচার করেন।

লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদ

অলিভার ক্রম্‌ওয়েলের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে যে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়, ১৬৫৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তার অবসান হল। পুনরায় ইংলণ্ডে রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সের (James II) নেতৃত্বে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু সেই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রেরও উচ্ছেদ ঘটে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের "গৌরবময় বিপ্লব" (Glorious Revolution") বা "রক্তহীন বিপ্লবের" ("Bloodless Revolution") দ্বারা। তখন থেকেই ইংলণ্ডে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) স্থাপিত হয়। কিন্তু সে সময়ে অরেঞ্জ্‌বংশীয় বিদেশী রাজা দ্বিতীয় উইলিয়ামের (William II বা William ol Orange) ইংলণ্ডের সিংহাসনে রাজারূপে নিয়োগকে অনেকে সমর্থন করেন নি। এই বিপ্লববিরোধী ইংরেজদের কাছে গৌরবময় বিপ্লবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্য এবং

লকের মতের ঐতিহাসিক পটভূমিকা : ক্রম্‌ওয়েলের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডে শাসনতান্ত্রিক সংকট ; চরম রাজতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব ; ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের সাফল্য ও চরম রাজতন্ত্রের বদলে তখন থেকে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের প্রচলন ; লক্‌ এই সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রেরই সমর্থক

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের জন্য লক্ তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা করেন।

লকের মতে, রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে আদিম মানুষ যে প্রাকৃতিক রাজ্যে (state of nature) বসবাস করত, সেখানে মোটামুটি এক ধরনের শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ-জীবন চালু ছিল। সেখানকার অধিবাসীদের জীবনধারা হব্‌সের কল্পিত প্রাকৃতিক রাজ্যের আবাসিকদের জীবনযাত্রার মত প্রচণ্ড বিপন্ন ছিল না। পরস্পরের প্রতি জনগণ শান্তি, শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি দেখাতেন। তাঁরা কতকগুলি প্রাকৃতিক আইনকানুনের (Law of Nature) দ্বারা পরিচালিত হতেন। এক ধরনের সাম্যও সেখানে বিরাজ করত। কারণ, সেখানে জনগণ কতকগুলি প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Rights) ভোগ করতেন। এ অধিকারগুলি ছিল "বাস্তব, সর্বজনীন, দীর্ঘস্থায়ী এবং শাশ্বত" ("objective, eternal, immutable and universal")।

লকের ব্যাখ্যা ঃ প্রাক্-রাষ্ট্রীয় প্রাকৃতিক রাজ্যে অধিবাসীদের জীবন শান্তিপূর্ণ ছিল

কিন্তু কয়েকটি কারণে এজাতীয় সুখের রাজ্য ছেড়ে জনগণ চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র নামক নতুন একটি সামাজিক সংগঠন স্থাপন করল। প্রথমতঃ, যে প্রাকৃতিক আইনগুলির দ্বারা জনগণের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত হত, সেগুলি সম্বন্ধে জনগণের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাঁরা শুধু বিবেক ও যুক্তির অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হতেন এবং এগুলিকেই তাঁরা প্রাকৃতিক আইন বলে মনে করতেন। কিন্তু সার্বিক প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি হল আইনের ভিত্তি। তাই প্রাকৃতিক আইনের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয় জরুরী হয়ে পড়ল। দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক আইনগুলি ব্যাখ্যা করে সেগুলির তাৎপর্য বোঝাবার মত কোন প্রশাসনিক শক্তি সেখানে ছিল না। ফলে, প্রাকৃতিক আইনের নিরপেক্ষ ব্যাখ্যাকারের প্রয়োজন দেখা দিল। তৃতীয়তঃ, কারুর কোন প্রাকৃতিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে তার প্রতিকারের কোন উপায় বা ব্যবস্থা ছিল না। ফলে, জনজীবনে এক ধরনের অনিশ্চয়তা ও অপূর্ণতা দেখা দিত। তাই প্রাকৃতিক অধিকারের স্বচ্ছন্দ ও সুষম ভোগকে নিশ্চিত করার জন্যই আদিম মানুষ সামাজিক চুক্তির দ্বারা একটি নিরপেক্ষ উচ্চতর পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বেছে নিল। এই উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হলেন সার্বভৌম রাজা এবং এই চুক্তিবদ্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি হল রাষ্ট্র।

তবুও তাদের প্রাকৃতিক আইনের তাৎপর্য বোঝাতে ও প্রাকৃতিক অধিকার কায়েম করার জন্য রাষ্ট্রশক্তির দরকার হল ; ফলে, চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র স্থাপিত হল

লকের দ্বারা সমর্থিত সামাজিক চুক্তি মতবাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, লক্ দুটি চুক্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন। প্রাকৃতিক রাজ্যের আদিম অধিবাসীদের পরস্পরের মধ্যে একটি সামাজিক চুক্তি (Social Contract) সম্পাদিত হয়। এর ফলে রাষ্ট্র গঠিত হল। তারপর সম্পাদিত হল আরেকটি চুক্তি। এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা অর্থাৎ সার্বভৌম সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। পরবর্তী এই চুক্তিটিকে লক্ প্রশাসনিক বা সরকার-সম্পর্কিত চুক্তি (Governmental Contract) বলে বর্ণনা করেছেন।

লকের মতের বৈশিষ্ট্য ঃ (১) লক্ দুটি চুক্তির কথা বলেন —প্রজাদের নিজেদের মধ্যে (সামাজিক চুক্তি) এবং রাজার সঙ্গে প্রজাদের (প্রশাসনিক চুক্তি)

দ্বিতীয়তঃ, প্রশাসনিক চুক্তির দ্বারা নবনির্মিত রাষ্ট্রের আইনপ্রণয়নের রূপরেখা নির্ণয় করা হল। স্থির হল যে, প্রাক্‌রাষ্ট্রীয় সমাজে পূর্ব-প্রচলিত প্রাকৃতিক অধিকারগুলির সঙ্গে সমতা বজায় রেখে আইনকানুন তৈরী হবে, প্রশাসন ও বিচার-ব্যবস্থা চালু রাখা হবে। ফলে, চুক্তিবদ্ধ সার্বভৌম সরকারের হাতে জনগণ তাদের পূর্বপ্রচলিত প্রাকৃতিক অধিকারগুলির কিছু কিছু সমর্পণ করল। জনগণের জীবনরক্ষা, স্বাধিকাররক্ষা এবং সম্পত্তিরক্ষার অধিকারগুলির মত মূল্যবান প্রাকৃতিক অধিকারগুলি সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই সার্বভৌম সরকারের হাতে যথোপযুক্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া হল। সার্বভৌম সরকারের শীর্ষে অধিষ্ঠিত রাজা প্রশাসনিক চুক্তির দ্বারা প্রাকৃতিক অধিকারগুলি সংরক্ষণের জন্য প্রজাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। রাজা চুক্তির উর্ধ্বে বা বাইরে রইলেন না। সুতরাং সামাজিক চুক্তি মতবাদকে লক্‌ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থনে ব্যবহার করেছিলেন।

(২) সামাজিক চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক চুক্তির দ্বারা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল

তৃতীয়তঃ, লক্‌ সামাজিক ও প্রশাসনিক চুক্তি দুটিকে পরস্পরের পরিপূরক রূপে ব্যাখ্যা করেন। সামাজিক চুক্তির দ্বারা যেমন জনগণ পরস্পরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন, তেমনি প্রশাসনিক চুক্তির দ্বারা রাজাও প্রজাদের সঙ্গে চুক্তিরক্ষার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে চুক্তিবদ্ধ হলেন। সুতরাং লকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সামাজিক চুক্তি একধরনের সর্বাত্মক, সামগ্রিক চুক্তিতে পরিণত হল।

(৩) দুটি চুক্তিই পরস্পরের পরিপূরক

চতুর্থতঃ, লক্‌ সর্বপ্রথম সার্বভৌমত্বের আইনগত ও রাজনৈতিক দিক ব্যাখ্যা করে এ দুটির মধ্যে পার্থক্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের সমর্থন না থাকলে আইনগত সার্বভৌমের নির্দেশ শেষ পর্যন্ত কার্যকর হতে পারে না। রাষ্ট্রদর্শনের বিচারে, লকের এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, লকের তত্ত্ব যথেচ্ছাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ করার অধিকারকে দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক পথে সরকারের পরিবর্তনসাধনকে বৈধ বলে লক্‌ ঘোষণা করেছেন।

(৪) আইনগত সার্বভৌমত্ব (রাজার) ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব (প্রজাদের); উভয়ের পার্থক্য

পঞ্চমতঃ, লক্‌ সর্বপ্রথম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও সরকারের সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যাপক, সরকারের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ। এ ক্ষেত্রে "রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব" বলতে তিনি রাষ্ট্রের আইনগত ও রাজনৈতিক দুপ্রকার সার্বভৌমত্বকেই বুঝিয়েছেন। জনগণ শেষ পর্যন্ত এই উভয়বিধ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু সরকারী সার্বভৌমত্ব অনেক সীমিত, কারণ রাজনৈতিক সার্বভৌমের অর্থাৎ জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা

(৫) রাষ্ট্র ও সরকার এক নয়, কারণ, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও সরকারের সার্বভৌমত্ব এক নয়

অনুসারে তাকে সরকার পরিচালনা করতে হয়। তাই বলা হয় যে, লক্ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন।

যে কারণগুলির জন্য লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যাকে সমালোচনা করা হয়, সেগুলি হল—প্রথমতঃ, লক্ হব্‌সের ঠিক বিপরীত যুক্তি দেখিয়েছেন। সামাজিক ও প্রশাসনিক চুক্তি-দুটিকে পরস্পর পরিপূরক বলে মেনে নিয়েও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের গুণগান করতে গিয়ে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বকে অর্থাৎ জনসাধারণের ইচ্ছাশক্তিকেই লক্ বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। হব্‌স্ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানোর দরুন তিনি আইনগত সার্বভৌমত্বের ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আসলে, সার্বভৌমত্বের দুটি দিকই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

লকের মতের সমালোচনা ঃ (১) হব্‌স্ যেমন রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বকে উপেক্ষা করেছেন, লক্ তেমনি আইনগত সার্বভৌমত্বকে উপেক্ষা করেছেন ঃ দুটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ

দ্বিতীয়তঃ, লক্ প্রজাতন্ত্রের প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল ছিলেন না। সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী হলেও তিনি রাজাকেই প্রজাদের ঊর্ধ্বে রেখেছিলেন। তাই রাজার পদটির বিশেষত্বকে বোঝাবার জন্য তিনি রাজাকে স্বতন্ত্রভাবে জনগণরে সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ রাখার জন্য আলাদা একটি চুক্তির প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেন।

(২) লক্ সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের সমর্থক, প্রজাতন্ত্রের সমর্থক নন

লক সামাজিক চুক্তি মতবাদের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার **ঐতিহাসিক মূল্য** সকলেই স্বীকার করেন। প্রথমতঃ, তাঁর ব্যাখ্যা সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রগতিকে নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত করেছে। ইংলণ্ডে তাঁর মতের প্রভাবে ধীরে ধীরে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রধান হয়ে ওঠে ও রাজা বা রাণী সম্পূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক উপাধিসর্বস্ব শাসকে পরিণত হন। ইংলণ্ডের অনুকরণে পৃথিবীর বহুদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পরিচালিত হয়।

লকের মতবাদের ঐতিহাসিক মূল্য ; (১) তাঁর ব্যাখ্যা গণতন্ত্রের সহায়ক

দ্বিতীয়তঃ, জনগণকে রাজনৈতিক সার্বভৌম রূপে বর্ণনা করে ও আইনসিদ্ধ সার্বভৌমকে জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল বলে ব্যাখ্যা করে লক্ সাধারণভাবে গণতন্ত্রের পক্ষে জোরালো যুক্তি দেখিয়েছেন। সর্বসাধারণের সম্মতির ওপর নির্ভর করেই শাসনব্যবস্থা প্রগতিশীল হয়ে ওঠে—এই সনাতন গণতান্ত্রিক সত্যটি লক্ সফলভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

(২) সর্বসাধারণের সম্মতির ওপরই রাষ্ট্রের ভিত্তি

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রকে সমর্থন করার জন্য লকের ব্যাখ্যা থেকে আরও কয়েকটি গণতান্ত্রিক স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয়। যথা—ব্যর্থ বা অপদার্থ আইনগত সার্বভৌমের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ করার অধিকার।

(৩) লকের কয়েকটি গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধ ; যেমন—(ক) জনগণের বিদ্রোহ করার অধিকার

চতুর্থতঃ, লক্ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। সামাজিক চুক্তির স্বারা গঠিত রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু চুক্তি-বন্ধ রাজা সরকারের শীর্ষে থেকে চুক্তিভঙ্গ করলে সেই সীমাবন্ধ রাজতান্ত্রিক সরকারকে জনগণ ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকারী। এটি লকের আরেকটি গণতান্ত্রিক স্বতঃসিন্ধ সিন্ধান্ত।

(খ) এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার

॥ সামাজিক চুক্তি মতবাদ ঃ রুশোর ব্যাখ্যা ॥

জ্যাঁ জা রুশো (Jean-Jacques Rousseau) (১৭১২—১৭৭৮) একজন বিখ্যাত ফরাসী রাজনীতিবিদ্। তিনি ফরাসী ভাষায় ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে "সামাজিক চুক্তি" "দ্য কঁত্রাত্ সোসিয়াল্" (Du Contrat Social" বা "The Social Contract") নামক গ্রন্থ প্রকাশ করে তৎকালীন বিদ্বৎসমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এই গ্রন্থে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা করে তিনি খ্যাতিলাভ করেন।

রুশোর সামাজিক চুক্তিমতবাদ তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ—"দ্য কঁত্রাত্ সোসিয়াল্"

রুশোর ব্যাখ্যা অনুসারে, সামাজিক চুক্তির স্বারা রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে আদিম মানুষ যে প্রাকৃতিক রাজ্যে (state of nature) বসবাস করত, সেখানে তাদের জীবন ছিল রীতিমত স্বর্গীয়। সেখানে সাম্য ও স্বাধীনতা বিরাজ করত, মানুষ সুখী সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করত। কিন্তু কয়েকটি কারণে আদিম যুগের মানুষ এই প্রাক্‌রাষ্ট্রীয় স্বর্গীয় জীবন ত্যাগ করে রাষ্ট্র নামক একটি নতুন সামাজিক সংগঠন স্থাপনের জন্য প্রবৃত্ত হল। প্রথমতঃ, জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক রাজ্যে ক্রমশঃ নানাপ্রকার অসুবিধা দেখা দিতে লাগল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা আর সম্ভব হল না। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির অধিকারের উদ্ভবের ফলে ধীরে ধীরে সার্বিক সামাজিক স্বার্থের বদলে ব্যক্তিগত মালিকানার কুফল-স্বরূপ স্বার্থ, লোভ, হিংসা, ভয় প্রভৃতি দেখা দিল। ফলে, প্রাক্-রাষ্ট্রীয় স্বর্গতুল্য প্রাকৃতিক রাজ্য ক্রমশঃ নরকতুল্য হয়ে উঠল। প্রত্যেকে নিজের ভোগ্যবস্তুকে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে, নিজের স্বার্থকে অপরের বা সমষ্টির স্বার্থ থেকে বিভিন্ন বলে কল্পনা করতে শিখল। সংঘর্ষ, নরহত্যা, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির ফলে শান্তি ও সুখ বিনষ্ট হল। তৃতীয়তঃ, একদিকে প্রকৃতির রাজ্যের স্বর্গীয় সুখ দূর হয়ে যেমন চরম অশান্তি দেখা দিল, অপর দিকে তেমনি শুভবুদ্ধি ও যুক্তির উন্মেষের ফলে নতুন কোন বিকল্প সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য আদিম মানুষ আগ্রহী হল। ফলে,

রুশোর মতের ব্যাখ্যা ঃ প্রাক্-রাষ্ট্রীয় প্রাকৃতিক রাজ্য স্বর্গ-তুল্য ছিল ; কিন্তু ক্রমশঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাব ইত্যাদি রাজ্যের সামাজিক ও অর্থিক ভারসাম্য নষ্ট করল ; লোভ, হিংসা প্রভৃতি ব্যক্তির ও সমাজের জীবনকে অশান্ত করে তুলল ; ফলে মুক্তির উপায়—রূপে সামাজিক চুক্তির স্বারা রাষ্ট্র স্থাপিত হল

সামাজিক চুক্তির জন্য মানুষ প্রেরণা লাভ করল। রাষ্ট্র গঠিত হল। প্রাকৃতিক রাজ্যে আদিম মানুষের স্বর্গীয় স্বাধীনতার মধ্যেও অনিশ্চয়তা ও অপূর্ণতা ছিল। সামাজিক চুক্তির দ্বারা সমাজবদ্ধ জীবরূপে রাষ্ট্র গঠন করেই ব্যক্তিজীবন নিরাপদ হল, ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পূর্ণতা লাভ করল।

হবসের মত রুশোও একটিমাত্র সামাজিক চুক্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু **রুশোর ব্যাখ্যায়** সামাজিক চুক্তির **বিশেষত্ব** লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে, চুক্তির দ্বারা মানুষ কোন ব্যক্তিবিশেষকে সার্বভৌম শক্তি সমর্পণ করে নি। চুক্তির ফলে সমস্ত জনসমাজের মধ্যে প্রতিফলিত "সাধারণ ইচ্ছাশক্তি" (*volonté générale* বা general will) সার্বভৌম শক্তিরূপে রাষ্ট্রের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করল। এই ইচ্ছাশক্তি সমাজের সকল ব্যক্তির ইচ্ছার সার বস্তু। সুতরাং এই ইচ্ছাশক্তি সার্বভৌম শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে প্রকৃতপক্ষে সামাজিক চুক্তির পূর্বে প্রাকৃতিক রাজ্যের অধিবাসীরূপে জনগণ প্রত্যেকে পৃথকভাবে নিজের নিজের যে সত্তা ও স্বাধীনতা প্রকাশ করত, সেই সত্তা ও স্বাধীনতাই সমষ্টিবদ্ধভাবে "প্রকৃত ইচ্ছা" (real will) রূপে প্রকাশ করতে সক্ষম হল। সুতরাং রুশোর ব্যাখ্যা অনুসারে, "প্রকৃত ইচ্ছার" সমন্বয়ই "সাধারণ ইচ্ছাশক্তি।" লোকে চুক্তির পূর্বে পৃথকভাবে যে সার্বভৌমত্বের অধিকারী ছিল, সমষ্টিবদ্ধভাবে সেই সার্বভৌম শক্তিকেই আরও সার্থক ও ফলপ্রদ ভাবে তারা ব্যবহার করার ক্ষমতা লাভ করল। রুশো এইভাবে "লোকায়ত সার্বভৌমত্ব" (Popular Sovereignty) ব্যাখ্যা করেন।

রুশোর মতের বৈশিষ্ট্য ঃ হবসের মত রুশোও একটিমাত্র চুক্তির কথা বলেন—সকলের সঙ্গে প্রত্যেকের, প্রত্যেকের সঙ্গে সকলের চুক্তি ; কিন্তু চুক্তির ফলে কোন ব্যক্তিবিশেষ সার্বভৌমত্ব লাভ করলেন না ; সমাজের সাধারণ মঙ্গলকামী ইচ্ছাশক্তির বাহকরূপে সমস্ত জনসমাজই সার্বভৌম হলেন

রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদের অনেক সমালোচনা হয়েছে। এই সমালোচনাগুলি মূলতঃ, তাঁর "সাধারণ ইচ্ছাশক্তি" মতবাদেরই বিরুদ্ধে সমালোচনা।

রুশোর মতের সমালোচনা

প্রথমতঃ, রুশো "সাধারণ ইচ্ছাশক্তি"-কে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তার ফলে এই ইচ্ছাশক্তি কার্যতঃ "সংখ্যাগরিষ্ঠের শক্তি" হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর মতে, মানুষ "সাধারণ ইচ্ছাশক্তি" মান্য করলে তবেই সে প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদ পাবে। কেউ যদি কুসংস্কার বা অজ্ঞতার দরুণ "সাধারণ ইচ্ছাশক্তি" মানতে না চান, তা হলে রুশোর মতে, সে ব্যক্তি "স্বাধীন" নন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ হল যে, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সেই মূঢ় ব্যক্তিকে বলপূর্বক "সাধারণ ইচ্ছাশক্তি" মান্য করতে বাধ্য করা উচিত (রুশোর ভাষায় "the minorities should be forced to be free")। এর ফলে, রুশোর পরিকল্পিত সার্বভৌম রাষ্ট্র কার্যতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থায় পরিণত হতে বাধ্য।

(১) রুশোর "সাধারণ ইচ্ছাশক্তি" কার্যতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়

দ্বিতীয়তঃ, রুশোর পরবর্তীকালে জার্মান আদর্শবাদী দার্শনিক হেগেল ও আধুনিকযুগে হেগেলপন্থী ইংরেজ দার্শনিক বোসাংকে (Bosanquet) রুশোর সার্বভৌম তত্ত্বকে চরম রাষ্ট্রীয় প্রাধান্যের সমর্থনে ব্যবহার করেছেন। বোসাংকের স্মরণীয় উক্তি হল—নিজের বিবেচনা অনুযায়ী অধীনস্থ সমস্ত সংস্থার শীর্ষে চরম ক্ষমতার প্রয়োগকর্তারূপে সার্বভৌম রাষ্ট্র ক্ষমতার আধার ছাড়া আর কিছুই নয় ("The state, as the operative criticism of institutions, is force")। এই কারণেই আধুনিক মানবতাবাদী দার্শনিক মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russell) বলেছেন যে, রুশোর "সাধারণ ইচ্ছাশক্তি" তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত একনায়কতন্ত্রী স্বৈরাচারী সর্বাত্মক রাষ্ট্রের (Totalitarian State বা Dictatorship) গড়ে তুলবে।

(২) রুশোর মতকে পরবর্তীকালে হেগেল ও হেগেলপন্থী বোসাংকে স্বৈরাচারী সর্বাত্মক রাষ্ট্রের সমর্থনে ব্যবহার করেন

তৃতীয়তঃ, রুশোর "সাধারণ ইচ্ছাশক্তির" তত্ত্ব অবাস্তব। সুইজারল্যাণ্ডের মত ছোট প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ছাড়া আধুনিক বৃহদায়তন পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে এই মতবাদ প্রযোজ্য নয়।

(৩) রুশোর তত্ত্ব অবাস্ত, কেবলব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে প্রযোজ্য

চতুর্থতঃ, হবস্ স্বৈরাচারী রাজাকে বা সংসদকে যেভাবে চরম সার্বভৌমশক্তির অধিকারী বলে কল্পনা করেন, রুশো "সাধারণ ইচ্ছাশক্তি" সম্পন্ন জনসমাজকে সেইরকম চরম ক্ষমতার অধিকারী বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক হার্নশ (Hearnshaw) তাই যথার্থ মন্তব্য করেছেন—"রুশোর সার্বভৌম সমাজ হবসের ছিন্নমুণ্ড লেভিয়াথান্।"

(৪) হবস্ রাজার স্বৈরাচার সমর্থন করেন, রুশো সংসদীয় স্বৈরাচার সমর্থন করেন ঃ দুজনেই চরমপন্থী

পঞ্চমতঃ, রুশোর পরিকল্পিত আদর্শ সমাজের "সাধারণ ইচ্ছাশক্তি" আবিষ্কার প্রায় অসম্ভব। বেশীর ভাগ আধুনিক রাষ্ট্রেই রাজনৈতিক দল, চাপগোষ্ঠী (Pressure-group), স্বার্থগোষ্ঠী (Interest-group) ইত্যাদি সংস্থার ক্ষমতার লড়াই কোন-না-কোন স্বার্থকে কায়েমী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে। সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপই শেষ পর্যন্ত এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের শেষ পরিণতি চূড়ান্তভাবে নির্দেশ করে। ফলে, রুশোর পরিকল্পিত মঙ্গলময়, নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ কোন "সাধারণ ইচ্ছাশক্তির" প্রভাব সর্বোত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও সব সময় দেখা যায় না।

(৫) আধুনিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা, চাপগোষ্ঠী, স্বার্থগোষ্ঠী ইত্যাদির প্রভাবে সমাজে নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ "সাধারণ ইচ্ছাশক্তি" দেখা যায় না

রুশোর ব্যাখ্যায় সামাজিক চুক্তি মতবাদের নানাপ্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা গেলেও **রুশোর মতের ঐতিহাসিক গুরুত্ব** অনস্বীকার্য। প্রথমতঃ, রুশো জনকল্যাণকর উদ্দেশ্যকেই রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্যে বলে ঘোষণা করেছেন। সুস্থ, স্থায়ী সামাজিক সংগঠনরূপে রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে হলে তাকে গণতন্ত্রের এই মূলমন্ত্র স্মরণ করতে হবে। কারণ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মূল উৎস জনসাধারণ।

রুশোর-মতের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঃ (১) রাষ্ট্রের জনকল্যাণকর উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা

আদর্শগতভাবে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বর্তমান প্রতিনিধিমূলক বা পরোক্ষ অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্র অপেক্ষা শ্রেয়ঃ—রুশোর এই মত কেউই অস্বীকার করতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ, ভলতেয়ার (Voltaire), দিদেরো (Diderot) প্রভৃতি সমকালীন ফরাসী লেখক ও দার্শনিকদের সাহিত্যের মত রুশোর সামাজিক চুক্তি সম্পর্কিত গ্রন্থ ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের সময় বিপ্লবীদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। রুশো ফরাসী বিপ্লবীদের চরমপন্থী গণতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করতে সফল হন। টমাস পেনের (Thomas Paine) মত রুশোর গ্রন্থও সমকালীন মার্কিনীদের ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছিল। তাই গণতান্ত্রিকতা, প্রজাতান্ত্রিকতা ও বিপ্লববাদের প্রাজ্ঞ পথিকৃৎরূপে গণমুখী আন্দোলনকারীদের কাছে তিনি স্মরণীয়, বরণীয়, পূজনীয়।

(২) ভলতেয়ার, দিদেরো প্রভৃতির মত রুশোও ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেন

॥ সামাজিক চুক্তি মতবাদ : হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশোর মতের সাদৃশ্য ॥

হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশোর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে প্রচণ্ড পার্থক্য থাকলেও তাঁদের ব্যাখ্যায় সামাজিক চুক্তি মতবাদের যে **সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি** চোখে পড়ে, তা থেকে বোঝা যায়, তাঁরা সকলেই বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্রগঠনের পূর্বে আদিম মানুষ একটা **প্রাক্‌-রাষ্ট্রীয়** জীবন যাপন করত। তাঁরা এটার নাম দিয়েছেন **"প্রকৃতির রাজ্য"** (State of nature)। এখানে মানুষ নানাপ্রকার **প্রাকৃতিক অধিকার** (Natural Rights) অবাধে ভোগ করত। এই অবাধ স্বাধীনতা বজায় থাকার ফলে প্রাকৃতিক রাজ্য ছেড়ে আদিম মানুষ চুক্তির সাহায্যে আরও সুন্দর, সুসম্বদ্ধ জীবনযাপনের আশায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করল। চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় শক্তির সৃষ্টি হল এবং মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা ইত্যাদি নতুনভাবে কায়েম হল।

হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশোর মতের সাদৃশ্য : (১) প্রাক-রাষ্ট্রীয় প্রাকৃতিক জীবনের অস্তিত্ব ; (২) সেখানকার অধিবাসীদের প্রাকৃতিক অধিকারের অস্তিত্ব ; (৩) সেখানে নানা অসুবিধা (৪) সেজন্য সামাজিক চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র স্থাপনা

॥ হব্‌স্‌, লক্‌, ও রুশোর মতের পার্থক্য ॥

হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশোর বিশ্লেষণ থেকে সামাজিক চুক্তি মতবাদের সাধারণ ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও এর প্রধান **সমর্থক দার্শনিকত্রয়ের** মধ্যে বহু বিষয়ে **মতপার্থক্য** দেখা যায়। প্রথমতঃ, **প্রাকৃতিক রাজ্যে মানবজীবনের স্বরূপ** ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনজন লেখক তিন রকম মত দিয়েছেন। **হব্‌স্‌** বলেন যে, এই রাজ্যে ছিল চরম অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা। মানুষের জীবন ছিল নিঃসঙ্গ, দীন, কুৎসিত, পাশবিক এবং ক্ষণস্থায়ী

("Solitary, poor, nasty, brutish and short")। মানুষের জীবনে না ছিল কোনও নিরাপত্তা, না ছিল কোনও আইনকানুনের নিরপেক্ষ অনুশাসন। অশান্তি দূরীকরণের জন্য আদিম মানুষ চুক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রগঠনের তাগিদ অনুভব করল।

হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশোর মতের মধ্যে পার্থক্য : (১) প্রাকৃতিক রাজ্যে জনজীবনের অবস্থা

লকের মতে, প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষের জীবন মোটামুটি খারাপ ছিল না। সমাজে সাম্য ও অবাধ স্বাধীনতা বিরাজ করত। কিন্তু এই অবাধ স্বাধীনতার ফলেই আদিম মানুষ এক নিরপেক্ষ উচ্চশক্তির নিয়ন্ত্রণে অবাধ স্বাধীনতার কুফলগুলি দূর করে সর্বসাধারণের সার্বিক কুশলের উদ্দেশ্যে একটি রাষ্ট্র (Commonwealth) গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল ও সেই চুক্তি সম্পাদিত করল। **রুশোর** মতে প্রাকৃতিক রাজ্য ছিল স্বর্গতুল্য। সেখানে মানুষের জীবনও ছিল আদর্শ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রচলনের ফলে মানুষের সরল, অনাড়ম্বর, স্বর্গীয় জীবনযাত্রার পথে বহু সমস্যা ও জটিলতা দেখা দিতে লাগল। ফলে, আদিম মানুষ চুক্তির মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রীয় জীবন পছন্দ করে নিল ও রাষ্ট্র স্থাপিত হল। রাষ্ট্রের বন্ধন সে স্বীকার করে নিল। রুশো বলেন, "মানুষ জন্মেছিল স্বাধীনভাবে, কিন্তু এখন সে সর্বত্রই শৃঙ্খলিত ("Man is born free, but everywere he is in chains")।

দ্বিতীয়তঃ, **চুক্তির স্বরূপ, সংখ্যা** ও তার ফলে যে নতুন রাষ্ট্রীয় **সার্বভৌম শক্তি** প্রতিষ্ঠিত হল, **তার স্বরূপ ব্যাখ্যা** নিয়েও হব্‌স্‌ লক্‌ ও রুশোর মধ্যে তাঁর মতভেদ দেখা যায়। **হব্‌স্‌** বলেন যে, চুক্তি হয়েছিল একটি—জনগণের পরস্পরের মধ্যে। সার্বভৌম রাজা ও শাসক সামাজিক চুক্তির দ্বারা বাধ্য ছিলেন না। তিনি সামাজিক চুক্তি অনুযায়ী সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করতেন বটে, কিন্তু তিনি সর্বদাই এর ঊর্ধ্বে ছিলেন। জনগণ চরম বিশৃঙ্খলার মাঝে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই নতুন রাষ্ট্রীয় শক্তির ধারককে সর্বশক্তিমান করে তোলেন। হব্‌সের ব্যাখ্যা, ইংলণ্ডের তৎকালীন স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের যুগোপযোগী সমর্থনে তাই চরমপন্থী। **লক্‌** দুটি সামাজিক চুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি সাধারণ মানুষদের মধ্যে, দ্বিতীয়টি শাসক ও শাসিতদের মধ্যে। সুতরাং লকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যে রাজা সামাজিক চুক্তির ফলে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হলেন, তিনি চুক্তি অনুযায়ী দেশ শাসন না করলে প্রজাদের নির্দেশে দণ্ডনীয় হতে পারেন। এইভাবে লক্‌ তাঁর যুগের উপযোগী নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের (Constitutional or Limited Monarchy) সমর্থনে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি প্রয়োগ করেন।

(২) চুক্তির ফলে গঠিত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের স্বরূপ

রুশোর মতে, জনগণের মধ্যে একটিমাত্র সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে সার্বভৌম ক্ষমতা জনসাধারণের হাতেই রইল। আগে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ তা বিচ্ছিন্নভাবে ভোগ করত। রাষ্ট্র স্থাপনের পর মানুষ সংঘবদ্ধভাবে এই শক্তি প্রয়োগের অধিকার লাভ করল। রুশো এই প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত **"সাধারণ ইচ্ছার তত্ত্ব"** (General Will theory) ব্যাখ্যা **করেন**। এই

তত্ত্বের মূল কথা হল যে, সমাজে জনসাধারণের ইচ্ছা জনগণেরই সাধারণ ইচ্ছা এবং এরই নাম সার্বভৌম শক্তি। এই ইচ্ছাশক্তি অবশ্যই জনগণের সার্বিক মঙ্গলবিধায়ক। তাই কেউ যদি এই ইচ্ছা মেনে নিতে না পারেন, তবে তিনি সমাজের সর্বসাধারণের মঙ্গলকামী অর্থাৎ "স্বাধীন" নন। এমতাবস্থায় সমাজের সকলে নিশ্চয়ই তাঁদের এই সাধারণ মঙ্গলকামী শক্তির নির্দেশ অনুসারে তাঁকে "স্বাধীন" করে তুলবেন ("the minorities will be forced to be free")।

তৃতীয়তঃ, আইন সম্পর্কেও হবস্, লক্ ও রুশোর মতের মধ্যে পার্থক্য ছিল। হবস্ চরমপন্থী রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। তাই, তাঁর মতে, সার্বভৌম রাজার নির্দেশই আইন। লক্ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সমর্থন করেন। রাজা প্রজাদের মঙ্গলসাধনে চুক্তিবদ্ধ। তাই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রজাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর লক্ গুরুত্ব আরোপ করেন। রুশো জনগণের সমষ্টিবদ্ধ সমাজকে সাধারণ ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগকর্তারূপে সার্বভৌম বলে ঘোষণা করেন। তাই তাঁর মতে আইন হল সাধারণ ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ ("Law is the expression of the General Will")

(৩) রাষ্ট্রীয় আইনের প্রকৃতি নিয়ে মতভেদ

॥ সামাজিক চুক্তি মতবাদ : হবস্ ও লকের মতের সঙ্গে রুশোর সমন্বয় ॥

রুশোর জীবন ও রচনাবলী সম্পর্কে দু' খণ্ড প্রামাণ্য গ্রন্থের বিখ্যাত ইংরেজ লেখক মর্লে (Morley) মন্তব্য করেন যে, রুশো যেভাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা করেছিলেন, তাতে এ সম্বন্ধে হবস্ ও লকের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটা সমন্বয় বা সংযোগসাধনের অভিনব প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় (Rousseau's social contract theory is "a curious fusion between the premises and the temper of Hobbes and the conclusions of Locke")। এই মতটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গেলে রুশোর মতের সঙ্গে হবসের ও লকের মিল খোঁজা দরকার এবং তিনজনের মতেরই একটা তুলনামূলক ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

রুশোর সমন্বয়বাদী দৃষ্টিতে সামাজিক চুক্তি মতবাদ : মর্লের মন্তব্য

হবসের মতে, প্রাকৃতিক রাজ্যের অধিবাসীদের জীবন হানাহানি, কাটাকাটির দরুন খুব খারাপ ছিল। এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আদিম মানুষ সামাজিক চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র স্থাপন করল। রুশোর মতে, প্রাকৃতিক রাজ্যের অধিবাসীদের জীবন স্বর্গরাজ্যের অধিবাসীদের তুল্য ছিল,—অত্যন্ত সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত। কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুণ সেই সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির অধিকার প্রচলনের ফলে সমাজে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, ভোগ্যবস্তুর বণ্টনে বৈষম্য, হিংসা, সংঘাত ও অশান্তি দেখা দিল। এই চরম অরাজকতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আদিম মানুষ সামাজিক চুক্তির সাহায্যে রাষ্ট্র গঠন করল। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে হবস্ ও রুশোর পরিকল্পিত প্রাকৃতিক রাজ্যের অবস্থা

রুশো ও হবসের মধ্যে যুক্তিগত ও মেজাজগত মতৈক্যের ক্ষেত্র : (১) প্রাকৃতিক রাজ্যে চরম অশান্তির ফলেই চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র গঠনের তাগিদ এল

পরস্পরবিরোধী হলেও এই রাজ্যের জনগণ শেষ পর্যন্ত চরম দুর্গতির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই রাষ্ট্র গঠন করেন—এ বক্তব্যটিকে প্রাকৃতিক রাজ্যের চরম অবস্থায় ব্যক্তিজীবনের দুরবস্থা ও সামাজিক চুক্তি সম্পাদনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হবস্ ও রুশোর সাধারণ মত বলে ধরে নেওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, হবসের মত রুশোও বলেন যে, একটিমাত্র সামাজিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। সে চুক্তিটি হল জনগণের মধ্যে—সকলের সঙ্গে প্রত্যেকের এবং প্রত্যেকের সঙ্গে সকলের। কথাটি হেঁয়ালির মত শোনালেও এর তাৎপর্য হল এই যে, হবস্ ও রুশো দুজনের মতেই এই সামাজিক চুক্তি সম্পাদনার সময়ে সার্বভৌম শক্তি বা সরকার কোন অংশ গ্রহণ করে নি।

(২) চুক্তি হল একটিমাত্র

তৃতীয়তঃ, হবসের মত রুশোও চুক্তির ফলে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম শক্তিকে চরম শক্তি (absolute power) বলে বর্ণনা করেছেন। দুজনের মতেই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অবিভাজ্য, অভ্রান্ত, চরম ও অ-হস্তান্তরযোগ্য।

(৩) রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব হল একটা চরম শক্তি

মর্লে বলেছেন যে, এইভাবে হবসের যুক্তি ও মেজাজ নিয়ে প্রাকৃতিক চরম অব্যবস্থা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে সামাজিক চুক্তির প্রয়োজনীয়তা, তার ফলে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের অসীমতা রুশো ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু দুজনের মধ্যে মিল এ পর্যন্তই। কারণ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করার সময় ধাপে ধাপে যে যুক্তিগুলি রুশো উপস্থিত করেছিলেন, সেগুলির শেষ মৌলিক সিদ্ধান্ত লকের সিদ্ধান্তের মতই। কারণ, লক্ ও রুশো দুজনেরই উদ্দেশ্য এক—রাষ্ট্রের জনকল্যাণকর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করা। লক্ ও রুশোর মধ্যে সিদ্ধান্তগত এই একমততার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে দুজনের মতের মধ্যে। লক্ ইংলণ্ডে সমকালীন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইংরেজ জনগণের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন যে, রাষ্ট্র জনগণের সাধারণ কল্যাণসাধনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান। সুতরাং জনস্বার্থ-বিরোধী শাসকরূপে পরিগণিত হলে আইনের চক্ষে সার্বভৌম রাজাকেও জনগণ ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন। রুশো সে যুগের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরোধী ও বিপ্লবমুখী ফরাসী জনগণের প্রজাতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে তাঁর সামাজিক চুক্তি নামক গ্রন্থে শাশ্বত বাণীরূপ দিয়েছিলেন। তাই তিনি যে লোকায়ত সার্বভৌমত্বের মতবাদ (Theory of popular sovereignty) ব্যাখ্যা করেছেন, তার সারকথা হল—প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথকভাবে যে স্বাধীন পরহিতকর ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রোত্তর সমাজে তারা জনসাধারণের ইচ্ছাশক্তির সারবস্তুরূপে সেই সাধারণ ইচ্ছাশক্তি-কেই (general will) সার্বভৌম বলে মেনে নিল, কোন রাজা বা ব্যক্তিবিশেষকে নয়।

রুশো ও লকের সিদ্ধান্তের মধ্যে মিল ঃ জনকল্যাণসাধনই রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ; অবশ্য রুশো প্রজাতন্ত্র সমর্থন করে লকের চেয়ে অনেক বেশী প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রী

মর্লের ব্যাখ্যার মধ্যেও কিছু ত্রুটি দেখা যায়। রুশো ও লক্ জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতাকে মেনে নিলেও তাঁদের এই সিম্ধান্ত সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়। লক্ ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। তিনি নিয়মতন্ত্রী রাজাকে আইনগত সার্বভৌম বলে স্বীকার করলেও কার্যতঃ জনগণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু সীমাবম্ধ ক্ষমতাবিশিষ্ট হলেও লক্ রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে স্বীকার করেছেন, তার বাইরে তিনি যেতে পারেন নি। কিন্তু রুশো আইনগত সার্বভৌমত্বকে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে দুটির চূড়ান্ত যোগফলরূপে লোকায়ত সার্বভৌমত্বকে চরম সার্বভৌম শক্তি বলে ঘোষণা করেছেন। লক্ষণীয় যে, রুশো সর্বসাধারণের প্রত্যেকের জনহিতকর ইচ্ছাশক্তির সারাংশরূপে সমাজের সমষ্টিবম্ধ সংগঠনের সার্বিক মঙ্গলবিধায়ক ইচ্ছাশক্তিকেই সার্বভৌম (Sovereignty of the General Will) বলে ঘোষণা করেছেন। প্রজাতান্ত্রিক চিন্তাধারার লীলাভূমি সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভা শহরে জন্মগ্রহণ করে রুশো আজীবন প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি শ্রম্ধাবান্ ছিলেন, কোন রাজা বা রাণীকে সর্বোচ্চ সার্বভৌম শাসকরূপে দেখাটা তাঁর চরম প্রজাতান্ত্রিক মেজাজের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল।

কিন্তু মর্লের ব্যাখ্যাও ত্রুটিপূর্ণ; লক্ সীমাবম্ধ রাজতন্ত্রের সমর্থক; কিন্তু রুশোর ওপর প্রজাতান্ত্রিক চিন্তাধারার লীলাক্ষেত্র তাঁর জন্মভূমি সুইজারল্যাণ্ডের ও তাঁর জন্মস্থান জেনিভা শহরের প্রভাব এত প্রবল যে, তিনি লকের মত শুধু গণতন্ত্রেই বিশ্বাসী ছিলেন না; তিনি প্রজাতান্ত্রিক আদর্শেরও একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন

॥ সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা ॥

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদের অনেক সমালোচনা হয়েছে। প্রথমতঃ, স্যার হেনরি মেন্ (Sir Henry Maine) বলেছেন যে, এই মতবাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। রাষ্ট্রগঠনের পূর্ববর্তী কোন প্রাকৃতিক রাজ্যের অস্তিত্ব নৃতত্ত্ববিদ্‌গণও স্বীকার করেন না।

চুক্তি মতবাদের সমালোচনা; (১) মেনের মতে, এ মতবাদ অনৈতিহাসিক

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রগঠনের পূর্বে রাজনৈতিক চেতনা জন্মায় না। ১৬২০ সালে ইংলণ্ড্ থেকে শতাধিক দেশত্যাগী মেফ্লাওয়ার (Mayflower) জাহাজে করে আমেরিকায় গিয়ে নতুন এক সমাজগঠনের জন্য ভগবানের নামে এক প্রতিজ্ঞায় আবম্ধ হন—"ঈশ্বর এবং পরস্পরের উপস্থিতিতে আমরা ঘনিষ্ঠ ও পারস্পরিকভাবে আমাদের অধিকতর সংহতি ও সংরক্ষণের জন্য নিজেদের চুক্তিবম্ধ ও ঐক্যবম্ধ করছি") ("We do solemnly and mutually, in the presence of God and one another, covenant, and combine ourselves together into a civil body politic for our better ordering and preservation.")। এই প্রবাসগামী ব্যক্তিরা পূর্বেই এক রাষ্ট্রের অধীনে বাস করতেন।

(২) মেফ্লাওয়ার জাহাজের যাত্রীরা আমেরিকার নতুন বসতি ও "রাষ্ট্র" স্থাপনের আগেই তাদের রাজনৈতিক চেতনা ছিল

তার ফলে মনে হতে পারে যে, তাঁদের মধ্যে পূর্বেই রাজনৈতিক চেতনা ছিল। এই নজির দেখিয়ে এখানে আপাতদৃষ্টিতে চুক্তি করে তাঁরা নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে মনে হলেও একটু ভালভাবে অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে, এঁরা শুধু এক রাজনৈতিক অবস্থা (Political Status) থেকে আর এক রাজনৈতিক অবস্থায় উপনীত হন।

তৃতীয়তঃ, সামাজিক চুক্তি মতটির পেছনে কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষ আগে কোনও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে না থাকলে তাদের যেমন কোনও রাজনৈতিক চেতনা থাকতে পারে না, তেমনি তাদের কোন অধিকারবোধও থাকতে পারে না। ফলে, তাদের প্রাকৃতিক অধিকারও (Natural Rights) ছিল না। চুক্তি মতবাদে ধরে নেওয়া হয় যে, রাষ্ট্র স্থাপনের পূর্বেই মানুষের মনে রাষ্ট্রীয় অধিকারবোধের সূত্রপাত হয়। ঘোড়া আনার আগে যেমন ঘোড়ার গাড়ী কেনা অর্থহীন, তেমনি রাষ্ট্র গঠনের আগে রাষ্ট্রীয় অধিকারবোধের অস্তিত্বকল্পনা অর্থহীন। আইন অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম শক্তির কর্তৃত্ব না থাকলে অধিকার সমানভাবে সংরক্ষিত করা যায় না। কারণ, কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে রাষ্ট্রের মত অধিকারভঙ্গকারীকেও শাস্তি দেবার কোন শক্তি থাকে না।

(৩) এ মতবাদ অযৌক্তিক : প্রাক-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অধিবাসীদের প্রাকৃতিক অধিকার অকল্পনীয়, কারণ, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ছাড়া অধিকার-ভোগ সম্ভব নয়

চতুর্থতঃ, এই মতবাদ রাষ্ট্রের ধীর ও ধারাবাহিক বিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারে না। রাষ্ট্র এমন একটি প্রতিষ্ঠান নয় যে, এটা হঠাৎ কয়েকজন লোকের খেয়ালখুশি-মত গড়ে উঠতে পারে। এজন্যই বার্ক-এর (Burke) মত পণ্ডিতগণ বলেছেন যে রাষ্ট্র কোনও হিস্সাদারী ব্যবসা নয় যে, এর প্রতিষ্ঠার জন্য কোন চুক্তির দরকার হবে। চুক্তির দ্বারা ক্লাব বা এই ধরনের কোন সমিতি গঠন করা যায়। রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে ধীর, ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে। চুক্তির ধারণা আইনগত, রাষ্ট্রের ধারণা সামাজিক।

(৪) বার্ক বলেন—রাষ্ট্র হঠাৎ—গজানো কোনও হিস্সাদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয়; ধীর ও ধারাবাহিক তার ক্রমবিবর্তন

পঞ্চমতঃ, ব্লুনট্শ্লির মতে, সামাজিক চুক্তি মতবাদকে হব্স্ বা রুশোর মত চরম-ভাবে সমর্থন করলে সমাজকে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ঠেলে দেওয়া হয়। হব্স্ এবং রুশো যথাক্রমে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং স্বৈরাচারী গণতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। এই দুরকম চরম পন্থাই রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। ব্লুনট্শ্লি তাই বলেছেন যে এই মতবাদ সমাজকে চরম বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন করে দেয়। মানুষ ইচ্ছামত যদি রাষ্ট্র স্থাপন করতে পারে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে মানুষ যখন খুশী, যেভাবে খুশী রাষ্ট্রের কাঠামো ভেঙ্গে দিতেও পারে।

(৫) হব্স্ বা রুশোর চরম-পন্থী ব্যাখ্যায় এ মতবাদ বিপজ্জনক

বলা বাহুল্য, উভয় প্রকার যুক্তিই আপেক্ষিক, সব দেশে বা কালে তা সনাতন সত্য নয়।

কিন্তু চুক্তি মতবাদের বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। প্রথমতঃ মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিক্ষুব্ধ জনগণকে প্রতিবাদমুখর করে তুলতে খুবই সাহায্য করেছিল। স্পেনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে এবং হল্যাণ্ডে হিউগেনট্গণ (Huguenots) বিদ্রোহ করেন। এ প্রসঙ্গে সেণ্ট্ বার্থোলিমিউ দিবসের হত্যাকাণ্ড চিরস্মরণীয় দুর্ঘটনা। এ রকম ধর্মান্ধতা, বর্বরতা ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে দূর করার সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক পথে সামাজিক চুক্তি মতবাদ একটি সুদৃঢ়, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে গৌরবময় বিপ্লবের (Glorious Revolution, 1688) ফলে ইংরেজ জনগণ অত্যাচারী রাজাকে পদত্যাগ ও দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেন। ১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হন। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী জনগণ যুগান্তকারী বিপ্লবের সূচনা করে এবং মানবিক ও নাগরিক অধিকারপত্র (Declaration of the Rights of Man and of Citizens) অনুমোদন করে। আধুনিক যুগে ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবও অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনগণের সরব ও বলিষ্ঠ প্রতিক্রিয়া। বর্তমান যুগে সত্তরের দশকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সুতরাং একথা পরিষ্কার বলা যায় যে, মধ্যযুগীয় অত্যাচারী সামন্ততন্ত্র, যাজকতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদ গণতন্ত্রের সুমহান্ আদর্শ সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন ও সক্রিয় করে তুলেছিল, বর্তমান যুগেও জনগণ সর্বত্রই বিপ্লবমুখী। সামাজিক চুক্তি মতবাদের পরোক্ষ ফলশ্রুতি স্বরূপ রাষ্ট্রগঠনের কারণরূপে বিধাতৃ-বিধানের তত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব চিরতরে পরিত্যক্ত হল, গণতন্ত্রের অগ্রগতি আর বন্ধ করা গেল না। আধুনিক যুগের সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী বিকৃতমনা জঙ্গী রাষ্ট্রনায়কদের কাছে এই মতবাদটি চরম হুঁসিয়ারীর পরোয়ানা সন্দেহ নেই।

চুক্তি মতবাদের ঐতিহাসিক মূল্য: (১) এ মতবাদ প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছে—হিউগেনট্ বিক্ষোভের পরবর্তী বিপ্লবগুলির ওপর এর প্রভাব—১৬৮৮ সালে ইংলণ্ডে, ১৭৭৬ সালে আমেরিকায় ও ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে বিপ্লবের ওপর সুস্পষ্ট প্রভাব, এই বিপ্লব চেতনাই পরে ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্রে ও এ শতকের সত্তরের দশকে বাংলাদেশী মুক্তি যুদ্ধকে উদ্বুদ্ধ করে

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনে ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তত্ত্বগতভাবেও সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। (ক) বার্কার বলেন যে, স্বাধিকার (Liberty) এবং ন্যায়াদর্শ (Justice) এই দুটি গণতান্ত্রিক নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সামাজিক চুক্তি মতবাদ আধুনিক জনগণের মূল্যবোধকে সুদৃঢ় করে তুলেছে। (খ) জাঁ বদ্যাঁর (Jean Bodin) সময় থেকে সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে লোকের ধারণা একপেশে

ছিল। সার্বভৌমত্ব বলতে জনগণের ওপর প্রযোজ্য রাষ্ট্রের অসীম শক্তিকেই বোঝাত। কিন্তু সামাজিক চুক্তির ব্যাখ্যাকাররূপে হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশো যেভাবে সার্বভৌমত্বের বিশ্লেষণ করেন, তা থেকে আইনগত সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব, নামসর্বস্ব বা উপাধিসূচক সার্বভৌমত্ব, লোকায়ত সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সকলের তত্ত্বগত ধারণা স্বচ্ছতর হয়ে ওঠে। (গ) সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা থেকেই সর্বপ্রথম রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে বিভেদ দেখাবার প্রচেষ্টা শুরু হয়। চুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব থাকা পর্যন্ত তার রাষ্ট্রত্ব বিনষ্ট হয় না, কিন্তু সরকারের অদল বদল হতে পারে—এই মন্তব্যটি লক্‌ প্রথম প্রচার করেন। (ঘ) কোন কোন সমালোচক লকের ব্যাখ্যা থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের (Individualistic Theory) পূর্বাভাস পেয়েছেন বলে মনে করেন। কারণ, লক্‌ নিয়মতান্ত্রিক ও সার্বভৌম রাজতান্ত্রিক সরকারের প্রধান দায়িত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন যে, রাষ্ট্রের উচিত ব্যক্তির জীবন, তার স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা। (ঙ) মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র (Feudalism) এবং চরম রাজতন্ত্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তির জীবন, মান-মর্যাদা চরমভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। রাষ্ট্রপরিচালনার অংশীদাররূপে, সমাজে নীতিনির্ধারণের শরিকরূপে ব্যক্তির ভূমিকার ওপর কোনও গুরুত্ব দেওয়া হত না। এইভাবে যখন ব্যক্তিজীবন কুসংস্কার ও হতাশার ঘন তমিস্রায় আচ্ছন্ন ছিল, তখন সামাজিক চুক্তি মতবাদ গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের আদর্শকে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছিল, ব্যক্তিকে নিজের অধিকার, মান-মর্যাদা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে তার অপরিহার্যতা সম্বন্ধে সার্থকভাবে আত্মসচেতন ও আশাবাদী করে তুলেছিল। কারণ, গণতন্ত্র মানেই গণতান্ত্রিক নাগরিকের জয়যাত্রা।

(২) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব ঃ (ক) স্বাধিকার, ন্যায়দর্শের নীতির ওপর গুরুত্ব প্রদান (বার্কার); (খ) জাঁ বোদ্যাঁর সার্বভৌম নীতির তত্ত্বগত সম্প্রসারণ; (গ) রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে বিভেদ নির্ণয়ের প্রথম প্রচেষ্টা; (ঘ) পরবর্তী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ওপর লকের প্রভাব; (ঙ) গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের শাশ্বত সত্যতা সম্বন্ধে জনগণকে আশ্বাসদান

॥ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে আধুনিক গ্রাহ্য মতবাদ ঃ ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ ॥

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **গার্নার** (Garner) বলেছেন যে, **রাষ্ট্র** বিধাতৃসৃষ্ট নয়, সবলের শক্তির প্রকাশ নয়, চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট নয়, পরিবারের সম্প্রসারণের ফলও নয়। এটি **ক্রমিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল।** গার্নারের ভাষায়—"The State is neither the handiwork of God, nor the result of a superior physical force, nor the creation of resolution or convention, nor a mere expansion of the family. It is the result of historical

গার্নারের মতে রাষ্ট্র মানবসমাজের ধীর ধারাবাহিক বিবর্তনের ফল ঃ মেন্‌ ও বার্জেসের মতও তাই

evolution")। মেন্ (Maine,) বার্জেস্ (Burgess) প্রভৃতি যে সমস্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঐতিহাসিক আলোচনা পদ্ধতির সমর্থক, তাঁরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যার জন্য **বিবর্তনবাদের** (Evolutionary theory) ওপর খুব জোর দিয়েছেন। বার্জেস্ বলেছেন—"রাষ্ট্র মানবসমাজের অবিরাম ক্রমবিকাশের পরিণতি" ("The State is the product of continuous development of human society")।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে-ওঠা রাষ্ট্রের রূপান্তরলাভ একটা বিরাট রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা

সামাজিক বিবর্তনের অর্থ হল সমাজের বিভিন্ন স্তরের ক্রমিক বা **ধারাবাহিক পরিবর্তন**। এই পরিবর্তন ঘটেছে অত্যন্ত মন্থর গতিতে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, লোকচক্ষুর অজ্ঞাতসারে। আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন যে, সামাজিক বিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব ও রূপান্তরলাভ মানব-সভ্যতার সুদীর্ঘ অখণ্ড ধারাবাহিকতারই অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ।

হার্বার্ট্ স্পেন্সারের সমাজ-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ঃ বেজ্‌হটের সমর্থন

হার্বার্ট্ স্পেন্সার উপজাতীয়, সামরিক ও শিল্পজ স্তরগুলিকে সমাজের ক্রমিক বিবর্তনের এক একটি ধাপ বলে বর্ণনা করেছেন। অপর ইংরেজ লেখক বেজ্‌হট্‌ও (Bagehot) অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বলেছেন যে, প্রথমে সামাজিক প্রথাগুলির জন্ম হয়। তারপর চলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর দলাদলি। সব শেষে চলে আলোচনা ও আপোষের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। যদিও বিবর্তনবাদী লেখকদের সামাজিক বিবর্তন বিষয়ে চিন্তাধারা খুবই কল্পনাভিত্তিক, তবুও তাঁরা ইতিহাসের আলোকে ফেলে-যাওয়া তমসাচ্ছন্ন আলো-আঁধারি অতীতকে দেখতে চেষ্টা করেছেন। তাই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য এ সম্বন্ধে অন্যান্য মতবাদের প্রবক্তাদের বক্তব্যের চেয়ে বেশী যুক্তিনির্ভর ও বাস্তবধর্মী।

সমাজ গড়ে ওঠে রাষ্ট্রের উৎপত্তির অনেক আগে। প্রথমতঃ, রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আদিম মানুষ তার সন্তানসন্ততিদের নিয়ে পরিবার (Family) গড়ে তুলল। এঙ্গেল্‌স্ (Engels) বলেন, প্রথমে মানুষ আদিম সমভোগী জীবন (Primitive Communism) যাপন করত। ক্রমশঃ বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে মিলনের ফলে এক এক

রাষ্ট্রের বিবর্তনের ওপর বিভিন্ন প্রভাব ঃ (১) রক্তের বন্ধনের প্রভাব ঃ গোষ্ঠী, উপজাতি, দেশপ্রেম, জাতীয়তা ঃ এঙ্গেল্‌সের ব্যাখ্যা

অঞ্চলের পরিবারগুলি সম্প্রসারিত হয়ে গড়ে উঠল গোষ্ঠী (Tribe)। গোষ্ঠীপতি বা কুলপতি এক একটি বিরাট গোষ্ঠীর উপর নেতৃত্ব করতেন। ক্রমে গোষ্ঠী প্রসারিত হয়ে উপজাতি (Clan) জন্ম নিল, উপজাতি থেকে জাতির (Nation) উদ্ভব হল। কৃষি-ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হবার ফলে এক একটি উপজাতি নদীর ধারে ধারে গ্রামীন পরিবারভিত্তিক সমাজ সৃষ্টি করল। নদীমাতৃক এই সংস্থাগুলি স্থায়ী অঞ্চলে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ধীরে ধীরে আঞ্চলিক সহানুভূতি গড়ে তুলল। এই আঞ্চলিক হানুভূতিই হল "ভিটে মাটির টান" বা দেশপ্রেম বা জাতীয় চেতনা।

জাতীয়তার ভিত্তিতে ছোট বড় রাষ্ট্র গড়ে উঠল। এইভাবে আধুনিক জাতীয়-রাষ্ট্রের (Nation-State) সূচনা। সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে ম্যাক্‌আইভার বলেন যে কর্মকর্তার কর্তৃত্ব ক্রমশঃ গোষ্ঠীপতির ও পরে রাষ্ট্রপতির বা সেনাপতির কর্তৃত্বের রূপ লাভ করে।

দ্বিতীয়তঃ, **ধর্মীয় বন্ধনও** আদিম মানুষদের একত্রিত করে তোলে। ধর্ম গোষ্ঠীভুক্ত আদিম অধিবাসীদের পারিবারিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কুলপতি যেমন গোষ্ঠীর নেতারূপে সম্মাননীয় হতেন, তেমনি সম্মান পেতেন কুলপুরোহিত। প্রাচীন সমাজে মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির কার্য-কারণ সম্বন্ধ সম্পর্কে অনেক সময় সম্পূর্ণ অবহিত ছিল না। জোড্‌ (Joad) বলেছেন যে, প্রাচীন যুগের পুরোহিতগণ অনেক সময় এই নৈসর্গিক ঘটনাগুলির নিয়ন্ত্রণে দেবদেবীর আরাধনায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেন। সময় সময় তাঁরা ইন্দ্রজাল ও অন্যান্য ছলচাতুরীরও আশ্রয় নিতেন। এইভাবে অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রিক চেতনার অভ্যুদয়ের আগেই অতিপ্রাকৃতিক (supernatural) বা ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। ফ্রয়েড্‌ প্রভৃতি মনস্তত্ত্ববিদ্‌ ও ম্যালিনাওস্কি প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ্‌ ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ ভোজবিদ্যা (Magic) বা ডাকিনীতন্ত্র বা ডাইনীতন্ত্র (Witchcraft) সুপ্রাচীন যুগে অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক বিশ্বাস গড়ে তুলে আদিম মানুষকে এক ধরনের ধর্মচেতনায় অন্ধবিশ্বাসী করে দেয় বলে মনে করেন। পুরোহিত ও ধর্মীয় সংগঠনের প্রতি আনুগত্য থেকে মানুষের মনে কোন নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিকে মেনে চলার অভ্যাসও গড়ে উঠল। পরে যথাসময়ে রাষ্ট্রিক কর্তৃত্বের বশ্যতা স্বীকার করা প্রাচীন জনগণের কাছে যেন একটা নৈতিক বাধ্যতার রূপ নিল।

(২) ধর্মীয় বন্ধনের প্রভাব : প্রাকৃত ঘটনার বিজ্ঞানে অজ্ঞান আদিম মানুষকে ধর্ম অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী করিয়ে এক ধরনের নৈতিক বাধ্যতা সৃষ্টি করেছিল : ফ্রয়েড, ম্যালিনাওস্কি ও জোডের ব্যাখ্যা

রাষ্ট্রগঠনের তৃতীয় সক্রিয় উপাদান হল ব্যক্তিগত ও **দলীয় শক্তি** (Force)। যাযাবর জীবন ত্যাগ করে মানুষ যখন কৃষিভিত্তিক সমাজের স্থায়ী অধিবাসী হল, তখন দেখা দিল তার নিজস্ব ক্ষেত-খামারের মালিকানার স্বত্ব নিয়ে সমস্যা। আদিম মানুষ ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির মালিক হল। তারপর প্রশ্ন উঠল কিভাবে এই ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির অধিকার সংরক্ষিত করা যায়। সমাজের সদস্যদের সম্পত্তি ও জীবনরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হল বীর গোষ্ঠীপতির ওপর। শুধু তাই নয়। এক উপজাতি অনেক সময় পার্শ্ববর্তী অপর উপজাতিকে আক্রমণ করত। এ ধরনের যুদ্ধে যিনি উপজাতির সামরিক নেতারূপে নির্বাচিত হতেন, যুদ্ধের শেষে শান্তির সময়ও তাঁর নেতৃত্ব স্বীকৃত ও সম্মানিত হত। তাই বলা হয়—যুদ্ধই রাজতন্ত্রের জন্মদাতা (war begot the king)।

(৩) ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত শক্তির প্রভাব : যুদ্ধজয়ী সেনাপতির বিশেষ নেতৃত্ব : "যুদ্ধই রাজতন্ত্রের জন্মদাতা"

চতুর্থতঃ, রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের পর মানুষ অপেক্ষাকৃত উন্নততর সংগঠনের প্রেরণা পেল। পারস্পরিক সহযোগিতা সহানুভূতি এবং জাতীয়তাবোধ ক্রমে ক্রমে মানুষকে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ করে তুলল, গণতান্ত্রিকতার আদর্শ ধীরে ধীরে ব্যক্তিমানসকে উদ্বুদ্ধ করল।

(৪) রাজনৈতিক চেতনার, সামাজিক মূল্যবোধের, গণতান্ত্রিক আদর্শের সর্বাত্মক প্রভাব

পঞ্চমতঃ, **অর্থনৈতিক কারণেও** মানুষ রাষ্ট্রগঠনের প্রেরণা লাভ করল। দারিদ্র্য, অভাব প্রভৃতি সমস্যার সমাধানে আদিম মানুষ তার একান্ত আত্মকেন্দ্রিক জীবন ছেড়ে দিয়ে সমাজের অন্য সকলের সঙ্গে অর্থনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ হল। বিনিময়-ব্যবস্থার চাপে পড়ে মানুষ তার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য পরস্পর-নির্ভরশীল হয়ে উঠল। ধানের বিনিময়ে কৃষক মাংস-বিক্রেতার কাছ থেকে মাংস পেল, মাংস-বিক্রেতা পেল ধান। ক্রমে মুদ্রার আবির্ভাবে বিনিময়-ব্যবস্থার চরম অগ্রগতি লক্ষিত হল। আধুনিক রাষ্ট্রও সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের পথে নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাবার তাগিদ অনুভব করল। মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত সম্পত্তির (private property) অধিকারের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেন।

(৫) অর্থনৈতিক কারণের প্রভাব ঃ অভাব, দারিদ্র্য দূরীকরণে রাষ্ট্রের মত সংস্থার প্রয়োজনবোধ।

সুতরাং সংক্ষেপে বলতে গেলে রাষ্ট্র শুধু পরিবারের সম্প্রসারণে, কিংবা ধর্মীয় নির্দেশে অথবা সামরিক শক্তির চাপে বা জনগণের হঠাৎ-পাওয়া চুক্তি করবার প্রেরণায় গঠিত হয় নি। রাষ্ট্র এই উপাদানগুলির প্রত্যেকটিরই নানা সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় ঘাতপ্রতিঘাতের প্রতিক্রিয়ার একটা সামগ্রিক ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি। আদিকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক বিবর্তন এভাবেই।

সংক্ষেপে, আদিকাল থেকে অজস্র ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে রাষ্ট্রের উৎসারণ ও সম্প্রসারণ ; এরই নাম "রাষ্ট্রের সামাজিক, ঐতিহাসিক বিবর্তন"—রাষ্ট্রের উৎপত্তির সার্থক ব্যাখ্যা

রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে **বিবর্তনমূলক বা ঐতিহাসিক মতবাদকে** আধুনিকতম মতবাদরূপে সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই স্বীকার করেন। এই মতবাদে রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের কারণ হিসাবে কোনো নির্দিষ্ট একটি উপাদানেরওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। ঐতিহাসিক মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে একটা সমন্বয়প্রয়াসী (synthetic) দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। এটাই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। রাষ্ট্র যে আজ তার চরম পরিণতি লাভ করে রাষ্ট্রিক বিবর্তনের শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে, এমন কথা বলা যায় না। আধুনিক রাষ্ট্র একজাতীয় (Monc-national) রাষ্ট্ররূপে পরিচিত। আজ গণতন্ত্রকে অত্যন্ত সহজে যেন রাষ্ট্রের স্বাভাবিক শক্তির উৎস বলে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু কত না ভাবনার ও ঘটনার সংঘাতের ফলে রাষ্ট্রের এই আন্তরিক মানবিক কল্যাণসাধনের প্রচেষ্টা রাষ্ট্রকে একটি

সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান ("বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়") রূপে গড়ে তুলেছে। বর্তমান পারমাণবিক যুগে রাষ্ট্রের এই মানবিক রূপটি সব সময়ে স্মরণ রাখতে হবে। তবেই মানবসভ্যতা ও জ্ঞানের, প্রজ্ঞা ও প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে আজকের রাষ্ট্র আগামী দিনের সুসমৃদ্ধ বিশ্বরাষ্ট্রে পরিণত হবে, এটাই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিশ্ববাসীর একান্ত কামনা। তাই "ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ"কে শুধু যে রাষ্ট্রের অতীতকালের সঠিক ইতিবৃত্ত বলে ধরা হয় তাই নয়। এর মধ্যে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রূপবিস্তারের স্বাভাবিক সম্ভাবনার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়।

উপসংহার : রাষ্ট্রের উৎপত্তি, তার ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিবর্তন সম্পর্কে গ্রাহ্য এই মতবাদ শুধু অতীত বা বর্তমানকে নিয়ে জড়িত নয়, মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ বিবর্তনের ধারাও এতে বিধৃত

ঐতিহাসিক বা **বিবর্তনবাদী মতের** নানাপ্রকার **সমালোচনা** হয়েছে। প্রথমতঃ, ইংরেজ মনীষী হব্‌হাউস্ (Hobhouse) প্রভৃতি সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন যে, ঐতিহাসিক মতবাদ রাষ্ট্র গঠনের পেছনে নানাপ্রকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাহ্য কার্য-কারণের ওপর জোর দিয়েছে, কিন্তু সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম — এগুলির কোন চেতনাভিত্তিক ক্রমবিকাশের অর্থাৎ মানবমননের ও মানবসমাজের আভ্যন্তরীণ ক্রমপরিবর্তনের ধারার ওপর জোর দেয় নি। "মূল্যবোধের বিবর্তন" ("Morals in Evolution") সম্পর্কে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থে হব্‌হাউস্ এই বক্তব্যটি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে মানুষের মূল্যবোধের ক্রমবিবর্তন তাকে সংকীর্ণতা থেকে উদারতার পথে ধাবিত করে তার রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে, তাকে স্বচ্ছতর করে তুলে তাকে ক্রমশঃ অধিকতর সমাজসচেতন ও রাষ্ট্রনির্ভর করে তুলেছে।

রাষ্ট্রের বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যার সমালোচনা : (১) হব্‌হাউস্ বলেন—রাষ্ট্রের বিবর্তন শুধু ঘটনাভিত্তিক নয়, চেতনাভিত্তিকও বটে : তাই তিনি "মূল্যবোধের বিবর্তনের" ওপরও জোর দিয়েছেন

দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিক মতবাদ বেশী কল্পনাশ্রয়ী। তাই এই মতবাদে কবে কখন কোথায় রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট তথ্য সঠিক জানা যায় না। কেবল জানা যায়—কিভাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে।

(২) এ মতবাদ বেশী কল্পনাশ্রয়ী

তৃতীয়তঃ, মার্ক্‌স্‌বাদীদের মতে শুধু অর্থনৈতিক প্রভাবের দ্বারাই সামাজিক বিবর্তন (social change) ঘটে। তাই তাঁরা রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে বিবর্তনবাদকে কেবল একটি বিশেষ অর্থে স্বীকার করেন। মার্ক্‌স্ তাঁর সুবিখ্যাত "ডাস্ কাপিটাল্" ("Das Kapital") নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, উৎপাদনের সূত্রগুলি বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে বণ্টনব্যবস্থায় বৈষম্য সৃষ্টি করে। ফলে প্রাথমিক স্তর থেকেই সমাজ সমভোগবাদী (communitarian বা communistic) হতে পারে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সামন্তপ্রথা (Feudalism) জন্ম নিল। ফলে ভূস্বামী (Feudal Baron) এবং ভূমিহীন কৃষক (Serf) এই দুটি শ্রেণী গড়ে উঠল। এই

(৩) মার্ক্‌স্‌বাদীগণ একটি বিশেষ অর্থে এই মতবাদ সমর্থন করেন—তাঁদের কাছে "অর্থনৈতিক বিবর্তন" মুখ্য, "সামাজিক বিবর্তন" গৌণ ও আনুষঙ্গিকমাত্র

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভূস্বামীগণ শোষক, সার্ফ্‌গণ শোষিত। শিল্পবিপ্লবের (Industrial Revolution) পরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে ধনতন্ত্রের (Capitalism) আবির্ভাব ঘটে। তখন শোষক শোষিতের চিরন্তন শ্রেণীসংঘাত (class-struggle) এমন চরম আকার ধারণ করে যে, শোষিত সর্বহারা শ্রেণী (Proletariat) ধনিক (Bourgeois) শ্রেণীকে বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করতে বাধ্য হয়। ফলে সর্বহারাদের নেতৃত্বে শ্রেণীবিহীন সাম্যবাদী সমাজ (Dictatorship of the Proletariat) স্থাপিত হয়। সুতরাং মার্ক্সীয় বিচারে অর্থনৈতিক রূপান্তরের মধ্য দিয়েই সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিবর্তন সূচিত হয়, বিবর্তনের অন্য ঘটনাগুলি গৌণ, সেগুলি অর্থনৈতিক সূত্রের পরিচালনাধীন।

সারাংশ

মানুষ স্বভাবতঃই সামাজিক জীব ; তার গোষ্ঠীপ্রীতির জন্যই সে সংঘবদ্ধভাবে রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্গে সামিল হল।

রাষ্ট্রের উদ্ভব ব্যাখ্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও ইতিহাসের যৌথ ভূমিকা আছে—মহেঞ্জোদরো, হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ অতীত সভ্যতার নিদর্শন। তার সাক্ষ্যপ্রমাণ পুরাকালের মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের, রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের খণ্ড খণ্ড পরিচিতি।

ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান—সকলেরই বক্তব্য এক ঃ সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব । এই উদ্ভব ব্যাখ্যার জন্য অনুমানভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক দুরকম মত প্রচার করা হয়।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্লুন্ট্‌শ্‌লির তিনটি ঐতিহাসিক অবস্থার বর্ণনা ঐতিহাসিক দিক থেকে মূল্যবান।

বিধাতৃবিধানতত্ত্বঃ এর ধারাবাহিক ইতিহাসে একটি বক্তব্যই সুপরিস্ফুট—রাষ্ট্র ঈশ্বরের একটি অলৌকিক প্রতিষ্ঠান। এর ভিত্তিতে মধ্যযুগে ধর্মীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

বিধাতৃবিধান তত্ত্বের সমালোচনা ঃ ১। এই মত স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের অনুপূরক ; ইতিহাস স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র ত্যাগ করে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ; ২। এই মত সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট ; স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র আদর্শ শাসনব্যবস্থা নয় ; ৩। রাষ্ট্র অলৌকিক প্রতিষ্ঠান নয়, রীতিমত মানবিক প্রতিষ্ঠান। ৪। এই মত অনৈতিহাসিক। ৫। এই মত ধর্মতত্ত্বের বিকৃত ব্যাখ্যা করে। স্বৈরাচারী রাজা কি মঙ্গলময় ঈশ্বরের দূত হতে পারেন ? এ বিষয়ে বাইবেলের নির্দেশ।

বিধাতৃবিধান তত্ত্বের ঐতিহাসিক মূল্য—১। এতে রাষ্ট্রের শুভ উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট। ২। ধর্মীয় অনুশাসন অতীতে সমাজে শৃংখলাবোধ এনেছে। ৩। পরবর্তীকালে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পত্তনে এর ভূমিকা। ৪। বীরপূজার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের সংগঠন। ৫। ধর্মের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ।

উপসংহার ঃ ধনতন্ত্রের আবির্ভাবে সামন্ততন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের অবলুপ্তি ; মধ্যবিত্তদের নেতৃত্বে উদারপন্থী গণতন্ত্রের ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সূচনা। কিন্তু এখনও ধর্মীয় রাষ্ট্র লুপ্ত নয়। ইরান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ঐস্লামিক রাষ্ট্রের নজির। অবশ্য এ রাষ্ট্রগুলি ধর্মাশ্রয়ী রাজতন্ত্র নয়, কোথাও শুধু ধর্মীয়, কোথাও বা জঙ্গী ও ধর্মীয় প্রজাতন্ত্র।

শক্তিবাদের বক্তব্য—ব্যক্তিমানসের দুর্বলতা দূর করার জন্য চাই সবলের নেতৃত্ব। এই ধারণার মধ্য দিয়ে বীরপুঙ্গবের নেতৃত্বে রাষ্ট্রের উদ্ভব। পৌরাণিক যুগে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, মহাভারতে, হোমারের কাব্যে এবং হেরাক্লিটাস্, মধ্যযুগীয় খৃস্টান যাজকবর্গের বাণীর মধ্যে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। আধুনিক

যুগে লীকক্, জেঙ্কস্, বুন্টশ্লি ও ওপেনহাইমার নানাভাবে এই মত সমর্থন করেন। হেগেল, ট্রাইটস্কে, নীটসে, ফিস্টে প্রভৃতির ব্যাখ্যায় শক্তিবাদ যুদ্ধবাদে পরিণত হয়। ডারউইনপন্থী হার্বার্ট স্পেন্সার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থনে এই মত ব্যাখ্যা করেন। মার্কসবাদীগণ কিন্তু পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণশক্তির প্রতীক রাষ্ট্রের উচ্ছেদ চান। গডউইন, বাকুনিন প্রমুখ নৈরাজ্যবাদীরা আরেক অর্থে রাষ্ট্র-শক্তির কবল থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করতে চান। শক্তিবাদের লৌকিক সমর্থন—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা", "জোর যার মুলুক তার"। ভারতের গ্রামে গ্রামে এখনও ঔপনিবেশিকতার জের—থানার বড়বাবু, হাকিম সাহেব ইত্যাদি আঞ্চলিক রাজশক্তির প্রতীক।

শক্তিবাদের সমালোচনা—(১) বলপ্রয়োগই রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও স্থায়িত্বের একমাত্র কারণ নয়। অর্থনৈতিক কারণ, ধর্মীয় বন্ধন, রাজনৈতিক চেতনা ইত্যাদিরও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ও আছে—লীককের নিজেরই স্বীকৃতি। (২) গ্রীন ও ম্যাকআইভার বলেন—জনগণের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি। (৩) এই মতবাদ নীতিবিরোধী। হবস্ মানুষের চরিত্রের কেবল খারাপ দিকগুলির ওপর জোর দিয়ে শক্তিবাদী রাজতন্ত্র সমর্থন করেন। (৪) এই মত যুদ্ধবাদী, বিশ্বশান্তির পরিপন্থী। (৫) এই মত অগণতান্ত্রিক। কারণ এর দ্বারা একনায়কতন্ত্রী স্বৈরাচার সমর্থিত। (৬) গিলক্রাইস্টের মত গান্ধীজীও অহিংসা ও নৈতিক শক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। (৭) ডারউইনপন্থী স্পেন্সারের যুক্তি পরিত্যক্ত : সবলের রাজ্যে প্রতিভাবান্ প্রতিবন্ধীদের কি কোন স্থান নেই ?

উপসংহার—রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে অতীতের বীর নেতাদের কৃতিত্ব অবশ্যস্বীকার্য। শেষ ব্যাখ্যায় আরক্ষা, প্রতিরক্ষা, কারাগার ইত্যাদি রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক। কিন্তু এ সবই গণতান্ত্রিক নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের ইতিহাস—মহাভারত, বৌদ্ধ জাতক ও নিকায়, কৌটিল্য, বাইবেলের প্রাচীন সংহিতায় এই মতের সমর্থন মেলে। উলপিয়ান, মেনগোল্ড, হবস্, লক্, হিউম্, রুশো, গ্রোটিয়াস্, স্পিনোজা, পুফেনডর্ফ ও কাণ্টের সমর্থন।

"লেভিয়াথান" গ্রন্থে হবসের ব্যাখ্যা—চুক্তির দ্বারা গঠিত সার্বভৌম রাষ্ট্রই যেন লেভিয়াথানতুল্য বিশাল সামুদ্রিক জীব। প্রাক্-রাষ্ট্রীয় প্রাকৃতিক রাজ্যের অধিবাসীগণ নারকীয় জীবন থেকে মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠন করল। সমকালীন ইংলণ্ডের অশান্তি দূরীকরণের তাগিদে হবস্ স্বেচ্ছাচারী রাজার সার্বভৌমত্ব সমর্থন করেন। তাঁর মতে প্রজাদের মধ্যে একটিমাত্র চুক্তির ফলেই এই অসীম, অ-হস্তান্তরযোগ্য সার্বভৌমত্বের উদ্ভব। জনগণ চুক্তিভঙ্গ করতে চাইবেন না, কারণ তা করলে ভয়াবহ পূর্বাবস্থার পুনরাবির্ভাব হবে। সুতরাং সার্বভৌমের আদেশই আইন, ব্যক্তিস্বাধীনতা তাঁর দান।

হবসের মতের সমালোচনা—(১) স্যাবাইনের মতে হবস্ স্বেচ্ছাচারী রাজার বিকল্পরূপে 'ব্যক্তি-সংসদকেও" সার্বভৌম বলেছেন। (২) কোন চুক্তিই একপক্ষীয় নয়। (৩) হবস্ ও অস্টিন্ দুজনেই চরমপন্থী। (৪) হবস্ ব্যক্তিমনের অশুভ প্রবণতার ওপরই জোর দিয়েছেন। (৫) রাষ্ট্র ও সরকার অভিন্ন নয়।

শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার ওপর হবস্ সঠিকভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

লকের ব্যাখ্যা—১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে যে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র দেখা দিল, লক্ তার সমর্থনে চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, প্রাক্-রাষ্ট্রীয় প্রাকৃতিক রাজ্যে অধিবাসীদের জীবন শান্তিপূর্ণ ছিল। তবুও তাদের প্রাকৃতিক আইনের তাৎপর্য বোঝাতে ও প্রাকৃতিক অধিকার কায়েম করার জন্য রাষ্ট্রশক্তির দরকার হল। ফলে চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র স্থাপিত হল। লক্ দুটি চুক্তির কথা বলেন—প্রজাদের নিজেদের মধ্যে (সামাজিক চুক্তি) এবং রাজার সঙ্গে প্রজাদের (প্রশাসনিক চুক্তি)। দুটি চুক্তিই পরস্পরের পরিপূরক। লক্ প্রথম আইনগত সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের মধ্যে এবং রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন।

লকের মতের সমালোচনা—(১) হবস্ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বকে, লক্ আইনগত সার্বভৌমত্বকে উপেক্ষা করেছেন। (২) লক্ সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের সমর্থক, প্রজাতন্ত্রের সমর্থক নন।

লকের মতের ঐতিহাসিক মূল্য—(১) তাঁর ব্যাখ্যা গণতান্ত্রিক। (২) সকলের সম্মতির ওপরই রাষ্ট্রের

ভিত্তি। (৩) জনগণের বিদ্রোহ করার এবং (৪) উপযুক্ত ক্ষেত্রে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকারের ওপর তিনি গুরুত্ব দেন।

"দ্য কঁত্রাত্ সোসিয়াল্" গ্রন্থে রুশো নতুনভাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করে খ্যাত হন। তিনি বলেন—প্রাক্‌রাষ্ট্রীয় স্বর্গরাজ্যতুল্য প্রাকৃতিক রাজ্যেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমস্যা প্রভৃতির জন্য জনজীবন অসম ও অশান্ত হয়ে পড়ে। তাই সামাজিক চুক্তির দ্বারা জনগণ রাষ্ট্র স্থাপন করে। চুক্তি হল একটিমাত্র—সকলের সঙ্গে প্রত্যেকের ও প্রত্যেকের সঙ্গে সকলের। ফলে সমাজের সাধারণ মঙ্গলকামী ইচ্ছাশক্তির বাহকরূপে সমস্ত জনসমাজই সার্বভৌম হলেন।

রুশোর মতের সমালোচনা—(১) রুশোর "সাধারণ ইচ্ছাশক্তি" কার্যতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। (২) হেগেলপন্থীগণ এই মতের দ্বারা সর্বাত্মক রাষ্ট্রের সমর্থন করেন। (৩) রুশোর মত অবাস্তব, কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে প্রযোজ্য। (৪) হব্‌স্ রাজার স্বৈরাচার, রুশো জনগণের স্বৈরাচার সমর্থন করেন ঃ দুজনেই চরমপন্থী। (৫) আধুনিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল, চাপগোষ্ঠী, স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাবে "সাধারণ ইচ্ছাশক্তি" দেখা যায় না।

রুশোর মতের ঐতিহাসিক গুরুত্ব - (১) রাষ্ট্রের জনকল্যাণকর উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা ; (২) ভল্‌তেয়ার, দিদেরো প্রভৃতির মত তিনিও ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেন।

হব্‌স্, লক্ ও রুশোর মতের সাদৃশ্য—(১) প্রাক্-রাষ্ট্রীয় প্রাকৃতিক জীবনের অস্তিত্ব, (২) সেখানকার অধিবাসীদের প্রাকৃতিক অধিকারের অস্তিত্ব, (৩) সেখানে নানা অসুবিধা এবং (৪) সেজন্য সামাজিক চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রস্থাপনা—এই ব্যাপারগুলি নিয়ে মতৈক্য।

হব্‌স্, লক্ ও রুশোর মতের বৈসাদৃশ্য—(১) প্রাকৃতিক রাজ্যে জনজীবনের অবস্থা, (২) চুক্তির ফলে গঠিত সার্বভৌমত্বের স্বরূপ এবং (৩) রাষ্ট্রীয় আইনের প্রকৃতি নিয়ে মতভেদ।

মর্লের মতে হব্‌স্ ও লকের মতের মধ্যে রুশো সমন্বয় সাধন করেন। মর্লের মতে এই সমন্বয়ের লক্ষণগুলি হল—(ক) রুশো ও হব্‌সের মধ্যে যুক্তিগত ও মেজাজগত মতৈক্যের ক্ষেত্র—(১) প্রাকৃতিক রাজ্যে চরম অশান্তির ফলেই চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রগঠনের তাগিদ, (২) চুক্তি হল একটিমাত্র, (৩) রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব হল একটা চরম শক্তি। (খ) রুশো ও লকের সিদ্ধান্তের মধ্যে মিল—জনকল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু মর্লের ব্যাখ্যাও ত্রুটিপূর্ণ। রুশো প্রজাতন্ত্র সমর্থন করে লকের চেয়ে অনেক বেশী প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রী ছিলেন। কারণ, লক্ ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা - (১) মেনের মতে এ মতবাদ অনৈতিহাসিক। (২) মেফ্লাওয়ার জাহাজের যাত্রীরা নতুন বসতি ও "রাষ্ট্র" স্থাপনের আগেই তাঁদের রাজনৈতিক চেতনা ছিল। (৩) এই মতবাদ অযৌক্তিক ঃ প্রাক্-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অধিবাসীদের প্রাকৃতিক অধিকারের অস্তিত্ব অকল্পনীয়, কারণ, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ছাড়া অধিকারভোগ সম্ভব নয়। (৪) বার্ক্ বলেন—রাষ্ট্র হঠাৎ-গজানো কোনও হিস্‌সাদারী ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নয় ; ধীর ও ধারাবাহিক তার ক্রমবিবর্তন। (৫) হব্‌স্ বা রুশোর চরমপন্থী ব্যাখ্যায় এ মতবাদ বিপজ্জনক।

চুক্তি মতবাদের ঐতিহাসিক মূল্য ঃ (১) এ মতবাদ প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে—হিউগেনাট্ বিক্ষোভের পরবর্তী বিপ্লবগুলির ওপর এর প্রভাব—১৬৮৮ সালে ইংলণ্ডে, ১৭৭৬ সালে আমেরিকায় ও ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে বিপ্লবের ওপর এর সুস্পষ্ট প্রভাব। (২) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব ঃ (ক) স্বাধিকার, ন্যায়দর্শের নীতির ওপর গুরুত্বপ্রদান (বার্কার); (খ) জাঁ বোদ্যাঁর সার্বভৌম নীতির তত্ত্বগত সম্প্রসারণ; (গ) রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে বিভেদনির্ণয়ের প্রথম প্রচেষ্টা, (ঘ) পরবর্তী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ওপর লকের প্রভাব, (ঙ) গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের শাশ্বত সত্যতা সম্বন্ধে জনগণকে আশ্বাসদান।

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে আধুনিক গ্রাহ্য মতবাদ হল ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ। মেন, হার্বার্ট স্পেন্সার, বার্জেস্, বেজহট্ ও গার্নার এ মত সমর্থন করেন। তাঁদের মতে, ধর্মের বন্ধন, বাহু-বল, চুক্তি, পারিবারিক সম্প্রসারণ এদের সবগুলির ঘাতপ্রতিঘাতে মানবসমাজের অবিরাম ক্রমবিকাশের পরিণতি হল রাষ্ট্র। রাষ্ট্র মানবসমাজের ধীর, ধারাবাহিক বিবর্তনের ফল, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে-ওঠা তার রূপান্তরলাভ একটা বিরাট রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা।

রাষ্ট্রের বিবর্তনের ওপর বিভিন্ন প্রভাব—(১) রক্তের বন্ধনের প্রভাব : গোষ্ঠী, উপজাতি, দেশপ্রেম, জাতীয়তা—এঙ্গেলসের ব্যাখ্যা। (২) ধর্মীয় বন্ধনের প্রভাব—ফ্রয়েড্, ম্যালিনাওস্কি ও জোডের মতে, প্রাকৃত ঘটনার বিজ্ঞানে অজ্ঞান আদিম মানুষকে ধর্ম অতিপ্রাকৃতবিশ্বাসী করিয়ে একধরনের নৈতিক বাধ্যতা সৃষ্টি করেছিল। (৩) ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত শক্তির প্রভাব—যুদ্ধজয়ী সেনাপতির বিশেষ নেতৃত্ব : "যুদ্ধই রাজতন্ত্রের জন্মদাতা।" (৪) রাজনৈতিক চেতনার, সামাজিক মূল্যবোধের গণতান্ত্রিক আদর্শের সর্বাত্মক প্রভাব। (৫) অর্থনৈতিক কারণের প্রভাব—অভাব, দারিদ্র্য দূরীকরণে রাষ্ট্রের মত সংস্থার প্রয়োজনবোধ।

সংক্ষেপে, আদিকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত অজস্র ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে রাষ্ট্রের উৎসারণ ও সম্প্রসারণ। এরই নাম "রাষ্ট্রের সামাজিক, ঐতিহাসিক বিবর্তন।" রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে এটাই গ্রাহ্য মতবাদ।

রাষ্ট্রের বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যার সমালোচনা—(১) হবহাউস বলেন, রাষ্ট্রের বিবর্তন শুধু ঘটনাভিত্তিক নয়, চেতনাভিত্তিকও বটে। তাই তিনি "মূল্যবোধের বিবর্তনের" ওপরও জোর দিয়েছেন। (২) এ মতবাদ বেশী কল্পনাশ্রয়ী। (৩) মার্ক্সবাদীগণ একটি বিশেষ অর্থে এই মতবাদ সমর্থন করেন। তাঁদের কাছে "অর্থনৈতিক বিবর্তন" মুখ্য, "সামাজিক বিবর্তন" গৌণ ও আনুষঙ্গিকমাত্র।

উপসংহার—রাষ্ট্রের উৎপত্তি, তার ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিবর্তন সম্পর্কে গ্রাহ্য এই মতবাদ শুধু অতীত বা বর্তমানকে নিয়ে জড়িত নয়, মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ বিবর্তনের ধারাও এতে বিধৃত।

৫ জাতিসমাজ জাতীয়তা জাতি

"A nation, unlike a class, has a definition which is not economic. It is, we may say, a geographical group possessed of a sentiment of solidarity."

—Bertrand Russell

॥ কয়েকটি প্রাথমিক সংজ্ঞা ॥

"নেশন কি" নামক প্রবন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, "স্বীকার করিতে হইবে, বাংলায় 'নেশন' কথার প্রতিশব্দ নাই। নেশন ও ন্যাশনাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থদ্বৈধ—ভাবদ্বৈধের হাত এড়ানো যায়।" কতকগুলি উদাহরণ থেকে কবিগুরুর অভিব্যক্তির তাৎপর্য বোঝা যায়। অনেকেই "নেশন্" (Nation) বলতে "জাতি" ও "রাষ্ট্র" দুই-ই বোঝেন। "জাতীয়" (National) কথাটির সাহায্যে অনেকে কোন্ ব্যক্তি কোন্ রাষ্ট্রের "নাগরিক" (citizen) তা বুঝতে বা বোঝাতে চেষ্টা করেন। এ দিক থেকে চিন্তা করে অনেকে "জাতীয়তা" (Nationality) এবং "নাগরিকত্ব" (Citizenship) এ দুটি কথাকে সমার্থক বলে ভুল করেন।

'নেশন্" কথাটির সংজ্ঞা নিয়ে রবীন্দ্রভাবনা :

এ ধরনের অর্থগত ও ভাবগত বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পেতে হলে লর্ড্ ব্রাইসের বক্তব্য বিশেষভাবে জানা উচিত। তিনি "নেশন্" (Nation) বলতে "জাতি" বোঝাতে চান। তাই তাঁর সংজ্ঞা অনুসারে, "জাতি এমন একটি জাতিসমাজ যা রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীন বা স্বাধীনতাকামী (অর্থাৎ জাতীয়তাবোধ বা রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন) ("A Nation is a nationality which has organised itself into a political body either independent or desiring to be independent")

জাতি বা "নেশন্" সম্বন্ধে ব্রাইসের সংজ্ঞা

ব্রাইসের সংজ্ঞাটিকে আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যে কোন জনসমষ্টিকে (People) "জাতিসমাজ" (Nationality) বলা যায় না। কোন জনসমষ্টির (People) অন্তর্গত জনগণ কতকগুলি কারণে যদি ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীনতাকামী হন, অর্থাৎ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হন, তবেই সেই ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতাকামী জনগণকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ "জাতিসমাজ" (Nationality) বলেন। যে রাজনৈতিক আদর্শ তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলে, তাকে বলা হয় "জাতীয়তা" বা

জনসমষ্টি. জাতিসমাজ জাতীয়তা, জাতি, জাতীয় রাষ্ট্র (বা জাতিরাষ্ট্র) কাকে বলে

"জাতীয়তাবোধ" (Nationalism)। যখন এই জাতিসমষ্টি সুগঠিতভাবে ও সচেতনভাবে রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীনতাকামী হয়ে পড়ে, তখন তাকে "জাতি" (Nation) বলা হয়। অবশেষে যখন "জাতি" রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে রাষ্ট্র গঠন করে, তখন সে রাষ্ট্রকে বলা হয় "একজাতীয় রাষ্ট্র" (Nation-State)। সাধারণতঃ "রাষ্ট্র" বলতে "একজাতীয় রাষ্ট্রকেই" বোঝায়।

এই সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বিশ্লেষণকে উদাহরণের সাহায্যে সহজে ব্যাখ্যা করে আলোচনাকে অধিকতর বাস্তবভিত্তিক করা যায়। ১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগের ফলে ভারত ও পাকিস্তান এই দুটি রাষ্ট্রের আবির্ভাবের কাহিনী এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বহু ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণীতে বিভক্ত ভারতীয় জনসমষ্টি (Indian People) ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি কামনা করে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন, স্বাধীনতাকামী ও ঐক্যবদ্ধ হল। তাদের ঐক্যবদ্ধতার ও স্বাধীনতাকামনার এই রাজনৈতিক আদর্শ হল ভারতীয় জাতীয়তা বা ভারতীয় জাতীয়তাবোধ (Indian Nationalism)। কিন্তু ভারতের যে অঞ্চলগুলিতে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাঁরা ঐস্লামিক ধর্মীয় একতার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্র (Separate Nation-State) দাবী করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সফল হলেন ও ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট্ অবিভক্ত ভারতের মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি নিয়ে পাকিস্তান "ডোমিনিয়ান্" (Dominion of Pakistan) গঠিত হল, তারপর সেই অঞ্চলগুলিকে ভারত থেকে বাদ দিয়ে "ভারত ডোমিনিয়ান্" (Dominion of India) গঠিত হল। পরে এ দুটি ডোমিনিয়ান্ই প্রজাতন্ত্রে পরিণত হল। সুতরাং ভারতীয় জনসমষ্টি (Indian People) রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীন হবার আদর্শে অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয়তার বা জাতীয়তাবাদের (Indian Nationalism) আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারতীয় "জাতিসমাজে" (Indian Nationality) পরিণত হল। তারপর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট্ সেই ভারতীয় জাতিসমাজ "ভারতীয় জাতি" (Indian Nation) বা "ভারত" নামক "জাতি-রাষ্ট্রে" (Indian Nation-State) পরিণত হল।

ভারত ও পাকিস্থানের জন্ম বৃত্তান্ত

সংক্ষেপে বলতে গেলে, কোনও জনসমাজের (People) অন্তর্গত স্বাধীনতাকামী, ঐক্যবদ্ধ ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানবগোষ্ঠী হল জাতিসমাজ (Nationality)। এই জাতিসমাজকে স্বাধীনতাকামী, ঐক্যবদ্ধ ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার প্রেরণা বা আদর্শ হল জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তাবোধ (Nationalism)। যখন জাতিসমাজ রাষ্ট্র গঠন করতে সমর্থ হয়, তখন তাকে বলা হয় "জাতি" (Nation) বা জাতিরাষ্ট্র (Nation-State) বা রাষ্ট্র (State)।

সংজ্ঞাগুলির সংক্ষিপ্তসার

হেসের (Hayes) উক্তিটি এ প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন—"জাতীয় রাষ্ট্র সব সময়েই জাতীয়তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, কিন্তু রাষ্ট্র ছাড়াও জাতিসমাজ

থাকতে পারে" ("A national state is always based on nationality, but a nationality may exist without a national State")। জাতির উৎপত্তি বা অবলুপ্তি বললেই কোন রাষ্ট্রের উৎপত্তি বা অবলুপ্তি বোঝায় না। কলিকাতায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় পাঠাগারকে (National Library) অনেকে সাধারণ অর্থে বা প্রচলিত ভাষায় "জাতীয় পাঠাগার" বলেন। কিন্তু ভারত সরকার সঠিকভাবেই এর যে হিন্দী নাম দিয়েছেন, তা হল—"রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার।" এ থেকেই বোঝা যায়—"রাষ্ট্র" এবং "জাতি" কথা দুটি সমার্থক নয়।

হেসের ব্যাখ্যা : জাতির উৎপত্তি বা অবলুপ্তি রাষ্ট্রের উৎপত্তি বা অবলুপ্তি বোঝায় না

॥ জাতি বা জাতি-সমাজ গঠনের প্রধান উপাদান ॥

জিমার্নের (Zimmern) মতে জাতি (Nation) বা জাতি-সমাজ (Nationality) গঠনের প্রধান উপাদান ভাবগত অভিন্নতা। আবার, ইতালীয় নেতা মাৎসিনি (Mazzini), লিকক্ (Leacock), প্রভৃতি এ ক্ষেত্রে কুলগত বা বংশগত অভিন্নতার ওপর বেশী জোর দিয়েছেন। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মত অনুযায়ী জাতি বা জাতি-সমাজ গঠনের উপাদানগুলিকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—বাহ্য উপাদান (physical factors) এবং ভাবগত উপাদান (spiritual factors)। ভাবগত উপাদানগুলিকে অনুভূতিমূলক উপাদানও (emotional বা emotive factors) বলা হয়।

জাতি বা জাতিসমাজ গঠনের প্রধান উপাদান : বাহ্য ও ভাবগত উপাদান

বাহ্য উপাদানগুলিকে সাধারণভাবে "পরিবেশ" কথাটির দ্বারা বোঝানো যায়। পরিবেশের প্রভাবে মানুষ বেড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে পরিবেশ যেন আধারের কাজ করে। মাছের কাছে জল যেমন আধারের মত, মানুষের কাছে জাতি বা জাতি-সমাজও তেমনি আধার। জাতি গঠনের বাহ্য উপাদানগুলির মধ্যে অর্থ-নৈতিক ঐক্য, কুলগত (বা কৌলিক বা বর্ণগত বা বংশগত) ঐক্য, ভাষাগত (বা লিপিগত বা সাহিত্যগত) ঐক্য, ধর্মগত ঐক্য, ভৌগোলিক (বা আঞ্চলিক) ঐক্য এবং সাংগঠনিক বা রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ঐক্য উল্লেখযোগ্য।

বাহ্য উপাদান : অর্থনৈতিক, কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত, ভৌগোলিক, সাংবিধানিক ঐক্য

মার্ক্সবাদীগণ **অর্থনৈতিক ঐক্যকে** জাতিগঠনের সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান বলে মনে করেন। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা সোবিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত জর্জিয়ার জাতীয়তাবোধের নজিরের উল্লেখ করেন। দাস-প্রথার (অর্থাৎ সামন্তপ্রথার) অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলে এক ধরনের অর্থনৈতিক, শ্রেণী-ভিত্তিক ঐক্য গড়ে ওঠে। এই ঐক্যই পরে জর্জিয়ার অধিবাসীদের শ্রেণীসচেতন "জাতি" রূপে গড়ে তোলে।

অর্থনৈতিক ঐক্য : মার্কসীয় ব্যাখ্যা : জর্জিয়ার নজির

কুলগত বা কৌলিক বা বংশগত ঐক্য থাকার ফলে জাতিগঠন সহজ হয়। যেমন, অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীগণ একই বংশের অন্তর্ভুক্ত—ফলে তারা একই জাতি বলে

পরিগণিত। কিন্তু প্রাণিজগতে বর্ণগত অভিন্নতা স্বীকৃত নয়। বর্ণগত উৎপত্তির অভিন্নতার ও জার্মানদের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করে হিট্‌লার জার্মানদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের আদর্শবোধ সঞ্চারিত করেন। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত ও বিফল হন। ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, যুগ-যুগান্তর ধরে প্রাণিজগতের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত মনুষ্যসমাজেও অনবরত রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে ও ঘটছে। তার ফলে এককুলোদ্ভব জাতির বদলে সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিতে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু জাতীয় ঐক্য ব্যাহত হয় না। উদাহরণ—ইংরেজ, ওয়েল্‌সীয় ও স্কট্‌দের মধ্যে বংশগত ঐক্য না থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত। সুইজারল্যান্ড্‌ ও সোবিয়েত রাশিয়ার অধিবাসীগণ বিভিন্ন প্রজাতি-গোষ্ঠীর (ethnic groups) অধিবাসীদের মিশ্রণে গঠিত হলেও তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ খুব প্রবল।

কুলগত ঐক্য : অস্ট্রেলিয়া ; ব্যতিক্রম—ইংরাজ জাতি ; বর্তমানে কৌলিক বিশুদ্ধি দাবি করা যায় না

ভাষাগত বা লিপিগত বা সাহিত্যগত ঐক্য ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। ভাষা মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাববিনিময়ের প্রধান বাহন, রবীন্দ্রনাথের কথায় "জীবনে জীবন যোগ করার" প্রধান মাধ্যম। একই ভাষা অনেক সময় একই লিপির মারফত কোনও নির্দিষ্ট জনসমষ্টির মধ্যে ঐক্যপ্রচারে সাহায্য করে। জার্মান দার্শনিক ফিক্টের (Fichte) মতে ভাষা ও লিপির ঐকের দ্বারা গড়ে ওঠে সাহিত্যগত, কাল্‌চারগত ঐক্য। ইংরাজী ভাষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে একটা অনন্যসাধারণ লিপিগত ও সাহিত্যগত ঐক্য সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে জাতীয় প্রেরণা তৈরী করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে ভাষার ঐক্য জাতি গঠনে সহায়ক হলেও এই ঐক্য না থাকলে জাতি গঠনে বাধা নেই। সুইজারল্যান্ডের অধিবাসীরা ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয়ান এই তিনটি পৃথক ভাষা ব্যবহার করলেও জাতীয় ঐক্য সেখানে সুদৃঢ়। দীর্ঘকাল কানাডায় ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার যুগপৎ প্রচলন সত্ত্বেও সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ভাষার পার্থক্য জাতিগঠনে অন্তরায় হয় নি। সম্প্রতি অবশ্য ফরাসীপ্রধান কুইবেক্‌ অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে।

ভাষাগত ঐক্য : ফিক্টের মতে জার্মানী ; ব্যতিক্রম — সুইজারল্যান্ড

ধর্মগত ঐক্য কোনও নির্দিষ্ট জনসমষ্টির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাবোধ সৃষ্টি করে। যা ধারণ করে, তাই ধর্ম। ধর্ম তাই মানুষের ধারক। মানুষ একে অবলম্বন করেই নিজের পার্শ্ববর্তী সমধর্মী প্রতিবেশীদের মধ্যে এক ধরনের আত্মীয়তার রাখী-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। একই খ্রীস্টান ধর্মের সূত্রে আবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন বংশের সন্তানসন্ততি হয়েও আমেরিকানগণ জাতি হিসাবে এক। হিন্দু ও ইস্‌লাম এই দুটি ধর্মীয় বিভিন্নতার ভিত্তিতেই ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয় এবং "ভারত" ও "পাকিস্তান"

ধর্মগত ঐক্য : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ; ব্যতিক্রম—ভারত

এই দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এ ক্ষেত্রে অবশ্য বলা যায় যে, হিন্দু ধর্ম ভারতের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের একত্রিত করল, ইসলাম একত্রিত করল মুসলমানদের। কিন্তু ভারতে বহু মুসলমান আছেন, পাকিস্তানেও বহু হিন্দু ও শিখ আছেন। বৌদ্ধধর্ম শ্রীলংকায় জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করেছে, মিশরে করেছে ঐস্লামিক ধর্মমত। কিন্তু দেখা গেল যে, ধর্মের পার্থক্য থাকলেও জাতীয় জনসমাজ গড়ে ওঠে, যেমনটি হয়েছে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে ও সোবিয়েত রাশিয়ায়।

একস্থানে দীর্ঘদিন বংশপরম্পরায় বসবাস করলেও কোনও জনসমষ্টির মধ্যে একটা ভৌগোলিক বা **আঞ্চলিক ঐক্যবোধ** গড়ে ওঠে। এটাই অনেক সময় জাতীয় ঐক্যের প্রাথমিক ভিত্তি। এরই নাম হল ভৌগোলিক অভিন্নতা। হিন্দু এবং মুসলমান দুই ধর্মের লোক পাশাপাশি বাস করে একই ভাষা, লিপি ও সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হবার ফলে বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু এক স্থানে বসবাস না করেও জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছে, যেমনটি হয়েছে ইস্রেলে (Israel)। ইস্রেল স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেও ইহুদিরা বিশ্বময় পরিভ্রমণ করে বেড়াত, নিজেদের একই জাতীয় ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ বলে মনে করত। ইউরোপের প্রতিবেশী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি বহুবার পোল্যান্ডকে ভাগ করেছে। কিন্তু পোলরা চিরকালই একটি জাতি বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে।

ভৌগোলিক (আঞ্চলিক) ঐক্য : বাংলাদেশ ; ব্যতিক্রম—ইস্রেল

সাংগঠনিক ঐক্য বা রাষ্ট্রীয় বা সাংবিধানিক ঐক্য অর্থাৎ **শাসনব্যবস্থার অভিন্নতা** অনেক সময় কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে নানারকম পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটা নিবিড় একতা রচনা করে। ইংলন্ড, স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলসের জনগণ একই ব্রিটিশ রাজমুকুটের (British Crown) অধীন থেকে একটি সাধারণ জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছে। ইংরেজ আমলে ভারতে নানা ধর্ম, নানা ভাষা প্রচলিত থাকার ফলে আপাতদৃষ্টিতে ভারতীয়দের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি হলেও রেলগাড়ী, ডাকঘর প্রভৃতির মাধ্যমে বিদেশী শাসকগণ ভারতবাসীদের মধ্যে একটা শাসনতান্ত্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। ফলে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় প্রেরণা ঘনীভূত হয়ে ওঠে। কিন্তু একই ধরনের শাসনব্যবস্থার ঐক্য না থাকলেও এই বিভিন্নতা জাতিগঠনে বাধা সৃষ্টি করে না, যদি সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে অন্য কোন ঐক্যের উপাদান সক্রিয় হয়ে ওঠে। কানাডায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা (Federal government) প্রচলিত থাকার ফলে সেখানে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষাভাষী অধিবাসীদের নিয়ে গঠিত অঙ্গ-রাজ্যগুলিতে (Provinces) শাসনব্যবস্থার কিছু কিছু তারতম্য দেখা যায়। কিন্তু রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রচলনের ফলে ধর্মগত ঐক্য ঐ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে এমন একটা ভাবগত ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করল যে তার ফলে জাতীয় ঐক্যগঠন সহজ হয়ে উঠল।

শাসনব্যবস্থার ঐক্য : ভারত ; ব্যতিক্রম—কানাডা : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার হেরফের

জাতিগঠনের এই সমস্ত বাহ্য উপাদান সম্বন্ধে বিভিন্ন উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করে বোঝা গেল যে, জাতিগঠনের বাহ্য উপাদানগুলি নানা দিক দিয়ে সহায়ক হলেও এর মুখ্য উপাদানগুলি হল ভাবগত। জিমার্নের (Zimmern) কথায় বলা যায়, কোন জনসমাজ নিজেকে জাতিসমাজ বলে মনে করলে তবেই তাকে "জাতি" বলা যায় ("If a people feels itself to be a nationality, it is a nationality")। ধর্মের মত মানুষের গূঢ়তম প্রবৃত্তিকে ক্রিস্টোফার্ লয়েড্ (Christopher Lloyd) জাতীয়তার উৎস বলেছেন ("Nationalism may be called a religion, because it is rooted in the deepest instincts of man)। এই ভাবগত ঐক্যের উপাদানগুলির মধ্যে পড়ে আচার, রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের ঐক্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিগত ঐক্য, স্মৃতিগত বা ঐতিহাসিক ঐক্য, অতীতের সুখদুঃখের ঐক্য, যা অভাব-অভিযোগের, সমবেদনার, সমচেতনার ফল। যখনই দেখা যায় কোন বিশেষ জাতির মধ্যে ধর্ম, ভাষা প্রভৃতি বাহ্য ঐক্যের উপাদান সক্রিয় নয়, তখনই বোঝা যায় যে, কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাব অন্তরালে থেকে তার ঐক্য সৃষ্টির ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই অদৃশ্য শক্তিটি হল সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ইত্যাদির সমতার ফলে ঐ বিশেষ জনসমষ্টির মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য সৃষ্টির প্রেরণা। এজন্যই জার্মান দার্শনিক অস্‌ভাল্ট্ স্পেঙ্গ্‌লেয়ার (Oswald Spengler) বলেছেন, বংশগত বা ভাষাগত সমতা নয়, ভাবগত সমতাই জাতীয় ঐক্যের মূল উপাদান ("A nation is neither biological nor linguistic, but a spiritual unity")। আধুনিক ব্রিটিশ্ ঐতিহাসিক টইন্‌বি (Toynbee) অতীতের সভ্যতাগুলির উত্থানপতনের ইতিহাস ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সেই সমস্ত সভ্যতাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাবগত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দীর্ঘায়ু হয়েছে যেগুলি ভাবগত উৎকর্ষে সুসমৃদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ তিনি স্বল্পস্থায়ী সুমেরীয় সভ্যতার পাশাপাশি আর্যসভ্যতার সুদীর্ঘ জীবনের উল্লেখ করেছেন।

"জাতি" গঠনে ভাবগত উপাদানই বেশী সক্রিয়ঃ জিমার্ন, ক্রিস্টোফার লয়েড্, স্পেঙ্গ্‌লেয়ার ও টইন্‌বির বক্তব্য

ইংরেজ সমাজতত্ত্ববিদ্ গ্রাহাম্ ওয়ালাস্ (Graham Wallas) "ঐতিহ্য" কথাটির সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে এ এক অপূর্ব, অখণ্ড গণ-মানসিকতা, যা ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে ইতিহাসের পটভূমিকায় কোন বিশিষ্ট জনসমষ্টির গৌরব ও ত্যাগ, সুখ ও দুঃখের কতকগুলি চিরহরিৎ স্মৃতিকে নিয়ে গড়ে ওঠে। একই ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আদর্শ রূপায়নের জন্য এই জনসমষ্টির মধ্যে একটা আত্মীয়তা, একটা আন্তরিকতা, একটা অন্তরঙ্গতা অনুভূত হয়। কয়েক পুরুষ ধরে এই রকম সমচেতনা ভবিষ্যতের বংশধরেরা লাভ করে। ডিলাইল্ বার্ন্‌স্ (Delisle Burns) একেই জাতীয় ঐতিহ্য বলে চিহ্নিত করেছেন। সুমহান্ নেতৃবৃন্দের অনবদ্য জীবনকথা,

"ঐতিহ্য" কি?—গ্রাহাম্ ওয়ালাস ও ডিলাইল্ বার্ন্সের সংজ্ঞাঃ এক জাতি, এক প্রাণ, একতা

উদ্দীপক লোকাচার, লোকগীতি, লোকগাথা, লোকনাট্য এভাবেই গড়ে তোলে "এক জাতি, এক প্রাণ, একতা।" তাই বলা হয় জাতীয়তাবোধ প্রধানতঃ জনগণের স্মৃতির মণিকোঠায় জমানো ভাবরাজ্যের সম্পদ, একটা আন্তরিক একাত্মবোধ। ফরাসী দার্শনিক রেনাঁ (Rennan) তাই বলেছেন—সমাজের **আধ্যাত্মিক ঐক্য** তার জাতীয়তার জনক।

॥ ভারতের জাতীয় ঐক্য ঃ ভারত কি একটি জাতি ? ॥

ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জাতীয়তার সমস্ত ভাবগত উপাদান-গুলির সার্থক সমন্বয় এখানে লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুবিখ্যাত প্রবন্ধে ("ভারতবর্ষের ইতিহাস") এই বক্তব্য সুপরিস্ফুট করেছেন। "নেশন কি" প্রবন্ধে কবিগুরু বলেছেন "নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিষ এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুটি জিনিষ বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। একটি হইতেছে সর্ব-সাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ, আর একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা—যে অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে তাহাকে উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করিবার ইচ্ছা।"

রবীন্দ্রনাথ জাতিগঠনের ক্ষেত্রে ভাবগত উপাদানের ওপর জোর দিয়েছেন

ভারতে জাতীয় ঐক্যের বাহ্য উপাদানগুলির মধ্যে ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক ঐক্য ছাড়া অন্য কোনটি কার্যকর নয়। কিন্তু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের লীলাক্ষেত্র "ভারততীর্থ।" ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, কালচক্রের আবর্তনে অনাদি অতীত থেকে পাঠান, মোঘল, শক, হূণ, আর্য, অনার্য, এমন কি ইংরেজগণও এদেশে এসে ভারতের সমন্বয়ী প্রভাবের বাইরে থাকতে পারে নি। তাদের সকলের জীবনযাত্রার ধারা, ভাবনাচিন্তার ধারা শান্তিপূর্ণভাবে আত্তীকরণের (peaceful assimilation) ফলে ভারতের ঐতিহ্য সাতরঙা রামধনুর মত আশ্চর্য সুন্দর। ফেলে-যাওয়া একই অতীতের, একই সুখদুঃখের স্মৃতির রাখীবাঁধনে ভারতীয়গণ আবদ্ধ। পরাধীনতার গ্লানি আগের যুগের ভারতীয়গণ সকলে সমানভাবে অনুভব করেছিলেন। অগ্নিযুগে ভারতের নানা অঞ্চলের নেতাগণ একই অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ভারতের মুক্তিযুদ্ধে আত্মনিয়োগ করেন, আত্মবিসর্জন দেন। ভারতের স্বাধীনতালাভ এর সার্থক পরিণতি। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল প্রভৃতি বরেণ্য ভারতীয় মনীষিগণও রবীন্দ্রনাথের মতের অনুরূপ মত পোষণ করেন, বলেন—ভারতীয় জাতীয়তা মূলতঃ ভাবগত, মননসচেতন, ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ।

জাতিগঠনের বাহ্য উপাদান গুলির বেশীর ভাগ না থাকলেও ঐতিহ্যগত ঐশ্বর্যকেই গুরুদেব ভারতীয় জাতীয়তার সূচক বলেছেন, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজী, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী, জওহরলালও এ মতের সমর্থক

মার্ক্সবাদীগণ ভারতকে বহুজাতিক রাষ্ট্র (Poly-national State) বলে মনে করেন। তাঁরা ভারতকে একজাতি-রাষ্ট্র (Mono-national State) বলে মানতে চান না। ভারতে ভাষা, ধর্ম, সম্প্রদায়, আঞ্চলিক ও লৌকিক বৈচিত্র্য ইত্যাদি নানা ধরনের উপাদান অসংখ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছে। সুতরাং মার্ক্সবাদীদের মতে ভারতের জাতীয় সমস্যা আসলে সংখ্যালঘু সমস্যা। তাঁদের মতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির জন্য পুঁজিপতিগণের অবাধ শোষণের ফলেই বহু ক্ষেত্রে শোষিত জনগণ সরকার-প্রবর্তিত জাতীয় ঐক্যের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। তাই ভারতে জাতীয় সংহতি (national integration) বজায় রাখা ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

মার্ক্সবাদীগণ ভারতকে একজাতীয় রাষ্ট্র বলে মনে করেন না, মূল সমস্যা সংখ্যালঘুদের নিয়ে

কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যেভাবে ভারতের জাতীয় সংহতি বিপন্ন করছে, তা সত্যিই উদ্বেগজনক। এই বিচ্ছিন্নতাবাদীগণকে "শোষিত দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধি" মনে করা ভারতের জাতীয় সমস্যার অতি-সরলীকরণ বলে অনেকের ধারণা। সরকারকে যেমন কঠোর হস্তে বিচ্ছিন্নতাবাদ দমন করতে হবে, জনগণকেও ভারতের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় ঐক্যকে দলমত নির্বিশেষে যে কোন মূল্যে রক্ষা করার জন্য সচেতন ও তৎপর থাকতে হবে। আঞ্চলিক, সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত বিশিষ্টতাকে সযত্নে রক্ষা করতে হবে, আবার জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক আত্তীকরণের (assimilation বা acculturation) ব্যবস্থাও করতে হবে। ভারতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ী, উদারনৈতিক দর্শনের শাশ্বত বাণী তাদের এ ক্ষুরধার পথে অগ্রগামী হতে প্রেরণা জোগাবে—এটা অনেকে প্রার্থনা করেন।

মার্ক্সবাদীদের তত্ত্বের আলোচনা ঃ ভারতের সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ একটা বাস্তব ঘটনা যদিও তা এখনও অসম্পূর্ণ

আগেকার অনেক ইংরেজ লেখক ভারতবর্ষকে "জাতি" বলতে সম্মত হন নি। লর্ড বার্কেনহেডের (Lord Birkenhead) মতে, ইউরোপের মত ভারতেও নানা কারণে বহু "জাতির" বাস। এ দেশ যেন একটা জাতিগত পুরাতত্ত্বশালা (ethnological museum), এখানে জাতিগঠনের উপাদানগুলি মোটেই সক্রিয় নয়।

ভারত বহুজাতীয় ঃ লর্ড বার্কেনহেড

অপরপক্ষে বিখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ (Vincent Smith) লক্ষ্য করেছেন যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য (Unity in diversity) গড়ে তোলার একটা অপূর্ব প্রচেষ্টা ভারতের ইতিহাসে সুপ্রকাশিত। মধ্যযুগে দাদু, নানক ও কবীরের সাধনা হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় গঠন করেছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় সিপাহীদের দিয়েই সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ইংরেজরা ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম মুক্তিসংগ্রামের সময় ভারতীয়দের বিভিন্নতার সুযোগ নিয়ে

তাদের দমন করে। পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে মুক্তিসংগ্রাম আরম্ভ হয়, তাতে সব ধর্মের, বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতীয়গণ শরিক ও শহীদ হন। ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, ১৯২১ সালে ও ১৯৪২ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত যথাক্রমে "গণ আন্দোলন" ও "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নেতাজীর নেতৃত্বে বিখ্যাত আজাদ হিন্দ ফৌজের ত্যাগ ও বীরত্ব ভারতীয়দের এক অসাধারণ স্মৃতিগত, ঐতিহাসিক ঐক্যে, অতীতের সুখ-দুঃখের ঐক্যে, অভাব-অভিযোগের সচেতনার ফলে উদ্ভূত ঐক্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। এই ভাবগত ঐক্য নিছক ভাবপ্রবণতা নয়, এ হল সুদৃঢ় এক জীবনবোধ। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ভারতীয় সম্প্রদায়কে দুটি পৃথক জাতিরূপে অপপ্রচার চালাবার ফলে ভারতে অনর্থক রক্তপাত, সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দেয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ এ মত খণ্ডন করেন ঃ ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের আসল তাৎপর্য ঃ প্রত্যেক ভারতীয় ভারততীর্থের পথিক

অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট "ভারত" ও "পাকিস্তান" নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে দেশ বিভক্ত হয়। কিন্তু সুখের বিষয়, স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক, সমাজতন্ত্রী, ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতন্ত্র (sovereign, secular, socialist democratic republic) ভারত আজও তার অতীত ঐতিহ্য না হারিয়ে, সাম্রাজ্যবাদীদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে এক বিরাট ভবিষ্যতের আশায় অগ্রগামী জাতিরূপে জগতে সুপরিচিত। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে, তৃতীয় বিশ্বের (Third World) নেতৃত্বের শীর্ষে রয়েছে ভারত। কত বিরাট বাধা ভারতীয়দের জাতীয় ঐক্যসৃষ্টির পথে বিহ্বল করেছে। কত জটিল সমস্যার মোকাবিলায় তারা এগিয়েছে, পিছিয়েছে। কিন্তু চলমান এক মহাজীবনে বৈচিত্র্যময় বিকাশের মহামিলনের পথে অগণিত জয়পরাজয়ের মর্মান্তিক বেদনা ও অসীম আনন্দ, পরম গৌরব ও চরম গ্লানি তাদের জয়পরাজয়ের একই ধ্যান-ধারণার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী করে তুলেছে। তারা একই গৌরবময় ভারততীর্থের পথে পুণ্যার্থী সহযাত্রী।

তবুও মনে রাখা দরকার যে, স্বাধীনতালাভের ৩৮ বছর পরেও ভারতে নানা ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। "তেলুগুদেশম", দ্রাবিড়পন্থী ডি এম কে, "আমরা বাঙ্গালী" প্রভৃতি সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটেছে, কোথাও কোথাও তারা ভোটযুদ্ধে জয়ী হয়ে সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের শাসনক্ষমতা দখল করেছে। ভারতের লোকসভায় "তেলুগুদেশম" এখন বৃহত্তম বিরোধী দল। এই দলের নেতাগণ বোধ হয় তাঁদের দলীয় সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাঁদের দলকে কি করে "ভারতদেশম" দলে উন্নীত করা যায়, তাই নিয়ে ভাবছেন। তাঁদের এই প্রবণতা সকলের স্বস্তির পরিচায়ক।

তবুও বর্তমানে ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদের আবির্ভাব ঃ কিন্তু দল বড় নয়, দেশ বড়

ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় চরিত্রের মাধুর্য ও সৌকুমার্য হয়ত সমানভাবে সর্বত্র দেখা যায় না। কিন্তু এজন্য এদেশবাসীদের জাতীয়তাবোধের অভাবকে একমাত্র

কারণ বলে মনে করা ভুল। মার্ক্সবাদীদের যুক্তি এখানে কিছুটা গ্রাহ্য। তা হল—অধিকতর অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে ভারতবাসীদের চরিত্রেরও নিশ্চয়ই উন্নতি সম্ভব হবে। ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও এখানে মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, প্রভৃতি অসংখ্য সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায় পরমতসহিষ্ণুতা ও মানবিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শান্তিতে বসবাস করে। রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের প্ররোচনায় মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হলেও শুভবুদ্ধিসম্পন্নদের সাহায্যে বিরাট দেশের সঙ্কীর্ণ এলাকায় তাকে সীমাবদ্ধ রাখা যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধরনের অসাধারণ মিলনের আরেকটি উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যিই দুর্লভ। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মকথার ভাষায়—ভারত এখনও সম্পূর্ণ ও পরিণত জাতি না হলেও জাতিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পথে সঞ্চারমান ("A Nation in the making")।

মার্ক্সবাদীদের যুক্তির সমর্থনে বলা যায়—অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের ওপর পরোক্ষভাবে জাতীয় ঐক্য নির্ভরশীল

॥ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার : এক জাতি, এক রাষ্ট্র ॥

ইতিহাস এবং ভূগোল নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, এই বিরাট পৃথিবীতে খুব কম দেশই আছে যেখানকার জনসমষ্টি একটিমাত্র জাতিরূপে গঠিত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় একাধিক জাতির বা "প্রজাতির" লোক এলোমেলোভাবে একটা বিরাট ভূখণ্ডের অধিবাসী হয়ে আছে। যখন কোন রাষ্ট্র একটিমাত্র জাতির ভিত্তিতে গঠিত, তখন তাকে এক-জাতীয় রাষ্ট্র (Mono-national State) বলে। মিশরীয়গণ সকলেই এক জাতি। তাই মিশর এক-জাতীয় রাষ্ট্র। সে দেশে কোনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি বাস করে না। যুগোশ্লাভিয়ায় সার্ব্ (Serb) এবং ক্রোট্ (Croat) দুই জাতি বা প্রজাতি একই সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে। তাই যুগোশ্লাভিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সূক্ষ্ম বিচারে বহুজাতীয় রাষ্ট্র।

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার : বহুজাতীয় বনাম একজাতীয় রাষ্ট্র

যদি বহুজাতীয় রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রজাতির অধিবাসীগণ শান্তি, মৈত্রী ও সম্প্রীতির মধ্যে বাস করে তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটা একজাতীয় সমন্বয় গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে সেই দেশকে বিভিন্ন জাতির ভিত্তিতে খণ্ড খণ্ড করার কোন দরকারই হয় না। সে দেশ পৃথিবীতে স্বর্গের মত। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় এরকম আদর্শ সমন্বয় বোধ হয় ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না।

ভারতের মত বহু প্রজাতীয় মতের সার্থক সমন্বয় দুর্লভ

শুধু এক জাতি নিয়েই জাতি গঠিত হওয়া উচিত এই মতটি "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" ("One Nation, One State") মত নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য, এই মত একজাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে। এই মত অনুযায়ী বিভিন্ন জাতির বা প্রজাতি-গোষ্ঠীর অধিবাসীযুক্ত একটি বিরাট বহুজাতীয় রাষ্ট্রকে বহু ছোট ছোট একজাতীয় রাষ্ট্রে বিভক্ত করে দেওয়া উচিত। বহুজাতীয় রাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতির অধিবাসীদের নিজেদের

"এক জাতি, এক রাষ্ট্র" মতের বক্তব্য

পৃথক জাতীয় সত্তার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠন করার এই অধিকারকে "জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার" (Right of Self-determination) বলা হয়।

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে যখন পোল্যান্ড বিভক্ত হয়, তখন থেকেই জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবী ধ্বনিত হতে থাকে। ইউরোপের ইতিহাসে প্রাক্তন তুর্কী সাম্রাজ্যের (Ottoman বা Turkish Empire) অন্তর্ভুক্ত সংখ্যালঘু জাতির অধিবাসীদের কেন্দ্র করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলির সঙ্গে তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রাচ্য নীতি (Eastern Question) নিয়ে প্রায়ই সংঘর্ষ ঘটে। অধিবাসীদের অনেকেই ইস্‌লামের প্রেম ও মৈত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তবুও প্রায়ই গ্রীসের ও অন্যান্য ইউরোপীয় অঞ্চলের অধিবাসী সংখ্যালঘু খ্রীস্টানগণের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধিবাসীদের প্রায়ই দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখা দিত। ধীরে ধীরে এই বিশাল সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি একে একে পৃথক একজাতীয় রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অবশেষে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে প্রাক্তন তুর্কী সাম্রাজ্য শুধু ছোট্ট তুরস্কের স্বল্পপরিসর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল, তাও সম্ভব হল মুস্তাফা কামাল্ আতাতুর্কের মত ক্ষণজন্মা বীর তুর্কী নেতার আবির্ভাবের ফলে। প্রথম মহাযুদ্ধও মূলতঃ এই প্রাচ্যনীতিকে কেন্দ্র করে একাধিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রের মধ্যে ভয়াবহ সংগ্রামরূপে দেখা দেয়।

এই মতের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

১৯১৯ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্র-পতি উড্রো উইল্‌সন্ ভবিষ্যতে বিশ্বশান্তি সংরক্ষণের জন্য তাঁর সুবিখ্যাত "চৌদ্দ দফা শর্ত" ("Fourteen Points") ঘোষণা করেন। বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের সংখ্যা-লঘু জাতিগুলিকে নিজেদের পৃথক জাতি-রাষ্ট্র (Nation-State) গঠনের জন্য জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দান ছিল এই শর্তগুলির অন্যতম। এই প্রসঙ্গে উইল্‌সনের বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণীয়। তিনি বলেন যে, জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার নিছক বাগাড়ম্বর নয়, এটি এমন একটি অবশ্যপালনীয় কার্যবিধি, যা অবজ্ঞা করলে রাষ্ট্রনেতাগণ নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনবেন ("Self-determination is not a mere idle phrase ; it is an imperative principle of action which statesmen will henceforth ignore at their peril")। উইল্‌সন্ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে গণতান্ত্রিক অধিকার বলে ঘোষণা করেন। তাঁর নীতি অনুযায়ী প্রথম মহাযুদ্ধের পর চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি অনেক নতুন রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। ফলে, ইউরোপের মানচিত্র নতুন করে অঙ্কিত হল। এর আগে ১৮১৫ সালে ভিয়েনার মহাসভায় (Congress of Vienna), অর্থাৎ প্রায় শত বর্ষ আগে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে এইভাবে ইউরোপের মানচিত্রে অদলবদল করা হয়।

১ম মহাযুদ্ধের পর উড্রো উইল্‌সনের "চৌদ্দ দফা শর্তের" অন্যতম শর্ত ছিল জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধি-কারের স্বীকৃতি ঃ এর ফলে ১৮১৫ সালের শত বর্ষ বাদে ইউরোপীয় মানচিত্রে পুনরায় অদলবদল, নতুন রাষ্ট্রগঠন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময়ে ১৯৪১ সালে আট্‌লান্টিক সনদে (Atlantic Charter, 1941) এবং তারপর ১৯৪৫ সালে রচিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে (U. N. Charter) প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর ইচ্ছামত পছন্দসই সরকার গঠনের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। এই অধিকার স্বীকার করার অর্থই হল জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা।

আট্‌লান্টিক সনদে (১৯৪১) এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদেও এর স্বীকৃতি

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকারের পক্ষে নানা যুক্তি দেখানো হয়। প্রথমতঃ, জাতীয়, কৃষ্টি, সংস্কৃতি প্রভৃতি সংরক্ষণের ও বিকাশের যুক্তিতে জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ এই অধিকার সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, বহুজাতীয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু প্রজাতিগুলির নিজ নিজ কৃষ্টি, সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারে না। বহু প্রজাতির স্বার্থের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে কোন প্রজাতিই তার নিজস্ব প্রজাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে সক্ষম হয় না। তুর্কী শাসনে বল্‌কান্ দ্বীপপুঞ্জের জনগণ এবং অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত শ্লাভ্ ও শ্লোভাক্‌গণ পরস্পর কলহে লিপ্ত ছিল। এ ধরনের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি দূর করার জন্য মিল্ বলেছেন যে, প্রত্যেক জাতির সীমারেখা তার রাষ্ট্রীয় সীমারেখার সঙ্গে এক হওয়া উচিত। অর্থাৎ, প্রত্যেক রাষ্ট্রে একটিমাত্র জাতি বাস করা উচিত। মিলের এই যুক্তিকে স্বাধীনতার যুক্তি বলা যায়, কারণ, ঠিক এই যুক্তির ভিত্তিতেই ব্যক্তিস্বাধীনতা দাবি করা হয়। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পেয়ে রাষ্ট্রগঠনের সুযোগ লাভ করলে প্রত্যেক জাতি বা প্রজাতিগোষ্ঠী নিজের জাতীয় বা প্রজাতীয় সত্তার ও গুণাবলীর পূর্ণতম বিকাশে সমর্থ হয়; তাতে সে মানবসভ্যতার ভাণ্ডারকে কিছুটা সমৃদ্ধ করতে পারবে।

"এক জাতি, এক রাষ্ট্র" তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি: (১) জন্ স্টুয়ার্ট্ মিলের মতে প্রতিটি একজাতীয় রাষ্ট্রে প্রজাতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটে

দ্বিতীয়তঃ, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদানের ফলে বহুজাতীয় রাষ্ট্রে গর্বিত ও শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি দুর্বল সংখ্যালঘু জাতির ওপর কোনভাবে অত্যাচার করতে পারবে না। ঠিক এই যুক্তি দিয়েই মুস্‌লিম্ লীগ্ (Muslim League) ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমান-দের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য দেশবিভাগ দাবি করে। অবশেষে এই যুক্তি মেনে নিয়ে অবিভক্ত ভারতবর্ষকে দ্বিধাবিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা হয়।

(২) দুর্বল সংখ্যালঘিষ্ঠরা রক্ষা পায়

তৃতীয়তঃ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক স্বাধিকার রক্ষার দাবীতেও বহুজাতীয় রাষ্ট্র ভেঙ্গে পৃথক সংখ্যা-লঘু জাতিগুলির জন্য একাধিক একজাতীয় রাষ্ট্রের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করা হয়। আজকাল বহু রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা (Autarchy বা Autarky) দাবী করে।

(৩) সংখ্যালঘুদের বাণিজ্য সংরক্ষিত হয়

চতুর্থতঃ, সিলি (Seeley), বেঞ্জামিন্ কিড্ (Benjamin Kidd), পল্

রুবাখ্ (Paul Rohnbach) প্রভৃতি লেখকগণ প্রসারণশীল জাতীয়তাবাদের (Expansive nationalism) প্রবক্তা। তাঁরা বলেন যে, উন্নত, সভ্য জাতিগুলির নিজের নিজের জাতীয় সত্তা বাইরের সংঘাত, আক্রমণ বা হস্তক্ষেপ থেকে সংরক্ষণ করার অধিকার আছে, যেমন ব্যক্তির আত্মরক্ষার অধিকার সর্বত্র স্বীকৃত। আজকাল প্রচ্ছন্নভাবে এই ধরনের যুক্তির ওপর ভিত্তি করেই এককেকটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য শক্তি-তত্ত্বের (Power Theory) আশ্রয় নেওয়া হয় এবং শুধু যে একজাতীয় রাষ্ট্রের দাবি মেনে নেওয়া হয় তা নয়, এমনভাবে একজাতীয় রাষ্ট্রের সীমারেখা নির্ধারিত করার জন্য দাবী জানানো হয় যে, এই আওতায় খাদ্য, খনিজ প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সংশ্লিষ্ট জনসমাজে প্রচুর মজুত রাখা চলে।

(৪) প্রসারণশীল জাতীয়তা-বাদের যুক্তি

পঞ্চমতঃ, "এশিয়ার মুক্তি-সূর্য", নয়া চীনের পুনর্জাগরণের নেতা ডাক্তার সান্ ইয়াৎ-সেন (Sun yat-Sen) রুশবিপ্লবের মধ্য দিয়ে রুশ সমাজতন্ত্রের অভ্যুত্থানকে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পক্ষে বিরাট অগ্রগতি বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁর মতে, এই নীতিই পরাধীন উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতাসংগ্রামে জয়ী হবার প্রেরণা দিয়েছে, আধুনিক পৃথিবীতে উপনিবেশ-বিমোচন (De-colonisation) নীতিকে সার্থক করে তুলেছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি তাঁর মতের সমর্থনে রুশ সাম্যবাদী নেতা লেনিন্ ও স্তালিনের অনুরূপ উক্তিকে উদ্ধৃত করেন।

(৫) পরাধীন জাতির মুক্তি-সংগ্রামে এ নীতি ব্যবহার্য (সান্ ইয়াৎ-সেন্)

ষষ্ঠতঃ, মার্ক্সবাদীগণ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করেন। লেনিন্ শোষিত, পরাধীন জাতিসমাজের মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করার পক্ষপাতী ছিলেন। স্তালিনের মতে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার জাতীয় স্বাধিকারেরই নামান্তর। তাই তিনি বলেন যে, কোন জাতির জীবনে অন্য কারুর হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবে না, তার আচার-ব্যবহার, কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে দমন করা বা নিয়ন্ত্রিত করা চলবে না। মার্ক্সবাদীগণের বিশ্বাস যে, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতিই সংখ্যালঘু সমস্যার (minority problem) সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক পথ নির্দেশ করে। এই ধরনের নীতি অনুসরণের ফলেই সোবিয়েত রাশিয়াতে অসংখ্য ধর্মীয় ও ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সন্তোষজনকভাবে রুশ সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্রের উদ্যোগী সক্রিয় শরিকরূপে রুশ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

(৬) মার্ক্সবাদীগণ এই নীতির পক্ষে: স্তালিনের মত: সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানে এ মতের ব্যবহারে সোবিয়েত রাশিয়ার নজির

সপ্তমতঃ, বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল্ বলেছেন যে, কোন মহিলাকে যেমন ঘৃণার্হ কোন পুরুষের সঙ্গে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া যায় না, তেমনি কোন জাতিসমাজকে জোর করে অন্য কোন সরকারের অধীনে থাকতে বাধ্য করা যায় না ("To force a people to live under a Government not that of their own nation

(৭) বার্ট্রাণ্ড্ রাসেলের মতে এ তত্ত্ব জুলুমবাজীর বিরোধী

was felt to be like forcing a woman to marry a man whom she hates")।

একজাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে এত জোরালো যুক্তি থাকা সত্ত্বেও **এর বিপক্ষে যুক্তি-**গুলি অনেক বেশী বাস্তববাদী এবং গ্রহণযোগ্য। প্রথমতঃ, গুমপ্লোভিজ (Gumplowicz) ঐতিহাসিক বিচারের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বহুজাতীয় রাষ্ট্রের তুলনায় একজাতীয় রাষ্ট্রের লাভ বা ক্ষতি তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। লর্ড অ্যাক্টন (Lord Acton) ইতিহাসের পটভূমিকায় এই নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, এর ফলে মানবসভ্যতা পশ্চাৎপদ হয়ে যাবে ("The theory of Nationality is a retrograde step in history")। তাঁর মতে, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে যুক্তি একই সঙ্গে ছোট ছোট একজাতীয় রাষ্ট্র গঠন করে, আবার বৃহৎ বহু-জাতীয় রাষ্ট্রকে বহুভাগে ভাগ করে। তাই এই মতবাদ একই সঙ্গে ঐক্য ও বিচ্ছিন্নতার সমর্থনে প্রয়োগ করা যায়। লর্ড কার্জন (Lord Curzon) তাই মনে করেন যে, এটা যেন একটা দ্বিমুখী তরোয়াল, যার দুদিকেই সমান ধার। তা ছাড়া ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাক্টন বলেন যে, বহুজাতীয় রাষ্ট্রে উন্নত এবং অপেক্ষাকৃত কম উন্নত একাধিক জাতির পারস্পরিক দান-প্রতিদানের ফলে একটা বিরাট, শক্তিশালী, সুগঠিত সভ্যতার সৃষ্টি হয়। টইনবি প্রভৃতি অনেক আধুনিক ঐতিহাসিকও এই মত সমর্থন করেন। ভারতবর্ষের জাতীয়তা এই সত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত রাশিয়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও আঞ্চলিক মানবসমাজের বিভিন্ন অংশের জনগনের জ্ঞান, শৌর্য, বুদ্ধি প্রভৃতির সুন্দর এক মহামিলন সংঘটিত হয়েছে। এর ফলে প্রায়ই দেখা যায় যে একাধিক জাতি নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রগুলি একজাতীয় রাষ্ট্রের চেয়ে উন্নততর।

এই মতের বিপক্ষে যুক্তি
(১) এর দরুন লাভ-ক্ষতি তেমন গুরুতর নয় (গুমপ্লোভিজ); পশ্চাদ্‌গমনের নীতি (লর্ড অ্যাক্টন); কার্জন ও টইনবির সমালোচনা

দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অবাস্তব বলে মনে করা হয়। একেকটি বহুজাতীয় রাষ্ট্রকে যদি বহুভাগে ভাগ করা হয়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অস্তিত্বটুকুও (Viability) বজায় রাখা সম্ভব হবে না। আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী কার্ল ফ্রিডরিশ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই অতি-সাধারণ দিকটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর ফলে শুধু যে পৃথকভাবে একজাতীয় ছোট ছোট দুর্বল রাষ্ট্রগুলির নিজ নিজ অস্তিত্বই (viability) বিঘ্নিত হবে তা নয়, আন্তর্জাতিক শান্তি বিপদের সম্মুখীন হবে এবং ক্ষমতার ভারসাম্য (Balance of Power) অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হবে। "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" নীতিটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে ইউরোপে বর্তমান আটাশটি রাষ্ট্রের বদলে আটষট্টিটি রাষ্ট্র গঠন করতে হবে—শুধু সুইজারল্যাণ্ডকেই তিনটি রাষ্ট্রে ভাগ করতে হবে। ফলে, কোন রাষ্ট্রই স্বনির্ভরশীল হতে পারবে না এবং আন্তর্জাতিক শান্তিও নষ্ট হবে।

(২) অবাস্তব

তৃতীয়তঃ, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্রে (Poly-national State) স্বাভাবিক পরিবেশকে (natural eco-system বা ecological system) অথবা ভৌগোলিক পরিমন্ডলকে (geographical environs বা environment) অবলম্বন করেই মানুষ আদিমকাল থেকে কোন বিশেষ অঞ্চলে বসবাস করেছে, ফলে গড়ে উঠেছে তাদের অর্থনৈতিক বৃত্তি নির্বাচন বা বৃত্তি-বিশেষজ্ঞতা। তাদের প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (ethnic variety) থাকলেও ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণে সেই প্রজাতিগুলিকে কৃত্রিমভাবে পৃথক রাষ্ট্রের অধিবাসী করে তোলা প্রকৃতি ও অর্থনীতির স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করা। দেশবিভাগের সময় ও পরে ভারত ও পাকিস্তানের আর্থিক সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বিরাট অসুবিধা দেখা দেয়। পরবর্তীকালেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে ও সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশকে ভারতের ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল হতে হয়েছে।

(৩) অর্থনৈতিক কারণে প্রযোজ্য নয়

চতুর্থতঃ, লেনিনের সতর্কবাণী বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন যে, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে পরাধীন জনগণের স্বাধীনতার অধিকারকে বোঝায়, কিন্তু এই দাবিকে যথেচ্ছভাবে রাজনৈতিক স্বতন্ত্রীকরণের দাবিরূপে মেনে নেওয়া যায় না। যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক কার্ (E. H. Carr) ভবিষ্যতে পৃথিবীতে এ ধরনের ভঙ্গুর রাষ্ট্রব্যবস্থার আবির্ভাবকে বিশ্বশান্তির পক্ষে বিশেষ উদ্বেগজনক বলে মনে করেন।

(৪) এ মত অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে লেনিনের নিজের সতর্কবাণী : কারও অনুরূপ মতের সমর্থক

পঞ্চমতঃ, "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" নীতিটি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কতকগুলি গুরুতর অসুবিধার কথা ভাবা উচিত। যখনই কোন বড় বহুজাতীয় রাষ্ট্রকে বিভক্ত করে ছোট ছোট একজাতীয় রাষ্ট্র তৈরী করা হয়, তখনই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে উদ্বাস্তু সমস্যা ভয়াবহভাবে দেখা দেয়। অনেক অশান্তি, প্রচুর রক্তক্ষয়, ব্যক্তির, বিশেষতঃ নারীত্বের চরম অবমাননা, সম্পত্তি লুঠ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি গুরুতর বিপর্যয় দেখা দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে লোকবিনিময়ের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু এর ফলে মূল উদ্বাস্তু সমস্যাটির শুধু আংশিক সমাধানই হয়েছিল। ভারতবিভাগের অভিজ্ঞতাও খুব তিক্ত। এখনও ভারতের উদ্বাস্তু-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয় নি।

(৫) বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এ মত বহু ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য

ষষ্ঠতঃ, বর্তমান আন্তর্জাতিক আইনের দিকে দৃষ্টি রেখে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আজকাল বৃহৎ রাষ্ট্রের যুগ। ছোট-বড় নির্বিশেষে প্রত্যেক জাতীয় রাষ্ট্রকে সমান বলে যতই কল্পনা করা হোক না কেন, আসলে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি কার্যতঃ বড় বড় রাষ্ট্রের জোটে আবদ্ধ হয়। শুধু বড় রাষ্ট্রগুলির চাপেই নয়, ছোট রাষ্ট্রগুলির

স্বার্থেও আজ পৃথিবীতে দুটি বড় জোট সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো (N. A. T. O.) সৃষ্টি হয়েছে। আবার, ওয়ারশ' চুক্তির ফলে (Warsaw Pact) সোবিয়েত রাশিয়াও পূর্ব ইউরোপ অঞ্চলে নিজের জোট শক্তিশালী করে তুলে এক অদ্ভুত ক্ষমতার লড়াইয়ে (Cold War) অবতীর্ণ হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীর কোন দেশই প্রকৃত শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে এগোতে পারছে না। সুতরাং ছোট ছোট একজাতীয় রাষ্ট্র গঠনের অর্থ হল একাধারে বড় বহুজাতীয় রাষ্ট্রের বিলুপ্তি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একজাতীয় রাষ্ট্রের জোটবদ্ধতা। ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি তখন নামমাত্র স্বাধীন থাকে, আসলে তারা হয় শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির তাঁবেদার।

(৬) বর্তমান জোটবদ্ধতার যুগে প্রযোজ্য নয়

সপ্তমতঃ, জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ যেমন জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন, তেমনি তিনিদরকারমত একাধিক জাতীয় জনসমাজকে একটা বড় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় (Federal Government) রাখার পক্ষে খুব সুন্দর, সুচিন্তিত অনেক কথা বলেছেন। সোবিয়েত রাশিয়ার অসংখ্য ছোট জাতি একই রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে থেকে চমৎকারভাবে তাদের স্বার্থ, অর্থনীতি, ভাষা ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এ নিদর্শনের যুক্তি প্রযোজ্য।

(৭) মিল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষেও মত প্রকাশ করেছেন

সুতরাং সব সময় "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" নীতিকে একটা সাধারণ সূত্র বা ফরমুলা হিসাবে যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয়। তবে লর্ড ব্রাইস্ (Lord Bryce), ম্যাক্আইভার (MacIver), লেনিন্ প্রভৃতি লেখকগণ বলেছেন যে, যেখানে কোন বিশিষ্ট জাতির জাতীয় জাগরণ প্রকৃতপক্ষে তার গণতন্ত্র রক্ষা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম, সে ক্ষেত্রে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নীতি হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। এই নীতি অনুযায়ী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রাক্তন পূর্ব-পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের মুক্তিসংগ্রামকে ন্যায্য বলে ধরা উচিত। অন্যান্য ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু জাতির জনগণের নানারকম অধিকার স্বীকার করে নেওয়া উচিত, কিন্তু তাদের পৃথক পৃথক জাতি-রাষ্ট্র গঠনের অধিকার সব সময় মেনে না নেওয়াই ভাল।

উপসংহার ঃ ব্রাইস্, ম্যাক্-আইভার, লেনিন্ জাতীয় গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সংগ্রামে এর প্রয়োগ সমর্থন করেন ঃ বরং সংখ্যালঘুদের নানাপ্রকার অধিকার দেওয়া উচিত

॥ জাতীয় জনসমষ্টির অধিকার ॥

জাতীয় জনসমষ্টির অধিকারগুলি (Rights of a Nationality) এবার উল্লেখ করা যাক। প্রথমতঃ, বাঁচার অধিকার (Right to exist)। হিট্লার (Hitler) ইহুদিদের ব্যাপকভাবে নিধনের চেষ্টা করেন। এই অমানুষিক নীতির বিরুদ্ধে বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) এ ধরনের ব্যাপক গণহত্যাকে (Genocide) মানবতাবিরোধী এবং বেআইনী বলে ঘোষণা করেছেন।

জাতীয় জনসমষ্টির অধিকার ঃ (১) বাঁচার অধিকার

এমনভাবে কোন প্রজাতিকে বেঁচে থাকার অধিকার দিতে হবে, যার ফলে সে নিজের মৌল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষার অধিকার (Right to language, culture and education) স্বীকার করে নেওয়া উচিত। সাধারণতঃ প্রত্যেক প্রজাতিরই নিজের স্বতন্ত্র ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি থাকে। এমনকি, আফ্রিকার তথাকথিত অনুন্নত উপজাতিগুলিরও ভাষাগত, লিপিগত, সংস্কৃতিগত স্বকীয়তা আছে। এ সমস্ত এদের নিজস্ব অমূল্য সম্পদ। এগুলি সংরক্ষণের অধিকার স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ হল, এই আঞ্চলিক জনসমষ্টির লোকেরা যেন নিজেদের ভাষা, লিপি, সংস্কৃতি কৃষ্টি ইত্যাদি বাঁচিয়ে রাখতে পারে এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত করে তুলতে পারে।

(২) ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষার অধিকার

তৃতীয়তঃ, সংখ্যালঘু জনসমাজের আঞ্চলিক আচারব্যবস্থা, রীতিনীতি ইত্যাদি রক্ষার অধিকার (Right to retain local laws, customs and usages) মেনে নেওয়া উচিত। স্মরণ রাখা দরকার যে, ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে আলাণ্ড্ দ্বীপ (Aaland Islands) প্রধানতঃ সংস্কৃতিগত সান্নিধ্যের যুক্তিতেই ফিন্ল্যাণ্ড্ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সুইডেনের সঙ্গে সম্মিলিত হবার প্রার্থনা জানায় ও জাতিপুঞ্জ (League of Nations) এই দাবি সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর জনগণের নৈতিক দাবি বলে স্বীকার করেন। কেবল এইটুকু দেখা দরকার যে, কোন নির্দিষ্ট সংখ্যালঘিষ্ঠ জনসমষ্টির আঞ্চলিক আচার-ব্যবহার যেন এই বহুজাতীয় রাষ্ট্রের সমগ্র জনজীবনের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়।

৩) আঞ্চলিক আচার-বিচার, রীতিনীতি রক্ষার অধিকার : আলাণ্ড্ দ্বীপের নজির

চতুর্থতঃ, সংখ্যালঘিষ্ঠ জনসমষ্টির লোকেরা যেন আইনগত এবং রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার (Right to legal and political equality) থেকে বঞ্চিত না হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনের চক্ষে সব নাগরিকই সমান। জাতি, বর্ণ, ধর্ম ইত্যাদির কোন ভেদাভেদ না রেখে প্রত্যেক নাগরিককেই চাকুরী এবং অন্যান্য সকল প্রকার সুযোগসুবিধা দিতে হবে। প্রত্যেক নাগরিককে ভোটের অধিকার দিতে হবে। সরকারী অর্থ সমস্ত প্রজাতির জনগণের মধ্যে সমানভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। সোবিয়েত রাশিয়ার এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের মত দেশগুলি যেভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিগুলির অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে যথাক্রমে সাত সালা ও পাঁচ সালা পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় শিল্প, কৃষি প্রভৃতির উন্নয়নের ব্যবস্থা করছে এবং তার ফলে যেভাবে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে অনুন্নত সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণকে উন্নত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির জনগণের সঙ্গে সমান পর্যায়ে আনার চেষ্টা করছে, সে নীতি এবং ব্যবস্থা বিনা দ্বিধায় সকলের মেনে নেওয়া উচিত।

(৪) আইনগত ও রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার

॥ জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতা ॥

জাতীয়তাবাদ (Nationalism) এবং আন্তর্জাতিকতা (Internationalism) বর্তমান যুগে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী মতাদর্শ। এদের ঘাতপ্রতিঘাত সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা করতে হলে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এদের পারস্পরিক ভূমিকা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করা দরকার। প্রথমে জাতীয়তাবাদ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতা

কৃষিভিত্তিক আদিম জনসমাজ যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করে ক্রমে ক্রমে কৃষিব্যবস্থার বপন-ফলনের তাগিদেই কৃষিক্ষেত্রের এক-একটা অঞ্চল ভিত্তি করে আঞ্চলিক জনসমাজে পরিণত হল। এই অঞ্চলভিত্তিক একাত্মবোধ ধীরে ধীরে দেশপ্রেমের রূপ নিল ও স্থানীয় এক একটি জনসমষ্টিকে অবলম্বন করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক চেতনার ক্রমোন্মেষের ফলে এক একটি জাতি-রাষ্ট্র গড়ে উঠল। বলা বাহুল্য, এই পর্যায়ে সমাজসংগঠনের রাষ্ট্রিক রূপলাভ দু-তিন শত বছরে হয় নি, সহস্র শতাব্দীর সামগ্রিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলেই এই সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হয়।

ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ঃ কৃষিভিত্তিক স্তর থেকে জাতিসমাজে রূপান্তর ও উন্নয়ন

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলি (City States) আঞ্চলিকতার ভিত্তিতেই সংগঠিত হয়ে এক ধরনের জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করেছিল। স্পার্টা (Sparta) শৌর্যবীর্যের প্রতীক ছিল, এথেন্স্ (Athens) ছিল কৃষ্টিসংস্কৃতির প্রতীক। গ্রীক ও রোমকগণ সাম্রাজ্যবিস্তারের নীতি অনুসরণ করার ফলে বহু দেশের জনগণ নিজেদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হল। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংস হলেও রোমক যুগের ঐক্য ও বিশ্বজনীনতার ভাব ক্রমশঃ মানবতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সব কিছু বিচার করা সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে তুলেছিল। খ্রীস্টধর্মে (Christianity) জাতি, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে সবাইকে ভগবানের সন্তান বলে প্রচার করা হয়। খ্রীস্টধর্মের অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে বিশ্বজনীনতার আদর্শ (Cosmopolitanism) ধীরে ধীরে প্রচারিত হতে লাগল। খ্রীস্টধর্মের প্রধান যাজক পোপের (Pope) সার্বিক কর্তৃত্ব, লাতিন (Latin) ভাষার ব্যবহার এবং সামন্ততন্ত্রের প্রচলনের ফলে ইউরোপে মধ্যযুগ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদ সুস্পষ্টভাবে প্রকট হতে পারে নি, বরং আন্তর্জাতিকতার আদর্শ খাপছাড়াভাবে কার্যকর হচ্ছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রাজার হাতে, ধর্মীয় ক্ষমতা পোপের হাতে এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা সামন্তদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল।

গ্রীক ও রোমকযুগে সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রসার ; খ্রীস্টান বিশ্বজনীনতার আদর্শের প্রভাব

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে লাতিন ভাষার বদলে আঞ্চলিক ভাষাগুলি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হতে লাগল। এটিকে রেনেসাঁস (Renaissance) বা সভ্যতার নবজাগরণের ফল বলে ধরা হয়। বিভিন্ন ভাষাভাষী বণিকদের যাতায়াতের ফলে নানা দেশের জনগণের মনে পৃথকভাবে জাতীয় সত্তা সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিল। ব্যবসাবাণিজ্যের সংরক্ষণের খাতিরে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা অধিকতর কেন্দ্রীভূত হতে লাগল। ষোড়শ শতাব্দীতে মার্টিন লুথারের (Martin Luther) দ্বারা প্রবর্তিত প্রোটেস্টান্ট ধর্ম (Protestant Reformation Movement) নতুন রাষ্ট্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। ধর্মীয় পার্থক্যের ভিত্তিতে ক্যাথলিক (Catholic) পোপের আন্তঃরাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব (Holy Roman Empire) থেকে মুক্ত আলাদা ধরনের রাষ্ট্ররূপে ইংলন্ড, ফ্রান্স ও স্পেন গড়ে উঠল। জার্মানী ও ইতালীতে তখনও পোপের কর্তৃত্ব অব্যাহত রইল। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে গণতান্ত্রিক আদর্শ জয়ী হল। জনগণের সমষ্টিগত সচেতনতা রাষ্ট্রের পরিচালনার মূল ভিত্তিরূপে স্বীকৃত হল।

১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক ভাষাগুলির বিকাশ; প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের প্রভাব

পরবর্তীকালে নাপোলিয়ঁ বা নেপোলিয়ন (Napoleon) যখন জার্মানীতে ও স্পেনে ফরাসী আধিপত্য স্থাপনে সচেষ্ট হন, তখন সেখানকার জনগণ জাতীয়তাবোধে ও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ হল যে, তার ফলে তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল। নাপোলিয়ঁর পতনের পর ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে ভিয়েনার মহাসভায় (Congress of Vienna) ইউরোপের মানচিত্র প্রধানতঃ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে পুনরায় অঙ্কিত হল।

নাপোলিয়ঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলি কিভাবে স্বাধীন হল

ফরাসী সাম্রাজ্যের পতনের পর অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটেরনিশ (Metternich) ইউরোপে এবং ইউরোপের বাইরে অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেন। কেননা হাঙ্গেরীর ম্যাগইয়ার (Magyar), ইল্লিরিয়ার (Illyria), শ্লাভ (Slav), বোহেমিয়ার (Bohemia) জেক (Czech), গ্যালিসিয়ার (Galicia) পোল (Poles), লম্বার্ডি (Lombardy) এবং ভিনিসিয়ার (Venetia) ইতালীয়গণ সকলেই পূর্বে অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখনকার অটোম্যান (Ottoman) বা তুর্কী সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রায় ছয়টি খ্রীস্টান জাতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ফলে ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশগুলি জাতীয়তার ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অস্ট্রিয়ার হাপসবুর্গ (Hapsburg), রাশিয়ার রোমানফ (Romanoff), এশিয়ার শৈলেন্দ্র বংশীয় সাম্রাজ্য, প্রুশিয়ার হোহেনজলার্ন (Hohenzollern) এবং তুরস্কের অটোম্যান সাম্রাজ্যগুলি ক্রমে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পৃথক পৃথক জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হল।

ভিয়েনা কংগ্রেসে (১৮১৫) জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি ঃ ইউরোপের মানচিত্রে অদলবদল

তুর্কী সাম্রাজ্যের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিদ্বেষ ও যুদ্ধের ফলে তুরস্কের ত্রুটিপূর্ণ প্রাচ্যনীতির (Eastern Policy) শোচনীয় পরিণামরূপে ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ দেখা দেয়। এই যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর উড্রো উইল্‌সনের প্রস্তাবিত জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির ভিত্তিতে ইউরোপের মানচিত্র আবার নতুন করে অঙ্কিত হল এবং চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি নতুন একজাতীয় রাষ্ট্রের পত্তন হল।

তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রাচ্যনীতি জাতীয়তা সম্পর্কেই ঃ তাই নিয়ে ১ম বিশ্বযুদ্ধ ঃ উইল্‌সনের "চৌদ্দ দফা শর্ত"

হিট্‌লারের আবির্ভাবের ফলে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা হল। চেকোশ্লোভাকিয়ার সুডেটেন্‌ (Sudeten) অঞ্চল, পোল্যাণ্ড্‌, বেল্‌জিয়াম্‌, হল্যাণ্ড্‌, ফ্রান্স্‌ প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন একজাতীয় রাষ্ট্র হিট্‌লার দখল করলেন। কিন্তু শেষে ১৯৪৫ সালে তাঁর পরাজয়ের ফলে এই রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকটির প্রাক্তন জাতীয় সত্তা পুনরায় স্বীকৃত হল।

হিট্‌লারের সাম্রাজ্যবাদ প্রকৃত জাতীয়তার বিরোধী ঃ তাঁর পরাজয়, ২য় বিশ্বযুদ্ধের অবসান

হিট্‌লার জাতীয়তাবাদের এক নতুন বিকৃত ব্যাখ্যা (Perverted Nationalism) প্রচার করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর শোচনীয় পরাজয়ের পর জার্মানদের মনে চরম গ্লানি এবং বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়। তার শোধ নেবার জন্য তিনি তাদের উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। তিনি প্রচার করেন যে, একমাত্র জার্মানগণই আর্য, অন্যান্য জাতির মানুষ অনার্য এবং তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সর্বাত্মক একনায়কতন্ত্রী সরকারের মাধ্যমেই আর্য জার্মানগণ আবার পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হবে।

হিট্‌লারের জঙ্গী নীতি জার্মানদের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব-তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত

হিট্‌লার জাতীয়তাবাদের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন, তা প্রকৃত জাতীয়তার অর্থাৎ স্বাদেশিকতার (patriotism) সুমহান্‌ আদর্শ রূপ নয়, চরম, উগ্র, বিকৃত রূপ। এ ধরনের স্বাদেশিকতার ফলে একজাতিভুক্ত ব্যক্তিগণ প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই নিজেদের সব কিছুকেই শ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করে, অন্যান্য জাতির সব কিছুকেই হেয় বলে অবজ্ঞা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত হিট্‌লারের পরাজয় ঘটলেও জাতীয় অহংবোধ অনেক দেশেই আজও বিকৃত ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ধ্বনি তোলে। খেলার মাঠে যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের খেলোয়াড়গণ মিলিত হন, তখন এই বিকৃত চরম রূপ প্রকাশিত হয়, অথচ খেলাধুলার মাধ্যমেই বিভিন্ন দেশের জনগণের মধ্যে প্রেম ও মৈত্রীর সেতু রচিত হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা।

কিন্তু আজও আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রশ্রয় পায়

কার্ল্‌ ডয়েট্‌স্‌ (Karl Deutsch) বলেন যে, মানুষের সঙ্গলিপ্সা, স্বভাবসিদ্ধ সামাজিকতা তাকে একই আঞ্চলিক অধিবাসীদের সঙ্গে ও দূরবর্তী কেন্দ্রীয় এলাকার অধিবাসীদের সঙ্গে সহযোগী করে তুলেছে। জাতীয়তাবোধ এই যোগাযোগ-মাধ্যমের (Communication system) একটি পথ বা চ্যানেল্‌ (channel)।

জাতীয়তাবাদের পক্ষে যুক্তি ঃ কার্ল্‌ ডয়েট্‌সের যোগাযোগ-মাধ্যম তত্ত্ব

আদর্শ জাতীয়তাবাদের প্রকৃত অর্থ শুধু কতকগুলি মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রিক ঐক্য স্থাপন নয়। এ ঐক্য সচেতন, জৈবিক। সেই চেতনাপূর্ণ মৈত্রীর ফলে একদিকে রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ সাধারণ মানবতাবোধের ভিত্তিতে পরস্পর সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে, নিজেদের, রাষ্ট্রের, সকলের বাঁচার তাগিদে অপর রাষ্ট্রগুলির অধিবাসীদেরও বাঁচবার সুযোগ এনে দেয়। একেই বলে "আমরা বাঁচি, তোমরাও বাঁচো (Live and let live)" নীতি। গান্ধীজী তাঁর সম্পাদিত "যুব ভারত" ("Young India") পত্রিকার একটি মূল্যবান সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই আদর্শ অনুযায়ী জাতীয়তাবোধের উদ্দেশ্য খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—আদর্শ ব্যক্তি পরিবারের সকলের জন্য, পরিবার গ্রামবাসীদের জন্য, গ্রামবাসীগণ জেলার অধিবাসীদের জন্য, জেলার অধিবাসীগণ প্রদেশের অধিবাসীদের জন্য, প্রাদেশিক অধিবাসীগণ জাতির জন্য, সব শেষে, জাতি বহির্জাতির সকলের জন্য যখন স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত হন, তখনই গড়ে ওঠে আদর্শ জাতীয়তাবাদ ("The individual, being pure, sacrifices for the family, the latter for the village, the village for the district, the district for the province, the province for the nation, the nation for all")। বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন ঃ জাতীয়তাবাদ সাদৃশ্য ও ঐক্যের সচেতনা। ত্যাগ, প্রেম ও মৈত্রী এই সচেতনা গড়ে তোলে, আবার জাতীয় সচেতনাও প্রেম ও মৈত্রীর ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে দেয়। আদর্শ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তাই আন্তর্জাতিকতার কোন সংঘর্ষ বা বিরোধ থাকতে পারে না। বলা চলে যে, মানবসভ্যতার অগ্রগমনের সহায়ক হিসাবে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসাবে আদর্শ জাতীয়তাবাদ জাতির সঙ্গে জাতির সম্প্রীতি এমনভাবে বাড়িয়ে তোলে যে তার ফলে আন্তর্জাতিকতাও সকলের অজ্ঞাতসারে গড়ে ওঠে। তাই জিমার্ন (Zimmern) যথার্থই বলেছেন যে, প্রকৃত জাতীয়তাবাদের পথেই আন্তর্জাতিকতা গড়ে ওঠে ("Nationaliam is the highway to Internationalism")। আধুনিক যুগে বার্কার, ডিলাইল বার্নস, হেস প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণও আদর্শ জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতার মধ্যে সম্পর্ক এইভাবে ব্যক্ত করেছেন।

আদর্শ জাতীয়তাবাদের গুণ ঃ মানবতাবাদের সমর্থন ; স্বার্থ-ত্যাগের জন্য প্রস্তুতি ; গান্ধীজী, বার্ট্রান্ড রাসেল ও জিমার্নের মত

মার্কসবাদীগণ জাতীয়তাবাদকে "বুর্জোয়াজাতীয়তাবাদ" (Bourgeois Nationalism) এবং "প্রোলেতরীয় জাতীয়তাবাদ" (Proletarian nationalism) এই দুটি ভাগে বিভক্ত করতে চান। ধনতন্ত্রে ধনিকশ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ চরিতার্থ করতে, অর্থাৎ সর্বহারাদের শোষণের জন্য ব্যবহার করে, রাষ্ট্রের নামে দেশপ্রেম, জাতীয় ঐক্য বা জাতীয় সংহতির আদর্শকে নিজেদের খুশীমত বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করে। প্রচার-মাধ্যমগুলি তাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সাহায্য করে। সাম্যবাদী বিপ্লবের পর প্রোলেতারীয় জাতীয়তাবাদের মারফতই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং খেটে-খাওয়া শ্রমিকগণ যে শ্রেণীবিহীন জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে চান, সেটাই

হল প্রকৃত জাতীয় ঐক্য, খাঁটি জাতীয়তাবাদ। মার্ক্সবাদীগণ অবশ্য প্রোলেতারীয় জাতীয়তাবাদের বহু ঊর্ধ্বে রেখেছেন তাঁদের চরম লক্ষ্য— আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সার্বভৌম বিশ্বশ্রমিক সমাজ গঠন। এই চরম অবস্থাতেই বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের শ্রমিকগণ আন্তর্জাতিক প্রোলেতারিয়াত্ (International Proletariat) গড়ে তুলবে এবং সাম্যবাদকে প্রকৃত আন্তর্জাতিক, জনগণতান্ত্রিক মতাদর্শ (Internatioanl Communism) রূপে প্রতিষ্ঠিত করবে। এইভাবে মার্ক্সবাদীগণও বলেন যে, প্রকৃত জাতীয়তা ও আদর্শ আন্তর্জাতিকতার মধ্যে সত্যিই কোন বিরোধ নেই। বিরোধ যা কিছু, তা হল সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে পুঁজিপতিগণের শোষণভিত্তিক, বিকৃত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে, তাদের উগ্র, জঙ্গী জিগিরের সঙ্গে।

মার্ক্সবাদীগণ আন্তর্জাতিকায় বিশ্বাসী ; তাঁদের চরম লক্ষ্য— আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সার্বভৌম বিশ্বশ্রমিক সমাজ স্থাপন

ল্যাস্কি (Laski) লেনিনের মতের সমর্থনে ধনতন্ত্রকে (Capitalism) বিকৃত জাতীয়তাবাদের সূতিকাগার বলে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) ছাড়া গণতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতা কোন আদর্শেরই পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব নয়। শিল্পবিপ্লবের ফলে (Industrial Revolution) আগেকার কৃষিভিত্তিক সামন্ততন্ত্র (Feudalism) দূর হয়ে তার স্থলে বিকশিত হল শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র। জমির আগের মালিকগণ শিল্পবিপ্লবের পর থেকে পুঁজিপতিরূপে আবির্ভূত হলেন। ফলে, শ্রমিক ও মালিক এই দুই শ্রেণীর সংঘর্ষে সাম্য, ন্যায়বিচার প্রভৃতি গণতন্ত্রের মূল মানবিক আদর্শগুলির অবলুপ্তি ঘটতে লাগলো, ধনিক বা বুর্জোয়াগণ রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে সমাজে একাধিপত্য চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁদের নেতৃত্বে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে রাজনৈতিক দলগুলি স্থাপিত হল, তারা সাম্রাজ্যবাদকে (Imperialism বা Colonialism) নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্যরূপে প্রচার করতে লাগল। প্রকৃতপক্ষে, এরা চাইছিল নিজেদের শিল্পসম্ভাবনাকে অধিকতর শক্তিশালী করে তুলে নিজেদের শ্রেণীগত নেতৃত্ব অটুট রাখতে। বৃহদায়তন শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সংগ্রহের জন্য এবং পরে ঐ মালের সাহায্যে নিজেদের কারখানায় প্রস্তুত শিল্পজাত দ্রব্য সরবরাহের জন্য বিদেশী শাসকগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁদের উপনিবেশগুলি ব্যবহার করতে শুরু করলেন। লেনিন্ (Lenin) এজন্যই বলেছেন যে, ধনতন্ত্রের চরম পরিণতি দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদী শাসনে ("Imperialism is the highest stage of Capitalism")।

ল্যাস্কি সমাজতন্ত্রবাদ ও বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিকতাকে সমর্থন করেছেন : সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের আঁতাত সম্পর্কে লেনিনের মত অনুরূপ

ধনতন্ত্রের পটভূমিকায় ল্যাস্কি জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকৃতির যে চমৎকার ধারাবিবরণী দিয়েছেন, তারই পাশাপাশি আন্তর্জাতিকতার ধীর, কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপের

বর্ণনাও তাঁরই লেখায় পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের চরম অগ্রগতির ফলে দূরদর্শন, বেতার, সংবাদপত্রের মারফত আজ দেশদেশান্তরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে মানুষ অত্যন্ত দ্রুততালে সচেতন হতে পারছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য আজ এমন পর্যায়ে এসে পড়েছে যে, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলের কফি বাগিচায় কোনো শ্রমিক ধর্মঘট দেখা দিলে সুদূর মালয় দ্বীপপুঞ্জের রবারের শ্রমিকদের সংগঠনের ওপরও তার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আণবিক বোমার আবির্ভাবের ফলে, মানুষের চান্দ্র-অভিযান সফল হবার ফলে, বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক অগ্রগতির চাপে পৃথিবীর এক পিঠের এক দেশ থেকে অন্য পিঠের অন্য দেশের দূরত্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কিছুই নয়, এদের ভৌগোলিক দূরত্ব যাই হোক না কেন। পৃথিবীর ছোট-বড় নির্বিশেষে সব দেশের কাছেই যুদ্ধ আতঙ্কজনক, কেননা আজকের যুদ্ধ মানেই আণবিক যুদ্ধ। তার ফলে, পৃথিবীর সব দেশই মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

ল্যাস্কির মতে আন্তর্জাতিকতার আদর্শের উন্মেষের কারণ ঃ বিজ্ঞানের চরম অগ্রগতির ফলে পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে নিকট আত্মীয়তা

এহেন আন্তর্জাতিক পটভূমিকা থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববাসীদের মধ্যে আজ মৈত্রী ও ভালবাসার বন্ধন সুদৃঢ় হতে পারছে না। এর আসল কারণ হিসাবে ল্যাস্কি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই দায়ী করেছেন। এ রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকেই চরম শক্তি বলে মেনে নেওয়া হয়। ফলে, যুদ্ধ-বিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান মানবসভ্যতার এই চরম সংকট দূর করার জন্য ল্যাস্কি তাই সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ গ্রহণের জন্য এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের বদলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির ঊর্ধ্বে একটি সর্বশক্তিমান বিশ্বযুক্তরাষ্ট্র (World Federation) স্থাপনের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তা না হলে বর্তমানে আফ্রিকায় ও অন্যত্র বিভিন্ন শোষিত, ঔপনিবেশিকতার দ্বারা শৃঙ্খলিত জাতিদের মধ্যে যে মুক্তিসংগ্রাম দেখা দিচ্ছে, তা অবশ্যই সারা পথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। ল্যাস্কির এই অভিমত কিন্তু পৃথিবীর আধুনিক ঘটনাপরম্পরা সমর্থন করে না। করলে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরগুলিতে, বিশেষতঃ, সোবিয়েত রাশিয়া ও চীনের মধ্যে এমন পারস্পরিক বিদ্বেষ ও কলহ দেখা দিত না।

তবুও আদর্শ আন্তর্জাতিকতার পথে বাধা কোথায় ?—
(১) অবাধ ধনতন্ত্র (ল্যাস্কি)
(২) সাম্যবাদী শিবিরে অন্তর্দ্বন্দ্ব ঃ রুশ-চীন বিরোধ

তবে আদর্শের দিক থেকে ল্যাস্কি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আন্তর্জাতিকতার পক্ষে মত দিয়েছেন। বিভিন্ন মানবপ্রেমী দার্শনিক ও মনীষীগণ মানবতাবাদ ও নীতিবাদের ভিত্তিতে ঐ একই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। ইতালীয় মুক্তিসংগ্রামের মন্ত্রদাতা মাৎসিনি (Mazzini) বলেন যে, প্রত্যেক জাতিরই যে স্বকীয়তা আছে, সেই বিভিন্ন জাতীয় প্রতিভার সার্থক সমন্বয়েই মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতি পৃথিবীর সকলের কাছেই এক মূল্যবান সম্পদ বলে গণ্য হয়। সেই অর্থে আদর্শ জাতীয়তাবাদই প্রকৃত আন্তর্জাতিকতা গড়ে তুলতে পারে।

উপসংহার ঃ আদর্শ জাতীয়তাবাদই প্রকৃত আন্তর্জাতিকতা গড়ে তুলবে (মাৎসিনি)

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জাপানী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের নিন্দা করে বলেন যে, এই জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বিশ্বশিল্পের ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী হবার জন্য এক ধরনের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় জাপান মেতে উঠেছিল। তাই ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদী, বিকৃত জাতীয়তাবাদ জাপানকেও একটা নেশার ঘোরে, একটা তীব্র উম্মাদনায় মাতিয়ে রেখেছিল। ঠিক এই কারণেই ল্যাস্কি লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যার সাহায্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিকৃত জাতীয়তাবাদের নিন্দা করেছেন।

কবিগুরুর বাণী : জাপানের সংকীর্ণ, জাতীয়তাবাদ, বিকৃত শ্রেষ্ঠীতন্ত্র ও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ : বঙ্কিমের অনুরূপ উক্তি

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, "ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism—ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে।" এ রকম বিকৃত জাতীয়তাবাদ যুদ্ধবাদী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একেই "সভ্যতার সংকট" বলে সার্থকভাবে চিহ্নিত করেছিলেন।

মানবতাবাদী ফরাসী সাহিত্যিক রমাঁ রল্যাঁ (Romain Rolland), শ্রীঅরবিন্দ সকলেই জাতীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে মহামানবিক, জাগতিক সত্তার উদ্বোধনে পৃথিবীর সকল দেশের অধিবাসীদের আহ্বান করেছেন। এই জাগতিক সত্তা বরাবর রয়েছে, একে সক্রিয় করে না তুললে বিশ্বশান্তি বার বার বিঘ্নিত হবে। অবশ্য পরাধীন দেশের মুক্তিসংগ্রামের অগ্রগমনরূপে জাতীয়তাবাদের ধ্রুবাত্মক ভূমিকা রয়েছে।

রমাঁ রল্যাঁ ও শ্রীঅরবিন্দ মাৎসিনির মতের সমর্থক

আন্তর্জাতিকতার মতামত শুধু কল্পনাবিলাস নয়। বাস্তবেও আজ এর কল্যাণকর রূপ সুস্পষ্ট দেখা যায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) বিভিন্ন বিভাগের, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার (Economic and Social Council) এবং ইউনেস্কোর (UNESCO) কার্যকলাপ থেকেই বেশ বোঝা যায়, আন্তর্জাতিকতা আজ কত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে নবীন যুগের নতুন জীবনবেদরূপে। আদর্শ জাতীয়তাবাদ এবং প্রকৃত আন্তর্জাতিকতার সমন্বয়ের মাঝেই আগামী দিনের অনাগত প্রজন্ম তার মুক্তিমন্ত্র খুঁজে পাবে—এ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের। তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত বাণী উদ্ধৃত করে বলতে হয়—"বৈচিত্র্য এবং অনেক সময় বিরোধী প্রবৃত্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নেশন সভ্যতা বিস্তার কার্যে সহায়তা করিতেছে। মনুষ্যত্বের মহাসঙ্গীতে প্রত্যেকে এক একটি সুর যোগ করিয়া দিতেছে, সবটা একত্রে মিলিয়া বাস্তবলোকে যে একটি কল্পনাগম্য মহিমার সৃষ্টি করিতেছে তাহা কাহারও একক চেষ্টার অতীত।"

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেবামূলক ভূমিকা : রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী : আদর্শ জাতীয়তাবাদ মানবতাবাদী, বিশ্বজনীন ; কবিগুরু মাৎসিনির মতই আশাবাদী

সারাংশ

"নেশন্" কথাটির সংজ্ঞা নিয়ে রবীন্দ্রভাবনা। "জাতি" বা "নেশন্" সম্বন্ধে ব্রাইসের সংজ্ঞা। ব্রাইসের সংজ্ঞা থেকে জনসমষ্টি (People), জাতিসমাজ (Nationality), জাতি (Nation) এবং জাতীয় রাষ্ট্র বা জাতি-রাষ্ট্র (Nation-State) এগুলির পার্থক্য ও এদের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝা যায়। উদাহরণ—ভারত ও পাকিস্তানের জন্মবৃত্তান্ত। হেসের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে, জাতির উৎপত্তি বা অবলুপ্তি রাষ্ট্রের উৎপত্তি বা অবলুপ্তি বোঝায় না।

জিমার্ন, ক্রিস্টোফার লয়েড্, স্পেঙ্গ্লেরর ও টইন্‌বির মতে জাতি বা জাতি-সমাজ গঠনের বাহ্য ও ভাবগত উপাদানের মধ্যে ভাবগত উপাদানই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বাহ্য উপাদান বলতে বোঝায়—অর্থনৈতিক, কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত, ভৌগোলিক ও সাংবিধানিক ঐক্য। তবে এর প্রত্যেকটি না থাকলেও চলে। ভাবগত উপাদান বলতে মুখ্যতঃ ঐতিহ্যগত ঐক্যকেই বোঝায়। গ্রাহাম্ ওয়ালাস্ "ঐতিহ্য" সম্বন্ধ সংজ্ঞা দিয়েছেন।

ভারত "জাতি" না হলেও জাতিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পথে সঞ্চরমান (রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। জাতিগঠনের বাহ্য উপাদানগুলির বেশীর ভাগ না থাকলেও ভারতের ও ভারতীয়দের ঐতিহ্যগত ঐশ্বর্যকে অর্থাৎ ভাবগত উপাদানের ওপর জোর দিয়ে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড জাতি বলে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছেন। লর্ড্ বার্কেন্‌হেড্ ভারতকে বহুজাতীয় বললেও ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট্ স্মিথ এ মত খণ্ডন করেছেন। ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের আসল তাৎপর্য: প্রত্যেক ভারতীয় ভারততীর্থের পথিক। বিবেকানন্দ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী, জওহরলালও এ মতের সমর্থক। মার্ক্‌স্‌বাদীগণ ভারতকে একজাতীয় রাষ্ট্র বলে মনে করেন না; মূল সমস্যা সংখ্যালঘুদের নিয়ে। কিন্তু ভারতের সাংস্কৃতিক আত্তীকরণ একটা বাস্তব ঘটনা, যদিও তা এখনও অসম্পূর্ণ। তবুও বর্তমানে ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদের আবির্ভাব; কিন্তু দল বড় নয়, দেশ বড়। মার্ক্‌সবাদীদের যুক্তির সমর্থনে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ওপর পরোক্ষভাবে জাতীয় ঐক্য নির্ভরশীল।

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার: "একজাতি, একরাষ্ট্র"—ভারতের মত বহু-প্রজাতীয় মতের সার্থক সমন্বয় দুর্লভ। তাই বড় বহুজাতীয় রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে ছোট ছোট একজাতীয় রাষ্ট্রে বিভক্ত করে দেওয়া উচিত। যে অধিকার স্বীকার করে এই বিভাজন, তাকেই বলে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। ১৭৭২ সালে পোল্যাণ্ডের বিভাজনের পর তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত খ্রীস্টান রাষ্ট্রগুলি এই দাবী তুলতে থাকে। ভিয়েনার মহাসভায় (১৮১৫) এই দাবী প্রথম স্বীকৃত হয়। ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর (১৯১৯) উড্রো উইলসনের, "চৌদ্দ দফা শর্তের" অন্যতম ছিল এই অধিকারের স্বীকৃতি। তদনুসারে ইউরোপে অনেক ছোট ছোট নতুন রাষ্ট্র দেখা দেয়। আটলান্টিক্ সনদে (১৯৪১) ও বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদেও এর স্বীকৃতি। সাংস্কৃতিক কারণে, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ, তাদের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য ও পরাধীন, শোষিত জাতিগুলির মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে এই তত্ত্বের প্রয়োগ। এ দিক থেকে লেনিন্, স্তালিন ও সান্ ইয়াৎ-সেনের এই মত সমর্থন। বলা হয় যে, সোবিয়েত রাশিয়া এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই তার সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান করে। প্রসারণশীল জাতীয়তাবাদের নামে এ মত সমর্থিত। কিন্তু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে এ মতকে সর্বত্র প্রযোজ্য বলা যায় না। গুমপ্লোভিজ, লর্ড্ অ্যাক্টনের, কার্জন্ ও টইন্‌বির সমালোচনা। লেনিন্ নিজেই এ মতের যথেচ্ছ অপপ্রয়োগের বিরোধী ছিলেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার, আধুনিক জোটবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে এ মত পরিত্যাজ্য। জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ যেমন জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করেছেন, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও সমর্থন করেছেন। সুতরাং জাতীয় গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার স্বার্থে এ মত সমর্থনযোগ্য (ব্রাইস্, লেনিন্, ম্যাক্‌আইভার)। তবে সংখ্যালঘুদের নানাপ্রকার অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ বাঞ্ছনীয়। এই অধিকারগুলি হল—বাঁচার অধিকার; ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষার অধিকার; আঞ্চলিক আচার বিচার, রীতিনীতি রক্ষার অধিকার; আইনগত ও রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার।

জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতা—ঐতিহাসিক পর্যালোচনা—কৃষিভিত্তিক স্তর থেকে জাতিসমাজে রূপান্তর ও উন্নয়ন। গ্রীক ও রোমক যুগে সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রসার। খ্রীস্টান বিশ্বজনীনতার আদর্শের প্রভাব। ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক ভাষাগুলির বিকাশ। প্রোটেস্টান্ট্ ধর্মের প্রভাব। নাপোলিয়র সাম্রাজ্যের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলি ক্রমশঃ স্বাধীন হল। ভিয়েনা কংগ্রেসে (১৮১৫) জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি, ইউরোপের মানচিত্রে অদলবদল। তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রাচ্যনীতির বিরুদ্ধে ১ম বিশ্বযুদ্ধ। উইল্‌সনের "চৌদ্দ দফা শর্তের" অন্যতম শর্ত জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি। হিট্‌লারের জঙ্গী, সাম্রাজ্যবাদী, বিকৃত জাতীয়তাবাদ—জার্মানদের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ২য় বিশ্বযুদ্ধে হিট্‌লারের ও তাঁর উগ্র জাতীয়তাবাদের পরাজয়। কিন্তু আজও আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রশ্রয় পায়।

জাতীয়তাবাদের পক্ষে যুক্তি: কার্ল্ ডয়েট্‌সের যোগাযোগ মাধ্যম তত্ত্ব। আদর্শ জাতীয়তাবাদ মানবতাবাদী। আদর্শ জাতীয়তাবাদ ত্যাগভিত্তিক—গান্ধীজী, বার্ট্রাণ্ড রাসেল্ ও জিমার্নের মত। মার্ক্‌স্‌বাদীগণও আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী। তাঁদের চরম লক্ষ্য—আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সার্বভৌম বিশ্বশ্রমিক সমাজ স্থাপন।

ল্যাস্কি সমাজতন্ত্রবাদ ও বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিকতাকে সমর্থন করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের আঁতাত সম্পর্কে লেনিনের মতও অনুরূপ। ল্যাস্কির মতে আন্তর্জাতিকতার আদর্শের উন্মেষের কারণ: বিজ্ঞানের চরম অগ্রগতির ফলে পৃথিবীর দেশগুলির নিকট-আত্মীয়তা। তবুও আদর্শ আন্তর্জাতিকতার পথে বাধা—অবাধ ধনতন্ত্র (ল্যাস্কি) এবং সাম্যবাদী শিবিরে অন্তর্দ্বন্দ্ব (রুশ-চীন বিরোধ)।

উপসংহার: আদর্শ জাতীয়তাবাদই প্রকৃত আন্তর্জাতিকতা গড়ে তুলবে (মাৎসিনি, রমাঁ রলাঁ, শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের অভিমত)। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেবামূলক ভূমিকা।

কবিগুরু জাপানের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে নিন্দা করেছেন—সেখানে ছিল বিকৃত শ্রেষ্ঠীতন্ত্র ও পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ। রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী—আদর্শ জাতীয়তাবাদ মানবতাবাদী, বিশ্বজনীন। কবিগুরু মাৎসিনির মতই আশাবাদী।

———

৬

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

"Territoriality of jurisdiction is a rule of convenience in the sphere of evidence. It is not a requirement of justice or even a necessary postulate of the sovereignty of the state."

—Lauterpacht

॥ ভূমিকা ঃ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথে বাধা ঃ যুদ্ধের কারণ ॥

মানুষের চরিত্রে দুটি পরস্পরবিরোধী ভাব দেখা যায়। একটি হল অন্যান্য সকলের সঙ্গে তার সহযোগিতার আকাঙ্ক্ষা। এটি তার শান্তিপ্রিয়তার লক্ষণ। এর বিপরীত হল অপরের সঙ্গে তার সংঘাত, সংঘর্ষের প্রবণতা। এর ফলে দেখা দেয় ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির মতবিরোধ, হিংসা, ঘৃণা। সমাজতত্ত্ববিদদের মতে, প্রথম দিকটি হল ব্যক্তিমানসের সামাজিক প্রবণতা। এই প্রবণতা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সংস্থার সংঘবদ্ধতার প্রবণতা (sociability)। এর বিপরীত প্রবণতা অসামাজিক, বিভেদকামী। এর ফলে দেখা দেয় বিচ্ছিন্নতা (dissociability বা alienation)। সমাজের স্থায়িত্ব নির্ভর করে ব্যক্তিচরিত্রের প্রথম অর্থাৎ সামাজিক প্রবণতার ওপর। সমাজ ধ্বংস হয়ে যায় দ্বিতীয়, অর্থাৎ অসামাজিক, বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিভেদপন্থী ঝোঁকের জন্য।

ব্যক্তিচরিত্রে বৈপরীত্য ঃ বিচ্ছিন্নতা বনাম সংঘবদ্ধতা ; সংঘবদ্ধতাই জয়ী

ব্যক্তিচরিত্রের সংঘবদ্ধ প্রকাশ দেখা যায় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে। মতাদর্শ (Ideologies), জাতীয় স্বার্থ (National Interest), জাতীয় শক্তি (National power) ইত্যাদি লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় নেতাগণ রাষ্ট্রের জনগণকে সংঘবদ্ধ করে তোলেন। প্রত্যেক রাষ্ট্র তার নিজস্ব সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ করে এই জনগণকে যথেচ্ছভাবে পরিচালনা করে থাকে। ফলে, ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্বের ফলে সমাজে যেমন সংঘাত দেখা দেয়, এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের স্বার্থের সংঘাতের ফলেও তেমনি প্রতিযোগিতা বা সংঘর্ষ দেখা দেয়। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্ররূপে তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেও দুর্বল, অনগ্রসর রাষ্ট্রগুলিকে নিজের নিজের দখলে রাখার চেষ্টা করে। এই সমস্ত কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রচরিত্রেও তার প্রতিফলন ঃ এ ক্ষেত্রেও সংঘবদ্ধতার জয়

॥ যুদ্ধবিরোধী ও বিশ্বশান্তিবর্ধক প্রচেষ্টা ঃ তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক ॥

"হিতোপদেশ" নামক প্রাচীন ভারতের সরস ও সারগর্ভ নীতিকাহিনীর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, উদারপন্থী ব্যক্তিগণ সমস্ত পৃথিবীর জনগণকেই পরমাত্মীয়,

কুটুম্বের মত মনে করেন ("উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্")। ভারতের বৈদান্তিক ও বৈষ্ণব দার্শনিকগণ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকেই অখণ্ড, অসীম ব্রহ্মের খণ্ড খণ্ড, সসীম প্রতিচ্ছবি বলে মনে করেন। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম, ইস্‌লাম্ ও শিখ ধর্মীয় গুরুগণ বিশ্বশান্তি, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে প্রেম, প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি মানবিক আদর্শের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। খ্রীষ্টধর্মে বলা হয়েছে যে, সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। রেনেসাঁস্ (Renaissance) যুগে মানবতাবাদ (Humanism) এবং খৃস্টীয় বিশ্বজনীনতার (Christian Cosmopolitanism) আদর্শ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হল।

বিশ্বজনীনতা : হিতোপদেশ, ধর্মীয় অনুশাসন

রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে সাম্রাজ্যের বাইরের অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও সে অঞ্চলগুলির সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনার জন্য রোমান আন্তঃ-আঞ্চলিক আইন (Jus gentium) রচিত হল। কালক্রমে এই আইনগুলিই ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক আইনের (International law) রূপ নিল। সপ্তদশ শতাব্দীর ওলন্দাজ আইনবিদ্ হুগো গ্রোটিয়াস্ (Hugo Grotius) এই আইনগুলিকে আন্তর্জাতিক সমাজে প্রযোজ্য নিয়মের অনুশাসন (International Rule of Law) রূপে বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। সেজন্য তাঁকে "আন্তর্জাতিক আইনের জনক" ("Father of International Law") আখ্যা দেওয়া হয়।

রোমান সাম্রাজ্যবাদ ; হুগো গ্রোটিয়াসের আন্তর্জাতিকতা

সাংগঠনিক দিক থেকেও যুদ্ধবিরোধী ও বিশ্বশান্তিবর্ধক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য ভাবনাচিন্তার আরেকটি ধারা ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। চতুর্দশ শতাব্দীতে পিয়ের দুবোয়া (Pierre Dubois) শান্তিপূর্ণভাবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সালিশীর জন্য একটি আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। তৎকালীন ফরাসী সম্রাট্ চতুর্থ হেনরী ইউরোপের ১৫ টি রাষ্ট্রকে নিয়ে একটি সাধারণ সমবায় সংগঠন স্থাপনের কথা বলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক আবে সাঁ পিয়ের (Abbe Saint-Pierre) এবং মানবতাবাদী জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল্ কান্ট্ (Immanuel Kant) যুদ্ধবিরোধী মতামত প্রচারের ও বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কান্ট্ "চিরস্থায়ী শান্তি" ("Perpetual Peace") নামক তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকায় এই উদ্দেশ্যে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ধাঁচে একটি রাষ্ট্রসংঘ (United States of Europe) গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন।

বিশ্বমৈত্রীর প্রকল্প : পিয়ের দুবোয়া, সাঁ পিয়ের, কান্ট্

ফরাসী সম্রাট্ নাপোলিয়ঁর (নেপোলিয়ানের) পতনের পর ১৮১৫ সালে ভিয়েনার মহাসভায় (Congress of Vienna) ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নেতাগণ একটি রাষ্ট্রসমবায় (Concert of Europe) স্থাপন করেন। এই প্রথম বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতাগণ পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ্য

কূটনীতির (Open Diplomacy বা Conference Diplomacy) সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিরোধগুলি মীমাংসার চেষ্টা করতে থাকেন। সন্ধিনীতিকেও (Alliance) বিশ্বযুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের ও যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করার জন্য গ্রহণ করা হল। কিন্তু সন্ধিনীতির বদলে বিভিন্ন রাষ্ট্রগোষ্ঠীর জোটবদ্ধতা বা আঁতাত্ (Entente) নীতিই শেষে প্রবল হয়ে দেখা দিল। এ ধরনের স্বার্থসংঘাতের ফলেই শেষে কনসার্ট্ নামক রাষ্ট্র সমবায়নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হতে পারল না।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমবায় (১৮১৫)

কিন্তু কনসার্ট্-নীতি সম্পূর্ণ কার্যকর না হলেও আন্তর্জাতিক সমাজে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের সম্ভাবনা ম্লান হল না। ১৮৯৯ এবং ১৯০৭ সালে হল্যাণ্ডের রাজধানী হেগ্ শহরে দুটি সম্মেলন (Hague Conventions of 1899 and 1907) অনুষ্ঠিত হয়। স্থল, নৌ ও বিমান যুদ্ধের ক্ষেত্রে নানাপ্রকার নিয়ন্ত্রণ, শান্তির সময়ে ও যুদ্ধকালে নাগরিকের অধিকাররক্ষা, শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যার সালিশী, নিরস্ত্রীকরণ, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি আন্তর্জাতিক আদালত স্থাপন ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই সম্মেলন দুটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফলে আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে।

সমবায়নীতির ব্যর্থতা ঃ হেগ্ সভার প্রচেষ্টা (১৮৯৯,১৯০৭)

কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিসাম্য নীতির (Balance of Power) পুরাতন ঐতিহ্যের প্রাধান্য বজায় রইল। এই নীতির মূল কথা হল এই যে, বৃহৎ শক্তিগুলি এমনভাবে তাদের জোট সংরক্ষিত করে রাখতে চেষ্টা করে, যার ফলে অন্য কোন শক্তি অধিকতর ক্ষমতাবান না হয়ে ওঠে। দরকার হলে অন্য শক্তিগুলি (অর্থাৎ রাষ্ট্রগুলি) এমনভাবে নিজেদের সঙ্গে ঐ উদীয়মান রাষ্ট্রের লড়াই লাগিয়ে দেবে, যেন সে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় এবং সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়।

শক্তিসাম্য রক্ষা নীতির দাপট

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নাপোলিয়ঁ ইউরোপে ক্ষমতার পিরামিড্ রচনার চেষ্টা করেন এবং নিজেকে পিরামিডের শীর্ষে রাখার জন্য প্রয়াসী হন। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে ফরাসীদেশের এই অভ্যুদয় ইউরোপের তৎকালীন রাজতন্ত্রী দেশগুলির নেতাদের ভীত করে তুলেছিল। তাঁরা নিজেদের ক্ষমতালিপ্সা ও স্বাধিকার অপরিবর্তিত রাখতে ব্যাকুল হন ও নিজেরা মিলিতভাবে নাপোলিয়ঁর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। নাপোলিয়ঁর পরাজয়ের পর যখন তাঁরা বিভিন্ন দেশে স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা রক্ষার নামে ইউরোপের মানচিত্র নতুন করে তৈরী করলেন, তাতে আসলে নিজেদের ক্ষমতা ও রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা (status quo ante) বজায় রাখার ব্যবস্থা পাকা করলেন। ইউরোপের রাজনীতিতে এর পর থেকে প্রধান শক্তি হয়ে উঠল অস্ট্রিয়াই। অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মেটেরনিশ্ (Metternich) এমনভাবে বিশ্বসাম্য রক্ষার

মেটেরনিশ্ নীতির উদ্ভব ; মেটেরনিশের পতন হলেও শক্তিসাম্য রক্ষা নীতি অব্যাহত

নীতি প্রয়োগ করতে লাগলেন যে শেষে তাঁরও পতন হল। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী জনগণ ক্রমশঃ স্বৈরাচারীরাজতন্ত্র থেকে যেমন নিজেদের মুক্ত করে নেবার চেষ্টা সুরু করল, তেমনি চেষ্টা করতে লাগল বিদেশী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থেকে নিজেদের স্বাধীন করে রাখতে। ফলে ইতালী, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশের জনগণ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একত্রিত ও সংগঠিত হয়ে উঠল এবং অবশেষে অস্ট্রিয়ার বিক্ষুব্ধ অধিবাসীদের চাপে মেটেরনিশের একাধিপত্য ও যথেচ্ছাচারের অবসান ঘটল।

বিসমার্কের (Bismarck) নেতৃত্বে অস্ট্রিয়ার পরিবর্তে নবীন প্রুশিয়ার অধীনে জার্মানীর উত্থান আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। তিনি নানাপ্রকার আভ্যন্তরীণ নীতি গ্রহণ করে একদিকে যেমন স্বরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দেশকে উন্নত ও শক্তিশালী করে তোলেন, তেমনি পুরাতন শক্তিসাম্য রক্ষার নীতিকে সার্থকভাবে পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রয়োগ করতে লাগলেন। মেটেরনিশের বদলে এল বিসমার্কের নেতৃত্ব, দুজনেরই মূল নীতি একই।

বিসমার্কের সমর্থন

ইউরোপের ছোটখাটো দেশগুলি এদিকে ক্রমেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। তাদের জাতীয়তাবোধও ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। তৎকালীন তুর্কী সাম্রাজ্যে বহু জাতির বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক বাস করতেন। এখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জনগণ নানারকম অসুবিধা ভোগ করতেন। এই জাতীয়তার প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে (First World War) অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জার্মানী ও তার মিত্রশক্তিবর্গের পরাজয় ঘটল, তুর্কীসাম্রাজ্যেরও পতন হল।

জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভ ঃ তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন ; ১ম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি

॥ জাতিপুঞ্জ বা লীগ্ অফ নেশন্স্ ॥

১৯১৯ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর পৃথিবীতে শান্তির বুনিয়াদ চিরস্থায়ী করার জন্য তৎকালীন বৃহৎ শক্তিবর্গ জাতিপুঞ্জ বা লীগ্ অফ নেশন্স (League of Nations) স্থাপন করেন। সে সময় বহু সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচার মেনে নিয়ে অসন্তুষ্ট ভাবে জীবনযাপন করতে হত। জাতিপুঞ্জ বা লীগ্ এই জাতীয় অসন্তোষ দূর করার জন্য উড্রো উইলসনের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নেয়। ফলে, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি কতকগুলি সম্পূর্ণ নতুন রাষ্ট্র ইউরোপে গঠিত হল। তাই একজাতির সঙ্গে অপর জাতির সংঘর্ষের ক্ষেত্র অনেকটা সংকীর্ণ হয়ে গেল। ভবিষ্যতে যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করার জন্য লীগের সনদের (League Covenant) ১০ থেকে ১৭ ধারায় কতকগুলি প্রস্তাব নেওয়া হয়। সনদের ১০ ধারা অনুযায়ী লীগের সদস্যবৃন্দ পরস্পরের ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। সনদের ১৫ ধারা অনুযায়ী লীগের সদস্য-

১ম মহাযুদ্ধের পর লীগ্ অফ নেশন্স্ স্থাপন ঃ লীগ্ সনদের ব্যাখ্যা

রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন বিরোধ বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তের জন্য বা অপর কোনও রাষ্ট্রের সালিশীর জন্য (Judicial Settlement বা Arbitration) উপস্থাপিত না হলে সেই বিষয়টি লীগ্ সমিতির (League Council) দ্বারা মীমাংসার জন্য রেখে দেওয়া হত। সমিতি ইচ্ছা করলে নির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থার দ্বারা এই বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করতেন। কোন রাষ্ট্র এই ব্যবস্থা মেনে না নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে ১৬ ধারা অনুয়ায়ী লীগ্ সমিতি প্রয়োজন বোধ করলে সেই অবাধ্য আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নানারকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত। যেমন—লীগ্ ঐ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্য রাষ্ট্রদের দিয়ে সামরিক ও অর্থনৈতিক শাস্তি (military and economic sanctions) গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারত। অর্থনৈতিক শাস্তির ফলে ঐ দেশের আমদানি-রপ্তানি বিঘ্নিত হলে হয়ত ঐ অবাধ্য রাষ্ট্রটি লীগের নির্দেশ মানতে বাধ্য হত।

কিন্তু লীগের এই শান্তিপ্রচেষ্টা কার্যক্ষেত্রে সফল হয় নি। এর প্রধান কারণ হল এই যে, যুদ্ধবিরোধী কোনও ব্যবস্থা আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিতে গেলে লীগ্ কাউন্সিলের বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রত্যেক রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হতে হত। উপরন্তু লীগ্ সভায় বা (League Assembly) এই যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাবের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা আবশ্যক ছিল। ১৯৩১ সালে জাপান বলপূর্বক মাঞ্চুরিয়া (বর্তমান কোরিয়া) দখল করে। তখন জাপান ছিল বৃহৎ পঞ্চশক্তির অন্যতম। কাজেই, জাপানের নিজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লীগের সদস্যদের জাপানের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিপ্রস্তাব গ্রহণের জন্য জাপান সম্মত হয় নি।

লীগের ব্যর্থতার কারণ : বৃহৎ পঞ্চশক্তির ঐক্যমতের অভাব

প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পর জার্মানী শোচনীয় অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। নিজের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিজেতাদের কাছে প্রচুর টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। ফলে, পরাজিত রাষ্ট্রের হতভাগ্য নাগরিক হিসাবে জার্মানদের অন্য বিদেশী রাষ্ট্রগুলির কাছে নীত স্বীকার করতে হয়। হতাশ এবং বিক্ষুব্ধ জার্মানদের এই অপমানের, এই গ্লানির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যুদ্ধবিজয়ী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিশোধ নেবার জন্য হিট্লার খুব উৎসাহ দেন। ফলে, হিট্লারী একনায়কতন্ত্র গড়ে ওঠে। জার্মানী একে একে ভার্সাই সন্ধির (Treaty of Versailles) শর্তগুলি অমান্য করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ পটভূমিকা তৈরী করে দিল। একে একে সে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ অধিকার করল। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (Second World War) বিশ্ববাসীকে এক চরম অশান্তি ও অস্থিরতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করে রেখেছিল। ১৯৪৫ সালে পট্স্ডাম্ চুক্তির (Potsdam Treaty) এবং পরাজিত জার্মানীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হল। জার্মানীর মিত্রশক্তি জাপান কিছুদিন পরে আত্মসমর্পণ করল।

যুদ্ধোত্তর পরাজিত জার্মানীর অর্থনৈতিক সংকট : হিট্লারের অভ্যুত্থান ; ২য় মহাযুদ্ধে তাঁর পরাজয়

হিট্‌লারের পরাজয় সূচিত হলেও লীগের শোচনীয় ব্যর্থতাও লক্ষণীয়। কারণ, বিস্‌মার্কের নেতৃত্বে রচিত ও রূপায়িত শক্তিসাম্য রক্ষার নীতি লীগের পরাজয়ের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল। হিট্‌লারের নেতৃত্বে জার্মানী পুরানো শক্তিসাম্য রক্ষার নীতি আবার কার্যকর করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল। আবার বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হল। হিট্‌লারের শোচনীয় পরাজয়ের ফলে আবার শক্তিসাম্য রক্ষার নীতি ব্যর্থ হল।

শক্তিসাম্যরক্ষা নীতি ব্যর্থ

লীগ্ ব্যর্থ হলেও এ ব্যর্থতা আন্তর্জাতিক শান্তি সংরক্ষণের জন্য এবং যুদ্ধবিরোধী একটি নতুন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলকে সজাগ করে তুলল। লীগের ব্যর্থতা রাষ্ট্রগুলির নেতাদের অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছিল। প্রথমতঃ, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে লীগের মত দৃঢ় আন্তর্জাতিক শান্তিসংস্থাও বিশ্বশান্তি স্থায়ী রাখার জন্য ও হিংসাত্মক আক্রমণ রোধ করার ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। যতদিন পৃথিবীতে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সহযোগিতা ও হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত না হয়, ততদিন রাষ্ট্রগুলি পরস্পরকে হিংসা করবে ও একে অন্যের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে চেষ্টা করবে। শক্তিসাম্য রক্ষার নীতি শান্তি বজায় রাখে ঠিকই, কিন্তু সেটা কিছুদিন পর্যন্ত! এর শেষ পরিণতি হল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

লীগের ব্যর্থতার পর নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের তোড়জোড় ঃ লীগের আমলের মূল্যবান অভিজ্ঞতা
(১) সার্বিক নিরাপত্তা চাই

দ্বিতীয়তঃ, লীগ্ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলিকে গুপ্ত কূটনীতির (Secret Diplomacy) সর্পিল, জটিল পথ পরিত্যাগ করে প্রকাশ্য কূটনীতির (Open Diplomacy) সহজ, সরল, আলোকিত পথে পরিভ্রমণ করতে বাধ্য করল। চায়ের টেবিলে কিংবা ভোজসভার আসরে অথবা জলসাঘরে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির নিষ্পত্তি আর হত না রাজারাণীর, সচিব-সেনাপতির খেয়ালখুশী অনুযায়ী। স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি এখন থেকে রাষ্ট্রের আইনসভার প্রকাশ্য অধিবেশনে আলোচিত হতে লাগল। বলা বাহুল্য, এ সমস্তই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংবাদপত্র ও বেতারের মাধ্যমে বিঘোষিত হতে লাগল। জাতীয় পটভূমিকা আন্তর্জাতিক পাদপ্রদীপের আলোয় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। জাতির সঙ্গে জাতির ভাবগত, সংস্কৃতিগত, কৃষ্টিগত ঐক্য রাষ্ট্রিক ঐক্যের ক্ষুদ্রতর পরিসরকে ছাড়িয়ে গেল।

(২) প্রকাশ্য কূটনীতি

তৃতীয়তঃ, লীগের অন্যতম প্রধান কীর্তি—আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে একাধিক উপায় খুঁজে বের করা ও সেজন্য প্রয়োজনমত একাধিক বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। যেমন, আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, তাদের পারস্পরিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে শ্রমিকরূপে নিজেদের সাধারণ স্বার্থ ও সত্তা রক্ষার জন্য লীগ্ ১৯১৯ সালে সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভা (Geneva) শহরে আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংস্থা (International Labour Organisation বা সংক্ষেপে I. L. O.) গড়ে তুলল। এই প্রতিষ্ঠান আজও

পৃথিবীর শ্রমিকদের স্বার্থসংরক্ষণের একটি বড় সংস্থারূপে সক্রিয় রয়েছে। অনুরূপভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রায়ই নানা বিষয়ে বিবাদ-বিরোধ দেখা দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হলে এই বিবাদ-বিরোধ যদি আন্তর্জাতিক আইনের (International Law) সুসমঞ্জস ও সার্থক প্রয়োগে মেটানো না যায়, তবে শেষ পর্যন্ত সেই বিবাদ হিংসাত্মক মহাসমরে পর্যবসিত হয়, অনর্থক শান্তি ব্যাহত হয়, জনজীবন ও ধনসম্পত্তির বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই চরমাবস্থা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে লীগ্ হল্যান্ডের "দি হেগ্" (The Hague) শহরে আন্তর্জাতিক বিচারালয় (Permanent Court of International Justice বা সংক্ষেপে (World Court) স্থাপন করল। এই বিচারালয়ের মারফত লীগের আমলে বহু গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সম্ভব হয়েছে। আজও এই প্রতিষ্ঠান নিজের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য কাজ করে চলেছে।

(৩) ব্যাপক শান্তিপ্রচেষ্টার জন্য অজস্র আন্তর্জাতিক সংস্থা চাই

সংক্ষেপে বলা চলে যে, লীগের সনদের আইনগত ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য ত' বটেই, তা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা ও ঈর্ষা লীগের শান্তি-প্রকল্প সফল করে তুলতে দেয় নি। শক্তিসাম্য রক্ষার নীতি এর জন্য মূলতঃ দায়ী। লীগ্ দ্বিতীয় মহাসমর ঠেকাতে পারে নি। কিন্তু এই বেদনা ও ব্যর্থতার ইতিহাসের সঙ্গে কিছু মূল্যবান অভিজ্ঞতাও লীগ্ রেখে গেল, কিছু সাফল্যের নজির হাজির করল। যেমন—আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার পেছনে বৃহৎ শক্তিবর্গের অপচেষ্টা সম্বন্ধে মূল্যবান অভিজ্ঞতা ; যেমন, যুদ্ধবিরোধী নেতিবাচক (negative) শান্তিপ্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শ্রমিক প্রভৃতি জনগণকে শ্রেণীগতভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রকৃত শ্রমিকদরদী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা। লীগের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল যে, সে পৃথিবীর মানুষদের এক সুবৃহৎ বিশ্বসভ্যতার অত্যাশ্চর্য আধুনিক অগ্রগতির শরীকরূপে এক অখণ্ড বিশ্বমানবজাতির বংশধর মনে করে নিজেদের অসাধারণ গৌরবসম্পর্কে গর্বিত হতে শিখিয়েছে। এক জায়গার কুটনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর অন্য গোলার্ধের ব্যক্তিদের আজ ভাবিয়ে তুলছে। এক দেশের বিপদ-আপদে অন্য দেশের ব্যক্তিগণ সহানুভূতি, সাহায্য ও সম্প্রীতির ভাণ্ডার খুলে দিতে এগিয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক রেড্ ক্রসের (International Red Cross) মত বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান তার মানবিক, কল্যাণকর কার্যাবলী সার্থক করে তোলার জন্য অধিকতর সুযোগ লাভ করতে পারছে। পৃথিবীর এক দেশের রাজনীতির ওপর অন্য দেশের অর্থনীতির, এক দেশের কুটনীতির ওপর অন্য দেশের নীতির প্রভাব পড়ছে। পৃথিবীর এক দেশ অন্যের খুব কাছাকাছি এসে পড়ছে। আন্তর্জাতিকতা অনেকটা অগ্রগামী হতে পেরেছে।

(৩) শুধু যুদ্ধবিরোধী নয়, সর্বাত্মক শান্তিস্থাপনের মত নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা চাই

॥ চার স্বাধিকার, আট্‌লান্টিক সনদ : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপনের প্রস্তুতিপর্ব ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময়েই ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত রাশিয়া ও চীন এই ৫টি মিত্রপক্ষীয় দেশের (Allied Powers বা Allies) নেতৃবৃন্দ লীগের পরবর্তী অধিকতর সফল ও সক্রিয় নতুন একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা ভাবছিলেন। তাঁরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে প্রথম মহাযুদ্ধের মতই গণতন্ত্র বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম ("to make the world safe for Democracy") বলে বর্ণনা করেন। স্বৈরাচারতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ ভবিষ্যতে পৃথিবীর বুক থেকে দূর করার জন্য তাঁরা একমত হলেন। রুশ নেতাগণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় সংগ্রামকে "গণযুদ্ধ" বা "People's War" বলে অভিহিত করেন।

২য় বিশ্বযুদ্ধ গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধ

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় এক ভাষণ (Message) পাঠিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট (Franklin Roosevelt) তাঁর সুবিখ্যাত "চার স্বাধিকারের" (Four Freedoms) সনদ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় বাক্-স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মানুশীলনের স্বাধীনতা, অভাবমুক্ত থাকার অধিকার পৃথিবীর সব দেশের, সব বর্ণের, সব ধর্মের নারী-পুরুষকে প্রদানের জন্য যথোপযুক্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রস্তুত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

চার স্বাধিকার ঘোষণা (১৯৪১)

"চার স্বাধিকারের" ঘোষণার প্রধান ভূমিকা এখানেই সীমাবদ্ধ রইল না। এই ঘোষণাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য ১৯৪১ সালের জুন মাসে লণ্ডনের সেণ্ট জেমস প্রাসাদে ইংলণ্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আরও কয়েকটি মিত্রপক্ষীয় দেশের প্রতিনিধিগণ মিলিত হন। ফলে, লণ্ডনের ঘোষণা (Declaration of London) প্রচারিত হয়। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, ভবিষ্যতে নতুন যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হবে, তার ভিত্তি স্থাপিত হবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ব্যক্তিদের আন্তরিক সহযোগিতার ওপর। এজন্য পৃথিবীর উপনিবেশগুলিকে যথাসম্ভব স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে হবে এবং বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলিকে সামাজিক অধিকার লাভের ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে দিতে হবে। ঐ বৎসর রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এবং ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চার্চিল (Churchill) বিখ্যাত আট্‌লাণ্টিক চুক্তিতে Atlantic Charter) স্বাক্ষর দেন। এই চুক্তিতে তাঁরা দুই দেশের পক্ষ থেকে কতকগুলি প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন। এ দুটি দেশ কোনরকম সাম্রাজ্যলিপ্সায় লুব্ধ হবে না, সমস্ত দেশের সীমারেখা সেই দেশগুলির অধিবাসীদের ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ধারিত হতে দেবে। প্রত্যেক দেশের জনগণ সেই দেশের যে শাসনব্যবস্থা পছন্দ

ঔপনিবেশিকতার অবলুপ্তি কামনা : আট্‌লাণ্টিক সনদ

করবেন, তাতে বাধা দেওয়া হবে না। ছোটবড় নির্বিশেষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জগতের নানাপ্রকার সম্পদের ভাণ্ডার ব্যবহার করবার জন্য সমানভাবে অধিকারী হবে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। হিট্‌লারী জার্মানীর পরাজয়ের পর এমনভাবে বিশ্বশান্তি সংরক্ষণের প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে যে, পৃথিবীর সব দেশের লোকেরাই "চার স্বাধিকার" সমানভাবে ভোগ করতে পারেন। আট্‌লাণ্টিক্‌ সনদে ঘোষণা করা হয় যে, ভবিষ্যতে নতুন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ববাসীরা সকলেই বল-প্রয়োগের নীতি পরিত্যাগ করবেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে তাঁদের বিবাদ-বিরোধের নিষ্পত্তি করতে পারবেন।

১৯৪২ সালে ২৬টি দেশের প্রতিনিধিগণ সমবেত হয়ে আট্‌লান্টিক্‌ চুক্তির ধারাগুলি মেনে নেন। ১৯৪৩ সালে মস্কোর ঘোষণায় (Declaration of Moscow, 1943) ইংলণ্ড্‌, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত রাশিয়া এবং জাতীয়তাবাদী চীনা সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রিগণ মিলিত হয়ে ঘোষণা করেন যে, ভবিষ্যতে এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হবে যেখানে পৃথিবীর সব শান্তিকামী, সার্বভৌম রাষ্ট্র সাম্যের ভিত্তিতে মিলিত হবে এবং বলপ্রয়োগের বদলে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের সমস্যার সমাধান করবে।

মস্কো ঘোষণা (১৯৪৩); ডাম্‌বার্টন্‌ ওক্‌স্‌ ঘোষণা (১৯৪৪); ২৪ শে অক্টোবর, ১৯৪৫ : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্মদিন

বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ ছোটবড় নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্রের কাছেই উন্মুক্ত থাকবে। ১৯৪৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হট্‌ স্প্রিংস্‌ (Hot Springs) এবং আট্‌লাণ্টিক্‌ সিটি (Atlantic City) শহরদুটিতে দুটি মহাসভায় নতুন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটির কাঠামো স্থির করা হয়। ১৯৪৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন্‌উড্‌স্‌ (Bretton-Woods) শহরে একটি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক্‌ স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ঐ বৎসরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাম্‌বার্ট্‌ন্‌ ওক্‌স্‌ (Dumbarton Oaks) নামক স্থানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা ইউ. এন. ও-র (United Nations Organisation বা সংক্ষেপে U. N.) সনদ গৃহীত হয়। সর্বশেষে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো (San Francisco) শহরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। **১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্মলগ্ন থেকেই** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিউ ইয়র্ক্‌ (New York) শহরে তার সদর দপ্তর স্থাপন করে সনদ অনুযায়ী কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছে। এজন্য **২৪শে অক্টোবর তারিখটি বিশেষভাবে স্মরণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ**। নিকোলাসের (H. G. Nicholas) কথায় বলা যায়—লীগ্‌ প্রতিষ্ঠার ছাব্বিশ বছর পরে বিশ্ববাসীগণ নতুনভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পরীক্ষানিরীক্ষার প্রচেষ্টা আরম্ভ করল।

॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড ॥

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাবনায় (Preamble) ঘোষণা করা হয়েছে যে, "যে ভয়াবহ মহাসমর এ পর্যন্ত দুবার মানবসমাজের অশেষ ক্ষতিসাধন করেছে, তার কবল থেকে বিশ্ববাসীদের, তাদের বংশধরদের ও মানবসভ্যতাকে রক্ষার জন্য, মৌলিক মানবিক অধিকারের ওপর পুনরায় আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য, মানুষের প্রতি মানমর্যাদা রক্ষার জন্য, নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে এবং পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রের সমান অধিকর বলবৎ করার জন্য চুক্তি, সনদ প্রভৃতির শর্তগুলি ন্যায়-বিচারের ভিত্তিতে পালন করার জন্য, আন্তর্জাতিক আইনের অন্যান্য উৎসগুলি সমৃদ্ধ করার জন্য, সামাজিক উন্নতির জন্য, জনজীবনের মান আরও উন্নত করার জন্য, আমরা (অর্থাৎ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির জনগণ, WE THE PEOPLE OF THE UNITED NATIONS) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করছি।"

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ঃ তার সনদের প্রস্তাবনা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের (United Nations Charter) প্রথম এবং দ্বিতীয় ধারাতেও এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যগুলি আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথম ধারায় বলা হয়েছে যে, এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, সেজন্য পৃথিবীর কোন অঞ্চল থেকে শান্তির বিঘ্ন দূর করার জন্য সমষ্টিগতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া এবং কোনও কারণে শান্তি বিঘ্নিত হলে আন্তর্জাতিক আইন এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণভাবে ওই সমস্যাটির মীমাংসা করা। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করবে যাতে জনগণের সমানাধিকার এবং আত্মনির্ধারণের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং তার ফলে বিশ্বশান্তি আরও দৃঢ় হয়। তৃতীয়তঃ, এই প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করবে যাতে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক প্রশ্ন-জড়িত আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য যথোচিতভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে ওঠে। সেজন্য জাতি, ভাষা, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে পৃথিবীর বিভিন্ন ব্যক্তিগণ যাতে সমান মৌলিক অধিকার লাভ করতে পারেন তার জন্য এই প্রতিষ্ঠান সচেষ্ট হবে। চতুর্থতঃ, এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জাতির মধ্যে তাদের সকলের সাধারণ স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করবে।

প্রধান উদ্দেশ্য ঃ সামগ্রিক নিরাপত্তার দ্বারা বিশ্বশান্তি রক্ষা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ২ ধারায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিখ্যাত "সপ্তনীতির" কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রকে সমান বলে বিবেচনা করবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের অধিকারের সমতা স্বীকার করবে। দ্বিতীয়তঃ, এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র যাতে সনদের বিধিগুলি পালন করে চলে, তার ব্যবস্থা করা হবে। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র এমনভাবে তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসার চেষ্টা করবে যাতে বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তা ব্যাহত না হয়।

চতুর্থতঃ, প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র অঙ্গীকার করবে যে সে যেন কোনমতেই অন্য কোন সদস্য-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক অখণ্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করার জন্য শক্তি প্রয়োগ না করে। বলা হয়েছে যে, আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক এইভাবে কোন রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে বিঘ্নিত হলে তা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষিত উদ্দেশ্য-গুলির পরিপন্থী বলে বিবেচিত হবে। পঞ্চমতঃ, প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র পৃথিবীর কোথাও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে এবং এই ধরনের ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোনও সামগ্রিক প্রচেষ্টাকে (collective or preventive or enforcement action) বাধা দিতে পারবে না। ষষ্ঠতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রগুলি যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সর্বতোভাবে এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করে, তার জন্য তারা অঙ্গীকারবদ্ধ। সপ্তমতঃ, কোনও রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ কোনও ব্যাপারের এলাকায় (Domestic Jurisdiction) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোনভাবে হস্তক্ষেপ করবে না, যদি সেই বিষয়টি সনদের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোন-ভাবে বাধা সৃষ্টি না করে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ২ ধারায় ঘোষিত ৭ টি উদ্দেশ্য

॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান দপ্তর ॥

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এর দুটি দপ্তর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এদুটি হল **সাধারণ পরিষদ** (General Assembly) এবং **নিরাপত্তা পরিষদ** বা **স্বস্তি পরিষদ** (Security Council); অন্যতম প্রধান দপ্তরগুলি হল—অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC বা Economic and Social Council), অছি পরিষদ (Trusteeship Council), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice বা World Court) এবং মহাসচিব ও তাঁর মহাকরণ বা সেরেস্তা বা কর্মদপ্তর (U. N. Secretary-General and U. N. Secretariat)।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান দপ্তরগুলি

॥ সাধারণ পরিষদ ॥

সাধারণ পরিষদ (General Assembly) ঠিক যেন কোন রাষ্ট্রের আইনসভার (Legislature) মত, নিকোলাসের ভাষায় "আলোচনার আসর" ("talking shop")। আইনসভা যেমন দেশের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিতর্ক করে, প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং নির্বাহী বা কার্যনির্বাহক সভাকে (Executive) সেই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতে নির্দেশ দেয়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদও সেইভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। এই দিক দিয়ে কল্পনা করা যায় যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যদি হয় বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রের (World Federation) মত একটা প্রতিষ্ঠানের অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি, তাহলে সাধারণ পরিষদ হল এই রাষ্ট্রের আইনসভা।

সাধারণ পরিষদ যেন আইনসভা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে (U. N. Charter) ছোটবড়-নির্বিশেষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্রকে সমান বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রিক সাম্যের (Equality of States) নীতি সাধারণ পরিষদের গঠনের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদে প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের তাই সমান (অর্থাৎ একটি) ভোট থাকে। প্রতি বৎসর প্রথম অধিবেশনের শুরুতে একজন সভাপতি (President) এবং ১৭ জন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে নেওয়া হয়। সাধারণ পরিষদের নিয়মিত বৈঠক বসে বছরে একবার, সাধারণতঃ সেপ্টেম্বর মাসে। তবে পরিষদ ইচ্ছা প্রকাশ করলে একাধিক বিশেষ বৈঠকও আহ্বান করতে পারে।

সাধারণ পরিষদের সংগঠন
রাষ্ট্রিক সাম্যনীতি গ্রহণ

সাধারণ পরিষদের **সাতটি বিশেষ বিভাগ** আছে। যথা—(১) রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিভাগ (নিরস্ত্রীকরণের কাজও এর অন্তর্ভুক্ত), (২) অর্থনৈতিক ও হিসাব-নিকাশ বিভাগ, (৩) সামাজিক, মানবিক এবং সাংস্কৃতিক বিভাগ, (৪) অছি বিভাগ, (৫) প্রশাসনিক এবং ব্যয়বরাদ্দ-নির্ণায়ক বিভাগ, (৬) আইন বিভাগ এবং (৭) বিশেষ রাজনৈতিক বিভাগ।

৭টি বিভাগ

সাধারণ পরিষদে উপস্থিত ভোটদাতা সদস্য-রাষ্ট্রগুলির সংখ্যাধিক ভোটে (simple majority) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা সম্পর্কে স্বস্তি পরিষদের সুপারিশ, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্র নির্বাচন, নতুন সদস্য-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি বা কোন সদস্যরাষ্ট্রের বহিষ্করণ, ব্যয়বরাদ্দ (বা বাজেট) সম্পর্কিত প্রশ্ন ইত্যাদি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য-রাষ্ট্রের সমর্থন আবশ্যক।

ভোটদান পদ্ধতি

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ১০, ১১ এবং ১৩ ধারায় **সাধারণ পরিষদকে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে**। সেগুলিকে প্রধানতঃ সাতটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—প্রথমতঃ, আলোচনা বিষয়ক ; দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন ; তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তামূলক ; চতুর্থতঃ, তত্ত্বাবধানবিষয়ক ; পঞ্চমতঃ, অর্থনৈতিক ; ষষ্ঠতঃ, নির্বাচন বিষয়ক ; সপ্তমতঃ, সাংবিধানিক।

ক্ষমতা

প্রথমতঃ, সাধারণ পরিষদ কোন সদস্য-রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ছাড়া অন্য যে কোনও বিষয় নিয়ে **আলোচনা করার ক্ষমতার অধিকারী**। সদস্য-রাষ্ট্র নয় এমন রাষ্ট্রের বিষয়েও তার আলোচনার ক্ষমতা আছে। দরকারমত কোন বিষয়ে আলোচনার পর সাধারণ সভা স্বস্তি পরিষদে আলোচ্যমান বিষয় নিয়ে বা কোন জরুরী অবস্থা সৃষ্টির ফলে অবিলম্বে ব্যবস্থাগ্রহণের মত ক্ষেত্রে আলোচনা করতে পারে না। সুতরাং সনদের বিধান অনুসারে সাধারণ পরিষদের তুলনায় স্বস্তি পরিষদই বেশী ক্ষমতাবান্‌।

(১) আলোচনাবিষয়ক

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক **আইন প্রণয়নের ক্ষমতার** অধিকারী।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রসারের জন্য এবং মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত আন্তর্জাতিক আইনকানুন প্রণয়নের জন্য সাধারণ পরিষদ তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এইভাবে সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সালে আন্তর্জাতিক আইন কমিশন (International Law Commission) গঠন করে। কমিশনে আইনকানুনের খসড়া নিয়ে আলোচনা হয়। ১৯৮৪ সালে আন্তর্জাতিক সমুদ্রআইন (International Law of the Sea) কয়েক বছর ধরে সদস্যরাষ্ট্রদের মধ্যে সুদীর্ঘ আলোচনার পর লিপিবন্ধ হয়। বহু সদস্য-রাষ্ট্র এই আইনে স্বাক্ষর করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি না পাওয়ার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক আইন এখনও চালু হতে পারে নি। অবশ্য গণহত্যানিরোধ সম্পর্কিত বিধিপত্র (Convention on Genocide), উদ্বাস্তু সম্পর্কিত বিধিপত্র (Convention relating to the Status of Refugees) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাপত্র সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ নিজেরাই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিধিবন্ধ করেছেন।

(২) আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন-বিষয়ক

তৃতীয়তঃ, সাধারণ পরিষদের **রাজনৈতিক অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তামূলক ক্ষমতা** বলতে বোঝায় বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য যে-কোনও বিষয়ের প্রতি সে স্বস্তি পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ-রচয়িতাগণ (Fathers of the U. N. Charter) স্বস্তি পরিষদের হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন। স্বস্তি পরিষদে ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স্ ও চীন—এই বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রত্যেকে স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্র (Permanent Members) এবং এদের প্রত্যেকের হাতেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্য বাকী সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে 'ভেটো' (Veto) প্রয়োগ করার অর্থাৎ সিদ্ধান্তটি বাতিল করে দেবার ক্ষমতা আছে। ফলে, আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

(৩) রাজনৈতিক বা নিরাপত্তা-মূলক

১৯৫০ সালে সমাজতন্ত্রী উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে ধনতন্ত্রী দক্ষিণ কোরিয়ার যুদ্ধ চলার সময়ে স্বস্তি পরিষদ উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে সম্মিলিত ফৌজ পাঠিয়ে যুদ্ধের সত্বর অবসান ঘটাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সোবিয়েত প্রতিনিধি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে সমাজতন্ত্রী উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে সম্মিলিত ফৌজ পাঠানোর ব্যবস্থাকে দূর প্রাচ্যে সমাজতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রসারের বিরুদ্ধে মার্কিনী চক্রান্ত বলে প্রতিবাদ করেন এবং স্বস্তি পরিষদে এই প্রস্তাবগ্রহণের সময় অনুপস্থিত থাকেন। পরে সোবিয়েত সরকার ঘোষণা করেন যে, স্বস্তি পরিষদে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তাবগ্রহণের সময় বৃহৎ পঞ্চশক্তির এক শক্তিরূপে তাঁদের প্রতিনিধির অনুপস্থিত থাকার অর্থ হল তাঁদের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব

কোরিয়ার যুদ্ধের নজির

নাকচ (veto) করে দেওয়া। সুতরাং সোবিয়েত রাশিয়া দাবী করতে থাকে যে, উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে এ-অবস্থায় সামরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থার সমস্তটাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ধারাগুলি লঙ্ঘন করেছে এবং এই সিদ্ধান্ত ও ফৌজী ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বেআইনী।

এই নাটকীয় পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্র-সচিব ডীন্ অ্যাচিসন্ (Dean Acheson) প্রস্তাব করেন যে, কোনও দেশ আক্রান্ত হলে আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী যদি স্বস্তি পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রদের প্রেরিত সৈন্য নিয়ে কোনও সম্মিলিত ফৌজ পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু বৃহৎ পঞ্চশক্তির কোন একজনের অসম্মতি (veto) প্রকাশের ফলে যদি এই ব্যবস্থা কার্যকর করে তোলা না যায়, তা হলে সে ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ এরকম প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গ্রহণ করলে প্রস্তাবটি গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে। অ্যাচিসনের এই প্রস্তাব ১৯৫০ সালের ২রা নভেম্বর সাধারণ পরিষদে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটিকে "শান্তির জন্য সঙ্ঘবদ্ধতার প্রস্তাব" (Uniting for Peace Resolution) বলে। এই প্রস্তাব গৃহীত হবার ফলে এর পরবর্তী কাল থেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ রাজনৈতিক, অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তামূলক ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। অবশ্য সাধারণ পরিষদকে এর পর এ ধরনের কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় নি।

অ্যাচিসন্ প্রস্তাব ঃ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা লাভ

চতুর্থতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুসারে তার অসংখ্য শাখা দপ্তর আছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাকরণ বা কর্মদপ্তর বা সেরেস্তা ইত্যাদির হাতে সনদ অনুসারে নানা প্রকার বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া আছে। এদের প্রত্যেকের সচিবকে, এমন-কি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিবকেও নিজ নিজ সংস্থার বার্ষিক কার্যবিবরণী (Annual Report) সাধারণ পরিষদকে পেশ করতে হয়। অবশ্য, প্রথাগতভাবে স্বস্তি পরিষদের বার্ষিক কার্যবিবরণীর ওপর সাধারণ পরিষদে কোন তর্কবিতর্ক হয় না। বলা যায় যে, সাধারণ পরিষদের এই ক্ষমতাই হল **তত্ত্বাবধানবিষয়ক ক্ষমতা** এবং এই ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের প্রকৃত ক্ষমতার অন্যতম।

(৪) তত্ত্বাবধানবিষয়ক

পঞ্চমতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থভাণ্ডারের ওপর কেবল সাধারণ পরিষদেরই কর্তৃত্ব থাকে। একেই এই পরিষদের **অর্থনৈতিক ক্ষমতা** বলে। প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের দেয় চাঁদার পরিমাণ, চাঁদা বাকী পড়লে সেই সদস্য-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিতে হবে, তা সাধারণ পরিষদই স্থির করে। সাধারণ পরিষদের এটিও একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা।

(৫) অর্থনৈতিক

ষষ্ঠতঃ, সাধারণ পরিষদের **নির্বাচনবিষয়ক ক্ষমতাও** গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষমতা অনুসারে সাধারণ পরিষদ কতকগুলি পদে এককভাবে, আবার অন্য কতকগুলি পদে

স্বস্তি পরিষদের সহযোগিতায় পদাধিকারীদের নির্বাচন করে থাকে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ও অছি পরিষদের সভ্যদের এবং স্বস্তি পরিষদের অস্থায়ী সভ্যদের সাধারণ পরিষদ এককভাবে নির্বাচন করে। স্বস্তি পরিষদের সঙ্গে সহযোগিতায় সাধারণ পরিষদ যে পদগুলির অধিকারীদের নির্বাচন করে, সেগুলির মধ্যে পড়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিবের পদ ও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিদের পদগুলি।

(৬) নির্বাচনবিষয়ক

সপ্তমতঃ, সাধারণ পরিষদের **সাংবিধানিক ক্ষমতা** বলতে বোঝায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের সংশোধন সংক্রান্ত ক্ষমতা। সনদ অনুযায়ী স্বস্তি পরিষদের ৫ জন স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রসহ অন্ততঃ ৯ জন সদস্য-রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে এবং সাধারণ পরিষদের উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য-রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করলে সনদ সংশোধন করা যায়।

(৭) সাংবিধানিক

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের **সাধারণ পরিষদের কার্যাবলীর মূল্যায়ন** করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ শুমান (Schuman) বলেছেন যে, এই প্রতিষ্ঠান অন্য যে-কোনও কূটনীতিবিদদের সভার চেয়ে বেশী গুরুত্বসম্পন্ন বিধানসভা নয় ("The Assembly is no more a legislative body than any other conference of diplomats")। কিন্তু শুমানের সমালোচনার উত্তরে কয়েকটি যুক্তির সাহায্যে সাধারণ পরিষদের ক্ষমতাবলীর পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, সাধারণ পরিষদের হাতে অনেক ক্ষমতা আছে।

সাধারণ পরিষদের কার্যাবলীর মূল্যায়ন ঃ (১) এটি শুধু বিতর্কসভা (শুমান) ; এর জবাব (হামব্রো ও গুড্রিচ্)

প্রথমতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের প্রখ্যাত ভাষ্যকার হামব্রো (Hambro) এবং গুড্রিচ্ (Goodrich) বলেন যে, আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে নিবর্তনমূলক বা বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সাধারণ পরিষদের ভূমিকা ফলপ্রদ।

দ্বিতীয়তঃ, বলা হয় যে, সাধারণ পরিষদ যেন "বিশ্ববিবেকের কণ্ঠস্বর"। অর্থাৎ, সাধারণ পরিষদের বিতর্কগুলি প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে বিশ্বজনমত গঠনে সাহায্য করে। সকল রাষ্ট্রই বিশ্বজনমতকে মান্য করে চলে। নিকোলাস্ সাধারণ পরিষদের এই প্রচারধর্মী কার্যকলাপকে তাই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।

(২) "বিশ্ববিবেকের কণ্ঠস্বর" এখানে ধ্বনিত

তৃতীয়তঃ, ১৯৫০ সালে গৃহীত "অ্যাচিসন্ প্রস্তাব" বা শান্তির জন্য সংঘবদ্ধতার প্রস্তাব" স্বস্তি পরিষদে "ভেটো" প্রয়োগের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য সাধারণ পরিষদকে ব্যবস্থা নেবার ক্ষমতা প্রদান করেছে ফলে সাধারণ পরিষদ বেশ ক্ষমতাবান্ হয়েছে। অবশ্য সাধারণ পরিষদের পক্ষে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করার মত অনুরূপ পটভূমিকা আর দেখা দেয় নি।

(৩ অ্যাচিস্‌ন প্রস্তাব (১৯৫০) এর ক্ষমতা বাড়িয়েছে

চতুর্থতঃ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু দেশ ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এই "আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠী" (Afro-Asian Bloc) সাধারণ পরিষদে শীঘ্রই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে চলেছে। বহু ক্ষেত্রে অতীতে এই গোষ্ঠীর রাষ্ট্রগুলি সাধারণ পরিষদে প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তারা তৃতীয় বিশ্বের (Third World) সদস্য হিসাবে ভারতের নেতৃত্বে জোট-নিরপেক্ষতার আন্দোলনকে জোরদার করে তুলবে। সাধারণ পরিষদেও তার প্রগতিশীলতার প্রভাব নিশ্চয়ই পড়বে।

আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠীর প্রভাবে সুগঠিত

॥ স্বস্তি পরিষদ বা নিরাপত্তা পরিষদ ॥

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে যদি বিশ্বযুক্তরাষ্ট্র রূপে কল্পনা করা যায়, তা হলে নিরাপত্তা পরিষদ বা স্বস্তি পরিষদকে (Security Council) এর প্রধান নির্বাহী বিভাগ বা কার্যনির্বাহক বিভাগ বলে গণ্য করা যেতে পারে। সাধারণতঃ রাষ্ট্রের পরিচালক সরকারের অংশরূপে আইনসভা নিয়মকানুন প্রস্তুত করে এবং নির্বাহীবিভাগরূপে মন্ত্রিপরিষদ ও আমলাতন্ত্র এই নিয়মকানুন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনা করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্ষেত্রেও তাই। সাধারণ পরিষদ বিতর্ক, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য কতকগুলি নীতি গ্রহণ করে। স্বস্তি পরিষদ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সাধারণ পরিষদের দ্বারা গৃহীত ঐ নীতি ও প্রস্তাবগুলি বাস্তবে রূপায়িত করে।

স্বস্তি পরিষদ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল সনদে স্বস্তি পরিষদের গঠনের একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ ছিল। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী এই পরিষদের সদস্য-সংখ্যা ছিল এগারো। তার মধ্যে ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স ও জাতীয়তাবাদী চীন বৃহৎ পঞ্চশক্তি (Big Five) রূপে স্বস্তি পরিষদের স্থায়ী সদস্য। স্বস্তি পরিষদ কোনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে গেলে এই বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রত্যেকের সম্মতি থাকা প্রয়োজন। তা না হলে এই পঞ্চশক্তির যে-কেউ ইচ্ছা করলে "ভেটো" (Veto) প্রয়োগ করে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগ্রহণ বানচাল করে দিতে পারে। বৃহৎ পঞ্চশক্তি ছাড়া স্বস্তি পরিষদের বাকী ৬ জন সদস্য-রাষ্ট্র থাকতেন অস্থায়ী সদস্যরূপে। এঁরা সাধারণ পরিষদের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির দ্বারা দু' বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন। এঁদের কোনও "ভেটো" ক্ষমতা ছিল না।

বৃহৎ পঞ্চরাষ্ট্রের "ভেটো" ক্ষমতা

১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী থেকে স্বস্তি পরিষদের গঠনবিধি কিছুটা পরিবর্তিত হয়। নতুন বিধান অনুযায়ী পূর্বের মতই বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রত্যেকে স্বস্তি পরিষদে স্থায়ী আসন লাভ করবেন। তাঁদের ভেটো ক্ষমতাও অক্ষুণ্ণ রইল। কিন্তু

আগেকার ৬ জন নির্বাচিত অস্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রের পরিবর্তে এর পর থেকে সদস্য-রাষ্ট্র থাকবেন ১০ জন। এই ১০ জনের মধ্যে ৫ জন হবেন আফ্রো-এশীয় দেশের প্রতিনিধি (৩জন আফ্রিকা থেকে, ২জন এশিয়া থেকে) ২ জন হবেন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির প্রতিনিধি, ১ জন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির প্রতিনিধি এবং ২ জন লাতিন (দক্ষিণ) আমেরিকার দেশগুলির প্রতিনিধি। আগের মতই এই ১০ জন অস্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্র দু' বছরের জন্য সাধারণ পরিষদের দ্বারা নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সোবিয়েত বিরোধিতার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে সমাজতন্ত্রী চীন ফরমোজার বা তাইপের জাতীয়তাবাদী চীনের স্থলে স্থায়ী সদস্য হয়েছে।

স্বস্তি পরিষদের সংগঠন

স্বস্তি পরিষদের সদস্য-রাষ্ট্ররূপে কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির সময়ে বিশ্বশান্তি সংরক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং স্বস্তি পরিষদে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ রাষ্ট্রের সদস্যপদপ্রাপ্তির যৌক্তিকতা নিয়ে চিন্তা করে দেখা হয়। স্বস্তি পরিষদে ছোট-বড়-নির্বিশেষে প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের ১ জন করে প্রতিনিধি থাকেন। সদস্য-রাষ্ট্রগুলির নামের ইংরাজী বর্ণমালার ক্রমানুসারে স্বস্তি পরিষদের সদস্যরাষ্ট্রগুলি প্রতি মাসে একজন করে সভাপতি (President) নির্বাচন করেন।

সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব, সভাপতি নির্বাচন

স্বস্তি পরিষদে প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের একটি ভোট। কার্যধারা সম্পর্কিত বিষয়ে (Procedural matters) সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় স্বস্তি পরিষদের মোট ১৫ জন সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে অন্ততঃ ৯ জনের সম্মতি আবশ্যক। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রদের ভেটোসাপেক্ষ নয়। কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে অর্থাৎ কার্যধারাবিষয়ক ক্ষেত্র বাদে অন্য ক্ষেত্রে, বা মৌলিক ক্ষেত্রে (Non-procedural or Substantive matters) সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ৫ জন স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রের ঐকমত্য (unanimity) এবং বাকী ৪ জন অস্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রের সহ-সম্মতি (concurrence) থাকা আবশ্যক।

ভোটদান পদ্ধতি

স্বস্তি-পরিষদের **ক্ষমতা ও কার্যাবলী** বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি হল, প্রথমতঃ, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষা; দ্বিতীয়তঃ, অছি বিষয়ক; তৃতীয়তঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিয়োগ-বিষয়ক; চতুর্থতঃ, নিবর্তনমূলক বা সবল ব্যবস্থার দ্বারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রের সদস্যপদ বাতিল; পঞ্চমতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ সংশোধন; ষষ্ঠতঃ, নিরস্ত্রীকরণবিষয়ক।

কার্যাবলী

প্রথমতঃ, কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের বিরোধ দেখা দিলে শান্তিপূর্ণভাবে তার মীমাংসার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে স্বস্তি পরিষদের ওপর। এজন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলাপ-আলোচনা (Negotiation), অনুসন্ধান

কমিশন্ (Commission of Inquiry), আপোস (Conciliation), মধ্যস্থতা (Mediation), সালিশী ও বিচার ব্যবস্থার দ্বারা মীমাংসা (Arbitration and Judicial Settlement) প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ পন্থার (Pacific Methods for Settlement of Disputes) এর উল্লেখ আছে।

(১) বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার সংরক্ষা : শান্তিপূর্ণভাবে অন্তঃরাষ্ট্র বিরোধের মীমাংসা না হলে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ

শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসিত না হলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত ধারাগুলি অনুসারে আগ্রাসী, অর্থাৎ আক্রমণকারী রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রদের অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা ছিন্ন করতে বা তার বিরুদ্ধে তদের যৌথ উদ্যোগে গঠিত স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর মিলিত ফৌজের সাহায্যে বাধ্যতামূলক (নিবর্তনমূলক বা শাস্তিমূলক) ব্যবস্থা গ্রহণ করে শান্তি ফিরিয়ে আনার ক্ষমতাও স্বস্তি পরিষদের আছে। স্বস্তি পরিষদ এজন্য তার অধীনস্থ "সমর পরিষদের" (Military Staff Committee) পরামর্শ নেবে। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রত্যেকের সম্মতি অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কিন্তু ১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের সময় সাধারণ পরিষদের দ্বারা গৃহীত "শান্তির জন্য সংঘবদ্ধতার প্রস্তাব" (Uniting for Peace Resolution) অনুযায়ী যদি এই রকম ক্ষেত্রে বৃহৎ পঞ্চশক্তির কারুর দ্বারা "ভেটো" প্রযুক্ত হয় এবং তারপর প্রস্তাবিত ব্যবস্থাটি সাধারণ ভোটাধিক্যে সাধারণ পরিষদের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহলে সেটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত প্রস্তাব বলে বিবেচিত হবে এবং তদনুসারে কাজ আইনসম্মত উপায়ে সামগ্রিক নিরাপত্তা (Collective Security) রক্ষার ব্যবস্থা বলে গ্রাহ্য হবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ-রচয়িতাগণ (Fathers of the U. N. Charter) স্বস্তি পরিষদকেই এই বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠানের প্রধান সভারূপে স্বীকার করে গেছেন। ভেটো-প্রয়োগ নীতির জোরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েত রাশিয়ার মধ্যে যে স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াই (Cold War) চলে এসেছে, তার ফলে স্বস্তি পরিষদের বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক "শান্তির জন্য সংঘবদ্ধতার প্রস্তাব" গৃহীত হবার ফলে বাস্তব ক্ষেত্রে বৃহৎ পঞ্চশক্তির মধ্যে দলাদলির জন্য স্বস্তি পরিষদকে অচল করে দেওয়ার কোনও সম্ভবনা রহিত হয়ে গেছে।

দ্বিশক্তির ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে এ উদ্যোগের ব্যর্থতার সম্ভাবনা

আশা করা যায় যে, এই প্রস্তাব গৃহীত হবার ফলে স্বস্তি পরিষদে বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রত্যেকে সনদ কর্তৃক প্রদত্ত তাঁদের দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে আরও সচেতন হবেন। ফলে, স্বস্তি পরিষদও অধিকতর সক্রিয় হবার সুযোগ লাভ করবে, বিশ্বশান্তি সংরক্ষণও আরও নিশ্চিত ও সহজ হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয়তঃ, ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করে পৃথিবীর শোষিত, অনগ্রসর অঞ্চলগুলিকে স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের

সনদে "অছি ব্যবস্থা" (Trusteeship System) নামে একটি ব্যবস্থা আছে। অছি-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা (Strategic Areas) সম্পর্কে সন্ধিগুলির পর্যালোচনা, এই এলাকাগুলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের দায়িত্ব প্রভৃতি **অছি-বিষয়ক ক্ষমতা** স্বস্তি পরিষদের ওপর ন্যস্ত। স্বস্তি পরিষদের স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলি পদাধিকার বলে "গুরুত্বপূর্ণ এলাকা" পরিচালনার জন্য অছি পরিষদের সভ্য।

(২) অছি ব্যবস্থা পরিচালনা

তৃতীয়তঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিব (Secretary-General), আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতি প্রভৃতি **উচ্চ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে** এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে **নতুন সদস্য-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে** স্বস্তি পরিষদের **ক্ষমতা** রয়েছে। মোট ১৫ জন সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলির ও বাকী যে-কোন ৪ জন সদস্য-রাষ্ট্রের অনুমোদন আবশ্যক। এই ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের সহযোগীরূপে স্বস্তি পরিষদ প্রয়োগ করে থাকে।

(৩) নতুন সদস্য-রাষ্ট্রের প্রবেশ অনুমোদন

চতুর্থতঃ, **নিবর্তনমূলক বা সবল ব্যবস্থার দ্বারা** স্বস্তি পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোনও সদস্য-রাষ্ট্রের **সভ্যপদ** সাময়িকভাবে অথবা স্থায়ীভাবে **বাতিল** করে দিতে পারে বা তার বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। স্বস্তি পরিষদের সিদ্ধান্তই এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত।

(৪) সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

পঞ্চমতঃ, স্বস্তি পরিষদের বিশেষ ক্ষমতা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের **সনদ-সংশোধনের ক্ষমতা**। স্বস্তি পরিষদের স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রের সকলের সম্মতি থাকলে ও সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য-রাষ্ট্রের সম্মতি থাকলে তবেই সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৫) সনদ-সংশোধনের ক্ষমতা

ষষ্ঠতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে নিরস্ত্রীকরণের (Disarmament) ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নিরস্ত্রীকরণ **সম্পর্কেও স্বস্তি পরিষদকে বিশেষ ক্ষমতা** দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে সমর পরিষদ স্বস্তি পরিষদকে **পরামর্শ** দেয়। স্বস্তি পরিষদ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রদের কাছে পেশ করে।

(৬) নিরস্ত্রীকরণ

স্বস্তি পরিষদের কার্যাবলী পর্যালোচনা করে নিকোলাস্ বলেছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলেও বাস্তবক্ষেত্রে স্বস্তিপরিষদের ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য ও চমকপ্রদ নয়। ("Of all the organs of the U. N. none has shown a greater discrepancy between promise and peformance than the Security Council")। নিকোলাসের এই বক্তব্যটির তাৎপর্য বুঝতে গেলে **স্বস্তি পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর**

স্বস্তি পরিষদের কার্যাবলীর মূল্যায়ন : (১) এর অক্ষমতা সনদের গোঁজামিলের জন্যই ভেটো ব্যবস্থার সমালোচনা (কেলসেন)

মূল্যায়ন দরকার। প্রথমতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ধারা অনুসারেই স্বস্তি পরিষদের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে গোঁজামিল রয়েছে। যেমন—সাধারণ পরিষদে ছোট-বড়-নির্বিশেষে প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রকে সমান বলা হলেও স্বস্তি পরিষদের স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্ররূপে বৃহৎ পঞ্চশক্তির (Big Five) একচেটিয়া প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে। তাদের যে কেউ এককভাবে "ভেটো" প্রয়োগ করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে কোনও সিদ্ধান্তকে অচল করে দিতে পারে। প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনবিদ্ হান্স্ কেল্সেনের (Hans Kelsen) মতে বৃহৎ পঞ্চশক্তিকে "ভেটো" ক্ষমতা দেবার কোন যুক্তি নেই। তিনি বলেন যে, এর দ্বারা ক্ষমতার ভারসাম্যের (Balance of Power) ধ্রুপদী নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, সামগ্রিক নিরাপত্তার (Collective Security) নীতিকে আদর্শ হিসাবে স্বীকার করলেও বাস্তবক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করা হয় নি। ফলে, জাতীয় সার্বভৌমত্বের নীতিকেই চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আইনকে সার্বভৌম করে বিশ্বশান্তিকে সুরক্ষিত করার প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে।

দ্বিতীয়ঃ, "অ্যাচিসন্ প্রস্তাব" বা "শান্তির জন্য সংঘবদ্ধতার প্রস্তাব" অনুসারে "ভেটো" প্রয়োগের ফলে স্বস্তি পরিষদ কোন আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অক্ষম হলে সাধারণ পরিষদের হাতে সে ব্যবস্থা নেবার ভার অর্পিত হয়েছে। ১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের পটভূমিকায় সাধারণ পরিষদ এ প্রস্তাব অনুমোদন করলেও তারপর থেকে এ পর্যন্ত প্রস্তাবটি প্রয়োগের কোন ক্ষেত্র দেখা দেয় নি। উপরন্তু এই প্রস্তাবটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল সনদের বিরোধী কিনা তা নিয়ে আন্তর্জাতিক আইনবিদ্দের ও বহু সদস্য-রাষ্ট্রের নেতাদের মনে প্রচুর সংশয় রয়েছে। ফলে, বিশ্বশান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে স্বস্তি পরিষদের ভূমিকা নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

(২) অ্যাচিসন্ প্রস্তাবের বৈধতা নিয়ে সংশয়

তৃতীয়তঃ, অনেকের মতে, সোবিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ দুটি বৃহৎ শক্তি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। ফলে, দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বিপাক্ষিক মেরুকরণ (Bipolarisation of Power), উভয় ক্ষেত্রের প্রত্যেকের একক "ভেটো" প্রদান, দুটি পরস্পরবিরোধী জোটে বিভিন্ন রাষ্ট্রের জোটবদ্ধতা, দুটি শিবিরের মধ্যে "ঠাণ্ডা লড়াই" (Cold War) বা স্নায়ুযুদ্ধ শুধু সাধারণ পরিষদ বা স্বস্তি পরিষদকে নয়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকেই সার্বিকভাবে বিপন্ন করে তুলেছে।

(৩) সোবিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঠাণ্ডা লড়াই

চতুর্থতঃ, স্বস্তি পরিষদের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার আরেকটি কারণ হল ক্ষমতার দ্বিপাক্ষিক মেরুকরণের পরিবর্তে হিসাবে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি ভারতের নেতৃত্বে "তৃতীয় বিশ্ব" (Third World) গড়ে তুলেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ

পরিষদে আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠীর (Afro-Asian Bloc) ক্রমিক শক্তিবৃদ্ধির ফলে "তৃতীয় বিশ্ব" ভবিষ্যতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আসরে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। কিন্তু এর ফলে উপযুক্তভাবে তার সনদকে সংশোধন করে না নিলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ভবিষ্যতে আরও জটিল হয়ে উঠবে এবং স্বস্তি পরিষদও যথাযথভাবে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে বাধা পাবে।

(৪) ৩য় গোষ্ঠীরূপে আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠীর প্রভাব

পঞ্চমতঃ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিখ্যাত মার্কিনী বিশেষজ্ঞ হানস্ মর্গেনথাউ (Hans Morgenthau) মনে করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েত রাশিয়া এই দুটি রাষ্ট্রের নেতৃত্বেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাতই স্বস্তি পরিষদের সাফল্য লাভের পথে প্রধান বাধা। ঠান্ডা লড়াইয়ে লিপ্ত উভয় রাষ্ট্রের যথেচ্ছ "ভেটো" প্রয়োগের ওপর দোষারোপ না করে উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়া ও সহযোগিতাই একান্ত আবশ্যক। ভেটো থাকুক বা না-ই থাকুক, এ দুটি রাষ্ট্রের সহযোগিতাই স্বস্তি পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সনদে বিবৃত আদর্শ অনুযায়ী সক্ষম ও প্রগতিশীল করে রাখবে।

(৫) ভেটো থাকুক বা না থাকুক, দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের সহযোগিতা চাই (মর্গেনথাউ)

ষষ্ঠতঃ, সনদের শর্ত অনুসারে স্বস্তি পরিষদ আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে সম্মিলিত ফৌজ পাঠাতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, স্বস্তি পরিষদের কোন স্থায়ী ফৌজ নেই। তা ছাড়া এ ধরনের সামগ্রিক নিরাপত্তা বলবৎ রাখার ব্যবস্থা (Collective Security Enforcement Action) খুবই ব্যয়বহুল। স্বস্তি পরিষদে মার্কিনী ভূমিকার নিন্দা করে সোবিয়েত রাশিয়া অভিযোগ করেছে যে, মার্কিনী ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের উস্কানি ও প্ররোচনার ফলেই স্বস্তি পরিষদকে বহুক্ষেত্রে তার ফৌজ পাঠাতে হয়। সুতরাং সমাজতন্ত্রী সোবিয়েত সরকার এর ব্যয়বাবদ তার অংশ বহন করতে ইচ্ছুক হয় নি। এই ব্যাপারটি নিয়ে কিছুদিন আগে মার্কিন সরকার ও সোবিয়েত সরকারের মধ্যে তীব্র মতান্তর দেখা দেয়।

() সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যয়বহুল ; স্বস্তি পরিষদের স্থায়ী ফৌজ নেই

॥ সাধারণ পরিষদ ও স্বস্তি পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক ॥

অনেকের ধারণা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের রচয়িতাগণ (Fathers of U. N. Charter) সাধারণ পরিষদের চেয়ে স্বস্তি পরিষদকেই বেশী ক্ষমতাশালী করতে চেয়েছিলেন। এ ধারণার কারণ হল এই যে, সনদে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই দুই বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নি।

উভয়ের সম্পর্ক

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ধারাগুলি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে,

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধির জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে স্বস্তি পরিষদ ও সাধারণ পরিষদকে এককভাবে কাজ করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, কোথাও বা পরস্পরের সহযোগী হিসাবে তাদের কাজ করতে বলা হয়েছে।

প্রত্যেকের একক ক্ষমতা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ১০ ও ১১ ধারায় সাধারণ পরিষদকে এককভাবে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সাধারণ পরিষদ সংশ্লিষ্ট যে-কোনও বিষয়ে আলোচনা করতে পারে ও স্বস্তি পরিষদকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের সীমাবদ্ধতাও লক্ষণীয়। স্বস্তি পরিষদের বিবেচনাধীন কোন বিষয়ে বা অবিলম্বে জরুরী ব্যবস্থা নেবার মত কোন বিষয়ের ওপর স্বস্তি পরিষদের অনুমতি ছাড়া সাধারণ পরিষদ কোন আলোচনা চালাতে পারে না। সাধারণ পরিষদের ক্ষমতার এই সীমাবদ্ধতার জন্য আইসেলবার্গার (Eichelberger) মন্তব্য করেছেন যে, স্বস্তি পরিষদের তুলনায় সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা অনেক কম।

সাধারণ পরিষদের একক ক্ষমতা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ২৪ (১) ধারা অনুযায়ী জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে স্বস্তি পরিষদ বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য ও যুদ্ধকে সীমিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। বিশেষতঃ, সনদের সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী সার্বিক নিরাপত্তা (Collective Security) রক্ষার জন্য স্বস্তি পরিষদ আগ্রাসী রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রদের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলতে পারে। চরম নিবর্তনমূলক ও শান্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে স্বস্তি পরিষদ এই রাষ্ট্রদের কাছ থেকে স্থল, নৌ ও বায়ু সেনা চেয়ে নিয়ে তাদের সাহায্যে নিজস্ব আন্তর্জাতিক ফৌজ গঠন করে সেই ফৌজকে আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পাঠাতে পারে। কিন্তু এই চরম অবস্থায় স্বস্তি পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বৃহৎ পঞ্চশক্তির যে-কেউ "ভেটো" প্রয়োগ করলে স্বস্তি পরিষদ সে সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে পারবে না।

স্বস্তি পরিষদের একক ক্ষমতা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যাতে বানচাল না হয়ে যায়, সেজন্য কোরিয়ার যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫০ সালের ২রা নভেম্বর সাধারণ পরিষদ বিখ্যাত "অ্যাচিসন প্রস্তাব" (Acheson Plan) ("শান্তির জন্য সংঘবদ্ধতার প্রস্তাব") গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রের "ভেটো" প্রয়োগের ফলে সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য স্বস্তি পরিষদের প্রচেষ্টা বানচাল হলে সে ক্ষেত্রে সাধারণ সংখ্যাধিক্যের (simple majority) জোরে সাধারণ পরিষদ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। ১৯৫০ সালের এই প্রস্তাব সাধারণ পরিষদকে অবস্থাবিশেষে স্বস্তি পরিষদের প্রায় সমতুল্য করে দিয়েছে। সাধারণ পরিষদ ও স্বস্তি পরিষদ প্রত্যেকেই এককভাবে কাজ করতে গেলে তাদের ক্ষমতার ঘাটতি দেখা দিতে পারে। তখন তাদের একজন অপরের ঘাটতি পূরণ করতে পারবে।

অ্যাচিসন প্রস্তাব : সাধারণ পরিষদের বাড়তি ক্ষমতালাভ

এইভাবে অতি-আধুনিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে এক ধরনের ক্ষমতার ভারসাম্য (Balance of Power) বজায় রাখতে চেষ্টা করছে।

উভয় পরিষদের সহযোগী ক্ষমতা

যে বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ ও স্বস্তি পরিষদ পরস্পরের সহযোগীরূপে কাজ করবে, সেগুলি হল : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে উল্লিখিত কোন নির্বাচনসংক্রান্ত বিষয়ে, নিবর্তনমূলক বিষয়ে, সনদ সংশোধন বিষয়ে ও নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে।

(১) মহাসচিব নিয়োগ

প্রথমতঃ, নির্বাচনসংক্রান্ত বিষয়ে স্বস্তি পরিষদ সুপারিশ করবে। ক্ষেত্রবিশেষে এই সুপারিশ করা ও তাকে কার্যকর করার পদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। যেমন—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিব (U. N. Secretry-General) নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের অনুমোদন ও স্বস্তি পরিষদের বৃহৎ পঞ্চশক্তি ছাড়া অতিরিক্ত ৪টি সদস্যরাষ্ট্রের অনুমোদন দরকার। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নতুন সদস্য-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তিও এই নিয়ম অনুসারে হয়। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ক্ষেত্রে স্বস্তি পরিষদ ও সাধারণ পরিষদে যিনি সর্বাধিক ভোট পাবেন, তিনিই বিচারপতিরূপে নিযুক্ত হবেন এবং সে নির্বাচন বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভেটোসাপেক্ষ নয়।

(২) নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা

দ্বিতীয়তঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ৫ ও ৬ ধারা অনুসারে স্বস্তি পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ যে-কোনও সদস্য-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। চরম অবস্থায় এভাবে কোন সদস্য-রাষ্ট্রসম্মিলিত জাতিপুঞ্জথেকে বহিস্কৃতও হতে পারে।

(৩) সনদ-সংশোধন

তৃতীয়তঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের সংশোধন সম্পর্কে ১০৮ ধারা অনুসারে কোনও সংশোধনী প্রস্তাব স্বস্তি পরিষদের সম্মতিক্রমে এবং সাধারণ পরিষদে উপস্থিত ও ভোটদাতা দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য-রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে কার্যকর হয়। অবশ্য বৃহৎ পঞ্চশক্তির মতৈক্য থাকা চাই।

(৪) নিরস্ত্রীকরণ

চতুর্থতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ১১ ধারায় বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য নিরস্ত্রীকরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সনদ অনুসারে সাধারণ পরিষদ এ সম্বন্ধে আলোচনা করে প্রস্তাব গ্রহণ করবে এবং স্বস্তি পরিষদের কাছে বা সদস্য-রাষ্ট্রের কাছে বা উভয়ের কাছেই সে প্রস্তাব পেশ করবে। ১৯৪৬ সালে সাধারণ পরিষদ "পারমাণবিক শক্তি সংস্থা" (Atomic Energy Commission) গঠন করে। আবার, ১৯৪৭ সালে স্বস্তি পরিষদ "সাবেকী অস্ত্র কমিশন" (Conventional Armaments Commission) গঠন করে। পরে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের (President Truman) উদ্যোগে এই দুটি কমিশনই "নিরস্ত্রীকরণ কমিশন" (Disarmament Commission) নামে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই নতুন কমিশনটির পরিচালনার ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ ও স্বস্তি পরিষদ উভয়েরই যুগ্ম উদ্যোগ লক্ষণীয়।

॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যান্য বিশেষ সংস্থা : কি ও কেন ॥

জাতিপুঞ্জ বা লীগ্ প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি সংরক্ষণের এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করেছিল। শুধু যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেলেই পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখা চলে না। শান্তি বজায় রাখতে গেলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা থাকা দরকার। সেই উদ্দেশ্যে লীগ্ আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংস্থা (I. L. O.) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে।

বিশেষ সংস্থা

॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বাত্মক শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টা ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে নতুন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করতে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতাগণ ঠিকই বুঝেছিলেন যে, বিশ্বশান্তি শুধু যুদ্ধ বন্ধ করলেই প্রতিষ্ঠিত হয় না। এর জন্য চাই নানা রকম অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংস্থা। এগুলির দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে গড়ে উঠবে এক অখণ্ড মৈত্রী ও সৌভ্রাত্র। এর ফলে ধনী ও দরিদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোনও চরম পার্থক্য থাকবে না। পৃথিবীর সব দেশেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান ধীরে ধীরে সমান করে আনা যাবে। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা স্থাপন করতে পারলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মহামারী, অপুষ্টি প্রভৃতির আক্রমণ রোধ করা যাবে। আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠন করতে পারলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ভাব-বিনিময় সহজ এবং সুন্দর হবে।

বিশ্বশান্তি বাস্তব, অখণ্ড, সামগ্রিক

অতএব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপনের সময় এর নির্মাতাগণ বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য শুধু যুদ্ধবিরোধী কোনও একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেই ক্ষান্ত হলেন না। তাঁরা বিশ্বশান্তিকে একটা বাস্তব, অখণ্ড, সামগ্রিক শান্তিরূপে (positive, total, whole peace) কল্পনা করলেন। এর ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যুদ্ধজাতীয় হিংসাত্মক ঘটনা বন্ধ করার ও বিশ্বশান্তি সংরক্ষণের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। উপরন্তু নানা জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়ে অধিকতর সহযোগিতা ও বোঝাপড়া গড়ে ওঠার ফলে বিশ্বমৈত্রী আরও দৃঢ় হয়ে উঠবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ-রচয়িতাগণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে ভাবীকালের বিশ্বে বাস্তব, অখণ্ড, সামগ্রিক শান্তি স্থাপনের উপযোগী একটি বিশ্ব জনকল্যাণকর রাষ্ট্র (International Welfare State) রূপে গড়ে তুলতে চান। সেজন্য তাঁরা **অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা** নামে একটি সংস্থাগঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বাত্মক শান্তিস্থাপনের প্রচেষ্টাকে কার্যকর করে তোলাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। আবার, এই পরিকল্পনাকে বাস্তব ক্ষেত্রে সফল করার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এই সংস্থার সঙ্গে অসংখ্য বিশিষ্ট উদ্দেশ্যযুক্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করে রেখেছে। সুতরাং বলা যায় যে, সম্মিলিত

বিশ্ব জনকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

জাতিপুঞ্জের সঙ্গে অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীকে সংযুক্ত ও সমন্বিত করাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার প্রধান ভূমিকা।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংস্থাগুলির ভূমিকা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করে থাকে, সেগুলি হল—খাদ্য ও কৃষিসংস্থা, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনেস্কো, অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংস্থা, আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসংস্থা, আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান সংস্থা, বিশ্ব ডাকবিভাগীয় সংস্থা, আন্তর্জাতিক বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিশু তহবিল ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা প্রভৃতি।

মহাকরণ ও মহাসচিব ; আন্তর্জাতিক বিচারালয়

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকলাপ সাধারণভাবে পরিচালনার ভার রয়েছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিব ও তাঁর মহাকরণের (বা সেরেস্তা বা কর্মদপ্তর) ওপর। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তারা ইচ্ছা করলে বিরোধ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে পারে।

॥ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা ॥

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার মূল উদ্দেশ্য

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে, মানবাধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, এক কথায় উন্নত, প্রগতিশীল মানবিক সত্তার সার্বিক উন্মেষের জন্য সহায়তার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ **অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা** (The Economic and Social Council, সংক্ষেপে ECOSOC) নামে সাধারণ পরিষদের কর্তৃত্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে।

সংগঠন

১৯৪৫ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল সনদ অনুযায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার মোট সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল ১৮ জন। ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত বহু আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রের প্রবেশের ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬৬ সালে স্বস্তি পরিষদের এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার মোট সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৬৬ সালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার মোট সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল ২৭ জন। ১৯৭৩ সালে সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যা আবার বৃদ্ধি করা হয়। ফলে, সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৪ জন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার মোট সদস্য রাষ্ট্রগুলির ৯ জন প্রতি ৩ বছর অন্তর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। স্বস্তি পরিষদের স্থায়ী বৃহৎ পঞ্চশক্তির অন্তর্ভুক্ত ৫টি রাষ্ট্র এই সংস্থার স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্র।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জনহিতকর উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ করার জন সচেষ্ট। জীবনধারণের মান উন্নয়ন, বিশ্ববাসীদের যথাসম্ভব চাকুরীর ব্যবস্থা করা, অনুন্নত বা অনগ্রসর রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন এই সংস্থার **অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যগুলির** অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্যার সমাধান এবং শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার এই সংস্থার **সামাজিক উদ্দেশ্যগুলির** অন্তর্গত। ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও ব্যক্তির মান-মর্যাদা বৃদ্ধি—এই সংস্থার **মানবিক উদ্দেশ্যগুলির** অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দেশ্য মূলতঃ ৩ প্রকার : অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানবিক

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার অনেক কার্যকলাপ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের প্রস্তাবনায় ও ১ এবং ২ ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্য এবং এই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট সংস্থার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্য এই সংস্থা অসংখ্য উপ-সমিতি (Committee) ও উপ-সভা (Commission) গঠন করতে পারে। বলা যায় যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শান্তির বুনিয়াদ গঠনের জন্য যে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে, সেগুলি সবই অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — খাদ্য ও কৃষিসংস্থা (F. A. O. বা Food and Agricultural Organisation), বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (W. H. O. বা World Health Organization), ইউনেস্কো (U. N. E. S. C. O.) প্রভৃতি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা এই প্রতিষ্ঠান, উপ-সমিতি ও উপ-সভাগুলিকে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত বিশিষ্ট বিষয় সম্পর্কে নানাপ্রকার খসড়া বিবৃতি (Draft Report) পাঠাতে পারে, অথবা সাধারণ পরিষদেও এ ধরনের বিবৃতি পাঠাতে পারে। বিবৃতির মধ্যে নানাপ্রকার প্রস্তাব সুপারিশ করার ক্ষমতাও অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার আছে।

এজন্য (১) বিভিন্ন উপসমিতি পরিচালনা

দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা তার সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষ সংস্থাগুলির কার্যাবলীর সঙ্গে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যকলাপের সমন্বয় সাধন করতে পারে। এই যোগাযোগ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে ঘটে। নানাপ্রকার পরামর্শ ও প্রস্তাব-অনুমোদনের মধ্য দিয়ে এ সমন্বয় গড়ে ওঠে। বিশেষ সংস্থাগুলির কাগজপত্র, খসড়া ইত্যাদি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার মারফত সাধারণ পরিষদের কাছে পেঁছায়।

(২) তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন

তৃতীয়তঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সাধারণ পরিষদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থাকে অনেক কাজ, ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা সেই দায়িত্বগুলি পালন করার চেষ্টা করে।

(৩) সাধারণ পরিষদের নির্দেশপালন

চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা প্রয়োজন বোধ করলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদকে সাহায্য করার মত স্বস্তি পরিষদকেও নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। ফলে স্বস্তি পরিষদের পক্ষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ করা সহজ হয়।

(৪) স্বস্তি পরিষদকে সহায়তা

পঞ্চমতঃ, মানবিক অধিকার ও মানমর্যাদা রক্ষা করার ওপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা এই বিষয়গুলির প্রতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে ও এজন্য তাদের নানা প্রকার নির্দেশ দিতে পারে।

(৫) মানবিক অধিকার রক্ষা

ষষ্ঠতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থাকে যে বিষয়গুলির ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, সেগুলি নিয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা আন্তর্জাতিক সম্মেলন (International Conference) আহবান করতে পারে।

(৬ আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহবান

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার কার্যাবলীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রথমতঃ বলা হয় যে, তাত্ত্বিকভাবে অনেক ক্ষমতা ও দায়িত্ব একে অর্পণ করা হলেও এই সংস্থাকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার অধীনে থেকে কাজ করতে হয়, এর কোন স্বাধীনতা নেই।

মূল্যায়ন (১) স্বাধীন নয়

দ্বিতীয়তঃ, শুধু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি সংস্থারূপে বিবৃতি, সুপারিশ ইত্যাদি প্রস্তুত করা ছাড়া এর প্রকৃত কর্মক্ষমতা নেই।

(২) প্রকৃত ক্ষমতা নেই

তৃতীয়তঃ, সোবিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার দ্বিপাক্ষিক মেরুকরণের (Bipolarisation of Power) ও দ্বিপাক্ষিক জোটবদ্ধতার ফলে এ দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তি পরস্পরকে দোষারোপ করে থাকে। সোবিয়েত রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে প্রতিক্রিয়াশীল ও শ্রমিক-স্বার্থবিরোধী বলে মনে করে। তাই সোবিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংক বা বিশ্বব্যাংকের মার্কিনী একচেটিয়া কর্তৃত্বের প্রতিবাদে এই প্রতিষ্ঠানদুটির সভ্য হয় নি। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার কাজকর্মও দ্বিপাক্ষিক ঠাণ্ডা লড়াই (Cold War)-এর ফলে অনেকটা ব্যাহত। সমাজতন্ত্রী পোল্যাণ্ডে ওয়ালেসার (Walesa) নেতৃত্বে শ্রমিকসংঘের স্বাধিকারকে (Trade Union Right) স্বীকার করার ক্ষেত্রে সোবিয়েত রাশিয়ার আপত্তিকে অন্যায় হস্তক্ষেপ বলে মার্কিন সরকার অভিযোগ করেন। সোবিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশের প্ররোচনায় মার্কসবাদের অনুপ্রবেশের প্রতিবাদে ১৯৮৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউনেস্কোর সদস্যপদ ত্যাগ করেছে।

(৩) বৃহৎ দ্বিশক্তির ঠাণ্ডা লড়াইয়ের শিকার

কিন্তু তবুও বলতে হয়, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির আদর্শের ও স্বার্থের চরম

পরস্পরবিরোধিতা সত্ত্বেও তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে সফল

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যথাযথ সংযোগ ও সমন্বয় সাধনে অনেক সফল হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে প্রকৃত ও সার্বিক অর্থে আন্তর্জাতিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে (International Welfare State) পরিণত করার জন্য এর ভূমিকা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধীনে থেকে পৃথিবীর জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণবৃদ্ধি এবং সামাজিক সংস্কারের জন্য খুব সাহায্য করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত দেশগুলির আর্ত জনগণকে এই প্রতিষ্ঠান সহায়তা করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা কোরিয়ার যুদ্ধের পর উদ্বাস্তুদের অনেক উপকার সাধিত হয়েছে। অসহায় শিশু, অন্ধ, প্রতিবন্ধীদেরও এই প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সাহায্য করে। ১৯৬১ সালে এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত মাদকদ্রব্য বর্জন সমিতি (Commission on Narcotic Drugs) যে মূল্যবান রিপোর্টটি দাখিল করেন তা এই উদ্দেশ্য সাধনের অনেকগুলি বাস্তব দিক সম্বন্ধে বিশ্ববাসীকে অধিকতর সচেতন করে তুলেছে।

আর্তের সেবা

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার প্রয়োজনীয় বিভাগগুলি হল—কার্যকরী এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কমিশন (Functional and Regional Economic Commission) এবং কারিগরী সাহায্যদান সমিতি (Technical Assistance Committee)। এ দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও আবার কতকগুলি উপ-বিভাগ আছে। যেমন, বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ প্রচেষ্টা সমিতি, সংখ্যালঘু সংরক্ষণ সমিতি, মানবিক অধিকার উন্নয়ন সমিতি, মাদক দ্রব্য বর্জন সমিতি প্রভৃতি।

কারিগরী সাহায্যদান

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানারকম আঞ্চলিক সমস্যা দেখা যায়। এর ফলে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের জটিলতা দূর করার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার চারটি বিশেষ শাখা-কেন্দ্র কাজ করে থাকে। ইউরোপীয় শাখাটি জেনিভায়, এশিয়ার শাখাটি ব্যাংককে, দক্ষিণ আমেরিকার শাখাটি চিলির স্যান্টিয়াগো শহরে এবং আফ্রিকার শাখাটি ইথিয়োপিয়ার অন্তর্গত আদ্দিস আবাবা শহরে অবস্থিত।

নানা দেশে উপসমিতি গঠন

॥ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ॥

১৯১৮ সালে জাতিপুঞ্জ বা লীগ স্থাপিত হবার পর দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন নেতা সেনাপতি স্মাটস (General Smuts) বলেছিলেন যে, আন্তর্জাতিক শান্তি অনেক সময় ব্যাহত হবার প্রধান কারণ হল এই যে, প্রায়ই দেখা যায়, পৃথিবীর একাংশে খাদ্যের প্রাচুর্য, অন্যত্র দুর্ভিক্ষ। বলা বাহুল্য, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খাদ্যসামগ্রীর এই অসম বণ্টন দূর

স্মাটস পরিকল্পনা (১৯১৮)

করার একমাত্র উপায় হল একটি খাদ্য ও কৃষিসংস্থা স্থাপন করা ও তাকে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পরিচালন ব্যবস্থার অধীনে রাখা। আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধীনে এই উদ্দেশ্যেই কাজ করে থাকে। এর সদর দপ্তর ইতালির অন্তর্গত রোম শহরে।

সংগঠন

খাদ্য ও কৃষিসংস্থার উদ্যোগে প্রতি বছর একটি বার্ষিক সম্মেলন (Annual Conference) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের একটি করে ভোট থাকে। একটি পরিষদ (Council) সম্মেলন পরিচালনা করে। সম্মেলন একজন প্রধান পরিচালক (Director General) নিয়োগ করে।

উদ্দেশ্য, ক্ষমতা, কার্য : কৃষি-ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন

কৃষিপণ্যের উৎপাদনবৃদ্ধি, সুষ্ঠু বণ্টন, কৃষির উন্নতির জন্য গ্রামোন্নয়ন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহের দ্বারা তাদের দৈহিক পুষ্টিসাধন, কৃষিসম্পর্কিত তথ্যাদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রদের মধ্যে আদানপ্রদান, সদস্য-রাষ্ট্রদের কৃষিঋণ, কারিগরী ও প্রযুক্তিবিষয়ক সাহায্য দান ইত্যাদি খাদ্য ও কৃষিসংস্থার উদ্দেশ্য। বার্ষিক কার্যবিবরণী ও নানাবিধ পত্রপুস্তিকা প্রকাশ করে ও সেগুলি প্রচারের মাধ্যমে সদস্য-রাষ্ট্রদের সাহায্য করা এই সংস্থার অন্যতম কাজ।

দারিদ্র্যদূরীকরণ ও ক্ষুধা থেকে মুক্তির সর্বাত্মক প্রচেষ্টাগ্রহণ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আজ জনসংখ্যাবৃদ্ধির চাপে (Population Explosion) দুঃসহ অভাব, অনটন ও দারিদ্র্যের মুখোমুখি। এই সমস্যা কিছুটা দূর করা সম্ভব পৃথিবীতে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে। সেটা সম্ভব হয় আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিব্যবস্থাকে উন্নত করতে পারলে। আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এ উদ্দেশ্যে উন্নততর বীজ, সার প্রভৃতি আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের কৃষিব্যবস্থাকে সুসমৃদ্ধ করে তুলতে চায়। এই প্রতিষ্ঠান মৎস্যচাষ, পশুপালন, বনজসম্পদ সংরক্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খাদ্যসমস্যা দূর করার জন্য ব্যাপকভাবে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান থেকে বহু মূল্যবান পত্র-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। জাপানী প্রথায় চাষ এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই ভারতের মত দেশগুলিতে সাফল্যের সঙ্গে প্রচলিত হয়েছে। ভারতে "চাউল গবেষণা কেন্দ্র" স্থাপন, মধ্য ও দূর প্রাচ্যে গবাদি পশুর ব্যাধি নিরাময়ের ব্যবস্থা, ১৯৪৬ এবং ১৯৫২ সালে বিশ্বখাদ্য সমীক্ষা" (World Food Survey) পরিচালনা, ১৯৬০ সালে বিশ্ববাসীদের জন্য "ক্ষুধামুক্তি" (Freedom from Hunger") আন্দোলন, ১৯৮২ সালে থাইল্যাণ্ডে, ভারত ও বাংলাদেশে মৎস্য-বৃদ্ধি প্রকল্প খাদ্য ও কৃষি সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।

॥ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ॥

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি প্রধান দপ্তর হল বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation বা সংক্ষেপে W.H.O.)। এটি ১৯৪৮ সালে সুইজার-

ল্যাণ্ডের জেনিভা শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৩ সালে ইতালির অন্তর্গত ভেনিস্ শহরে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্লেগ প্রভৃতি মহামারী সম্বন্ধে বিশ্ববাসীকে সচেতন করার জন্য ও রোগমুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সকলকে সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চলে। লীগের আমলেও একটি ছোটখাটো আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন দপ্তর ছিল, তবে বর্তমান বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তুলনায় তার ভূমিকা ছিল সীমাবদ্ধ ও নগণ্য।

ভেনিস্ সম্মেলন (১৮৯৩)

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একটি আলোচনা সভা (Assembly) আছে। এই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্যে রূপায়িত করার জন্য একটি কার্যনির্বাহক সমিতিও (Executive Board) আছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার আলোচনা সভা এই সংস্থার নীতি নির্ধারণ ও সংস্থার আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে। কার্যনির্বাহক সমিতির ২৪ জন সদস্যকে আলোচনা সভা নির্বাচিত করে। কার্যনির্বাহক সমিতি একজন মুখ্য পরিচালক (Director General) নিয়োগ করে। তাঁর কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। কর্মচারীগণ তাঁকে সাহায্য করে থাকেন।

সংগঠন

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কাজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে রোগ এবং মহামারী দূর করার ব্যবস্থা করা। আফ্রিকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য যে সমস্ত ব্যাধি সেখানে বাসা বেঁধে ছিল, তার অনেকগুলিই এই প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় দূর হয়েছে। নানা পত্রপুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার, তথ্যসংগ্রহ, বিশেষজ্ঞ ও ওষুধপত্র পাঠানো, রোগ-নিরাময় ও রোগ-প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ এই সংস্থার কার্যসূচীর অন্তর্গত। বিশ্বে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার কমাবার জন্যও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সচেষ্ট। দূর প্রাচ্যে পীত রোগ, গ্রীসে ম্যালেরিয়া, ভারতে যক্ষ্মা, মরক্কোতে পক্ষাঘাত, আফগানিস্তানে টাইফয়েড্ রোগের প্রকোপ দূর করতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ভারতের নানা স্থানের বহু স্বাস্থ্যকেন্দ্র (Health Centre) এর সাহায্যপুষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার সিঙ্গুরে যক্ষ্মানিবারণের জন্য এর সাহায্যপুষ্ট একটি কেন্দ্র আছে।

উদ্দেশ্য, কার্য, মূল্যায়ন

॥ ইউনেস্কো ॥

ইউনেস্কো (U. N. E. S. C. O) কথাটি একটি বড় বাক্যাংশের সংক্ষিপ্ত রূপ। এই বাক্যাংশের বিস্তৃত অর্থই হল এই প্রতিষ্ঠানের আসল পরিচয়। এই বিস্তৃত কথাগুলি হল "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষাগত, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন" (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)। তবে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রচলিত সংক্ষিপ্ত নাম "ইউনেস্কো"-ই বেশী জনপ্রিয়।

"ইউনেস্কো" শব্দের অর্থ

১৯৪৪ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ৪৪টি রাষ্ট্র নিয়ে প্যারিসে ইউনেস্কো

স্থাপিত হয়। এর জন্য যে পৃথক সনদ রচিত হয়েছে, তাতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যুদ্ধের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয় মানুষের মনেই। তাই মানুষের মনেই বিশ্বশান্তি সংরক্ষণের সবচেয়ে বড় এবং দৃঢ় বুনিয়াদ গড়ে তোলা উচিত। তবেই যুদ্ধকামী মানুষের মন থেকে বিকৃত, অসামাজিক মনোভাব চিরতরে দূর করা সম্ভব হবে। বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক এবং মানবতাবাদী চিন্তানায়ক স্যার জুলিয়ান হাক্সলে (Sir Julian Huxley) ইউনেস্কোর সনদ রচনার পিছনে প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন।

প্রতিষ্ঠার কারণ

ইউনেস্কোর পরিচালন-ব্যবস্থা খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পরিচালনা ব্যবস্থার অনুরূপ। এর পরিচালনার ভার একটি সাধারণ সম্মেলনের (General Conference) ওপর ন্যস্ত। সম্মেলন একটি পরিচালন পর্ষদ (Executive Board) ও একটি কর্মীদপ্তর গঠন করেন। পরিচালন পর্ষদের ৩০জন সদস্য রাষ্ট্র ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র ৫ জন প্রতিনিধি পাঠালেও প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের একটি করে ভোট। পর্ষদ একজন কর্মসচিব নিয়োগ করেন।

সংগঠন

ইউনেস্কোর যে সাধারণ সম্মেলন ১৯৫০ সালে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে অনুষ্ঠিত হয়, তাতে একটি প্রস্তাবে ইউনেস্কোর ব্যাপক কর্মসূচী নির্ধারিত হয়। এই সর্বাত্মক কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে—নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও মৌলিক শিক্ষার প্রসার; আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতিসাধন; মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা; আন্তঃরাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক বিনিময়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুরক্ষা ও প্রসার; বেতার, চলচ্চিত্র, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি গণসংযোগ মাধ্যমের মারফত স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতি প্রতিষ্ঠা এবং প্রকৃত তথ্যবিনিময়; আন্তঃরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে গণসংযোগ মাধ্যমগুলির সমন্বয় সাধন।

উদ্দেশ্য ও কার্য

শিক্ষার ক্ষেত্রে ইউনেস্কো ব্যাপকভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য অভিযান চালাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে "কেন্দ্রীয় জনশিক্ষা পরিকল্পনা" (Pilot Mass Literacy Project) এবং মেক্সিকোতে স্থাপিত "মৌল শিক্ষা কেন্দ্র" (Fundamental Education Centre) ইউনেস্কোর প্রশংসনীয় কার্যসূচীর অন্তর্গত। আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিক্ষণপদ্ধতির বৈজ্ঞানিকীকরণ, শিক্ষাদানের উপযোগী সাজসরঞ্জাম আদান-প্রদান, গ্রন্থাগারগুলির উন্নতিসাধন, সঙ্গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ইউনেস্কোর সুবিখ্যাত ও মানবিক কার্যকলাপের অন্তর্গত। প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান, স্তম্ভ, যাদুঘর ইত্যাদি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও ইউনেস্কোর ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে। নিরক্ষরদের দ্রুত শিক্ষার জন্য এই প্রতিষ্ঠান বহু পুস্তক-পুস্তিকা রচনা ও বিতরণ করছে। বয়স্ক নিরক্ষরদের দ্রুত শিক্ষার (Adult Literacy বা Neo-literacy) জন্য নানাভাবে ফিল্ম, বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতি একাধারে শ্রাব্য ও দৃশ্য গণমাধ্যমের (Audio-visual mass media)

কার্যসূচীর মূল্যায়ন: শিক্ষার ক্ষেত্রে

বহুল ব্যবহারের ব্যবস্থা ইউনেস্কোর প্রচেষ্টায় সম্ভব হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অল্পবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের মন যাতে ইতিহাস, ভুগোল প্রভৃতি বিষয়ের বিকৃত ব্যাখ্যার ফলে সুস্থ আন্তর্জাতিকতা ও মানবতাবাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয় সেজন্য ইউনেস্কো এই সব বিষয়ে নতুন, উন্নত, উদারধর্মী পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করছে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউনেস্কো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া, জীবজন্তু প্রভৃতির পর্যালোচনা এবং এইগুলি সম্বন্ধে গবেষণার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে, বহু দেশের মরু অঞ্চলে উন্নত ধরনের ব্যবস্থায় চাষবাস সম্ভব হচ্ছে, সমুদ্রের লবণাক্ত জল, নানা দেশের ওষধি, গাছপালা, এমনকি আণবিক শক্তি পৃথিবীর সকলের কল্যাণে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা চলছে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে

সংস্কৃতি আদানপ্রদানের ক্ষেত্রেই ইউনেস্কোর অবদান সর্বাধিক। পৃথিবীর সকল দেশের মানুষকে বিশ্বের বিচিত্র, অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার, মানবসভ্যতার চিরপ্রবহমান স্রোত এবং মানবজাতির সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সম্পদ সম্পর্কে সগর্ব উত্তরাধিকারীরূপে ইউনেস্কো সচেতন করে তুলছে। ভার্জিলের কাব্য, তুলসীদাসের রামায়ণ, পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী আজ ইউনেস্কোর ব্যাপক প্রচারের ফলে বিশ্বের সকলের সাধারণ সম্পদ। বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের ফলে এইসব সাহিত্য সম্বন্ধে সকলেই আজ সুবিদিত। ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিখ্যাত জার্মান মহাকবি গ্যয়টের জন্মশতবার্ষিকী ইউনেস্কোর প্রচেষ্টায় পালিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা শিল্পীদের আঁকা ছবি ও তাঁদের অন্যান্য শিল্পকীর্তি সম্বন্ধেও ইউনেস্কোর মাধ্যমে আজ বিশ্ববাসী সুপরিচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মের যে অসংখ্য স্থাপত্যকীর্তি মন্দির, মসজিদ, গীর্জা প্রভৃতি অক্ষয় রূপ নিয়ে মানুষের মনে চিরদিন বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে রেখেছে, সেই অপূর্ব শিল্পকীর্তিগুলিও ইউনেস্কোর দৌলতে আজ সংরক্ষিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। বিভিন্ন দেশের যাদুঘর প্রভৃতি প্রদর্শশালাও ইউনেস্কোর বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে সুগঠিত হবার গৌরব লাভ করেছে। অজন্তা-ইলোরা তাজমহল-পিরামিড বরবুদুর-আংকোরভাট তাদের অক্ষয় শিল্প-সৌন্দর্য নিয়ে ইউনেস্কোর তত্ত্বাবধানে পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের অনির্বচনীয় আনন্দের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে

শিক্ষাগত, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা এক দেশ থেকে দেশান্তরে আদান-প্রদানের জন্য ইউনেস্কো অনেক বৃত্তি, আলোচনাচক্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করে। ফলে, বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ সানন্দে ইউনেস্কোর সুমহান্ মানবপ্রেমের আদর্শকে, আন্তর্জাতিকতা উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে সফল, সার্থক ও সুন্দর করে তোলার জন্য বারবার এগিয়ে আসেন। সংকীর্ণতাবাদী, হিংসাশ্রয়ী, জাতীয়তাবাদী, বিকারগ্রস্ত যুদ্ধ-নায়কদের দম্ভ ও আস্ফালনের যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তরদান ইউনেস্কোর মত মানবিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই সম্ভব। "যুদ্ধ চাই-না, শান্তি চাই" এ শ্লোগান ফাঁকা বুলি হয়ে

উপসংহার : "যুদ্ধ চাই-না শান্তি চাই"

দাঁড়াবে, যদি আন্তঃরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে বিশ্ববাসীদের মনে গণতান্ত্রিক, মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা না যায়। এদিক থেকে বিচার করলে ইউনেস্কো একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

॥ অছি পরিষদ ॥

পৃথিবীতে এখনও কতকগুলি রাষ্ট্র আছে যেগুলি দীর্ঘদিন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কর্তৃত্বে থাকার ফলে শোষিত ও অত্যন্ত অনুন্নত হয়ে রয়েছে। এই দেশগুলিকে উন্নত ও স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী করে তোলার জন্য জাতিপুঞ্জের অর্থাৎ লীগের সনদের রচয়িতাগণ এদের কতকগুলি উন্নত রাষ্ট্রের অভিভাবকত্বের অধীনে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে লীগ্ নির্দেশ পরিষদ (Mandates Commission) নামে একটি সমিতি গঠন করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আমলেও ঐ একই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে সমিতি গঠিত হয়েছে, তাকে বলা হয় অছি পরিষদ (Trusteeship Council)।

নির্দেশ পরিষদ ও অছি পরিষদ

লীগ সনদের ২২ ধারায় অনুন্নত, পরাধীন রাষ্ট্রগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল—(ক) প্রথম শ্রেণীর নির্দেশিত অঞ্চল (Mandated territory or Mandatory)। এর মধ্যে ছিল ইরাক, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি প্রাক্তন তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলি। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হওয়ায় এই নির্দেশিত অঞ্চলগুলির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং এগুলিকে ইংলণ্ডের অভিভাবকত্বের অধীনে নির্দেশিত অঞ্চলরূপে রাখা হয়। (খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর নির্দেশিত অঞ্চল। আফ্রিকার ক্যামেরুনস, টোগোল্যাণ্ড প্রভৃতি অত্যন্ত অনগ্রসর অঞ্চলগুলিকে এই নির্দেশিত অঞ্চলগুলির শ্রেণীভুক্ত করে রাখা হয়। আবার, এদের কোন কোন অঞ্চল বিভক্ত করে একাধিক রাষ্ট্রের অভিভাবকত্বের অধীনে রাখার ব্যবস্থাও করা হয়। যেমন, ফরাসী ও ব্রিটিশ টোগোল্যাণ্ড যথাক্রমে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়। (গ) তৃতীয় শ্রেণীর নির্দেশিত অঞ্চলের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা এবং সামোয়া প্রভৃতি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে দক্ষিণ আফ্রিকার অভিভাবকত্বে রাখা হয়, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সংশ্লিষ্ট দ্বীপপুঞ্জগুলিকে পার্শ্ববর্তী অস্ট্রেলিয়ার অভিভাবকত্বে রাখা হয়।

লীগ্ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ

আগেকার দিনে একটি রাষ্ট্র পার্শ্ববর্তী দুর্বল কোনও দেশকে অনায়াসে দখল করে নিজের সার্বভৌম এলাকার অন্তর্ভুক্ত করে নিত। লীগের প্রবর্তিত নির্দেশিত অঞ্চল ব্যবস্থার ফলে এই অবাধ সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি কার্যতঃ বেআইনী বলে ঘোষিত হল। উপরন্তু নির্দেশিত অঞ্চলগুলি পার্শ্ববর্তী সভ্য, উন্নত কোনও রাষ্ট্রের অভিভাবকত্বের অধীনে থেকে সভ্য উন্নত রাষ্ট্ররূপে নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পেল। ফলে, সতর্ক আন্তর্জাতিক প্রহরায় এরা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলরূপে নিজেদের রাষ্ট্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভের যোগ্য হয়ে উঠতে সুযোগ পেল।

আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার স্বীকৃত

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ৭৫ থেকে ৯১ ধারাগুলিতে অছি পরিষদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিধিব্যবস্থাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। যে সদস্য রাষ্ট্রগুলি নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য, কিন্তু অছি অঞ্চলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয় সেই রাষ্ট্রগুলি, অছিদার অর্থাৎ অভিভাবক রাষ্ট্র এবং সাধারণ পরিষদের মনোনীত কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যক রাষ্ট্র তিন বছরের জন্য অছি পরিষদের (Trusteeship Council) সভ্য। বর্তমানে অছি পরিষদের সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যা ৬।

অছি পরিষদ ; সংগঠন

অছি-ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত দেশগুলির প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে এই দেশগুলির অছি-প্রশাসক ও জনসাধারণের কাছ থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রাদি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করা অছি-পরিষদের প্রধান কাজ। অছি-তালিকাভুক্ত দেশগুলি এ বিষয়ে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী শাসিত হচ্ছে কিনা তা দেখা এবং প্রয়োজন হলে এই দেশগুলি পরিদর্শন করে এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করাও অছি পরিষদের কাজ।

কার্য

গণতান্ত্রিক পরিচালন-পদ্ধতি অনুযায়ী অছি পরিষদেও প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট থাকে। উপস্থিত সদস্য-রাষ্ট্রগুলির ভোটাধিক্যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই পরিষদ স্বনিয়ন্ত্রিত (auto-regulated), অর্থাৎ, এই পরিষদই ঠিক করে তার সভায় কি ধরনের নিয়মকানুন অনুসরণ করা হবে। পরিষদ দরকার মনে করলে অছি-তালিকাভুক্ত দেশগুলির ও তাদের জনসাধারণের উন্নতিবিধানের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের বা অন্য কোনও সংস্থার সাহায্য নিতে পারে।

ভোটদান ব্যবস্থা

১৯৪৫ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী অছি-পরিষদ স্থাপিত হবার পর থেকে ১১টি দেশ অছি শাসনব্যবস্থার অধীন ছিল—পশ্চিম আফ্রিকায় ৪টি, পূর্ব আফ্রিকায় ৩টি এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ৪টি। সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের সামোয়া দ্বীপপুঞ্জ স্বায়ত্বশাসন লাভ করার পর শুধু দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ছাড়া বর্তমানে অন্য কোনও অছি-শাসিত দেশ নেই। তার মানে এই নয় যে, পৃথিবীর সব দেশই এখন স্বায়ত্ব-শাসিত। তা ছাড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার অছিদার রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকা তার অছি শাসনাধীন এই অঞ্চলটিকে নিজের এলাকার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের অন্তর্গত অছি-শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিধি-ব্যবস্থার ধারাগুলি লঙ্ঘন করার অভিযোগ আনা হয়েছে। বিশ্ব আদালতে এই অভিযোগটি সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার নীতির বিরুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে কোনও কথা বলা হয় নি।

১৯৪৫ সালে অবস্থা কেমন ছিল, এখন কিরকম

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছি-বিষয়ক সূত্রগুলির ত্রুটিগুলির অন্যতম প্রধান ত্রুটি হল : প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থায় অছিদার রাষ্ট্রগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল (strategic area) এবং অন্যান্য অঞ্চল (non-strategic area) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্ব থাকবে। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে সাধারণ পরিষদের কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলটিকে ইচ্ছা করলে অছিদার রাষ্ট্র তার নিজের সামরিক ঘাঁটিরূপে গড়ে তুলতে পারে। অবশ্য, এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি চাই। বলা বাহুল্য, এই ধরনের ব্যবস্থা কোন কোন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে শান্তি ব্যাহত করতে পারে এবং চোরাপথে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশের জন্য প্রশ্রয় দিতে পারে।

(১) "দুটির গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল"—সাম্রাজ্যবাদের খিড়কি দরজা ?

দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ অরগানস্কি (Organski) বলেছেন যে, অছি পরিষদের ভোটদানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কিন্তু অছি পরিষদের অর্ধেক সদস্য অছি এলাকার প্রশাসনিক কর্তৃত্বের ভারপ্রাপ্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রের দ্বারা নির্বাচিত। ফলে, এই তত্ত্বাবধায়ক সদস্য রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী কোন প্রস্তাব অছি পরিষদে গৃহীত হবার সম্ভাবনা নেই। তত্ত্বাবধায়ক রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব থাকলে ত আর কথাই নেই। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার নজির উল্লেখ করা যেতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার অছিদার বা তত্ত্বাবধায়ক রাষ্ট্র। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে স্বায়ত্তশাসনলাভের উপযোগী করে তোলার বদলে আগ্রাসী, বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকা সে অঞ্চলে তার সাম্রাজাবাদী নীতিকে কার্যকর করে বেপরোয়াভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে নিজ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। ১৯৭১ সালে আন্তর্জাতিক আদালত এ বিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে রায় দিয়ে ঘোষণা করেছে যে, অছিদার হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকা অছি আইন ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি লঙ্ঘন করেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণকায় অধিবাসীগণ তাঁদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে "সোয়াপো" (Swapo বা South West Africa People's Organization) নামক গণফৌজ তৈরী করে গণসংগ্রাম চালাচ্ছে এবং নামিবিয়া (Namibia) নামক নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করছে।

অছি পরিষদের ভোটদান পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ ; অছিদার রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী হলে বিপদ ; দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার নামিবিয়ার নজির

তৃতীয়তঃ, অছি সংবিধি (Statute) অনুসারে অছি পরিষদের প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র "বিশেষজ্ঞ" নামক একজন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। কিন্তু অছি আইনে কোথাও এই বিশেষজ্ঞতার কোন সূচক বা মানদণ্ড নির্দেশ করা হয় নি। অছি পরিষদের সদস্য-রাষ্ট্রগুলি স্বাভাবিকভাবেই নিজের নিজের স্বার্থ, মতাদর্শ ইত্যাদি কার্যকর করে তুলতে চেষ্টা করে। এর ফলে অছি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ হতে বাধ্য। রুশ-মার্কিনী ঠাণ্ডা লড়াই এ দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বিপাক্ষিক মেরুকরণের ফলেই ঘটেছে ও ঘটছে।

(৩) অছি সংবিধির ফাঁক

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দ্বারা প্রবর্তিত অছি ব্যবস্থার কার্যাবলীর পর্যালোচনা করে নিকোলাস্ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত টোগোল্যান্ড্, ক্যামেরুন্স্, সোমালিল্যান্ড, টাঙ্গানাইকা, রুয়ান্ডা—উরুন্ডি প্রভৃতি অঞ্চলগুলি অছি পরিষদের সাহায্যেই স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে গড়ে উঠেছে। এর ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যা এর প্রতিষ্ঠার সময়ের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। বিরাট আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠী (Afro-Asian Bloc) জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করে এবং ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের (Third World) নেতৃত্বের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে দিচ্ছে। ফলে গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে মুক্ত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠা বাস্তব ঘটনা হয়ে উঠবে—আশা করা যায়। তবে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার বেআইনী, বেপরোয়া আচরণ পৃথিবীতে নয়া-উপনিবেশবাদের গোপন অনুপ্রবেশের অশুভ ইঙ্গিত। শুধু অছি পরিষদ নয়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমস্ত বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানকেই নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

কার্যাবলীর পর্যালোচনা; নিকোলাসের সিদ্ধান্ত; নয়া-উপনিবেশবাদ : দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নামিবিয়া

॥ আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংস্থা ॥

লীগের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যুগেও তাদের কার্যাবলীর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে, আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংস্থা (International Labour Organization বা সংক্ষেপে I.L.O.) তাদের অন্যতম। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বময় কর্তৃত্বে ও ব্যবস্থাপনায় এই প্রতিষ্ঠানটি নিজের কল্যাণকর ভূমিকা পালনে যাতে আরও সক্রিয় ও সচেষ্ট হয়ে উঠতে পারে, সেজন্য ১৯৪৪ সালের ফিলাডেলফিয়া ঘোষণায় (Philadelphia Declaration) প্রস্তাব গৃহীত হবার পরই এই শ্রমিকসংস্থা ভবিষ্যতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সক্রিয় অংশীদার হবার গৌরব লাভ করল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ৫৭ ধারায় এই সংস্থার কার্যাবলীকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

লীগ্ আমলের ঐতিহ্য

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নানারকম আইনকানুনের প্রচলন সুরু হয়। খনিতে মাটির নীচে কর্মরত শ্রমিকদের, নারী ও শিশু শ্রমিকদের বিশেষ স্বার্থরক্ষার চেষ্টা চলতে থাকে। লীগের সনদের ২৩ (ক) ধারায় পৃথিবীর সব দেশের সকল প্রকার শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার কর্তব্য ও দায়িত্ব প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। ভার্সাই চুক্তির (Treaty of Versailles) ত্রয়োদশ ভাগে এই সিদ্ধান্ত লিখিত হবার ফলেই লীগ্ কর্তৃক এই মহান্ দায়িত্ব পালন সম্ভব হয়েছিল।

ভার্সাই চুক্তির প্রভাব

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার উদ্দেশ্য পালনের জন্য এর বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রের ৪ জন করে প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সাধারণ সভা (General Conference)

গঠিত হয়। এই ৪ জন প্রতিনিধির মধ্যে থাকেন ২ জন সরকারী প্রতিনিধি, ১ জন শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং ১ জন মালিক পক্ষের প্রতিনিধি। সাধারণ সভার দুই তৃতীয়াংশ সদস্য-রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করলে তবেই সভা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। ৪৮ জন সদস্য নিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার একটি পরিচালনা সমিতি (Governing Body) আছে। এই ৪৮ জনের মধ্যে ২৪ জন সরকারী প্রতিনিধি, ১২ জন শ্রমিক প্রতিনিধি, ১২ জন মালিক প্রতিনিধি। পরিচালনা সমিতি সংস্থার আলোচ্য বিষয়সূচী স্থির করে, প্রধান শ্রম পরিচালক নিয়োগ করে, আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর (Intenational Labour office) পরিচালনা করে, বিভিন্ন শাখাদপ্তরগুলিকে নির্দেশ দেয়, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার বাজেট প্রস্তুত করে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার প্রধান কর্মকেন্দ্র সুইজারল্যান্ডের জেনিভা শহরে অবস্থিত।

বর্তমান সংগঠন

পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্রমিক। তাই আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংস্থার দ্বারা শ্রমজীবীদের স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিষ্ঠানটি এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অনেক পত্রপুস্তিকা প্রচার করে থাকে। শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণসাধনের জন্য বহু আইন গ্রহণ করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশে তদনুসারে শ্রমিকস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সেই মর্মে এই প্রতিষ্ঠানটির নির্দেশনায় বহু বিধি ও বিধান রচিত হয়েছে। শিল্প, কৃষি, খনি প্রভৃতি সকল শ্রেণীর শ্রমিকই এতে নানা ভাবে উপকৃত হচ্ছেন। শ্রমিকদের দৈনিক কার্যকালের মেয়াদ স্থির করা, তাদের প্রয়োজনমত বেকারভাতা প্রদান, তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতিসাধন, তাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা প্রভৃতির বিষয়ে আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অধিকতর মনোযোগী। এর ফলে পৃথিবীর অন্ততঃ অর্ধেক জনসংখ্যার জীবনধারণের মান উন্নত হবে। ১৯৪৪ সালের ফিলাডেলফিয়া ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে, পৃথিবীর কোনও একটি দেশে দারিদ্র্য থাকলে তা অন্যত্র উন্নতির পক্ষে বিপজ্জনক ("Poverty anywhere is a danger to prosperity everywhere.")। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দেশনায় শ্রমিক কল্যাণে কর্মরত আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংস্থা এই ঘোষণার কথাগুলি মনে রেখেই কাজ করে চলেছে অনলসভাবে। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, তাদের ব্যক্তিগত সুযোগের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষা, মানুষ হিসাবে শ্রমিকদের আর্থিক ও নৈতিক মান উন্নয়ন—ফিলাডেলফিয়া ঘোষণার এই উচ্চ আদর্শগুলি বাস্তবাকার ধারণ করুক —এটাই প্রার্থনা।

ফিলাডেলফিয়া সভা (১৯৪৪) ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার ভবিষ্যৎ

॥ আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার ॥

পৃথিবীর সব দেশ সমানভাবে উন্নত নয়। একটি দেশ হয়ত পূর্বে কোনও বিদেশী শক্তির কর্তৃত্বাধীন উপনিবেশ রূপে থেকে প্রচণ্ডভাবে শোষিত হবার ফলে স্বাধীনতা

লাভ করেও দারিদ্র্যের অভিশাপে জর্জরিত। ঠিক তার পাশেই হয়ত দেখা যাবে অত্যন্ত উন্নত, শিল্পে ও কৃষিতে সুসমৃদ্ধ একটি রাষ্ট্র। পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে এই অর্থনৈতিক বৈষম্য যতদিন দূর করা না হবে, ততদিন বিশ্বশান্তি স্থাপন প্রকৃত অর্থে সম্ভব নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের রচয়িতাগণ এই কথা মনে রেখেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা স্থাপন করেন। আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার (International Monetary Fund বা সংক্ষেপে I. M. F.) এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন শহরে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার ঠিক পূর্বেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন্-উড্স্ (Bretton-Woods) শহরে আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকব্যবস্থা স্থাপনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপন : আন্তর্জাতিক কোষাগার

সংগঠন

আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডারের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির ১ জন করে প্রতিনিধি থাকেন। তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত একটি পরিচালকমণ্ডলী (Board of Governors) আছে। আসলে ২০ জন বিশেষ নির্দেশক (Executive Directors) এর পরিচালনাকার্য চালিয়ে থাকেন। তাঁরা নিজেদের মধ্য থেকে ১ জন প্রধান পরিচালক (Managing Director) নিয়োগ করেন।

কার্য

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রাব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা, পৃথিবীর দেশগুলির অর্থের একাংশ মজুত রেখে একটি অর্থভাণ্ডার তৈরী রাখা, আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবাধে বেচাকেনার ব্যবস্থা চালু রাখা, ব্যবসারত দেশগুলির মধ্যে বিনিময়ের হার স্থির রাখা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপের মারফত আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার পৃথিবীর উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করে।

॥ বিশ্ব উন্নয়ন ব্যাঙ্ক্ বা বিশ্বব্যাঙ্ক্ ॥

বিশ্ব আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডারের সঙ্গেই ১৯৪৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে স্থাপিত উন্নয়ন ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development বা সংক্ষেপে World Bank) আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডারের একটি অত্যাবশ্যক সহযোগী দপ্তর। আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার বিভিন্ন দেশের অর্থ মজুত রেখে একটি আন্তর্জাতিক কোষাগারের কাজ করে থাকে। বিশ্ব ব্যাংক এই সঞ্চিত আন্তর্জাতিক কোষাগার থেকে বিভিন্ন অনুন্নত ও উন্নতিকামী দেশকে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঋণ দান করে থাকে। আগে পৃথিবীর এক দেশকে আর্থিক বা কারিগরী সাহায্যে জন্য পৃথক্‌ভাবে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হত। এজন্য নানারকম চুক্তি

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন : ঋণদান

সম্পাদিত করতে হত। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্তৃত্বাধীনে বিশ্বব্যাঙ্কিং স্থাপিত হবার ফলে আজ রাষ্ট্রদের এই জাতীয় ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করতে হয় না। বিশ্বব্যাঙ্ক তাদের পক্ষ থেকে এই কাজ করে থাকে। ঋণের সর্ত, সুদের হার প্রভৃতি সবই এই ব্যাঙ্ক স্থির করে দেয়।

আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডারের মত বিশ্বব্যাঙ্কেরও পরিচালনার ভার ন্যস্ত রয়েছে একটি পরিচালক-মণ্ডলীর (Board of Governors) হাতে। আসল কাজ করার জন্য ২০ জন সদস্যযুক্ত নির্দেশক মণ্ডলী (Executive Directors) থাকেন। তবে এই ব্যাঙ্কের পরিচালক-মণ্ডলীতে কোন্ সদস্য-রাষ্ট্রের কতখানি ক্ষমতা ও কত ভোট থাকবে তা নির্ভর করে, সেই রাষ্ট্র কি পরিমাণে এই ব্যাঙ্কের সংগঠনে অর্থ সাহায্য করেছে, তার ওপর। সদস্যরাষ্ট্রদের কার্যকালের মেয়াদ ২ বছর। অন্যান্য ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য যৌথ মূলধনী কারবারের (Joint-stock Company) সঙ্গে বিশ্বব্যাঙ্কের সাংগঠনিক মিল এখানে লক্ষণীয়।

সংগঠন

বিশ্ব ব্যাঙ্কের অন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সংস্থা (International Finance Corporation বা সংক্ষেপে I. F. C.) এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (International Development Association বা সংক্ষেপে I. D. A.)। প্রথম প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে এবং দ্বিতীয়টি ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয়। প্রথম প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রে অবস্থিত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্যদান করতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে বিনিময়যোগ্য দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের একান্ত অভাব। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সংস্থা এই সংকট দূর করতে সাহায্য করার ক্ষমতার অধিকারী। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির অনগ্রসর অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন আজ অনেক সহজ ও বাস্তব। আন্তর্জাতিক উন্নয়নসংস্থার বিশিষ্ট কার্য হল বিভিন্ন ঋণ-গ্রহণকারী রাষ্ট্র যখন অন্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়, তখন সেই ঋণদানের সর্তগুলি ঠিকঠাক করা, ঋণপরিশোধের কাজটি যথাসম্ভব সহজ করে তোলা, সুদের হার সম্পর্কে জটিলতা দূর করা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনগ্রসর অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে এই প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সংস্থা ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা

উন্নয়নশীল বা অনগ্রসর রাষ্ট্রগুলির সাহায্যের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রাষ্ট্রগুলিকে রেলপথ নির্মাণ, রেল ইঞ্জিন, বিমান ইত্যাদি ক্রয়, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন প্রভৃতি যে উন্নয়নমূলক কাজগুলিতে প্রচুর মূলধন প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাঙ্ক অর্থ এবং কারিগরী সাহায্য ইত্যাদি প্রদান করে। ১৯৫৬ সালে আফ্রিকার ইথিও-

কিন্তু ব্যাঙ্কের কার্য

পিয়ার রাজপথ নির্মাণ, ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে বন্দর প্রতিষ্ঠা, মেক্সিকোতে জলসরবরাহ প্রকল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের উদ্যম প্রশংসার দাবী রাখে।

বিশ্বব্যাংককে অনেকে মার্কিনী ধনতান্ত্রিক অর্থাৎ বুর্জোয়া নেতৃত্বের নজির বলে কড়া সমালোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গে সি. এম. ডি. এ. (C. M. D. A. বা Calcutta Metropolitan Development Authority) নামক কলিকাতা পৌর উন্নয়ন সংস্থার সাহায্যের জন্য কংগ্রেস সরকার যখন বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেন, তখন বাম রাজনৈতিক দলগুলি এ ধরনের মার্কিন বিরোধী শ্লোগান দিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারও সি. এম. ডি. এ.-র ব্যাপারে এবং কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহনের (Calcutta State Transport Corporation) উন্নতিকল্পে বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে মোটা টাকা ঋণ গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

বিশ্বব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ : তার জবাব

॥ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসংস্থা ॥

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কিউবার হাভানায় অনুষ্ঠিত এক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্তৃত্বাধীনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসংস্থা (International Trade Organization বা সংক্ষেপে I. T. O.) প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে যুদ্ধে অবতীর্ণ দেশগুলির যুদ্ধকালীন কর্মীগণ বহু ক্ষেত্রে বেকার হয়ে পড়েন। বিভিন্ন দেশ যুদ্ধে বহুলাংশে বিধ্বস্ত হয়। তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপিত হবার ঠিক পরবর্তী স্তরে সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় যুদ্ধকালীন ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ হবার পর নতুন করে আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যকে শান্তিকালীন অবস্থায় ফিরিয়ে আনা এবং যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করা। এই উভয় প্রকার দায়িত্ব পালনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে এর প্রতিষ্ঠার ঠিক পরেই সাহায্য করেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসংস্থা। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার ফলে ও নানা দেশে বিদেশী দ্রব্যাদির অবাধ আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের জন্য নানাপ্রকার শুল্ক চালু থাকার ফলে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সহজ হয় নি। পরবর্তীকালে তাই রাষ্ট্রগুলি ব্যবসা ও শুল্ক সম্বন্ধে সাধারণ চুক্তিতে (General Agreement on Trade and Tariff বা সংক্ষেপে G. A. T. T.) আবদ্ধ হন। একাধিকবার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন অর্থনৈতিক দপ্তরের নির্দেশে ও সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সংকট মোচনের জন্য সভা, সমিতি আহূত হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসার : গাট

॥ আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান সংস্থা ॥

১৯৪৭ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অসামরিক বিমানব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কানাডার অন্তর্গত মন্ট্রিল্ শহরে আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান সংস্থা (International Civil Aviation Organization বা সংক্ষেপে I.C.A.O.) স্থাপিত হয়।

অসামরিক বিমান ব্যবস্থা

আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রদের নিয়ে একটি সভা (Assembly) গঠিত। এই সভা ৩০ জন সদস্য রাষ্ট্র সমেত একটি কর্মপরিষদ (Council) গঠন করে। কর্ম-পরিষদই এই সংস্থার কার্যাবলী পরিচালনা করে এবং সেই উদ্দেশ্যে একজন সাধারণ মহাসচিব (Secretary general) নিয়োগ করে।

সংগঠন

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আজ ব্যাপকভাবে বিমানপরিবহণ ব্যবস্থার সাহায্য নিচ্ছে। ফলে, যাত্রী ও মালপত্র অত্যন্ত দ্রুত স্থানান্তরিত করা সম্ভব। আজকাল বিমানপথে এক দেশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতি নিয়ে বিরুদ্ধ রাষ্ট্রের বেসামরিক বিমান ছিনতাই (Air hijacking)-এর ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। আশা করা যায় যে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহণ সংস্থা এই ধরনের বিমানপোত ছিনতাই বন্ধ করবার চেষ্টা করবে এবং এভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ওপরের আকাশপথে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ বন্ধ করবে। এই সংস্থাটি এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক বিমানচলাচল সম্বন্ধে একই ধরনের নিয়মকানুন চালু করেছে, নানারকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছে, শুল্ক বিভাগীয় নিয়মকানুন সহজ করে রেখেছে, বিভিন্ন দেশের বিমান যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পর্কে কড়া নজর রেখেছে যাতে, তাদের মাধ্যমে সংক্রামক ব্যাধিগুলি বিস্তার-লাভ না করে। সংস্থা উত্তর অ্যাটলাণ্টিক অঞ্চলে একটি "আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র" (Weather Observation Centre) স্থাপন করেছে। বিমানের নিরাপত্তা রক্ষাই এই কেন্দ্রের প্রধান কাজ।

বিমান ছিনতাই রোধ, অন্যান্য কার্য

॥ বিশ্ব ডাকবিভাগীয় সংস্থা ॥

১৮৭৫ সালে সুইজারল্যাণ্ডের বের্ণে (Berne) শহরে গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত বিশ্ব ডাকবিভাগীয় সংস্থা (Universal Postal Union) বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ডাক ব্যবস্থার মারফত যোগাযোগ রক্ষার কাজ সহজ করে দিচ্ছে। এই সংস্থার দপ্তর বের্ণে শহরে এখনও অবস্থিত এবং সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের দ্বারা এটি বিশ্ববাসীদের মধ্যে ডাক যোগাযোগ রক্ষার সংস্থারূপে স্বীকৃত। এই সংস্থাই "আন্তর্জাতিক জবাবী-কুপন" (International Reply Coupon) ব্যবস্থা চালু করে বিশ্ব ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ করে দিয়েছে।

বিশ্বে ডাক ব্যবস্থা উন্নয়ন

॥ আন্তর্জাতিক বেতার যোগাযোগ সংস্থা ॥

১৮৬৫ সালের প্যারিস চুক্তির পরিকল্পনা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বেতার যোগা-যোগ সংস্থা (International Telecommunication Union) আজ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠা হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে নানাভাবে বেতার যোগা-যোগের ব্যবস্থা সহজ ও আবশ্যক করে তুলছে। ফ্রান্সের প্যারিস শহরে এর সদর দপ্তর অবস্থিত।

বিশ্বে বেতার ব্যবস্থা উন্নয়ন

॥ বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা ॥

১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আবহাওয়া সংস্থা (World Meteorological Organization) স্থাপন করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কে নানাপ্রকার গবেষণা করা এবং এই সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচারের জন্য এই প্রতিষ্ঠান খুব মূল্যবান সাহায্য করছে। কৃষিকার্যে, আকাশপথ পর্যবেক্ষণ-নিরীক্ষণে, আবহাওয়া এবং জলবায়ু সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে গবেগণার জন্য এই প্রতিষ্ঠান খুবই সক্রিয়।

বিশ্বের আবহাওয়া বিষয়ে গবেষণা

॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক জরুরী শিশু তহবিল অবস্থা ॥

শিশুরাই বিশ্বের ভবিষ্যৎ সংগঠক। আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে শিশুদের কল্যাণ-সাধনের জন্য জরুরী অবস্থা বিবেচনায় একটি আন্তর্জাতিক তহবিল গড়ে তোলার প্রস্তাব ১৯৪৬ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়। সেজন্য "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক জরুরী শিশু তহবিল ব্যবস্থা" (United Nations Intenational Children's Emergency Fund বা সংক্ষেপে U.N.I.C.E.F.) গঠিত হয়। এই অর্থভাণ্ডারের বর্তমান সংক্ষেপিত নাম—"সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিশুভাণ্ডার" (United Nations Children's Fund) প্যারিসে এই তহবিলের কেন্দ্রীয় দপ্তর।

বিশ্বের শিশুদের জন্য জরুরী তহবিল ব্যবস্থা

এই তহবিল পরিচালনার ভার রয়েছে একটি পরিচালকমণ্ডলীর (Board) ওপর। পরিচালকমণ্ডলী নীতি নির্ধারণ করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিব (Seeretacy-General) এই তহবিল পরিচালনার জন্য একজন প্রশাসক পরিচালক (Executive Director) নিয়োগ করেন। তহবিলের পরিমাণ বছরে প্রায় আড়াই কোটি ডলার।

সংগঠন

জরুরী শিশু তহবিলে জমা অর্থ ব্যয় করার জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে পরামর্শ করা হয়। কারণ, শিশুস্বাস্থ্য, মায়েদের ও সন্তানসম্ভবা নারীদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা বিশ্বস্বাস্থ্য রক্ষার কর্মসূচীর অন্তর্গত। বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে শিশুদের ও মায়েদের রক্ষার জন্য ত্রাণকার্যও এই তহবিল মারফত হয়ে থাকে। হাসপাতাল, প্রসূতিসদন ইত্যাদি নির্মাণ ও পরিচালনাও এই তহবিলের কর্মসূচীর অঙ্গ।

কার্য

॥ আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থা ॥

১৯৫৭ সালে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরে আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থা (International Atomic Energy Ageney, বা সংক্ষেপে, I.A.E A.) স্থাপিত হয়। আণবিক যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সংস্থা স্থাপন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বিশ্ব পরমাণু সংস্থা

এই সংস্থার সংগঠন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সংস্থার মতই—সদস্য রাষ্ট্রগণ একটি সাধারণ সম্মেলন (General Conference) গঠন করে, সম্মেলন ৩৪ জন সদস্য সমেত একটি পরিচালক মণ্ডলী (Board of Governors) গঠন করে এবং পরিচালকমণ্ডলী একজন মুখ্য পরিচালক (Director General) নিয়োগ করে। পরিচালকমণ্ডলীর প্রায় অর্ধাংশ বিদায়ী সদস্যগণ নির্বাচন করে, বাকী সদস্য-রাষ্ট্রদের সম্মেলন নির্বাচন করে। পরিচালকমণ্ডলীর মনোনীত প্রার্থীকে সম্মেলন মুখ্য পরিচালক নিয়োগ করে।

সংগঠন

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ হবার মুখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরের ওপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। ফলে, আধুনিক পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিশ্বজনমত গড়ে ওঠে। এরই প্রতিক্রিয়ারূপে "শান্তির জন্য পরমাণু শক্তিপ্রয়োগ" ("Atoms for Peace") আন্দোলন চলতে থাকে। আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থা এই আন্দোলনের সুমহান উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করতে প্রয়াসী। এজন্য এই সংস্থা বিশ্বব্যাপী নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। এ সংস্থার গবেষণাগুলির সাফল্যের ওপর শান্তির জন্য ব্যাপকভাবে পারমাণবিক শক্তির প্রচলনের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে।

কার্য : পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগ

॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিব ও তার মহাকরণ বা সেরেস্তা ॥

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ সুপরিচালনার জন্য একজন প্রধান নির্বাহক (Chief Executive) থাকেন। যেমন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে প্রধান মন্ত্রীর ও মন্ত্রিসভার কাজকর্ম নির্বাহ করার জন্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীগণ নিযুক্ত হন। এঁদের সম্মিলিতভাবে বলা হয় আমলাতন্ত্র (Bureaucracy বা Civil Service)। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার যে সিদ্ধান্তগুলি সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও নানারকম আইনকানুন গ্রহণের চেষ্টা করেন, কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের উচ্চপদস্থ আই. এ. এস্. (I. A. S.) কর্মচারীগণ সেগুলি শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। তেমনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একজন মহাসচিব বা মুখ্যসচিব (Secretary-General) থাকেন। তিনিই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান কার্যনির্বাহক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ বিশ্বশান্তি সংরক্ষণ সম্পর্কে যে সব প্রস্তাব স্বস্তি পরিষদকে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন, সেগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিব কার্যকরী করে তোলেন। এই বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্য তাঁর একটি মহাকরণ বা সেরেস্তা বা কর্মদপ্তর (Secretariat) আছে।

আন্তর্জাতিক আমলাতন্ত্র ও মহাসচিব

১৯৪৬ সালের সিদ্ধান্ত অনুসারে মহাসচিব বা মুখ্যসচিব স্বস্তি পরিষদের মনো-

নীত এবং সাধারণ পরিষদের দ্বারা ৫ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। সাধারণ পরিষদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে পুনরায় নির্বাচিত করা যায় বা তাঁর কার্যকালের মেয়াদ বাড়ানো যায়।

নির্বাচন-ব্যবস্থা

মুখ্যসচিবের নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বস্তি পরিষদের মোট ১৫ জন সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে অন্ততঃ ৯ জনের সম্মতি আবশ্যক। তার মধ্যে বৃহৎ পঞ্চশক্তির অর্থাৎ স্থায়ী ৫ টি সদস্য-রাষ্ট্রের সম্মতি থাকা চাই। স্বস্তি পরিষদের সুপারিশ সাধারণ পরিষদের উপস্থিত ও ভোটদাতা সদস্য রাষ্ট্রগুলির সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা অনুমোদিত হয়। অবশ্য সাধারণ পরিষদ এ ক্ষেত্রে ইচ্ছা করলে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য-রাষ্ট্রের অনুমোদনের ওপর জোর দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

মহাসচিবের কার্য : (১) সাধারণ প্রশাসনিক ক্ষমতা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিবের—অনেক প্রকার **ক্ষমতা** আছে। প্রথমতঃ, তাঁর সাধারণ প্রশাসনিক ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রশাসনিক আধিকারিক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বৈঠকগুলির নিয়মিত অনুষ্ঠান, বৈঠকের আলোচ্য কর্মসূচী নির্ধারণ, নানাপ্রকার কমিশন বা কমিটি গঠন, তাদের অধিবেশন আহবান তাঁকেই করতে হয়।

(২) রাজনৈতিক ক্ষমতা

দ্বিতীয়তঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ৯৮ ধারা অনুযায়ী মহাসচিব বছরে অন্ততঃ একবার এই প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্বন্ধে বিবরণী দাখিল করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ইচ্ছামত যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সাধারণ পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। সাধারণ পরিষদের সুপারিশ তিনি স্বস্তি পরিষদ পেশ করবেন। এটিকে মহাসচিবের রাজনৈতিক ক্ষমতা বলা যায়।

(৩) জরুরী ক্ষমতা

তৃতীয়তঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ৯৯ ধারা অনুযায়ী মহাসচিব বিশ্বশান্তি ব্যাহত হবার মত যে-কোনও বিষয়ের প্রতি স্বস্তি পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। এটিকে মহাসচিবের জরুরী ক্ষমতা বলা যায়। আইসেলবার্গারের (Eichelberger) মতে, বিশ্বশান্তি সংরক্ষণে এভাবে মহাসচিবের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তৃতীয় উপাদানরূপে কাজ করেন।

(৪) আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বিষয়ক ক্ষমতা

চতুর্থতঃ, ১৯৪৬ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংসদ (Economic and Social Council) ব্যাপকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অনগ্রসর দেশ-গুলিকে অর্থ ও কারিগরী সাহায্য দেবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে ক্ষমতা প্রদান করেন। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে এইজন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিবের কর্তৃত্বে একটি কারিগরী অনুদান বিভাগ (Technical Assistance Board বা সংক্ষেপে T. A. B.) নিয়োগ করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসাবে

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রচুর অনুদান মহাসচিবের মারফত সদস্য-রাষ্ট্রগুলির কাছে পেঁছায়। ফলে, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রভুত ক্ষমতা রয়েছে।

পঞ্চমতঃ, তাঁর প্রযোজক ও সাংগঠনিক সংহতিসাধক ক্ষমতা তাঁর পদটির বিশেষ গুরুত্ব নির্দেশ করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন বিভাগের নথি, দলিল ও কাগজপত্র, পরিসংখ্যান, তথ্য প্রভৃতি তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকে। সেগুলির সংরক্ষণ, বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ তাঁর মারফত হয়ে থাকে। এভাবেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে তিনি সাংগঠনিক সংহতিসাধন করেন।

(৫) সাংগঠনিক ক্ষমতা

ষষ্ঠতঃ, মহাসচিবের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বলতে বোঝায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাৎসরিক ব্যয়বরাদ্দ বা বাজেট প্রস্তুত করা সম্বন্ধে তাঁর ক্ষমতা। তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোষাধ্যক্ষ। সদস্য-রাষ্ট্রগুলির দেয় অর্থ তিনি আদায় করেন ও কোন সদস্য-রাষ্ট্র অর্থ না দিলে তিনি সে বিষয়ে সাধারণ পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

(৬) অর্থনৈতিক ক্ষমতা

সপ্তমতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাকরণ বা সেরেস্তা বা কর্মদপ্তরের তিনি সর্বে-সর্বা নেতা। এই দপ্তরে শৃংখলারক্ষার দায়িত্ব তাঁরই। কর্মচারীগণকে তিনিই নিয়োগ করেন। তাঁরই কেউ শৃংখলা ভঙ্গ করলে তিনি সে ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

(৭) মহাকরণ সম্পর্কিত ক্ষমতা

অষ্টমতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অনেক প্রাক্তন মহাসচিব বিশ্বশান্তি সংরক্ষণের জন্য ও বহু বিবদমান রাষ্ট্রের বিরোধ মীমাংসার জন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই ক্ষমতাকে মহাসচিবের সালিশী ক্ষমতা বলা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, প্রাক্তন মহাসচিব পরলোকগত ডাগ্ হামারশিল্ড্ (Dug Hammarskjoeld) আফ্রিকার কংগো প্রজাতন্ত্রের মর্মান্তিক গৃহযুদ্ধ অবসানের জন্য সক্রিয় ভুমিকা নেন। ভিয়েৎনামে সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ নিবারণের জন্য এবং আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের হিংসাত্মক কার্য-কলাপ প্রতিরোধের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বর্তমান মহাসচিব কুর্ট ভাল্‌ডহাইমের (Kurt Wald-heim) নেতৃত্বও প্রশংসার দাবী রাখে। সুতরাং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের বিভিন্ন ধারা পর্যালোচনা করলে বেশ বোঝা যায় যে, সনদের রচয়িতা রাষ্ট্রনায়কগণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিবকে যেন আগামী দিনের বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার এবং মুখ্য করণিকরূপে অবতীর্ণ হবার জন্য যথোপযুক্ত নেতৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী করে রেখেছেন। এটা মোটামুটি বলা যায় যে, প্রধানতঃ প্রাক্তন মহাসচিবদের দূরদর্শিতা, সহানুভুতি এবং নেতৃত্বের গুণেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সুয়েজ সমস্যা, লেবানন ও জর্ডন সমস্যা, কঙ্গো সমস্যা, কিউবা সমস্যা প্রভৃতি অনেক শোচনীয় হিংসাত্মক ঘটনাবলীকে পৃথিবীতে ব্যাপক-

(৮) সালিশী ক্ষমতা

মহাসচিবের ভূমিকা

ভাবে সম্প্রসারিত হতে বাধা দিয়েছে এবং পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত করে রেখেছে।

॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিবের মহাকরণ বা সেরেস্তা (কর্মদপ্তর) ॥

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ১০০ এবং ১০১ ধারা অনুযায়ী মহাসচিব (U. N. Secretary General) তাঁর মহাকরণের দপ্তরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সক্ষম এবং তৎপর কর্মচারীদের নিযুক্ত করেন। সনদে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর দপ্তরের কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে পৃথিবীর যত বেশী সংখ্যক দেশের কর্মচারীদের মধ্যে থেকে বাছাই করে নিয়োগ করেন, ততই ভাল। এই কর্মচারীগণ যাতে প্রকৃতভাবে সুদক্ষ আন্তর্জাতিক আমলাতন্ত্র গড়ে তুলতে পারেন, সেজন্য এঁদের চাকুরীর ক্ষেত্রে নানারকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়। মহাসচিব নিয়মিতভাবে নানা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর দপ্তরের কর্মচারীদের কাজকর্মের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করেন। ফলে, এখনও পর্যন্ত তাঁর দপ্তর থেকে কোনও কর্মচারী দোষী বা অক্ষম বা দুর্নীতিপরায়ণ বলে শাস্তি পান নি বা চাকুরী থেকে বরখাস্ত হন নি। সাধারণতঃ ২০ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত বয়সের লোকেরাই মহাসচিবের দপ্তরের কর্মচারী হতে পারেন। এঁদের স্থায়ীভাবে, অস্থায়ীভাবে বা চুক্তিবদ্ধ সময়ের মেয়াদে নিযুক্ত করা হয়। কর্মচারীদের ২ বছরের জন্য শিক্ষানবিশী করতে হয়। ১৯৫০ সালে মহাসচিবের দপ্তরের কর্মীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি যৌথ নিয়মানুবর্তন বিভাগ (Joint Disciplinary Committee) গঠন করা হয়। কেবলমাত্র এই বিভাগের নির্দেশেই মহাসচিবের কর্মীদের উপযুক্ত কারণ থাকলে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা যায়। মহাসচিব ও তাঁর দপ্তরের কর্মীগণ সকলেই, বিভিন্ন রাষ্ট্রের দূতাবাসের কর্মীগণ আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যে সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে থাকেন, সেগুলির অধিকারী হন। তদনুসারে তাঁরা যে কোনও রাষ্ট্রের আইনকানুনের ঊর্ধ্বে থাকেন ও সেই রাষ্ট্রের এলাকার বহির্ভূত নাগরিকরূপে পরিগণিত হন। এজন্য কোনও রাষ্ট্র তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা দায়ের করতে পারেন না। যুদ্ধের সময়ে তাঁরা পদাধিকার-বলে নিরপেক্ষ দেশের নাগরিকরূপে বিবেচিত ও সম্মানিত হন। তাঁদের এই অধিকার-গুলিকে রাষ্ট্রিক বহির্ভৌমিত্বের অধিকার (Privilege of Ex-territoriality) বলে।

মহাসচিবের মহাকরণ ঃ সংগঠন

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিবের মহাকরণের কার্যাবলী বিবিধ ও বিচিত্র। প্রথমতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার নথি, দলিল ইত্যাদি প্রস্তুত করা, মহাসচিবের বিবেচনার জন্য সে সব ক্ষেত্রে নানাপ্রকার খসড়া পেশ করা, প্রয়োজনবোধে সেগুলির ব্যাখ্যা, সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সময় দৈনন্দিন কর্মবিবরণী বা "বুলেটিন" (Bulletin) প্রকাশ ইত্যাদি কার্যগুলি মহাসচিবের মহাকরণের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য।

মহাসচিবের মহাকরণের কার্যাবলী ঃ (১) দলিলের খসড়া পেশ ও ব্যাখ্যা, নথিপ্রস্তুত ইত্যাদি

দ্বিতীয়তঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে অসংখ্য কমিশন ও কমিটি রয়েছে, সেগুলিকে সাহায্য করার জন্য তথ্য ও পরিসংখ্যান, সংগ্রহ ও সরবরাহ মহাসচিবের মহাকরণের মারফত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্য সার্বিকভাবে তার মহাসচিবের মহাকরণের কর্মদক্ষতার ওপর নির্ভর করে।

(২) তথ্যসংগ্রহ ও সরবরাহ

তৃতীয়তঃ, জনসংযোগ ও প্রচারের ক্ষেত্রেও মহাসচিবের মহাকরণের অনেক কাজ রয়েছে। এ উপলক্ষে মহাকরণ নানাপ্রকার পত্রপুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করে থাকে। এর ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যাবলীর পক্ষে বিশ্বের শিক্ষিত সমাজে জনমত সুগঠিত হয়।

(৩) জনসংযোগ : পত্রপুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার

চতুর্থতঃ, আন্তঃরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে কারিগরী প্রশিক্ষণ ও বিশেষজ্ঞদের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে অনগ্রসর ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির বিকাশে মহাসচিবের মহাকরণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অতি-আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাকরণের মহাসচিব এ-ক্ষেত্রে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। মহাসচিবের এই ক্ষমতাগুলিই তাঁর মহাকরণের কর্মীগণ তাঁর নির্দেশ-অনুসারে প্রয়োগ করে থাকেন।

(৪) অনগ্রসর রাষ্ট্রদের সাহায্য দান

পঞ্চমতঃ, মহাসচিবের মহাকরণের কর্মচারীগণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন বিভাগের কর্মদপ্তরের কর্মীদের সাহায্য ও উপদেশ দিয়ে তাদের সঙ্গে সংহতি বজায় রাখার চেষ্টা করেন। ফলে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তার সমস্ত বিভাগগুলির ক্ষেত্রে একই আন্তর্জাতিক আদর্শের রূপদানে সক্ষম হয় এবং একটি সুগঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানরূপে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

(৫) জাতিপুঞ্জের বিভাগগুলির কর্মীদের সঙ্গে সংহতিসাধন

ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রশাসকগণ যেমন সকলের অজ্ঞাতে অন্তরালবর্তী থেকে তাঁদের দায়িত্ব সম্পাদন করেন, কূট-নৈতিক দপ্তরের কর্মীগণ যেভাবে কূটনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও সেই নীতিপ্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্তরাল থেকে কাজ করে যান, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিবের মহাকরণের করণিক ও আধি-কারিকগণও সেই রকম অজ্ঞাতনামা কৃত্যকরূপে কর্ম সম্পাদন করে থাকেন। একেই বলে আমলাতান্ত্রিক অজ্ঞাত-পরিচিতি (bureaucratic anonimity)।

(৬) আমলাতান্ত্রিক অজ্ঞাত পরিচিতির নীতি অনুসরণ

॥ আন্তর্জাতিক বিচারালয় ॥

লীগের সনদের ১৪ ধারা অনুযায়ী সর্বপ্রথম একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপন করা হয়। এর আগে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে হেগের চুক্তি অনুযায়ী (Hague Convention, 1899) একটি বিশেষ স্থায়ী সালিশী আদালত (Permanent

Court of Arbitration) স্থাপিত হয়। কিন্তু এই আদালত প্রকৃতপক্ষে 'স্থায়ী' ছিল না। কারণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে তখনই কেবল পৃথক পৃথক বিবাদের মীমাংসার জন্য এই আদালত গঠিত হত। বিবাদের মীমাংসা হলেই এ ধরনের প্রত্যেক স্বতন্ত্র সালিশী বিচারালয় কার্যতঃ নিষ্ক্রিয় হয়ে যেত।

হেগ্ চুক্তি, ১৮৯৯

প্রকৃত আন্তর্জাতিক আদালত লীগের আমলেই হেগ্ শহরে স্থাপিত হয়। তখন এর নাম ছিল আন্তর্জাতিক স্থায়ী বিচারালয় (Permanent Court of International Justice)। এই বিচারালয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃ-রাষ্ট্র বিরোধের মীমাংসা করে। এই বিচারালয়ের আবশ্যকতা অনুভব করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ৯২ ধারা অনুযায়ী এটির পুনর্গঠন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে এই আদালতের নাম আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice বা সংক্ষেপে World Court)।

লীগ্ আমলের ঐতিহ্য

লীগের আমলে এই আদালতে ১১ জন বিচারপতি এবং ৪ জন সহ-বিচারপতি ছিলেন। ১৯৩০ খৃস্টাব্দে সহ-বিচারপতির পদ লুপ্ত করা হয় এবং ১১ জনের বদলে ১৫ জন বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। একজনকে প্রধান বিচারপতিরূপে গণ্য করা হয়। এখনও এই ব্যবস্থা বর্তমান। তবে বর্তমানে বিচারপতিগণ সাধারণ পরিষদ ও স্বস্তি পরিষদের দ্বারা বিভিন্ন রাষ্ট্রদের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হন। কোন রাষ্ট্র থেকে একাধিক বিচারপতি নিযুক্ত হন না। বিচারপতিদের উন্নত চরিত্রের ও আইনবিদ্যার অধিকারী হতে হয়। বিচারপতি নিয়োগ স্বস্তি পরিষদের "ভেটো" সাপেক্ষ নয়। বিচারকগণ ৯ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তাঁদের ৫ জন প্রতি ৩ বছর অন্তর নির্দিষ্ট আবর্তব্যবস্থা অনুযায়ী (by rotation) অবসর গ্রহণ করেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে আবার নিয়োগ করা যায়।

সংগঠন

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সভাপতি-বিচারপতির সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন বিচারপতিকে পদচ্যুত করা যায় না। কোনও বিচারপতি অন্যত্র কোন পদে কাজ করতে পারেন না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন দপ্তরের এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিজস্ব মহাকরণের আধিকারিক ও করণিকগণ বিদেশী দূতাবাসগুলির কর্মীদের মত আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যে বিশেষ অধিকার ভোগ করেন, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতি ও অন্যান্য কর্মীগণও সেই সমস্ত অধিকার ভোগ করে থাকেন। বিচারকগণ ৩ বছরের জন্য সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন করেন। সংশ্লিষ্ট কর্তব্য লঙ্ঘনের বা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সংবিধিগত (Statutory) শর্তাদি লঙ্ঘনের অভিযোগে বিচারপতিকে অভিযুক্ত করা যায়। তবে এ ব্যাপারে অন্যান্য বিচারকদের একমত হতে হবে। কর্মসচিব (Registrar) তখন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত বিচারপতির পদটি শূন্য

বিচারকদের পদচ্যুতি ইত্যাদি

বলে ঘোষণা করবেন। ১৫ জন বিচারপতির মধ্যে ৯ জনের উপস্থিতি এই সংস্থার কাজ চালানোর জন্য আবশ্যকীয় সংখ্যা (কোরাম বা Quoram)।

ইংরাজী ও ফরাসী এই দুটি ভাষা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার (simple majority) ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও বিচারপতিদের মধ্যে কোনও মামলা সম্বন্ধে মতানৈক্য দেখা দিলে প্রধান বিচারপতি সভাপতিরূপে তাঁর নিজস্ব চূড়ান্ত বা নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) দ্বারা সিদ্ধান্ত পাকাপাকিভাবে স্থির করেন। কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নিরপেক্ষভাবে, বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করার জন্য বিচারপতিগণ শপথ গ্রহণ করেন।

ব্যবহার্য ভাষা, সভাপতির চূড়ান্ত ভোট

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে বর্তমানে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও মামলা নিয়ে উপস্থিত হতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ৯৬ ধারা অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ কিংবা স্বস্তি পরিষদ কোনও বিষয়ে বিচারালয়কে উপদেশাত্মক মতামত (Advisory Opinion) প্রকাশ করতে অনুরোধ জানাতে পারেন। তৃতীয়তঃ, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিকার এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে গৃহীত চুক্তি (General Convention on the Privileges and Immunities of the U.N.) অনুযায়ী যখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং এর অন্য কোনও সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের মতামত অবশ্য প্রয়োজন। প্যালেস্টাইনে মধ্যস্থতা করার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রেরিত নেতা কাউন্ট্ বার্নাডোটের (Count Bernadotte) হত্যার পর তাঁর পক্ষ থেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যখন দোষী রাষ্ট্রের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন, তখন আন্তর্জাতিক বিচারালয় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। চতুর্থতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান দপ্তরগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত থাকার ফলে এই দেশের সঙ্গে ভবিষ্যতে কোনও বিরোধ উপস্থিত হলে সেটি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। পঞ্চমতঃ, সুইজারল্যাণ্ডের মত চির-নিরপেক্ষীকৃত রাষ্ট্র (Permanently Neutralised State) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য না হলেও এর সংবিধির (Statute) ৯৩ (২) ধারা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে দরকার হলে কোনও মামলা দায়ের করতে পারে।

কারা মামলা করতে পারেন

বিখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনবিদ্ ব্রিয়ার্লি'র (Brierly) মতে, লীগের আমলে আন্তর্জাতিক স্থায়ী বিচারালয়ের এলাকা বা এক্তিয়ার যে তিনটি ক্ষেত্রে প্রসারিত ছিল, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আমলেও তাই আছে। এলাকাগুলি হল— (১) স্বেচ্ছামূলক (voluntary), (২) বাধ্যতামূলক (compulsory), (৩) ঐচ্ছিক (optional) এবং (৪) উপদেশাত্মক বা পরামর্শদান এলাকা (advisory jurisdiction)।

এলাকা

(১) স্বেচ্ছামূলক

প্রথমতঃ, **স্বেচ্ছামূলক এলাকাক্ষেত্র** অনুযায়ী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রগুলি ইচ্ছা করলে যে-কোনও বিরোধ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দ্বারস্থ হতে পারেন।

(২) বাধ্যতামূলক

দ্বিতীয়তঃ, একাধিক রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে স্বাক্ষরিত কোন চুক্তির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে, কিংবা শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের বিবাদ মীমাংসার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে যে ব্যবস্থাগুলি (Pacific Methods of Settlement of Disputes) উল্লিখিত আছে, সেগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-হিসাবে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থিত হতে বাধ্য। এই বাধ্যতা লীগের আমলে এই আদালতের সংবিধির ৩৫ ধারা অনুযায়ী স্বীকৃত এবং এটাই বর্তমানে **এই বিচারালয়ের বাধ্যতামূলক এলাকাক্ষেত্র।**

(৩) ঐচ্ছিক

তৃতীয়তঃ, **এই বিচারালয়ের ঐচ্ছিক এলাকা ক্ষেত্র** আন্তর্জাতিক আইনের পণ্ডিতদের কাছে বহু-বিতর্কিত। লীগের আমলে এই বিচারালয়ের সংবিধির ৩৬ ধারা অনুসারে যখনই লীগের কোন সদস্য-রাষ্ট্র কোন বিরোধের মীমাংসার জন্য এই বিচারালয়ের দ্বারস্থ হয়ে এর সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে নিজের বাধ্যতা ঘোষণা করতেন, তখনই এই বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে প্রযোজ্য বলে স্বীকৃত হত। এটা বর্তমানেও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ঐচ্ছিক এলাকাক্ষেত্র। নামে "ঐচ্ছিক" এলাকা হলেও কার্যতঃ ও চরিত্রগতভাবে তা "আবশ্যিক এলাকা"। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল যে, এই ঐচ্ছিক এলাকা ক্ষেত্র থাকার জন্যই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ক্ষমতা যথেষ্ট এবং এর জন্যই একে অন্যকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করে থাকেন। বাস্তবিক, আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার ইতিহাসে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ঐচ্ছিক এলাকাক্ষেত্র এত গুরুত্বপূর্ণ যে, **বেশীর ভাগ মীমাংসাই ঐচ্ছিক এলাকাক্ষেত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত** হয়। কিন্তু এটাও একটা মর্মান্তিক সত্য যে, এই ঐচ্ছিক এলাকাক্ষেত্র থাকার ফলে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দ্বারা মীমাংসিত সমস্ত সিদ্ধান্ত সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেগুলি সমানভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রযোজ্য বলে মনে করে না। তাই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের হাতে এর সংবিধি অনুযায়ী অনেক ক্ষমতা থাকলেও এটি এখনও সম্পূর্ণভাবে সফল এবং সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি।

(৪) উপদেশাত্মক বা পরামর্শ দান এলাকা

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের **উপদেশাত্মক ও পরামর্শদান এলাকা** কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি যেমন প্রয়োজন বোধ করলে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের উপদেশ নিতে পারেন, তেমনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ, স্বস্তি পরিষদ ও অন্যান্য বিভাগগুলি বিভিন্ন বিষয়ে আইনগত ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাছ থেকে উপদেশ চাইতে পারেন। তবে পরামর্শদানের সময় বিচারকদের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের শর্তগুলি মেনে চলতে হবে। পরামর্শগ্রহণকারী সংস্থা সেই উপদেশ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য নন।

নানা দিক থেকে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কার্যকলাপের সমালোচনা হয়েছে। প্রথমতঃ, এই বিচারালয়ের সংবিধি-এর কার্যকলাপকে সীমিত করে দিয়েছে। এই বিচারালয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের কোন ব্যাখ্যা করার অধিকারগত যোগ্যতা (competence) লাভ করে নি। তাছাড়া, পরামর্শ গ্রহণ ও তদনুসারে কার্য সম্পাদন উপদেশপ্রার্থীদের ইচ্ছাধীন। ফলে, এই বিচারালয়ের পরামর্শদান এলাকাকে অনেক সময় অসুবিধায় পড়তে হয়।

সমালোচনা ঃ (১) জাতিপুঞ্জের সনদ ব্যাখ্যার যোগ্যতা নেই; পরামর্শদান এলাকা নিষ্ক্রিয়।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে এবং আভ্যন্তরীণ এলাকার (Domestic jurisdiction) নামে বিবদমান রাষ্ট্রগুলি তাদের বিরোধ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাছে যেতে বাধ্য নয়। ফলে, এই বিচারালয়ের স্বেচ্ছাধীন এলাকাও কার্যতঃ সীমিত।

(২) স্বেচ্ছাধীন এলাকাও নিষ্ক্রিয়

তৃতীয়তঃ, বিবদমান রাষ্ট্রগুলি শর্তসাপেক্ষে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের আবশ্যিক এলাকাভুক্ত মামলার ক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে পারে। সুতরাং এই বিচারালয়ের আবশ্যিক এলাকাও প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন।

(৩) শর্তসাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে আবশ্যিক এলাকাও নিষ্ক্রিয়।

চতুর্থতঃ, এই বিচারালয়ের সংবিধিতে এমন কোনও ব্যবস্থা বা মাধ্যমের উল্লেখ নেই, যার ফলে এই আদালত তার সিদ্ধান্তকে বলবৎ করতে পারে। ফলে, আন্তর্জাতিক আদালত সামগ্রিকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের এটি একটি মারাত্মক ত্রুটি।

(৪) নিজ সিদ্ধান্ত বলবৎ করার অক্ষমতা

আসল কথা, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কার্যক্ষেত্র এমনভাবে চিহ্নিত হওয়া উচিত যে, এর সমস্ত সিদ্ধান্তই যেন বিবাদী রাষ্ট্রগুলির দ্বারা চূড়ান্তভাবে গৃহীত এবং অবশ্য-প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়া যায়। তা ছাড়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ এমনভাবে পরিবর্তিত হওয়া উচিত যে, কোনও আন্তঃরাষ্ট্রিক বিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসিত না হলে সেটিকে বাধ্যতামূলকভাবে যেন আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাছে মীমাংসার জন্য পাঠান হয়। তখন এই আদালতের এলাকা হবে সম্পূর্ণভাবে বাধ্যতামূলক। তাহলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু বিবাদ দীর্ঘদিন অমীমাংসিত থেকে এবং ধূমায়িত হয়ে অবশেষে প্রচণ্ড সমরাগ্নির দ্বারা পৃথিবীকে দগ্ধ করতে পারবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে শুধু যে আন্তর্জাতিক বিচারালয়কে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হবে তা নয়, প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকেও। কারণ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে বা তার অধীনস্থ আন্তর্জাতিক বিচারালয়কে আন্তঃরাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়ার অর্থই হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করা। বস্তুতঃ, এই একটি

উপসংহার

মাত্র বিষয়ের মীমাংসার ওপরেই নির্ভর করছে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ।

॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও লীগের মধ্যে তুলনা ॥

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাবনা, এর সনদের প্রথম ধারা প্রভৃতি আলোচনা করলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এই প্রতিষ্ঠানটি এর পূর্বেকার অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশী ক্ষমতাবান। লীগের আমলে এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে আক্রমণ করলে আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনও সম্মিলিত ব্যবস্থা শাস্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব হত না। কারণ এক্ষেত্রে লীগের সনদ অনুযায়ী তৎকালীন বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রত্যেকের সম্মতির প্রয়োজন হত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদেও বর্তমান বৃহৎ পঞ্চশক্তিকে এ অধিকার দেওয়া হয়েছে। সনদের সপ্তম অধ্যায়ে অবশ্য আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নানারকম শাস্তিমূলক সামরিক ব্যবস্থা (Enforcement action) গ্রহণ করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্তৃত্বে যৌথ নিরাপত্তা (Collective Security) রক্ষার দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের হাতে অর্পিত।

লীগের তুলনায় জাতিপুঞ্জ বেশী শক্তিশালী

॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্যের পথে বাধা-বিপত্তি ॥

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে স্বাক্ষরদানের সময়ে বৃহৎ পঞ্চশক্তির মধ্যে যে মতৈক্য, বোঝাপড়া এবং সহযোগিতার ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ তা আজ অনুপস্থিত। বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রত্যেকের হাতে যে ক্ষমতা আছে, তার ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তরফ থেকে স্বস্তি পরিষদ কোন আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে যখনই কোনও যৌথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করে, তখনই বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রত্যেকের এতে সম্মতি থাকা প্রয়োজন। তাঁরা যে কেউ এই যৌথ প্রচেষ্টাকে নাকচ করে সনদ অনুযায়ী তাঁদের "ভেটো" প্রয়োগ করতে পারেন। শুধু যৌথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রত্যেকে এভাবে "ভেটো" প্রয়োগ করার অধিকারী। ১৯৫০ সালে সাধারণ পরিষদ স্বস্তি পরিষদে বৃহৎ পঞ্চশক্তির কারুর দ্বারা ভেটো প্রয়োগ হবার ফলে অচলাবস্থা দূর করার উদ্দেশ্যে "শান্তির জন্য সঙ্ঘবদ্ধতার প্রস্তাব" গ্রহণ করেন। এর ফলে অবশ্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যৌথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পথে আইনগত বাধা দূরীভূত হল। কিন্তু তারপর আইনের ক্ষেত্র অতিক্রম করে বৃহৎ পঞ্চশক্তির অন্তর্গত একাধিক বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে ঘোরতর রাজনৈতিক অসন্তোষ দেখা দিতে লাগল। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই রাজনৈতিক অসন্তোষ ঠান্ডা লড়াই বা স্নায়ুযুদ্ধ (Cold War) রূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোবিয়েত রাশিয়ার সম্পর্ককে তিক্ততম পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল। বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হবার পর ১৯৭১ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সাম্যবাদী চীনা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্যের পথে বাধা ঃ (১) "ভেটো" পদ্ধতি

প্রজাতন্ত্র সোবিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে। তাই আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বদলে ত্রিপাক্ষিক ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। "ভেটো" পদ্ধতিই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্যের পথে প্রথম বাধা।

দ্বিতীয়তঃ, বৃহৎ পঞ্চশক্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজের নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট। এদের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অনিবার্য পরিণতি হল বৃহৎ পঞ্চশক্তির অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির এক একজনের পক্ষে ছোটখাটো অন্য বহু রাষ্ট্রকে নিয়ে জোটবদ্ধতার প্রচেষ্টা। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ৫১ থেকে ৫৪ ধারা অনুযায়ী আঞ্চলিক জোটব্যবস্থা গঠন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মৌল আদর্শের পরিপন্থী নয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি বৃহৎ রাষ্ট্র যখনই অন্য রাষ্ট্রদের নিয়ে জোট বাঁধার চেষ্টা করে, তখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য রাষ্ট্রও অপর কয়েকটি রাষ্ট্র নিয়ে পাল্টা জোট নির্মাণের চেষ্টা করে। এ ধরনের জোট ও প্রতি-জোটের সদম্ভ আস্ফালনের ফলে শুধু যে বৃহৎ শক্তিদের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই দীর্ঘায়িত হয় তাই নয়। এর ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল ভিত্তির ওপরও ধীরে ধীরে আঘাত করা হয়। ১৯৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর আতলান্তিক চুক্তিব্যবস্থা (North Atlantic Treaty Organisation বা সংক্ষেপে N. A. T. O.) গ্রহণ করল। ১৯৫৫ সালে সোবিয়েত রাশিয়া পূর্ব ইউরোপের সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে মার্কিনী জোটবদ্ধতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার নামে পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ' শহরে জোটবদ্ধ হবার চুক্তি (Warsaw Pact) সম্পাদন করল। এ ধরনের জোট-প্রতিজোট ব্যবস্থা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে ঘোষিত যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার (Collective Security) মূলে কুঠারাঘাত করে এবং এ ধরনের প্রচেষ্টা শক্তিসাম্য রক্ষার (Balance of Power) ধ্রুপদী নীতিকেই অতি সঙ্গোপনে ও অত্যন্ত সন্তর্পণে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ছাড়া আর কিছু নয়।

(২) বৃহৎ পঞ্চশক্তির মতানৈক্য

তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোবিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বৃহৎ দ্বিশক্তির দ্বারা ক্ষমতার মেরুকরণের ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদকে পুরোপুরি কার্যকর করে তোলা যাচ্ছে না। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে নামিবিয়ার সংঘর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকার উগ্র বর্ণবিদ্বেষ-নীতি প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে বিবৃত মানবাধিকার রক্ষার শর্ত পালন সম্ভব হচ্ছে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শুধু এ সব ক্ষেত্রে নিন্দাপ্রস্তাব গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই করতে পারছে না। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েত রাশিয়া এই বৃহৎ রাষ্ট্রদুটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠার সময়ে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ককে বজায় রাখতে পারত, তা হলে এ ধরনের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি দেখা দিত না।

(৩) সোবিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ-সংঘাত

দ্বিপাক্ষিক ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিপর্যস্ত। ভারত মহাসাগরে মার্কিনী ঘাঁটি স্থাপন যে অর্থে আন্তর্জাতিক শান্তির ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক, তার পাল্টা জবাব হিসাবে আফগানিস্তানে রুশ কার্যকলাপও সমান উদ্বেগজনক। পশ্চিমী

জোটের সঙ্গে যেমন সমাজতন্ত্রী জোটের পার্থক্য দেখা যাচ্ছে, তেমনি চীনা ও রুশ সম্পর্কের ফাটল (Sino-Soviet rift) সমাজতন্ত্রী দুনিয়াকেও দ্বিধাবিভক্ত করে তুলেছে। ফলে দ্বিপাক্ষিক ঠাণ্ডা লড়াই শুধু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তার সূচনা ঘটিয়েছে, তাই নয়। এর জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে বিশ্বশান্তি বজায় রাখার ও যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করার প্রচেষ্টাও ব্যাহত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ—রুশ সরকারের প্রচ্ছন্ন সম্মতিক্রমে পোল্যাণ্ডের সমাজতন্ত্রী সরকার সেখানকার শ্রমিক-নেতা ওয়ালেসাকে (Walesa) শ্রমিকসংঘ গঠনের স্বাধিকার দিচ্ছে না। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন সরকার রুশ সরকারের ও তার জোটের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে ইউনেস্কোর সদস্যপদ ত্যাগ করেছে। রুশ সরকারও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সামগ্রিক নিরাপত্তা রক্ষার বহু কর্মসূচীর (Collective Security Programme) ক্ষেত্রে "আগ্রাসী" কার্যকলাপ নিরোধে যৌথ ফৌজ পাঠাবার ঘটনাগুলিকে "মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত" বলে নিন্দা করে এবং একাধিকবার এ বাবদ ব্যয়ভার বহন করতে তার অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

বিশ্বের নানা রাষ্ট্র রুশ-মার্কিনী ঠাণ্ডা লড়াইয়ের শিকার : চীনা-রুশ বিরোধ

চতুর্থতঃ, অনেকের মতে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের কতকগুলি ধারাই এই সংস্থাকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। উদাহরণস্বরূপ "ভেটো" ব্যবস্থার নজির দেখানো হয়। বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রত্যেকেই নিজ রাষ্ট্রীয় স্বার্থে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে এমন অনেক নজির আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রভাবক্ষেত্রগুলি (Spheres of influence) প্রসারিত করতে ও সোবিয়েত সম্প্রসারণ রুখতে সচেষ্ট। এর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার দোহাই দিয়ে সোবিয়েত গোষ্ঠীও পাল্টা জবাব দিতে প্রস্তুত। এ কথা ঠিক যে, পৃথিবীর বেশীর ভাগ সম্পদ ধনতন্ত্রী দেশগুলির হাতে রয়েছে। ফলে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার প্রচুর সম্পদ তাদের করায়ত্ত। তাদের প্রাক্তন উপনিবেশগুলির অধিকাংশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠীর প্রভাব বিস্তৃত করলেও ঋণ, কারিগরী সাহায্য ইত্যাদি দানের নামে নয়া-ঔপনিবেশিকতা এখনও সক্রিয়। কিন্তু এই দুর্ঘটনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে জোট-প্রতিজোট ব্যবস্থা অনুসরণ করলে সুবিধাবাদী রাজনীতিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। স্বাধীন ভারতের নেতা জওহরলাল নেহেরুর "জোট নিরপেক্ষতা নীতিই" (Non-alignment with Power-Blocs) একমাত্র গ্রহণযোগ্য নীতি। তৃতীয় বিশ্বকে সুগঠিত করতে হবে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে শক্তিশালী করতে হবে। জাপান ও পশ্চিম জার্মানী আগামী দিনে দুটি "শিল্পদানবে" (industrial demons) পরিণত হতে চলেছে। তাদেরও জোট-নিরপেক্ষ তৃতীয় বিশ্বের আওতায় আনতে হবে। জোট-নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর নেতারূপে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটা বিরাট, সংগঠনমূলক ভূমিকা এখানে লক্ষ্য করা যায়।

(৪) দ্বিপাক্ষিক ঠাণ্ডা লড়াইয়ে "ভেটো" ব্যবস্থার প্রয়োগ

পঞ্চমতঃ, লীগের তুলনায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক শান্তিসংরক্ষণ প্রচেষ্টার অনেক নতুন নতুন বাতায়ন উন্মুক্ত করে দিয়েছে। লীগ্ বিশ্বশান্তি সংরক্ষণ বলতে মনে করত নানা উপায়ে পৃথিবীর বুক থেকে যুদ্ধের কালো ছায়া অপসৃত করে রাখা। আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংস্থা স্থাপনের মারফত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগণকে এক-একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সাধারণ ঐক্যের ভিত্তিতে মিলিত করার চেষ্টা অবশ্য লীগের আমলেই সুরু হয়। কিন্তু এ ধরনের সুমহান্ প্রচেষ্টা আরও ব্যাপকভাবে সুরু করা হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আমল থেকে। তাই ত' দেখি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের রচয়িতাদের দৌত্যের ফলে এমন একটি উন্নততর নতুন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল যার অধীনে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনেস্কো, খাদ্য ও কৃষিসংস্থা, আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দপ্তর বিশ্ব-জনজীবনের বিভিন্নমুখী অভাব-অভিযোগ দূর করে বিশ্ব-মানবাত্মাকে শান্তি ও অহিংসার, প্রেম ও মৈত্রীর পরমার্থের সন্ধান দিল। যতই এই সব বিশিষ্ট দপ্তর নিজেদের পৃথক কার্যকলাপ সুসম্পাদিত করে যাবে, ততই পরিতৃপ্ত হবে বিশ্ব-মানব, ততই অগ্রগামী হবে বিশ্বশান্তি ও সন্তুষ্টির মহান্ আদর্শ।

(৫) যুদ্ধরোধের মতই শান্তি-স্থাপনের অন্য ব্যবস্থাগুলিও তত সফল নয়

ষষ্ঠতঃ, আণবিক যুদ্ধের পীতাভাস আজ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীকে অস্বচ্ছ করে দিচ্ছে। অসীম ধ্বংসক্ষমতা বহন করে আণবিক সমরনীতি মানুষকে এমন ভীত, ত্রস্ত করে তুলছে যে, তাকে আজ স্বদেশের, বিদেশের সকল অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে মিলিত হতে হবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ঠিক এই রকম ব্যবস্থাকেই যৌথ নিরাপত্তাব্যবস্থার আদর্শ গ্রহণযোগ্য নীতিরূপে ঘোষণা করেছেন। আণবিক যুগে ভবিষ্যতে বিশ্ব-শান্তিসংরক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নিরস্ত্রীকরণের (Disarmament) আবশ্যকতা। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নেতৃত্বে এ পথেও অনেক দূর অগ্রসর হওয়া গেছে। ১৯৪৫ সালে জাপানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন প্রথম আণবিক বোমা নিক্ষেপ করল, তখন শোনা যায় যে, বিশ্ববিশ্রুত মার্কিন পদার্থতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক ওপেনহাইমার (Oppenheimer) সভয়ে উপনিষদের ঋষির সেই শাশ্বত বাণী উচ্চারণ করেন—"দত্ত, দাম্যত, দয়ধ্বম্" (দান কর, দমন কর, দয়া কর)। এই সতর্কবাণী শুধু বৈজ্ঞানিকের প্রজ্ঞা এবং মানবতার প্রকাশ নয়, এ হল আগামী দিনের পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কদের কাছে নিক্ষিপ্ত এমন এক অনুজ্ঞা, এমন একটি অনুশাসন, এত দামী একটা মহামন্ত্র, যা সনাতন ও চিরন্তন। কালের যাত্রাপথে মানুষের সঙ্গে মানুষের, জাতির সঙ্গে জাতির, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংঘর্ষ ও সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে যে মহামূল্যবান্ মানবসভ্যতার বিকাশলাভ ঘটেছে অসংখ্য স্তরবিন্যাসের ফলে, ইতিহাসের সেই ধারাবাহিকতা, মানবাত্মার রাষ্ট্রিক থেকে আত্মিক মার্গে উত্তরণের যে ব্যাকুল প্রচেষ্টা, একের মধ্যে বহুর যে বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য, তাকে নিমেষে ধ্বংস করার স্পর্ধা জানাতে চায় আণবিক বোমা। এই স্পর্ধার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য একটিই

(৬) পারমাণবিক সমরের বিভীষিকা

পন্থা মানুষের কাছে বর্তমান। তা হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে আরও শক্তিশালী করে তোলা, তার কল্যাণকর দপ্তরগুলির ব্যাপক কার্যকলাপকে আরও সম্প্রসারিত করা, নিরস্ত্রীকরণের দাবীকে আরও শক্তিশালী করে তোলা।

ভারতে ঋষি বশিষ্ঠের, গৌতম বুদ্ধের, ভগবান মহাবীরের, প্রেমিক চৈতন্যের, গুরু নানকের মতামতের মধ্যে দিয়ে একই বাণী ধ্বনিত হয়েছে। তা হল প্রেমের বাণী। এই বাণী আধুনিক কালে সার্থকভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে গান্ধী-অরবিন্দের কণ্ঠ থেকে। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রও এই আদর্শে স্থিরবিশ্বাসী। তাই দেখা যায় যে, জোটনির্বিশেষে, মতাদর্শনির্বিশেষে ভারত সোবিয়েত রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দুটি ভিন্নপন্থী রাষ্ট্রের মধ্যে সমান আন্তরিকতার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। আজ ভারত আণবিক শক্তির অধিকারী হয়েও বার বার ঘোষণা করছে যে, এ মহাশক্তি সে কাজে লাগাবে শান্তির জন্য, হিংসাত্মক বা ধ্বংসাত্মক কাজে নয়। ভারতে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির বৈচিত্র্যের যে বিচিত্রঐকতান অনুরণিত, তা একের মধ্যে বহুর আবির্ভাবকে (Unity in diversity) অভিনন্দন করেই সুরু হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "ভারততীর্থ" কবিতার বাস্তবরূপ ভারতে, বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে। এই সমন্বয়ের আদর্শই হল ভারতের আদর্শ। ভারত যেন কার্যতঃ একটা ছোটখাট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। একের মধ্যে বৈচিত্র্যের সঞ্জীবন যদি ভারতে সম্ভব এবং সার্থক হতে পারে, তা হলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে তা আরও বড় বহরে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ভারতীয় আদর্শের সার্থক রূপদানের ওপরেই তাই নির্ভর করছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। ভারত যে পথে অগ্রসর হয়ে এসেছে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও সেই পথে এগিয়ে চলুক—এটাই হল পৃথিবীর প্রত্যেক শান্তিকামী, প্রগতিশীল ব্যক্তির অন্তরের আকুতি।

উপসংহার : ভারত শান্তি ও সমন্বয়ের অগ্রদূত ; তাই ভারততীর্থই দিশারী

সারাংশ

ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও সংবদ্ধতার দ্বন্দ্ব থাকলেও শেষে সঙ্ঘবদ্ধতার প্রভাবই কার্যকর। রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্প্রীতির তাগিদও এভাবেই দেখা দিল। বিশ্বজনীনতার আদর্শের ক্রমবিবর্তন ও এই আদর্শের রূপদানের জন্য প্রকল্প রচনা এই প্রবণতার সাক্ষ্য।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমবায় (১৮১৫) ও হেগ্ সভার প্রচেষ্টা (১৮৯৯, ১৯০৭) শক্তিসাম্যনীতির চাপে বাধা পেল। তুর্কী ও অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে জাতীয়তাবাদী সংঘর্ষের ফলে ১ম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা।

জাতিপুঞ্জ (লীগ্ অফ্ নেশনস্) ১ম মহাযুদ্ধের পর স্থাপিত হয়। লীগ্ সনদের ব্যাখ্যা—এ ক্ষেত্রে ১০ ও ১৬ ধারা গুরুত্বপূর্ণ।

বৃহৎ পঞ্চশক্তির অনৈক্যের জন্যই লীগ্ ব্যর্থ হল। এক্ষেত্রেও শক্তি সাম্যনীতিই দায়ী। হিট্লারী অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ২য় মহাযুদ্ধের সূচনা। তাঁর পরাজয়ের পর নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠনের তোড়জোড়। লীগের মূল্যবান অভিজ্ঞতা : শুধু যুদ্ধবিরোধী নয়, সর্বাত্মক শান্তিস্থাপনের মত নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা

চাই। চার স্বাধিকার, আতলান্তিক সনদ ও মস্কো ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপিত হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের প্রস্তাবনায় তার বিশ্বজনীন উদ্দেশ্যগুলি উল্লিখিত। সনদের ২ ধারায় ঘোষিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ৭টি উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান দপ্তর—সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ বা স্বস্তি পরিষদ।

সাধারণ পরিষদ যেন একটি আইনসভা। সেখানকার ভোটদান পদ্ধতি, ক্ষমতা ও কার্যাবলী। পরিষদের কার্যাবলীর মূল্যায়ন—এটি শুধু বিতর্কসভা নয়, এখানে "বিশ্ববিবেকের কণ্ঠস্বর" ধ্বনিত।

স্বস্তি পরিষদের সংগঠন ঃ বৃহৎ পঞ্চরাষ্ট্রের "ভেটো" ক্ষমতা। শান্তিপূর্ণভাবে আন্তঃরাষ্ট্র বিরোধের মীমাংসা না হলে স্বস্তি পরিষদ যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। দ্বিশক্তির ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে এ উদ্যোগের ব্যর্থতার সম্ভাবনা। স্বস্তি পরিষদের অন্যান্য কার্যাবলী।

সাধারণ পরিষদ এবং স্বস্তি পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক—প্রত্যেকের একক ক্ষমতা আছে, আবার যৌথ উদ্যোগে কাজ করার ক্ষমতাও আছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে বিশ্বশান্তিকে বাস্তব, অখণ্ড, সামগ্রিক শান্তিরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা গঠন করা হয়েছে। ব্যাপকভাবে এই উদ্যোগকে সফল করার জন্যও এর অধীনে বহু সংস্থা রাখা হয়েছে। যেমন—খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনেস্কো, অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ব বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান সংস্থা, বিশ্ব ডাকবিভাগীয় সংস্থা, আন্তর্জাতিক বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিশু তহবিল ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা প্রভৃতি।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার গঠন, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর পর্যালোচনা। তার অধীনস্থ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার গঠন, উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলীর সমালোচনা।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিব ও তাঁর মহাকরণ বা সেরেস্তা। মহাসচিবের নির্বাচন-পদ্ধতি, ক্ষমতা ও তাঁর পদের মূল্যায়ন। মহাসচিবের মহাকরণের সংগঠন, কার্যাবলী ও তার মূল্যায়ন।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়—বিচারকদের নিয়োগপদ্ধতি, তাঁদের পদচ্যুতি ও বিচারালয়ের কার্যধারা। বিচারালয়ের এলাকা বা এক্তিয়ার। তার কাজের সীমাবদ্ধতা।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও লীগের মধ্যে তুলনা—লীগের তুলনায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বেশী শক্তিশালী।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ—তার সাফল্যের পথে বাধা—(১) "ভেটো" পদ্ধতি। (২) বৃহৎ পঞ্চশক্তির মতানৈক্য। (৩) সোবিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থসংঘাত ও তার দরুন ঠাণ্ডা লড়াই। (৪) যুদ্ধরোধের মতই শান্তিস্থাপনের জন্য ব্যবস্থাগুলিও তত সফল নয়। (৫) পারমাণবিক সমরের বিভীষিকা।

উপসংহার ঃ ভারত শান্তি ও সমন্বয়ের অগ্রদূত। তাই ভারততীর্থই দিশারী।

৭ নাগরিকতা

"In a democratic society there should be at least two characteristics in the conduct and outlook of all men, first, a sturdy independence and secondly, an imaginative sympathy."

—Delisle Burns

।। "নাগরিক" কথাটির প্রাচীন সংজ্ঞা ।।

নাগরিকের জীবন এবং রাষ্ট্রিক সংগঠন পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। এই সত্যটি বোঝা যায়, যদি প্রাচীন রাষ্ট্রে এবং আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

নাগরিক রাষ্ট্রের প্রধান অঙ্গ

সাধারণ লোকে নগরের অধিবাসীকেই নাগরিক বলে মনে করেন। কিন্তু রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে "নাগরিক" কথাটির অর্থ অনেক ব্যাপক। প্রাচীন গ্রীসের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের অধিবাসীগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং সক্রিয়ভাবে নিজেদের নগররাষ্ট্রে আইন-প্রণয়ন ও শাসন-পরিচালনা করতেন, এমন কি আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের ক্ষেত্রে কোনকোন সময়ে বিচারকের ভূমিকাও গ্রহণ করতেন। তাঁদেরই তখন "নাগরিক" বলা হত। সুতরাং রাষ্ট্রের যে সমস্ত অধিবাসী প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন, তাঁদেরই তখন নাগরিক বলা হত। গ্রীক দার্শনিকদের, বিশেষতঃ আরিস্টটলের লেখায় নাগরিকের এই সংজ্ঞাই পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতেও লিচ্ছবি রাজাদের এবং অন্যান্য এই ধরনের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে নাগরিকের সংজ্ঞা এইরকম ছিল।

প্রাচীন গ্রীসে ও ভারতে "নাগরিক" কথাটির সংজ্ঞা

বর্তমান যুগের জাতিরাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন যুগের নাগরিকত্বের ধারণা অনেক পরিবর্তিত হয়ে গেছে। প্রথমতঃ, প্রাচীনকালে নাগরিকদের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। বিদেশী ছাড়াও ক্রীতদাস এবং কায়িক শ্রমিকগণ নাগরিক অধিকার থেকে বরাবর বঞ্চিত হতেন। গ্রীসে এবং রোমে নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে লিপ্ত থাকার মত অবসর ও সময়ের ব্যবস্থা করে দিত বিরাট এক ক্রীতদাস সম্প্রদায়। পরবর্তীকালে সামন্ততন্ত্রের (Feudalism) যুগে ভূমিহীন কৃষকেরা প্রয়ে গ্রীকযুগের ক্রীতদাসদের মতই নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। "নাগরিক" কথাটির সংজ্ঞা প্রাচীন নগররাষ্ট্র থেকে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের, এককথায় বলতে গেলে প্রাচীন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র থেকে আধুনিক পরোক্ষ গণতন্ত্রের ক্রমবিবর্তনের ফলশ্রুতি।

প্রাচীন ও বর্তমান যুগের নাগরিক : (১) গ্রীক গণতন্ত্রে নাগরিকত্ব সীমিত ছিল

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন নগররাষ্ট্রে নাগরিকদের পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে শহরের কেন্দ্রস্থলে

হাট-বাজারের মত কোন প্রকাশ্য স্থানে মিলিত হয়ে সরাসরি নাগরিক কর্তব্য পালন করা সম্ভব হত। কারণ তখন ছোট ছোট অঞ্চলে অল্প জনসমষ্টি নিয়ে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ আকারের গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র তার বিরাট আয়তন এবং জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত। প্রাচীন রাষ্ট্রের তুলনায় আধুনিক রাষ্ট্রের এই গুণগত পার্থক্য দেখা দিয়েছে বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের সংঘাতে।

(২) আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব ব্যাপক

সুতরাং প্রাচীন কালের নাগরিকের তুলনায় আজকের নাগরিরেক রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রেও চরম গুণগত পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য দেখা দিয়েছে প্রাচীন এবং বর্তমান রাষ্ট্রের মধ্যে সাংগঠনিক (structural) পার্থক্যের জন্য, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকার জন্য। আধুনিক গণতন্ত্র প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তিদের ভোটে নির্বাচিত আইনসভা এবং মন্ত্রিসভা নিয়ে গঠিত।

তৃতীয়তঃ, নীতিগতভাবে আধুনিক গণতন্ত্র অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়-বিচার প্রভৃতি আদর্শের ভিত্তিতে স্থাপিত। প্রাচীন রাষ্ট্র ছিল নগররাষ্ট্র, আধুনিক রাষ্ট্র জাতিরাষ্ট্র। প্রাচীন গণতন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র, আধুনিক গণতন্ত্র হল পরোক্ষ গণতন্ত্র। প্রাচীন রাষ্ট্র ছিল ক্রীতদাসনির্ভর, আধুনিক গণতন্ত্র আদর্শগতভাবে সমতাবাদী। প্রাচীন নাগরিকত্ব ছিল সীমাবদ্ধ, আধুনিক নাগরিকত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যাপক।

(৩) আধুনিক নাগরিকত্ব আদর্শভিত্তিক

॥ "নাগরিক" কথাটির আধুনিক সংজ্ঞা ॥

সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত অধ্যাপক ভ্যাটেল (Vattle) আধুনিক নাগরিক-জীবনের ব্যাপকতার দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে নাগরিক সম্পর্কে একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তা হল এই—সভ্য সমাজের সদস্য হিসাবে সমাজের সঙ্গে যে ব্যক্তিগণ কতকগুলি কর্তব্যসূত্রে আবদ্ধ, রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতার অধীন এবং এর দ্বারা প্রদত্ত সুযোগসুবিধার সমান অংশীদার, তারাই হল রাষ্ট্রের নাগরিক।

ভ্যাটেলের সংজ্ঞা

মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মিলার (Mr. Justice Miller) একটি মামলায় তাঁর রায় দেবার সময় নাগরিক সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাও স্মরণীয়। তাঁর মতে, রাজনৈতিক সমাজের সদস্য হিসেবে যারা রাষ্ট্র গঠন করে, নিজেদের সম্মিলিত ক্ষমতার দ্বারা একটি সরকার স্থাপন করে, অথবা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকারগুলি রক্ষা করার জন্য সেই সরকারের অধীনে থাকে, তারাই হল নাগরিক ("Citizens are members of the political community to which they belong. These are the people who compose the State

মার্কিন বিচারপতি মিলারের সংজ্ঞা

and who, in their associated capacity, have established or subjected themselves to the dominion of their collective rights".)

নাগরিক সম্বন্ধে এই আধুনিক সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ নিঃসন্দেহে নানা প্রকার অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্রের কাছ থেকে লাভ করে থাকেন। রাষ্ট্র সংবিধানে এই অধিকারগুলি নাগরিকদের প্রদান করতে দায়বন্ধ। এগুলি ভোগ করার পথে কেউ বাধা সৃষ্টি করলে রাষ্ট্র তাকে শাস্তি দিয়ে থাকে। এইভাবে আধুনিক রাষ্ট্র নাগরিকদের অধিকার প্রদান করেই ক্ষান্ত হয় না, এগুলি সংরক্ষণের জন্যও চুক্তিবন্ধ।

সংজ্ঞাগুলির তাৎপর্য: রাষ্ট্রের দায়িত্ব

কিন্তু এ হল আধুনিক নাগরিকত্বের একটি দিক, **অধিকারের দিক**। এর অপর দিক হল **কর্তব্যের দিক**। নাগরিককে তার অধিকার ভোগের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রতি, নাগরিকদের পরস্পরের প্রতি অনেক কর্তব্য পালন করতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার, রাষ্ট্রের আইনকানুন মান্য করা, দেশরক্ষার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হওয়া, সমাজের সকলের মঙ্গল-সাধনের জন্য সচেতনভাবে নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করা—এগুলিই হল আধুনিক যুগের নাগরিকের প্রধান প্রধান কর্তব্য। তাই নাগরিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে ল্যাস্কি বলেছেন—সর্বসাধারণের কল্যাণের সুশিক্ষিত বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগই হল নাগরিকত্বের মূল বৈশিষ্ট্য ("Citizenship is the contribution of one's instructed judgment to public good")।

ল্যাস্কির সংজ্ঞায় অধিকার ও কর্তব্যের সমন্বয় হয়েছে

নাগরিকতা সম্পর্কে ল্যাস্কির সংজ্ঞাটি নিয়ে আলোচনা করলে এ সম্বন্ধে গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের (Socrates) এবং প্রখ্যাত ভারতীয় মনীষী ও বাগ্মী বিচারপতি শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর কথাগুলি মনে পড়ে। সক্রেটিস্ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাকেই সার্বভৌম বলে বর্ণনা করেন। জ্ঞানের সার্বভৌমত্ব (Sovereignty of True Knowledge) তখনই দেখা দেয় যখন নাগরিকগণ তাঁদের বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচারশক্তি এবং চিন্তাশীলতা সমগ্র রাষ্ট্রিক পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলেন যে, প্রকৃত দেশ-প্রেম এবং প্রকৃত নাগরিকত্ব একই। এই দুটি ক্ষেত্রেই অপরের ন্যায্য সুখ-সুবিধা নিরাপদ রাখার প্রতি নাগরিকের মমত্ব ও সচেতনতা থাকা চাই। তবেই সে আদর্শ নাগরিক হয়ে ওঠে।

সক্রেটিস্ ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর মতও তাই

॥ আধুনিক শাসনতান্ত্রিক (সাংবিধানিক) আইনে নাগরিকত্ব ॥

আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে সাংবিধানিক

আইন (Constitutional Law)। আবার এই সাংবিধানিক আইনই নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করে থাকে। সুতরাং অধিকার লাভ এবং অধিকার রক্ষা দুদিক থেকেই আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ শাসনতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক আইনের আওতায় (Subjects of Municipal or Constitutional Law) পড়েন।

নাগরিক অধিকার ও সাংবিধানিক আইন

॥ আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে নাগরিকত্ব ঃ নাগরিক ও স্বজাতীয় ॥

বিখ্যাত ইংরেজ আন্তর্জাতিক আইনবিদ্ স্যার জন্ ফিশার উইলিয়াম্স্ (Sir John Fischer Williams) বলেছেন যে, জাতীয়তার মাধ্যমেই নাগরিকত্ব রাষ্ট্রিক সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের আইন বিভিন্ন প্রকার—এই কথা বলে যদি কেউ নাগরিকত্ব অর্থাৎ জাতীয়ত্ব সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আইনের অসংলগ্নতার বা অসম্পূর্ণতার প্রশ্ন তোলেন, তা হলে তিনি আন্তর্জাতিক আইনকে খুবই ছোট করে দেখবেন।

নাগরিকত্ব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত

কোন কোন আন্তর্জাতিক আইনবিদ্ নাগরিক (citizen) এবং স্বজাতীয় (national) এই দুটি বিভিন্ন শব্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। আন্তর্জাতিক আইনে নাগরিককে ব্যক্তি হিসেবে (citizen) ধরা হয়, কিন্তু কোনও দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে সেই দেশের স্বজাতীয়রূপে (national) ধরা হয়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে "নাগরিক" ও "স্বজাতীয়" এ দুটি কথার আইনগত তাৎপর্য একই। "নাগরিক" কথাটি ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগসূত্র রচনা করে। 'স্বজাতীয়' শব্দটি ঐ ব্যক্তির বা ঐ দেশের কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রগুলির যোগসূত্র রচনা করে। একটা রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করলেই কেবল অন্য রাষ্ট্রগুলির কাছে সেই নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের স্বজাতীয়ত্বের স্বীকৃতি এবং পরিচিতি লাভ সম্ভব হয়।

নাগরিক ও স্বজাতীয়ের মধ্যে পার্থক্য

আন্তর্জাতিক আইনে এক রাষ্ট্রের নাগরিককে অন্য রাষ্ট্রে যেতে হলে নিজের রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রদপ্তর থেকে ছাড়পত্র বা পাস্পোর্ট্ (Passport) নিতে হয় এবং সেই সঙ্গে যে রাষ্ট্রে সে প্রবেশ করতে চায়, সেই রাষ্ট্রের অনুমতিপত্র বা ভিসা (Visa) নিতে হয়। এক রাষ্ট্রের নাগরিক বা রাষ্ট্রপ্রধান, দূত, সৈনিক যুদ্ধজাহাজ বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান অন্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত এবং এদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়। অবশ্য তাঁরা সাধারণতঃ অন্য রাষ্ট্রের ফৌজদারী নিয়মকানুনের (Criminal Law) আওতা থেকে মুক্ত নন।

পাস্পোর্ট, ভিসার গুরুত্ব; বিদেশী দূত, যুদ্ধজাহাজ, সৈনিকের বিশেষ অধিকার

অতি-আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে নাগরিকত্ব মানবিক অধিকারের স্তরে উন্নীত হয়ে রাষ্ট্রিক থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মানবিক অধিকারের বিশ্বজনীন সনদ

(Universal Declaration of Human Rights) অনুমোদন করেছে। এই সনদে নাগরিককে রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে তাকে পৃথিবীর মানবসমাজের একজন রূপে অর্থাৎ "পৃথিবীর নাগরিক" (Citizen of the World) রূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই সনদে বিশ্বমানবসমাজের নাগরিক-রূপে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, শ্রেণী, ভাষা নির্বিশেষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাগরিকের অধিকার সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণতঃ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যে সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে থাকেন, সেগুলি বিশ্বমানবসমাজের নাগরিকদের মানবিক অধিকাররূপে স্বীকৃত হয়েছে। কতকগুলি অতিরিক্ত অধিকার এর সঙ্গে মানবিক অধিকাররূপে সংযুক্ত হয়েছে। যেমন—রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার ফলে কোনও দেশের মুক্তিসংগ্রামের নেতা যদি নিজের দেশের শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার থেকে মুক্ত হবার জন্য অন্য কোন দেশে আশ্রয়প্রার্থী হন, তাহলে তিনি আশ্রয় পাবার অধিকারী হবেন।

নাগরিকত্ব ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার

॥ "নাগরিক" কথাটির সঙ্গে কতকগুলি কথার তুলনাঃ নাগরিক, স্বজাতীয়, প্রজা, বিদেশী ॥

নাগরিক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে কতকগুলি শব্দের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। স্থূল অর্থে একই রাষ্ট্রের একজন নাগরিক অপর নাগরিককে "স্বজাতীয়" (National বা Compatriot) বলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণে **"নাগরিক"** এবং **"স্বজাতীয়"** কথাদুটির তাৎপর্য এক নয়। স্বজাতীয় হলেই কেউ সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হন না। যতদিন ভারত ইংরেজ সরকারের অধীনে ছিল, ততদিন ভারতীয়রা ব্রিটিশ্-স্বজাতীয় বলে বিবেচিত হতেন, কিন্তু ব্রিটিশ্ নাগরিকরূপে বা স্বাধীন নাগরিকরূপে কোন অধিকার ভোগ করতেন না। যতটুকু অধিকার তাঁরা ভোগ করতেন, ততটুকু কেবল ইংরেজ সরকারের আনুকূল্যে। আবার, বর্তমানে ভারত কমন্ওয়েল্থ্ নামক সমিতির সদস্য-রাষ্ট্র। এই সমিতির শীর্ষে আছেন ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী। সুতরাং ভারতীয় নাগরিকগণ অধিকন্তু কমন্ওয়েল্থ্ নাগরিকত্ব (Commonwealth citizenship) লাভ করে থাকেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ভারতীয় নাগরিকগণ ইংলণ্ডেরও বা অন্য কোনও কমন্ওয়েল্থ্ দেশেরও নাগরিক। আন্তর্জাতিক আইনের সূক্ষ্ম বিচারে "স্বজাতীয়" কথাটির দ্বারা বোঝায় এমন কোনও ব্যক্তিকে যে কোনও বিশেষ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, কিন্তু সে রাষ্ট্রের পূর্ণ নাগরিক অধিকার ভোগ করে না। "নাগরিক" ও "স্বজাতীয়" কথাদুটির এই শব্দগত সমার্থকতা আইনের চক্ষে গোলমালের সৃষ্টি করতে পারে। তাই অনেকে মনে করেন যে, "স্বজাতীয়" কথাটির পরিবর্তে "দেশবাসী" কথাটি অথবা "রাষ্ট্রের বাসিন্দা" এই বাক্যাংশটির প্রয়োগ অনেক সার্থক। রাষ্ট্রের বাসিন্দা হিসাবে কিছু কিছু অধিকার

"নাগরিক" এবং "স্বজাতীয়" কথাদুটির মধ্যে পার্থক্য

লাভ করলেও সেই ব্যক্তি কেবল নাগরিকরূপেই সম্পূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে থাকেন। শুধু "দেশবাসী" হিসাবে যাঁর পরিচয়, তাঁর ভোটাধিকারের মত রাজনৈতিক অধিকার নাও থাকতে পারে। সংশ্লিষ্ট দেশে বসবাসকালে সেই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনই তাঁর একমাত্র কর্তব্য। এর পরিবর্তে তিনি ঐ রাষ্ট্রের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেতে পারেন। কিন্তু "সাহায্য" এবং "অধিকার" এক নয়।

"নাগরিক" কথাটির সঙ্গে অনেকে "**প্রজা** (*Subject*) কথাটির পার্থক্য কল্পনা করে থাকেন। নাগরিক বলতে যদি শুধু ভোটাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বোঝায় এবং অবশিষ্ট স্বজাতীয়দের "প্রজা" বলে অভিহিত করা হয়, তা হলে প্রজাদের সম্পূর্ণ নাগরিকত্ব থাকে না। কিন্তু এ ধরনের চিন্তাধারা ভ্রান্ত। "নাগরিক" এবং "প্রজা" কথাদুটি সমার্থক। এ দুটি কথার দ্বারাই পূর্ণ নাগরিকত্ব বোঝায়। আন্তর্জাতিক আদালতে রাষ্ট্রের ভোটাধিকার পাবার অধিকারই নাগরিকত্বের সূচক, কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক হবার ফলে এই অধিকার প্রয়োগে অসমর্থ ব্যক্তিদেরও স্থিত-নাগরিকত্বের (potential citizenship) অধিকারী বলে ধরে নেওয়া হয়।

"নাগরিক" ও "প্রজা" কথা দুটির পার্থক্য

অনেকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে অথবা একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী ব্যক্তিদের সকলকেই "প্রজা" আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এঁদের সকলেই সেই রাষ্ট্রের নাগরিক নাও হতে পারেন—এই রকম যুক্তি দেখিয়ে কেউ কেউ "নাগরিক" এবং "প্রজা" কথাদুটির মধ্যে পার্থক্য দেখাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই যুক্তিও ঠিক নয়। ইংলণ্ডের মত দেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত। সেখানে "নাগরিক" এবং "প্রজা" কথাদুটির রাজনৈতিক ব্যাখ্যা একই অর্থ বোঝায়। তবে "প্রজা কথাটির সঙ্গে রাজতন্ত্রের ছাপ আছে মনে করে উগ্র গণতান্ত্রিক ব্যক্তিগণ এই কথাটি ব্যবহার করতে চান না। রাজ এবং স্বরাজের সংঘাতের ইতিহাসের সঙ্গে অনেক বেদনার স্মৃতি জড়িত। তাই "প্রজা" কথাটি রাজতান্ত্রিক অর্থে গণতন্ত্রের সমর্থকগণ প্রয়োগ করতে অনিচ্ছুক। তাঁরা মনে করেন যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমস্ত স্বাধীন ব্যক্তিই নাগরিক, তাঁরা ভোটদানের অধিকারী হন বা নাই হন।

"প্রজা" কথাটি রাজতান্ত্রিক

"নাগরিক কথাটির সঙ্গে "**বিদেশী**" (Alien) কথাটির পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সকলেই একমত। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই বিদেশী দূতাবাস থাকে এবং কোন কোন দেশে কিছু বিদেশী ব্যবসায়ীও থাকেন। সাময়িকভাবেও অনেক বিদেশী কোন রাষ্ট্রে পর্যটক (Tourist) হিসাবে আশ্রয় নেন। কিন্তু কোনও রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যে সমস্ত অধিকার ভোগ করে থাকেন এবং সেই রাষ্ট্রের প্রতি কতকগুলি কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যেভাবে দায়বদ্ধ থাকেন, বিদেশীরা সেভাবে অধিকার ভোগ করেন না বা অন্য রাষ্ট্রে বসবাসকালে সেই রাষ্ট্রের প্রতি তার নাগরিকদের মত কর্তব্য সম্পাদনে বাধ্য থাকেন না।

"নাগরিক" ও "বিদেশী"র মধ্যে পার্থক্য

নাগরিক এবং বিদেশী উভয়েই কোনও রাষ্ট্রে বসবাসকালে বাক্‌স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতি সমান সামাজিক অধিকার ভোগ করে থাকেন। কিন্তু নাগরিকরা নিজেদের রাষ্ট্রে সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে থাকেন, বিদেশীরা করেন না। যেমন ভারতে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিক আইনসভার নির্বাচনে ভোটদাতারূপে বা সদস্য-প্রার্থী রূপে অংশগ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু দূতাবাসস্থ কোনও মার্কিন নাগরিক ভারতের কোনও আইনসভার নির্বাচনে এভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। এর কারণ হল, ভারতীয় নাগরিকের আনুগত্য ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের আনুগত্য তাঁর দেশের প্রজাতন্ত্রের প্রতি।

উভয়ের আনুগত্য বিভিন্ন

আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রেও এই রাষ্ট্রিক আনুগত্যের পার্থক্যের দরুন নাগরিক এবং বিদেশী উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য দেখা যায়। আন্তর্জাতিক আইনে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উপাদান হল তার প্রতি স্থায়ী আনুগত্য প্রদর্শনকারী জনসাধারণ। ঐ রাষ্ট্রের প্রতি এদের আনুগত্য এক হলেও ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দুরকমের—স্থিত (potential) এবং বাস্তব (real)। কিন্তু এই নাগরিকত্ব কেবল একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সভ্যরূপেই চিহ্নিত। তাই এক রাষ্ট্রের নাগরিক বিদেশীরূপে অন্য রাষ্ট্রের সভ্যরূপেই চিহ্নিত। তাই এক রাষ্ট্রের নাগরিক বিদেশীরূপে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধীন নন। এজন্যই চীনা প্রজাতন্ত্রে বসবাসকারী কোনও মার্কিন নাগরিককে চীনা সরকার তার সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করতে পারে না। একই যুক্তিতে সাধারণতঃ দূতাবাসের অধিবাসী বিদেশীগণ, বিদেশী জাহাজের নাবিক, ঐ জাহাজের বিদেশী মালপত্র, অন্য কোনও দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, বিদেশী সেনাবাহিনীর সভ্যগণ—এ সমস্তই অন্য কোনও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের এক্তিয়ারের বাইরে। অর্থাৎ অন্য কোনও রাষ্ট্রের আদালতে এঁদের নিয়ে কোনও মামলা দায়ের করা চলে না। অবশ্য বিদেশীদের ক্ষেত্রে তাঁরা যে রাষ্ট্রে বসবাস করছেন সেই রাষ্ট্রের আইন মেনে চলার প্রাথমিক কর্তব্য পালন যাতে সহজ এবং অব্যর্থ হতে পারে, সেজন্য ঐ রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের অস্থায়ী আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়। শুধু এই কারণেই তাঁরা বিদেশী রাষ্ট্রের ফৌজদারী আইনকানুনের (Criminal Law) বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য, তার বেশী নয়।

আন্তর্জাতিক আইনে "নাগরিক" ও "বিদেশী"র মধ্যে পার্থক্য

আন্তর্জাতিক আইনে সকল নাগরিক অধিকারকেই মানবিক অধিকার (Human Rights) বলে ধরে নেওয়া হয়। সুতরাং কোনও রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত হয়, সেগুলির প্রায় সবগুলিই নাগরিক এবং বিদেশী সকলেই সমানভাবে ভোগ করে থাকেন। আবার, আন্তর্জাতিক আইনে বিদেশীদের জীবন, ধনসম্পত্তি ইত্যাদি রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের প্রতিও কঠোর

নাগরিক ও বিদেশী দুজনেরই মানবাধিকার এক

দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যদি কোনও বিদেশী কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তা হলে তাঁর ক্ষতির অনুপাতে রাষ্ট্রকে যথোচিত ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

॥ নাগরিকত্বলাভের উপায় ॥

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মানবিক অধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণার প্রস্তাবে সম্মতি দেবার ফলে "নাগরিক" কথাটি বর্তমানে রাষ্ট্রিক সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। "মানবিক অধিকার" রূপে এই অধিকারগুলি সাধারণতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে "নাগরিক অধিকার" হিসাবে প্রচলিত ও স্বীকৃত। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনে নাগরিককে দেশ, কাল উর্ধ্ব ব্যক্তি হিসাবে অর্থাৎ বিশ্বমানবসমাজের একজন সভ্য হিসাবে ধরা হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি নাগরিকত্ব লাভের ক্ষেত্রে এক ধরনের নিয়মকানুন মেনে চলে না। তাই নানা রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব অর্জনের নীতিগুলি নানা রকমের। এই নীতিগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) জন্মগত নাগরিকত্বের নীতি (Law of natural citizenship) এবং (২) অর্জিত বা আত্মীকৃত বা দেশীয়কৃত নাগরিকত্বের নীতি (Law of naturalised citizenship)। প্রথম ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি জন্মসূত্রে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে সে যে রাষ্ট্রের নাগরিক ছিল না, কৃত্রিম উপায়ে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পায়। প্রথম নীতিটির ক্ষেত্রে সকল রাষ্ট্রে একই বিধি প্রচলিত নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলি সাধারণতঃ একই ধরনের কতকগুলি নিয়ম মেনে চলে।

নাগরিকত্ব লাভ মানবাধিকাররূপে বিশ্বব্যাপ্ত ; তবুও নাগরিকত্ব দুটি উপায়ে লভ্য : জন্মগত, অর্জিত

বিভিন্ন রাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবে নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে কেন বিভিন্ন আইনকানুন মেনে চলে, সে প্রশ্নের উত্তরে আন্তর্জাতিক আইনবিদ্‌গণ দুটি কারণ নির্দেশ করেন। প্রথমটি হল ব্যক্তিগত প্রভুত্বের নীতি (Law of Personal Supremacy)। দ্বিতীয়টি হল আঞ্চলিক প্রভুত্বের নীতি (Law of Territorial Supremacy)। ব্যক্তিগত প্রভুত্বের নীতি অনুসরণ করে আধুনিক রাষ্ট্র জন্মগত অধিকারের নীতি (Jus Sanguinis) প্রয়োগ করে। আঞ্চলিক প্রভুত্বের বিধি অনুসরণ করে আধুনিক রাষ্ট্রগুলি জন্মস্থান নীতি (Jus loci অথবা Jus soli) প্রয়োগ করে। তবে এই দুটি প্রয়োগক্ষেত্রেই সাধারণভাবে নাগরিকের "জন্মের" ওপর তার নাগরিকত্ব অর্জন নির্ভর করে থাকে।

জন্মগত ও জন্মস্থানগত নাগরিকত্ব : আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যা

জন্মগত অধিকারের নীতি অনুযায়ী ব্যক্তির পিতামাতার নাগরিকত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সাধারণতঃ, পিতৃত্বের দাবিকেই এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে পিতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক, সন্তান যদি সেই রাষ্ট্রে জন্ম গ্রহণ না করে, তবুও সে পিতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক সেই রাষ্ট্রের নাগরিকরূপেই গণ্য হবে। ফ্রান্সে এই নীতি অনুসরণ করা হয়।

জন্মগত অধিকারের নীতি

জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী জন্মভূমির ওপর ভিত্তি করে নাগরিকত্ব স্থির হয়। এই নীতি অনুসারে কোন ব্যক্তি যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে, তাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলে গণ্য করা হয়, তার পিতামাতা জন্মগত নীতির সূত্রে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হলেও। আন্তর্জাতিক আইনবিদ্‌গণ এক্ষেত্রে "জন্মস্থান"কে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। যেমন, কোনও রাষ্ট্রের জাহাজ বা তার নিজস্ব কোনও বিমানপোত তার নিজের সার্বভৌম এলাকা বলেই পরিগণিত হয়। আর্জেন্টিনার প্রজাতন্ত্র এই নীতি অনুসরণ করে।

জন্মস্থানগত নীতি

এক একটি রাষ্ট্র নাগরিকত্ব দানের জন্য পূর্বে উল্লিখিত দুটি আইনের এক একটি অনুসরণ করলে এ বিষয়ে হয়ত খুব বেশী জটিলতার সৃষ্টি হত না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোন কোন রাষ্ট্র একই সঙ্গে জন্মগত নীতি ও জন্মস্থানগত নীতি অনুসরণ করে থাকে। ইংলণ্ড্‌ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত কোনও বিদেশীর সন্তানকে নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে দুটি নিয়মই অনুসরণ করে থাকে। ভারতের রাষ্ট্রপতি আবার যে কোনও রাষ্ট্রের নাগরিককে "বিদেশী নন" বলে ঘোষণা করতে পারেন। সুতরাং বহু ক্ষেত্রে একাধিক নাগরিকত্বের (Plural Citizenship) নীতি প্রচলিত। এর ফলে নাগরিককে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। যেমন, যুদ্ধের সময় যদি কোনও ব্যক্তিকে একই সঙ্গে একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক বলে ধরা হয়, তা হলে ঐ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ লাগলে সে বিপদে পড়তে পারে। কারণ, যুদ্ধের সময় কোন রাষ্ট্র শত্রুপক্ষীয় রাষ্ট্রের নাগরিককে আটক করে রাখতে পারে। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে এ ধরনের বহু নাগরিকত্বের সমস্যার মীমাংসার ব্যবস্থা হয়েছে। যেমন, এই ধরনের নাগরিক সাবালক হয়ে স্থির করতে পারে—সে কোন্‌ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করতে চায়। অথবা সে ঐ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যে রাষ্ট্রের সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষা, চাকুরী, বসবাস প্রভৃতির ফলে অধিকতরভাবে জড়িত, সেই রাষ্ট্রেরই নাগরিকরূপে পরিচিতি দাবি করতে পারে। এই রকম নাগরিকত্বকে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে কার্যকর নাগরিকত্ব (Effective Citizenship) বলে।

দুটি ক্ষেত্রেই বহু-নাগরিকত্বের সম্ভাবনা ও সে সমস্যার সমাধান

নাগরিত্ব লাভের প্রথম প্রকার নীতি অর্থাৎ জন্মগত নাগরিকত্বের নীতি সম্পর্কে এতক্ষণ আলোচনা করা হল। এবার দ্বিতীয় প্রকার নীতি অনুযায়ী, অর্থাৎ অর্জিত বা আত্মীকৃত বা দেশীয়কৃত নাগরিকত্বের নীতি নিয়ে আলোচনা করা যাক। কতকগুলি শর্ত পালন করে কৃত্রিম উপায়ে নাগরিকত্ব অর্জন করাই অর্জিত নাগরিকত্বের মূল তাৎপর্য। বিদেশী নাগরিক অন্য রাষ্ট্রে এই শর্তগুলির কোন একটি পালন করলে তবেই সে নতুন রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করে আত্মীকৃত নাগরিক হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, এহেন বিদেশীর নতুন রাষ্ট্রের নাগরিকত্বলাভ ঐ নতুন রাষ্ট্রটির অনুমোদনসাপেক্ষ। কৃত্রিম উপায়ে প্রাপ্ত এ রকম নাগরিককে অনুমোদনসিদ্ধ বা

অর্জিত বা আত্মীকৃত নাগরিকত্বলাভের বিভিন্ন শর্ত

আইনসিদ্ধ নাগরিক (Naturalised citizen) বলে। এই কৃত্রিম উপায়ে নাগরিকত্ব-লাভ সাধারণতঃ যে শর্তগুলির ওপর নির্ভর করে, সেগুলি হল (ক) দীর্ঘদিন কোন স্থানে বসবাস (Domicile); (খ) বিবাহ; (গ) বৈদেশিক রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী করা বা ঐ রাষ্ট্রের অধীনে সৈনিকরূপে কাজ করা, (ঘ) বিদেশে সম্পত্তি ক্রয় করা এবং (ঙ) অন্য কতকগুলি শর্ত পালন করা।

প্রথমতঃ, দীর্ঘদিন এক রাষ্ট্রে বসবাস করার ফলে নাগরিকত্ব লাভ করা যায়। এই বসবাসের কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই। তবে বসবাসের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে কোনও বিদেশী, সে যে রাষ্ট্রে বসবাস করে তার স্বরাষ্ট্রবিভাগের কাছে আবেদন করে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা জানাতে পারে। স্বরাষ্ট্রদপ্তরের আপত্তি না থাকলে তাকে অর্জিত নাগরিক বলে ধরা হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশীকে নতুন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করতে হলে সেই রাষ্ট্রের আদালতের কাছে আবেদন করলেও চলে। অনেক সময় তাকে নতুন রাষ্ট্রের ভাষাভাষী হতে হবে। ভারত এবং ইংলণ্ডে বসবাসের সময়সাপেক্ষ শর্ত (Condition of Domicile) অনুযায়ী অন্ততঃ ৪ বছর কোন বিদেশীকে এই রাষ্ট্রে বসবাস করতে হবে। উপরন্তু ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষা ও ভারতের ক্ষেত্রে সংবিধানের সংশোধিত অষ্টম তফ্‌সিলের অন্তর্ভুক্ত ১৫ টি ভাষার যে কোন একটিতে জ্ঞান থাকা দরকার। অনেক সময় নির্দিষ্ট কয়েকবছর বসবাসের শর্ত পালনের পর বিদেশীকে নতুন রাষ্ট্রের নাগরিক হতে হলে ভবিষ্যতেও তার এই রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের ইচ্ছা আছে সে কথা সেই রাষ্ট্রকে জানাতে হয়।

শর্তগুলির ব্যাখ্যা ঃ (১) দীর্ঘ-কাল বসবাসের শর্ত

দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী আজকাল ধরে নেওয়া হয় যে, কোনও মহিলা বিবাহের পর তাঁর স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন। কিন্তু এই সহজ, সরল নীতিটি গড়ে ওঠার পেছনে আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত জটিল প্রশ্ন জড়িত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনেক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আদালতে বহু বাগ্‌বিতণ্ডার ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কারণ, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিবাহের পর নারীর নাগরিকত্বের প্রশ্নটি নিয়ে এখনও অনেক রকম পরস্পরবিরোধী আইন প্রচলিত। এই নিয়ে অনেক জটিলতা দেখা দিয়েছিল এবং তার মূল কারণ সব ক্ষেত্রে একই—বিবাহিতা নারীর বহু-নাগরিকত্ব থাকার সম্ভাবনা।

(২) বিবাহ

বিবাহিতা নারীর নাগরিকত্বের সমস্যাটি আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন খুব সুস্পষ্টভাবে মীমাংসা করেছে। ঠিক এইভাবেই সংশ্লিষ্ট অনুরূপ একটি প্রশ্নের সদুত্তর দিয়েছেন আধুনিক যুগের আন্তর্জাতিক আইনবিদ্‌গণ। পৃথিবীর বহু দেশে অনেক অবৈধ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অনেক রাষ্ট্রে এরকম হতভাগ্য সন্তানদের নাগরিকত্ব নিয়ে কোনও স্পষ্ট বিধান থাকে না। ফলে পূর্বে এই ধরনের

বিবাহিতার ও অবৈধ সন্তানের নাগরিকত্ব ঃ আন্তর্জাতিক "কার্যকর নাগরিকত্ব নীতি"

সন্তানগণ নাগরিকত্ববিহীন বলে বিবেচিত হত। কিন্তু আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে এই সমস্যাটিরও সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী অবৈধ সন্তান যে রাষ্ট্রে লালিতপালিত হবে বা শিক্ষালাভ করবে অথবা চাকুরি করবে এবং এভাবে দীর্ঘদিন যে রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত থাকবে, তাকে সেই রাষ্ট্রের অর্জিত নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক আইন কার্যকর নাগরিকত্বের নীতি (Law of Effective Citizenship) প্রয়োগ করে থাকে।

(৩) বৈদেশিক রাষ্ট্রে চাকুরী বা সৈন্যরূপে নিযুক্তি

বৈদেশিক রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী করা কিংবা ঐ রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে সৈনিক রূপে যোগদান করার ফলে অনেক রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনুমোদনসিদ্ধ বা বিধিগত নাগরিকত্ব দিয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্দিষ্ট সময় বসবাসের পর কোনও বিদেশী যদি নির্দিষ্টকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে চাকুরি করে, কিংবা সেখানকার সৈন্যবাহিনীতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করে থাকে, তা হলে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক বলে গণ্য হবার যোগ্যতা অর্জন করে।

(৪) বিদেশে সম্পত্তিক্রয়

বিদেশে সম্পত্তি ক্রয় করার ফলে কোনও কোনও রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট বিদেশীকে কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে অর্জিত নাগরিকত্ব প্রদান করে থাকে। পূর্বে মালয় দ্বীপপুঞ্জের কতকগুলি উপনিবেশে বিদেশীদের এই অধিকার দেওয়া হত। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঐ জনবিরল উপনিবেশগুলির লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা। অতি-আধুনিক কালে এইভাবে বিদেশীদের অর্জিত নাগরিকত্ব লাভের তেমন নজির পাওয়া যায় না।

বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের জয়ী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ এখন অসম্ভব

পূর্বে কোন রাষ্ট্র কোনও অঞ্চল জয় করলে বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের নিজের রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব দেবার ব্যবস্থাটিকে অর্জিত নাগরিকত্ব লাভের একটি প্রচলিত, আইনসিদ্ধ ব্যবস্থা বলে স্বীকার করা হত। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের (United Nations Charter) ১(১) ধারা অনুসারে প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ যে সে অন্য রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব কখনও ক্ষুণ্ণ করবে না। এর প্রস্তাবনাতেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যুদ্ধ-বিরোধী ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা তার অছি-শাসনভুক্ত এলাকার অন্তর্গত দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে (বর্তমান নামিবিয়াকে) নিজের এলাকার অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টার জন্য বিশেষভাবে নিন্দিত। আন্তর্জাতিক আদালতে এ সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে মতামত ব্যক্ত হয়েছে। এ সমস্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, কোনও রাষ্ট্রের দ্বারা অন্য কোনও রাষ্ট্রের বলপূর্বক অন্তর্ভুক্তির ফলে অন্তর্ভুক্ত এলাকার ব্যক্তিদের নতুন রাষ্ট্রের অর্জিত নাগরিকত্বলাভের কোনও সম্ভাবনাই বর্তমানে নেই।

॥ নাগরিকত্বপ্রাপ্তির জন্য প্রচলিত আইনকানুনের সমালোচনা ॥

নাগরিকত্ব প্রাপ্তি সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নীতি বিভিন্ন ধরনের। শুধু আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের ফলেই এই রাষ্ট্রিক আইনকানুনগুলি কিছুটা অভিন্নতার সূত্রে গ্রথিত হয়েছে।

অর্জিত নাগরিকত্ব

সাধারণতঃ আইনসিদ্ধ নাগরিকদের স্বাভাবিক নাগরিকদের থেকে অভিন্ন বলে কল্পনা করা হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্জিত নাগরিকের মানমর্যাদা এই রাষ্ট্রের জন্মসূত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত নাগরিকদের মানমর্যাদা থেকে কিছুটা নিম্নতর। কারণ, কোনও কৃত্রিম উপায়ে স্বীকৃত মার্কিন নাগরিক এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অথবা উপরাষ্ট্রপতির পদের জন্য প্রার্থী হতে পারেন না। এই পদগুলি কেবল এই রাষ্ট্রের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নাগরিকত্বের অধিকারী ব্যক্তিরাই পেতে পারেন। মার্কিন সাংবিধানিক আইনের ভাষ্যকারগণ অবশ্য উভয় প্রকার মার্কিন নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই বৈষম্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূর্ণ নাগরিকত্ব (Grand Citizenship) এবং আংশিক নাগরিকত্ব (Partial Citizenship) এই নীতিদুটির অবতারণা করেছেন। এই দুটি নীতি অনুযায়ী তাঁরা জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকদের পূর্ণ নাগরিক বলে এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকদের আংশিক নাগরিক বলে চিহ্নিত করেছেন। ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি রাষ্ট্রে জন্মগত এবং অনুমোদনসিদ্ধ এই দুই শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও এই মার্কিনী ব্যাখ্যা প্রচলিত।

মার্কিনী, ফরাসী ও বেলজিয়ামের ক্ষেত্রে অর্জিত নাগরিকত্ব সীমিত

ইংলণ্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে চাকুরীপ্রার্থী বিদেশীদের অনুপ্রবেশ ও বসবাস নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত অভিবাসন বিধি (immigration laws) রচিত হয়েছে, সেগুলি নিয়ে দেশে বিদেশে বাগ্‌বিতণ্ডার অন্ত নেই। এ প্রশ্নগুলির সঙ্গে প্রায়ই বর্ণবৈষম্যের নীতি জড়িত থাকে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঘোরতর বিদ্বেষ ও অশান্তি দেখা দিতে পারে। রাষ্ট্রিক নাগরিকত্বের প্রশ্নটি শেষে মানবিক অধিকারের প্রশ্নরূপে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আশা করা যায় যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্তৃত্বে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা অথবা মানবিক অধিকার সংস্থার মত কোনও প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে সক্রিয়ভাবে ব্যবস্থা করে যাবে।

এর সঙ্গে বিদেশী রাষ্ট্রে চাকুরী, অভিবাসন নীতি ইত্যাদি জড়িত

॥ নাগরিকত্বের বিলুপ্তি ॥

যদি নাগরিকত্ব লাভের উপায়গুলিকে প্রাপ্তিসূচক হিসাবে গণ্য করা হয়, তা হলে ঐগুলিকেই আবার নাগরিকত্বের বিলুপ্তির নেতিবাচক সূচকরূপে বর্ণনা করা যেতে

পারে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি খুব সহজে বোঝান যাবে। ধরা যাক, কোন নাগরিক প্রকৃতপক্ষে জন্মসূত্রে ফ্রান্সের নাগরিক। সে হয়ত কিছুদিন হল্যান্ডে বসবাস করার পর সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দারূপে কৃত্রিম উপায়ে আইনসিদ্ধ নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য হল্যান্ডের কাছে আবেদন করল। এ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষে সে জন্মসূত্রে ফ্রান্সের নাগরিক, আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্থায়ী বসবাসের দোহাই দিয়ে সে হল্যান্ডের আইনসিদ্ধ নাগরিক। নাগরিকত্ব অর্জনের দুটি উপায়ই এ ক্ষেত্রে কার্যকর হল বটে, কিন্তু এদের একটি কার্যকর হল তার নাগরিকত্ব অর্জনের সূচক হিসাবে, অপরটি কার্যকর হল তার নাগরিকত্ব বর্জনের সূচক হিসেবে। অর্থাৎ একই উপায়গুলি ক্ষেত্রবিশেষে নাগরিকত্ব অর্জনের এবং নাগরিকত্ব বর্জনের উপলক্ষ্য হিসাবে কার্যকর। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাপকতর ব্যাখ্যায় এই ঘটনাকে নাগরিকত্বের বিলুপ্তি বলে মনে না করে নাগরিকত্বের পরিবর্তন-রূপে ব্যাখ্যা করা হয়। এগুলি হল, প্রথমতঃ, দীর্ঘকাল স্বদেশের বাইরে বাস করার ফলে নাগরিক যেমন একদিকে তার আগের নাগরিকত্ব হারায়, অপরদিকে সে নতুন রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দারূপে নতুন নাগরিকত্ব অর্জন করে। কোনও কোনও সময়ে একটি রাষ্ট্রের বাইরে দীর্ঘদিন থাকলে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব স্বতঃই বিলুপ্ত হয়। আগে নাগরিকত্বের এই ধরনের পরিবর্তন পূর্বতন রাষ্ট্র স্বীকার করত না। কিন্তু আজকাল কেউ যদি অন্য রাষ্ট্রে দীর্ঘকাল বসবাস করে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করতে চায়, তা হলে পূর্বতন রাষ্ট্র এতে আর আপত্তি করে না। শুধুমাত্র দরখাস্ত জমা দিয়ে রেজিস্ট্রির দ্বারা আদালতের অথবা স্বরাষ্ট্রদপ্তরের মত শাসনবিভাগীয় কোনও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করলেই যথেষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে **ভারত** একটি বিশেষ নিয়ম মেনে চলে। এই আইন অনুসারে কোন নাগরিক স্বেচ্ছায় অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে তাকে পূর্বের রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে আর মেনে নেওয়া হয় না।

নাগরিকত্ব অর্জনের বা বর্জনের উপলক্ষ্যগুলি একই

(১) বিদেশে স্থায়ী বসবাস

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে ধরে নেওয়া হয় যে, বিবাহের পর বিবাহিতা নারী তার পূর্বের রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব হারায়। এর অর্থ হল যে, বিবাহিতা নারীর জন্মগত নাগরিকত্ব লোপ পায় এবং সে তার স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে বিবেচিতা হয়।

(২) বিদেশীর সঙ্গে বিবাহ

তৃতীয়তঃ, প্রাচীন গ্রীসে নিয়ম ছিল যে, রাজনৈতিক কারণে বা দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অথবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে অনেক ব্যক্তিকে রাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত বা বহিষ্কৃত করা হত। আধুনিক যুগে অবশ্য এ ধরনের নজির পাওয়া যায় না। তবে অনেক ক্ষেত্রে এ রকম নাগরিক নিজের রাষ্ট্র থেকে পলায়ন করলে সে যদি অন্য রষ্ট্রের আশ্রয় (asylum) লাভ করে, তাহলে সে তার পূর্বের রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব

(৩) বিদেশে আশ্রয়লাভ

আপনা-আপনি (ipso facto) হারায়। বর্তমানে মানবাধিকার সম্পর্কে বিশ্বজনীন ঘোষণায় (Universal Declaration of Human Rights) এক রাষ্ট্র পরিত্যাগ করার পর অন্য রাষ্ট্রের আশ্রয়লাভের অধিকার মানবিক অধিকাররূপে স্বীকৃত হয়েছে।

(৪) সৈন্যদল থেকে পলায়ন

চতুর্থতঃ, নিজের রাষ্ট্রের সৈন্যদল থেকে পলায়ন (desertion from the army of the State) আইনের চক্ষে রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল। এ রকম ক্ষেত্রে কোন নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ না করলেও নিজের রাষ্ট্রের এলাকার বাইরে তার নাগরিকত্ব আপনা-আপনি লোপ পায়।

(৫) বিদেশী সৈন্যবাহিনীতে বা অন্য কোথাও চাকুরী, বিদেশে জমিক্রয় ইত্যাদি

পঞ্চমতঃ, বিদেশী সৈন্যবাহিনীতে চাকুরি গ্রহণ করলে বা অন্য কোনও চাকুরি গ্রহণ করলে অথবা জমি ক্রয় করলেও নাগরিক স্বেচ্ছায় তার পূর্বের নাগরিকত্ব বর্জন করে নতুন রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে পরিগণিত হতে পারে। তা ছাড়া ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের মত কোন কোন রাষ্ট্রে শিক্ষাসংক্রান্ত উপাধি ছাড়া অন্য কোনও রাষ্ট্রের প্রদত্ত অন্য উপাধি কোন নাগরিক গ্রহণ করতে পারেন না। এর সাংবিধানিক তাৎপর্য হল এই যে, কোন নাগরিক কোন বিদেশী সম্মানচিহ্ন গ্রহণ করলে তার নাগরিকত্ব লোপ পায়।

আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন রক্ষাকবচ

নাগরিকত্ব লোপের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাতে কোনরূপ বিপদের সম্মুখীন না হন, সেজন্য আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে ব্যবস্থা আছে যে, কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পূর্বের নাগরিকত্ব বহাল থাকবে। এই বিধান প্রচলিত হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিকত্বের বিলুপ্তি নিয়ে কোনও জটিলতা সৃষ্টি হবার অবকাশ নেই।

॥ ভারতীয় সংবিধান অনুসারে নাগরিকত্ব লাভ ॥

(১) সংবিধান চালু হবার সময় স্বীকৃত ব্যবস্থা

ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকত্ব লাভ সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি বলবৎ আছে। সেগুলি হল—প্রথমতঃ, ২৬ শে জানুয়ারী, ১৯৫০ তারিখে সংবিধান চালু হবার সময় ভারতের অধিবাসীদের কারুর ভারতে জন্ম হলে অথবা তাদের কারুর পিতা বা মাতার ভারতে জন্ম হলে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা স্থায়ীভাবে ভারতে বাস করতে রাজী হলে সেই ব্যক্তিরা ভারতের নাগরিক।

(২) এর আগে যারা জাত

দ্বিতীয়তঃ, এই তারিখের আগে যারা অন্ততঃ ৫ বছর ভারতের স্থায়ী অধিবাসী ছিল, ও যারা ভবিষ্যতেও ভারতে স্থায়ীভাবে বাস করতে ইচ্ছুক, তারাও ভারতের নাগরিক।

তৃতীয়তঃ, যারা ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাইয়ের আগে পাকিস্তান ত্যাগ করে

ভারতে এসেছে, তাদের পিতামাতা, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহীদের কেউ অবিভক্ত ভারতে জাত হলে বা স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস করে থাকলে সেই ব্যক্তিরা ভারতীয় নাগরিক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই থেকে ভারত সরকার আইন করেন যে, পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে হলে সরকারের কাছে জানাতে হবে যে, আবেদনকারী অন্ততঃ ৬ মাস ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা।

(৩) পাকিস্তান প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা

চতুর্থতঃ, অন্য কোন দেশের বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করতে ইচ্ছুক হলে তারও পিতামাতা, পিতামহ-পিতামহী মাতা-মহীর মধ্যে অন্ততঃ একজনের অবিভক্ত ভারতে জন্ম হওয়া চাই। আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট বিদেশে স্থিত ভারতীয় দূতাবাসের সুপারিশ নিয়ে আসতে হবে।

(৪) বিদেশী বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা

॥ ভারতীয় নাগরিকত্ববিধি (১৯৫৫) ॥

ভারতে নাগরিকত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন (Citizenship Act, 1955) বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই আইনের ৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, সাধারণভাবে জন্মগত সূত্রে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে বা তার পরে, যারা ভারতে জাত, তাদের পিতা ভারতীয় হলে তারা ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু ঐ সময়ে ভারতে বৈদেশিক দূতাবাসের কর্মীদের সন্তানগণ ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও তারা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবে না। অনুরূপভাবে, শত্রুপক্ষীয় রাষ্ট্রের বা ঐ অঞ্চলে জাত ব্যক্তিগণ জন্মগত সূত্রে এই সময়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবার অধিকারী নয়।

নাগরিক পিতার সন্তান ভারতীয় নাগরিক

১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনে আরও বলা হয়েছে যে, কৃত্রিমভাবে তালিকাভুক্তির (Registration) দ্বারাও ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করা যাবে। তালিকাভুক্তির জন্য যোগ্য-প্রার্থীদের মধ্যে পড়ে (১) অবিভক্ত ভারতে বসবাসকারী ভারতীয়গণ ; (২) ভারতে বসবাসকারী যারা তালিকাভুক্তির আবেদনের পর অন্ততঃ ৬ মাস ভারতের বাসিন্দা ; (৩) যে নারী ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে বিবাহিতা ; (৪) ভারতীয় নাগরিকদের যে সমস্ত সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক নয় ; (৫) ইংলণ্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কার মত কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক বাসিন্দাগণ।

অর্জিত নাগরিকত্ব লাভের উপায়

১৯৫৫ সালের আইনে দেশীয়করণ পদ্ধতিকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তবে কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে এই দেশীয়করণ বলবৎ হবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, বিশ্বমৈত্রী প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণীদের পক্ষে শর্তগুলি শিথিল করার নীতিও ভারত সরকার অনুসরণ করেন।

দেশীয়করণ পদ্ধতি স্বীকৃত

১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, এই আইনটি বিশেষভাবে উদারপন্থী। এই আইনের পশ্চাতে রয়েছে মানবতা ও বিশ্বজনীনতার আদর্শ। নাগরিকত্ব যেভাবেই অর্জিত হোক না কেন, ভারতীয় সংবিধান অনুসারে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের যে কোনও উচ্চ পদে যে কোন নাগরিক প্রার্থী হতে পারেন।

আইনটি উদার, মানবিক, বিশ্বজনীন

॥ ভারতীয় নাগরিকত্ব লোপ সংক্রান্ত আইন (১৯৫০)॥

১৯৫০ সালে ভারত সরকার ভারতের নাগরিকদের নাগরিকত্বলোপের কারণগুলি বিধিবদ্ধ করেন। ভারতীয় নাগরিকত্ব লোপ সংক্রান্ত এই আইন অনুসারে যে কারণগুলির জন্য কোন ভারতীয়ের নাগরিকত্ব লুপ্ত হবে, সেগুলিহল—প্রথমতঃ, অপর কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভারতীয় নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হয়।

লুপ্তির কারণ ঃ (১) বিদেশে নাগরিকত্ব লাভ

দ্বিতীয়তঃ, সরকারী অনুমোদন, তালিকাভুক্তি (Registration) বা কৃত্রিম পদ্ধতি অনুসারে নাগরিকত্ব অর্জনকারী ব্যক্তি যদি ভারতীয় সংবিধান বলবৎ হবার তারিখের (২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০) এবং আইনসিদ্ধ নাগরিকত্ব (Citizenship by naturalisation) অর্জনের প্রাথমিক পর্যায়ের আবেদনের তারিখের (৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫) মধ্যবর্তী সময়ে স্বেচ্ছায় অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তা, হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভারতীয় নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হয়।

(১) স্বেচ্ছায় বিদেশে নাগরিকত্ব গ্রহণ

তৃতীয়তঃ, যে ব্যক্তি সরকারী অনুমোদনক্রমে বা তালিকাভুক্তির ফলে ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করেছে, সে ব্যক্তির এজন্য অসদুপায় অবলম্বনের দোষ প্রমাণিত হলে, বা সে রাষ্ট্রদ্রোহিতা করলে, বা ভারতের সঙ্গে যুদ্ধরত শত্রুপক্ষের কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে সহায়তা করলে, বা নাগরিকত্ব লাভের ৫ বছরের মধ্যে কোন রাষ্ট্রে দু বছরের জন্য সে বন্দী থাকলে, অথবা ৭ বছর একটানা ভারতের বাইরে সে বসবাস করলে ও ঐ সময়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব বজায় রাখার ইচ্ছা স্পষ্টভাবে প্রকাশ না করলে তার ভারতীয় নাগরিকত্ব খারিজ হয়ে যায়।

(৩) নাগরিকত্ব খারিজের কতকগুলি কারণ

॥ সুনাগরিকতা ঃ তার প্রতিবন্ধক, সেগুলি দূর করার উপায় ॥

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য চাই গণতান্ত্রিক নাগরিক, অর্থাৎ সুনাগরিক (good citizens)। লর্ড ব্রাইস সুনাগরিকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, যদি কোন নাগরিকের বিচারবুদ্ধি, সংযম ও বিবেকবোধ থাকে, তাহলে তাকে "সুনাগরিক" আখ্যা দেওয়া যায়। প্রখ্যাত বাগ্মী, বিচারপতি পণ্ডিত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও ব্রাইসের মত সমর্থন করেছেন। কিন্তু সাধারণের কাছে চারিত্রিক উৎকর্ষের এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই লম্বাচওড়া বুলি বলে মনে হয়। আমরা চতুর্দিকে মূল্যবোধের দারিদ্র্য, চরিত্রের অবক্ষয়, অপসংস্কৃতির দাপট দেখতে এত অভ্যস্ত যে, জানতে ইচ্ছা হয় সুনাগরিকত্বের

সুনাগরিক সম্বন্ধে ব্রাইস ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর সংজ্ঞা

সূচক এই গুণগুলি কেন বিকশিত হচ্ছে না, কেন গণতন্ত্র সম্পূর্ণ সফল হতে পারছে না। এ ক্ষেত্রেও ব্রাইসের বিশ্লেষণ আমাদের সাহায্য করতে পারে।

৩ রকম বাধা

ব্রাইস্ বলেছেন যে, ঔদাসীন্য (Indolence), ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা (Private self-interest) এবং দলবাজি (Party spirit) সুনাগরিকতার পথে প্রধান অন্তরায়।

(১) ঔদাসীন্য ঃ তার কারণ

জনগণের ঔদাসীন্যের বিভিন্ন কারণ হিসাবে ধরা হয়—রাষ্ট্রের বিশালতা ও নাগরিকের জীবিকা অর্জনের তাগিদ। আধুনিক রাষ্ট্রের আকার অস্বাভাবিকরূপে বিরাট হবার ফলে তুলনামূলকভাবে নাগরিক নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করে। তার ক্ষুদ্র-মন্যতা, তার হতাশা, বিহ্বলতা, অসহায়তা তার ঔদাসীন্যেরই অভিব্যক্তি। সে যেন গোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র—সকলের কাছ থেকেই বিচ্ছিন্ন (alienated)। উপরন্তু দৈনন্দিন তৈলতণ্ডুলের দুশ্চিন্তা মানুষকে ক্ষণে ক্ষণে অভাবের তাড়নায় তাড়িত, পীড়িত, অস্থির করে তোলে। অপরের কথা, অন্য কিছু প্রসঙ্গ ভাববার অবকাশ তার কোথায় !

(২) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা

ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা নাগরিককে সংকীর্ণচেতা, লোভী, বেপরোয়া করে তোলে। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে সে ছল, চাতুরী, মিথ্যা, অন্যায় সব কিছুরই আশ্রয় নিতে ইতস্ততঃ করে না। মানুষের কর্তব্যবোধ নষ্ট হয় ; নিজের ছোট্ট গণ্ডীর বাইরে সে অন্য কিছু ভাবতে পারে না। ফলে নাগরিকের কর্তব্যবোধ যেমন শ্লথ হয়, দুর্নীতির পথ পরিহার করার নৈতিক ও সামাজিক বাধাগুলির (moral and social restraints) চাপ তার কাছে ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসে।

(৩) দলবাজি

নির্লজ্জ দলবাজি মানুষকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করে। গণতন্ত্র রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে, নিশ্চয়ই। কিন্তু তা হল সুস্থ দলব্যবস্থা। এর বদলে যা দেখা যায় তা হল সংকীর্ণ, বিকৃত দলব্যবস্থা। দলবাজদের কাছে দল বড়, দেশ বড় নয়। তারা জাতীয় স্বার্থের চেয়ে দলীয় স্বার্থকেই বড় করে দেখে। আবার, তাদের অনেকেই দলীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বার্থকে চরিতার্থ করতেও চেষ্টা করে। এজন্য দলবাজরা নানারকম ধোঁকাবাজি, ধান্ধাবাজী ও ধাপ্পাবাজীর আশ্রয় নেয়।

এ বাধাগুলি দূর করার উপায় সম্বন্ধে ব্রাইসের উপদেশ (১) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রব্যবস্থা

ব্রাইসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই তিনটি কারণ দূর করতে পারলেই সুনাগরিকতার পথে বাধাগুলি দূর করা সহজ হবে এবং গণতন্ত্রও অধিকতর সফল হতে পারবে। ব্রাইস্ ও অন্যান্য রাজনীতিবিদ্‌গণ এ ব্যাপারে কতকগুলি প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রথমতঃ, সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানের মত গণউদ্যোগ, গণভোট প্রভৃতি কতকগুলি ব্যবস্থা থাকা দরকার। তবে ল্যাস্কি, ফাইনার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে এ ধরনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা ছোট রাষ্ট্রের পক্ষেই প্রযোজ্য। তা ছাড়া র‍্যাপার্ডের

মতে সুইজারল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সাফল্যের পেছনে এমন কতকগুলি বিশেষ কারণ আছে যেগুলির উপস্থিতি অন্য রাষ্ট্রে আশা করা যায় না।

(২) গান্ধীবাদীদের প্রস্তাব

দ্বিতীয়তঃ, গান্ধীবাদীগণ মনে করেন যে, মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন না ঘটাতে পারলে নাগরিককে সচেতন সুনাগরিক করে গড়ে তোলা যাবে না। তাঁরা স্বনির্ভর সর্বোদয় সমাজ গড়ে তুলতে চান, গ্রামীণ অর্থনীতি, ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্পের উন্নতির মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য দূর করে সত্যাগ্রহী নাগরিক তৈরী করতে চান।

(৩) মার্ক্সবাদীদের মত

তৃতীয়তঃ, মার্ক্সবাদীগণ মনে করেন যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থাৎ শ্রেণীবিহীন সমাজ স্থাপিত না হলে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের আত্মীয়তাবোধকে আরও বাস্তব করে তোলা যাবে না। মেহনতী শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ধনিক শোষকশ্রেণীর উচ্ছেদের দ্বারাই তা সম্ভব।

(৪) রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যা—শিক্ষাবিস্তার রাজনৈতিক সামাজিকীকরণকে সহজ করবে

চতুর্থতঃ, নিরক্ষতা দূরীকরণের দ্বারাই নাগরিকদের মনকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করা যাবে এবং সে তখন ক্রমশঃ দেয়ালের বাইরে স্থিত বৃহত্তর জগৎ সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহী হবে। সে বুঝতে পারবে যে, কিনু গোয়ালার গলিই পরিপূর্ণ ভূভারত নয়। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ববিদ্দের (Political Sociologists) কাছে তাই মূল সমস্যাটি হল রাজনৈতিক অংশগ্রহণের (Political Participation) মধ্য দিয়ে জনগণকে কিভাবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের (Political Socialisation) পথে আকৃষ্ট করে তোলা যায় তা স্থির করা। সুষ্ঠু জনমতগঠনের জন্য সেজন্য অনেকে এ ক্ষেত্রে জনসংযোগ মাধ্যমগুলিকে ইংলণ্ডের বি বি সির মত স্বশাসিত সংস্থা করার পক্ষপাতী।

॥ নাগরিক অধিকার : এর গুরুত্ব ॥

অধিকার ও স্বাধীনতা দুটিরই লক্ষ্য এক : ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে একাত্ম করে তোলা (ল্যাস্কি)

ল্যাস্কি বলেছেন যে, অধিকারের মূল ভিত্তি হল স্বাধীনতা। ব্যক্তিস্বাধীনতার যা তাত্ত্বিক রূপ ধারণ করে, তার বাইরের রূপই হল অধিকার। দুইয়েরই লক্ষ্য এক : ব্যক্তিজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, ব্যক্তিসত্তার প্রতি শ্রদ্ধা। আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের আকার এবং জনসংখ্যা এত বিরাট যে বিজ্ঞানের চরম অগ্রগতির মধ্যেও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, মননের সঙ্গে মননের সজীব, প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকে না। ফলে ব্যক্তির প্রতি, ব্যক্তি-মানসের প্রতি চরম অবহেলা দেখানো হয়। সবচেয়ে বিপজ্জনক হল অনেক রাষ্ট্রে আপাত-গণতান্ত্রিকতার অন্তরালে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে তার একটু কৃপার, দাক্ষিণ্যের বস্তু করে তোলে। এ ছাড়া বড় বড়রের ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিংবা দলনির্ভর একনায়কী শাসন ত' আছেই। আধুনিক জীবনের এই ঘটনাপ্রবাহ

থেকে একটা সহজ, সরল সিদ্ধান্তে পেঁছান যায়। তা হল এই যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা আজকের এই গণতান্ত্রিক যুগেও খুব বিপন্ন। নাগরিক অধিকারকে মানবিক অধিকারের বিশ্বজনীনতায় সগর্বে উন্নীত করা হলেও ব্যক্তিজীবন আজ অত্যন্ত অবহেলিত, কারণ ব্যক্তিস্বাধীনতা এখনও অত্যন্ত বিপন্ন।

এমন কি গণতন্ত্রেও নাগরিক অধিকার বিপন্ন ঃ এর কারণ

বর্তমানকালে সংগঠিত রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক সময় গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকেও এমনভাবে কাজ করে যায় যে, মানুষ স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে নিজের চিন্তার সাহায্যে যেন কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়। তারা চায় তাদের উপহার দেওয়া চিন্তাধারাকেই সে নিজের চিন্তাধারা বলে মেনে নেয়, তাদের সিদ্ধান্তগুলিকেই সে নিজের সিদ্ধান্ত বলে বিশ্বাস করে নেয়। যে ব্যক্তি নিজেই চিন্তা করে এবং নিজের আত্মিক ধ্যানধারণার প্রতি আস্থাবান, এমন মানুষ এই প্রতিষ্ঠান-গুলির কাছে খুবই অসুবিধা সৃষ্টি করে, সে তাদের কাছে দুর্বোধ্যও। সে যে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের কর্মপন্থার সক্রিয় রূপায়নে সহায়তা করবে, এমন নিশ্চয়তা নেই।

শাসকগোষ্ঠীর আক্রমণই খুব বিপজ্জনক

আজকের গণতন্ত্রের যুগেও মানুষ সমস্ত জীবন ধরে কেবলই তার স্বাধীনতার আদর্শকে আক্রান্ত হতে দেখেছে। শাসনকগোষ্ঠী বড় রাষ্ট্রে ক্ষমতা পরিচালনার সময় বুঝে নেয় যে চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিফল হলে তাদেরই লাভ। এই বিফলতার মধ্যে ব্যক্তিজীবনে অনেক সময় হতাশা নেমে আসে যখন ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও চিন্তার দ্বারা সে যতটুকু সফল হয়েছে তার মূল্য স্বীকার করা হয় না। বহু দিক থেকে কত বিচিত্র উপায়ে ব্যক্তির স্বাধীনতার ওপর শাসকগোষ্ঠী এতরকম নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করে যার ফলে সত্য ও আত্মবিশ্বাসের ওপর ব্যক্তির আস্থা ক্রমশঃ কমে যায়, ব্যক্তি যাতে পুরোপুরি বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, যাতে তাদের দেওয়া সত্য, তাদের গড়ে-তোলা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের নিরিখ সে এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে নিতে বাধ্য হয়।

চিন্তা হল মানুষের সবচেয়ে সৃজনধর্মী শক্তি। নতুন দিগন্ত সে উন্মোচিত করে। ব্যক্তিকে সে ভাবতে শেখায়, অনুধাবন করতে শেখায়। তাই ব্যক্তি বেঁচে থাকে তার ভাবনা-চিন্তার ওপরে। সে নতুনকে চেনে, অনুধাবন করে, অভিনন্দন করে। সেজন্যই একনায়কতন্ত্রী শাসন ব্যক্তির চিন্তাশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। ভাবনা-চিন্তার স্বাধীনতার ওপর সীমা নির্দেশ করা শুধু কোন এক রাজনৈতিক বা সামাজিক মতামতের ওপরেই আক্রমণ নয়, এটা হল মানুষের অস্তিত্বের ওপরই আক্রমণ। চিন্তাকে বিসর্জন দিতে বলার অর্থ মানবাত্মার দেউলিয়া অবস্থা ঘোষণা করা। নিজের চিন্তাশক্তি খাটিয়ে সত্যে পেঁছুবার ক্ষমতায় মানুষের যখন আস্থা

থাকে না, তখনই সে অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এই অবিশ্বাস তার নিজের ওপরই অবিশ্বাস। বর্তমান যুগের মানবতাবাদী মনীষী অ্যালবার্ট সোয়াইট্‌জার (Albert Schweitzer) তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনীতে ("Out of My Life and Thought") এই শাশ্বত বাণীটিকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সত্য সম্পর্কে ব্যক্তির চরম অনীহা, আত্মবিশ্বাসের প্রতি তার পরম অনাস্থা আধুনিক গণতান্ত্রিক জীবনকে বিপর্যস্ত, বিপন্ন করে তুলছে। কাঠামোটাই শুধু অনেক স্থানে দাঁড়িয়ে আছে, অন্তঃসার বলতে কিছুই নেই। তাই সোয়াইট্‌জারের উপদেশ গণতান্ত্রিক নাগরিক মাত্রেরই প্রণিধানের যোগ্য। চিন্তার মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়া সম্বন্ধে আমাদের শক্তিতে যদি আস্থা থাকে, তবেই বাইরে থেকে আমরা সত্যকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারব। চিন্তাকে শুধু শৃঙ্খলমুক্ত হলেই চলবে না, তাকে হতে হবে গভীর এবং সহানুভূতিশীল। তবেই ত সে সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতার ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করতে পারবে। সত্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে চাই নিষ্ঠার প্রতিও আকাঙ্ক্ষা। কারণ, নিষ্ঠাই মানবজীবনের ভিত্তি। সত্য ও নিষ্ঠার প্রজনন শুধু একটা গণতান্ত্রিক কাঠামো আঁকড়ে থাকলেই হয় না। এ প্রজনন সম্ভব হয় কেবল স্বাধীন, স্বাধিকারী গণতান্ত্রিক নাগরিকের দ্বারা।

অধিকার নাগরিককে চিন্তাশীল, সৃজনশীল, সক্রিয় করে তোলে (অ্যালবার্ট সোয়াইট্‌জার)

॥ নাগরিক অধিকারের সংজ্ঞা ॥

মানুষ বিনা বাধায় কাজকর্ম করার জন্য একটা আদিম আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে থাকে। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতাকে মেনে নেওয়া। শক্তির, বুদ্ধির তারতম্য অনুযায়ী এক ব্যক্তি অন্যের দ্বারা, এক গোষ্ঠী অপরের দ্বারা পীড়িত হয়ে থাকে। তাই মানুষের স্বাধীনতাকে সুশৃঙ্খলভাবে এবং সমানভাবে প্রত্যেকের ভোগের জন্য রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে অর্থাৎ সংবিধানের মাধ্যমে যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করে থাকে, সেগুলি রাষ্ট্রের দ্বারা প্রদত্ত ও সংরক্ষিত নাগরিক অধিকার (Rights of citizens) বলে গণ্য হয়। নাগরিক অধিকারগুলির দ্বারাই ব্যক্তিজীবন এবং সমষ্টি-জীবনের মধ্যে একটা সমন্বয় গঠিত হয় এবং ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরবিরোধিতার ভাব দূর হয়। সুতরাং গ্রীনের (Green) মতে, নাগরিক অধিকার একটা সামাজিক ধারণা (a social concept)।

সুশৃঙ্খলভাবে, সমানভাবে স্বাধীনতা ভোগের ব্যবস্থাই অধিকার; অধিকার সামাজিক ধারণা (গ্রীন)

ল্যাস্কি নাগরিক অধিকারের সাংবিধানিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে অধিকার সমাজজীবনের এমন কতকগুলি সুযোগসুবিধা যেগুলি ছাড়া কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয় না ("Rights are those conditions of social life without which no man can seek to be himself at his best")।

ল্যাস্কির মনোবৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা

ল্যাস্কির মনোবৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে অধিকার সম্বন্ধে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ, ব্যক্তিত্ব বিকাশই অধিকারের প্রধান ভিত্তি। কারণ, এর উদ্দেশ্য হল, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে পূর্ণতম আত্মপ্রকাশের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

অধিকার (১) আত্মোন্নতির পথ

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও অধিকারের একটা সামাজিক গুরুত্ব আছে। কারণ, সমাজবদ্ধ জীবরূপে প্রত্যেক ব্যক্তির পারস্পরিক মেলামেশার, আলাপ-আলোচনার মাধ্যম হিসেবে অধিকারগুলি হল রাষ্ট্রের দ্বারা প্রদত্ত এবং স্বীকৃত কতকগুলি সুযোগসুবিধা। অতএব সমাজ-বহির্ভূত অধিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিচারে কোন অধিকারই নয়।

(২) এর সামাজিকতা

তৃতীয়তঃ, নাগরিক অধিকারগুলি স্থান এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে আপেক্ষিক। চিরকালই তারা প্রগতিশীল সমাজজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। পূর্বে ইংরেজ শাসনের সময়ে ভারতে বিদেশী ব্যবসায়ীগণ কলকারখানার শ্রমিকদের অবাধে শোষণ করত। শ্রমিক-সংস্থা বা ট্রেড্ ইউনিয়ন্ গঠন তখন ভারতীয়দের অধিকারের অন্তর্গত ছিল না। কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে যে শোষণবিমুক্ত সমাজবাদী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, তাতে এই অধিকার শ্রমিকদের একটি মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকৃত এবং সম্মানিত।

(৩) এর আপেক্ষিকতা

চতুর্থতঃ, নাগরিক অধিকার সর্বজনীন। জাতি, ধর্ম, ভাষা, শ্রেণী, সম্প্রদায়, স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, নির্ধন নির্বিশেষে সকলকেই রাষ্ট্র এগুলি সমানভাবে প্রদান করে ও এগুলির সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা করে থাকে। সুতরাং এগুলি কোনও বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। নাগরিক অধিকারই হল গণতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রধান বুনিয়াদ।

(৪) এর সর্বজনীনতা

॥ অধিকারের শ্রেণীবিন্যাস : আইনগত ও নৈতিক অধিকার ॥

সাধারণতঃ দুটি প্রধান ভাগে নাগরিকদের অধিকারগুলি ভাগ করা হয়। যে অধিকারগুলি রাষ্ট্র স্বীকার করে নেয়, সংবিধানে লিপিবদ্ধ করে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে, সেগুলিকে আইনগত অধিকার (Legal Rights) বলে। যেমন, স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)। এই অধিকারের বলে নাগরিক যেখানে খুশী যাতায়াত করতে পারে, যার সঙ্গে খুশী মেলামেশা, ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে, সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

আইনগত অধিকার

আইনগত অধিকার ছাড়াও কতকগুলি নৈতিক অধিকারের কথাও রাষ্ট্র উল্লেখ করে থাকে। বৃদ্ধ ও অক্ষম পিতার সাহায্যের জন্য পুত্রের যেমন কর্তব্য থাকে, তেমনি এরকম ক্ষেত্রে উপযুক্ত পুত্রের কাছ থেকে পিতার সাহায্য পাবার অধিকার একটি নৈতিক অধিকার।

নৈতিক অধিকার

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ নাগরিক অধিকারগুলিকে নৈতিক এবং আইনগত

এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করার কোনও যুক্তিকে বিজ্ঞানসম্মত বলে স্বীকার করেন না। কারণ, নৈতিক অধিকার নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পারস্পরিক নীতিবোধের ওপর। নীতিবোধ আবার নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিবেক, বুদ্ধি, ন্যায়বিচার প্রভৃতির ওপর। এগুলি সবই কিন্তু নাগরিকের চিন্তাধারার সঙ্গে জড়িত, নাগরিকের বাইরের কার্যকলাপের সঙ্গে এগুলির কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র নেই। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ শাসনতন্ত্রের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নাগরিকদের যে অধিকারগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করে থাকেন, সেগুলি প্রধানতঃ আইনগত অধিকার।

আইনগত অধিকারই গুরুত্বপূর্ণ

আইনগত অধিকারগুলিকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—পৌর অধিকার (Civil Rights), রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights), অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights), সামাজিক অধিকার (Social Rights)। যে অধিকারগুলি ছাড়া সুসভ্য, শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক জীবনযাপন সম্ভব নয়, সেগুলিকে **পৌর অধিকার** বলা হয়। যেমন—জীবনধারণের অধিকার, শিক্ষালাভের অধিকার।

৪ প্রকার আইনগত অধিকার : (১ পৌর অধিকার

আধুনিক যুগে গণতান্ত্রিকীকরণ (Democratisation) একটা স্বাভাবিক রাষ্ট্রিক পরিণতি। সেজন্য রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনায় সকল নাগরিকের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার অধিকারের স্বীকৃতি আধুনিক রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকতারই সুস্পষ্ট প্রকাশ। সুতরাং নাগরিকের যে অধিকারগুলির দ্বারা সে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সুযোগ লাভ করে, সেই অধিকারগুলিকে **রাজনৈতিক অধিকার** (Political Rights) বলে। যেমন —নির্বাচনে ভোটদাতারূপে অংশগ্রহণের অধিকার, নির্বাচনে প্রার্থীরূপে দাঁড়াবার অধিকার ইত্যাদি।

(২) রাজনৈতিক অধিকার

আজকাল বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে, নাগরিকের কতকগুলি পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষিত করলেই সে রাষ্ট্র আদর্শ গণতন্ত্র হয়ে উঠতে পারে না। এর জন্য চাই প্রকৃত **অর্থনৈতিক অধিকার** (Economic Rights)। যেমন—জীবিকা নির্বাহের অধিকার। শোষণ থেকে নাগরিককে মুক্ত করতে না পারলে তার সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। যে শ্রমিক দারিদ্র্যের চাপে মালিকের কাছে নামমাত্র মূল্যে তার শ্রম বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, তার কাছ থেকে সুনাগরিক হিসাবে ভোটদানের সময় নিজের স্বাভাবিক ইচ্ছাকে ভোটপত্রে প্রকাশ করার দায়িত্ববোধ আশা করা অন্যায়। এজন্য চাকুরির অধিকার, সমান পরিশ্রমের বিনিময়ে সমান মজুরী পাওয়ার অধিকার প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকারগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার বলে মনে করা হয়।

(৩) অর্থনৈতিক অধিকার

ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশের জন্য রাজনৈতিক অধিকার যথেষ্ট নয়। চাই এমন

কতকগুলি সামাজিক সুযোগসুবিধা, এমন একটা সামাজিক পরিবেশ, যার ফলে নাগরিকের সার্বিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতম পরিণতি ঘটতে পারে। এই অধিকারগুলিকে **সামাজিক অধিকার** (Social Rights) বলা হয়। এগুলির দ্বারা ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সামাজিক সত্তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে। শিক্ষার অধিকার, সুস্থ সামাজিক পরিবেশে বাস করার অধিকার প্রভৃতি নাগরিকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক অধিকার।

(৪) সামাজিক অধিকার

॥ নাগরিক অধিকার : পৌর অধিকার ॥

রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকারগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধিকারগুলি হল পৌর অধিকার (Civil Rights)। এগুলির মধ্যে পড়ে—জীবনরক্ষার অধিকার (Right of Life), আইনের চক্ষে সমানাধিকার (Right to Equality before Law), স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার (Right to free movement), সম্পত্তি অর্জনের ও ভোগের অধিকার (Right to Property), চুক্তি সম্পাদনের অধিকার (Right to Contract), বাক্‌স্বাধীনতা (Freedom of Speech), মুদ্রাযন্ত্রের বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (Freedom of Press), সভাসমিতির অধিকার (Right to Association), পরিবার গঠনের অধিকার (Right to Family), ধর্মাচরণের ও বিবেকের স্বাধীনতা (Freedom of Worship and Conscience)।

পৌর অধিকারের প্রকারভেদ

হব্‌সের মতে **জীবনরক্ষার অধিকার** ব্যক্তির আদিম অধিকার। প্রত্যেক নাগরিকই নিজের জীবন বিপন্ন হলে রাষ্ট্রের কাছে জীবনরক্ষার দাবী জানাতে পারে। যদি নাগরিকের জীবনে কোন নিরাপত্তাই না থাকে, তাহলে তার পক্ষে সংঘবদ্ধভাবে রাষ্ট্রের অধীনে বাস করা নিরর্থক। তাই আরক্ষা বাহিনী, কারাগার, বিচারালয়, সেনাবাহিনী ইত্যাদি গঠিত করে রাষ্ট্র নাগরিকের ব্যক্তিজীবনকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করে। রাষ্ট্র ব্যক্তিজীবনের নিরাপত্তার অধিকারের ওপর এত গুরুত্ব আরোপ করে থাকে যে, নিজের জীবনরক্ষার জন্য কোন ব্যক্তি যদি আততায়ীকে হত্যা করে, তাহলেও সেটা অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না। বাস্তবিক, আত্মজীবন প্রত্যেকের কাছেই অত্যন্ত প্রিয় এবং পবিত্র, কেন না মানুষের সমস্ত উদ্যম, তার আত্মোন্নতির সমস্ত প্রচেষ্টা তার আত্ম-জীবনের নিরাপত্তার ওপর নির্ভর করে। সেজন্য বাঁচার অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পৌর অধিকার। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, এই অধিকারটি চরম অধিকার নয়। নাগরিক নিজের জীবন রক্ষা করার অধিকার লাভ করে বটে, কিন্তু তার নিজের জীবন নষ্ট করার অধিকার তার নেই। কারণ, রাষ্ট্রের প্রতি, সমাজের প্রতিও তার কর্তব্য আছে। তাই আত্মহত্যা দণ্ডনীয়।

প্রধান পৌর অধিকার :
জীবনরক্ষার অধিকার

আইনের চক্ষে একই রাষ্ট্রের অধিবাসী ব্যক্তিদের মধ্যে কোন বৈষম্য থাকা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শের পরিপন্থী। ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অভিজাত-

অভাজনের মধ্যে কোনরকম বিভেদ কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্বীকার করে না। ইলণ্ডে আইনের অনুশাসনের (Rule of Law) প্রধান ভিত্তি হল **আইনের চক্ষে** ব্যক্তিদের **সমানাধিকার**। অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংবিধানেও আইনের চক্ষে সমানাধিকার স্বীকৃত হয়। অবশ্য এই অধিকারটি চরম অধিকাররূপে স্বীকার করা হয় না। দুর্বল, অসহায় ব্যক্তিদের, নারী, শিশু প্রভৃতি বিশেষ কতকগুলি শ্রেণীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করলে তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট আইনকানুন প্রবর্তন করতে পারে। এর প্রকৃত তাৎপর্য হল এই যে, এর ফলে সমাজের অবহেলিত, অসহায় ব্যক্তিদের বিশেষ কোন অসুবিধা দূর করে তাদের অন্য সকলের সঙ্গে সমান করে তোলা। এর অর্থ পরোক্ষভাবে সাম্যের নীতিকেই অধিকতর শক্তিশালী করে তোলা।

আইনের চক্ষে সমানাধিকার

স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার একটি মূল্যবান পৌর অধিকার। মানুষ সামাজিক জীব। আরিস্টটল্ বলেছেন যে, প্রকৃতি মানুষকে বাক্‌শক্তি দিয়েছেন অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের মাধ্যমে তার সামাজিক সত্তাকে সুন্দরভাবে বিকশিত করে তোলার জন্য। তাই নাগরিক চায় তার ছোট্ট গণ্ডীর বাইরে বৃহত্তর গোষ্ঠীজীবনের সঙ্গে, সমাজজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে, আত্মীয়তা গড়ে তুলতে। তাই সে চায় অবাধে চলাফেরা করতে, নিজের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে সুরুচিপূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত করতে। স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকারের অর্থ হল—অন্যায়ভাবে কোন নাগরিকের চলাফেরার ওপর রাষ্ট্র কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না। কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে আটক করা হলে সে আদালতের কাছে "হেবিয়াস্ কর্পাস্" বা বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus) আবেদন পেশ করতে পারে। বিচারপতি তখন ধৃত ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত করতে নির্দেশ দেন এবং তার গ্রেপ্তার বৈধ কিনা বিচার করে দেখেন। গ্রেপ্তার বে-আইনী মনে হলে তিনি নাগরিককে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন। ধৃত ব্যক্তিকে সশরীরে হাজির করার এই প্রয়োজনটিকে ইংলণ্ডে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে প্রধান উপায় বলে ধরা হয়। কিন্তু এই অধিকারটি জন-কল্যাণের স্বার্থে বা দেশের স্বার্থে অনেক সময় সীমাবদ্ধ রাখা হয়। যুদ্ধের সময়, কিংবা জরুরী অবস্থার সময় আভ্যন্তরীণ নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই অধিকারটি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। সাধারণতঃ কোন নাগরিকের গৃহে অন্যের অনধিকার প্রবেশের অধিকার নেই। কিন্তু প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রের নির্দেশে পুলিস খানাতল্লাসী করতে পারে। এইভাবে নাগরিকের গতিবিধিও কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার

সম্পত্তি অর্জনের ও ভোগের অধিকার ধনতান্ত্রিক দেশের এবং নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষে সমাজতন্ত্রবাদী দেশের ব্যক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বলে স্বীকৃত। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সম্পত্তি-অর্জনকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রকাশরূপে বর্ণনা করে থাকেন। তাঁদের মতে, সম্পত্তি অর্জনের স্পৃহার জন্য লোকে অধিকতর শ্রমশীল ও উদ্যমশীল হয়ে

ওঠে। কিন্তু জনস্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ সম্ভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সম্পত্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ণয়, করব্যবস্থার মাধ্যমে ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণ, এমন কি প্রয়োজনমত ক্ষতিপূরণ দিয়ে বা না-দিয়ে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকারও আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে নীতি হিসাবে সমর্থিত ও কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ল্যাস্কি বলেন যে, নাগরিকের শ্রমের দ্বারা যা অর্জিত হয় না অথবা যা সামাজিক কল্যাণের বিরোধী অথবা সমাজে কর্তব্য পালনের জন্য ব্যক্তির যা প্রয়োজন নয়, তাতে তার কোন অধিকার থাকতে পারে না। এই যুক্তির ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক রাষ্ট্র, এমন-কি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রও সম্পত্তি সম্ভোগের অধিকারকে নিরঙ্কুশ অধিকার বলে স্বীকার করে না। সাম্যবাদীগণ শুধু নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যসামগ্রীর মধ্যেই কেবল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারটুকু সীমাবদ্ধ রাখতে চান। তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে পূর্বের মত পবিত্র বলে মনে করা হয় না।

সম্পত্তির অধিকার

আইনসঙ্গতভাবে **চুক্তি সম্পাদনের অধিকার** প্রত্যেক নাগরিকেরই বৈধ অধিকাররূপে স্বীকৃত। কোন কোন আইনবিদের মতে, এই অধিকারটি নাগরিকের সম্পত্তি অর্জনের এবং ভোগের অধিকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সমাজে মানুষের স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সুবিধার ক্ষেত্র বিস্তৃত করার জন্য কতকগুলি শর্তের খাতিরে নাগরিকগণ চুক্তিবদ্ধ হন। চুক্তির শর্ত ঠিকমত প্রয়োগের ফলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ভালভাবে পরিচালিত হয়। চুক্তিভঙ্গ করলে আদালতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা চলে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে রাষ্ট্র চুক্তিভঙ্গকারীকে দণ্ডিত করে। কিন্তু চুক্তির অধিকার জনগণের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত। দুরভিসন্ধিমূলক, বেআইনী, জনকল্যাণের পরিপন্থী চুক্তিকে রাষ্ট্র কখনই বৈধ চুক্তিরূপে স্বীকার করে না। পৃথিবীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসে এমন সময়েরও উল্লেখ পাওয়া যায়, যখন চুক্তির মাধ্যমে ক্রীতদাসপ্রথা পরিচালিত হত এবং দাসখত লিখিয়ে শ্রমিক নিয়োগ ও শ্রমিকের কার্যকাল প্রভৃতি স্থির হত। যে সমাজ শ্রমশিল্পপ্রধান, সেখানে চুক্তি করার স্বাধীনতা, প্রকৃতপক্ষে, তখনই সার্থক হয়ে ওঠে, যখন শ্রমিক এবং মালিক সমান ভিত্তিতে দরকষাকষি করার সুযোগ পায়। মার্ক্সবাদীরা মনে করেন যে, অবাধ ধনতন্ত্রে এই দরকষাকষির সাম্য থাকে না।

চুক্তি সম্পাদনের অধিকার

বাক্‌স্বাধীনতা আধুনিক নাগরিকদের সর্বশ্রেষ্ঠ পৌর অধিকার। কথা বলা মানুষের প্রকৃতিদত্ত, সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তি। এজন্যই আরিস্টটল্ মানুষকে স্বাভাবিকভাবে সামাজিক জীবরূপে ঘোষণা করেছেন। বাক্‌স্বাধীনতার দ্বারাই নাগরিকগণ পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, সহানুভূতি ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলে। ব্যক্তি তার সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। এইভাবে জনমত গড়ে ওঠে। জনমতই গণতান্ত্রিকতার প্রধান ভিত্তি। আইনসভায় তাই সভ্যগণ অবাধে তর্কাতর্কির অধিকার লাভ করেন। সভাসমিতি

গঠন করে নাগরিকগণ নিজেদের বক্তব্য প্রচারের সুযোগ পান। ইংরেজ মহাকবি মিলটন (Milton) তাঁর একটি সুবিখ্যাত প্রবন্ধে ("এরিয়োপ্যাগিটিকা" Areopagitica) মন্তব্য করেছেন, "আমাকে জানার স্বাধীনতা দাও, বিবেক অনুসারে কথা বলার ও আলোচনা করার স্বাধীনতা দাও। এটাই হল সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা।" পরবর্তীকালে অপর একজন ইংরেজ মানবতাবাদী উদারপন্থী দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল মিলটনের কথার প্রতিধ্বনি করেন। "স্বাধীনতা" ("On Liberty") শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, বাকস্বাধীনতা থাকলে তবেই ন্যায়-অন্যায়ের, সত্য-মিথ্যার সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ মতামতের সুপ্রকাশ সূচিত হয়। প্রখর রবির নির্মল আলোকে যেমন অন্ধ তামস অপসৃত হয়, তেমনি সত্যের শাশ্বত প্রকাশ সবসময়েই বাদানুবাদের ঘাতপ্রতিঘাতে প্রকটিত হয়। আধুনিক যুগে ল্যাস্কি বলেছেন যে, ব্যক্তিকে তার প্রত্যয় এবং প্রত্যাশা প্রকাশের অধিকার না দিলে সে ক্রমশঃ চিন্তাশক্তিই হারিয়ে ফেলবে। বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russell) বলেন যে, স্বাধীন চিন্তার অধিকার মানবসভ্যতার ইতিহাসে নাগরিকের বহু কষ্ট ও ত্যাগের ফলে অর্জিত একটি মহামূল্যবান অধিকার। কিন্তু বাকস্বাধীনতা কখনই একটি চরম অধিকার নয়। দুরভিসন্ধিমূলক কিংবা প্ররোচনামূলক, মানহানিকর, রাজদ্রোহমূলক কোন মতপ্রকাশের ফলে অন্যায়ভাবে নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়, লোকের সুনামের প্রতি আঘাত করা হয়, সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য লোকে কিছু সুবিধাবাদী দুষ্কৃতকারীর দ্বারা প্ররোচিত হয়। রাষ্ট্র কখনই এগুলি বরদাস্ত করে না।

বাকস্বাধীনতা

মুদ্রাযন্ত্রের বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নাগরিকদের একটি অতি প্রয়োজনীয় পৌর অধিকার। বেরি (Bury) স্বাধীন চিন্তাধারার ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাকে আধুনিক গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে বর্ণনা করেছেন। একজন বিখ্যাত লেখক বলে গেছেন যে, বারুদ এবং ছাপাখানার আবিষ্কার মানবসভ্যতার অগ্রগমনের দুটি বিরাট স্তম্ভ। মানুষ বাকস্বাধীনতার ফলেই সভ্যতার উচ্চ শীর্ষে উঠতে পেরেছে। জনমতের বাঙ্ময় রূপই পুঁথিপত্রে লিখিত রূপ ধারণ করে। সুতরাং বলা চলে যে, মুদ্রাযন্ত্রের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বাকস্বাধীনতারই প্রকারান্তর। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে দেশের সার্বিক ঘটনাবলীর খোলাখুলি আলোচনা চলে, সরকারের দোষত্রুটিরও সমালোচনা হয়ে থাকে। ফলে, সরকার দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে না। জনগণও নানারকম রাষ্ট্রিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন ইস্তাহার থেকে জনগণ কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ভালভাবে জানতে পারে। কিন্তু বাকস্বাধীনতা যে কারণে সীমাবদ্ধ, মুদ্রাযন্ত্রের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও সেই কারণগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, রাজদ্রোহাত্মক, মানহানিকর, অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ, প্ররোচনাত্মক কোন

মুদ্রাযন্ত্রের বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

কিছু বিষয়ে যেমন নাগরিকের বাক্‌স্বাধীনতা নেই, তেমনি এগুলি নিয়ে কিছু লিখিত মতামত প্রকাশের বা প্রচারের স্বাধীনতাও তার নেই। তাছাড়া যুদ্ধ, বা অন্য কোন জরুরী অবস্থায় বাক্‌স্বাধীনতার মত মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাও, জনস্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হয়।

সভাসমিতির অধিকার সামাজিক ও সংগ্রামী সৈনিক হিসাবে নাগরিকের স্বাধীন মতামত প্রকাশের একটি উপযুক্ত হাতিয়ার। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা অজস্র। এগুলিকে চরিতার্থ করার আশায় সে বহু দল গঠন করে, বহু আলোচনাচক্রের আয়োজন হয়, বহু সভাসমিতির উদ্বোধন ঘটে। সুতরাং সুসভ্য নাগরিক জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে নাগরিকের সভাসমিতি গঠনের অধিকারের মধ্য দিয়ে স্বাধীন-ভাবে মতামত প্রকাশের ওপর। কোন কোন সমিতি স্বল্পস্থায়ী, কোনটি বা দীর্ঘস্থায়ী। নাগরিক জীবনের বহুমুখিতার জন্য বিভিন্ন সভার বা সংঘের উদ্দেশ্যও বিবিধ। রাষ্ট্রের উদ্ভব ব্যক্তিবর্গের সংঘবদ্ধতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকেই। সুতরাং তাদের সম্মিলিত হবার প্রবৃত্তিকে সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রূপায়িত করার অধিকারকেই রাষ্ট্র নাগরিকের সভাসমিতির অধিকাররূপে স্বীকৃতি দেয়। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জনমত গঠিত এবং পরিব্যক্ত হয়। ভাষণ এবং মুদ্রণ এই দুটি মাধ্যমই সভাসমিতিগুলি জনমত গঠনে ব্যবহার করে থাকে। সভাসমিতিতে মিলিত হয়ে নাগরিকগণ সম-মতাবলম্বী হতে সক্ষম হয়, রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করে এবং রাষ্ট্রের পরিচালনা সহজ ও সরল হয়। কিন্তু নাগরিকদের অন্যান্য অধিকারের মত এই অধিকারটিও সীমাবদ্ধ। কোন সমিতি যদি রাজদ্রোহাত্মক কাজকর্মে লিপ্ত হয় কিংবা গুপ্তভাবে কোনরকম জনস্বার্থবিরোধী কাজে রত হয়, অথবা প্রকাশ্য জনসভায় যদি হিংসাত্মক মতামত প্রকাশ করা হয় অথবা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়, তাহলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সরকার নাগরিকের এই অধিকারটি সীমিত করে দিতে পারে। যুদ্ধ বা অন্য জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্র সভাসমিতির অধিকার কিছু কালের জন্য বাতিল করে দিতে পারে।

সভাসমিতির অধিকার

পরিবার গঠনের অধিকার আদর্শ নাগরিক জীবনযাপনের পক্ষে অপরিহার্য। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে পরিবারকে নাগরিকের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আদিমতম প্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই অধিকারটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অধিকারের অর্থ—প্রত্যেক নাগরিকেরই বিবাহের মাধ্যমে পারিবারিক সংগঠন গড়ে তোলবার স্বাধীনতা থাকবে। পরিবারের সুষ্ঠু সংগঠনের জন্য সমস্ত রাষ্ট্রই নাগরিকদের উৎসাহদানের চেষ্টা করে। কোনও নাগরিকের পোষ্যের সংখ্যা বেশী হলে আগে রাষ্ট্র এই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির করদানের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা দিত। কিন্তু আধুনিক যুগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্যভাবে রাষ্ট্র পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে থাকে। পাশ্চাত্য দেশে আজকাল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিজীবনে অনেক জটিলতা এবং

পরিবার গঠনের অধিকার

সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে, সেই দেশগুলিতে পরিবারগুলির ওপর খুব চাপ পড়ে। তাই এই দেশগুলিতে বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, শিশু-অপরাধী ইত্যাদি বিষয়ে নানা রকম আইনকানুন রচিত হচ্ছে। এগুলির উদ্দেশ্যও একই—সুস্থ পরিবারে সুস্থ নাগরিক গড়ে তোলার চেষ্টা।

ধর্মাচরণের ও বিবেকের স্বাধীনতা নাগরিকের একটি মূল্যবান অধিকার। যা ধারণ করে তাই ধর্ম। সভ্য নাগরিক যাতে সৎ চিন্তা, সদাচরণ, সৎ প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজের বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যেতে পারে, তার আয়োজন করে ধর্ম। মধ্যযুগের ইতিহাসে ধর্মের নামে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে গেছে। বিজ্ঞানের ক্রমিক অগ্রগতির ফলে ধর্মানুশীলন বর্তমানে অনেকটা কুসংস্কারবর্জিত হয়ে উঠতে পেরেছে।

ধর্মাচরণের ও বিবেকের স্বাধীনতা

সুতরাং বিজ্ঞাননির্ভর আধুনিক সমাজও ধর্মকে ছেড়ে চলতে পারে না। ধর্ম যে শুধু ইহকাল-পরকাল, পাপ-পুণ্য নিয়ে আলোচনা করে, তাই নয়। ধর্ম ব্যক্তির নীতিবোধকে মার্জিত ও উন্নত করে। উন্নত, পরিচ্ছন্ন নীতিবোধই সুনাগরিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এজন্য রাষ্ট্র ব্যক্তিগত ধর্ম ও বিশ্বাস অনুসারে ধর্মাচরণের ও উপাসনার অধিকার স্বীকার করে নেয়। সোবিয়েত রাশিয়ার শাসনতন্ত্রে আবার এই অধিকারের সঙ্গে ধর্মের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশের ও প্রচারের স্বাধীনতাকেও নাগরিকের অন্যতম অধিকার বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতাকে (Secularism) ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রগতিশীলতার প্রধান লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়। নাগরিকের চিন্তার স্বাধীনতা স্বীকার করলে রাষ্ট্রকে ধর্মমত সম্পর্কে সহনশীল হতেই হবে। কিন্তু ধর্মাচরণের স্বাধীনতাও সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে সীমিত। আধুনিক রাষ্ট্র তাই ধর্মের নামে কোনরকম অসামাজিকতা, সাম্প্রদায়িক হিংসা, অন্ধ গোঁড়ামি, চিত্তবিকৃতি বা উন্মাদনার আতিশয্যকে প্রশ্রয় দেয় না। এ সমস্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রকে সব সময়ে সচেতন ও তৎপর থাকতে হয়।

॥ নাগরিক অধিকার ঃ রাজনৈতিক অধিকার ॥

শুধু গণতন্ত্রেই নাগরিকগণ সরকার পরিচালনার কাজে অংশ গ্রহণ করে থাকে। এই অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ হতে পারে। তাই কেবল গণতান্ত্রিক দেশেই নাগরিকগণ রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) ভোগ করতে পারে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের যে রাজনৈতিক অধিকারগুলি রাষ্ট্র প্রদান করে থাকে

রাজনৈতিক অধিকারের প্রকারভেদ

এবং সেগুলি সংরক্ষণের জন্য চুক্তিবদ্ধ, সেই রাজনৈতিক অধিকারগুলি হল—বাসস্থানের অধিকার (Right to Residence); বিদেশে নিরাপত্তার অধিকার (Right to Protection when staying abroad); ভোটদানের অধিকার (Right to Vote); নির্বাচিত হবার অধিকার (Right to Election); সরকারী চাকুরি লাভের অধিকার (Right to

hold Public Office); প্রতিবেদনের অধিকার (Right to Petition); প্রতিরোধের অধিকার (Right to Resistance)।

বাসস্থানের অধিকারকে রাজনৈতিক অধিকার বলার কারণ এই যে, কোনও বিশেষ রাষ্ট্রে বিদেশীগণ এই অধিকার ভোগ করে না। প্রকৃতপক্ষে নাগরিকত্বের অধিকারের বাস্তব রূপ হল বাসস্থানের অধিকার। নাগরিকরূপে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের রাষ্ট্রের বাসিন্দা হবার অধিকারী। এই অধিকারের ফলেই কোনও বিদেশী রাষ্ট্রের বা ঐ রাষ্ট্রের কোনও নাগরিকের কোনপ্রকার কার্যকলাপের ফলে যদি কোনও নাগরিকের বাসস্থানের অধিকার বিঘ্নিত হয়, তাহলে সে ঐ বিদেশী রাষ্ট্রের বা বিদেশীর বিরুদ্ধে নিজের রাষ্ট্রের কাছে যথোচিত সাহায্য পাবার অধিকারী হয়। বর্তমান যুগে বাসস্থানের অধিকারকে ব্যক্তির একটি মূল্যবান মানবিক অধিকাররূপে স্বীকার করা হয়। এই অধিকার চরম অধিকার নয়। রাজনৈতিক কারণে রাষ্ট্র নাগরিকের এই অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারে। তবে, এক্ষেত্রেও মানব অধিকারের বিশ্বজনীন সনদে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোন রাষ্ট্রের কোন নাগরিক কোন রাজনৈতিক কারণে যদি নিজের রাষ্ট্র ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, তাহলে সে অন্য কোন দেশের আশ্রয় (Asylum) লাভ করে তার বাসিন্দা হতে পারে।

বাসস্থানের অধিকার

বিদেশে প্রত্যেক নাগরিক যেমন তার নিজের রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের অধীন থাকে, তেমনি সে বিপন্ন হলে সে নিজের রাষ্ট্রের কাছ থেকে **নিরাপত্তালাভের অধিকার** পাবে। যদি বিদেশী রাষ্ট্র তার ন্যায়সঙ্গত দাবী মেনে না নেয়, তাহলে বিদেশে সে তার নিজের রাষ্ট্রের দূতাবাসের মাধ্যমে যথোচিত বিচার এবং ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে। রাষ্ট্রও বিদেশী সরকারের দরবারে তার দূতের সাহায্যে বিদেশে বসবাসকারী তার নিজের নাগরিকদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বিদেশী রাষ্ট্রে অবস্থানরত নাগরিকদের সবরকম দাবীই গ্রাহ্য নয়। যদি কোনও বিদেশী কোনও রাষ্ট্রে নরহত্যা বা ঐ জাতীয় কোন গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে সে ঐ রাষ্ট্রের সাধারণ ফৌজদারী আইনের (Criminal Jurisdiction) আওতায় দণ্ডনীয় বলে বিবেচিত হবে।

বিদেশে নিরাপত্তার অধিকার

ভোটদানের অধিকারকে নাগরিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার বলা হয়। আধুনিক গণতন্ত্র পরোক্ষ গণতন্ত্র (Indirect Democracy)। এখানে প্রতিনিধিমূলক অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্র (Representative বা Parliamentary Democracy) প্রচলিত। এর মূল কথা হল, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অবাধ এবং স্বাধীন সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভা গঠিত হয়। সেই আইনসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলই মন্ত্রিসভা গঠন করে। সুতরাং বলা যায় যে, প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে নাগরিকদের ভোটদানের অধিকারের

সুষ্ঠু এবং সুচিন্তিত প্রয়োগের ওপর। তার এই অধিকার ভালভাবে প্রয়োগ সম্ভব হয়, যদি দেশে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা সুগঠিত থাকে। সেই অর্থে রাজনৈতিক দলগুলিকে বাক্‌স্বাধীনতা, সভাসমিতির স্বাধীনতা প্রভৃতি যে পৌর অধিকারগুলি প্রদান করা হয়, সেগুলিও এক একটি মূল্যবান রাজনৈতিক অধিকার। এই কারণে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারকে (Universal Adult Franchise) নাগরিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করা হয়। যাতে নাগরিকগণ এই অধিকারটি সুন্দরভাবে প্রয়োগ করতে পারেন, তার জন্য আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র প্রভৃতি প্রচারের মাধ্যমগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখার চেষ্টা করে। ইংলণ্ডে ও ভারতে নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকেই বেতারের মাধ্যমে নিজের দলীয় নীতি ইত্যাদি প্রচারের অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়। সব দলই সমান সুযোগ লাভ করে। ফলে, জনমত সুগঠিত হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানও শান্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হতে পারে। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, ভোটদানের অধিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যথেচ্ছভাবে প্রদান করে না। বিদেশী, নাবালক, বিকৃতমস্তিষ্ক, অপরাধী বা দেউলিয়াগণ ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত। ভারতে ইংরেজ আমলে শিক্ষাগত ও সম্পত্তিগত যোগ্যতার ওপর ভোটাধিকার নির্ভর করত। তাই তখন ভারতীয়দের মধ্যে শতকরা ১৪ জন মাত্র ভোটদানের অধিকারী ছিলেন। প্রজাতন্ত্রী ভারতের শাসনতন্ত্রে সকল প্রাপ্তবয়স্কের জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি স্বীকৃত।

ভোটদানের অধিকার

নির্বাচিত হবার অধিকার নাগরিকের ভোটদানের অধিকারেরই একটি অঙ্গ। প্রত্যেক নাগরিক যেমন গণতান্ত্রিক নির্বাচন-ব্যবস্থায় ভোটদাতারূপে অংশগ্রহণ করার অধিকার পায়, তেমনি সে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে দাঁড়াবারও অধিকার পায়। কিন্তু বিশেষ কোনও পদে নির্বাচনের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ যোগ্যতার ওপর জোর দিতে পারে। যেমন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে একুশ বছর বয়স হলেই নাগরিককে প্রাপ্তবয়স্ক বলে ধরে নেওয়া হয় এবং তাকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু আইনসভার নিম্নকক্ষে প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে তাকে অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়স্ক হতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার আইনসভার সাধারণ নির্বাচনে পূর্বে সব প্রাপ্তবয়স্কদেরই ভোট ছিল, কিন্তু কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিদেরই প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার স্বীকার করা হত। কিন্তু নির্বাচনে প্রার্থীরূপে নাগরিকদের দাঁড়াবার অধিকার এভাবে নিয়ন্ত্রিত হলে নাগরিকের ভোটদানের অধিকারকে আর সার্থক বলা চলে না। ইংরেজ আমলে ভারতে যে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা (Communal Electorate) প্রচলিত ছিল, তদনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভোটদাতাগণ কেবল নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের তাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলিতেই ভোট দিতে

নির্বাচিত হবার অধিকার

পারত। এই ধরনের সাম্প্রদায়িক নির্বাচনব্যবস্থা প্রজাতন্ত্রী ভারতের শাসনতন্ত্রে পরিত্যাগ করা হয়েছে।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সকলেই তাদের নাগরিকদের **সরকারী চাকুরী লাভের অধিকার**-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার বলে স্বীকার করে। একই পদে সমান যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে নাগরিককেই সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। নাগরিকের সরকারী চাকুরী লাভের অধিকারের তাৎপর্য হল এই যে, প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের শাসনকার্য-চালনার ব্যাপারে জনগণের কোনও বিশেষ শ্রেণীর জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা স্বীকার করা হবে না। অর্থাৎ, সব রকম সরকারী পদই রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত বলে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয়তঃ, শুধুমাত্র যোগ্যতার বিবেচনাতেই সরকারী পদগুলিতে কর্মচারী নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু এই অধিকারও অসীমাবদ্ধ হতে পারে না। প্রয়োজন বোধ করলে রাষ্ট্র বিশেষ সরকারী পদে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে পদপ্রার্থীদের বিশেষ যোগ্যতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে পারে। যেমন, ভারতীয় সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রার্থীর বয়স অন্ততঃ ২৫ বছর হওয়া আবশ্যক। তা ছাড়া, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের বা উপজাতীয় ব্যক্তিদের ও নারীদের ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরীদানের জন্য যোগ্যতা সম্পর্কে নিয়ম-কানুন রাষ্ট্র কিছুটা শিথিলভাবে প্রয়োগ করে। অবশ্য, এ সমস্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা-দানের নীতি গণতান্ত্রিক প্রথা অনুসারে আইনসভায় আলোচিত এবং ব্যাপকভাবে সমর্থিত হবার ফলেই ভারত সরকারের সরকারী নীতিরূপে অনুসৃত হচ্ছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাম্যের অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলা যুক্তিযুক্ত নয়। নানা কারণে সমাজের অন্য নানা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের তুলনায় কোনও বিশেষ শ্রেণীর নাগরিকগণ যদি অপেক্ষাকৃতভাবে অনগ্রসর হয়ে থাকেন, তা হলে সমস্ত নাগরিকদের সাধারণ মঙ্গলবিধায়ক অভিভাবকরূপে রাষ্ট্র এ সকল ক্ষেত্রে ঐ অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ব্যক্তিদের চাকুরীলাভ বা অন্য বিষয়ে বিশেষ অধিকার স্বীকার করে নিলে তার ফলে তাদের সমাজে অগ্রগামী হবার সুযোগ দেওয়া হয়। এর ফলে সাম্যের নীতিকে যেন অধিকতর সার্থক করে তোলার প্রয়াসই প্রকাশ পায়।

সরকারী চাকুরী লাভের অধিকার

প্রতিবেদনের অধিকার নাগরিকের একটি অত্যন্ত মূল্যবান রাজনৈতিক অধিকার। সরকারের শাসননীতির বিরুদ্ধে নাগরিকের কোনও অভিযোগ থাকলে এ বিষয়ে তিনি সরকারের কাছে আর্জি পেশ করতে পারেন। এই অধিকার দু'ভাবে বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে। প্রথমতঃ, কোনও নাগরিক তাঁর বিশেষ ব্যক্তিগত অভিযোগ সম্পর্কে আর্জি পেশ করতে পারেন। অথবা, একাধিক নাগরিক মিলিতভাবে তাঁদের সাধারণ কোনও অভিযোগ সম্পর্কে আর্জি পেশ করতে পারেন। কোন কোন সময়ে দেখা যায় যে, নাগরিকগণ কোথাও সভা-সমিতির মারফত তাঁদের বক্তব্যগুলি প্রস্তাবের আকারে সংশ্লিষ্ট শাসন-কর্তৃপক্ষের কাছে

প্রতিবেদনের অধিকার

দাবীরূপে পেশ করে থাকেন। গণতান্ত্রিক সরকারে শাসকগোষ্ঠী সব সময় সুগঠিত জনমতের অনুকুলেই তাঁদের শাসননীতি পরিচালিত করার চেষ্টা করে থাকেন। কারণ, পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে ভোট পাবার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। এ বিষয়ে সরকার যেমন সচেষ্ট হন, আইনসভাও ততটা অবহিত থাকেন। প্রতিবেদনের অধিকারের প্রধান গণতান্ত্রিক তাৎপর্য হল এই যে, এই অধিকার প্রয়োগের ফলে বিদ্রোহ বা অন্য কোনও চরম হিংসাত্মক পথের পরিবর্তে নাগরিক এককভাবে অথবা নাগরিকগণ সম্মিলিতভাবে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে অভাব-অভিযোগ বিজ্ঞাপনের পথ খুঁজে পান। ফলে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সাবলীলভাবে জনমতের অনুকুলে পরিচালিত হতে পারে। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যদের সম্মিলিত প্রস্তাব অনুসারে সুবিখ্যাত স্বাধিকার বিধি (Bill of Rights) ইংলণ্ডের রাজমুকুটের নিকট উপস্থাপিত করা হয়। তিনি সেটি অনুমোদন করেন। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের বহু বিধান নাগরিকদের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।

প্রতিরোধের অধিকার নাগরিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। শাসকদলের বিরুদ্ধে নাগরিকের সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণার ও পরিচালনার অধিকার নাগরিকদের আছে কিনা তাই নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। গ্রীন (Green) বলেন যে, বিপ্লবের অধিকারকে ব্যাপকভাবে মেনে নেওয়ার অর্থ হল বিশৃঙ্খলাকে নির্বিচারে প্রশ্রয় দেওয়া। কিন্তু তিনি স্বীকার করেন যে, দুর্নীতিপূর্ণ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যদি জনমত প্রবলভাবে সংগঠিত হয়, তা হলে তাকে বিতাড়িত করা নাগরিকদের শুধু অধিকারই নয়, সেটা তাদের কর্তব্যও। তবে দেখা দরকার এক্ষেত্রে বিদ্রোহের ফলে রাষ্ট্রের যতটা ক্ষতি হয়, তার চেয়ে বেশী ক্ষতি ঐ দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের শাসন-পরিচালনার জন্য ঘটে কিনা। ল্যাস্কি বলেন যে, অন্যায়ভাবে সরকার নাগরিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করলে শান্তিপূর্ণভাবে সভাসমিতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, মিছিল, শোভাযাত্রা ইত্যাদি সংগঠিত করে, সংবাদপত্রের স্তম্ভে ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রভৃতির মারফত নাগরিকদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার অধিকার আছে। আইনসভার মধ্যেও জনপ্রতিনিধিগণের পক্ষে সরকারের দুর্নীতির তীব্র সমালোচনার দ্বারা প্রতিরোধ গঠন করার অধিকার আছে। পরাধীন ভারতে গান্ধীজী "সত্যাগ্রহ" ও "অসহযোগ" আন্দোলন সংগঠিত করে অহিংস উপায়ে প্রবল ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তিসংগ্রামকে পরিচালিত করেন।

প্রতিরোধের অধিকার

॥ নাগরিক অধিকার : অর্থনৈতিক অধিকার ॥

ল্যাস্কির মত সমাজতন্ত্রবাদী গণতন্ত্রী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি নাগরিকদের কোন কাজেই লাগবে না, যদি অর্থনৈতিক সাম্য এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে পুনর্গঠিত করে না তোলা যায়। এর

অর্থ হল—সমাজতন্ত্রের মূল আদর্শগুলির সঙ্গে গণতন্ত্রের মূল সিদ্ধান্তগুলিকে সার্থকভাবে সমন্বিত করা। সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির ফলে ধনতন্ত্রকে তাই একটা অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। রাষ্ট্রকে নাগরিকদের নানাপ্রকার অর্থনৈতিক অধিকার (Economic rights) প্রদান করতে হয়েছে। যে নাগরিক বেকার, কিংবা যে তার জীবিকার জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল, তার কাছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কিংবা ভোটদানের অধিকারের মত পৌর বা রাজনৈতিক অধিকারগুলি নিরর্থক হয়ে ওঠে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী একমাত্র অর্থনৈতিক অধিকারগুলিই নাগরিকদের পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে বাস্তব করে তোলে।

অর্থনৈতিক অধিকারের গুরুত্ব

সমাজের প্রত্যেক নাগরিক শ্রমজীবী। সে পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকারের মারফত সরকারের ওপর প্রয়োজনমত চাপ সৃষ্টি করে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক অধিকার আদায় করে নিতে পারে। কিন্তু সোবিয়েত রাশিয়া, ইংলণ্ড, ভারত প্রভৃতি সমাজতন্ত্রী বা জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক অধিকারগুলি সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রত্যেক প্রগতিশীল রাষ্ট্রেরই উচিত নাগরিকদের ন্যায্য অর্থনৈতিক অধিকারগুলি সম্মানের সঙ্গে, বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নেওয়া। নাগরিকের কাছ থেকে আনুগত্য, দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ প্রত্যাশা করতে গেলে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকারগুলি স্বীকার করে নেওয়া। প্রাত্যহিক তৈলতণ্ডুলের দুশ্চিন্তা, দৈনিক অভাব-অভিযোগ, বেকারত্বের ভয়-ভাবনা থেকে নাগরিকদের সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেবার দায়িত্ব মেনে নিতে হবে।

সমাজতন্ত্রবাদী ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ঝোঁক

আধুনিক প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে নাগরিকদের যে অর্থনৈতিক অধিকারগুলিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল—জীবিকানির্বাহের বা কাজ করার অধিকার (right to work); নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্ধারিত মজুরি পাবার অধিকার বা ন্যায্য বা ন্যূনতম বেতন পাবার অধিকার (right to fixed pay for fixed work অথবা right to living wage or minimum wage); সামাজিক বা সঙ্ঘবদ্ধ বীমা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধিকার (Right to Social Insurance); ছুটি ও বিশ্রামের অধিকার (right to rest and leisure); শ্রমিক-স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য শ্রমিক-সংস্থা গঠনের অধিকার (right to trade unions) এবং ধর্মঘটের অধিকার (right to strike)।

অর্থনৈতিক অধিকারের প্রকারভেদ

জীবিকার অধিকারকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ নাগরিকদের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার বলে মনে করে থাকেন। তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, কর্মক্ষম শ্রমিকের ব্যবহারযোগ্য শ্রম অত্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু (Labour is the most perishable commodity of the labourer")। এর অর্থ হল এই

যে, শ্রমিক যদি ২ ঘণ্টা বেকার থাকে, তা হলে সে ঐ ২ ঘণ্টায় যতটা উৎপাদন করতে পারত, ততটা উৎপাদনক্ষমতা সে চিরকালের মত হারাল এবং সমাজও তার শ্রমের বিনিময়ে লব্ধ সমপরিমাণ উৎপাদন থেকে চিরতরে বঞ্চিত হল। ফলে, ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই অপূরণীয় ক্ষতি হল। পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল রাষ্ট্রই তাই বেকারত্বকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে থাকে। নাগরিকের জীবিকানির্বাহের অধিকারকে বাস্তব রূপ দেবার জন্যই আধুনিক রাষ্ট্রগুলি বেকারদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজকর্ম খুঁজে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে দেশের নানা অঞ্চলে বহু নিয়োগসংস্থা (Employment Exchange) স্থাপন করা হয়। সোবিয়েত রাষ্ট্র যে সাম্যবাদী মতাদর্শ মেনে চলে, তার তাৎপর্য হল—"যে কাজ করবে না, তার জীবিকানির্বাহের কোনও অধিকারই নেই" ("He who does not work, neither shall eat")। এই নীতিকে কার্যকর করে তোলার জন্য সোবিয়েত রাশিয়ার শাসনতন্ত্রে প্রত্যেক সুস্থ, সক্ষম সোবিয়েত নাগরিকের কাজ পাবার অধিকার স্বীকৃত। ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রে নাগরিকের কাজ পাবার অধিকার স্বীকার করার পেছনে সামগ্রিক রাষ্ট্রের (Totalitarian State) স্বার্থটাকেই বড় করে দেখা হত। নাগরিকদের স্বার্থ সেখানে ছিল একান্ত গৌণ। একনায়কতন্ত্রী নেতাগণ সব সময় রাষ্ট্রের উন্নতির নামে নাগরিকদের কঠোর শ্রমের ব্যবহারকে নিতান্ত যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখে থাকেন। আসলে, জীবিকার তাগিদে উৎপীড়িত হলেও এবং ক্ষুধার তাড়নায় সাময়িকভাবে মানুষকে সাধারণ জীবজন্তুর সমতুল্য মনে করা হলেও জীবন সব সময়ে জীবিকার চেয়ে বড়। তাই জীবিকার অধিকার স্বীকার করে না নিয়ে রাষ্ট্র যদি নাগরিকের ব্যক্তিসত্তার স্বচ্ছন্দ, সাবলীল বিকাশে বাধা দান করে, তাহলে এই ধরনের গুরুতর অর্থনৈতিক অধিকারও শেষ পর্যন্ত নাগরিকের কাছে মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, জীবনের জন্যই জীবিকা।

জীবিকার অধিকার

নির্দিষ্ট কাজের জন্য **নির্ধারিত মজুরি পাবার অধিকার** অনুসারে অর্থ বা ন্যায্য ন্যূনতম বেতন পাওয়ার অধিকার নাগরিকের একটি প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক অধিকার। সোবিয়েত শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের নির্দিষ্ট কাজের জন্য আনুপাতিক হারে মজুরি দেওয়া হয়। সেজন্য শুধু নাগরিকদের ন্যূনতম বেতনের হারই নির্ধারিত হয় তা নয়, সেখানে নাগরিকদের ন্যূনতম বেতন ভালভাবে জীবনধারণের মত ন্যায্য পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করা হয়। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সোবিয়েত রাশিয়ায় প্রত্যহ ৬ ঘণ্টা কাজের সময় বলে ধরা হত, সপ্তাহে ১ দিন শ্রমিকদের ছুটি দেওয়া হত। মাটির নীচে (অর্থাৎ খনি প্রভৃতির কাজে) অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত। সম্প্রতি সোবিয়েত রাষ্ট্রে নাগরিকদের সাপ্তাহিক শ্রমের মেয়াদ আরও হ্রাস করার প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গতিশীল ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রেও নাগরিকদের কাজের মেয়াদ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়, একই ধরনের কাজে নিযুক্ত

নির্ধারিত বা ন্যূনতম বেতন পাবার অধিকার

শ্রমিকদের সমান হারে মজুরি দেওয়া হয়, নাগরিকদের ন্যায্য মজুরি বা ন্যূনতম মজুরি পাবার অধিকারও স্বীকার করে নেওয়া হয়। প্রগতিশীল, জনকল্যাণকর, ধনতান্ত্রিক অস্ট্রেলিয়াতে নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকারগুলি রাষ্ট্র খুব সাফল্যের সঙ্গে বলবৎ করতে পেরেছে।

অনেক সময় নিজের আয়ত্তের বাইরে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে,যার ফলে নাগরিক বিনা অপরাধে বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। বার্ধক্য ব্যক্তিজীবনের একটি নিশ্চিত পরিণতি, কিন্তু বৈধব্য বিবাহিতার কাছে আকস্মিক দুর্ঘটনা। যে-কোন শিশু হঠাৎ অনাথ হয়ে যেতে পারে, যে-কোন ব্যক্তি আচমকা ব্যাধিগ্রস্ত, অকর্মণ্য হয়ে পড়তে পারে। কারখানার যে-কোন শ্রমিক দুর্ঘটনায় অক্ষম হয়ে যেতে পারে, অনিচ্ছাকৃতভাবে যে-কেউ বেকারত্বের শিকার হতে পারে। পূর্বে চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থায় এ ধরনের দুর্ঘটনাকে ব্যক্তিগত বীমার (Personal Risk Insurance) দ্বারা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা হত। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদের ক্রমিক প্রসারের ফলে বর্তমানে রাষ্ট্র নাগরিকদের **সামাজিক** (Social Insurance and Social Security) **অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বীমা ও নিরাপত্তার অধিকার** দিচ্ছে। ইংলণ্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শ্রমিক দলের (Labour Party) মুখপাত্ররূপে অর্থনীতিবিদ্ লর্ড্ বেভারিজ (Lord Beveridge) এ ধরনের প্রকল্পগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। পরে ব্রিটিশ্ সরকার সেগুলি কার্যকর করে তোলে। জনকল্যাণকর রাষ্ট্ররূপে ভারত সরকারও এ প্রকল্পগুলির কয়েকটি ধীরে ধীরে চালু করেছেন। সোবিয়েত নাগরিকগণ অবসর গ্রহণ করলে মাসিক ২০০ থেকে ৩০০ রুবল্ হারে অবসরভাতা (পেনসন্) পান (১ রুবল্ প্রায় ভারতীয় ১১ টাকার সমান)। অনেক রাষ্ট্র অসুস্থ নাগরিকের চিকিৎসার ব্যয় বহন করে। কর্তব্যরত অবস্থায় কোন দুর্ঘটনা ঘটলে রাষ্ট্রের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মী ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী। নারী শ্রমিকগণ গর্ভাবস্থায়, তার আগে ও পরে বিশেষ কতকগুলি সুবিধাভোগের অধিকারিণী। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, সুইডেন্, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড্ প্রভৃতি দেশে নাগরিকদের জন্য সংঘবদ্ধভাবে বীমাব্যবস্থা সুপরিকল্পিতভাবে তাদের জীবিকার ক্ষেত্রে নানাভাবে সাহায্য করে। নাগরিকগণ এ ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করলে ব্যক্তিগতভাবে আশ্বস্ত, নিরাপদ ও দুশ্চিন্তামুক্ত হবে। আবার, রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য, বৃহত্তর সমাজের প্রতি তাদের দরদও আন্তরিক হয়ে উঠবে।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে বীমা ও নিরাপত্তার অধিকার

ছুটি ও বিশ্রামের অধিকার নাগরিকদের প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক অধিকার। সোবিয়েত নাগরিকরা এ অধিকার ভোগ করেন। একটানা কর্মের ফলে শ্রমিকের শরীর খারাপ হয়, ক্লান্তি ও একঘেয়েমিতে মন ভরে ওঠে। নাগরিক-জীবনের এই অবহেলিত দিক সম্বন্ধে মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্

ছুটি ও বিশ্রামের অধিকার

তাঁদের "ভবিষ্যৎদৃষ্টি" ("Looking Into the Future") নামক প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন।

শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য **শ্রমিকসংস্থা গঠনের অধিকারকে** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি নাগরিকদের একটি প্রধান অর্থনৈতিক অধিকাররূপে স্বীকার করে থাকে। শ্রমিক-আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাস মূলতঃ সমাজতন্ত্রবাদের অগ্রগমনেরই ইতিহাস। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে শ্রমিকগণ শ্রমিকসংস্থার দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

শ্রমিকসংস্থা গঠনের অধিকার

আগেকার দিনে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবে সেই সুবিধাগুলি ভোগ করা তাদের পক্ষে স্বপ্নেরও অতীত ছিল। এই শ্রমিকসংস্থাগুলিকে বৈধ প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকার করার ফলে শ্রমিকদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা, তাদের কারখানার সামনে বা নিকটে সভাসমিতি করার অধিকার, তাদের সামগ্রিক স্বার্থে পত্র-পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদি অধিকারও বৈধ বলে স্বীকৃত। কোন কোন রাষ্ট্রে আবার শিল্পের পরিচালনার ব্যাপারে অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ, মূল্যনির্ধারণ, শ্রমিক-নিয়োগ প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য মালিকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শ্রমিকসংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়মিত বৈঠক হয়। ল্যাস্কি প্রভৃতি সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এভাবে কলকারখানা পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকীকরণের (Industrial Democracy) ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন। রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করলে শ্রমিকসংস্থাকে অবলম্বন করে অসুস্থ, অসামাজিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বেআইনি বলে ঘোষণা করতে পারে এবং এ রকম শ্রমিক সংস্থাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে। **ধর্মঘটের অধিকার** নাগরিকদের শ্রমিকসংস্থা গঠনের স্বাধীনতারই আর একটি দিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশও শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকারটিকে স্বীকার করে নিয়েছে। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে মালিকদের যেমন বিরাট সমিতি থাকে, শ্রমিকদেরও তেমনি

ধর্মঘটের অধিকার

বিরাট শ্রমিকসংস্থা থাকে। মালিকেরা শ্রমিক নিয়োগ করেন অর্থাৎ বাজারে শ্রমিকদের চাহিদা সৃষ্টি করেন। শ্রমিকগণ মালিকদের কাছে তাঁদের শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিকের হার এবং শ্রমিকরূপে অন্যান্য ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্বীকার করে নেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করে থাকেন। মালিক ও শ্রমিকের এই টানাপোড়েনে, অর্থাৎ চাহিদা এবং যোগানের সমতা স্থির হয় উভয়পক্ষের সংঘবদ্ধ দরাদরির (Collective Bargaining) দ্বারা। সুতরাং বিরাট শিল্পোন্নত দেশে শ্রমিকসংস্থাগুলির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। শ্রমিকদের বেতন, সাময়িক বাড়তি আয় বা বোনাস (Bonus) প্রভৃতি ঠিকমত স্থির না হলে ধর্মঘটের (strike) আহ্বান জানান হয়। আবার, মালিকপক্ষও শ্রমিকদের জব্দ করার জন্য ছাঁটাই প্রভৃতি নীতি গ্রহণ করতে পারেন এবং দরকার হলে কারখানা ভেতর থেকে বন্ধ করে শ্রমিকদের প্রবেশে বাধা (Lock-out) সৃষ্টি করতে পারেন। সুতরাং শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকারকে একটি চরম অধিকার বলা যায় না। মালিকদেরও শ্রমিকস্বার্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে রীতিমত জোরালো প্রভাব সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে।

॥ নাগরিক অধিকার ঃ সামাজিক অধিকার ॥

সামাজিক অধিকারের প্রকারভেদ

সামাজিক অধিকারগুলির দ্বারা নাগরিকের ব্যক্তিসত্তা সামাজিক সত্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অধিকারগুলি হল—শিক্ষার অধিকার, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার, ভাষা ও লিপি রক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার, সুস্থ, ভদ্র পরিবেশে বাসের অধিকার, সামাজিক সাম্যের অধিকার।

শিক্ষার অধিকার

শিক্ষার অধিকার (Right to Education) নাগরিকের প্রধান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার। উপযুক্তভাবে শিক্ষিত না হলে নাগরিক রাষ্ট্রের পরিচালনার ব্যাপারে উদাসীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে ওঠে। এই মৌলিক অধিকার থেকেই উদ্ভূত আরও কয়েকটি অধিকার। যেমন—মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের অধিকার, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার, ভাষা ও লিপিরক্ষার অধিকার। এই সামাজিক অধিকারগুলি মানুষের মনকে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে দেয়। জ্ঞানের আলো ব্যক্তিমননের অন্ধকার যবনিকা উন্মোচন করে। ব্যক্তিমনন যতই আলোকিত হয়, সামাজিক পরিবেশ ততই স্বচ্ছ, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধীনস্থ সংস্থা ইউনেস্কো (UNESCO) তাই নিরক্ষরতা-দূরীকরণকে দারিদ্র্য-দূরীকরণের মত সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করে শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টাকে ব্যাপক করে তুলছে। এদিক থেকে বিচার করলে শিক্ষার অধিকারকে শুধু সামাজিক অধিকার বলাই যথেষ্ট নয়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক অধিকার (Human Right)। শিক্ষা গড়ে তোলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে আদর্শ গণতান্ত্রিক নাগরিক। শিক্ষার অধিকারের সঙ্গে জড়িত ভাষা, লিপি প্রভৃতি কৃষ্টিগত বা সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি শুধু ব্যক্তিগত সামাজিক অধিকার নয়, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের পক্ষেও এগুলি মূল্যবান্ সামাজিক অধিকার। এ অধিকারগুলি গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের মধ্যে নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলে, সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের মধ্যে ভাববিনিময় সহজ হয়, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি দৃঢ় হয়।

স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার

স্বাস্থ্যই সম্পদ (Health is Wealth)। দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত, চিন্তামুক্ত করে। মানুষের মনোবল অটুট হয়, তার আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়। সে সমস্ত কাজকর্মে অফুরন্ত উৎসাহ, অনন্ত উদ্দীপনা খুঁজে পায়। তাই **স্বাস্থ্য রক্ষার অধিকারকে** গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অধিকার বলা হয়। সোবিয়েত রাশিয়া, চীন প্রভৃতি সমাজতন্ত্রী দেশগুলি নানাপ্রকার খেলাধূলা ও গঠনমূলক কাজকর্মে যুবশক্তিকে নিয়োজিত করে এবং সেজন্য জন্ম থেকেই ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সুস্বাস্থ্য গড়ে তুলতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হয়।

সুস্থ, ভদ্র পরিবেশে বাসের অধিকার শুধু ব্যক্তিগত চাহিদা নয়, এটি ব্যক্তির

একটি মূল্যবান সামাজিক অধিকার। মেহনতী মানুষ মূলতঃ শান্তিপ্রিয়, ষড়ঋতুর আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়ে পরিবেশ দূষণ হতে দূরে থেকে নিজের একটা জীবন, আপনার একট পরিমণ্ডল রচনা করতে চায়। ইমারত নয়, রাজপ্রাসাদ নয়, তার অতি সাধারণ মানবিক দাবি—"একটুকু বাসা"। চাহিদার তুলনায় সরবরাহের ঘাটতি থাকার জন্যই উদ্বাস্তু কলোনী, রেল কলোনী নামক নোংরা, অস্বাস্থ্যকর বস্তি ব্যাপকভাবে যত্র তত্র গড়ে ওঠে। সুনাগরিক গড়ে তুলতে হলে সুস্থ পরিবেশে তার বাস করার অধিকারকে স্বীকার করে নিতে হবে। তাই আধুনিক রাষ্ট্রগুলি সরকার বা পৌর প্রতিষ্ঠানের মারফত সুস্থ পরিবেশে দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য নানাপ্রকার আবাসন পরিকল্পনা গড়ে তুলছে, বস্তি উন্নয়ন, এমন-কি বস্তি উচ্ছেদের জন্যও প্রকল্প গ্রহণ করছে।

সুস্থ, ভদ্র পরিবেশে বাসের অধিকার

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সাম্যের অধিকার বলতে শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সাম্যই বোঝায় না, সামাজিক সাম্যও এই অধিকারের অন্তর্গত। সামাজিক সাম্যের অধিকারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই সমাজের বেশীর ভাগ চাকুরীর ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেওয়া ; ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী ইত্যাদি বিচার না করে সকলকে শিক্ষালাভের বা বৃত্তিনির্বাচনের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেওয়া ; ভোজনালয়, স্নানাগার ইত্যাদি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ও ব্যবহার্য করে দেওয়া ইত্যাদি। মার্কসবাদীগণ অবশ্য বলেন যে, প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সাম্যের অধিকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ও সর্বাত্মক সমতা সৃষ্টি করতে পারে।

সামাজিক সাম্যের অধিকার

॥ নাগরিকের বিভিন্ন অধিকারের মধ্যে সম্পর্ক ॥

নাগরিক অধিকারগুলিকে পৌর, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক এই চারটি ভাগে বিভক্ত করার অর্থ এ নয় যে, এই প্রত্যেকটি বিভাগের অন্তর্গত এক-একটি অধিকার অন্য কোনও বিভাগের অন্তর্গত কোনও অধিকার থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন। আসল কথা হল, প্রথমতঃ, অধিকারের উৎস নাগরিকের স্বাধীনতাপ্রিয়তার মধ্যে এবং তার নিজের ব্যক্তিত্বকে সুচারুভাবে ফুটিয়ে তোলার আগ্রহের মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ, নাগরিক অধিকারগুলি সব ক্ষেত্রেই অখণ্ড ব্যক্তিসত্তার, নিটোল ব্যক্তিমনের বহিঃপ্রকাশ। যেমন ধরা যাক,—বাক্‌স্বাধীনতা। এটিকে প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী একটি পৌর অধিকার বলে ধরা হয়। কিন্তু এটি আবার ভোটদানের মত রাজনৈতিক অধিকারেরও উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করে থাকে। কারণ, বাক্‌স্বাধীনতা না থাকলে নাগরিকগণ সভাসমিতির মারফত সুষ্ঠুভাবে জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হন না। ফলে, পৌর স্বাধীনতা হলেও বাক্‌স্বাধীনতা পরোক্ষে একটি রাজনৈতিক অধিকার।

(১) ৪ প্রকার অধিকার পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত

দ্বিতীয়তঃ, নাগরিকের বিভিন্ন প্রকার অধিকারের গুরুত্ব সমান। ল্যাস্কি বলেছেন, এই সমস্ত অধিকারই নাগরিকগণ কোনও বিশেষ রাষ্ট্রে কতটা ভোগ করে থাকেন, তার ওপরেই সে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকতা পুরোপুরি নির্ভর করে থাকে।

(২) অধিকার রাষ্ট্রের সূচক

তৃতীয়তঃ, নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে যে আত্মীয়তার রাখিবন্ধন গড়ে ওঠে, সেটি তাদের প্রত্যেকেরই সমানভাবে সমাজনির্ভর হবার ফলে। এই চার শ্রেণীর অধিকারই নাগরিকদের কাছে বাস্তবে রূপায়িত হয় সমাজজীবন যেভাবে নাগরিকদের ব্যক্তিগত জীবনকে গড়ে তোলে তার দ্বারা। অধিকারগুলি ভোগ করার মত উপযুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ না থাকলে সেগুলি শুধু কতকগুলি ফাঁকা বুলিই থেকে যায়, সেগুলি প্রকৃত অধিকারের রূপ লাভ করতে পারে না। নাগরিকদের শিক্ষার মান সমাজজীবনকে এবং রাষ্ট্রজীবনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

(৩) এদের সামাজিক মূল্য এক

চতুর্থতঃ, আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে নাগরিক অধিকার শুধু কোনও বিশিষ্ট রাষ্ট্রের ব্যক্তির অধিকার নয়। নাগরিক অধিকার এখন মানবাধিকারের অংশ বলে গণ্য করা হয়।

(৪) মানবিক মূল্য সমান

॥ নাগরিকের কর্তব্য ও দায়দায়িত্ব ॥

নাগরিকের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন অধিকার এবং কর্তব্য এই দুই নিয়ে জড়িত। প্রত্যেক মুদ্রার দুটি পিঠ আছে। সমাজজীবনও যেন একটি মুদ্রার মত— এক পিঠে নাগরিকের অধিকার (Rights), অপর পিঠে নাগরিকের কর্তব্য (Duties)। রাষ্ট্র নাগরিককে নিজের ব্যক্তিত্ববিকাশের মধ্য দিয়ে সমাজজীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করার জন্য সচেষ্ট করে। কিন্তু পৃথিবীতে কোন কিছুকেই একতরফা বলে ভাবা হয় না। নাগরিক শুধু রাষ্ট্রের কাছে কতকগুলি অধিকার পেলেই রাষ্ট্র এবং নাগরিকের সম্পর্কটুকু শেষ হয়ে যায় না। নাগরিকের কাছ থেকে রাষ্ট্রও কিছু আশা করে বইকি। নাগরিকদের কাছ থেকে রাষ্ট্রের এই প্রত্যাশা থেকেই নাগরিক কর্তব্যগুলির উদ্ভব হয়েছে।

অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক

শুধু রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নাগরিক কর্তব্যগুলির আবির্ভাব ঘটে নি। পৌর বিজ্ঞানের, তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূচনা হল মানুষের স্বাভাবিক সামাজিকতাকে অবলম্বন করে। তাই কোন নাগরিকের অধিকার শুধু তার একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ নয়, এটা বিশিষ্ট অর্থে সামাজিক সম্পদও। এর অর্থ হল এই যে, নাগরিকের অধিকার ভোগ নির্ভর করে অন্য নাগরিকদের সহানুভূতি, সচেতনতা এবং সক্রিয় সহযোগিতার ওপর। সুতরাং কোনও অধিকারই নিরঙ্কুশ ব্যক্তিগত অধিকার নয়। প্রত্যেকটি নাগরিক অধিকারই অন্য নাগরিকদের কল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্র প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। নাগরিকের অধি-

নাগরিক অধিকার ব্যক্তিগত সম্পদ, সামাজিক সম্পদও

কারের এই অপরব্যক্তিক দিকটির জন্য প্রত্যেকটি নাগরিক অধিকার সীমাবন্ধ। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি নাগরিক অধিকার নির্ভর করে সকল নাগরিকের পারস্পরিক সমাজবোধের ওপর। প্রত্যেক নাগরিককে সেজন্য সমবেতভাবে একই অধিকার সকলে যেন ভোগ করতে পারে, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে কতকগুলি কর্তব্য পালন করে যেতে হয়।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকগণ রাষ্ট্রসৃষ্টির পূর্বে যে সমাজকে প্রাকৃতিক রাষ্ট্র রূপে কল্পনা করেছিলেন, সেখানে নাগরিকদের মধ্যে এই ধরনের সহানুভূতির কোন বালাই ছিল না, নাগরিকেরা সেখানে শুধু অধিকারই ভোগ করেছে, কোন কর্তব্যের অস্তিত্ব সেখানে ছিল না। সামাজিক চুক্তি মতবাদটি সমালোচিত হয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তির তত্ত্ব হিসাবে পরিত্যক্ত। কিন্তু এর মধ্যে যে প্রধান সত্যটি নিহিত, তা হল এই যে, সচেতন নাগরিক ব্যতীত সমাজ-জীবন চলে না, রাষ্ট্রও গঠিত হতে পারে না। সমাজজীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবন এগুলি সবই নির্ভর করে কতকগুলি নিয়মশৃঙ্খলার ওপর। এই নিয়মশৃঙ্খলার অন্যতম তাৎপর্য হল নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সমানভাবে সচেতন থাকা। সেজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, অধিকার এবং কর্তব্য আদর্শ নাগরিক জীবনের, আদর্শ রাষ্ট্রিক জীবনের, আদর্শ সমাজজীবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক। **অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর নির্ভরশীল।** ("Rights imply Duties")।

চুক্তিমতবাদের প্রাসঙ্গিকতা: অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের পরিপূরক

হবহাউস (Hobhouse) খুব সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়ে নাগরিকদের পরস্পরের প্রতি কর্তব্যের সঙ্গে প্রত্যেকের অধিকারভোগের সম্বন্ধটি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, নাগরিক যদি অবাধে রাস্তায় ভ্রমণের অধিকারী হন, তা হলে অন্য নাগরিকের কর্তব্য তাঁকে পথ ছেড়ে দেওয়া ("If I have a right to walk along the street without being pushed off the pavement……your duty is to give me reasonable room.")। আবার, রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকদের কর্তব্য আছে বইকি। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডলটন (Dalton) বলেছেন যে, নাগরিকগণ যদি নিয়মমত কর, শুল্ক ইত্যাদি রাষ্ট্রকে প্রদান না করেন, তা হলে রাষ্ট্রের জনহিতকর, সেবামূলক কাজকর্মগুলি অচল হয়ে যাবে।

হবহাউস ও ডলটনের বক্তব্য

রাষ্ট্রেরও নাগরিকদের প্রতি দায়দায়িত্ব আছে। নাগরিকদের অধিকার ভোগ সহজ এবং সার্থক করে তুলেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিকদের প্রতি তার দায়দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে থাকে। রাষ্ট্র নাগরিকদের কি ধরনের এবং কতটা অধিকার ভোগ করতে দেয় তার ওপর রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকতা নির্ভর করে। তেমনি নাগরিকগণ পরস্পরের প্রতি এবং রাষ্ট্রের প্রতি যে ধরনের কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়, তার ওপর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জাতীয় চরিত্র নির্ভরশীল।

রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা

অনেকে নাগরিকের কর্তব্যগুলিকে আইনগত কর্তব্য এবং নৈতিক কর্তব্য এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন। রাষ্ট্র তার আইনসভার দ্বারা অনুমোদিত আইনকানুনের

সাহায্যে নাগরিকদের যে দায়দায়িত্বগুলি ঘোষণা করে থাকে এবং যে দায়িত্বগুলি পালন না করলে রাষ্ট্র নাগরিকদের বিধিমত দণ্ড দিতে পারে, সেই কর্তব্যগুলিকে আইনগত কর্তব্য (Legal duties) বলা হয়। যেমন, রাষ্ট্রের অর্থদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী নাগরিকদের আয়কর দান একটি বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। এটিকে নাগরিকদের একটি আইনগত কর্তব্য বলা যায়। অপর পক্ষে, যে দায়িত্বগুলি পালন করা বা না-করা নাগরিকের ব্যক্তিগত বা সামাজিক নীতিবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেই দায়িত্বগুলি নৈতিক কর্তব্যের (Moral duties) অন্তর্গত। বৃদ্ধ মাতাপিতাকে সাধ্যমত সেবা করা সন্তানরূপে নাগরিকের একটি প্রধান নৈতিক কর্তব্য।

নাগরিকের আইনগত কর্তব্য ও নৈতিক কর্তব্য

আইনগত এবং নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল এই যে, আইনগত কর্তব্যগুলি রাষ্ট্রের আইন-আদালতের দ্বারা সংরক্ষিত হয়, কিন্তু নৈতিক কর্তব্যগুলি রাষ্ট্রের আইন-আদালত স্বীকার করে না। এই পার্থক্যের মূল কারণ হল—আইনগত কর্তব্য নাগরিকের বাইরের আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু নৈতিক কর্তব্য নাগরিকের আন্তরিক নীতিবোধের সঙ্গে জড়িত। বিভিন্ন দেশের আইনকানুনের বিভিন্নতার ফলে নাগরিকদের আইনগত কর্তব্যগুলির স্বরূপ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। আবার, নাগরিকের নীতিবোধ নানাদেশে নানাকালে, নানা পরিবেশে নানারকম। এই কারণেই দেখা যায় যে, কোন রাষ্ট্রে নাগরিকের একটি বিশেষ কর্তব্য হয়ত আইনগত কর্তব্যরূপে স্বীকৃত, আবার অন্য রাষ্ট্রে হয়ত সেই কর্তব্যটি নৈতিক কর্তব্যরূপে পরিচিত। সাধারণ নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থীকে সমর্থন করে ভোটদান করাকে সাধারণতঃ একটি নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করা হয়। কিন্তু মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম এবং সুইজারল্যান্ডে ভোট দেওয়াকে নাগরিকের আইনগত কর্তব্য বলে সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং আইনগত কর্তব্য এবং নৈতিক কর্তব্য এই দু'প্রকার কর্তব্যের মধ্যে পরিষ্কারভাবে পার্থক্য নির্ণয় করা সব সময় সম্ভব নয়।

এই দু'রকম কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্যনির্ণয় কঠিন

সংক্ষেপে বলতে গেলে নাগরিকের প্রধান কর্তব্যগুলি হল পরিবারের প্রতি কর্তব্য, সমাজের প্রতি কর্তব্য, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য এবং বিশ্ববাসীর প্রতি কর্তব্য।

কর্তব্যের প্রকারভেদ

পরিবারের প্রতি কর্তব্য নাগরিকের একটি মৌলিক কর্তব্য। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, পরিবার হল সমাজের আদিম এবং প্রাথমিক সংগঠন। মানুষ জন্মলাভ করেই নাগরিক হয় না। শিশু তার মাতাপিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়কুটুম্বদের স্নেহে, যত্নে, আদরে, সোহাগে বড় হয়। যতদিন সে স্বাবলম্বী না হয়ে ওঠে, ততদিন সে থাকে নাবালক। সাবালক হলে তবেই সে নাগরিকত্ব লাভ করে; কেননা, আধুনিক রাষ্ট্রে তার এই সাবালকত্ব প্রাপ্তির প্রধান নিদর্শন হল প্রাপ্তবয়স্করূপে তার ভোটদানের যোগ্যতালাভ।

(১) পরিবারের প্রতি কর্তব্য

সুখী পরিবার গঠন ব্যক্তিজীবনের প্রধান লক্ষ্য। কত যত্নে, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা মনে রেখে মাতাপিতা তাঁদের সন্তানদের প্রতিপালন করেন, তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন, পরে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী জীবিকা নির্বাহের পথ খুঁজে দেন। তেমনি সন্তানদের দায়িত্ব রয়েছে মাতাপিতা, শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা এবং তাঁদের নির্দেশ মেনে চলা। অনুরূপ কর্তব্যবোধ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কার্যকলাপের মধ্যে নিহিত। আদর্শ পরিবার এমন, যে পরিবারের সকলেই নিজেদের নির্দিষ্ট কর্তব্যগুলি পালন করে চলেন।

সুখী পরিবার কাকে বলে

সমাজের প্রতি কর্তব্য নাগরিকদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। মানুষ সভ্যতার রাজপথে এগিয়ে চলে সমাজের হাত ধরেই। তার স্বাভাবিক সামাজিকতা তাকে পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে কূপমণ্ডুক করে রাখতে পারে না। শুধু গতিশীল নয়, প্রগতিশীল হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষাও মানুষের আরেকটি সামাজিক প্রবৃত্তি। সে শুধু বাঁচতে চায় না, আরও ভালভাবে বাঁচতে চায়। সে চায় তার সন্তানগণ তার চেয়ে সুন্দর জীবনযাপন করতে যেন সক্ষম হয়। এই রকম ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়েই মানুষ তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে পারে যে, তার ব্যক্তিগত উন্নতি সমষ্টিগত উন্নতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সেজন্য নাগরিক তার নিজের স্বার্থের সঙ্গে অপরের স্বার্থকে মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। তবেই তার পূর্ণ আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয়। সমাজের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য তাই অন্য নাগরিকদের প্রতি তার কর্তব্যের মধ্যে রূপায়িত। অন্যের অধিকার যেন কোন একজন নাগরিকের যথেচ্ছাচারিতার ফলে বিপর্যস্ত না হয়, সেদিকে নাগরিককে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে। আবার, সমাজের প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদনের সময় নাগরিককে মনে রাখতে হবে, যেন কোনভাবে সমাজবিরোধী কাজে সে লিপ্ত না হয়। তার চিন্তাধারা, আচার-আচরণ, কার্যকলাপ সব কিছু এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে তার ও অন্য সকলের কল্যাণ সাধিত হয়।

(২) সমাজের প্রতি কর্তব্য

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য হল নাগরিকদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এগুলির মধ্যে পড়ে—রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, আইনানুবর্তিতা, নিয়মিত করদান, ভোটদান, সরকারী কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন প্রভৃতি।

(৩) রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য

রাষ্ট্রের প্রতি যে নাগরিক আনুগত্য প্রদর্শন করে না, সে দেশদ্রোহী। গুপ্তচরবৃত্তি অবলম্বনের ফলে কোনও নাগরিক যদি বিদেশী কোন রাষ্ট্রকে সহায়তা করে, তা হলে ধরা পড়লে সে সেই দেশের আইন অনুসারে এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। ১৯৮৫ সালের মে মাসে প্রবর্তিত আইন অনুসারে ভারত সরকার রাষ্ট্রের সার্বিক স্বার্থে এজন্য প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারেন। সোবিয়েত রাশিয়ার শাসনতন্ত্রে রুশ নাগরিকদের প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যুদ্ধ

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য

করা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। চীনা প্রজাতন্ত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। কোনও কোনও রাষ্ট্রে যুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনী থেকে পলায়ন করাকে রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্রোহ করার সামিল বলে মনে করে এবং এজন্য সংশ্লিষ্ট নাগরিককে দণ্ড দিয়ে থাকে। তবে বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি আধুনিক শান্তিবাদী (Pacifist) মনীষিগণ যুদ্ধের সময় নাগরিকদের সৈন্যবাহিনীতে যোগদানকে বাধ্যতামূলক করার তীব্র বিরোধিতা করেন। বিবেকের দাবিতে অহিংস আদর্শে এবং শান্তির নীতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের (Conscientious objector) এই অমানবিক কর্তব্যপালন থেকে মুক্ত রাখার জন্য তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন। আবার, অনেকে "আনুগত্য" কথাটির আরও ব্যাপক অর্থ নির্দেশ করেছেন। তাঁদের মতে, দেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সময়ে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা, অপরাধ দমনের জন্য এবং অপরাধীকে খুঁজে বার করার জন্য পুলিশকে সাহায্য করা, রাষ্ট্রের স্বার্থে নিজের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সমর্পণ করা প্রভৃতি কর্তব্য "রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের" অন্তর্ভুক্ত।

আইনানুবর্তিতার অর্থ—নাগরিক শুধু যে নিজেই রাষ্ট্রের আইনকানুন মেনে চলবে তাই নয়, অন্য নাগরিকগণও যাতে সেই আইনকানুনগুলি মেনে চলে, তার জন্য চেষ্টা করবে। আবার, আইন মেনে চলার অর্থ এ নয় যে, নাগরিক শুধু প্রচলিত আইনগুলির ভাষাগত অর্থের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করবে। এই আইনগুলির অন্তর্নিহিত নির্দেশগুলিও তাকে সচেতনভাবে মেনে চলতে হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য এবং আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে নাগরিককে সরকারী কর্মচারীদের সব দিক দিয়ে সাহায্য করতে হবে। রাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিক যদি প্ররোচিত হয়ে অন্যায়ভাবে আইন অমান্য করতে প্রবৃত্ত হয়, তা হলে রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়বে।

আইনানুবর্তিতা

কিন্তু তাই বলে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালনের অর্থ এ নয় যে, নাগরিক বিনা প্রতিবাদে রাষ্ট্রের সমস্ত নিয়মকানুনই মেনে চলতে বাধ্য। রাষ্ট্র অনেক সময় কুচক্রী রাজনৈতিক দলের সুবিধাবাদ ও স্বার্থসিদ্ধির মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। এই কুচক্রী সরকার আইনপ্রণয়ন করে অন্যায়ভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে, কোনও ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের স্বার্থে আইনগুলিকে যথেচ্ছভাবে বিকৃত করে রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিকৃত করে তুলতে পারে। এই অবস্থায় আদর্শ নাগরিকের কর্তব্য জনস্বার্থবিরোধী আইনগুলির সমালোচনা প্রভৃতির দ্বারা জনসাধারণকে সচেতন করা, প্রবল জনমত গঠন করা এবং বৈধ বা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে "আইন" অমান্য করা। মহাত্মা গান্ধী ভারতে ইংরেজ আমলে অন্যায় আইন অমান্য করার জন্য ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করে তোলেন এবং অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে (Non-violent Civil Disobedience Movement) নেতৃত্ব দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত হন।

কিন্তু কুচক্রী সরকারকে প্রতিরোধও কর্তব্য

নিয়মিত করদান সুনাগরিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। নাগরিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে তার নিজের ও অন্যান্য নাগরিকদের কল্যাণসাধনের জন্য নানাপ্রকার সেবামূলক কার্যকলাপ প্রত্যাশা করে থাকে। আধুনিক প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলিও জনকল্যাণকর রাষ্ট্ররূপে এই সমস্ত জনহিতকর কার্য সম্পাদন করে থাকে। কিন্তু এগুলি সম্পাদনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন অর্থ নেই, নাগরিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হারে কর আদায় করে রাষ্ট্র তার রাজকোষ গঠন করে থাকে। অন্যান্য সংগঠনের মত রাষ্ট্রও তার জনহিতকর কাজগুলি সম্পাদনের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ধনভাণ্ডার গড়ে তোলে। সেজন্য নাগরিকগণ যদি নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত হারে রাষ্ট্রকে করদান না করেন, তা হলে রাষ্ট্রের পক্ষে কোনরকম তহবিল গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। নাগরিকদের পক্ষে করদান করার কর্তব্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কর ফাঁকি না-দেওয়া। বহু ধনতান্ত্রিক দেশে করনীতি যে আইন-কানুনগুলির সাহায্যে পরিচালিত হয়, সেগুলির মধ্যে নানারকম ফাঁক খুঁজে বার করা হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে উচিত এই ধরনের ফাঁকগুলি সম্বন্ধে সজাগ থাকা, যাতে নাগরিকদের পক্ষে কর ফাঁকি দেওয়া কোনভাবেই সম্ভব না হয়। ধনী ব্যবসাদার, চোরা-কারবারী এবং অসৎ পুঁজিপতিদের মধ্যে সাধারণতঃ ব্যাপকভাবে কর ফাঁকি দেবার প্রচেষ্টা চলে।

নিয়মিত করদান

ভোটদান নাগরিকদের একটি পবিত্র কর্তব্য। ভোটব্যবস্থার মধ্য দিয়েই আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, প্রকৃতপক্ষে, জনমতের ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুযায়ী নিজের শাসননীতি নির্ধারণের চেষ্টা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণের মতে, প্রত্যেক নাগরিকের যেমন ভোটদানের অধিকার আছে, তেমনি ভোটদানের জন্য দায়িত্বও আছে। প্রত্যেক ভোটদাতাকে নিজের এলাকার রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসূচী ভাল করে জানতে হবে, বিভিন্ন প্রার্থীদের যোগ্যতা তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখতে হবে, ভোট-দানের সময় উপযুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচন করতে হবে। ভোটদানে বিরত থাকা, ভোটবিক্রয়, ভোট না-দেওয়া, নির্বাচনে রিগিং, জাল ভোট দেওয়া, বুথ দখল প্রভৃতি কারচুপিতে অংশগ্রহণ নাগরিকের চরম দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক। এর ফলে শেষে ফ্যাসিবাদের জয় হয়। আবার, প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্বাচন-ব্যবস্থাকে ত্রুটিবিহীন ও দুর্নীতিমুক্ত রাখা।

ভোটদান

সরকারী কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করাও নাগরিকদের একটি বড় কর্তব্য। আইনকানুন যথাযথ পালন করা নাগরিকের গুরুতর দায়িত্ব। যদি রাষ্ট্র নাগরিককে দেশের ও দশের স্বার্থে কোনরকম দায়িত্ব পালন করতে নির্দেশ দেয়, তা হলে অবৈতনিক হলেও নাগরিককে সে দায়িত্ব পালনের জন্য সব সময়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। লোকগণনার সময়ে কিংবা মহামারী প্রভৃতি কোনও জাতীয় বিপদের সময় এ ধরনের অনেক দায়িত্ব নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও নাগরিককে পালন করতে হয়।

সরকারী কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন

সরকার যদি কোন প্রখ্যাত উকিলকে বিচারপতি নিয়োগ করতে চান, তা হলে নিজের ব্যবসায়ে ক্ষতি স্বীকার করেও তাঁর এই পদ গ্রহণ করা উচিত।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, **বিশ্ববাসীর প্রতি কর্তব্য** নাগরিকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। বিজ্ঞানের চমকপ্রদ অগ্রগতির ফলে আধুনিক যুগে পৃথিবীর এক প্রান্তের রাষ্ট্র অন্য প্রান্তের রাষ্ট্রের খুব কাছে এসে পড়েছে। সুতরাং প্রতি মুহূর্তে এক দেশের নাগরিক অন্য দেশের নাগরিকের সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতন হবার সুযোগ পাচ্ছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠার পর বিশ্বমানবতাবোধ আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সকলেরই কাছে দৃঢ়তর। বিশ্বমানবপ্রীতির ফলেই বিভিন্ন দেশের নাগরিকগণ নানাপ্রকার সাংস্কৃতিক, কৃষ্টিমূলক, ঐতিহ্যগত, ভাবগত আদানপ্রদানের জন্য প্রস্তুত হতে পারছে। আধুনিক রাষ্ট্রের ও আধুনিক মানবসমাজের কল্যাণের জন্য সচেতন থাকা এবং সেজন্য যথাযথভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করা নাগরিকের একটি গুরুতর কর্তব্য।

(৪) বিশ্ববাসীর প্রতি কর্তব্য

॥ ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার ॥

ভারতের প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) দানের ফলে পরাধীন ভারতীয় ব্যক্তি স্বাধীন ভারতীয় নাগরিকরূপে অত্যন্ত গৌরবজনক ভূমিকা পালনের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতীয়দের স্বাধীন নাগরিকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ট্ (Mrs. Annie Besant) যে স্বায়ত্ত-শাসন সম্পর্কিত বিল (Home Rule Bill) সমর্থন করেন, তাতে ভারতীয়দের নানারকম নাগরিক অধিকার দেবার প্রস্তাব পেশ করা হয়। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকারগুলি বিধিবদ্ধ করে একটি ঘোষণা পত্র (Declaration) ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে দাবী করেন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে আয়ারল্যান্ডের শাসনতন্ত্রে অনুরূপ একটি প্রস্তাব গৃহীত হবার ফলে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এই দাবী আরও জোরালো হয়ে ওঠে। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয়দের মৌলিক অধিকারগুলি বিধিবদ্ধ করার দাবী জানিয়ে পুনরায় প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু সাইমন্ কমিশন্ (Simon Commission) এ প্রস্তাব বাতিল করেন। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে গান্ধীজী এই প্রস্তাব ইংরেজ সরকারের কাছে পেশ করেন। তৎকালীন ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ (Ramsay Macdonald) এই দাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু সংসদে তাঁর দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় তখন ইংলণ্ডের সর্বদলীয় জাতীয় সরকার ভারতীয়দের এই দাবী অগ্রাহ্য করে। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনেও (Government of India Act, 1935) এই দাবী স্বীকৃত হয় নি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম মূলতঃ নাগরিক অধিকার অর্জনের লড়াই ঃ এজন্য জাতীয় কংগ্রেসের গৌরবময় প্রচেষ্টা স্মরণীয়

স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ (Constituent Assembly) যখন তৎপর হন, তখন ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলির প্রতি ভারতীয় প্রতিনিধিদের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়। গণপরিষদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন এবং আইরিশ প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি যেভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং ভারতীয় সংবিধানে কিভাবে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার-গুলি লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত করা যায়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

ভারতীয় গণপরিষদের প্রচেষ্টা

ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের বিশেষ কতকগুলি মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে এই অধিকারগুলিকে ৭টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলি হল (ক) সাম্যের অধিকার (Right to Equality) ; (খ) স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom) ; (গ) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation) ; (ঘ) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion) ; (ঙ) শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক অধিকার (Educational and Cultural Rights) ; (চ) সম্পত্তির অধিকার (Right to Property) এবং (ছ) শাসনতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকার লাভের অধিকার (Right to Constitutional Remedies)। কিন্তু ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুসারে সম্পত্তির অধিকার আর মৌলিক অধিকার বলে গণ্য হয় না। সুতরাং বর্তমানে ভারতীয় নাগরিকগণ ৬ রকম মৌলিক অধিকার ভোগ করেন।

বর্তমানে ভারতীয় নাগরিকদের ৬ রকম মৌলিক অধিকার

ভারতীয় সংবিধানের ১৪ এবং ১৬ ধারায় ভারতীয় নাগরিকদের **সাম্যের অধিকার** দেওয়া হয়েছে। ধনী, দরিদ্র কিংবা বর্ণ, ধর্ম, শ্রেণী নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিককে সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকই সরকারী কাজ লাভের সমান অধিকারী। অস্পৃশ্যতা বেআইনী বলে ঘোষিত হয়েছে। সংবিধানের ১৮ ধারা অনুসারে কেউই শিক্ষাগত উপাধি ছাড়া অন্য কোন উপাধি পাবার অধিকারী হবেন না। ভোটদানের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে এবং প্রত্যেক ভারতীয় নির্বাচনে প্রার্থীরূপে দাঁড়াবার অধিকারী।

(১) সাম্যের অধিকার

কিন্তু সাম্যের অধিকার নিরঙ্কুশ অধিকার নয়। সংবিধানের ১৫ (৩) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র নারী এবং শিশুদের রক্ষার জন্য বিশেষ আইনকানুন বিধিবদ্ধ করার অধিকারী। ১৯৫১ সালের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আইনে রাষ্ট্র অনুন্নত শ্রেণীর ব্যক্তিদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ আইনকানুন গ্রহণ করার অধিকারী। সংবিধানের ১৬ ধারা অনুসারে চাকরীর ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র অনুরূপভাবে অনগ্রসর শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সুবিধা দান করতে পারে। যদি কেউ মনে করেন যে, এভাবে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে কোন বিশেষ শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকার সচেষ্ট, এবং তার ফলে সাম্যের

সাম্যের অধিকারের সীমা

অধিকার লঙ্ঘিত হবার আশঙ্কা রয়েছে, তা হলে তার উত্তরে একথা বলা যায় যে, বস্তুতঃ এই ব্যবস্থাগুলি সাম্যের নীতিকেই অধিকতর সফল করে তোলার দিকে সচেষ্ট। ভারতের ৫ কোটির বেশী অনুন্নত হরিজনদের অগ্রগমনের জন্য বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা না দিলে ভারতীয় সমাজে সাম্যের নীতি অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। সংবিধানের ১৭ ধারা অস্পৃশ্যতা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় সংবিধানের ১৪ ধারার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চিরঞ্জিতলাল চৌধুরী বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন মামলাটির রায়দানের সময় সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত করেন যে, এই ধারাটির প্রধান তাৎপর্য হল—সকলেই সব সময়ে আইনের চক্ষে সমান। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করলে ন্যায়সঙ্গতভাবে সমতামূলক আইনপ্রণয়নের জন্য নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারে। তৃতীয়তঃ, এই ধরনের শ্রেণীবিভাগের বিরুদ্ধে যদি কোন ভারতীয় নাগরিক কোনরকম প্রশ্ন তোলেন, তা হলে তাঁকেই তাঁর যুক্তির যথার্থতা প্রমাণ করতে হবে। সুপ্রীম কোর্ট এই মামলায় রায়দানের সময় একথা স্বীকার করেছেন যে, সাম্যের অধিকারকে ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে ভারতের অসম সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বৈষম্য সৃষ্টি হবেই। কিন্তু রাষ্ট্রের ঘোষিত শ্রেণীবিন্যাস এই ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করেছে—শুধুমাত্র এই অজুহাতে সাম্যের অধিকার লঙ্ঘন করেছে বলে তাকে ধরা হবে না।

চিরঞ্জিতলাল বনাম ভারতীয় মামলা ইউনিয়ন

কার্যক্ষেত্রে ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত সাম্যের অধিকারকে অনেক সময় মান্য করা হয় না। রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট প্রশাসককে সংবিধানের ৩৬১ ধারা অনুযায়ী আদালতের এক্তিয়ারের বহির্ভূত রাখা হয়েছে।

সাম্যের ব্যতিক্রম

ভারতের নাগরিকদের সংবিধানের ১৯ থেকে ২২ ধারার মারফত যে **স্বাধীনতার অধিকার** দেওয়া হয়েছে তার পরিধি খুবই ব্যাপক। এর মধ্যে শুধু **১৯ ধারাতেই সাত প্রকার মৌলিক স্বাধীনতার অধিকার** ঘোষিত হয়েছে—বাক্‌স্বাধীনতা এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ; সভাসমিতির স্বাধীনতা ; সঙ্ঘবদ্ধ হবার স্বাধীনতা ; অবাধে চলাফেরার অধিকার ; বাসস্থানের অধিকার ; সম্পত্তির অধিকার এবং যে কোনও বৈধ বৃত্তি বা পেশা নির্বাচনের অধিকার। ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনের পর সম্পত্তির অধিকার আর মৌলিক অধিকার বলে গণ্য হয় না। বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতা ভারতীয় নাগরিকের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য ভারতের প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র সংরক্ষিত করেছে। সংবিধান প্রবর্তিত হবার গোড়ার দিকে এই স্বাধীনতাগুলির মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ছিল। মানহানি, অশ্লীলতা, আদালত অবমাননা এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা—শুধু এগুলি ছিল সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট বাক্‌স্বাধীনতার কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ। রমেশ থাপারের সঙ্গে মাদ্রাজ অঙ্গরাজ্যের বিখ্যাত মামলায় ভারতের সুপ্রীম কোর্ট নির্দেশ দেন যে, কেবলমাত্র রাষ্ট্রের

(২) স্বাধীনতার অধিকার ৭ প্রকার : কোনটিই নিরঙ্কুশ নয়

নিরাপত্তা যেখানে বিঘ্নিত হতে পারে, সে ক্ষেত্রেই বাক্‌স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। কিন্তু ১৯৫১ সালের সংবিধান সংশোধনী আইনে বলা হয় যে, রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করলে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব বজায় রাখতে কিংবা কোনও প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য বাক্‌স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী আইনে বলা হয় যে, ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতা সংরক্ষণের জন্য আইনসভাগুলি প্রয়োজনমত বাক্‌স্বাধীনতা এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে। এই আইনে আরও ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করলে শান্তিপূর্ণভাবে সভাসমিতি করবার এবং সঙ্ঘবদ্ধ হবার অধিকারের ওপরেও ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারে। মহামারীর মত জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে নাগরিকদের অবাধ ভ্রমণের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নাগরিকদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপ করতে পারে। পেশা এবং বৃত্তি নির্বাচনের অধিকারও সংবিধানের প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবে রাষ্ট্র ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা লাভ করেছে। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ জনস্বার্থের খাতিরে আরোপিত হয়।

নিবর্তনমূলক আটক আইন

শত্রুস্থানীয় বিদেশী এবং নিবর্তনমূলক আটক আইন (Preventive Detention Act) যতদিন কার্যকর ছিল, ততদিন রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখতে পারত এবং তাদের গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারালয়ে হাজির করাতে বাধ্য ছিল না।

মিসা

১৯৭১ সালে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বিরোধী আইন (Prevention of Violent Act) এবং তারপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংরক্ষণ বিধি (Maintenance of Internal Security Act, সংক্ষেপে MISA বা মিসা) প্রযুক্ত হয়। ১৯৭৮ সালে এ আইনগুলি বাতিল হয়ে যায়। এই আইনগুলির দ্বারা যদি কোন ভারতীয় নাগরিককে আটক করা হত, তাহলে সরকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ধৃত ব্যক্তিকে যতদিন খুশী আটক রাখতে পারত।

জাতীয় নিরাপত্তা আইন, এসমা

১৯৮০ সালে ভারত সরকার চোরাচালান বন্ধ করা, অত্যাবশ্যক পণ্যগুলির যোগান অব্যাহত রাখা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে জাতীয় নিরাপত্তা আইন (National Security Act) বলবৎ করেছে। ১৯৮১ সালে "এসমা" (ESMA বা Essential Supplies Maintenance Act) নামে একটি আইন বলবৎ করে ভারত সরকার জাতীয় স্বার্থে অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। বিরোধী দলগুলির আশংকা যে এভাবে

"কেন্দ্র" নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি সঙ্কুচিত করেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই আইনগুলির অপপ্রয়োগের কোন গুরুতর নজির পাওয়া যায় নি বা আদালতে এ আইনগুলির বৈধতা নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন তোলেন নি। তাছাড়া, দায়িত্বজ্ঞানহীন শ্রমিক আন্দোলন সব সময়ে নিন্দনীয়। অবশ্য ভারত সরকারকে মৌলিক অধিকারগুলি সম্পর্কে সংবিধান-রচয়িতাদের উদার ও গণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে হবে।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ভারতীয় নাগরিকদের জীবনরক্ষার অধিকারের সমতুল্য। সংবিধানের ২৩ ধারায় বেগার বা বিনা পারিশ্রমিকে বাধ্যতামূলকভাবে মজুরদের খাটাবার নীতি বেআইনী বলে ঘোষিত হয়েছে। নরনারী নিয়ে ব্যবসাও ("traffic in human beings") সমানভাবে বেআইনী বলে ধার্য করা হয়েছে। সংবিধানের ২৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, ১৪ বছরের কম বয়সের বালকবালিকাদের কারখানা, খনি, বাগিচার কাজের মত কোনও বিপজ্জনক বৃত্তিতে নিয়োগ করা চলবে না।

(৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

ভারত সরকার সম্প্রতি দাসখত রীতিতে দায়বদ্ধ মজুরদের (Bonded Labour) মুক্তিদানের জন্য আইন প্রণয়ন করেছেন। মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি বহু অনুন্নত অঙ্গরাজ্যে এই আইন প্রচলিত হবার ফলে বহু দায়বদ্ধ মজুর মুক্ত হয়েছে।

দাসখতরীতি বেআইনী

"নরনারী নিয়ে ব্যবসা" এই বাক্যাংশটি এত ব্যাপক যে ভারতীয় সংবিধানে এটা নিষিদ্ধ করার ফলে দাসপ্রথা, পতিতাবৃত্তির জন্য নারীসংগ্রহ, ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে শিশুদের অপহরণ প্রভৃতি সমাজবিরোধী গর্হিত কাজগুলি সবই সংবিধানবিরোধী, অসামাজিক ও বেআইনী। এ দিক থেকে সংবিধানের ২৩ ও ২৪ ধারাদুটি খুব প্রশংসার দাবী রাখে। মার্ক্সবাদীগণ অবশ্য বলেন যে, ধনতন্ত্রের সহজাত ব্যক্তিগত মালিকানা, একচেটিয়া কারবার প্রভৃতি দূর করা না হলে শোষণ থেকে নাগরিক মুক্ত হতে পারে না, কেবলমাত্র সম্পূর্ণ সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রেই নাগরিক সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত।

শোষণমুক্তির ধারার ব্যাখ্যা

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State) রূপে ঘোষিত হয়েছে। ভারতে বহু ধর্মের এবং একই ধর্মের অন্তর্গত বহু সম্প্রদায়ের লোক বাস করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নাগরিকদের **ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার** খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ ধারাগুলি এই অধিকারসম্পর্কিত। সমস্ত ভারতীয় নাগরিক বিবেকের স্বাধীনতা সমভাবে ভোগ করার অধিকারী। যে-কোনও নাগরিক ইচ্ছামত যে-কোনও ধর্মমতে বিশ্বাসী হতে, যে-কোনও ধর্মমত পালন ও প্রচার করতে পারেন। সকল ধর্মের এবং সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যে-কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারেন, সেই প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার ব্যবস্থা করতে পারেন, বৈধ উপায়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মারফত সম্পত্তি অর্জন করতে

(৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার : চম্পকম্ দোরাইরাজন্ মামলার রায়ের তাৎপর্য

পারেন, তার মালিকানা লাভ করতে পারেন এবং সেই সম্পত্তি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে পারেন। শুধু ধর্মীয় কারণে রাষ্ট্র কোনপ্রকার অর্থসাহায্য দানের ক্ষেত্রে কোনও পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করবে না, বা কোনও বিশেষ ধর্মের বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের জন্য কোনরকম বিশেষ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারবে না। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট চম্পকম্ দোরাইরাজন্ বনাম মাদ্রাজ অঙ্গরাজ্য সরকারের মামলায় এই সিদ্ধান্ত নেন যে, ধর্মের বা জাতির ওপর ভিত্তি করে কোনও অঙ্গরাজ্য সরকার সরকারী বিদ্যালয়ে কোনভাবে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

সংবিধানের ২৬ ধারায় জনস্বাস্থ্য, সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি এবং নীতিবোধের খাতিরে রাষ্ট্র কোনও ধর্মীয় নীতি বা ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা ধর্মানুষ্ঠানের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে। সংবিধানের ২৭ ধারা অনুসারে কোনও নাগরিককে কোনও বিশেষ ধর্মের প্রচার বা সংরক্ষণের দোহাই দিয়ে কোনপ্রকার চাঁদা দিতে বাধ্য করা যাবে না। অনুরূপভাবে, ২৮ ধারা অনুসারে সংশ্লিষ্ট কোনও বিশেষ ধর্মের নীতি সম্পর্কে উপদেশ গ্রহণ করতে বা কোনপ্রকার ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

সংবিধানের ২৬, ২৭, ২৮ ধারা

প্রখ্যাত দার্শনিক ও ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বলেন যে, "ধর্মনিরপেক্ষতা" বলতে অধার্মিক, ধর্মবিরুদ্ধ, বা ধর্মসম্পর্কে অনীহা বোঝায় না। তাঁর মতে, ভারতীয় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বোঝায় একটা বিশেষ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ। এই পরিবেশে রাষ্ট্র সব ধর্মগুলিকেই নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ও শান্তিপূর্ণভাবে মতপ্রচারের সমান সুযোগ দেবে, অথচ নিজে থেকে কোন ধর্মমতের প্রতি কোনভাবে পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করবে না। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ অবশ্য এ ক্ষেত্রে "ধর্মনিরপেক্ষ" কথাটির বদলে "অসাম্প্রদায়িক" কথাটি ব্যবহার করা সমীচীন বলে মনে করেন।

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণনের অভিমত

শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক অধিকারগুলি ভারতীয় নাগরিকদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। এই অধিকার, প্রকৃতপক্ষে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির অধিকার। কারণ, সংবিধানের ২৯ ধারায় যে-কোনও সংখ্যালঘুসম্প্রদায়ের নাগরিকগণ তাঁদের সম্প্রদায়গত ভাষা, লিপি এবং সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত রাখার অধিকার লাভ করেছেন। সংবিধানের ৩৪৩ ধারায় দেবনাগরী হরফে লিখিত হিন্দী ভাষাকেই ভারতের সরকারী ভাষারূপে স্বীকার করে নেবার ফলে ২৯ ধারায় বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর দ্বিতীয় উপধারায় আরও বলা হয়েছে যে, ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা ভাষার পার্থক্য থাকার জন্য কোনও নাগরিক সরকারী বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন না। সংবিধানের ৩০ ধারা অনুযায়ী ধর্মীয় বা ভাষাগত কারণে সৃষ্ট যে-কোনও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় নিজেদের বিশেষ স্বার্থের উন্নতির জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারেন। রাষ্ট্র সে-ক্ষেত্রে তাঁদের বাধা

(৫) শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক অধিকার

দেবে না বা তাঁদের প্রতিষ্ঠানকে নিয়মমাফিক রাষ্ট্রীয় সাহায্য লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না।

ভারতীয় নাগরিকগণের ষষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হল **শাসনতান্ত্রিক উপায়ে অধিকার লাভের অধিকার।** এই অধিকারের সারমর্ম হল এই যে, ভারতীয় নাগরিকগণ তাঁদের কোন মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে প্রয়োজনমত হাইকোর্টের কাছে কিংবা সুপ্রীম কোর্টের কাছে আবেদন করতে পারেন। সংবিধানের ৩২ ধারা অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকগণকে এই অধিকারলাভের যোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানের অন্যতম প্রধান রচয়িতা ডক্টর আম্বেদকর সংবিধানের এই ধারাটিকে "শাসনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ" ("A part and soul of the constitution") বলে বর্ণনা করেন।

(৬) শাসনতান্ত্রিক উপায়ে অধিকারলাভের অধিকার

সংবিধানে যে কয়টি ব্যবস্থার সাহায্যে ভারতীয় নাগরিকগণ শাসনতান্ত্রিক উপায়ে তাঁদের মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন, সেগুলি হল—(১) বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus বা হেবিয়াস্ করপাস্), (২) পরমাদেশ (Mandamus), (৩) প্রতিষেধ (Prohibition), (৪) অধিকারপৃচ্ছা (Quo Warranto) এবং (৫) উৎপ্রেষণ (Certiorari)।

উপায়গুলি ৫ প্রকার

হেবিয়াস্ করপাস্ ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিক যদি মনে করে যে, তাকে অন্যায়ভাবে আটক করা হয়েছে, তা হলে কি কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেটা জানার জন্য সে আদালতের কাছে আবেদন জানাতে পারে। আদালত প্রয়োজন মনে করলে ধৃত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করার জন্য সরকারকে বাধ্য করতে পারে ও তাকে মুক্তি দিতে পারে।

(ক) বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ

পরমাদেশ অনুযায়ী আদালত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, নিম্নতর আদালত অথবা সরকারকে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব বৈধভাবে পালন করার নির্দেশ দিতে পারে।

(খ) পরমাদেশ

প্রতিষেধ অনুসারে উর্ধ্বতন আদালত অধস্তন আদালতে বিচারাধীন কোন মামলার ক্ষেত্র অধস্তন আদালতের নিজের সঠিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে নির্দেশ দিতে পারে।

(গ) প্রতিষেধ

অধিকারপৃচ্ছা এমন একটি পদ্ধতি, যার সাহায্যে কোন ব্যক্তি কোন পদ দখল করলে বিরুদ্ধপক্ষের কোন নাগরিক যদি তার যোগ্যতার প্রশ্ন তোলে, তখন আদালত সেই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বিচার করবে এবং প্রয়োজন হলে অভিযুক্ত ব্যক্তির অযোগ্যতা প্রমাণিত হলে তাকে ঐ পদ থেকে বরখাস্ত করতে পারে।

(ঘ) অধিকারপৃচ্ছা

(৬) উৎপ্রেষণ

উৎপ্রেষণ অনুসারে কোন আদালত নিম্নতর আদালতের কোন সিদ্ধান্তকে তার নিজস্ব ক্ষমতাক্ষেত্রের বহির্ভূত বলে মনে করলে তদনুসারে তার সিদ্ধান্তকে বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারে।

জরুরী অবস্থাতেও হাইকোর্ট এগুলি বলবৎ করতে পারে

ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম সংশোধন অনুযায়ী শাসনতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকার লাভের অধিকার জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে ভারতীয় নাগরিকগণ ভোগ করতে পারতেন না। কিন্তু ৪৩তম এবং ৪৪তম সংশোধনী আইন অনুযায়ী নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে জরুরী অবস্থার সময়েও মহাধর্মাধিকরণ (হাইকোর্ট) অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় লেখ (Writ) জারি করতে পারে।

॥ ভারতীয়দের অধিকারগুলি কেন "মৌলিক" ॥

অধিকারগুলি কেন মৌলিক: এগুলি (১) সংবিধানে লিখিত

ভারতীয়দের ছয় প্রকার মৌলিক অধিকারকে "মৌলিক" বলার যুক্তি আছে। প্রথমতঃ, এ অধিকারগুলি ভারতীয় সংবিধানে লিখিত। অর্থাৎ, এগুলি সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। সরকার এগুলি প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

(২) সভ্যজীবন অপরিহার্য

দ্বিতীয়তঃ, এ-অধিকারগুলি ছাড়া ভারতীয় নাগরিকদের সভ্য জীবনযাপন অসম্ভব। সুতরাং জীবনধারণের জন্য যেমন জল, আলো, বাতাস অপরিহার্য, এই অধিকারগুলি ছাড়া তেমনি ভারতীয় নাগরিকদের রাজনৈতিক জীবনযাপন অসম্ভব।

(৩) আদালত কর্তৃক রক্ষিত

তৃতীয়তঃ এই অধিকারগুলিকে 'মৌলিক' বলার একটি প্রধান কারণ হল এই যে, এগুলি আদালত কর্তৃক স্বীকৃত, সম্মানিত এবং সংরক্ষিত। এর অর্থ হল: যদি কোন কারণে কোনও ভারতীয় নাগরিকের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, তা হলে তিনি আদালতের নিকট বিচারপ্রার্থী হতে পারেন।

(৪) সবগুলি "মৌলিক" নয়

চতুর্থতঃ, কোন কোন সমালোচকের মতে অস্পৃশ্যতা বর্জন বা রাষ্ট্রের বাইরে অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শিক্ষাগত উপাধি ছাড়া অন্য কোন উপাধি না নেবার নির্দেশ ইত্যাদি "মৌলিক অধিকারের" মধ্যে পড়ে না।

॥ ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য ॥

মৌলিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য: (১) আদালত কর্তৃক রক্ষিত

প্রথমতঃ, ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলির কোনটিই নিরঙ্কুশ নয়। রাষ্ট্র নাগরিকদের সার্বিক এবং সাধারণ স্বার্থে এ অধিকারগুলি সম্ভোগের ক্ষমতা নাগরিকদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশেও দেখা যায়। জরুরী অবস্থার সময়েও ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে আদালতের এক্তিয়ার অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, ভারতের আইনসভাগুলিও এই সাংবিধানিক ধারাগুলিকে কার্যকর করে তোলার জন্য নিয়মমত আইনকানুন রচনা করার অধিকার পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পার্লামেন্ট ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে অস্পৃশ্যতা অপরাধ আইন (Untouchability Offence Act) প্রবর্তন করে। ভারতীয় সংবিধানের ১৭ ধারায় অস্পৃশ্যতাকে দূর করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের এই আইনটি সংবিধানের ১৭ ধারার উদ্দেশ্যের পরিপূরক বলা চলে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার বর্গাদারদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য "অপারেশান্ বর্গা" নামক বিধি রচনা করেছে।

(২) আইনসভাগুলির দ্বারাও রক্ষিত

তৃতীয়তঃ, ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি বিদেশী শাসনতন্ত্রগুলির দ্বারা প্রভাবিত। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সমকালীন মানবিক অধিকারের স্বীকৃতির (Declaration of the Rights of Man), ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের অধিকার বিধির (Bill of Rights), মার্কিন শাসনতন্ত্রের প্রথম দশটি সংশোধনী সংযোজনের ফলে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের অনুরূপ অধিকারবিধির (Bill of Rights) ও আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানের সম্মিলিত প্রভাব ভারতীয় শাসনতন্ত্রের এই অংশের ওপর লক্ষণীয়। ১৯৩৬ সালে রুশ্ শাসনতন্ত্রে যে নাগরিক অধিকারগুলি গৃহীত হয়েছিল, সেগুলির ভিত্তিতে ভারতীয় নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকার দেবার কথা সংবিধানে বলা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকারগুলি রুশ্ নাগরিকদের অধিকারের তুলনায় অনেক অসম্পূর্ণ। কারণ রুশ্ নাগরিকদের চাকুরীর অধিকার, ছুটি ও বিশ্রামের অধিকার প্রভৃতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় নাগরিকগণ এখনও এই মৌলিক অধিকারগুলি পাবার অধিকারী হন নি, যদিও এগুলি ভবিষ্যতে প্রযোজ্য রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিরূপে (Directive Principles of State Policy) শাসনতন্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ। অবশ্য, সরকারের এই প্রতিজ্ঞার পেছনে এখনও কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

(৩) এগুলির ওপর বিদেশী সংবিধানের প্রভাব

চতুর্থতঃ, মার্কস্‌বাদীগণ বলেন যে, ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার-গুলির ঘোষণার মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্যের গ্যারাণ্টি নেই। কিন্তু এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। কারণ, সংবিধানের প্রস্তাবনায় অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের (Economic Justice) উল্লেখ আছে। "শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার" ভারতীয় নাগরিকদের একটি স্বীকৃত মৌলিক অধিকার এবং এ অধিকারটি প্রধানতঃ অর্থনৈতিক অধিকার। তাছাড়া, সম্পত্তির অধিকারকে আর "মৌলিক" অধিকার বলে গণ্য করা হয় না।

(৪) মার্কস্‌বাদীদের মত ঃ অর্থনৈতিক অধিকার যথেষ্ট নয়

পঞ্চমতঃ, মার্কস্‌বাদীদের আরেকটি অভিযোগ হল এই যে, ভারতীয় নাগরিকদের

মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের ক্ষমতা যথেষ্ট নয়। সম্পত্তির অধিকারকে ব্যক্তিগত মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকার করে ভারতীয় সুপ্রীম্ কোর্ট্ যখন কোন কোন মামলায় রায় দিতেন, তখন তাঁরা বিচারালয়কে "প্রতিক্রিয়াশীল" বলে সমালোচনা করতেন। কিন্তু এ কথা সত্য যে, শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম্ কোর্ট্ একাধিক মামলায় স্বীকার করেছেন, জাতীয় স্বার্থে, এমনকি, মালিককে ক্ষতিপূরণ না দিয়েও রাষ্ট্র সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারে।

(৫) তাঁদের আরেকটি অভিযোগ : বিচার ব্যবস্থার অক্ষমতা

ষষ্ঠতঃ, ভোটদানের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারকে ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের তালিকায় স্থান দেওয়া হয় নি বলে অনেকে অভিযোগ করেন। কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৩২৫ ধারায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগরিকের ভোটদানের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে।

(৬) ভোটদানের মত অধিকারও "মৌলিক" নয়

সপ্তমতঃ, ভারতের মত বিরাট, সমস্যাবহুল রাষ্ট্রের জনগণের জীবনধারণের মান উন্নত করতে হলে ও দেশের অগণিত মানুষকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে নিয়ে আসতে হলে সরকারকে এবং জনসাধারণকে একটা বিরাট কর্মকাণ্ড নিয়ে সুসংহতভাবে কাজ করতে হবে। পাঁচ সালা পরিকল্পনাগুলির মারফত এই কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টা সম্ভব। রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হলেও ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী আইনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোন নির্দেশাত্মক নীতি চালু করার জন্য কোন আইন সংবিধানের ১৪, ১৯ এবং ৩১ ধারায় স্বীকৃত নাগরিকের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে পরস্পরবিরোধী হলে সে-ক্ষেত্রে আইনটিই গ্রাহ্য হবে। এভাবে নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে মৌলিক অধিকারের চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করা হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, ভারতের সংবিধান-রচয়িতাগণ নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিকে সর্বাত্মক ও সফল করে তুলতে একান্তভাবে সচেষ্ট। সেজন্যই নির্দেশাত্মক নীতিগুলি শুধু মৌলিক অধিকারের পরিপূরকমাত্র নয়, ক্ষেত্রবিশেষে নির্দেশাত্মক নীতির উদ্দেশ্য পালনের জন্য উপযুক্ত আইনকানুন রচনা করে রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারগুলির অসম্পূর্ণতা দূর করতে পারে।

(৭) নির্দেশাত্মক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারের ঊর্ধ্বে স্থাপিত

॥ ভারতীয় নাগরিকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের তাৎপর্য : রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি ॥

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে ভবিষ্যৎ সরকারের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য কতকগুলি নীতি উল্লেখ করা আছে। এই নীতিগুলি এমন কতকগুলি নির্দেশ, যেগুলি আইনসিদ্ধ (Justiciable) রূপে আদালতের কাছে গ্রাহ্য না হলেও

এগুলিকে মেনে চলার জন্য সরকারের নৈতিক দায়িত্ব আছে। আম্বেদকার এগুলিকে "নির্দেশদানের উপচার" (instruments of instructions) বলে প্রশংসা করেছেন।

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির শ্রেণীবিভাগ : (১) জনকল্যাণকর রাষ্ট্রগঠনের নীতি, (২) গান্ধীবাদী নীতি, (৩) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পালনীয় নীতি

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে প্রকৃত কল্যাণকর রাষ্ট্রে (Welfare State) পরিণত করার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এগুলিকে এক-একটি সুদৃঢ় পদক্ষেপরূপে বিবেচনা করা হয়। সংবিধান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ ভারতীয় শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করেছেন। সংবিধানের ৩৬, ৩৭ এবং ৩৮ ধারাগুলি কতকগুলি সাধারণ ধারা। এগুলির মারফত নির্দেশাত্মক নীতিগুলির উদ্দেশ্য, স্বরূপ, আইনগত মূল্য ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অন্য ধারাগুলি সাধারণতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) ভারতকে প্রকৃত জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করার কতকগুলি ব্যবস্থা ; (খ) ভারতে গান্ধীজীর নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আদর্শগুলি রূপায়ণের প্রস্তাবগুলি ; (গ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত সরকারের অবশ্য পালনীয় কতকগুলি নীতি।

ভারতীয় সংবিধানের ৩৮ ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকার এমনভাবে নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্য বর্ধনের ব্যবস্থা করবে, যার ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের আদর্শ অনুসৃত হয়। ৩৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকার এমনভাবে শাসননীতি পরিচালনা করবে, যার ফলে সমস্ত ভারতীয় নাগরিক

জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সাম্য ও ন্যায়বিচারের নিরিখে ভবিষ্যতে প্রদেয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার

সুষ্ঠুভাবে জীবিকানির্বাহের অধিকার ভোগ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ সকলকেই সমান অধিকার দিতে হবে। সমস্ত জাতীয় সম্পদ সকলের জন্য, সকলের স্বার্থে সমভোগের ভিত্তিতে ব্যবহার করা হবে। সমস্ত জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষমতা যেন অল্প কয়েকজনের হাতে সীমাবদ্ধ থেকে সার্বিক জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে। সরকার লক্ষ্য রাখবে, যাতে জাতীয় সম্পদ ন্যায্যভাবে এবং সমভাবে বণ্টিত হয়। বিশেষতঃ, শিশু, যুবক, যুবতীদের শোষণের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করা হবে—তারা যেন দুর্নীতি এবং দুর্দশার শিকার না হয়ে ওঠে। ভবিষ্যতে দেশের সকলের জন্য শিক্ষার এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। বেকারত্বের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভাতা দিতে হবে, বার্ধক্য, অসুস্থতা, শারীরিক অক্ষমতা প্রভৃতি, যে সমস্ত ক্ষেত্রে কোনও ভারতীয় নাগরিককে বাধ্য হয়ে আর্থিক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, সে সমস্ত ক্ষেত্রে যথাযথ সাহায্য দানের ব্যবস্থা থাকবে। কাজকর্মের ক্ষেত্রে ন্যায্য এবং সম্মানজনক শর্ত আরোপ করা হবে। নারী-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মাতৃত্বের সময় সাহায্য দানের ব্যবস্থা থাকবে। ভবিষ্যতে সরকার লক্ষ্য রাখবে, যাতে শ্রমিকগণ জীবনধারণের মত মজুরী পান এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে পারেন। শ্রমিকদের বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া হবে এবং সামাজিক ও

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের অবসর বিনোদনের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে। চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুদের অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষাদানের জন্য সরকার সচেষ্ট হবে। রাষ্ট্র সমাজের সকলের পুষ্টির এবং জীবনধারণের মান উন্নত করবে এবং জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য যথার্থ চেষ্টা করা হবে।

কতকগুলি গান্ধীবাদী নীতি

গান্ধীবাদী নীতিগুলি কার্যকর করে তোলার জন্য শাসনতন্ত্রে যে দুটি নির্দেশাত্মক নীতির উল্লেখ রয়েছে, সে দুটি হল—সরকার গ্রামপঞ্চায়েত স্থাপনের চেষ্টা করবে, এবং সেগুলিকে এমনভাবে ক্ষমতা ও সাহায্য দান করবে যার ফলে সেগুলি নিভৃতে পল্লীর ছোট ছোট স্বায়ত্ত-শাসনের কেন্দ্রস্থলরূপে গড়ে উঠতে পারে। রাষ্ট্র এমনভাবে গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিগত অথবা সমবায় ভিত্তিতে কুটিরশিল্পের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করবে, যাতে গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা যায়।

নেহরুর কাছে গান্ধীবাদী নীতিগুলির তাৎপর্য

গণপরিষদে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি নিয়ে শাসনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট অংশের খসড়া সম্পর্কে যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়, তাতে যোগ দিয়ে জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন যে, এই নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ছোট ক্ষেত নিয়ে কর্মরত গ্রামের কৃষককে কেন্দ্র করে রচিত। তাই তার স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য যে নির্দেশাত্মক নীতিগুলি মেনে নেওয়া হয়েছে, সেগুলি খুব ব্যাপক। যেমন—সমাজের দুর্বল এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণীর লোকদের, বিশেষ করে তফশীলভুক্ত জাতি ও উপ-জাতিদের উন্নয়নের ব্যবস্থা করা এবং তাদের সব দিক দিয়ে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা। ঔষধরূপে ছাড়া যে সমস্ত মাদকদ্রব্য শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, সেগুলিকে বর্জন করার জন্য সরকার সব সময় সচেষ্ট থাকবে। কৃষি এবং পশুপালনের ব্যবস্থাকে আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উন্নত করে তোলার জন্য, জীবজন্তুর সংরক্ষণের জন্য, গবাদি পশু হত্যা বন্ধ করার জন্য, জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বলে ঘোষিত স্মরণীয় ঐতি-হাসিক স্থানগুলি রক্ষার জন্য সরকার চেষ্টা করে যাবে। বিচারবিভাগকে শাসন-বিভাগ থেকে পৃথক্ করার দায়িত্ব স্বীকার করে সরকার নাগরিকদের দেশের সর্বত্র এক রকমের বিচারব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পালনীয় নীতিগুলি

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পালনীয় যে নির্দেশাত্মক নীতিগুলি সরকারকে আদর্শরূপে স্বীকার করে নিতে বলা হয়েছে, সেগুলি হল—আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকা, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে ন্যায়সঙ্গত এবং সম্মানজনক শর্তে মেলামেশা করা, আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং শান্তিপূর্ণ সালিসী ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধগুলির মীমাংসার জন্য উৎসাহ দেখানো।

॥ নির্দেশাত্মক নীতিগুলির বাস্তব রূপদান ॥

১৯৫০ সাল থেকে ভারতের প্রজাতন্ত্রী সংবিধান কার্যকর হয়েছে। তখন থেকে সরকার নানাভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির অনেকগুলি নানাক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন।

নীতিগুলির রূপদান

প্রথমতঃ, জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন, নানাপ্রকার ভূমিসংস্কার আইন বলবৎ করা, জমির ঊর্ধ্বতন সীমা নিরূপণ প্রভৃতি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সংবিধান সংশোধন করার ফলে সম্পত্তির অধিকারকে আর মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করা হয় না। ফলে, আদালতে ব্যক্তিগত অধিকারের দোহাই দিয়ে প্রগতিশীল ভূমিসংস্কার আইনগুলির বৈধতার প্রশ্ন তুলে আর সেগুলি অচল করে রাখা যাবে না। "গরীবী হঠাও" অভিযান, পাঞ্জাবের "সবুজ বিপ্লব" ইত্যাদি কিছু কিছু ব্যবস্থা আঞ্চলিক সাফল্য এনেছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার "অপারেশান্ বর্গা" নামক চমকপ্রদ ভূমিসংস্কার আইন চালু করেছেন। এতে বর্গাদারদের ও ভূমিহীন কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষিত করার চেষ্টা হচ্ছে। ভারত সরকার ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে এনেছেন, রাজন্যবর্গের চিরস্থায়ী ভাতা বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের পেন্সন্ প্রদানের ব্যবস্থা চালু করতে চান।

(১) রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষম বণ্টনব্যবস্থা : কৃষিক্ষেত্রে

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমজীবীদের জন্য সরকারী বীমা (E. S. I. বা Employees' State Insurance) প্রকল্প চালু করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির হার নির্দিষ্ট হয়েছে, শ্রমিক-মালিক বিরোধের মীমাংসার জন্য সরকার মালিক-শ্রমিক ত্রিপাক্ষিক সালিসী ব্যবস্থা (arbitration tribunal) চালু করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কিছুকাল বেকারভাতা চালু করেছিলেন।

(২) শিল্পক্ষেত্রে

তৃতীয়তঃ, সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচীর (Community Development Programme) মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে সর্বাত্মক গ্রামীণ উন্নয়নের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে চালু করা হয়েছে। সেচব্যবস্থার উন্নতি, উন্নত প্রকারের বীজ বিতরণ, পশুপালন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এ-সকল কর্মসূচীর অন্তর্গত।

(৩) সর্বাত্মক সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প

চতুর্থতঃ, গ্রামে ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক ব্যাধি, এনকেফেলাইটিস্ ও নানা সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস করার ব্যবস্থা হয়েছে, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র (Rural Health Centre) স্থাপিত হয়েছে। শহরতলীর বাসিন্দাদের চাহিদার ফলে শহরের হাসপাতালগুলিতে অতিরিক্ত ভীড় থাকার জন্য শহরের হাসপাতালগুলির অনেক উন্নতি সাধন করা হয়েছে।

(৪) স্বাস্থ্যরক্ষা

পঞ্চমতঃ, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট সরকার স্কুলস্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করে দিয়েছেন। ভারতের অন্য কয়েকটি অঙ্গরাজ্যেও অনুরূপ নীতি গৃহীত হয়েছে। বয়স্ক অশিক্ষিতদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে।

(৫) শিক্ষা

ষষ্ঠতঃ, ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে পঞ্চায়ত ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্ট সরকার সর্বপ্রথম এ-রাষ্ট্রে পঞ্চায়ত ব্যবস্থা চালু করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতি, কারচুপি ও দলবাজির অভিযোগ সত্য বলে ধরে নিলেও এ-ব্যাপারে বামফ্রণ্ট সরকারের প্রাথমিক প্রচেষ্টা অভিনন্দন পাবার যোগ্য।

(৬) পঞ্চায়তী রাজ

সপ্তমতঃ, খাদি, গ্রামীণ ও কুটির শিল্প প্রসারের জন্য ভারত সরকার ও কোন কোন অঙ্গরাজ্য সরকার নানাবিধ সংস্থা গঠন করেছেন। তার ফলে এই গ্রামীণ শিল্পগুলি নানাভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে।

(৭) খাদি, কুটিরশিল্প

অষ্টমতঃ, ভারতের সর্বত্র বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে পৃথক্ করে ক্ষমতাবিভাজন নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে। আজকাল ভারতের প্রত্যেক জেলায় প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় ক্ষেত্রে দু'রকম জেলাশাসক নিয়োগ করা হয়।

(৮) বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য

নবমতঃ, ভারতসরকার ও অঙ্গরাজ্যসরকার দেশের নানাস্থানে অবস্থিত পুরাকালের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ মূর্তি, স্তম্ভ, অট্টালিকা ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য নানাভাবে সচেষ্ট।

(৯) পুরাকীর্তি সংরক্ষণ

দশমতঃ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত বৃহৎ দ্বিশক্তির বাইরে থেকে নির্জোট আন্দোলনের (Non-alignment Movement) ও তৃতীয় বিশ্বের (Third World) নেতৃত্বের পুরোভাগে রয়েছে। ভারত তার ঐতিহ্য অনুযায়ী বিশ্বমৈত্রীর অগ্রদূত, যুদ্ধবিরোধী প্রচেষ্টার প্রধান প্রবক্তা, বিশ্বজনীন আদর্শের একনিষ্ঠ পূজারীরূপে সর্বজনস্বীকৃত।

(১০) নির্জোট আন্দোলনে ও ৩য় বিশ্বে ভারতের নেতৃত্ব

॥ রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির পর্যালোচনা ॥

ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি নিয়ে অনেক দেশী এবং বিদেশী শাসনতন্ত্রবিদ্ বিরূপ সমালোচনা করেছেন। অধ্যাপক কে টি. শাহ্ এগুলিকে "সদিচ্ছার উচ্ছ্বাস" (expression of pious wishes) বলেছেন। অনেকে মনে করেন যে, এগুলি যেন কোন একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তাহারের মত। প্রখ্যাত ইংরেজ শাসনতন্ত্রবিদ্ হয়্যার এই ধরনের মত প্রকাশ

করেছেন। জেনিংস্ মনে করেন যে, এই নীতিগুলির সমর্থকদের মধ্যে ইংলণ্ডের ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রবাদের (Fabian Socialism) প্রেতাত্মার উঁকিঝুঁকি দেখা যায়। কেউ কেউ আবার এই নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে মৌলিক অধিকারগুলির মত ভারতের আদালতগুলির চক্ষে আইনসিদ্ধরূপে গৃহীত না-হওয়ার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁরা মনে করেন যে, ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলি আইনসিদ্ধ হওয়ার জন্য এগুলির কোনটি কেউ ভঙ্গ করলে আদালত দোষীকে শাস্তি দিতে পারে। অর্থাৎ, আদালতের শাস্তির ভয়ে এই আইনগুলি সকলেই মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু কোনও বিশেষ নির্দেশাত্মক নীতি অমান্য করা হলে অমান্যকারীকে অনুরূপভাবে শাস্তি দেবার অধিকার আদালতের নেই। ফলে এগুলি মেনে চলতে কেউ বাধ্য নয়। কোন কোন সমালোচক আবার একথাও বলে, থাকেন যে, এই নীতিগুলি শাসনতন্ত্রে লিখিতভাবে স্থান পেলেও এগুলি শুধু নৈতিক আদর্শরূপেই মূল্যবান, সাংবিধানিক আইনের চোখে এগুলির কোন মূল্য নেই।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলির বিরূপ সমালোচনা : এগুলি "নৈতিক সদিচ্ছার উচ্ছ্বাস," আইনগত নয়, "যেন নির্বাচনী ইস্তাহার"

মার্ক্‌স্‌বাদীগণ বলেন যে, সরকারের মিশ্র অর্থনীতির (Mixed Economy) সীমাবদ্ধতার জন্য নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মত ভারতের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের সদিচ্ছামূলক বিধিগুলি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। কারণ, মিশ্র অর্থনীতির দরুন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনস্থ অনেক বৃহদায়তন শিল্পের সহাবস্থিতি মেনে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে, মার্ক্‌সীয় বিচারে বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামো ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীকে দীর্ঘায়ু করে রাখবে। ফলে, ভারতবাসীদের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য নির্দেশাত্মক নীতিগুলির অর্থনৈতিক সুপারিশগুলির কার্যকারিতা সম্বন্ধে মার্ক্‌স্‌বাদীগণ অত্যন্তসন্দিহান। অবশ্য, তাঁরা স্বীকার করেন যে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলি সংবিধানে সংযুক্ত হবার ফলে ভারতীয়দের মনে প্রত্যয় ও প্রত্যাশা সঞ্চারিত হয়েছে, নাগরিক অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মার্ক্‌স্‌বাদীদের সমালোচনা : মিশ্র অর্থনীতি সীমিত

কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির বিরুদ্ধে এই সমালোচনাগুলি অনেক ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যায় না। নীতিগুলিকে সাংবিধানিক আইনের অন্তর্গত বলে ধরা উচিত। কারণ, ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় (Preamble) যে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আদর্শের ওপর ভিত্তি করে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ভবিষ্যতে কাজ করে যাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সেই আদর্শগুলিকেই আরও বিস্তৃতভাবে এবং বিশিষ্টভাবে নির্দেশাত্মক নীতিগুলি প্রকাশ করেছে। এই নীতিগুলিকে সংবিধান-বহির্ভূত নিছক কতকগুলি নীতিসর্বস্ব আদর্শ বলে মনে করলে শুধু এদের ন্যায়সঙ্গত এবং আইনগত মূল্যই অস্বীকার করা হয় না, সংবিধানের প্রস্তাবনাকেও সাংবিধানিক আইনের বহির্ভূত বলা হয়।

সমালোচনার জবাব : প্রস্তাবনার মত এ নীতিগুলিও বহুমূল্য : গোপালন্ মামলায় প্রধান বিচারপতি কানাইয়ার রায়

গোপালন্ বনাম মাদ্রাজ সরকার মামলাটিতে রায়দান প্রসঙ্গে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি হরিলাল কানাইয়া বলেছেন যে, এ নীতিগুলি শুধু কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাধিক্যের জোরে ক্ষমতাসীন থাকার ফলে পালন করে চলবে—তাই নয়, এগুলির মাধ্যমে গণপরিষদ ভবিষ্যতে ভারতীয়দের ভাগ্যনির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতির শ্রেষ্ঠ সদিচ্ছাকে যেন স্থায়ী, চরম আইনের রূপ দান করেছে। বিচারপতি কানাইয়ার মতে, এই নির্দেশগুলিকে নিশ্চয়ই সাংবিধানিক আইনের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া যায়।

ভারতীয় বিচারালয়গুলি মৌলিক অধিকার সম্পর্কে নানা সময় যে সিম্ধান্ত প্রকাশ করেছেন, সেগুলির মধ্যে মৌলিক অধিকারগুলির সংজ্ঞা ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা অনেক সময় নির্দেশাত্মক নীতিগুলির ওপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সূর্যপাল সিং বনাম উত্তরপ্রদেশ সরকার মামলায় উত্তরপ্রদেশে ১৯৫১ সালে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করার জন্য আইনের বৈধতার প্রশ্ন তুলে যে মামলা দায়ের করা হয়, তার রায়দান প্রসঙ্গে "জাতীয় উদ্দেশ্য" ("Public Purpose") এবং "জাতীয় নীতি" ("Public Policy")—এদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে আদালত নির্দেশাত্মক নীতির আইনগত মূল্য স্বীকার করে নেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা কামেশ্বর সিং বনাম বিহার সরকারের মামলায় রায়দান করতে গিয়েও বিচারপতিগণ নির্দেশাত্মক নীতির প্রভাব অস্বীকার করতে পারেন নি।

অন্যান্য মামলায় আদালতের অনুরূপ সিম্ধান্ত

ভারত সরকার নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা করেছেন যে, সরকার রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে সব সময়েই নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মূল্য স্বীকার করে থাকেন। বিশেষতঃ, ভারতের পরিকল্পনা কমিশন নিয়মিতভাবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি রচনার সময় এবং এগুলির বাস্তব রূপদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি স্মরণ ও স্বীকার করে থাকেন। তাছাড়া, নির্দেশাত্মক নীতিগুলির সাংবিধানিক গুরুত্ব ও আইনগত মূল্য স্বীকার না করলে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌমত্বের প্রকৃত অংশীদার হিসেবে নির্বাচকমণ্ডলীর ওপর অর্থাৎ ভারতের জনসাধারণের ওপর আস্থা রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে ভারতীয় গণতান্ত্রিকতা শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করতে হয়।

ভারত সরকার এদের মূল্য স্বীকার করেন ঃ এগুলির গণতান্ত্রিক মূল্য

বিশিষ্ট আইনজীবী এবং ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম নির্মাতা স্যার বেনেগাল্ নরসিং রাউ (Sir Benegal Narsing Rau) বলেছেন যে, রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি নৈতিক উপদেশ হলেও এগুলির ব্যবহারিক মূল্য যথেষ্ট। কারণ, এগুলির মারফত নির্বাচনে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলও শাসন-নীতি রচনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুতর বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন হবেন। ভবিষ্যতে যে কোন শাসকদল এগুলি থেকে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক শিক্ষালাভ করবে। সুতরাং নির্দেশাত্মক নীতিগুলির শিক্ষাগত উপযোগিতাও অনস্বীকার্য।

বেনেগাল্ নরসিং রাউয়ের মত

১৯৫১ সালে চম্পকম্ দোরাইরাজন্ বনাম মাদ্রাজ সরকারের মামলায় রায় দিতে গিয়ে বিচারালয় মন্তব্য করেন যে, মৌলিক অধিকারের সঙ্গে যদি কখনও কোন নির্দেশাত্মক নীতির সংঘাত দেখা দেয়, তা হলে মৌলিক অধিকারই বজায় থাকবে। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের পঞ্চবিংশতিতম সংশোধনী আইন অনুসারে ভারতীয়দের মধ্যে বৈধভাবে সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রীয়করণের বা নিয়ন্ত্রণের বা বিকেন্দ্রীকরণের জন্য নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী কোনও আইন রচিত হলে তাকে আদালত সংবিধানের ১৪, ১৯ এবং ৩১ ধারার বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করতে পারবেন না। সুবিখ্যাত গোলোকনাথের মামলায় আদালত ঘোষণা করেন যে, মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করে কোন নির্দেশাত্মক নীতি কার্যকর করার অধিকার সরকারের নেই। কিন্তু সংবিধানের ৪৪ তম সংশোধনী আইনে নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে আইনসিদ্ধ করার চেষ্টা দেখা যায়।

মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সংঘাত হলেও নির্দেশাত্মক নীতি গ্রাহ্য : ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন ; আদালতের রায়

সংবিধানে লিখিতভাবে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি ঘোষণার নজির প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীতে প্রবর্তিত ভাইমার প্রজাতন্ত্রের (Weimar Republic) সংবিধানে দেখানো হয়। তারপর ১৯২৯ সালে অস্ট্রিয়ার, ১৯৩৭ সালে আয়ারল্যাণ্ডের, ১৯৪২ সালে ব্রাজিলের, ১৯৪৬ সালে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের, ১৯৪৭ সালে ইতালির, ১৯৪৮ সালে ব্রহ্মদেশের, ১৯৫৮ সালে পশ্চিম জার্মানীর শাসনতন্ত্রে এই নজির বার বার দেখা গেছে। মনে হয়, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান-রচয়িতাগণও এই শাসনতন্ত্রগুলির প্রভাবে অনেকটা প্রভাবিত হন। আবার, ভারতীয় সংবিধানের প্রচলনের পরে গৃহীত ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, থাইল্যাণ্ড এবং পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রগুলিতেও ভারতীয় দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শাসনতন্ত্র রূপায়ণের আদর্শগুলিকে লিখিত আকারে বিধিবদ্ধ করা হয়। শুধু তাই নয়, জওহরলাল নেহরু পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের এবং সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যে বিখ্যাত "পঞ্চশীল" নীতি ঘোষণা করেন, সেই নীতিগুলির মূলেও রয়েছে ভারতীয় শাসনতন্ত্রে বর্ণিত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির অন্তর্গত কয়েকটি আদর্শ। এ নীতিগুলি হল— (১) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থিতি ; (২) 'অনাক্রমণ' ; (৩) আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা ; (৪) আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করা এবং (৫) সাম্য। সুতরাং ভারতীয় নাগরিকগণ এ-কথা সগর্বে ঘোষণা করতে পারেন যে, ভারতীয় শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি শুধু ভারতীয় শাসনতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "পঞ্চশীল" নীতির প্রশংসা করতে গিয়ে বিখ্যাত ইংরেজ সমাজতন্ত্রী নেতা মাইকেল্ ফুট্ (Michael Foot) যথার্থ উক্তি করেছেন—"ধ্বংসাত্মক সম্ভাবনার হাত থেকে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তির অপব্যবহারের হাত থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষা করে স্বাধীন ভারত সকলের

নির্দেশাত্মক নীতিগুলির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব : অন্যান্য বিদেশী সংবিধানের নজির

বিশেষ উপকার সাধন করেছে ("The world owes to Independent India an immense debt for helping to save us from the corruption of power on an international scale which might so easily have led us to disaster.")।

॥ ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য ॥

সোবিয়েত রাশিয়া, চীনা প্রজাতন্ত্র এবং জাপানের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। ১৯৭৬ সালের ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী আইনে ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলি (Fundamental Duties of the Indian citizens) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি দূর করা হল।

ভারতীয়দের কর্তব্য ঃ রুশ ও চীনা প্রভাব

সংবিধান সংশোধনী বিধিতে ভারতীয় নাগরিকের ১০টি মৌলিক কর্তব্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—(১) সংবিধানকে মান্য করা, তার আদর্শ, সাংগঠনিক ব্যবস্থা, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ; (২) স্বাধীনতাসংগ্রামের সুমহান্ আদর্শ অনুধাবন ও অনুসরণ, (৩) ভারতের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির সুরক্ষা ; (৪) দেশ-রক্ষার জন্য ও জাতীয় সেবায় আত্মনিয়োগ ; (৫) ধর্ম, ভাষা, অঞ্চল বা শ্রেণীকে আশ্রয় করে যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিচ্ছে, তার উর্ধ্বে থেকে জাতীয় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে ব্যাপক করে তোলা, মহিলা-দের মর্যাদা রক্ষা ; (৬) ভারতের সমন্বিত সংস্কৃতির (composite culture) ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং তার প্রতি যথাযথ গুরুত্বদান ; (৭) অরণ্য, জলরাশি, বন্যপ্রাণী, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ; (৮) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, কৌতূহল, মানবতাবোধ এবং সংস্কারবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা ও এগুলির সম্প্রসারণ ; (৯) জনগণের সম্পত্তি রক্ষা করা ও অহিংস পথ গ্রহণ করা ; (১০) দেশবাসীদের কর্মোদ্যম ও সাফল্যের ক্ষেত্রে গতিবেগ সঞ্চারের জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টার সংযোগ সাধন।

৪২ তম সংবিধান সংশোধন ঃ ভারতীয় নাগরিকদের ১০টি কর্তব্য

সারাংশ

নাগরিক রাষ্ট্রের প্রধান অঙ্গ। প্রাচীন (গ্রীকো-রোমান) যুগে নাগরিকত্ব ছিল সীমিত, আধুনিক রাষ্ট্রে তা ব্যাপক ও আদর্শভিত্তিক। নাগরিকতা সম্পর্কে ভ্যাটেলের ও মিলারের সংজ্ঞায় রাষ্ট্রের দায়িত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ল্যাস্কির সংজ্ঞায় অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সমন্বয় দেখা যায়। সক্রেটিস্ ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর মতও তাই।

নাগরিকের অধিকার লাভ ও রক্ষা দুই-ই আধুনিক সাংবিধানিক আইনে সম্ভব।

আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে নাগরিকত্ব বিস্তৃত। এই আইন নাগরিক ও স্বজাতীয়ের মধ্যে পার্থক্য, পাসপোর্ট ও ভিসা, মানবাধিকার ইত্যাদি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক। "নাগরিক", "স্বজাতীয়", "প্রজা", "বিদেশী" কথাগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে।

নাগরিকত্বলাভের উপায় : জন্মগত, জন্মস্থানগত, অর্জিত বা আত্মীকৃত নাগরিকত্ব—আন্তর্জাতিক আইনে এদের তাৎপর্য। বিভিন্ন পদ্ধতি থাকার ফলে বহু-নাগরিকত্বের সম্ভাবনা ও সে সমস্যার সমাধান। অর্জিত নাগরিকত্ব লাভ শর্তসাপেক্ষ। যেমন—দীর্ঘকাল স্থায়ী বসবাস, বিবাহ, বিদেশে চাকুরীগ্রহণ ইত্যাদি। অবৈধ সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি।

নাগরিকত্বের বিলুপ্তি—অর্জন ও বর্জনের উপলক্ষ্যগুলি একই।

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে নাগরিকত্বলাভের পদ্ধতি। ভারতীয় নাগরিকত্ব বিধি (১৯৫৫)। ভারতীয় নাগরিকত্ব লোপ সংক্রান্ত আইন (১৯৫০)। এগুলির ব্যাখ্যা।

সুনাগরিকতা ও তার প্রতিবন্ধক—প্রতিবন্ধকগুলি দূর করা সম্বন্ধে ব্রাইসের উপদেশ।

নাগরিক অধিকার : তার সংজ্ঞা ও গুরুত্ব। গণতন্ত্রেও নাগরিক অধিকার বিপন্ন হয়। অধিকার নাগরিককে চিন্তাশীল, সৃজনশীল, সক্রিয় করে তোলে (অ্যালবার্ট সোয়াইটজার)। গ্রীনের মতে, অধিকার একটা সামাজিক ধারণা। অধিকার সম্বন্ধে ল্যাস্কির মনোবৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা ও তার তাৎপর্য—অধিকার আত্মোন্নতির পথ ; অধিকার সামাজিক, আপেক্ষিক, সর্বজনীন।

নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে আইনগত অধিকারই বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

আইনগত অধিকার ৪ প্রকার—পৌর, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকার। প্রত্যেকটির তাৎপর্য।

পৌর অধিকারের প্রকারভেদ : প্রধান পৌর অধিকারগুলি হল—জীবনরক্ষার অধিকার, আইনের চক্ষে সমানাধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার, সম্পত্তি অর্জনের ও ভোগের অধিকার, চুক্তি সম্পাদনের অধিকার, বাক্স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতির অধিকার, পরিবারগঠনের অধিকার, ধর্মাচরণের ও বিবেকের স্বাধীনতা। প্রত্যেকটি অধিকারই জনগণের স্বার্থে নিরঙ্কুশ নয়।

রাজনৈতিক অধিকার : এগুলি হল—বাসস্থানের অধিকার, বিদেশে নিরাপত্তার অধিকার, ভোটদানের অধিকার, নির্বাচিত হবার অধিকার, সরকারী চাকুরীলাভের অধিকার, প্রতিবেদনের অধিকার, প্রতিরোধের অধিকার।

অর্থনৈতিক অধিকার ও তার গুরুত্ব। এ অধিকারগুলি হল—জীবিকার অধিকার, নির্ধারিত মজুরি পাবার অধিকার, সামাজিক বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বীমা ও নিরাপত্তার অধিকার, ছুটি ও বিশ্রামের অধিকার, শ্রমিক-সংস্থা গঠনের অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার।

সামাজিক অধিকার : শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার, সুস্থ ও ভদ্র পরিবেশে বাসের অধিকার, সামাজিক সাম্যের ধিকার।

নাগরিকের বিভিন্ন অধিকারগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অধিকারগুলি রাষ্ট্রের সূচক। তাদের সামাজিক ও মানবিক মূল্য এক।

নাগরিকের কর্তব্য ও দায়দায়িত্ব—অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। নাগরিক অধিকার ব্যক্তিগত সম্পদ, সামাজিক সম্পদও। এ ক্ষেত্রে চুক্তি মতবাদের প্রাসঙ্গিকতা : অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের পরিপূরক। হবহাউস ও ডলটনের বক্তব্য। রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা। নাগরিকের আইনগত ও নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কঠিন। কর্তব্যের প্রকারভেদ : পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি, বিশ্ববাসীর প্রতি কর্তব্য।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম মূলতঃ নাগরিক অধিকার অর্জনের লড়াই। এজন্য জাতীয় কংগ্রেসের গৌরবময় প্রচেষ্টা স্মরণীয়। ভারতীয় গণপরিষদের প্রচেষ্টা।

বর্তমানে ভারতীয় নাগরিকদের ৬ রকম মৌলিক অধিকার স্বীকৃত—(১) সাম্যের অধিকার—তার ব্যতিক্রম। (২) স্বাধীনতার অধিকার : বর্তমানে ৬ প্রকার স্বাধীনতা স্বীকৃত ; নিবর্তনমূলক আটক

আইন, মিসা, জাতীয় নিরাপত্তা আইন, এস্মা—তাদের ভূমিকা। (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার—তার ব্যাখ্যা। (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার: চম্পকম্ দোরাইরাজন্ মামলার রায়ের তাৎপর্য, সংবিধানের ২৬,২৭, ধারার ব্যাখ্যা; ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণনের অভিমত। (৫) শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক অধিকার। (৬) শাসনতান্ত্রিক উপায়ে অধিকারলাভের অধিকার: উপায়গুলি ৫ প্রকার: বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকারপৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ। জরুরী অবস্থাতেও হাইকোর্ট্ এগুলি বলবৎ করতে পারে।

ভারতীয়দের মৌলিক অধিকারগুলি কেন "মৌলিক"—এগুলি (১) সংবিধানে লিখিত, (২) সভ্যজীবনে অপরিহার্য, (৩) আদালত কর্তৃক রক্ষিত, (৪) সবগুলি "মৌলিক" নয়।

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনা: (১) আদালত কর্তৃক সংরক্ষিত। (২) আইনসভাগুলির দ্বারাও রক্ষিত। (৩) এগুলির ওপর বিদেশী সংবিধানের প্রভাব। (৪) মার্ক্সবাদীদের মত: অর্থনৈতিক অধিকার যথেষ্ট নয়। (৫) তাঁদের আরেকটি অভিযোগ: বিচারব্যবস্থার অক্ষমতা। (৬) ভোটদানের মত অধিকারও "মৌলিক" নয়। (৭) নির্দেশাত্মক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারের ঊর্ধ্বে স্থাপিত।

ভারতীয় নাগরিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের তাৎপর্য: রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি। নীতিগুলির শ্রেণীবিভাগ—(১) জনকল্যাণকর রাষ্ট্রগঠনের নীতি, (২) গান্ধীবাদী নীতি (৩) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পালনীয় নীতি।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলির বাস্তব রূপদান কতটা সম্ভব হয়েছে: রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষম বণ্টনব্যবস্থা: কৃষিক্ষেত্রে ও শিল্পক্ষেত্রে। সর্বাত্মক সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা, পঞ্চায়েতীরাজ, খাদি, কুটিরশিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতিসাধন। বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় ও পুরাকীর্তি রক্ষার ক্ষেত্রে, নির্জোট আন্দোলনে ও ৩য় বিশ্বে ভারতের নেতৃত্বের মধ্যে নির্দেশাত্মক নীতিগুলি বাস্তবায়িত।

নীতিগুলির পর্যালোচনা: মার্ক্সবাদীরা বলেন যে, মিশ্র অর্থনীতির সীমিত কাঠামোর মধ্যে নির্দেশাত্মক অর্থনৈতিক নীতিগুলিসফল হতে পারে না। কেউ কেউ বলেন: এগুলি "নৈতিক সদিচ্ছার উচ্ছ্বাস"—যেন,"নির্বাচনী ইস্তাহার।" এর জবাবে বলা যায় যে, এ নীতিগুলিরও মূল্য যথেষ্ট। গোপালন্ মামলায় প্রধান বিচারপতি কানাইয়ার রায়। অন্যান্য মামলায় সিদ্ধান্তও অনুরূপ। ভারত সরকার এগুলির মূল্য স্বীকার করেন। বেনেগাল্ নরসিং রাউয়ের মত। মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সংঘাত হলেও নির্দেশাত্মক নীতি গ্রাহ্য: ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইন ও আদালতের রায়। নীতিগুলির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব।

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য—১০ প্রকার কর্তব্যের উল্লেখ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে রুশ্ ও চীনা সংবিধানের প্রভাব।

৮

উদারনৈতিকতা মার্ক্স্বাদ গণসমাজতন্ত্র

"But what more oft, in nations grown corrupt,
And by their vices brought to servitude,
Than to love bondage more than liberty—
Bondage with ease than strenuous liberty.

—Milton's "*SamsonAgonistes*"

আরিস্টটল্ মানুষকে যখন রাজনৈতিক জীবরূপে (political animal) চিহ্নিত করেন, তখন তিনি ব্যক্তিচরিত্রের কতকগুলি প্রবণতার, কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দেন। মানুষ বাক্শক্তির অধিকারী। সে চিন্তাশীল। সে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে বিশেষভাবে আত্মোন্নতির জন্য, আত্মোপলব্ধির জন্য নিয়োগ করে। শুধু বাঁচাই তার কাছে সব নয়। ভালোভাবে, আরো সুন্দরভাবে বাঁচা—এটাই তার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব। এর ফলেই অনেক কম বুদ্ধির ও চিন্তার অধিকারী অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষ অনেক বেশী প্রগতিশীল। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য সহজ, সরল, বিশুদ্ধ মানবিকতাই মানুষকে সমাজ-জীবন যাপনের, রাষ্ট্র গঠনের যোগ্য করে তুলেছে।

বাক্শক্তি ও চিন্তাশীলতা মানুষকে প্রগতিশীল করেছে

মানুষের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সত্তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যই হল যে, সে বর্তমানকে নিয়ে সুখী হতে পারে না। সে নতুন, উন্নত জীবনাদর্শ খোঁজার চেষ্টা করে, আগের আদর্শের সঙ্গে পরেরটির তুলনা করে, নিজের অনুভূতির, উপলব্ধির কষ্টিপাথরে নতুনকে যাচাই করে নেয়। এভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা-সমীক্ষা চালাতে তাকে সাহায্য করে প্রকৃতির অফুরন্ত দান তার বাক্শক্তি, তার বুদ্ধিবৃত্তি, তার চিন্তাধারা। এর ফলেই মানুষ তার সংঘবদ্ধ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উপযোগী তাত্ত্বিক (theory) ও প্রাতিষ্ঠানিক (institutions) দিকগুলি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে। সেই বিশিষ্ট ভাবনাচিন্তাকেই সামাজিক বা রাজনৈতিক মতবাদ (Social and Political concepts বা theories) বলা হয়। লিও স্ট্রাউসের (Leo Strauss) মতে, মানুষের স্বভাবসিদ্ধ পরিবর্তন-প্রিয়তার ফলেই সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদগুলির মধ্যে রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার সহাবস্থিতি লক্ষ্য করা যায় ("All political action aims at preservation or change.")। মতবাদগুলি যখন কতকগুলি সুনির্দিষ্ট, বাঁধাধরা

প্রগতিশীল ভাবনাচিন্তাই রাজনৈতিক মত সৃষ্টি করে; প্রচারধর্মী রাজনৈতিক মতই মতাদর্শ

নিয়ম বা নীতির কাঠামোকে আশ্রয় করে প্রচারধর্মী হয়ে ওঠে, তখন সে মতবাদগুলিকে মতাদর্শ (Ideloogy) বলা হয়। আধুনিক যুগে উদারনৈতিকতা (Liberalism), মার্কসবাদ (Marxism) এবং গণসমাজতন্ত্র (Democratic Socialism) তিনটি প্রধান রাজনৈতিক মতবাদ (major political theories) কার্যকর। এ-মতবাদগুলি কোথাও-কোথাও, কখনও-কখনও প্রচারধর্মী হয়ে ওঠে। তখন বলা হয় যে, এগুলি আধুনিক মতাদর্শ (modern political ideologies)।

॥ উদারনৈতিকতা : মতবাদটির রূপ ও রূপান্তর ॥

খ্রীস্টধর্মের প্রসারের পর থেকে রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টধর্মের সর্বোচ্চ ধর্ম-যাজকরূপে রোমের পোপ (Pope) সমগ্র ইউরোপের খ্রীস্টান ধর্মসংস্থাগুলির (Church) ওপর তাঁর চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার লাভ করেন। অন্যান্য ধর্মের মত খ্রীস্টধর্মের উদার নীতি মানবতা ও সাম্যের, শান্তি ও সম্প্রীতির আদর্শ বহন করলেও শেষ পর্যন্ত খ্রীস্টান যাজকদের বিলাসিতা, দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে জনমানসে নানারকম বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে লাগল। এর প্রতিবাদে জার্মানীতে আন্দোলন শুরু করেন বিখ্যাত ধর্মযাজক মার্টিন্ লুথার (Martin Luther : ১৪৮৩—১৫৪৬), সুইজারল্যাণ্ডে জন্ কাল্‌ভিন্ (John Calvin : ১৫০৯—৬৪)। শেষ পর্যন্ত এই ক্যাথলিক গির্জার দুর্নীতিকে কেন্দ্র করেই পোপের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রোটেস্টান্ট প্রতিবাদ আন্দোলন (Protestant Movement) বা ধর্ম সংস্কার আন্দোলন (Reformation Movement) শুরু হয়। মার্টিন্ লুথারের প্রবর্তিত প্রতিবাদী খ্রীস্টধর্ম (Protestantism) ধীরে ধীরে ইউরোপে ও পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে সম্প্রসারিত হল। ফলে, যাজকশক্তি দুর্বল হয়ে গেল, রাজশক্তি বেশী গুরুত্ব লাভ করল। এইভাবে, ভাইস্‌বর্ডের (Weisbord) মতে, ধর্মসংস্কার আন্দোলন রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে উদারনৈতিকতার আবির্ভাবের প্রথম কারণ।

রাজনৈতিক মতাদর্শরূপে উদারনৈতিকতার আবির্ভাবের কারণ (১) মার্টিন্ লুথারের প্রোটেস্টান্ট্ ধর্মমত ও ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন (ভাইস্‌বর্ড্)

দ্বিতীয়তঃ, টনি (R. H. Tawney) বলেছেন যে, প্রোটেস্টান্ট্ ধর্ম-আন্দোলন যেমন একদিকে ক্যাথলিক যাজকদের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, তেমনি এর ফলে ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতাগণ যাজকদের করায়ত্ত শাসন-ক্ষমতার অংশলাভে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। রাজশক্তি তাদের শাসনক্ষমতার ভাগ দিতে সম্মত না হবার ফলে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পরবর্তী উদারনৈতিক আন্দোলন হল স্বৈরাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে ধনিক শ্রেণীর আন্দোলন। স্টুয়ার্ট্ আমলে ইংলণ্ডে এর চরম পরিণতি দেখা দেয় ১৬৪৯ সালে রাজা ১ম চার্লসের শিরশ্ছেদ, গৃহযুদ্ধ এবং ইংলণ্ডে অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে প্রথম প্রজাতন্ত্র

(২) ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ (টনি)

প্রতিষ্ঠা (১৬৫৩—১৬৫৮)। তাই তিনি বলেছেন যে, মার্ক্স্ উনবিংশ শতাব্দীতে সর্বহারা প্রোলেতারিয়ত শ্রেণীর জন্য যা করেছিলেন, কাল্‌ভিন্ ষোড়শ শতাব্দীতে ধনিক বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্য তাই করেছেন। কিন্তু বুর্জোয়া ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্তৃত্বলাভের ফলে স্বৈরতন্ত্রী রাজার শাসন অবলুপ্ত হল। বিশেষ, অর্থাৎ সীমাবদ্ধ অর্থে শাসনক্ষমতার এই রূপান্তরকেও ক্ষমতার গণতান্ত্রিকীকরণ বলা চলে এবং স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্রের অবসান জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান মূল্যের সূচকরূপে উদারনৈতিকতার আদর্শকে অগ্রগামী করে দিল।

তৃতীয়তঃ, নবম ও দশম শতাব্দী থেকে মধ্যযুগ (Middle Ages) অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে সামন্ততন্ত্র (Feudalism) প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থা সেখানকার অধিবাসীদের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করত। ভূমিহীন কৃষকগণের ওপর জমির মালিকানার মত স্বত্ব ভূস্বামীর কর্তৃত্বকে চরম ও অব্যাহত করে রেখেছিল। জমির মালিকানা হস্তান্তরিত হলে ভূমিহীন কৃষকদের ওপর মালিকানাও নতুন মালিকের কাছে হস্তান্তরিত হত। এই হতভাগ্য কৃষকগণের ওপর স্বৈরাচারী জমিদারগণ চরম, অমানুষিক অত্যাচার চালাতেন। কিন্তু যাজকতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের স্বৈরতা দূর হবার ফলে ইউরোপের বহু রাষ্ট্রে নিপীড়িত, শোষিত ভূমিহীন কৃষকদের প্রতি দরদ জানিয়ে অনেক ছোটখাট ধর্মীয় আন্দোলন দেখা দেয়। ইংলন্ডে

(৩) সপ্তদশ শতাব্দীর ছোট-খাটো ধর্মীয় আন্দোলন : কোয়েকার আন্দোলনের প্রভাব

রাজা ১ম চার্ল্‌সের শিরশ্ছেদের সময়ে স্বৈরতন্ত্রী রাজার বিরুদ্ধে যখন গৃহযুদ্ধ চলে, তখন সেখানকার "কোয়েকার" আন্দোলনকে (Quaker Movement) ভাইস্‌বর্ড্ উদারনৈতিকতার বিশেষ প্রকাশ বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, কোয়েকারগণ তখন ছিলেন ধর্মীয় ক্ষেত্রে চরম ব্যক্তি-স্বাধীনতার ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক গণতন্ত্রের সমর্থক ("Religious Anarchists with some Social Democratic ideas")। তিনি বিশেষভাবে জন্ বেল্লের্স্ (John Bellers) এবং জেরার্ড্ উইন্‌স্টান্‌লি (Gerrard Winstanley) – সে আমলের এই দুজন কোয়েকারের কথা উল্লেখ করেন। বেল্লের্স্ শ্রমভিত্তিক মূল্যতত্ত্ব (Labour Theory of Value) সমর্থন করেন। উইন্‌স্টান্‌লি কয়েকজন আঞ্চলিক ভূস্বামীর (Lords of Manors) কাছে আবেদন করে জানান, "তোমাদের একচেটিয়া ভোগের জন্য ও আমরা (কৃষকরা) তোমাদের গোলামি করব বলে পৃথিবীর সৃষ্টি হয় নি" ("the Earth was not made purposely for you to be Lords of it, and we to be your Slaves.")। উইন্‌স্টান্‌লি ভালবাসার ভিত্তিতে স্ত্রীপুরুষের বিবাহ (love marriage) সমর্থন করতেন। কালক্রমে, বেল্‌জিয়াম্, হল্যান্ড্ প্রভৃতি ক্যাথলিকপ্রধান রাষ্ট্রগুলিতেও প্রোটেস্টান্ট্ ধর্মের মত কোয়েকার আন্দোলনের ঢেউ এসে জানিয়ে দিল যে, এ হল উদারনৈতিকতার আলোড়ন।

চতুর্থতঃ, ইউরোপীয় রেনেসাঁস্ (Renaissance) আন্দোলনের প্রভাবেও উদারনৈতিকতার আদর্শ ইউরোপে ব্যাপক ও বিপুলভাবে প্রসার লাভ করে। বাচ্যার্থে

"রেনেসাঁস" হল পুনর্জাগরণ (Rebirth)। এই পুনর্জাগরণ প্রধানতঃ দুটি দিকে ঘটে। (ক) গ্রীকো-রোমান রীতিনীতির মধ্যে যেগুলি গ্রহণযোগ্য, সেগুলির পুনরুদ্ধারের ফলে জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারে গ্রীক্ ও রোমানগণের মূল্যবান অবদান সম্পর্কে পুনরায় চর্চা এবং সেগুলি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রচেষ্টা শুরু হল। সাহিত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাই একটা নতুন রকমের ঝোঁক দেখা দিল। পবিত্র বাইবেলের নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে হেলেনীয়, অর্থাৎ গ্রীক পদ্ধতিতে গির্জাগুলিতে নানা প্রকার সুন্দর মূর্তি গড়া হল। এর মধ্য দিয়ে মানুষের ধর্মবোধকে ঐশ্বরিক ধর্মচেতনার সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা প্রকাশ পেল। ভগবান্ যীশু মানবশিশুর মতই মা মেরীর কোলে দেখা দিলেন। ঈশ্বরকে মানবিকগুণে ভূষিত করার প্রচেষ্টা (Anthropomorphism) ধর্মান্ধতার পরিবর্তে ব্যক্তির কাছে ধর্মকে মানবীয় করে তুলল। (খ) রেনেসাঁসের সবচেয়ে বড় এবং স্থায়ী অবদান হল মানবতাবাদের (Humanism) সূচনা। দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র ইত্যাদির চাপে নিপীড়িত মানবাত্মা মুক্তির কামনায় অস্থির হয়ে উঠছিল। তার সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার কাহিনী শিল্পে, সাহিত্যে, ললিতকলায় যেন একটা নবীন আঙ্গিকের, নতুন সৃজনশীল শিল্পধর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে লাগল। তাই সভ্যতার ইতিহাসের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার উইল্ ডুরাণ্ট্ বলেছেন যে, রেনেসাঁস্ শুধু যুক্তিবাদী মননশীলতা এবং কার্যকারণসম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের পবিত্র কৌতূহলকে ("holy curiosity") জাগিয়ে তুলেছে তাই নয়, রেনেসাঁসকে হারিয়ে-যাওয়া মানবসত্তার পুনরাবিষ্কারও ("Rediscovery of Man") বলা যায়। এইভাবে মানবসত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে উদারনৈতিকতা একটা অভিনব ও অভাবনীয় পথ খুঁজে পেল। এজন্যই ফিসারের (H. A. L. Fisher) কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন যে, ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের বিস্তারের ওপর সেখানে রেনেসাঁস্ আমলে গ্রীক ও লাতিন ভাষা ও সাহিত্য পঠনপাঠনের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) রেনেসাঁস্ (পুনর্জাগরণ) আন্দোলনের প্রভাব : ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য সব ক্ষেত্রে গ্রীকো-রোমান সভ্যতার ও মানবতাবাদের প্রভাব : উইল্ ডুরাণ্ট্ ও ফিসারের বক্তব্য

পঞ্চমতঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংলণ্ডের মার্কিন উপনিবেশগুলি মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই উপলক্ষে ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই তারা যে স্বাধীনতা প্রস্তাব (Declaration of Independence) ঘোষণা করে, তার মধ্যেও উদারনৈতিকতার আদর্শ রূপায়িত। কারণ, ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকারের ভিত্তিতে এই ঘোষণায় শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়। মার্কিন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রেও এই ঘোষণাপত্র প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। উদারনৈতিকতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শের ক্ষেত্রে এই মার্কিনী ঘোষণাপত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন সংবিধানের প্রখ্যাত টীকাকার জোসেফ্ স্টোরি (Joseph Story) এই ঘোষণাপত্রকে "মার্কিন জাতির অভিজ্ঞানপত্র" ("birth certificate of the American nation") বলে বর্ণনা করেছেন।

(৫) মার্কিন উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৭৫)

ষষ্ঠতঃ, ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব (French Revolution, 1789) উদারনৈতিকতার আদর্শকে প্রভাবিত করেছিল। এই বিপ্লব ব্যর্থ হবার প্রধান কারণ হল যে, জনতা (mob) কেবল সাময়িকভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল করেছিল। তবুও ক্ষুব্ধ জনতা রুষ্ট হলে যথেচ্ছাচারী শাসকদেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব এই কঠিন বাস্তব সত্যটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল। বিপ্লব ব্যর্থ হলেও ফরাসী নাগরিকদের অধিকারগুলি তালিকাভুক্ত করে যে ঘোষণাপত্র (Declaration of the Rights of Man) ঐ সময়ে গৃহীত হয়, উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ইতিহাসে তার মূল্য অনেক। (ক) এই ঘোষণার প্রথম ধারায় রুশোর সামাজিক চুক্তি সম্পর্কিত বিখ্যাত মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলা হয় যে, মানুষ জন্ম থেকে স্বাধীন, স্বাধীনতা ও সাম্য তার প্রাপ্য এবং জনসাধারণের স্বার্থে ছাড়া কোন সামাজিক পার্থক্য থাকবে না। (খ) দ্বিতীয় ধারায় বলা হয় যে মানুষের প্রাকৃতিক এবং চিরন্তন অধিকার (natural and imprescriptible rights of man) সংরক্ষণই প্রত্যেক রাজনৈতিক সংস্থার উদ্দেশ্য। এই অধিকারগুলি স্বাধীনতার, সম্পত্তি-রক্ষার, নিরাপত্তার অধিকার এবং পীড়নের বিরুদ্ধে অধিকার। (গ) তৃতীয় ধারায় রুশোর দ্বারা সমর্থিত লোকায়ত সার্বভৌমত্বকে সমর্থন করা হয়েছে। (ঘ) চতুর্থ ধারায় বলা হয় যে, অপরের অনুরূপ স্বাধীনতার ক্ষতি না করে কিছু করার ক্ষমতার নাম স্বাধীনতা এবং কেবলমাত্র প্রাকৃতিক অধিকারের মধ্যে অন্তর্নিহিত সীমাগুলিই ব্যক্তি-স্বাধীনতার সীমা; সে সীমাগুলি আবার আইনের দ্বারা সীমিত। (ঙ) ষষ্ঠ ধারায় ঘোষণা করা হয় যে, আইন সমাজের সমষ্টিবদ্ধ জনগণের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিজে হাজির হয়ে বা তার প্রতিনিধির মারফত এই সাধারণ ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ করবার অধিকার আছে। ফরাসী ঘোষণাপত্রের মধ্য দিয়ে বিপ্লবোত্তর যুগে মানবাধিকারের যে স্বীকৃতি প্রচারিত হল, তাতে ব্যক্তির প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার কথা বলা হল। এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে মানবতাবাদী. উদারনৈতিক।

(৬) ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব, ব্যক্তিস্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার

সপ্তমতঃ, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে রাষ্ট্রবিরোধী গুপ্ত, সন্ত্রাসবাদী সমিতি স্থাপন, রাজকর্মচারীদের হত্যা প্রভৃতি নৈরাজ্যবাদী কর্মসূচী (anarchist action) দেখা দিল। প্রুধোঁ (Proudhon), ক্রোপটকিন (Kropotkin) প্রভৃতি নৈরাজ্যবাদীগণ প্রচার করেন যে, শ্রমিকদের বঞ্চনার ফলে সম্পত্তি অর্জিত হয় ("Property is theft.")। তাঁরা রাষ্ট্রের, তথা সরকারের সব রকম বন্ধন থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। সন্ত্রাসবাদী নৈরাজ্যবাদ প্রত্যক্ষভাবে উদারনৈতিকতাকে প্রভাবিত করে নি বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু গডউইন (Godwin), তলস্তয় (Tolstoy) প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক নৈরাজ্যবাদীগণ (Philosophical Anarchists) ব্যক্তিকে

(৭) নৈরাজ্যবাদের, বিশেষতঃ, দার্শনিক নৈরাজ্যবাদের প্রভাব; শেলী, বায়রন প্রভৃতি রোমান্টিক কবিদের প্রভাব

সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেওয়ার যে আকুতি প্রকাশ করেন, তা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে। শেলী (Shelley), বায়রন্ (Byron) প্রভৃতি রোমান্টিক কবিদের কাব্যে রূপায়িত এই উদারনৈতিকতা জনগণকে অভিভূত ও আত্মসচেতন করে তোলে।

অষ্টমতঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) ঘটার ফলে ইউরোপের সর্বত্র সামন্ততন্ত্র ভেঙ্গে পড়ে। ধনতন্ত্র (Capitalism) এই শূন্য স্থান অধিকার করে। ভূস্বামীগণের অনেকেই শাসনক্ষমতা দখল করতে আগ্রহী হন। উচ্চ মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী বা পুঁজিপতিরূপে তাঁদের অনেকেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্যনীতি, সম্পত্তির অধিকার, পূর্ণ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অর্থনৈতিক দাবিগুলি সংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা শুরু করে। এইভাবে তখন থেকে তাঁরা উদারনৈতিকতার সঙ্গে ধনতন্ত্রকে সংযুক্ত করে তোলার চেষ্টা করতে থাকেন। উদারনৈতিক সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত উদারপন্থী রাজনৈতিক দলব্যবস্থার মধ্যেও তাঁদের ধনতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়।

(৮) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে শিল্পবিপ্লবের ফল : ধনতন্ত্রের আবির্ভাব

নবমতঃ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খল থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) নামে একটি উদারনৈতিক মতাদর্শ ধীরে ধীরে প্রচারিত হতে লাগল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ প্রমুখ রাজনীতিবিদ্‌গণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমর্থন করে সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের দাবী জানালেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রিকার্ডো (Ricardo), অ্যাডাম্ স্মিথ্ (Adam Smith), কব্‌ডেন্ (Cobden) প্রভৃতি ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্‌গণ ধনতন্ত্রের সমর্থনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে ব্যবহার করলেন। হার্বার্ট স্পেন্সার ডারউইনের জীবতত্ত্বের ভিত্তিতে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় রেখে সমাজে যোগ্যতমের স্থায়িত্বের অধিকারকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জৈবিক ও সামাজিক দিকরূপে ব্যাখ্যা দেন। সব ক্ষেত্রেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অবাধ রাখার পক্ষে তাঁদের মতামত প্রচার করেন। ফলে, উনবিংশ শতাব্দীতে উদারনৈতিকতা বলতে অনেকেই বুঝতেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। ভাইস্‌বর্ড উদারনৈতিকতার এহেন পরিণতিলাভকে "উদারনৈতিকতার বয়ঃপ্রাপ্তি" ("Liberalism's coming of age") আখ্যা দিয়েছেন।

(৯) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আবির্ভাব : রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক (জৈবিক) ক্ষেত্রে

দশমতঃ, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব ব্যর্থ হলেও এর গণতান্ত্রিক গুরুত্ব ছিল সীমাহীন। সামন্ততন্ত্রের অবলুপ্তির ফলে অভিজাত শ্রেণীর এবং উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইউরোপের বহু রাষ্ট্রে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী

হয়ে উঠলেন। জনগণকে নানারকম অধিকার দিয়ে খুশী রাখার জন্য তাঁরা সচেষ্ট হলেন। আধুনিক ফরাসী সামাজিক ঐতিহাসিক হালেভির (Halevy) মতে, উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে হিতবাদের (Utilitarianism) আবির্ভাবের ও সমকালীন সংস্কার-বিষয়ক উদারনৈতিক আইনকানুনগুলির (Reform Acts) পেছনে এটাই ছিল সামাজিক, রাজনৈতিক পট-ভূমিকা। বেন্থাম্ ও জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ হিতবাদের সমর্থকরূপে প্রচার করেন যে, রাষ্ট্রের উচিত সর্বাধিক জনগণের জন্য সবচেয়ে বেশী কল্যাণসাধন ("greatest good of the greatest number")। তাঁদের মতে, তাহলেই সমাজের বেশীর ভাগ লোকের কল্যাণ হবে। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃ সুখ (Pleasure) ভালবাসে। স্মরণীয় যে, ভিক্টোরীয় যুগে অর্থাৎ, উনবিংশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে আইনকানুনের রদবদলের মারফত ভোটাধিকার বিস্তৃত হয় ও জনগণের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য কিছু কিছু আইন রচিত হয়। গুন্নার মির্ডাল্ (Gunnar Myrdal) হালেভির মতই যুক্তির সাহায্যে নরওয়ে ও সুইডেনে সামাজিক গণতন্ত্রের (Social Democracy) উদ্ভব ও উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থারূপে তার ক্রমিক জনপ্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।

(১০) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহায্যে সংস্কার আন্দোলন; ইংলণ্ডে হিতবাদের ও নরওয়ে-সুইডেনে সামাজিক গণতন্ত্রের উদ্ভব: হালেভি ও মির্ডালের ব্যাখ্যা

একাদশতঃ, মার্কিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম্ লিংকনের আমলে গৃহযুদ্ধের (১৮৬১—১৮৬৫) অবসানের পর দাসপ্রথা (Slavery) অবলুপ্ত হয়। উদারনৈতিকতার অগ্রগতির ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। ভাইস্‌বর্ডের মতে, লিংকন্ গোড়ার দিকে দাসপ্রথা চালু রাখার পক্ষপাতী মার্কিনী দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে এ ব্যাপারে একটা আপোসের চেষ্টা করেন। স্মরণীয় যে, লিংকন্ ছিলেন একজন কোয়েকার, আদর্শগতভাবে যুদ্ধবিরোধী, শান্তিপ্রিয়। তিনি হয়ত সেজন্যই দক্ষিণাঞ্চলে দাসপ্রথাকে সীমিত করে রেখে পরে তার অবলুপ্তির ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু মার্কিনী দক্ষিণাঞ্চলের উগ্র অমানবিকতার বিরুদ্ধে তাঁকে শেষে রাষ্ট্রপতিরূপে গৃহযুদ্ধের পরিচালনার ভার নিতে হয়।

(১১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথার অবলুপ্তি: লিংকনের প্রচেষ্টা

দ্বাদশতঃ, উদারনৈতিকতার আদর্শ নারীমুক্তি ও প্রগতিকেও (Feminism) উপেক্ষা করে নি। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে রক্ষণশীল সমাজে নারীগণ যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করতেন না। সে সময়ে ইংলণ্ডে সংস্কার-আন্দোলনের জোয়ার দেখা দিয়েছিল। ব্যক্তি-স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ পূজারী জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ এই উদারনৈতিকতার প্রবাহে নারী-প্রগতির আন্দোলনকে সংযুক্ত করে দেন। তখন পুরুষপ্রধান সমাজে মেয়েদের ব্যক্তিত্বকে জোর করে দমিত করে দেওয়া হত। সমাজের অর্ধাংশ নারী। সুতরাং নারীদের স্বাধীনতা না দিলে সমাজের অর্ধাংশ মুক্ত জীবনযাপনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

(১২) নারীমুক্তি ও নারী-প্রগতির আন্দোলন: জন্-স্টুয়ার্ট্ মিলের অবিস্মরণীয় নেতৃত্ব

অতএব মিল্ নারীগণের নানাপ্রকার অধিকার দানের জন্য মুক্তকণ্ঠে আবেদন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকে নারীগণ পৃথিবীর বহু দেশে ভোটাধিকার লাভ করেন। বর্তমানে নারীগণের অবস্থা আগের তুলনায় যে-রকম উন্নত হয়েছে, তার পেছনে উদারনৈতিকতার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ত্রয়োদশতঃ, উদারনৈতিকতার আরেকটি প্রগতিশীল ভূমিকা দেখা গেছে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনকে (Pacifism) গড়ে তোলার মধ্যে। পৃথিবীর বিরাট রাষ্ট্র-গুলির নেতাগণ নিজেদের রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে প্রায়ই যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করতেন। বিংশ শতাব্দীতেই দুটি সর্বগ্রাসী বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আণবিক বোমা ব্যবহারের পর থেকে যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে উদারনৈতিক লেখক, শিল্পী, দার্শনিক প্রভৃতি মনীষিগণ বিশ্ববাসীকে সচেতন করতে থাকেন। হিট্লারী একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁরা ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলন (Anti-Fascist Movement) গড়ে তোলেন। এঁদের প্রধান ধ্বনি—"যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।" ল্যাস্কি প্রমুখ উদারনৈতিক রাজনীতিবিদ্‌গণ জাতীয় সার্বভৌমত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের জন্য মত প্রকাশ করেন। লেনিন প্রমুখ সমাজতন্ত্রবাদীগণ পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আঁতাতের ফলে যুদ্ধের আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করে যুদ্ধবিরোধী জনমত গঠনে সাহায্য করেন। বার্ট্রান্ড্ রাসেল্ নাগরিকের যুদ্ধে যোগদানকে বাধ্যতামূলক না করার জন্য দাবী তোলেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানাপ্রকার স্বৈরতার দরুন বিপন্ন ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে উদ্ধার করার জন্য 'আন্তর্জাতিক মুক্তিসংঘ" (Amnesty International) প্রতিষ্ঠা করেন।

(১৩) যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন: "যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই"; ল্যাস্কি ও বার্ট্রান্ড্ রাসেলের নেতৃত্ব

॥ উদারনৈতিকতার বৈশিষ্ট্য ॥

উদারনৈতিকতার তাত্ত্বিক বিবর্তন ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমতঃ ঐতিহাসিকগণ তার বৈচিত্র্য এবং অনেক সময় তার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার সহাবস্থিতি লক্ষ্য করে অত্যন্ত বিস্মিত হন। মধ্যযুগে ঐস্লামিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সংকীর্ণ ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রভাবিত গোঁড়া খৃস্টানদের ধর্মযুদ্ধকে (Crusade) উদারনৈতিকতার আদিকালের ইতিহাসের প্রধান ঘটনা-বলীর অন্তর্গত বলে অনেকে মনে করেন। আবার, উদার-নৈতিক আন্দোলনের আধুনিক পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিকতার প্রভাবে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের (Welfare State) আবির্ভাব, নারী-প্রগতির আন্দোলন এবং অতি-আধুনিক কালে "যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই" আন্দোলনের মত বিশ্বজনীন, প্রগতিশীল ঘটনা-গুলিকেও উদারনৈতিকতার আদর্শের অঙ্গীভূত বলে ধরা হয়। যাঁরা সমাজতন্ত্রবাদী, তাঁরা নিজেদের "উদারপন্থী" বলে দাবী করেন, আবার যাঁরা "মুক্ত অর্থনীতি"র (Free Trade) সমর্থক, তাঁরাও নিজেদের "উদারপন্থী" বলে মনে করেন।

উদারনৈতিকতার বৈশিষ্ট্য: (১) পরস্পরবিরোধী ভাবের সহাবস্থিতি, নমনীয়তা

দ্বিতীয়তঃ, উদারনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে পরস্পরবিরোধী ভাবের সহাবস্থিতি থাকলেও তার নমনীয়তার দরুন এর মধ্যে একটা সমন্বয়ী প্রচেষ্টা (attempt for synthesis) লক্ষণীয়। যেমন, ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের জন্য সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সমন্বয়ের একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অনেকের ধারণা উদারনৈতিকতা মানেই পুঁজিবাদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনজ্ঞাপন এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy) মানেই বুর্জোয়াদের ধাপ্পাবাজির একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত কায়েম করা। কোন কোন স্থানে অবশ্য ধনিকশ্রেণী গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলিকে কৌশলে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেছে ও করে। কিন্তু সেই পরিণতির জন্য উদারনৈতিকতা, গণতান্ত্রিকতা বা প্রজাতান্ত্রিকতার আদর্শকে দোষী বলে মনে করলে এই মহামূল্যবান্ আদর্শগুলিকে অপমান করা হয়। উদারনৈতিকতার সমন্বয়ী প্রচেষ্টাকে "রক্ষণশীলতার সঙ্গে আপোস" বলে গণ্য করলে এই সুমহান্ আদর্শটিকে অন্যায়ভাবে ছোট করে দেখা হয়।

(২) বিরুদ্ধ আদর্শের মধ্যেও সমন্বয়ী প্রচেষ্টা

তৃতীয়তঃ, উদারনৈতিকতার আদি এবং শেষ কথা হল "স্বাধীনতা"। এই স্বাধীনতা ব্যক্তির স্বাধিকাররূপে স্বীকৃত, আবার নারী, শ্রমিক প্রভৃতি নিপীড়িতদের লুপ্ত মানমর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্যও সমর্থিত।

(৩) স্বাধীনতা

চতুর্থতঃ, ম্যাক্‌ফার্সন্ (Macpherson) বলেন যে, উদারনৈতিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মানবতাবাদ (Humanism)। ব্যক্তিকে স্বাধীনরূপে স্বীকার করে নেওয়ার পেছনে যে আবেগ রেনেসাঁস্ যুগ থেকে দেখা যায়, তার প্রধান কেন্দ্রস্থল হল মানবিকতার মত একটা বিশ্বজনীন, শাশ্বত আদর্শ। মধ্যযুগ পর্যন্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিসত্তা যেভাবে অবহেলিত হয়েছিল, উদারনৈতিক মানবিকতা এই প্রবণতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো প্রতিবাদরূপে দেখা দিল।

(৪) মানবিকতা (ম্যাকফার্সন্)

পঞ্চমতঃ, ম্যাক্‌ফার্সন্ আরও বলেন যে, উদারনৈতিকতার অন্যতম বিশেষত্ব হল যুক্তিবাদ (Rationalism)। রেনেসাঁস্ যুগ মানবজাতিকে যুক্তিবাদী করে তুলে সভ্যতার ইতিহাসে তাকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে মার্টিন্ লুথারের প্রোটেস্টান্ট্ ধর্মের প্রচার, ধর্মান্ধতার প্রতিবাদ ইত্যাদি ঘটনা ব্যক্তি-মানসকে ক্রমশঃ যুক্তিনির্ভর, তথ্যনিষ্ঠ এবং কৌতূহলী করে তুলল। এজন্য শিল্প, সাহিত্য, ললিতকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উদারনৈতিকতা যেমন যুক্তিবাদের প্রাধান্য সূচিত করল, তেমনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি-মননের অদম্য কৌতূহলকে নিয়োজিত করল।

(৫) যুক্তিবাদ : প্রোটেস্টান্ট্ ও রেনেসাঁস্ আন্দোলনের প্রভাব ; বিজ্ঞানচিন্তার, কৌতূহলী, উদ্ভাবনী দৃষ্টির উন্মেষ (ম্যাক্‌ফার্সন্)

ষষ্ঠতঃ, উদারনৈতিকতার মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগের ধর্ম-নিরপেক্ষতার (Secularism) আদর্শ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হল। প্রোটেস্টান্ট ও কোয়েকার আন্দোলন মানুষের ধর্মচিন্তাকে সংস্কারমুক্ত, যুক্তিনিষ্ঠ, বিজ্ঞানভিত্তিক করে দিল।

(৬) ধর্মনিরপেক্ষতা

সপ্তমতঃ, উদারনৈতিকতা স্বাধীনতার যে আদর্শকে লালিত করেছিল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও প্রজাতান্ত্রিকতার আদর্শের মধ্য দিয়ে তা রূপায়িত হল। নৈরাজ্যবাদীদের ছোটখাটো সন্ত্রাসবাদী ঘটনা থেকে শুরু করে মার্কিন স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং ফরাসী বিপ্লবের মত চরম গণবিক্ষোভ উদারনৈতিকতাকে একটা স্বাধিকারবাদী আদর্শ (Libertarianism) রূপে প্রতিষ্ঠিত করল। ম্যাকফার্সন্ যথার্থই বলেছেন যে, উদারনৈতিকতা স্বৈরতন্ত্রবিরোধী মতাদর্শরূপেও (Anti-authoritarianism) প্রতিভাত হল।

(৭) স্বাধিকারবাদ ও স্বৈরতন্ত্রবিরোধিতা

অষ্টমতঃ, সমাজতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সমর্থক ল্যাস্কি উদারনৈতিকতাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন যে, উদারনৈতিকতা প্রাচীন ও মধ্য যুগ থেকে আধুনিকতার যুগে মানবাত্মার গৌরবময় উত্তরণ। উদারনৈতিকতা কেবল একটা রাজনৈতিক মতবাদ নয়। এ হল মলিন, পঙ্কিল জলাশয় থেকে নিষ্ক্রান্ত সংস্কারমুক্ত মানুষের নির্মল, বিস্তীর্ণ, পবিত্র প্রয়াগে স্বচ্ছন্দ অবগাহন। সংক্ষেপে, ল্যাস্কির কথায়, আধুনিকত্বের কর্মসূচীকে মেনে নিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকাণ্ডে অভ্যস্ত হবার একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা ("more a habit of mind than a doctrine")। এ আদর্শের মূলকথা হল—পার্থিব উন্নতিকে কেন্দ্র করে মানুষের সঙ্গে মানুষের নতুন নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলা, নতুন ভাবে যুক্তি এবং মুক্তির, ব্যক্তি, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। ল্যাস্কির অনবদ্য ভাষায় উদারনৈতিকতা আধুনিক যুগের নতুন চাহিদা পূরণের নতুন উপচার ("a new ideology to fit the needs of a new world")।

(৮) প্রাচীন ও মধ্য যুগ থেকে আধুনিকতার যুগে মানবাত্মার গৌরবময় উত্তরণ (ল্যাস্কি)

॥ উদারনৈতিকতার সংজ্ঞা ॥

ইংরাজী অভিধান (Encyclopaedia Britannica) থেকে জানা যায় যে, স্বাধীনতার ভিত্তিতে সরকারের, সমাজের, ব্যক্তির, গোষ্ঠীর পরিচালনার জন্য তাত্ত্বিক ও ফলিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভাবধারাই হল উদারনৈতিকতা ("an idea committed to freedom as a method and policy in government, as an organising principle in society, and a way of life for the individual and community")। উদারনৈতিকতার এই সংজ্ঞাটি থেকে তাত্ত্বিক ও ফলিত উভয় ক্ষেত্রেই তার গুরুত্ব বোঝা যায়। উদারনৈতিকতা একটা ব্যাপক, সর্বাত্মক চিন্তাধারা।

উদারনৈতিকতার সংজ্ঞা ঃ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক

অধ্যাপক হব্‌হাউস্‌ (Lord Hobhouse) "উদারনৈতিকতা" সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে উদারনৈতিকতার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা তার আভিধানিক সংজ্ঞার অনুরূপ। তাঁর মতে, উদারনৈতিকতা মুক্ত, অখণ্ড জীবনপ্রবাহের একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা। তিনি এর আধ্যাত্মিক মূল্যও স্বীকার করেছেন ("The heart of Liberalism is the understanding that progress is not a matter of mechanical contrivance, but of the liberation of living spiritual energy")। এই আধ্যাত্মিকতার বলেই আধুনিক যুগে উদারনৈতিকতা ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী আন্দোলন রূপে গড়ে উঠেছে। সুতরাং লর্ড্‌ হব্‌হাউসের মতে, উদারনৈতিকতার একটা বিশিষ্ট অর্থ হল প্রতিবাদী আন্দোলন ("The modern State……starts from the basis of an authoritarian order, and the protest against that order, a protest religious, political, economic, social, and ethical, is the historic beginning of Liberalism.")।

লর্ড্‌ হব্‌হাউসের সংজ্ঞা : মুক্ত, অখণ্ড জীবনপ্রবাহ, প্রতিবাদী আন্দোলনের অনুপ্রেরণা

॥ উদারনৈতিকতার মুখ্য সমর্থকদের মতামত ॥

একাধিক দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ্‌ নিজের নিজের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে নানাভাবে উদারনৈতিকতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের সকলের মতামতের আলোচনা সহজসাধ্য নয়। তাই উদারনৈতিক মতবাদের কেবল মুখ্য সমর্থকদের মতামত আলোচনা করাই কর্তব্য। তাঁদের মধ্যে টমাস্‌ পেন্‌ (Thomas Paine), জেরেমি বেন্থাম্‌ (Jeremy Bentham), জন্‌ স্টুয়ার্ট্‌ মিল্‌ (John Stuart Mill), টমাস্‌ হিল্‌ গ্রীন্‌ (Thomas Hill Green), লর্ড্‌ হব্‌হাউস্‌ (Lord Hobhouse) এবং ওয়াল্টার লিপ্‌ম্যানের (Walter Lippman) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উদারনৈতিকতার সমর্থকদের মধ্যে পেন্‌, বেন্থাম্‌, মিল্‌, গ্রীন্‌, লর্ড্‌ হব্‌হাউস্‌ ও লিপ্‌ম্যানের নাম উল্লেখযোগ্য

(ক) টমাস্‌ পেন্‌ (১৭৩৭—১৮০৯) অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত উদারপন্থী রাজনীতিবিদ্‌। প্রথমতঃ, রাজনৈতিক মতাদর্শের বিশ্লেষণপদ্ধতির ক্ষেত্রে তিনি "সাধারণ বা রাজনৈতিক বুদ্ধির" (Commonsense) ওপর আস্থাবান্‌ ছিলেন। এই যুক্তির ভিত্তিতেই তিনি মার্কিন উপনিবেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন দেবার পক্ষে ব্রিটিশ্‌ সরকারকে ও ব্রিটিশ্‌ জনমনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। পেন্‌ ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক অধিকারের (Natural Rights) ভিত্তিতে তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি সমকালীন ফরাসী বিপ্লব সমর্থন করেন।

টমাস পেনের চিন্তাধারা : (১) ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সাধারণ বুদ্ধির ওপর গুরুত্ব, প্রাকৃতিক অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা ও ব্যক্তির সংস্কারমুক্ত বিবেকবোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

দ্বিতীয়তঃ পেনের উদারনৈতিকতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল ঃ রাষ্ট্রের বদলে সমাজের প্রতি তাঁর গুরুত্বদান। তাঁর মতে, সমাজের প্রাধান্যের যে ভাব লক্ষ্য করা যায়, সেটা স্বাভাবিক ; সমাজ সরকারের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ("Society is a patron, government a punisher," "society is a blessing, government a necessary evil")।

(২) রাষ্ট্রের বদলে সমাজের ওপর গুরুত্বদান

পেনের উদারনৈতিকতার মূল বৈশিষ্ট্য হল যে, তিনি কোয়েকারপন্থী ছিলেন। তাই সংস্কারমুক্ত। উন্নত ব্যক্তিত্বের প্রতি তিনি শুধু আকৃষ্ট হন নি, তাঁর মতে, ব্যক্তি-মানসিকতাকে উন্নত করার ক্ষেত্রে উদারনৈতিকার ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

৩ কোয়েকার মতের প্রভাব

(খ) জেরেমি বেন্হাম্ (১৭৪৮ — ১৮৩২) ইংলণ্ডে হিতবাদের (Utilitarianism) প্রধান সমর্থক। ব্যক্তি-চরিত্রের প্রবণতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই সুখ চায়, বেদনা পরিহার করতে চায়। তাই তিনি বলেন—যে আইনকানুন সবচেয়ে বেশী লোকের সর্বাধিক সুখ ("greatest good of the greatest number") দিতে পারে, তাই জনহিতকর। সমকালীন ইংলণ্ডে প্রগতিশীল আইনকানুন প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে যে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন চলে, বেন্থামের হিতবাদ ছিল তার তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং সেজন্য এই মতবাদ খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে আইনকানুন সংস্কারের ভূমিকাটি বেন্থামের ব্যাখ্যা থেকে বেশ বোঝা যায়। তাই বেন্থাম্‌কে একজন "মৌলিক দার্শনিক" ("Radical thinker") বলা হয়।

জেরেমি বেন্হামের হিতবাদ ঃ ইংলণ্ডে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা

বেন্থামের হিতবাদের উদারনৈতিকতা স্বীকার করেও লর্ড্ হব্‌হাউস্ বলেন যে, প্রথমতঃ, এই মতবাদ বিকৃত আকারে রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রনায়কদের স্বৈরতান্ত্রিকতা ("Authoritarian Paternalism) সমর্থন করার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

লর্ড্ হব্‌হাউসের সমালোচনা ঃ (১) সম্ভাব্য স্বৈরতন্ত্র

দ্বিতীয়তঃ, হব্‌হাউসের মতে, সমকালীন ইংলণ্ডে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে বেন্থামের চেয়ে কব্‌ডেন্ (Cobden) অনেক বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। মর্লে কব্‌ডেনের জীবনী লিখতে গিয়ে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কব্‌ডেন্ ও অ্যাডাম্ স্মিথ্ (Adam Smith)-এর আদর্শের সঙ্গে বেন্থামের চিন্তাধারাকে এভাবে অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা ধনতন্ত্রের (Laisse-z raire economy অর্থাৎ Capitalism) সমর্থনে ব্যবহার করা হয়।

(২) বেন্হামের চেয়ে কব্‌ডনের প্রভাব বেশী ঃ ধনতন্ত্রের সমর্থন

(গ) জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ (১৮০৬—১৮৭৩) ইংলণ্ডের, তথা বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডারের সমৃদ্ধিসাধনের ক্ষেত্রে তাঁর বিপুল ও বিস্ময়কর অবদানের জন্য বিখ্যাত। প্রখর ছিল তাঁর বুদ্ধি, গভীর ছিল তাঁর প্রজ্ঞা, জনসেবার প্রতি আকুলতা তাঁর ছিল ঐকান্তিক। মনীষার সঙ্গে মননশীলতার এরকম অপূর্ব সমাবেশ বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোনো দার্শনিকের মধ্যে নেই।

মিলের রাষ্ট্রদর্শনে মনীষার সঙ্গে মননশীলতার বিস্ময়কর সমাবেশ দেখা যায়

মিল্ তাঁর পিতা বিখ্যাত ঐতিহাসিক জেম্স্ মিলের (James Mill) সাহায্যে কৈশোরেই প্রাচীন পাশ্চাত্য ভাষায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং যৌবনেই মৌলিক রচনা প্রকাশ শুরু করেন। বেন্থাম্ ও তাঁর পিতার হিতবাদী মত তাঁকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে। তবে তিনি ব্যক্তিমনের উন্নতিশীলতার ওপর বেশী জোর দিয়ে বলেন যে, মানুষ শুধু সুখপ্রিয় নয়, উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে সে তার রুচিবোধকে উন্নত ও মার্জিত করতে পারে। সেজন্য তিনি শিক্ষা-প্রসারের ওপর গুরুত্ব দেন। ফলে, তাঁর হিতবাদে ব্যক্তিকে উন্নততর সুখের জন্য আকৃষ্ট করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

হিতবাদী হলেও মিল্ ব্যক্তিকে উন্নততর সুখের প্রতি আকৃষ্ট ও রুচিসম্পন্ন করার জন্য ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার সমর্থন করেন

তরুণ অবস্থাতেই মিল্ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর (East India Company) অফিসে কর্মী হিসাবে যোগ দেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর কোম্পানীর হাত থেকে ব্রিটিশ্ সরকার ভারত শাসনের ভার গ্রহণ করেন। তার ঠিক পূর্বে কোম্পানীর তরফে মিল্ ইংরেজ সরকারের কাছে যে চিরস্মরণীয় স্মারকলিপি (Memorandum) পেশ করেন, তা থেকে তাঁর উদারপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ঔপনিবেশিকতা বিমোচন (Decolonisation) নীতি, আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তিসংগ্রাম সমর্থন করেন, জ্যামাইকায় কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর ব্রিটিশ্ শাসকের বর্বর অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন।

মিল্ ঔপনিবেশিকতা বিমোচন নীতি, আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করেন, জ্যামাইকার কৃষ্ণাঙ্গদের নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন

'স্বাধীনতা" ("On Liberty") নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে মিল্ ব্যক্তির আচরণকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি হল "ব্যক্তিকেন্দ্রিক" ("self-regarding"), অন্যটি "অপর-কেন্দ্রিক" ("other-regarding")। প্রথমটির ক্ষেত্রে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংকোচন সমর্থন করেন। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতাই তাঁর কাছে সবচেয়ে দামী। তাঁর কাছে "মুক্তি" (Liberty) কথাটি শুধু বহিরঙ্গনে ইচ্ছামত পরিভ্রমণের অধিকার পাওয়াটুকুই বোঝায় নি, তিনি বলেছেন—মুক্তি হল বৃহৎকে অনুভব করার শক্তি, তুচ্ছতাকে অতিক্রম করার প্রয়াস।

মিল্ ব্যক্তি-স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারী

মিল্ যে অর্থনৈতিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী রচনা করেন, তার মধ্যে তিনি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে যেমন ব্যাখ্যা করেন, অন্যদিকে তেমনি ধনতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা

নিয়মকানুন সমর্থন করে সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক প্রকাশ করেন।

মিলের উদারনৈতিকতা তাঁকে সমাজতান্ত্রিক করে তুলেছিল : ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রীদের ওপর তাঁর প্রভাব

তাঁর আত্মজীবনীতে ও ১৮৭৩ সালে ওয়েস্টমিনস্টার রিভিউ-এ (Westminster Review) তাঁর মরণোত্তর প্রকাশন "সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীর" ('Chapters on Socialism") মধ্যে তিনি অত্যন্ত দক্ষভাবে সমাজতন্ত্রের গুণাবলী ব্যাখ্যা করেন। উপরন্তু তিনি ভূমিহীন কৃষকদের জমির স্বত্বদানের (Peasant Proprietorship) সমর্থন করেন, কলকারখানার শ্রমিকদের উন্নতিসাধনের ব্যাপক কর্মসূচী রচনা করেন। বলা যায় যে, পরবর্তীকালে ইংলণ্ডে ফেবিয়ান সমিতির দ্বারা সমর্থিত গণসমাজতন্ত্রের (Democratic Socialism) তিনি পথিকৃৎ ছিলেন ("Mill was the last of the Utilitarians and the first among the Fabians")।

ইংলণ্ডের উদারপন্থী দলের (Liberal Party) প্রতিনিধি হিসাবে মিল কমন্স-সভায় সদস্য নির্বাচিত হয়ে বিভিন্ন ভাষণের মধ্য দিয়ে, বহু চিঠিপত্র ও দিনপঞ্জীর

ইংলণ্ডের কমন্সসভার উদারপন্থীদলের সদস্যরূপে, বই, চিঠিপত্র, ডায়েরী ইত্যাদির মাধ্যমে মিল উদারনৈতিকতার শ্রেষ্ঠ প্রচারক

(ডায়েরীর) মধ্য দিয়ে তাঁর উদারনৈতিক চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Representative Government) সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থই প্রামাণ্য গ্রন্থ। গণতন্ত্রের গুণাগুণ, গণতন্ত্রকে সংগঠিত করার উপায়, গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলী, সরকারের আপেক্ষিকতা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর কথাকেই অনেকে শেষ কথা বলে মনে করেন। সংসদীয় গণতন্ত্রকে উদারনৈতিকতার প্রধান স্তম্ভরূপে নির্মাণ করা তাঁর অক্ষয় কীর্তি, অতুলনীয় কৃতিত্ব।

নারী-মুক্তি ও নারী-প্রগতি আন্দোলনে মিল ছিলেন প্রথম সারির নেতা। নারীগণের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের, তাঁদের সুপ্ত গুণাবলীর সুষ্ঠু উন্মেষের অধিকার প্রদানের জন্য তিনি অজস্র ভাষণে ও পুস্তক-পুস্তিকায় তাঁর বক্তব্যকে ব্যাপকভাবে

মিল নারী-মুক্তি, নারী-প্রগতি আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেতা

প্রচারিত করেন। পুরুষেরা যে অধিকারগুলি ভোগ করেন, সেগুলি ছাড়াও স্বাধীনভাবে বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার, স্বোপার্জিত অর্থ পৃথকভাবে ভোগের অধিকার প্রভৃতি মেয়েদের কতকগুলি নিজস্ব অধিকার তিনি অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেন। মিলের মত জননেতার সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলেই বিংশ শতাব্দীতে নারীগণ ভোটাধিকার সহ তাঁদের প্রাপ্য বহু অধিকার লাভ করেন।

পরিচিত ও অপরিচিত, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অজস্র পুস্তক-পুস্তিকা থেকে মিলের উদারনৈতিকতা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ না করে কয়েকটি মামুলি উদ্ধৃতির মাধ্যমে মিলকে

মিলের বহুমুখী প্রতিভার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন দরকার ; তিনি একজন ছোট মাপের বুর্জোয়া নন

"বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ" বলে অনেকে তাঁর ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ রাখেন ও সমাজবিজ্ঞানের, তথা মানবসভ্যতার অগ্রগমনের ক্ষেত্রে তাঁর অবিনশ্বর অবদানকে ছোট করে দেখাতে চেষ্টা করেন। আগামী দিনের সমাজতন্ত্রবাদের সম্ভাব্য সুফল সম্বন্ধে মিলের ভাবনাচিন্তার আন্তরিকতা ও মৌলিকতা স্বীকার করলেও ভাইসবড়ু বলেছেন যে, তাঁর এ ঝোঁক ছিল কমজোর

("timid")। তাঁর মতে, মিল্ যেন এ ব্যাপারে তৎকালীন উদারপন্থীদের প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোনের (Gladstone) দিকেই বেশী ঝোঁকেন।

আধুনিক উদারনৈতিকতার পরবর্তী বিশিষ্ট প্রবক্তা লর্ড হবহাউস মিলের সঠিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন যে, মিল্ উদারনৈতিকতার আদর্শকে জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেন ("The teaching of Mill brings us close to the heart of Liberalism.")। হবহাউসের মতে, মিল্ সারাজীবন উদারনৈতিকতার আদর্শের চর্চা ও চর্যা করেন, প্রাচীন ও নবীন উদারনৈতিকতার মধ্যে সেতু রচনা করেন। তাঁর উদারনৈতিকতা অন্যান্য যুক্তিপূর্ণ, সম্পূর্ণ এবং সুসংবদ্ধ মতাদর্শগুলির চেয়েও চিরস্থায়ী হবে। হবহাউসের মতে সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারূপে মিলের "আত্মজীবনীতে" যে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা রয়েছে, উদারনৈতিক সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে তার চেয়ে ভাল কিছু লেখা হয় নি ("Mill had the qualities of a life-long learner, and in his single person he spans the interval between the old and the new Liberalism···his work will survive the death of many consistent, complete, and perfectly rounded systems ······the brief exposition of the socialist ideal given in his Autobiography remains perhaps the best summary statement of Liberal Socialism that we possess")।

মিল্ সম্বন্ধে লর্ড হবহাউসের সঠিক মূল্যায়ন : মিল্ বুর্জোয়া নন, সমাজতন্ত্রী

(ঘ) টমাস্ হিল্ গ্রীন্ (১৮৩৬—১৮৮২) ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (Oxford University) দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। কাণ্টের আদর্শবাদের (Idealism) ইংরেজ ব্যাখ্যাকাররূপে খ্যাতি অর্জন করলেও তিনি ইংলণ্ডের সুদীর্ঘ গণমুখী ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হন। রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য প্রদর্শনের যে কারণগুলি ("Principles of Political Obligation") তিনি ব্যাখ্যা করেন, আধুনিক উদারনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে সেগুলিকে মূল্যবান সংযোজন বলে গণ্য করা হয়।

অক্সফোর্ডের অধ্যাপক গ্রীন্ আদর্শবাদী হলেও গণমুখী ছিলেন

জার্মান আদর্শবাদীগণের মত গ্রীন্ বলেন যে, ইচ্ছা ও যুক্তির ভিত্তিতে মানুষের মনে একটা নীতিবোধ, সমাজচেতনা কাজ করে থাকে। সুতরাং তাঁর মতে, নাগরিকের অধিকার, কর্তব্য প্রভৃতি সব রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলি নৈতিকতার দ্বারা প্রভাবিত।

গ্রীন্ নীতিবাদী ছিলেন

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা করে গ্রীন্ বলেন যে, রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তির কোন অধিকার থাকতে পারে না ("No state, no right")। কারণ, কেউ কারুর অধিকার ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র অধিকার-ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেয়। রাষ্ট্র নাগরিকের সর্বোত্তম সত্তার ("best self") বিকাশের জন্য তাকে অধিকার দেয়। আবার সমাজের

সকলের সাধারণ মঙ্গলসিদ্ধির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নাগরিকগণ সচেতনভাবে মেনে নেয়। ব্যক্তির এই সচেতনতাই, সাধারণ স্বার্থচিন্তাই (common good) রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য প্রকাশের কারণ। তাই গ্রীনের চিরস্মরণীয় উক্তি—"বলপ্রয়োগ নয়, ব্যক্তির স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতাই রাষ্ট্রের প্রধান ভিত্তি" (Will, and not Force, is the basis of the state.")।

সাধারণ মঙ্গলসাধকরূপে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্বন্ধে ব্যক্তির সচেতনতাই তাকে রাষ্ট্রানুগত করে; বলপ্রয়োগ নয়, ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি

চুক্তি মতবাদের সমর্থকদের মতে, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পূর্বে কল্পিত প্রাকৃতিক রাজ্যের নাগরিকগণ নানা অধিকার ভোগ করতেন। সেগুলিকে তাঁরা প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Rights) অ্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু গ্রীন্ এই মত গ্রাহ্য করেন নি। কারণ, রাষ্ট্র ছাড়া নাগরিকদের অধিকার ভোগ সম্ভব নয়। তবে তিনি একটি বিশেষ অর্থে প্রাকৃতিক অধিকারের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁর মতে, ভবিষ্যতে রাষ্ট্র নাগরিকদের যে আদর্শ অধিকারগুলি প্রদান করবে, সেগুলিকে এই বিশেষ অর্থে "প্রাকৃতিক অধিকার" বলা যায়।

নাগরিক অধিকার, প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে গ্রীনের বক্তব্য

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে গ্রীন্ রুশো এবং অস্টিনের মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন। রুশো লোকায়ত সার্বভৌমত্বের (Popular Sovereignty) সমর্থক। কারণ, জনগণ সমষ্টিগতভাবে তাদের ইচ্ছাশক্তিকে (General Will) সার্বভৌম শক্তিরূপে প্রকাশ করে। এই গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তকে গ্রীন্ স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু রুশোর মত অনুসারে সার্বভৌমত্বকে সব সময়ে জনসাধারণের শক্তিরূপে চিন্তা করা যায় না। বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর চাপে এই শক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাশক্তিরূপে কার্যকর হয়। তাই গ্রীন্ রুশোর লোকায়ত গণতান্ত্রিকতাকে মেনে নিয়েও অস্টিনের পক্ষ সমর্থন করে বলেন যে, সার্বভৌমকে এমন চরম ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে, যাতে লোকে তাঁকে মানতে বাধ্য হয়। কিন্তু শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা এ আনুগত্য জন্মায় না। এদিক থেকে অস্টিনের ত্রুটিকে গ্রীন্ রুশোর গণতান্ত্রিকতার দ্বারা সংশোধন করেছেন। গ্রীনের মতে, সার্বভৌমকে এমনভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে, যার ফলে সমাজের সকলের সাধারণ মঙ্গল (common good) সমানভাবে সংরক্ষিত হয়।

গ্রীনের সার্বভৌম তত্ত্ব : রুশো ও অস্টিনের তত্ত্বের সমন্বয়

গ্রীনের দণ্ডনীতি কাণ্টের মতের দ্বারা প্রভাবিত। অন্যের ন্যায্য অধিকারভোগে বাধা সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রের দ্বারা সংরক্ষিত অধিকার ব্যবস্থা (State-maintained system of rights) আঘাতপ্রাপ্ত হয়। তাই কাণ্টের মত গ্রীন্ও মনে করেন যে, অপরাধী ব্যক্তিগত এবং সামাজিক কারণে দণ্ডনীয়। প্রতিহিংসামূলক (Retaliatory), প্রতিরোধ-সূচক (Preventive) এবং সংস্কারাত্মক (Reformatory)—এই তিন প্রকার দণ্ডের যথাযোগ্য সমন্বয়ের ভিত্তিতে গ্রীন্ তাঁর দণ্ডনীতি উদ্ভাবন করেন। অর্থাৎ, দণ্ডনীতি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে গ্রীন্ ব্যক্তি ও সমাজ—দুটি বিষয়ের প্রতিই লক্ষ্য রেখে এবং তিন

গ্রীনের দণ্ডনীতি : আদর্শবাদী হলেও বাস্তবধর্মী ও সমন্বয়ী

প্রকার দণ্ডনীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে একটা সমন্বয়ী তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। অপরাধীর সংস্কারের ওপর জোর দিয়ে তিনি আধুনিক ও প্রগতিশীল সামাজিকতার সঙ্গে উদারনৈতিকতাকে সংযুক্ত করেছেন।

গ্রীনের মতে, সম্পত্তি (Property) ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের একটা প্রকৃষ্ট উপায়। সম্পত্তি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা শ্রম, উদ্যম, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে অর্থাৎ ব্যক্তিগত অনেকগুলি প্রবৃত্তিকে অধিকতর সক্রিয় করে তোলে। ব্যক্তিগত তৎপরতা সমষ্টিগতভাবে সামাজিক তৎপরতার রূপ ধারণ করে। কিন্তু সম্পত্তির অধিকারকে সমর্থন করলেও অলস, পরজীবীদের সম্পত্তির অধিকারকে গ্রীন্ সমর্থন করেন নি, উপযুক্ত ক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও তিনি মত প্রকাশ করেন।

গ্রীনের সম্পত্তিতত্ত্ব: সম্পত্তির অধিকার সমর্থন করলেও তিনি তার নিয়ন্ত্রণের ওপরও জোর দেন

অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক ও অন্যান্য অবিচার দূর করার জন্য এবং প্রগতিশীল আইনকানুন প্রবর্তনের জন্য গ্রীন্ রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ (State-intervention) সমর্থন করেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি উদারনৈতিকতাকে সমর্থন করেন। আবার, সামাজিকতার আদর্শকেও তিনি গ্রহণ করেন। উদারনৈতিকতার আদর্শের ক্ষেত্রে মিল্ যে সমন্বয়ী, প্রগতিশীল, আশাবাদী, প্রায়-সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন, গ্রীনও তার দ্বারা প্রভাবিত হন, যদিও মিল্ ছিলেন হিতবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী (empiricist)। গ্রীন্ আদর্শবাদী (idealist)। মিল্, গ্রীন্, ল্যাস্কি—এঁদের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ্ উদারনৈতিকতা তার ধারাবাহিকতা সুন্দরভাবে বজায় রেখেছে, একটা গণসমাজতান্ত্রিক আদর্শ যেন ক্রমবিকশিত হয়ে উঠেছে।

কোথায়, কখন, কেন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ দরকার: গ্রীনের বক্তব্য; মিল্, গ্রীন, ল্যাস্কি—ব্রিটিশ্ গণসমাজতন্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস রচনা করেছেন

(ঙ) লর্ড্ হব্‌হাউস্ (অধ্যাপক এল. টি. হব্‌হাউস্ ১৮৬৪—১৯২৯) বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক উদারনৈতিকতার সমাজতাত্ত্বিক প্রবক্তারূপে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। দীর্ঘকাল তিনি লণ্ডন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। ডারউইন্‌পন্থী, স্পেন্‌সারীয় উগ্র, জৈবিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের শৃঙ্খল থেকে তিনি উদারনৈতিকতাকে মুক্ত করেন। সুগভীর মানবতাবোধ তাঁর গবেষণাগুলিকে বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করেছে। তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইংলণ্ডের প্রথম শ্রমিকদলীয় মন্ত্রিসভা তাঁকে "লর্ড্" উপাধির দ্বারা সম্মানিত করে।

লণ্ডন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক হব্‌হাউস্ উদারনৈতিকতার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকার

হব্‌হাউস্‌ প্রথমতঃ উদারনৈতিকতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করার আগে কট্টর সমাজতন্ত্রবাদীদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। প্রথমতঃ, তাঁর মতে, সমাজতন্ত্রবাদীগণ শ্রমকে (Labour) অত্যন্ত বেশী প্রাধান্য দেন। কিন্তু শ্রম ছাড়াও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান আছে। ফলে উগ্র সমাজতন্ত্রীগণ অন্যান্য উপাদানগুলিকে উপেক্ষা করেন।

হব্‌হাউসের উদারনৈতিকতা (১) উগ্র সমাজতন্ত্রের সমালোচনা

দ্বিতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রবাদের সাম্যনীতি কৃত্রিম। নিউটন্‌ বা শেক্‌স্‌পীয়ারের সঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তিদের সমান মনে করা অন্যায়।

(২) কৃত্রিম সাম্যনীতি

তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক প্রশ্ন থেকে সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রশ্নকে বিচ্ছিন্ন করা ঠিক নয়। কেবল অর্থনৈতিক যুক্তিকেই স্বীকার করে নিলে চা-পান এবং মদ্যপানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। দুটিই রাষ্ট্রের রাজস্বলাভের উৎস। কিন্তু এ দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে সামাজিক পার্থক্য অত্যন্ত গুরুতর।

(৩) রাষ্ট্রের রাজস্বলাভের সব উৎসগুলির সমাজতাত্ত্বিক মূল্য সমান নয়

উদারনৈতিকতার লক্ষণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হব্‌হাউস্‌ স্বাধীনতা (Liberty) এবং সাম্য (Equality) এই দুটিকে উদারনৈতিকতার আদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত বলে মনে করেন। তিনি আইনকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে ঘোষণা করেন ("Law is the condition of Liberty.")।

উদারনৈতিকতার লক্ষণ ঃ সাম্য ও স্বাধীনতা

সামাজিক বিবর্তনবাদের (social evolution) সমর্থক হিসাবে হব্‌হাউস্‌ বলেছেন যে, উদারনৈতিকতার ধীর অগ্রগতি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, আধুনিক জনগণের প্রগতিশীল জীবনপ্রবাহের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে ("Liberalism is an all-pervading element of the life-structure of the modern world……it is an effective historical force.")। উদারনৈতিকতার ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করে হব্‌হাউস্‌ বলেছেন যে, সামন্ততন্ত্রের (Feudalism) অবসানের পর উদারনৈতিকতার সূচনা। তাঁর মতে, ঊনবিংশ শতাব্দী "উদারনৈতিকতার যুগ" ("Age of Liberalism")। কারণ, এ যুগেই গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে রক্ষণশীল দলের (Conservative Party) এবং সাম্রাজ্যবাদীদের অপপ্রচারের ফলে উদারনৈতিকতার গতি কিছুটা ব্যাহত। সমাজতন্ত্রবাদের সামাজিক সাম্য ও ন্যায়নীতির দ্বারা প্রভাবিত হবার ফলে উদারনৈতিকতার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হয়ে দেখা দিয়েছে। হব্‌হাউসের মতে, সমাজতন্ত্রবাদ উদারনৈতিক ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার সঙ্গে সামগ্রিক অর্থাৎ সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচারের মূল্যবোধকে সংযুক্ত করেছে। তাই উদারনৈতিকতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি খুবই আশাবাদী। তাঁর কথায়—ন্যায়বিচারের জন্য উত্তেজনা ভবিষ্যতে কোন নাটকীয় ঝলকের প্রকাশ না দেখালেও তার

বিবর্তনবাদী উদারনৈতিকতা ঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে ঝোঁক্‌বার লক্ষণ

দূরে থেকে যাবে অম্লানদীপশিখার দীর্ঘস্থায়ী দীপালি ("the vision of justice in the wholeness of her beauty kindles a passion that may not flare up into moments of dramatic scintillation, but burns with the enduring glow of the central heat.")।

(চ) **ওয়াল্টার লিপ্‌ম্যান্‌** (Walter Lippmann) (১৮৯৮—১৯৭৩) বর্তমান যুগের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রখ্যাত উদারনৈতিক লেখক ও সাংবাদিক। তাঁর মতে, শিল্পবিপ্লবের পর থেকে ক্রমশঃ উৎপাদন-ব্যবস্থার যান্ত্রিকীকরণের (mechanisation) ও অধিকতর শ্রমবিভাগের (Division of labour) ফলে জনজীবন জটিল হতে থাকে। ফলে ধ্রুপদী উদারনৈতিক সংজ্ঞার পরিবর্তে দেখা দিল তার আধুনিক সংজ্ঞা। লিপ্‌ম্যান্‌ বলেন যে, ধ্রুপদী ব্যাখ্যা অনুসারে উদারনৈতিকতার প্রধান অঙ্গ হল স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ। কিন্তু আধুনিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী উদারনৈতিকতার সঙ্গে দুটি নীতি জড়িত। একটি হল—সব ব্যক্তিই মানবত্বের অধিকারী ("All men are persons.") এবং ব্যক্তিসত্তার অবিনশ্বরতা ("human person is inviolable.")। আধুনিক জটিলতার যুগে লিপ্‌ম্যান্‌ উদারনৈতিকতার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা তার ধ্রুপদী সংজ্ঞার চেয়ে সরলতর, আরও মৌলিক।

উদারনৈতিকতার ধ্রুপদী সংজ্ঞার পরিবর্তে লিপ্‌ম্যানের আধুনিক সংজ্ঞা ঃ সবাই মানবত্বের অধিকারী, ব্যক্তিসত্তা অবিনশ্বর

লিপ্‌ম্যান্‌ মনে করেন যে, ইংরেজ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদ্‌ অ্যাডাম্‌ স্মিথ্‌ (Adam Smith) শ্রমবিভাগের ফলে আধুনিক জনজীবনের জটিলতার তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু মার্ক্‌স্‌ তা পারেন নি। ফলে, উদারনৈতিকতার সঙ্গে মার্ক্‌স্‌বাদের বিরোধ দেখা দিল।

মার্ক্‌স্‌বাদীরা শ্রমবিভাগের জটিল ফলগুলি বোঝেন নি (লিপ্‌ম্যান) ; তাই বিভ্রান্তি

লিপ্‌ম্যান্‌ যে-কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ নীতিকে (control-system) অবাঞ্ছিত বলে মনে করেন। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র বর্তমানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার (Economic Planning) মধ্য দিয়ে যে সার্বিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা পরিচালনা করে, তাঁর মতে, তা মূলতঃ ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা থেকে ধার করা। কিন্তু এর ফলে গণতন্ত্রে ফ্যাসিবাদী সমাজের কুফল দেখা দেয়। অর্থাৎ, অধিক পরিকল্পনার ফলে অধিক নিয়ন্ত্রণ জনগণকে সামরিক মোর্চায় পরিণত করে ("Drilling the population")। এজন্য লিপ্‌ম্যানের কাছে কম্যুনিজম্‌ অত্যন্ত বেশী তাত্ত্বিক (Doctrinaire)। কারণ, তার দ্বারা যেভাবে হোক্‌, কতকগুলি মনগড়া সিদ্ধান্তকে জোর করে ফলিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

লিপ্‌ম্যান্‌ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মত সবরকম নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার বিরোধী ; কারণ এ থেকেই ফ্যাসিবাদের জন্ম

লেনিনের নেতৃত্বে সোবিয়েত রাশিয়ায় যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে লিপ্‌ম্যান্‌ এক ধরনের সমষ্টিবাদ (Collectivism) বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর

মতে, লেনিনও ফলিত ক্ষেত্রে খাঁটি মার্ক্সবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। প্রথম বিচ্যুতি ("the first retreat") হল—১৯২১ সালে লেনিনের "নব্য অর্থনীতি" (N. E. P. বা New Economic Policy)। এই নীতি তখন ধনতন্ত্রের ব্যক্তিগত মালিকানাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিচ্যুতি ("the second retreat") হল—১৯৩১ সালে, যখন স্তালিন (Stalin) একই রকম কাজের জন্য বিভিন্ন শ্রমিককে ভিন্ন হারে মজুরি দেবার নীতি (differential wages) প্রবর্তন করেন।

লিপ্‌মানের ব্যাখ্যা : সোবিয়েত ব্যবস্থা মার্ক্সবাদ থেকে বিচ্যুত

লিপ্‌মানের মতে, শেষ বিচারে সোবিয়েত রাশিয়ার বা চীনের মত সাম্যবাদী রাষ্ট্রে শ্রেণী-সংগ্রামের পরিবর্তে দেখা যায় একই শ্রেণীর অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর নেতাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। স্তালিন, না বুখারিন, না ট্রট্‌স্কি? রক্তাপ্লুত পথেই তার মীমাংসা হয় ("Communism is now outlawed in Russia, its adherents being known as Trotskyites.")।

সাম্যবাদী রাষ্ট্রে ক্ষমতার লড়াই প্রবল

॥ উপসংহার : তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিকতার রূপবৈচিত্র্য ॥

কিভাবে বর্তমান সমাজকে সুন্দরতর সমাজে পরিবর্তিত করা যায়, তা নিয়ে নানা উদারনৈতিক পণ্ডিত নানা মত দিয়েছেন। ফলে, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিকতার আদর্শের রূপবৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তবুও উদারনৈতিকতার মতাদর্শের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ও এর সমর্থকদের মতামত ব্যাখ্যা করলে এই মতাদর্শের বিবর্তনের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। এগুলি জানতে পারলে এই মতাদর্শের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যাবে।

বৈচিত্র্যের মধ্যেও উদারনৈতিকতার ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে কয়েকটি ঝোঁক

প্রথমতঃ, এক ধরনের রাজনীতিবিদ্‌গণ উদারপন্থী চিন্তাধারার সাহায্যে গণসমাজতন্ত্র (Democratic Socialism) সমর্থন করেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সমাজের প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক দিকে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ গণসমাজতন্ত্রের মূল কথা।

(১) এর গণসমাজতান্ত্রিক পরিণতি

দ্বিতীয়তঃ, সুম্‌পিটার (Schumpeter), রবার্ট ডাল (Robert Dahl) প্রভৃতি মার্কিন রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার স্থিতিশীলতার জন্য উদারনৈতিকতাকে ব্যবহার করেছেন। সুম্‌পিটার বলেন যে, উদারনৈতিকতার অর্থ হল গণতান্ত্রিকতা। সুতরাং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে কিভাবে নির্বাচন, ক্ষমতা দখল ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জনগণের সর্বাত্মক এবং সাধারণ কল্যাণ

সাধন করা যায়, তাই হল উদারনৈতিকতা। রবার্ট ডাল বলেন যে, উদারনৈতিকতার আদর্শ হল রাষ্ট্রের ও সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সম-বিভাজনের ন্যায়-নীতির (distributive justice) ভিত্তিতে ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা চাপগোষ্ঠী, স্বার্থগোষ্ঠীগুলির ভারসাম্য বজায় রাখা।

(২) সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য এর প্রয়োগ : সুম্‌পিটার ও রবার্ট ডাল

সুতরাং এই দুই প্রখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত উদারনৈতিকতা ও গণতান্ত্রিকতাকে সমাজের রূপান্তরের বদলে তার স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য ব্যবহারের দিকেই বেশী দৃষ্টি দিয়েছেন। তাই তাঁদের মুক্ত সমাজের তত্ত্বকে (Theory of Open Society) অনেকে বুর্জোয়া সমাজের সমর্থনের ব্যাখ্যা বলে সমালোচনা করেন।

তৃতীয়তঃ, টিট্‌মাস্ (Titmuss), রব্‌সন্ (Robson), লর্ড বেভারিজ্ (Lord Beveridge), গল্‌ব্রেথ্ (Galbraith) প্রভৃতি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের (Welfare State) সমর্থকগণ সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র এই দুটি বিরুদ্ধ ব্যাখ্যার বদলে এ দুটির প্রত্যেকটির সুফলগুলিকে সমন্বিত করে উদারনৈতিকতাকে একটি সমন্বয়ী মতবাদ (a synthetic concept) রূপে প্রচার করেছেন। ইংলণ্ডের শ্রমিক দল (Labour Party), পশ্চিম জার্মানী, হল্যান্ড, বেল্‌জিয়াম্, ডেন্‌মার্ক, নরওয়ে, সুইডেন্ প্রভৃতি দেশের খ্রীশ্চান্ ও সামাজিক গণতন্ত্রী দলের (Christian Democrats বা Social Democrats) জনসেবামূলক কর্মসূচীগুলি সমন্বয়ী উদারনৈতিকতার আদর্শে পরিচালিত বলে ঐ দলের নেতাগণ দাবি করে থাকেন।

(৩) জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ : টিট্‌মাস, রব্‌সন্, বেভারিজ্, গল্‌ব্রেথের প্রচেষ্টা

॥ কার্ল্ মার্ক্স্ ও মার্ক্স্‌বাদ ॥

মার্ক্সবাদের সঙ্গে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্ক্সের (Karl Marx) (১৮১৮—১৮৮৩) নাম জড়িত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন গ্যালিলিও (Galileo), বলবিদ্যার ক্ষেত্রে নিউটন্ (Newton), পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে আইন্‌স্টাইন্ (Einstein) মৌলিক চিন্তার ও মূল্যবান্ অবদানের জন্য বিখ্যাত, মার্ক্সের নামও আধুনিক রাজনীতি ও দর্শনের ক্ষেত্রে সেভাবে বিখ্যাত। বেলিন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হেগেল্‌বাদ নিয়ে গবেষণা করে মার্ক্স্ পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। প্রথম জীবনে তিনি হেগেল্‌পন্থী ছিলেন, পরে হেগেলীয় দর্শনের তীব্র সমালোচক হয়ে ওঠেন এবং অজস্র গবেষণাধর্মী ও প্রচারধর্মী পত্র-পুস্তিকায় তাঁর নানা প্রকার বৈপ্লবিক ও যুগান্তকারী মতামত প্রচার করেন। তার তালিকা প্রস্তুত করলে তা হবে সুবিস্তৃত। ১৮৪৭ সাল থেকেই তিনি তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হন, ইউরোপের নানা রাষ্ট্রে ভ্রমণ করেন ও বহু গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতিতে যোগ দেন। ১৮৪৮ সালে ফ্রিড্‌রিশ্ এঙ্গেল্‌সের সঙ্গে যুগ্ম

মার্ক্সের সংক্ষিপ্ত জীবনী

গ্রন্থকার হিসাবে "সাম্যবাদী ইস্তাহার" প্রকাশ করেন, ঐ বছর জার্মানীতে বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দেন। ফলে তিনি জার্মানী থেকে বিতাড়িত হন এবং লণ্ডনে স্থায়ীভাবে আশ্রয় নেন। সেখানে ১৮৮৩ সালের ১৭ই মার্চ তিনি পরলোক গমন করেন। লণ্ডনের হাইগেটে মার্ক্সের সমাধিক্ষেত্রে এঙ্গেলস্ যে স্মরণীয় অন্ত্যেষ্টি-ভাষণ প্রদান করেন, তার শেষ কথাগুলি হল—"যুগে যুগে অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর নাম, অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর কাজ।"

॥ মার্ক্সবাদের প্রধান উৎস ॥

"কে মার্ক্সবাদী?"—এই জব্বর প্রশ্নের জবাবে লেনিন্ বলেছেন যে, যিনি শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বকে সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রয়োগ করেন, তিনিই মার্ক্সবাদী ("A Marxist is one who extends the acceptance of the class struggle to the acceptance of the dictatorship of the proletariat.")।

মার্ক্সবাদের অবদান তিনটি ক্ষেত্রে স্মরণীয়—অনুবর্তন, বস্তুবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব (লেনিন্)

১৯১৩ সালে মার্ক্সের ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে লেনিন্ মার্ক্সবাদের তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রের উল্লেখ করে সেগুলি ব্যাখ্যা করেন। এগুলি হল—অনুবর্তন (evolution), বস্তুবাদ (materialism) এবং শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব (theory of class struggle)। এই তিনটি বিষয়কে মার্ক্সীয় যুক্তি সহযোগে বিশ্লেষণ করে লেনিন্ **মার্ক্সবাদের তিনটি মূল উৎস** ব্যাখ্যা করেছেন—(ক) **জার্মান দর্শন**, (খ) **ব্রিটিশ্ অর্থনীতি**, **ফরাসী সমাজবাদ**। মার্ক্সবাদের দার্শনিক দিকটি জার্মান দর্শন থেকে উদ্ভূত, তার অর্থনৈতিক অংশ ইংলণ্ডের সমকালীন অর্থনীতিবিদ্দের দ্বারা প্রভাবিত এবং তার সমাজতান্ত্রিক দিকটি ফরাসী সমাজবাদ থেকে উৎসারিত। কিন্তু এই তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রের তত্ত্ব ও তথ্য মার্ক্স্ নিজের মনীষা এবং পাণ্ডিত্যের দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করে এগুলির অপূর্ণতা ও ত্রুটি প্রচার করেন ও শেষ পর্যন্ত তাঁর একান্ত মৌলিক মতবাদ ব্যাখ্যা করেন।

মার্ক্সবাদের তিনটি উৎস—জার্মান দর্শন, ব্রিটিশ অর্থনীতি, ফরাসী সমাজবাদ, (লেনিন্)

॥ মার্ক্সবাদের প্রথম উৎস : দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ : মার্ক্স্ ও হেগেলের দর্শন ॥

মার্ক্সবাদের দার্শনিক দিকটি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের (Historical Materialism) ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে উল্লেখ্য যে, এই বাক্যাংশের দ্বারা মার্ক্সীয় দর্শনকে প্রথম চিহ্নিত করেন জার্মান দার্শনিক জোসেফ্ ডয়েট্স্গেন্ (Joseph Deutschgen)। পরে প্রখ্যাত রুশ্ দার্শনিক গেওর্গি প্লেখানভ্ (Georgi Plekhanov) সর্বপ্রথম এই বাক্যাংশটি মার্ক্সবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ : প্লেখানভের ব্যাখ্যা

মার্ক্সের দর্শন ফ্রিড্‌রিশ্‌ এঙ্গেল্‌সের (Friedrich Engels) নামের সঙ্গেও জড়িত। কারণ, দুই বন্ধু মিলিতভাবে এই দর্শনের প্রচারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

মার্ক্সের ওপর হেগেলের প্রভাব

জার্মান দার্শনিক হেগেলের (১৭৭০—১৮৩১) দর্শন সম্বন্ধে গবেষণা করে মার্ক্‌স্‌ জার্মানীর বের্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয় (Berlin University) থেকে "ডক্টর" উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি হেগেলীয় দর্শনের দ্বন্দ্ববাদী দিকটি ছাড়া অন্য দিকগুলি পরিত্যাগ করে বস্তুবাদী ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বনীতি ব্যাখ্যা করেন। এই দর্শনকেই মার্ক্‌স্‌বাদের "দার্শনিক দিক" বলা হয়।

হেগেলের মতে পরিদৃশ্যমান জগৎ "ভাব" ("Idea") থেকে উদ্ভূত। ভাবের পৃথক সত্তা আছে, বহির্জগৎ হল ভাবের বাহ্যরূপ। জ্ঞানের উন্মেষের ক্ষেত্রে হেগেল তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছেন—স্থিতি বা সত্তা (Being বা Thesis), অ-সত্তা বা প্রতি-স্থিতি (Non-Being বা Anti-Thesis) এবং ভাব বা সমন্বিত-স্থিতি (Becoming বা Synthesis)। হেগেল বলেন যে, ব্যক্তি তার চৈতন্যের জন্যেই ভাবের প্রকৃত বোদ্ধা হয়ে ওঠে। ব্যক্তির এই আদি-চৈতন্য ঈশ্বরের সৃষ্টি। ব্যক্তি তার চেতনার সাহায্যেই স্থিতির সঙ্গে প্রতি-স্থিতির সংঘাত উপলব্ধি করে এবং এই সংঘাতের ফলে সমন্বিত-স্থিতি অর্থাৎ কোন সমন্বয় সম্পর্কে তার মনে ধারণা জন্মায়।

হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ

হেগেলের মতে "সাদা" বলতে গিয়ে আমরা "সাদার অভাব" অর্থাৎ "কালো" সম্পর্কে ধারণা করি। এই দুটি ধারণার সংঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের মনে একটা সংঘাতমূলক মিশ্র ধারণা জন্মায়। এটাই হল হেগেলীয় মতে দ্বন্দ্বগত সংঘাতের ফলে একটি সমন্বিত চেতনার জন্মের ইতিহাস। জ্ঞানরাজ্যের এই দ্বান্দ্বিক লীলা হেগেল বহির্জগতের ঘটনার পারম্পর্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যায় যুদ্ধ হল একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের সংঘাত। যুদ্ধে জয়ী রাষ্ট্র একটি সমন্বিত ঘটনার চরম অভিব্যক্তি। পরে তার সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের সংগ্রাম দেখা দিলে তখন হয়ত এই সমন্বিত স্থিতাবস্থার সঙ্গে সংগ্রামী রাষ্ট্রের সংঘাতের দরুন নতুন একটা সমন্বিত অবস্থা জন্ম লাভ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, হেগেল বাহ্য জগতের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করতে গিয়েও তাঁর ভাববাদী দর্শনের (Idealistic Philosophy) আশ্রয় নিয়েছেন। মার্ক্‌স্‌ হেগেলের দ্বন্দ্ববাদকে (Dialectics) গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু তাকে বস্তু-তান্ত্রিক ও ঐতিহাসিক যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) রূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

উদাহরণ ঃ কালো বনাম সাদা ; যুদ্ধ (রাষ্ট্র বনাম রাষ্ট্র)

মার্ক্‌সের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল উদ্দেশ্য হল ধনিক (বুর্জোয়া বা Bourgeois) ও সর্বহারা (প্রোলেতারিয়ত বা Proletariat) এই দুই শ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের চিরন্তন

দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে সামাজিক বিবর্তন ব্যাখ্যা করা।

মার্কসীয় ও হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের মধ্যে মৌলিক ভেদ

মার্কসের মতে "ভাব" ব্যক্তির মনে বহির্জগতের প্রতিফলন, পরে "ভাব" চিন্তার রূপ নেয়। তিনি হেগেলের ভাববাদকে বস্তুজগতের বহির্ভূত ও বহির্জগৎ-নিরপেক্ষ, সুতরাং "অবাস্তব" বলে চিহ্নিত করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদই হল সমাজের বিবর্তনের প্রকৃত, বিজ্ঞানসম্মত, বাস্তববাদী ব্যাখ্যা। এঙ্গেলসের ইতিহাস-গবেষণার ওপর ভিত্তি করে মার্কস আদিম অবস্থা থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষের বিবর্তনের একটি ধারাবাহিক চিত্র অংকন করেন।

আদিম যুগের মানুষ এক ধরনের সামগ্রিক সাম্যবাদী সমাজের (Primitive Communism) অধীন ছিল। তখন একই পরিবারের মধ্যে সমাজের সমস্ত ব্যক্তি সমানভাবে কোন আঞ্চলিক নেতার নেতৃত্ব মেনে চলতেন। পরবর্তীকালে দাসপ্রথা (Slavery) দেখা দিল এবং মানুষ অসহায়ভাবে প্রভুর ভৃত্যরূপে জোর জুলুমের শিকার হল। কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর জমির মালিক হিসাবে জমিদারগণ ভূমিহীন কৃষকদের দ্বারা কৃষি ব্যবস্থা চালু করে। তার ফলেও সমাজে জমিদার এবং ভূমিহীন প্রজা এই দুটি শ্রেণী দেখা দিল। এর পর শিল্প বিপ্লবের (Industrial Revolution) মধ্যে দিয়ে ইউরোপের মত উন্নত দেশে ধনতন্ত্রের (Capitalism) আবির্ভাব ঘটে। এর ফলে বরাবর যেমন হয়ে এসেছিল, সেভাবেই সমাজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল—পুঁজিপতি এবং শ্রমিক। মার্কসের মতে, ইতিহাসের ধারাবাহিক পর্যালোচনার ফলে সমাজে এই যে দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণীর দ্বন্দ্ব (Dialectics) দেখা যায়, এই দ্বন্দ্ব অর্থনৈতিক বৈষম্য বা শোষণ থাকার ফলেই ঘটে। এর মধ্য দিয়ে প্রভু এবং ক্রীতদাস, জমিদার এবং ভূমিহীন কৃষক, পুঁজিপতি এবং শ্রমিক—এই দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম (Class struggle) দেখা দিতে থাকে। মার্কসের মতে এই শ্রেণীসংগ্রাম পুঁজিবাদী অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজে চরম রূপ ধারণ করে। তখন উভয় পক্ষই দুটি সংঘবদ্ধ শ্রেণীতে পরিণত হয়। একটি হল ধনিক বা বুর্জোয়া শ্রেণী, অপরটি হল সর্বহারা বা প্রোলেতারিয়ত শ্রেণী। শেষ পর্যন্ত হিংসাত্মক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সর্বহারাদের শ্রেণীহীন সমাজ (Dictatorship of the Proletariat বা classless society) গড়ে ওঠে। এই সমাজের নাম সাম্যবাদী (Communist) সমাজ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মার্কসের মতে অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে শোষিতকে বারবার একটা শ্রেণী বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। এই সংগ্রাম অর্থনৈতিক কারণে ঘটে এবং শ্রেণী স্বার্থের দ্বন্দ্বের ফলে ঘটে। এই দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী, ঘটবেই। তাই মার্কস এই অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বকে একটি ঐতিহাসিক তত্ত্বে, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পরিণত করেন।

মার্কসীয় বস্তুবাদ ঐতিহাসিক, বিবর্তনমূলক : মার্কসের ইতিহাস-বিজ্ঞান

মার্কসবাদের ব্যাখ্যা করে প্লেখানভ (Plekhanov) লিখেছেন যে, মার্কস এবং

এঙ্গেল্‌স্‌ তাঁদের সাম্যবাদী চিন্তাধারায় হেগেল, ফয়য়্যারবাঃখ্‌ (Feuerbach) প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন। প্লেখানভের মতে মার্ক্‌স্‌ হেগেলপন্থী জার্মান দার্শনিকদের প্রভাব থেকে মুক্তি পাবার জন্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদের (Historical Materialism) সাহায্যে তাঁর বিজ্ঞানসম্মত সাম্যবাদের (Scientific Socialism) ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ, তাঁর মতে, তাত্ত্বিক বস্তুবাদ (Epistemological Materialism) এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism) এই দুটির মধ্যে মার্ক্‌স্‌ সর্বপ্রথম পার্থক্য নির্ণয় করেন। প্লেখানভের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথমটি হেগেলবাদ, দ্বিতীয়টি মার্ক্‌স্‌বাদ।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক (প্লেখানভ)

মার্ক্‌সীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে লেনিন্‌ বলেছেন যে, এই মতবাদ শুধু ইতিহাস এবং অর্থনীতিকে সংযুক্ত করে না, এ দুটির সঙ্গে সমাজতত্ত্বকেও যুক্ত করে। লেফেভার (Lefebvre), বটমোর (Bottomore) প্রমুখ আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ মার্ক্‌স্‌বাদী সমাজতত্ত্বের (Marxian Sociology) প্রধান স্তম্ভরূপে ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে চিহ্নিত করেন। এই ব্যাখ্যায় সমাজের অস্তিত্ব (origin of society) এবং সমাজের গতিশীলতা (social dynamics বা social mobility) এই দুটিরও অর্থবহ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সমাজতাত্ত্বিক

মার্ক্‌সীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ একাধারে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক। মার্ক্‌সীয় অর্থনীতির শেষ কথা হল যে, সমাজের বিবর্তন বা পরিবর্তন যে শোষণভিত্তিক শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঘটেছে, সেখানে অর্থনীতির ভূমিকা মুখ্য। কারণ, উৎপাদনের পদ্ধতি যতই পরিবর্তিত হয়েছে, ততই সমাজে শোষণের তীব্রতা বেড়েছে, কারণ বণ্টনব্যবস্থার বৈষম্য বেড়েছে। বিপ্লবের ফলে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের পর শ্রেণীহীন সাম্যবাদী, সমভোগবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল এই বৈষম্য দূর হয়।

সুতরাং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সর্বাত্মক

॥ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ : মার্ক্‌স্‌ বনাম ফয়য়্যারবাঃখ্‌ ॥

ছাত্রজীবনে হেগেলকে গুরু বলে স্বীকার করলেও মার্ক্‌স্‌ কিছুদিন বাদেই হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের ভাববাদী অংশকে বর্জন করে তাঁর মৌলিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠা করেন। ফয়য়্যারবাঃখ্‌ও (Feuerbach) মার্ক্‌সের মত প্রাথমিক পর্যায়ে হেগেলের শিষ্য ছিলেন। পরে তিনি হেগেলবাদ ত্যাগ করে তাঁর নিজস্ব বস্তুবাদ ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু ফয়য়্যারবাঃখের চিন্তাধারার মধ্যেও মার্ক্‌স্‌ ভাববাদের প্রাধান্য খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর মতে ফয়য়্যারবাঃখ্‌ ছিলেন ছদ্ম-হেগেলপন্থী।

মার্ক্‌সের মতে ফয়য়্যারবাঃখ্‌ ছদ্ম-হেগেলপন্থী

মার্ক্‌স্‌ ও ফয়েরবাখ্‌-এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে গেলে ফয়েরবাখ্‌ সম্বন্ধে তাঁর এগারোটি পর্যালোচনা ("থিসিস্‌") বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই থিসিস্‌-গুলির অন্ততঃ কয়েকটির বক্তব্য ব্যাখ্যা না করলে ফয়েরবাখ্‌ এবং মার্ক্‌সের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যাবে না, মার্ক্‌সের মতবাদও সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে না।

দুজনের পার্থক্যের ক্ষেত্র

প্রথম থিসিসে মার্ক্‌স্‌ বলেন যে, গ্রীক বস্তুবাদী দার্শনিক ডেমক্রিটাস্‌ (Democritus) থেকে ফয়েরবাখ্‌ পর্যন্ত সকলেই বিষয়বস্তু, বাস্তব ঘটনা এবং অভিজ্ঞতা-জনিত বোধ প্রত্যেকটিকে প্রত্যয়ী বা উপলক্ষরূপে কল্পনা করেন। মার্ক্‌স্‌ বলেন যে, তা ঠিক নয়। এগুলিকে মানুষের ধারণা ও ব্যবহার্যতা (Praxis বা Practice) রূপে কল্পনা করা উচিত। তাঁর মতে সঠিক ইতিহাসচেতনার মূল বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তির চাহিদার ওপর, চাহিদা পূরণের জন্য প্রাথমিক উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করার যোগ্যতা। শিল্পের যান্ত্রিকীকরণের মধ্য দিয়ে শ্রমবিভাগ দেখা দেয়। সেজন্য পুরাতন চাহিদা মেটানো সহজ হয়। কিন্তু ইতিহাস ও অর্থনীতির গতিশীলতার এমনই বিশেষত্ব যে, মানুষের পুরাতন চাহিদা পূর্ণ হতে না হতেই নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি (nature), আর্থ-ঐতিহাসিক ধারার হেতু (middle terms in the historical process) এবং বিমূর্ত চাহিদা (concrete needs) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে ওঠে। স্থূল (physical) এবং সামাজিক (social) ব্যবস্থার অন্তঃক্রিয়া ইতিহাসের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গতঃ, মার্ক্‌স্‌ ফয়েরবাখের ব্যবহার্যতাতত্ত্বকে বা প্রাক্সিস্‌কে সমালোচনা করেছেন। ফয়েরবাখ্‌ ধর্মকে সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য বলে মনে করেন। মার্ক্‌স্‌ বলেন যে, ফয়েরবাখ্‌ এভাবে হেগেলীয় আদর্শবাদের ফাঁদে পা দিলেন। মার্ক্‌সের মতে, আর্থইতিহাসের প্রগতিশীলতাকে মেনে নিয়ে অর্থনৈতিক ইতিহাসের ফলিত তত্ত্বগুলির সঠিক প্রয়োগই হল সার্থক প্রাক্সিস্‌।

ফয়েরবাখের ১ম থিসিসের মার্ক্‌সীয় সমালোচনা

তৃতীয় থিসিসে মার্ক্‌স্‌ ফয়েরবাখের বস্তুবাদকে ছদ্ম-হেগেলবাদ বলে সমালোচনা করেছেন। ফয়েরবাখ্‌ বলেন যে, শিক্ষা ও পরিবেষ্টনীর দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের দ্বারাই সামাজিক রূপান্তর সম্ভবপর হয়। কিন্তু এই শিক্ষা বা পরিবেষ্টনীর কোন বিশেষ "বস্তুবাদী" চিহ্নিতকরণের প্রচেষ্টা তাঁর মধ্যে নেই, কারণ তিনি নিজেকে "বস্তুবাদী" বলে জাহির করলেও তাঁর কোন বিশিষ্ট বস্তুবাদী আর্থঐতিহাসিক চেতনা ছিল না। মার্ক্‌সেরমতে এক্ষেত্রে ফয়েরবাখের বক্তব্য রবার্ট ওয়েনের (Robert Owen) মত কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্রবাদীদের বক্তব্যের মতই ত্রুটিপূর্ণ। তাঁর মতে, প্রকৃতি ও সমাজ বস্তুবাদী দ্বন্দ্বপ্রণালীর মাধ্যমেই সমাজব্যবস্থার রূপান্তর ঘটায় এবং এটাই বিজ্ঞানসম্মত খাঁটি বস্তুবাদের সার কথা।

ফয়েরবাখের ৩য় থিসিসের মার্ক্‌সীয় সমালোচনা

একাদশতম থিসিস্‌ মার্ক্‌সের একটি চিরস্মরণীয় উক্তির জন্য সুবিখ্যাত। তাঁর

বক্তব্য হল—দার্শনিকেরা যুগে যুগে নানাভাবে পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা করেছেন ; কিন্তু যা প্রয়োজন তা হল পৃথিবীর পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করা। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে মৌলিক, শ্রেণীগত পার্থক্য মার্ক্সের চোখে ধরা পড়ে, ফয়য়্যারবাঃখ্ তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না।

ফয়য়্যারবাঃখের ১১শ থিসিসের মার্ক্সীয় সমালোচনা

ফয়য়্যারবাঃখ্ অস্তিত্বযুক্ত বস্তুকে চেতনার আওতায় আনতে চান। কিন্তু মার্ক্স্ এর প্রতিবাদে বললেন—অস্তিত্বযুক্ত বস্তুকে বাস্তব চেতনায় আনার মধ্যে স্থিতাবস্থা (status quo ante) বজায় রাখার একটা আগ্রহ যেন উঁকিঝুঁকি মারছে। মার্ক্সের মতে, বাহ্য জগৎ, বাস্তব ঘটনা, প্রাকৃতিক রূপকল্প—সব কিছুই জ্ঞেয়। ইতিহাস ও অর্থনীতিকে ভিত্তি করে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বের নীতিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে সব কিছুকেই চেতন ও জ্ঞেয় করে তোলা যায়। সমাজের আদর্শ, ব্যক্তির চিন্তা, প্রকৃতির ভ্রূভঙ্গী—সব কিছুই বস্তুবাদী দ্বন্দ্বনীতির ব্যাখ্যার বিষয়বস্তু। সমাজের বাস্তব পরিমণ্ডলই মানুষের ধ্যানধারণার, ভাবনাচিন্তার, প্রেরণা-এষণা-অন্বেষণার মূল উৎস। এক কথায় মেহনতী মানুষই তার ভাগ্যনিয়ন্তা।

॥ মার্ক্সবাদের দ্বিতীয় উৎস ঃ বৃটিশ্ অর্থ নৈতিক চিন্তাধারা ॥

সামন্তপ্রথার শেষ দিকে এবং শিল্প বিপ্লবের মুখোমুখি ইংলণ্ডে যে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়, তা ধনতন্ত্র (Capitalism) ও শ্রেষ্ঠিতন্ত্রকে (Mercantilism) আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। যে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্গণ এর ব্যাখ্যাকার ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুজনের চিন্তাধারা মার্ক্স্কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। একজন হলেন—অ্যাডাম্ স্মিথ্ (Adam Smith), অন্যজন ডেভিড্ রিকার্ডো (David Ricardo)। মার্ক্সের অর্থনীতির তিন খণ্ড (Das Kapital) এবং কাউট্স্কির (Kautsky) সম্পাদনায় "উদ্বৃত্ত মূল্য" (Surplus Value) নামক চতুর্থ খণ্ডে মার্ক্সের অর্থনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে যা জানা যায়, তা হল যে, তিনি এই দুজন ইংরেজ ধনবিজ্ঞানীর মতের সমালোচনার মাধ্যমে নিজের যুক্তিগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মার্ক্সীয় অর্থনীতির ওপর অ্যাডাম্ স্মিথ্ ও ডেভিড্ রিকার্ডোর প্রভাব

অ্যাডাম্ স্মিথ্, রিকার্ডো, মিল্ প্রভৃতি ধ্রুপদী ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্গণের মতে, অর্থকে (Money) কেন্দ্র করে বিনিময় ব্যবস্থা, বাজার প্রভৃতি গড়ে ওঠে। শ্রম এবং মূলধনকে কেন্দ্র করে এই ক্রিয়াকাণ্ড চলতে থাকে। মূলধনের দ্বারা শ্রমিকের শ্রমের ফলে উৎপাদিত বস্তু বিনিময়যোগ্য দ্রব্যে (commodity for exchange) পরিণত এবং বাজারে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কযুক্ত হয়ে ওঠে। এইভাবে শ্রম, মূলধন, বাজার, ক্রয়, বিক্রয়, বিনিময় প্রভৃতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে ওঠে। সমকালীন ইংরেজ ধনবিজ্ঞানীদের এই যুক্তিকে অবলম্বন করে মার্ক্স্ তাঁর বিখ্যাত "উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব" (Theory of Surplus Value) ব্যাখ্যা করেন। **এই তত্ত্বকেই মার্ক্সীয় অর্থনীতির** প্রধান তত্ত্ব বলে অনেকে মনে করেন।

অ্যাডাম্ স্মিথ, রিকার্ডো ও জন্ স্টুয়ার্ট্ মিলের অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক অবাধ বাণিজ্য নীতি

মার্ক্সের "উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বের" আরেকটি দিক হল "শ্রমভিত্তিক মূল্যতত্ত্ব" (Labour Theory of Value)। এই দুটি তত্ত্বেরই বক্তব্য একই। সমকালীন ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের মতে ধনতন্ত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতা (Perfect Competition) ও অবাধ বাণিজ্যনীতি (Free Trade) প্রচলিত। তার ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য (economic equilibrium) বজায় থাকে, উৎপাদন-বণ্টন-ভোগ (Production-distribution-consumption)—এই অর্থনৈতিক চক্র সাবলীলভাবে চলমান ও স্বাভাবিকভাবে গতিশীল থাকে। এই ধ্রুপদী ধনতান্ত্রিক মতের সমালোচনা করে মার্ক্স বলেন যে এই সাবলীলতা ও স্বাভাবিকতা তত্ত্বগতভাবে বা ফলিত ক্ষেত্রে কোন সময়েই দেখা যায় না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ছোটখাটো ব্যবসা অবলুপ্ত হয়, শেষ পর্যন্ত ধনিক শ্রেণীর কর্তৃত্বে একচেটিয়া ব্যবসা (monopoly) গড়ে ওঠে। পুঁজিপতিগণ শ্রমিকদের যে মজুরী দেন, তার চেয়ে অনেক বেশী মজুরী শ্রমিকদের প্রাপ্য। সুতরাং পুঁজিপতিগণ যে মুনাফা (Profits) অর্জন করেন, তা শ্রমিকদের প্রাপ্য। ফলে, দ্রব্যমূল্যের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের প্রাপ্য উদ্বৃত্ত থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়।

মার্ক্সের শ্রমভিত্তিক মূল্যতত্ত্ব

শ্রমিকগণ ক্রমশঃ পুঁজিপতিদের বঞ্চনা ও প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে অত্যন্ত হতাশ, নিঃসঙ্গ ও দরিদ্র হয়ে পড়ে (inpoverishment of the working class)। এটি ধনতন্ত্রের একটি অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণতি। শ্রমিকদের শ্রম যেন একটা পণ্য (commodity) হিসাবে গণ্য হয়। পুঁজিপতিগণ শ্রমিকদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে নামমাত্র মূল্যে তাদের শ্রমকে পণ্য হিসেবে বিক্রয় করতে বাধ্য করে। সুতরাং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিই ধনিক বা শোষক বুর্জোয়া শ্রেণী ও দরিদ্র, শ্রমজীবী, সর্বহারা প্রোলেতারিয়ত শ্রেণী এই দুটি পরস্পরবিরোধী ভাগে সমাজকে বিভক্ত করে দেয়। ধনতন্ত্রেই এই শ্রেণী-সংঘর্ষ চরমরূপ ধারণ করে। মুষ্টিমেয় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বহারাদের বিপ্লব অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রোলেতারীয় বিপ্লবের পর সর্বহারার একনায়কত্ব ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমাজ শ্রেণীবিহীন, কারণ, এখানে একটিমাত্র শ্রেণী — মেহনতী জনতা। তাই এ সমাজে শ্রেণীবিরোধ অন্তর্হিত হয়। ফলে, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক অনাচার দূর হয়।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির শোচনীয় পরিণতি: "শ্রম" পণ্যে পরিণত হয়

॥ মার্ক্সবাদের তৃতীয় উৎস: সমকালীন ফরাসী সমাজবাদ ॥

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের পর ফ্রান্সীদেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা বৈপ্লবিক তত্ত্ব প্রচারিত হয়। মার্ক্স বলেন যে, ফরাসী বিপ্লব পুরানো সামন্তপ্রথা ভেঙে দিল বটে, কিন্তু শিল্প-বিপ্লবকে উপলক্ষ করে নব্য পুঁজিপতি বা মুৎসুদ্দি শ্রেণী (comprador class) সেখানে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাই

বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে স্বৈরতন্ত্রের অভ্যুত্থান

স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের বাণী শাশ্বত করে রাখলেও বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র স্থায়ী হল না। স্বৈরতন্ত্রী নাপোলিয়ঁর আবির্ভাব সূচিত হল।

ফরাসী সমাজতন্ত্র

কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব ঘটলেও উদীয়মান পুঁজিবাদের প্রতিপক্ষীয় একটি মতবাদ ফ্রান্সে তখন থেকে আলোচিত ও বিতর্কিত হতে লাগল। সে মতবাদটি হল সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্র (Socialism)।

মার্ক্সের "সাম্যবাদী ইস্তাহারে" সমকালীন পাঁচ রকম সমাজতন্ত্রবাদের ছক

প্রাথমিক পর্যায়ে, শুধু ফ্রান্সে কেন, সমগ্র ইউরোপে যে সমাজবাদ বিকাশ লাভ করল, তাকে মার্ক্স্ সাধারণভাবে নাম দিয়েছেন "কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদ" (Utopian Socialism)। তিনি "সাম্যবাদী ইস্তাহারে" ("Communist Manifesto") কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদের যে বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক ছক (Typology of Socialism) দিয়েছেন, তার মধ্যে রয়েছে (১) সামন্ততান্ত্রিক সমাজবাদ (Feudal Socialism) (২) পেতি-বুর্জোয়া সমাজবাদ (Petit-bourgeois Socialism), (৩) জার্মান বা "আসল" সমাজবাদ (German or "True" Socialism), (৪) রক্ষণশীল বা বুর্জোয়া সমাজবাদ (Conservative or Bourgeois Socialism), (৫) বিশ্লেষণমূলক কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদ (Critical Utopian Socialism)। মার্ক্স্ এদের প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং প্রত্যেকটির ত্রুটি দেখিয়ে সাম্যবাদকে (Communism) প্রকৃত সমাজতন্ত্রবাদ বলে প্রমাণ করেছেন।

(১) সামন্ততান্ত্রিক সমাজবাদ আসলে বুর্জোয়া মতবাদ

(১) **সামন্ততান্ত্রিক সমাজবাদের** নামে ফ্রান্স্ ও ইংলণ্ডে বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে এক ধরনের সাম্যের প্রতি সমর্থন জানানো হত। এঙ্গেল্সের মত সমর্থন করে মার্ক্স্ বলেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এ ধরনের সাম্যবাদ্ খ্রীস্টধর্মের উদারনীতির এবং ধনিক, অভিজাত শ্রেণীর সহানুভূতিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। তাঁর মতে, একে সামন্ততন্ত্রেরই উন্নত রূপ বলা উচিত।

(২) সিস্‌মঁদির পেতি-বুর্জোয়া সমাজবাদ ত্রুটিপূর্ণ

(২) **পেতি-বুর্জোয়া সমাজবাদ** (Petit-bourgeois Socialism) ফ্রান্সে সিস্‌মঁদির (Sismondi) নেতৃত্বে প্রচারিত হয় এবং ইংলণ্ডেও তার আভাস দেখা যায়। এই মতবাদে কৃষক ও শ্রমিকদের সুবিধাদানের কথা বলা হয়েছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করা হবে এবং উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থাকেও আবশ্যকমত নিয়ন্ত্রিত করা হবে। মার্ক্সের মতে, এ-ধরনের সমাজবাদ ধনতন্ত্রের সীমাবদ্ধ কাঠামোকে মেনে নিয়ে পরিচালিত হবে। ফলে, একে একপ্রকার ধনতন্ত্র বলাই সঙ্গত।

(৩) **জার্মান বা "আসল" সমাজবাদ** (German or "true" Socialism)

বলতে মার্ক্স্ সমকালীন জার্মানিতে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে আরেক ধরনের কল্পনা-শ্রয়ী সমাজবাদের কথা বলেছেন। কার্ল্ গ্রুইন্ (Karl Gruen) এ ধরনের সমাজবাদ সমর্থন করেন। এই সমাজবাদও তৎকালীন জার্মান উদারপন্থী বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়। মার্ক্সের মতে এও এক ধরনের বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক বিকৃতি, একে সমাজবাদ বলা উচিত নয়।

(৩) জার্মান "আসল" সমাজবাদ বিকৃত ধনতন্ত্র

(৪) **রক্ষণশীল বা বুর্জোয়া সমাজবাদ** (Conservative or Bourgeois Socialism) সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্ক্স্ এর প্রধান সমর্থক প্রুধোঁর (Proudhon) মতের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করেন। মার্ক্সের মতে প্রুধোঁ ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ রিকার্ডোর মতকে একটু পরিবর্তিতভাবে সমর্থন করেন। রিকার্ডো বলেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজে দ্রব্যবিনিময়ের ঘটনাটি শ্রম ও সময় এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে নির্ধারিত হয়। প্রুধোঁ তাঁর "দারিদ্র্যের দর্শন" ("The Philosophy of Poverty") গ্রন্থে প্রস্তাব করেন যে, অর্থনৈতিক সাম্য বজায় রাখতে হলে দ্রব্য বিনিময় এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে বিনিময়যোগ্য দুটি দ্রব্যেরই উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমের এবং সময়ের ক্ষমতা বজায় থাকে। তাঁর মতে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার এমন হওয়া উচিত যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই শ্রমজীবী হন এবং প্রত্যেকেই সময় ও শ্রমের সমতার সূত্রের দ্বারা পরিচালিত হন।

(৪) প্রুধোঁর রক্ষণশীল সমাজবাদ : বিনিময়যোগ্য দুটি দ্রব্যের উৎপাদনের শ্রম ও সময়ের সমতার তত্ত্ব

মার্ক্স্ প্রুধোঁর বক্তব্যগুলির পাল্টা জবাব দেবার জন্য তাঁর যে বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তার নাম "দর্শনের দারিদ্র্য" ("The Poverty of Philosophy")। এই গ্রন্থে তিনি হেগেলীয় নীতি অনুযায়ী সামাজিক স্থিতি (Thesis) ও প্রতি-স্থিতির (Anti-Thesis) দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে আদিকাল থেকে উৎপাদনব্যবস্থার বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। প্রুধোঁ বলেন যে, সঞ্চিত ও প্রত্যক্ষ শ্রমের প্রতি-স্থিতির ওপর নির্ভর করে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থিতি ও প্রতি-স্থিতির এই দ্বন্দ্বকে বাদ দিয়ে অর্থনৈতিক সাম্য ও প্রগতিকে নিশ্চিত করা যায় না। কিন্তু মার্ক্স্ হেগেলের দ্বন্দ্বনীতির পরিবর্তে তাঁর নিজস্ব দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল সূত্রটি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, শ্রেণী-সংগ্রামকে অস্বীকার করা চলে না। কারণ, শ্রেণী-সংগ্রাম ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক সূত্রাবলীর ভিত্তিতে একটা পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত ঘটনা। মার্ক্স্ বলেন যে, প্রুধোঁ হেগেলের দর্শনের যে দিকটি গ্রহণ করেন, তা হল—ভাবজগৎ থেকে বস্তুজগতের উত্তরণের ব্যাখ্যা। মার্ক্সের মতে এটা হল হেগেলীয় দর্শনের প্রতিক্রিয়াশীল দিক। তাঁর মতে, প্রুধোঁ হেগেলীয় দর্শনের গ্রহণযোগ্য বৈপ্লবিক দিকটি উপেক্ষা করেছিলেন। এই বৈপ্লবিক দিকটি হল স্থিতি, প্রতি-স্থিতি ও সমন্বিত-স্থিতির পারস্পরিক বিবিধ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ভাব

প্রুধোঁর ত্রুটি

স্বতঃক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। কিন্তু বস্তুজগতের ব্যাখ্যা মেলে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্বের সাহায্যে।

(৫) **বিশ্লেষণমূলক-কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদ** (Critical Utopian Socialism) বাবেয়ুফ্ (Babeuf), সাঁ সিমঁ (Saint Simon), ফুরিয়ার (Fourier), রবার্ট্ ওয়েন্ (Robert Owen) প্রমুখ প্রচারকগণ সমর্থন করেন। মার্ক্স্ এই সমাজবাদকে সমালোচনা করেন। এর সমর্থকগণ দরিদ্র, শোষিতদের সম্পর্কে আলোচনা করলেও মার্ক্সের মতে তাঁরা ঐতিহাসিক, ধারাবাহিক বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শোষিতদের অভ্যুত্থানের কারণ ব্যাখ্যা করেন নি। শুধু নিপীড়িত শ্রেণীরূপেই শোষিতরা তাঁদের কাছে আলোচ্য বিষয়বস্তু। ফলে এই সমাজবাদীদের চিন্তায় শোষিতদের বিপ্লবমুখিতার কোন কারণের হদিস নেই। শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরী, মূলধনের ভূমিকা প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মৌলিক সূত্রগুলি তাঁরা ঠিক বুঝতে পারেন নি।

(৫) বাবেয়ুফ্, সাঁ সিমঁ, ফুরিয়ার, রবার্ট্ ওয়েন্ দ্বারা সমর্থিত বিশ্লেষণমূলক সমাজবাদ—স্বপ্ন-ধনতন্ত্র

ফরাসী ও ব্রিটিশ্ বিশ্লেষণমূলক সমাজবাদকে অ-বৈজ্ঞানিক ও কল্পনাশ্রয়ী বলে সমালোচনা করলেও মার্ক্সের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ওপর তার বিশেষ প্রভাব ছিল। এর সমর্থকগণ পুঁজিবাদী সমাজে শোষকরূপে ধনিক শ্রেণীর শোষণবাদী ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্য দূরীকরণ, ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে শিল্পকে না রাখা, শুধু উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিচালকরূপে ("a mere superintendence of production") রাষ্ট্রের দায়িত্বকে সীমিত করা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবগুলি বিশ্লেষণমূলক সমাজ-বাদকে কল্পনাশ্রয়ী করে রাখলেও লেনিনের মতে, মার্ক্সের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ওপর এর ধ্রুবাত্মক প্রভাব ("Positive influence") স্বীকার্য। এর প্রতিক্রিয়া-শীলতাকে বাদ দিয়ে মার্ক্স্ এর বৈপ্লবিক, মানবতাবাদী ও সমাজবাদী দিকটিকে সযত্নে লালিত করেন এবং তার বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও অর্থনৈতিক যুক্তি-গুলির সাহায্যে তাঁর নিজস্ব, মৌলিক, বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ উপস্থাপিত করেন। এর নাম "মার্ক্স্‌বাদ।"

তবে ফরাসী ও ব্রিটিশ্ বিশ্লেষণমূলক সমাজতান্ত্রিক চিন্তা মার্ক্স্‌কে প্রভাবিত করে

।। মার্ক্স্‌বাদের মূল বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সার : বুর্জোয়া-প্রোলেতারিয়ত শ্রেণীসংঘাত, সর্বহারার বিপ্লব, বিপ্লবোত্তর সাম্যবাদের সূচনা ।।

মার্ক্স্‌কে অনেকে শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বের (theory of class-struggle) প্রধান উদ্ভাবক বলে মনে করেন। কার্লাইল্, অ্যাডাম্ স্মিথ্, সিস্‌মঁদি, সাঁ সিমঁ প্রভৃতি লেখকগণ তাঁর পূর্বে শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু প্লেখানভ্ যথার্থভাবে বলেছেন যে, "কম্যুনিস্ট্ ইস্তাহারে" মার্ক্স্ এবং এঙ্গেল্‌স্ উভয়েই শ্রেণী-তত্ত্বের ভিত্তিতে ইতিহাসের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রকৃত যুক্তিপূর্ণ, বৈজ্ঞানিক

শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্বের প্রথম মৌলিক ব্যাখ্যা মার্ক্সেরই (প্লেখানভ্)

ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের পূর্ববর্তী অথবা সমকালীন সমাজবাদীগণ এই তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হলেও তাঁরা এর সঠিক ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারেন নি।

মার্ক্স্ এবং এঙ্গেল্সের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বুর্জোয়া এবং প্রোলেতারিয়ত এই দুই শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত। তার ফলে মার্ক্সবাদীদের বর্ণনা অনুসারে শ্রেণী-তত্ত্বের বিশ্লেষণে এই দুটি শ্রেণীরই বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শিল্পযুগের শুরু থেকে বৃত্তি

শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব : মার্ক্সের ব্যাখ্যা

এবং দক্ষতার ভিত্তিতে যে শ্রমবিভাগের নীতি (Theory of Division of Labour) প্রচলিত হয়েছে, সেই ঘটনাটিকেই মার্ক্সবাদীগণ শ্রেণীবিভাগের একমাত্র কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। "কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদী বুর্জোয়া লেখকগণও" স্বীকার করেছেন যে, সামন্ততন্ত্রের পরিবর্তে যে নতুন শিল্পভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তার মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ চলে এসেছে। কিন্তু তাঁদের মতে শ্রেণীবিভাগের কোন মৌলিক অর্থনৈতিক কারণ ছিল না, এটা আকস্মিক ঘটনা। মার্ক্স্ শ্রেণীবিভাগের মৌলিক অর্থনৈতিক কারণটি ব্যাখ্যা করে তার অভ্যুত্থানের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করেছেন ও শিল্পসমৃদ্ধ যুগেও ধনবণ্টনের বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে তার বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন।

"কম্যুনিস্ট্ ইস্তাহার" গ্রন্থে মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ ঘোষণা করেছেন যে, প্রত্যেক বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় এক ধরনের মালিক-প্রশাসক সম্প্রদায় (Managerial Class) থাকে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রচলিত পদ্ধতিকে চালু রাখার চেষ্টা করে। এই প্রশাসক বা মালিক শ্রেণী থেকেই ক্রমে ক্রমে বুর্জোয়া শ্রেণীর উৎপত্তি হয়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব

মার্ক্সবাদীগণ বলেন যে, বুর্জোয়া শ্রেণী শোষক শ্রেণী হলেও সে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের জন্য অবতীর্ণ হয়। মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্সের যৌথ "ইস্তাহারে" বলা হয়েছে যে, মিশরের পিরামিড, রোমানদের আমলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ইত্যাদি বহু প্রকার উন্নতি অতীতকালে বুর্জোয়াদের আমলে ও তাদের নেতৃত্বে দেখা গেছে। কিন্তু সেজন্য বুর্জোয়াদের শাসনকে প্রাকৃতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে আদর্শ শাসন বলে মনে করা যায় না। এর কারণ হিসাবে মার্ক্স্ এবং এঙ্গেল্স্ বুর্জোয়াদের শ্রেণীচরিত্র এবং শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে তাঁদের বিশেষ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন।

বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রধান লক্ষ্য হল উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থার ওপর নিজেদের শ্রেণীগত প্রাধান্য বিস্তার করা। এই প্রাধান্য লাভের উদ্দেশ্য হল দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিক

বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থের লক্ষ্য

অর্থাৎ, সর্বহারা শ্রেণীর শ্রমলব্ধ উৎপাদনজনিত প্রাপ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা। এটাই হল বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রেণীগত চরিত্র ও তার শ্রেণীস্বার্থ।

"ইস্তাহারে" বলা হয়েছে যে, বুর্জোয়া শ্রেণী সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও তারা অর্থ-

নৈতিক কারণে শক্তিশালী। ধীরে ধীরে তারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগে আঁতাঁত (entente) বা আত্মীয়তা স্থাপন করে। একই শ্রেণী-স্বার্থের জন্য এই আত্মীয়তাবোধ গড়ে ওঠে। পৃথিবীর বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশের সমস্ত বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের এই প্রাধান্যকে ব্যাপক করে তোলার জন্য ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, শেয়ার বাজার, প্রভৃতি পৃথিবীর সব দেশের আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৃহদায়তন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুঁজিপতি ও ব্যবসাদারদের সংগে যোগাযোগ রাখে এবং তাদের সেবা করার চেষ্টা করে। এভাবে বুর্জোয়া সম্প্রদায় ক্রমশঃ একটি শক্তিশালী শোষকশ্রেণীরূপে গড়ে ওঠে। লেনিন্ পরে দেখিয়েছেন যে, পুঁজিবাদী দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদের (Imperialism) মাধ্যমে তাদের বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্যকে কায়েমী স্বার্থরূপে (vested interests) রক্ষা করার চেষ্টা করে।

ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, শেয়ার বাজার, আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে তোলে

মার্ক্স্বাদীদের মতে, বুর্জোয়াগণ তাদের শ্রেণীস্বার্থের মূলে নিজেরাই কুঠারাঘাত করছে (the bourgeoisie are the "grave-diggers" of the ruling class)। কারণ, যেমন বুর্জোয়ারা আন্তর্জাতিক স্তরে ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী হয়ে উঠছে, তেমনি সর্বহারা প্রোলেতারিয়ত শ্রেণীও সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার ফলে ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সুতরাং মার্ক্স্ এবং এংগেল্স্ তাঁদের যৌথ "ইস্তাহারে' এ দুটি পরস্পর-বিরোধী শ্রেণী-চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বকে একটা সর্বাত্মক এবং বৈজ্ঞানিক সত্য বলে বর্ণনা করেছেন। এর ফলেই সর্বহারা শ্রেণী সমাজতন্ত্রকে একটা সর্বজনীন মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। তাদের নেতৃত্বে অবশ্যম্ভাবী সাম্যবাদী বিপ্লবের শেষে শ্রেণীবিহীন, সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণীও এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়

মার্ক্স্বাদী আলোচনায় শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব (theory of class-struggle) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য বুর্জোয়া এবং প্রোলেতারিয়ত শ্রেণীর গুরুত্ব ও মূল্যের জন্য এই মতবাদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রেণী-সংগ্রাম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্ক্স্, এঙ্গেল্স্ উভয়ে আদি সমাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্র এই সমাজব্যবস্থাগুলির ধারাবাহিক আবির্ভাবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাসের অগ্রগতি বা পরিবর্তন শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে হয়েছে। ফলে, এই শ্রেণীগত অন্তর্দ্বন্দ্ব শোষক এবং শোষিত শ্রেণী দুটির মধ্যে একটা তীব্র বিরোধ চিরকাল সৃষ্টি করে এসেছে। আধুনিক ধনতন্ত্রে এই শ্রেণীগত বিরোধ চরম পর্যায়ে ঘটে এবং রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সর্বহারার নেতৃত্ব (Dictatorship of the Proletariat) স্থাপিত হয়। অবশেষে শ্রেণীবিহীন, অর্থাৎ সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মার্ক্স্বাদী তত্ত্ব অনুযায়ী বুর্জোয়া এবং প্রোলেতারিয়ত উভয় শ্রেণীর পৃথক্ পৃথক্

অর্থনৈতিক কারণে শ্রেণী-সংগ্রাম গড়ে ওঠে—এটা ঐতিহাসিক সত্য

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হলেও একটির ভূমিকা অপরটির ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল।

॥ মার্ক্সীয় ইতিহাসবিজ্ঞান : এঙ্গেল্সের দৃষ্টিতে ॥

প্রথম জীবনে হেগেলপন্থী হলেও ফ্রিড্রিশ্ (Friedrich Engels) (১৮২০—১৮৯৫ শেষ পর্যন্ত বামপন্থী হয়ে ওঠেন। ইংলণ্ডের শ্রমিকপ্রধান ম্যাঞ্চেস্টার শিল্পাঞ্চলে আসার পর শ্রমিকদের সম্পর্কে তিনি ভাবনাচিন্তা শুরু করেন। মার্ক্সের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বকে ল্যাস্কি একটি 'ঐতিহাসিক ঘটনা' বলেছেন ("No partnership in history is more famous than that of Marx and Engels.")। তাঁর অর্থনীতি সম্পর্কিত গ্রন্থে মার্ক্স্ একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখেছিলেন। ইংলণ্ডে ও জার্মানীতে শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে, ফয়য়্যারবাঃখ্ সম্পর্কে ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর লেখাগুলি মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর। "কমিউনিস্ট্ ইস্তাহার" ও "জার্মান মতাদর্শ" ("The German Ideology") মার্ক্স ও এঙ্গেল্সের যুগ্ম প্রচেষ্টায় রচিত। মার্ক্সীয় অর্থনীতির অনেক দিক এঙ্গেল্স্ নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু "পরিবার, সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি" শীর্ষক তাঁর গ্রন্থটি মার্ক্সীয় ইতিহাসচেতনার ব্যাখ্যা হিসেবে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকৃত।

এঙ্গেল্সের সংক্ষিপ্ত জীবনী

মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে হেগেলের ভাববাদী, অবাস্তব ইতিহাসদর্শন (Philosophy of History) থেকে মুক্ত করেন এবং ইতিহাসকে বস্তুবাদী ব্যাখ্যার সাহায্যে ইতিহাসবিজ্ঞানে (Science of History) রূপান্তরিত করেন।

মার্ক্স ও এঙ্গেল্সের ইতিহাসবিজ্ঞান

লিউইস্ হেনরি মর্গান্ (Lewis Henry Morgan) (১৮১৮—১৮৮১) নামক বিখ্যাত মার্কিন নৃবিজ্ঞানীর ব্যাখ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এঙ্গেল্স্ অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তরগুলির ক্রমিক রূপান্তরের ভিত্তিতে ইতিহাসের ঘটনাভিত্তিক ও বস্তুবাদী ব্যাখ্যা করেন। মর্গানের ব্যাখ্যাকে মার্ক্সীয় ইতিহাসবিজ্ঞানের আলোকে তিনি উদ্ভাসিত করেন। এঙ্গেল্সের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি একটি বিচ্ছিন্ন, তাৎক্ষণিক ব্যাপার নয়। সেগুলি ধারাবাহিকভাবে ঐতিহাসিক বিবর্তনের সামগ্রিক গতিশীলতার সঙ্গে জড়িত।

এঙ্গেল্সের ইতিহাসবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা : তাঁর ওপর মর্গানের প্রভাব

এঙ্গেল্স্ বলেছেন যে, আদিকালে আদিম সাম্যবাদ (Primitive Communism) প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগের মার্ক্সীয় সাম্যবাদের তুলনায় তা ছিল স্থূল। মার্ক্সীয় সাম্যবাদ সমভোগবাদী, কিন্তু আদিম সাম্যবাদ ছিল গোষ্ঠীগত সমাধিকারের (communal ownership) ওপর নির্ভরশীল। কৃষিপদ্ধতি আবিষ্কারের পর সেচের জন্য জল ও উর্বরা জমিকে অবলম্বন করে নদীমাতৃক সভ্যতা গড়ে ওঠে বটে, কিন্তু এর ফলে

সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের ইতিহাস

অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গের কর্তৃত্বে দুর্বল ব্যক্তিগণ ক্রীতদাসে পরিণত হল। শক্তিশালী ব্যক্তিগণ জমি দখল করতে শুরু করল। কালক্রমে, ভূমিহীন কৃষকেরা তাদের ভাড়াটিয়া কৃষকে পরিণত হল। এভাবে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হল।

ইউরোপের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে এঙ্গেলস্ বলেন যে, সামন্তপ্রথা মধ্যযুগ (Middle Ages) পর্যন্ত বিশেষভাবে শক্তিশালী ছিল। যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামন্ত ও সেনাপতিগণ রাজতন্ত্রের সমর্থন করে। পরে, সামন্তশ্রেণী, মধ্যবিত্ত ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অধিকতর রাজনৈতিক কর্তৃত্বলাভের জন্য স্বৈরতন্ত্রী রাজার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়। ফলে ক্রমশঃ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পতন হল এবং ধনিক শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের (Capitalism) সূচনা হল।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আবির্ভাবের কারণ

কিন্তু যে ঘটনাটি সমস্ত মধ্যযুগীয় সামন্ত প্রথাকে নিমেষে বিধ্বস্ত করল, তা হল শিল্পবিপ্লবের সূচনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে যন্ত্রের প্রয়োগে শিল্প-সমৃদ্ধির সম্ভাবনা ক্রমবর্ধিত হতে লাগল। ধনতন্ত্রের আবির্ভাব হল। কিন্তু এঙ্গেলস্ মার্ক্সের সঙ্গে একমত হয়ে ঘোষণা করলেন যে, শাসক-শাসিতের মধ্যে শোষক-শোষিতের পরস্পরবিরোধী যে শ্রেণীসম্পর্ক আদিকাল থেকে চলে এসেছে, ধনতন্ত্র তাকে তীব্রতম পর্যায়ে পৌঁছে দিল। ফলে, ধনিক বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়ত সর্বহারাদের শ্রেণীসংগ্রাম শেষ পর্যন্ত সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে নিশ্চিত করে তুলল। সর্বহারাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। তাদের জয় মানেই তাদের নেতৃত্বে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজের আবির্ভাব একটা ধ্রুব সত্য।

শিল্পবিপ্লবের ফল ঃ সামন্ত-তন্ত্রের উচ্ছেদ ঃ ধনতন্ত্রের জন্ম ঃ শ্রেণীসংগ্রাম হল তীব্রতম

এঙ্গেলস্ মর্গানের নৃতত্ত্ব ও মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক তত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলিকে আন্তঃ-শাস্ত্রীয় প্রয়োগপদ্ধতির (interdisciplinary method) সাহায্যে সামগ্রিক ইতিহাসবিজ্ঞান রচনার জন্য ব্যবহার করেছেন। এর ফলে গড়ে উঠেছে সামগ্রিক, দ্বান্দ্বিক ও বস্তুবাদী মার্ক্সীয় ইতিহাসবিজ্ঞান। এঙ্গেলস্ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তনসূচক সূত্রগুলির সাহায্যেও মার্ক্সীয় ইতিহাসবিজ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

মার্ক্সীয় ইতিহাস-বিজ্ঞানের মূল্যায়ন

॥ মার্ক্সীয় ইতিহাসবিজ্ঞান ঃ প্লেখানভের ব্যাখ্যা ॥

প্রথম জীবনে নারদনিক্ (Narodnik) সম্প্রদায়ের সমর্থক হিসাবে কল্পনাশ্রয়ী, অর্থাৎ মার্ক্সবাদ-বিরোধী সমাজবাদী চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হলেও গেওর্গি প্লেখানভ্ (Georgi Plekhanov) (১৮৫৬—১৯১৮) পরবর্তীকালে লেনিন-বাদী হয়ে ওঠেন। মার্ক্সবাদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মত অনেক তাত্ত্বিক প্রশ্নের ব্যাখ্যা করে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

প্লেখানভ্ মার্ক্সবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার

মার্কসীয় ইতিহাসবিজ্ঞান ইতিহাস ও অর্থনীতির ফলশ্রুতি ঃ প্লেখানভ

এঙ্গেলস্ মার্কসের ইতিহাসভাবনাকে মর্গানের নৃতত্ত্ব ও মার্কসীয় অর্থনীতির সাহায্যে ইতিহাসবিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্লেখানভ্ হেগেলীয় ইতিহাসদর্শনের ভাববাদী শৃঙ্খল থেকে ইতিহাসচেতনাকে মুক্ত করে মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও মার্কসীয় অর্থনীতির সাহায্যে ইতিহাসের বিশ্লেষণ করেন। ফলে, গড়ে ওঠে মার্কসের ইতিহাসবিজ্ঞানের একটি বলিষ্ঠ চিন্তাধারা।

হেগেলের ইতিহাসদর্শন ভাববাদী ঃ ইতিহাস ঐশী-শক্তির প্রকাশ, ব্যক্তির ভূমিকা পূর্বনির্দিষ্ট

হেগেলীয় কল্পনায় ইতিহাস ভাবের পরিচালিকা একটি জাগতিক শক্তি (History is World Spirit appearing as Idea.)। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হেগেল জাগতিক শক্তিকে সুমহান্, চরম ক্ষমতাসম্পন্ন ঐশী শক্তির প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং হেগেলীয় দর্শনে ইতিহাস অদৃশ্য শক্তির দ্বারা স্বয়ং-চালিত, ব্যক্তির ভূমিকা সেখানে পূর্ব-নির্দিষ্ট। অর্থাৎ হেগেলের মতে ইতিহাস স্বয়ংসৃষ্ট একটি জাগতিক ঘটনা (History is pre-determined cosmology.)। ব্যক্তি ইতিহাসের গতি প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না।

প্লেখানভের হেগেলীয় ইতিহাসদর্শনের সমালোচনা ও মার্কসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ

প্লেখানভ্ হেগেলের ভাববাদী ইতিহাসদর্শনের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, **মার্কসের** দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের **মূল বক্তব্য** হল এই যে, **ইতিহাস মানুষের সৃষ্টি**। ইতিহাসের ও অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক বিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যার অর্থ—মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে ইতিহাস তৈরী করে। তাই প্লেখানভ্ বলেন যে, ব্যক্তির তাৎক্ষণিক প্রয়োজন এবং ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিপ্রতীপ অবস্থায় রাখা ভুল। আদিম সমাজের অর্থনৈতিক প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষ তার চাহিদা মিটিয়ে পরিবেশ ও পরিমণ্ডল রচনা করেছে। নতুন কোন অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রণালী বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক অনুষঙ্গও পরিবর্তিত হয়। সোজা কথায়, মানুষ অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করে। সামন্ততন্ত্র কৃষিভিত্তিক, ধনতন্ত্র শিল্পভিত্তিক। কিন্তু মার্কসীয় ব্যাখ্যায় সমস্ত ঐতিহাসিক অবস্থাতেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয়েছে শ্রেণীসংঘাতের ভিত্তিতে। এই শ্রেণীসংঘাতই ধনতন্ত্রের চরম বিকাশের ফলে অবশেষে শোষিত সর্বহারাদের শোষক-বিরোধী বিপ্লবের পথে তাড়িত করে। বিপ্লবে তাদের জয় হবেই ; কারণ, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা আদর্শনিষ্ঠ। তাই তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক মুক্তির, তাদের সার্বিক উন্নয়নের ব্যবস্থা তাদের নিজেদেরই হাতে। ইতিহাস ও অর্থনীতি মানুষ নিজেই পরিচালনা করে। এইভাবে প্লেখানভ্ একদিকে হেগেলের কল্পনাশ্রয়ী, ভাববাদী ইতিহাসদর্শনের ধোঁয়াটে আবহাওয়ার বাইরে ইতিহাসচেতনাকে নিয়ে এলেন, অন্যদিকে মার্কসের ইতিহাসচিন্তাকে স্বচ্ছ, সহজবোধ্য, বাস্তবধর্মী যুক্তিতর্কের দ্বারা

ইতিহাসবিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাই "ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা" ("Role of the Individual in History") প্রবন্ধটি লিখে প্লেখানভ্ শুধু যে হেগেলের ইতিহাসদর্শনের সঠিক বিকল্পরূপে মার্ক্সীয় ইতিহাসবিজ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলেন, তাই নয়, তিনি নিজস্ব চিন্তাধারার সাহায্যে মার্ক্সবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের মৌলিক ব্যাখ্যাকাররূপে বিখ্যাত হয়েছেন।

বিশিষ্ট মার্কিন দার্শনিক সিড্নি হুক্ (Sidney Hook) মার্ক্সের ইতিহাস-বিজ্ঞানের সঙ্গে হেগেলীয় ইতিহাসদর্শনের তুলনা করে বলেছেন যে, মার্ক্সবাদ ওল্টানো হেগেলবাদ ("Marxism is Hegelianism turned upside down")। কারণ, উভয়েরই ইতিহাসচিন্তা দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্যের নীতিকে (Dialectics) আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, কিন্তু হেগেল ভাববাদী, মার্ক্স বস্তুবাদী। কার্ল্ পপারের (Karl Popper) মতে মার্ক্সীয় ইতিহাসবিজ্ঞান ইতিহাসকে সরলরৈখিক তত্ত্বরূপে ("a linear, schematic view of History") প্রকাশ করে। কিন্তু ইতিহাসের গতি সব সময়ে সরল রেখার মত নয়। টইন্বি ইতিহাসের উত্থানপতনের ভিত্তিতে তার তারঙ্গিক গতি (Cyclical view of History) নির্দেশ করেছেন।

সিড্নি হুক্, কার্ল্ পপার ও টইন্বির বক্তব্য

॥ মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বের আদিপর্ব : নিকোলাই বুখারিনের ব্যাখ্যা ॥

নিকোলাই বুখারিন্ (১৮৮৮—১৯৩৮) রুশ্বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক লেনিনের একজন ঘনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত সহকর্মী ছিলেন। মার্ক্সবাদের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকার হিসাবেও তাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমন কি মার্ক্সীয় সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ রূপে তাঁকে গণ্য করা হয়।

বুখারিন্ মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বের প্রথম ব্যাখ্যাকার

মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যার জন্য বুখারিন্ প্রথমে মার্ক্সের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের (Historical Materialism) বিশ্লেষণ শুরু করেন। মার্ক্স বলেন যে, সামন্ততন্ত্রে ভূস্বামীগণ এবং ধনতন্ত্রে পুঁজিপতিগণ যথাক্রমে ভূমিহীন কৃষকদের ও সর্বহারা শ্রমিকদের শ্রমলব্ধ প্রাপ্য আয় থেকে তাদের নামমাত্র মজুরি দিয়ে উদ্বৃত্ত অংশ নিজেরা আত্মসাৎ করে। মার্ক্সীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে "উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বের" (Theory of Surplus Value) এটাই সারকথা। মার্ক্সীয় অর্থনীতির এই সিদ্ধান্তকে স্বতঃসিদ্ধ (axiom) রূপে গ্রহণ করে বুখারিন্ এর সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন।

মার্ক্সের "উদ্বৃত্ত মূল্য-তত্ত্বের" সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য

বুখারিনের মতে খেতমজুর ও শ্রমিকদের প্রাপ্য আত্মসাৎ করে বুর্জোয়া ধনিকশ্রেণী

একটা পরান্নভোজী, পরগাছা শ্রেণীরূপে পরিপুষ্ট হয়। ধীরে ধীরে তারা একটা অবসর-ভোগী শ্রেণীতে (Leisured Class) পরিণত হয়। জীবন-সংগ্রামের দুর্ভোগ তাদের সহ্য করতে হয় না বলে তাদের পক্ষে নেতৃত্বলাভ সহজ হয়। কিন্তু তাদের নেতৃত্ব (Leadership) সুবিধাভোগী শ্রেণীর নেতৃত্ব। তাদের একটা লঘিষ্ঠ অংশ শিল্প, সাহিত্য, কলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সৃজনশীল কাজে আত্মনিয়োগ করলেও তারা শ্রমজীবী নামক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য অবসরভোগের অধিকারপ্রাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাদের সম্ভাব্য সৃজনশীলতা বাধা পায়। ধনতন্ত্রী সমাজের একঘেয়ে, একপেশে, বাস্তববিচ্যুত, অবক্ষয়ী সভ্যতা এভাবেই গড়ে ওঠে।

পরান্নভোজী, অবসরভোগী বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্মের ও নেতৃত্বলাভের সমাজতাত্ত্বিক কারণ

রুশ বিপ্লবের পর পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রী সমাজের অগ্রগমনের অন্তর্বর্তী অবস্থার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও বুখারিন বাস্তববাদী পদ্ধতি অনুসরণ করেন। লেনিন এ বিষয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তা-ধারার প্রশংসা করেন এবং তাঁকে অন্তর্বর্তীকালীন রুশ সমাজনীতি (social transformation of the transitional period) নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের অন্তর্বর্তী অবস্থার বৈশিষ্ট্য

ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সহযুক্তি সম্পর্কে লেনিনীয় ব্যাখ্যা অর্থনৈতিক দিক থেকে মূল্যবান। কিন্তু বুখারিন এই অর্থনৈতিক যোগসূত্রের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন ধনতন্ত্রীরা অবসরভোগী শ্রেণীরূপে সুবিধা পাচ্ছে, তেমনি বহির্বিশ্বের অবসরভোগী শ্রেণীরূপেও বুর্জোয়ারা সর্বত্রই এরকম একটা সুবিধাভোগী পরগাছা শ্রেণী।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র বুর্জোয়া-শ্রেণীও পরগাছা শ্রেণী

।। মার্কসবাদের সম্প্রসারণ : রুশ বিপ্লব, ১৯১৭ : বলশেভিক বনাম মেনশেভিক দল ।।

ভ্লাদিমির ইলিয়িচ উলিয়ানভ বিপ্লবী নেতারূপে আত্মগোপন করার সময় ব্যবহৃত নিকোলাই লেনিন (১৮৭০—১৯২৪) এই ছদ্মনামেই বিশ্ববিখ্যাত। মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁরা ছয় ভাই রুশ বিপ্লবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তৎকালীন স্বৈরাচারী জারের হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন ও তাঁর ফাঁসি হয়। কাজান ও সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের সময় থেকেই লেনিন রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হন। নানা সময়ে তিনি জারের সৈন্যদের হাতে অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করেন—কখনও উত্তর মেরুর সন্নিকটে সুদূর সাইবেরিয়ার "ঠাণ্ডা মরুভূমিতে" নির্বাসিত, কখনও কারাগারে চাবুকের আঘাতে জর্জরিত। একবার চলন্ত ট্রেন থেকে তিনি লাফ দিয়ে পালান। অদম্য প্রাণশক্তি, গভীর নিষ্ঠা, মৌলিক চিন্তা, অটল মনোবল সম্বল করে তিনি যেভাবে রুশ

লেনিনের সংক্ষিপ্ত জীবনী

বিপ্লবীদের নেতৃত্বের শীর্ষে ওঠেন, তা রূপকথার মত—যেমন রোম্যাণ্টিক্ তেমনি লোমহর্ষক। এই ক্ষণজন্মা যেন নেতৃত্ব প্রদানের জন্যই রুশ্ রাজনীতির রংগ-মঞ্চে আবির্ভূত। তিনি শুধু মার্ক্স্বাদী দার্শনিক ও মার্ক্স্বাদের ব্যাখ্যাকার নন, বিপ্লবোত্তর যুগে স্বল্প সময়ের মধ্যে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রের স্তরে রুশ্ দেশের উন্নয়নের মত অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করে তোলেন। তাঁর বাস্তবতাবোধ, বিচক্ষণতা, নিপীড়িত স্বজাতীয়দের প্রতি গভীর দরদ দেশবাসীর কাছে তাঁকে পরম প্রিয় করে তোলে। তাই তিনি "মহান্ লেনিন্"।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রুশ্ বিপ্লবের আগে ১৯১২ সাল থেকে মার্ক্স্বাদী নেতাগণ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন—প্লেখানভের নেতৃত্বে "মেন্শেভিক দল" (Mensheviks) এবং লেনিনের নেতৃত্বে "বল্শেভিক দল" (Bolsheviks)। লেনিনের তাত্ত্বিক শিক্ষকরূপে প্লেখানভ্ বিশেষ সম্মান পেয়ে থাকেন। দুটি দলই তৎকালীন স্বৈরাচারী, শোষক রাশিয়ার সম্রাটের (Czar বা Tsar) জারতন্ত্রের উচ্ছেদ চাইতেন ও মার্ক্স্বাদী বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। কিন্তু মেন্শেভিক্গণ মনে করতেন—তৎকালীন রুশ্ কৃষকশ্রেণী বিপ্লবের জন্য তখনও প্রস্তুত ছিল না, কলকারখানার শ্রমিকদের সাহায্যেই সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটাতে হবে। পশ্চিম ইউরোপের গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের (Social Democrats) দ্বারা তখন মেন্শেভিক্গণ প্রভাবিত হন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, কিছুদিন ধরে বুর্জোয়াদের সাহায্যে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়ে পরে সাম্যবাদী আন্দোলনকে এরই অন্তরালে গুপ্ত গণসমিতি ইত্যাদির মারফত এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মেন্-শেভিক্গণের কেউ কেউ শুধু লেনিনের নেতৃত্বে একটা অভিজাত শ্রেণীর সাহায্যে সাম্যবাদী আন্দোলন শুরু করতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু লেনিনের নেতৃত্বে বল্-শেভিক্গণ অবিলম্বে সাম্যবাদী বিপ্লব পরিচালনার জন্য উদ্যোগী হন। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, লেনিনই সঠিক নীতি গ্রহণ করেন।

মেন্শেভিক্ বনাম বল্শেভিক্ দল; দুদলের বক্তব্য

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লেনিন্ রুশ্ বিপ্লবের প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করেন। প্লেখানভের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও তিনি বেশীর ভাগ মেন্শেভিক্দের রুশ্ কম্যুনিস্ট্ পার্টি থেকে বহিস্কৃত করেন। তিনি রুশ্ চরিত্র সম্পর্কে প্লেখানভের চেয়েও বেশী সচেতন ছিলেন। সংখ্যায় গরিষ্ঠ থাকলেও মেন্শেভিক্গণ কোন বিকল্প সাম্যবাদী দল গড়তে পারলেন না। অক্টোবর বিপ্লবের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব এভাবেই লেনিনের সুযোগ্য হাতে চলে এল। বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মেন্শেভিক্গণ লেনিনের সঙ্গে কেন যোগ দেন নি বা কেন স্বতন্ত্র দল গড়েন নি, সেটা ইতিহাসের অনেক হেঁয়ালির অন্যতম। শেষে লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব সফল হল। রাশিয়া তখন থেকে সোবিয়েত সমাজতন্ত্রী দেশ হিসাবে গড়ে উঠল।

লেনিন্ কিভাবে বিপ্লব পরিচালনা করেন

॥ মার্ক্‌স্‌বাদের সম্প্রসারণ : লেনিন্‌বাদ ॥

মার্ক্‌সের ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণে লেনিন্‌ বলেছেন যে, মার্ক্‌স্‌বাদ সুসম্পূর্ণ দার্শনিক বস্তুবাদ —"তা থেকে মানবসমাজ, বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণী তার জ্ঞানাঞ্জন শলাকা লাভ করেছে।" লেনিন্‌ নানা দিক দিয়ে মার্ক্‌স্‌বাদের ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে মার্ক্‌স্‌বাদের তত্ত্বগত ও ফলিত উভয়ক্ষেত্রেই তিনি অনেক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। তাই দেখা যায় যে, আগেকার **মার্ক্‌স্‌বাদ** লেনিনোত্তর যুগে **মার্ক্‌স্‌বাদ-লেনিন্‌বাদ** এই যুগ্ম অভিজ্ঞানের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে আসছে। এর ফলেই ব্যাখ্যা ও পুনর্ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে মার্ক্‌স্‌বাদ বহু আলোচিত, প্রাণবন্ত, তত্ত্ব ও ফলিতের একটি নতুন আঙ্গিকরূপে পৃথিবীর নানা দেশের দার্শনিকের ও জননেতাদের প্রাণিত করছে।

সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত মার্ক্‌স্‌বাদ এখন মার্ক্‌স্‌বাদ-লেনিন্‌বাদ

প্রথমতঃ, লেনিন্‌ মার্ক্‌স্‌বাদের যে দিকটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন, তা হল **দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ**। কিন্তু এখানে স্মরণীয় "বস্তু" সম্পর্কে লেনিনের ব্যাখ্যা। "বস্তুবাদ ও তার অবৈজ্ঞানিক সমালোচনা" ("Materialism and Empirio-criticism") নামক তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থে লেনিন্‌ বলেছেন যে, যা কিছু গতিময়, তাই বস্তু ("Matter means Motion")। সুতরাং লেনিনীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী মার্ক্‌সীয় তত্ত্বে বস্তুবাদ মানে প্রগতিশীলতা।

লেনিন্‌বাদের বৈশিষ্ট্য : (১) "বস্তু" মানেই প্রগতি

দ্বিতীয়তঃ, ধনতন্ত্রের চরম অবস্থায় পুঁজিবাদ ঔপনিবেশিকতার বা সাম্রাজ্যবাদের (Imperialism) সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাম্যবাদের অগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করে। লেনিনের মতে সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুঁজিপতিদের শোষক শ্রেণীরূপে সুগঠিত করে তোলে। ব্যাঙ্ক্‌, বীমা প্রতিষ্ঠান, আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় বিশালাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শেয়ার্‌ ও ফাট্‌কাবাজার প্রভৃতির মারফত ব্যাপকভাবে পুঁজির লেনদেন, বিনিয়োগ ও পণ্যসামগ্রীর বণ্টন-ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক পুঁজি (Finance capital) রূপে পুঁজিপতিগণ সম্পূর্ণভাবে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে নিজেদের কর্তৃত্বে রাখে। ফলে পুঁজিপতিগণ আন্তর্জাতিক পুঁজিপতিরূপে (International Bourgeoisie) সঙ্ঘবদ্ধ ও সুগঠিত হয়। পুঁজিপতিদের শিল্পের চাহিদা মেটাতে উপনিবেশগুলি থেকে কাঁচামাল সরবরাহ হয়। আবার, শিল্পজাত দ্রব্যগুলির বাজার হিসাবেও উপনিবেশগুলি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং পুঁজিপতিদের শ্রেণীস্বার্থেই ধনতন্ত্রী দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক পুঁজিপতিগণ শক্তিশালী হলেও মুষ্টিমেয়। এর পাল্টা আরও শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে একই বিরোধী শ্রেণীস্বার্থকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণী (International Proletariat)। এর ফলে, লেনিনের ব্যাখ্যায়, সাম্রাজ্যবাদই

(২) সাম্রাজ্যবাদই ধনতন্ত্রের চরম ও শেষ পর্যায় : আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া বনাম আন্তর্জাতিক প্রোলেতারিয়েত

ধনতন্ত্রের চরম ও শেষ পর্যায় (("Imperialism is the highest stage of Capitalism")। সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ উভয়ের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধেই আন্তর্জাতিক সর্বহারার নেতৃত্বে সাম্যবাদী বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়।

তৃতীয়তঃ, ইতিহাসের ঘটনার অমোঘ নির্দেশে অর্থনৈতিক সূত্রাবলীর নিশ্চিত, চরম পরিণতি ঘটাবার জন্য দায়ী বুর্জোয়া শ্রেণী। তারা নিজেরাই সমাজতান্ত্রিক ইতিহাসের ক্রম-পরিণতির পথে নিজেদের শ্রেণীগত ভূমিকা পালন করে যায়। মুনাফার লোভ ক্রমশঃ পুঁজিবাদী শ্রেণীকে শোষণের চরমতম পথে ধাবিত করে। চড়া ও মন্দা বাজারের তরঙ্গ (trade cycle), বেকারত্ব, কালোবাজারী, ফাটকাবাজী প্রভৃতি প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত পুঁজিবাদী শ্রেণীর আত্মঘাতী স্বার্থের জন্যই আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রে দেখা দেয়। বুর্জোয়া শ্রেণীকে ধনতন্ত্র এভাবে স্ববিরোধী করে তোলে ("The Bourgeoisie collapses by its own inner contradictions")। এজন্যই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদকে আত্মঘাতমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে হয় ("the bourgeoisie are its own grave-diggers")।

(৩) বুর্জোয়া শ্রেণীর আত্মঘাতী ভূমিকাই সাম্যবাদী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত, নিশ্চিত করে তোলে

মার্কসবাদ সম্পর্কে লেনিনের চতুর্থ মূল্যবান ব্যাখ্যা হল—"রাষ্ট্রের অবক্ষয় তত্ত্ব" ("withering away of the state")। এই তত্ত্ব তাঁর পুঁজিবাদী স্ববিরোধিতার তত্ত্বের ("Contradictions") তাত্ত্বিক সম্প্রসারণ। জোসেফ স্তালিন (Joseph Stalin) (১৮৭৯-১৯৫৩) ১৯২৪ সালে সোবিয়েত রাশিয়ার স্বের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ে (Sverdlov University) প্রদত্ত তাঁর ভাষণে লেনিনের "স্ববিরোধিতা তত্ত্বের" যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তদনুসারে **ধনতন্ত্রের প্রথম স্ববিরোধ** শ্রমিক ও মূলধনের মালিকের বিরোধ। এই বিরোধের কারণ দুটি শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীগত বৈপরীত্য। **দ্বিতীয় স্ববিরোধ** হল কাঁচামালের উৎস, অপর রাষ্ট্রের ভূখণ্ড ইত্যাদি দখল করা নিয়ে বিভিন্ন ধনতন্ত্রী দেশের পুঁজিপতিদের মধ্যে ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ক্ষমতার লড়াই ও দখলদারি তৎপরতা। **তৃতীয় স্ববিরোধ হল—** মুষ্টিমেয় কতকগুলি "সভ্য" শাসক জাতি এবং সারা দুনিয়ার অগণিত ঔপনিবেশিক, পরাধীন জনসাধারণের মধ্যে বিরোধ।

(৪) রাষ্ট্রের অবক্ষয় তত্ত্ব ও ধনতন্ত্রের স্ববিরোধিতার তত্ত্ব

স্তালিনের কথায় "মার্কসবাদের সাধারণ কোষাগারে লেনিন যা দান করেছেন, যা স্বভাবতঃই শুধু তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত," তা হল মার্কসবাদকে একটা ব্যাপক, সুসংবদ্ধ বিশ্বদর্শনে পরিণত করার প্রচেষ্টা। লেনিনের ব্যাখ্যায় মার্কসবাদ নিছক রুশ বা অন্য কোন দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন "জাতীয় মতাদর্শ" নয়, তা হল বিশ্বজনীন সাম্যবাদ (International Communism)। এরই অপর নাম মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। স্তালিনের মতে এটাই মার্কসবাদের লেনিনীয় ব্যাখ্যার "ঐতিহাসিক মূল্য।"

লেনিনের স্ববিরোধতত্ত্বের স্তালিনীয় মূল্যায়ন ও সমর্থন

পঞ্চমতঃ, স্তালিন্ "পদ্ধতির তত্ত্বকে" বা "ব্যবহার্যতার তত্ত্বকে" (Praxis) লেনিন্বাদের একটি স্তম্ভ বলে বর্ণনা করেছেন। "সাম্যবাদী ইস্তাহারে" মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ "দুনিয়ার মজদুরদের" ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানিয়েছিলেন। লেনিন্ ১৯১৭ সালের বল্শেভিক বিপ্লবের প্রধান সংগঠক ছিলেন। তাই মার্ক্সবাদের বিপ্লবাত্মক বক্তব্যকে তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে "পদ্ধতিগত তত্ত্বের" সাহায্যে সুপরিস্ফুট করেন।

(৫) স্তালিনের মতে, প্রাক্সিস্ তত্ত্ব লেনিনের মার্ক্স্বাদী ব্যাখ্যাকে গুরুত্বপূর্ণ করেছে

রুশ্ বিপ্লবের প্রাক্কালে রাশিয়াতে বিপ্লববিরোধী নানা বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল। "পেতি-বুর্জোয়া" নারদ্নিক্গণ সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে রুশ্ শাসনতন্ত্রকে পরিচালিত করতে আগ্রহী ছিলেন। সম্পূর্ণ নৈরাজ্যবাদীরা (Anarchists) স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে চরম বিক্ষোভ প্রদর্শনের নামে গোলমাল পাকাতে চাইছিলেন। স্তালিন্ বলেন যে, এই সমস্ত বিভ্রান্তির মুখোমুখি হয়েও লেনিন্ তাঁর নির্ভীক নেতৃত্ব, নির্ভুল রণকৌশল (Strategy) এবং নির্ভেজাল পদ্ধতির (Praxis) সাহায্যে রুশ্ বিপ্লবকে সফল করে তোলেন।

লেনিনীয় প্রাক্সিস্ তত্ত্ব বিপ্লবের ক্ষেত্রে কেন গুরুত্বপূর্ণ

স্তালিন্ লেনিনীয় রণকৌশল ও পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী তত্ত্বের প্রযোজ্যতা যাচাই করা ও সমাজতন্ত্রী দলের সংগঠন ও পুনর্গঠন লেনিনের রণকৌশল ও পদ্ধতির মূল কথা। এ প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন—কিভাবে বিপ্লবের নামে "শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলার" ("infantile disorder") ঝোঁকের বিরুদ্ধে লেনিন্ কমুনিস্ট্দের সতর্ক করে দেন। কাউট্স্কির মত আওয়াজ তুললেই বিপ্লব দেখা দেয় না। "এক পা আগে—দু পা পিছিয়ে" শীর্ষক পুস্তিকায় এ জাতীয় রণকৌশলের পদ্ধতিকে লেনিন্ "হঠকারিতা" বলে তার নিন্দা করেন।

লেনিন্ বলেন—বিপ্লব হঠকারিতা নয়

ষষ্ঠতঃ, স্তালিন্ বলেন যে, মার্ক্সের তুলনায় লেনিন্ মতাদর্শের (Ideology) ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। মার্ক্স্বাদের বস্তুতান্ত্রিকতাকেই তিনি একমাত্র সঠিক মতাদর্শ বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ, এ মতাদর্শ ইতিহাস, অর্থনীতি ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যৌথ ও ফলিত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলশ্রুতি। মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও একমাত্র অনুসরণযোগ্য পদ্ধতি। প্রসঙ্গক্রমে স্তালিন্ বলেছেন যে, মার্ক্স্ বিপ্লবের স্বতঃস্ফূর্ততার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। পেতি-বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লবকে স্বতঃস্ফূর্ত বলে প্রচার করে, বিপ্লবের ভ্রূণকে হত্যা করে ও প্রতিবিপ্লব (Counter-revolution) ও প্রতিক্রিয়াশীলতার (Reaction) সাহায্যে ধনতন্ত্রকে স্থায়ী করে রাখার চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে "কি করতে হবে" ("What is to be done") এবং "এপ্রিল্

(৬) সঠিক মতাদর্শের ওপর লেনিনের গুরুত্ব আরোপ; বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্ত নয়, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিপ্লবকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাৎক্ষণিক মিলনও চিন্তনীয়

নিবন্ধগুলি" ("April theses") সাম্যবাদী মতাদর্শের, পদ্ধতির ও রণকৌশলের বাস্তবভিত্তিক ব্যাখ্যাকার হিসাবে লেনিনের নামকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। আবার, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকাকে বিচার করে সাময়িকভাবে বুর্জোয়াদের সংগে সহযোগিতা করে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যরূপে সাম্যবাদী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার কর্মসূচীকেও লেনিন্ মতাদর্শ, পদ্ধতি ও রণ-কৌশলের অন্তর্বর্তী প্রকল্প বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। "দরকার হলে অস্থায়ী, নড়বড়ে সরকারের সংগেও বন্ধুত্ব কর, তারপর সাম্যবাদের ধাক্কায় তাকে বিধ্বস্ত করে দাও"— লেনিনের এ নির্দেশ মার্ক্সবাদকে ফলিত ক্ষেত্রে আরও প্রয়োগমূলক, আরও বাস্তব-ধর্মী করে দিয়েছে।

সপ্তমতঃ, মেহনতী জনতার একনায়কত্ব স্থাপনের জন্য মার্ক্সবাদী লক্ষ্যকে লেনিন্ আরও বাস্তবধর্মী করে তোলেন। স্তালিনের মতে, লেনিন্ এ ক্ষেত্রে মার্ক্সের চেয়েও বাস্তবতার দিকে বেশী ঝুঁকেছিলেন। "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" ("State and Revolution") নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লেনিনের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে স্তালিন্ তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করেন। লেনিন্ বলেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat) হল ক্ষয়িষ্ণু, মুমূর্ষু বুর্জোয়া শ্রেণীর ওপর মেহনতী জনতার শাসন। বলপ্রয়োগের ওপর এ শাসন নির্ভরশীল। কোন আইনকানুন এর ধারে কাছেও আসবে না। এ শাসন চিরস্থায়ী, কারণ মেহনতী জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন এর ভরসা। ১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিল্ মার্ক্স্ জার্মান সাম্যবাদী নেতা কুগেল্মান্কে (Kugelmann) যে পত্র লেখেন, তাতে তিনি নির্দেশ দেন, "পূর্বের মত রাষ্ট্র নামক আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটি শুধু দখল করাই নয়, তাকে ভেংগে টুকরো টুকরো করাই হল কম্যুনিস্ট্দের শেষ লক্ষ্য। ইউরোপ মহাদেশের যে কোন স্থানে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এটাই হল প্রাথমিক পদক্ষেপ।' "স্ববিরোধ-তত্ত্ব," "রাষ্ট্রের অবক্ষয় তত্ত্ব" ইত্যাদি আনুষংগিক মতবাদের সাহায্যে লেনিন্ মার্ক্সের উপদেশকেই সাম্যবাদী সমাজের চরম লক্ষ্যরূপে আরও বাস্তবায়িত করে তোলেন।

(৭) মার্ক্সের মেহনতী জনতার একনায়কত্বের তত্ত্বকে লেনিন্ আরও বাস্তবায়িত করেন

অষ্টমতঃ, স্তালিনের ব্যাখ্যা অনুসারে লেনিন্বাদের বিশেষত্ব হল—মার্ক্সবাদের ভিত্তিতে জাতিসমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করা। সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি তাদের উপনিবেশের অধিবাসী অনুন্নত জাতিগুলিকে "সভ্য" করে তোলার অজুহাতে তাদের ওপর কর্তৃত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখত। তাদের ধনতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখার জন্যই তাদের এ সাম্রাজ্যবাদী কৌশল ও অপচেষ্টা। লেনিন্ প্রথম মার্ক্সবাদের যুক্তির সাহায্যে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে আঁতাত্ (entente) থাকার ফলে জাতিসমস্যার জটিলতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right of self-determination) প্রদান করে প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের অধিকার লেনিন্ স্বীকার করেন। স্তালিন্ দাবি করেন যে, এইভাবে লেনিনের

(৮) জাতিসমস্যার সমাধানে লেনিনের মৌলিক চিন্তাধারা

ব্যাখ্যায় শুধু ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের কারণই জানা যায় না, সাম্রাজ্যবাদের অবশ্যম্ভাবী পতনের কারণও জানা যায়। মার্কসবাদের লেনিনীয় ব্যাখ্যার ফলে দুটি কারণই এখন পরিষ্কার।

নবমতঃ, মার্কসবাদের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে স্তালিন লেনিনের যে নিজস্ব অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন তার অন্যতম হল "সাম্যবাদী দলের" ("পার্টির" অর্থাৎ Communist Party-র) ভূমিকা নির্ধারণ। মার্কসবাদকে ফলিত ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে হলে নতুন, জঙ্গী, বিপ্লবী পার্টি দরকার। তাই ক) শ্রমিক-শ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী (Vanguard of the Working Class) রূপে সাম্যবাদী পার্টিকে সংগঠিত ও সুগঠিত করার ওপর লেনিন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। (খ) কম্যুনিস্ট পার্টিকে শ্রমিক-শ্রেণী ও সর্বহারা মেহনতী জনতার সঙ্গে অনবরত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে, তার হাত ধরে তাকে সময়মত বিপ্লবের রাস্তায় এগিয়ে আনতে হবে। (গ) পার্টি যেন সর্বহারার সামগ্রিক সংগঠন হয়ে যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। (ঘ) "এক পা এগিয়ে, দু'পা পেছিয়ে" পুস্তিকায় লেনিন উপদেশ দিয়েছেন যে, কম্যুনিস্ট পার্টি প্রয়োজন হলে "প্রাক্সিস" অনুসারে বিপ্লবমুখী শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ব দিতে গিয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে, হঠকারিতা, শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলার ("Infantile disorder") বিরুদ্ধে সাবধান হতে হবে। (ঙ) কম্যুনিস্ট পার্টি যেন সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে। (চ) লেনিনের মতে, কম্যুনিস্ট পার্টি হল সর্বহারা শ্রেণীর সম্মিলিত ইচ্ছা-শক্তির প্রতীক। সুতরাং লেনিনবাদ কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে কোন উপদলের উপস্থিতি বরদাস্ত করে না। দলের শৃঙ্খলা থাকবে লোহার মত অনমনীয়। না থাকবে কোন সুবিধাবাদ, না হবে ফাঁকা বুলি কপচানো। নিছক বাকসর্বস্ব, ভণ্ড, নীতি-বিবর্জিত, সুবিধাবাদী, ক্ষমতালিপ্সু সমাজতান্ত্রিক পার্টিকে "প্রচ্ছন্ন বুর্জোয়া দল" বলে লেনিন তাঁর চরম ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

(৯) "পার্টি" সম্বন্ধে লেনিন মার্কসীয় ধারণাকে স্পষ্টতর করেন ঃ লেনিনের মতে পার্টি "অগ্রগামী বাহিনী" বা ভ্যানগার্ড

কেউ কেউ অভিযোগ করেন যে, মার্কসবাদের সম্প্রসারণ করতে গিয়ে লেনিন পরস্পরবিরোধী কথা বলেছেন। তিনি একদিকে বলছেন যে, প্রাক্সিস বা রণকৌশল হবে "অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া।" এদিক থেকে তিনি মার্কসবাদের আপেক্ষিকতা স্বীকার করে নিয়েছেন। অথচ অন্য দিকে তিনি "পার্টিকে" অনমনীয়, কঠোরভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে উপদেশ দিয়েছেন।

লেনিনবাদের সমালোচনা ঃ পরস্পরবিরোধী বক্তব্য

তবুও তত্ত্বগত ও ফলিত ক্ষেত্রে মার্কসবাদের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে লেনিন মার্কসবাদের বিপুল সম্ভাবনা সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করেছেন। ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে আঁতাত, জাতি-সমস্যার প্রকৃত কারণ নির্দেশ, মতবাদ, পদ্ধতি, রণনীতি ও রণকৌশল নিরূপণ, কম্যুনিস্ট পার্টি নাম দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ছদ্ম-বাম

মার্কসবাদ লেনিনবাদের মূল্যায়ন

দলের ভণ্ডামি ইত্যাদি বিষয়ে লেনিনের ব্যাখ্যা বিশেষভাবে মৌলিকতার দাবি রাখে। বোঝা যায় বর্তমানে ও ভবিষ্যতে মার্ক্সবাদ শুধুই মার্ক্সবাদ নয়, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ একই বৃন্তে দুটি কুসুম।

॥ দুটি চমকপ্রদ তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব : লেনিন্ বনাম রোজা লুক্সেমবুর্গ, লেনিন্ বনাম রায় ॥

(ক) লেনিন্ বনাম রোজা

রোজা লুক্সেমবুর্গ (Rosa Luxemburg) (১৮৭০—১৯১৯) মার্ক্সবাদের দ্বারা প্রভাবিত জার্মানীর একজন বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেত্রী। গত শতাব্দীর শেষে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী বিপ্লবের নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। কম্যুনিস্ট্ বিপ্লবে পার্টির ভূমিকা কি হবে—এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে লেনিনের তীব্র মত-পার্থক্য দেখা দেয়। ঐ সময়ে সমাজতন্ত্রী মহলে এই তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। রোজা লেনিনের সমবয়সী ছিলেন এবং বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে দুজনেই বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সহযোগী ছিলেন।

রোজা লুক্সেমবুর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচিত

লেনিন্ বলেন, সাম্যবাদী আন্দোলনে কম্যুনিস্ট্ পার্টির ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পার্টিকে তিনি আন্দোলনের পুরোভাগে, প্রথম সারিতে রাখার পক্ষপাতী। পার্টি সম্বন্ধে তাঁর এই তত্ত্ব "পুরঃস্থিতির তত্ত্ব" (Vanguard Theory) নামে সুপরিচিত। তাঁর ব্যাখ্যায় পার্টিই সব, পার্টি শ্রেণীসচেতন সর্বহারাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্রতম পর্যায়ে নিয়ে যাবে, সর্বহারাদের বিপ্লবকে ত্বরান্বিত ও সার্থক করে তুলে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ স্থাপন করবে, সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র স্থাপিত হবে।

পার্টি সম্বন্ধে লেনিনের "পুরঃস্থিতির তত্ত্ব"

কম্যুনিস্ট্ পার্টি সম্বন্ধে "স্বতঃস্ফূর্তির মতবাদের" (Spontaneity theory) সঙ্গে রোজার নাম জড়িত। এই মত সমর্থন করে তিনি বলেন যে শ্রেণীসচেতনতাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই সচেতনতা সর্বহারাদের বুর্জোয়াবিরোধী সাম্যবাদী বিপ্লবে প্রবৃত্ত করে। শ্রেণী সচেতনতাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বহারাদের পার্টি গড়ে তুলতে, পার্টিকে শক্তিশালী করে তুলতে বাধ্য করবে। রোজা বলেন—আগে শ্রেণী-সচেতনতা, পরে পার্টি।

সাম্যবাদী বিপ্লব সম্বন্ধে রোজার "স্বতঃস্ফূর্তির তত্ত্ব"

রোজার মতের সমালোচনা করে লেনিন্ বলেন যে, স্বতঃস্ফূর্তির মতবাদ সুবিধা-বাদ। এ মতবাদ সাম্যবাদী বিপ্লবের ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী চরিত্রকে, তার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অস্বীকার করে। এ মতবাদ শ্রমিকদের "শুধু কিছু পাইয়ে দেবার নীতি।" তার সীমাবদ্ধতা তাৎক্ষণিক। যে দাবিদাওয়াগুলি শ্রমিকরা উপস্থিত করবেন, সেগুলি কেবল বুর্জোয়াদের পছন্দমত চাহিদাগুলি। কিছু কিছু

লেনিন রোজার মতের অসারত্ব প্রতিপন্ন করেন

দাবি তাৎক্ষণিকভাবে শ্রমিকগণ পূরণ করতে পারবে, এর বেশী নয়। এ মতবাদ শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন অংশের ভূমিকাকে ছোট করে দেখায়।

জার্মানীর গণসমাজবাদীদের ওপর রোজার প্রভাব

পরবর্তীকালে রোজার মতবাদ জার্মানীতে গণসমাজবাদীদের (Social Democrats) প্রভাবিত করে। রোজা বিপ্লববাদী প্রবাহ থেকে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাই স্তালিনের মত লেনিন্‌বাদীগণ বলেন যে, পার্টি সম্বন্ধে রোজার বক্তব্য ঠিক নয়, লেনিনের বক্তব্যই সঠিক।

(খ) লেনিন্ বনাম রায়

এম্ এন্ রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বিপ্লবী নেতা ও দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (১৮৮৬ ?—১৯৫৪) প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরূপে আত্মগোপনের সময় "এম্ এন্ রায়" (M. N. Roy) ছদ্ম নামেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় তিনি ভারতের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগ দেন এবং গোপনে রুশ্ বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় আশ্রয় নেন। তাঁর মৌলিক বিপ্লবচিন্তা, রুশ্ বিপ্লবের সংগঠনের জন্য গভীর আন্তরিকতা ও অদ্ভুত কর্মতৎপরতা তাঁকে অচিরে লেনিন্, স্তালিন, ট্রট্‌স্কি প্রভৃতি রুশ্ বিপ্লবের প্রথম সারির নেতাদের সমপর্যায়ভুক্ত করে তোলে।

১৯২৩ সালে তৃতীয় বিশ্ব (সাম্যবাদী) সভায় রায়ের সঙ্গে লেনিনের দ্বন্দ্ব : সুবিধাবাদী বুর্জোয়া ব্যবসায়ীদের সমর্থন করে ভারতের মুক্তিসংগ্রামকে সাম্যবাদী করা যাবে কি ?

১৯২৩ সালে তৃতীয় বিশ্ব (সাম্যবাদী) সম্মেলনে (Third International) সোবিয়েত রাশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পর অন্যান্য বিতর্কের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য দেশের সাম্যবাদী বিপ্লবীদের প্রতি রুশ্ সাম্যবাদীদের নীতি কি হবে তাই নিয়ে আলোচনা চলে। রায় তাঁর "আত্মজীবনীতে" ("Memoirs") জানিয়েছেন যে লেনিনের উপদেশেই ভারতের সমকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিশ্ব সাম্যবাদী সম্মেলনের বক্তব্য সম্পর্কে তিনি তাঁর স্বতন্ত্র তাত্ত্বিক পত্র বা "থিসিস্" ("thesis") সম্মেলনে পেশ করেন। তাঁর থিসিসে রায় বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণী প্রতিযোগী ব্রিটিশ্ পুঁজিপতিদের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সুরক্ষিত ও চরিতার্থ করার জন্যই ইংরেজ-বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তাই তাঁর মতে ভারতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা রীতিমত সুবিধাবাদী, ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের আসরে ভারতীয় বুর্জোয়াগণ তাদের অবস্থার উন্নতি চায়। সুতরাং তাদের ইংরেজবিরোধী ভূমিকাকে সাম্যবাদী, বৈপ্লবিক ভূমিকারূপে কল্পনাই করা যায় না, তাদের সঙ্গে বিশ্বের সাম্যবাদী নেতৃবর্গের সহযোগিতা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

রায়ের এই থিসিসের সঙ্গে লেনিন্ তাঁর থিসিস্ তৃতীয় বিশ্ব সম্মেলনে পেশ

করেন। লেনিনের বক্তব্য ছিল যে, ভারতে সাম্যবাদী নেতৃত্ব, কম্যুনিস্ট পার্টি, উপযুক্ত সাম্যবাদী মতাদর্শ, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সাম্যবাদী পটভূমিকা পুরোপুরি গড়ে ওঠা না পর্যন্ত ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উচিত স্থানীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলা। লেনিনবাদীরা লেনিনের রণকৌশল, রণনীতি, পথ, প্রাক্সিস্ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই থিসিসের যৌক্তিকতা সমর্থন করেন।

ভারতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে বিপ্লবীদের তাৎক্ষণিক সহযোগিতা লেনিন্ সমর্থন করেন

প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় বিশ্বসম্মেলনে রায়-লেনিন্ দ্বন্দ্ব কোনো "দ্বন্দ্বই" ছিল না। কারণ লেনিনের নির্দেশে সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত দুটি থিসিস্‌কেই পরস্পরের পরিপূরকরূপে অনুমোদন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। রায়ের সম্মতিক্রমে শেষ পর্যন্ত লেনিনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে লেনিনের দূরদর্শিতা প্রশংসার দাবী রাখে। কারণ, দুজনের থিসিসের মধ্যে কার থিসিস্ সঠিক তার বিচারের ভার তিনি ভবিষ্যতের ইতিহাসের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। পর বৎসরই লেনিনের আকস্মিক মৃত্যু না হলে ইতিহাস কোন্ পথে চালিত হত, কারুর তা জানার কথা নয়।

শেষ পর্যন্ত সম্মেলন দুটি থিসিস্‌কেই পরস্পরের পরিপূরক বলে অনুমোদন করে

॥ মার্ক্স্‌বাদ-লেনিন্‌বাদের সম্প্রসারণ : স্তালিন্ ও স্তালিন্‌বাদ ॥

জোসেফ স্তালিন্ (Joseph Stalin) (১৮৭৯—১৯৫৩) লেনিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে রুশ্ বিপ্লবের একজন প্রধান সংগঠক ছিলেন। গভীর দেশপ্রেম, অভাবনীয় সংগঠনী শক্তি, প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব তাঁকে অচিরে রুশ্ কম্যুনিস্ট্ পার্টির প্রথম সারির নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত করে। লেনিনের মৃত্যুর পর তিনি সোবিয়েত রাশিয়ার শাসকপ্রধান হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স্ ও চীনের সংগে সহযোগিতা করেন এবং হিট্‌লারের নির্মম আক্রমণ থেকে স্বদেশকে রক্ষা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি শুধু লেনিনবাদের ব্যাখ্যাকার হিসাবেই পরিচিত নন, তিনি তত্ত্বগত ও ব্যবহারগত ক্ষেত্রে মার্ক্স্‌বাদ-লেনিন্‌বাদের সম্প্রসারণের চেষ্টা করেন।

স্তালিনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

স্তালিনের বিশেষ মতবাদগুলির মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, তিনি সোবিয়েত রাশিয়ায় অনুসৃত মার্ক্সীয় অর্থনীতির ব্যাখ্যা করেন। এংগেল্‌স্ তাঁর "ডুরিং-বিরোধী বক্তব্যে ("Anti-Dühring") বলেন যে, ধনতন্ত্রের অবলুপ্তির পর এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তিত হলে মানুষ অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবে। স্তালিন্ বলেছেন যে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির (Economic growth) নিয়মগুলি ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই এক। তবে সমাজতন্ত্রে এই নীতিগুলির মৌলিক রূপান্তর ঘটে। সুতরাং দেখা যায় যে, লেনিনবাদের মধ্যে যে প্রাক্সিস্, আপেক্ষিক বাস্তবতাবোধ প্রভৃতির নিদর্শন মেলে, স্তালিন্ তাকে তাঁর অভিজ্ঞতার

স্তালিনবাদের বৈশিষ্ট্য : (১) মার্ক্সীয়-লেনিনীয় অর্থনীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা

ভিত্তিতে সমর্থন করেন। লেনিনের মতই তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, অচিরে অর্থনৈতিক কারণেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। বিশ্বের সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলির উচিত সেই দ্বন্দ্বের সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। এভাবেই ভবিষ্যতে বিশ্ব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তার জন্য ব্যাপকভাবে মার্ক্সীয় লেনিনীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতামতের প্রচারের ওপর স্তালিন্ গুরুত্ব দেন। ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে স্তালিনের অর্থনৈতিক চিন্তার ওপর ভিত্তি করেই রুশ্ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বিষয়ক প্রস্তাব রুশ্ কম্যুনিস্ট্ পার্টি অনুমোদন করে।

দ্বিতীয়তঃ, লেনিন্ জাতিসমস্যা সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেন, তাকে স্তালিন্ আরও পরিস্ফুট করেন। সোবিয়েত রাশিয়ার এশীয় ও ইউরোপীয় দুটি অংশে নানাবিধ সংখ্যালঘু প্রজাতি (ethnic minorities) বাস করেন। তাঁদের ভাষা, লিপি, সংস্কৃতি, ধর্ম সব কিছুকে সাম্যবাদী রুশ্ ঐক্যের মধ্যে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে স্তালিন্ ভাষার ও ভাষাতত্ত্বের সামাজিকীকরণের (Socialisation of Linguistics) ওপর জোর দেন। এভাবে সাহিত্য, শিল্প, কলা, ইত্যাদি সাংস্কৃতিক সব কিছুর সমাজতান্ত্রিক আত্তিকরণ না হলে সমাজতন্ত্রকে স্থায়ী করা যায় না বলে স্তালিন্ মত প্রকাশ করেন।

(২) জাতীয় সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের জন্য ভাষার সামাজিকীকরণ

তৃতীয়তঃ, কম্যুনিস্ট্ পার্টি সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্যকে স্তালিন্ আরও বাস্তববাদী করে তোলেন। ১৯৩৭ সালের মার্চ্ মাসে রুশ্ কম্যুনিস্ট্ পার্টির কেন্দ্রীয় প্লেনামে (প্রতিনিধিসভায়) "পার্টি" সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে স্তালিন্ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসে স্তালিনের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই কাগানোভিচ্ (Kaganovich) এবং দিমিত্রফ্ (Dmitroff) তাঁদের মতামত পেশ করেন। এগুলি আলোচনা করলেই পার্টি সম্বন্ধে স্তালিনের নতুন ভাবনাচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, পার্টির ভূমিকা শুধু সংগঠন ও প্রচারের মধ্যেই সীমিত নয়, শিক্ষকের ভূমিকাও পার্টিকেই নিতে হবে। তরুণ ও উঠ্‌তি যুবকযুবতীদের মধ্যে থেকে বাছাই করে পার্টির কর্মী ("ক্যাডার") তৈরী করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মার্ক্সবাদ লেনিন্‌বাদের আদর্শে শিক্ষিত করতে হবে, সমাজতন্ত্রের মন্ত্রে তাদের দীক্ষিত করতে হবে। দেখতে হবে—যেন বুর্জোয়া গুপ্তচরদের অনুপ্রবেশ (infiltration) না ঘটে। তোতাপাখীর মত বাঁধা বুলি কপ্‌চানো, মামুলি সূত্রের একঘেয়ে ব্যবহার, পণ্ডিতী নিষ্ঠাসর্ব্বস্ব ভাব ত্যাগ করে পার্টির কর্মীদের জনমুখী, সমাজমুখী হতে হবে।

(৩) পার্টি সম্বন্ধে স্তালিনের নতুন কিছু বক্তব্য

॥ দুটি চমকপ্রদ তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব : স্তালিন্ বনাম ট্রট্স্কি, স্তালিন বনাম টিটো॥

(ক) স্তালিন্ বনাম ট্রট্স্কি : লেনিন্ ও রুশ্ বিপ্লবের অন্যান্য নেতাগণ এ বিষয়ে

একমত ছিলেন যে, সোবিয়েত রাশিয়ার সাম্যবাদী সমাজকে স্থায়ী রাখতে হলে তার চারপাশেও এ ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। লেনিনের প্রিয় সহকর্মী লিও ট্রট্স্কি (Leon Trotsky (১৮৭৯—১৯৪০) বরাবর এই মতের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। তাই তাঁর তত্ত্বকে "বিশ্ব সাম্যবাদী স্থায়ী বিপ্লবের তত্ত্ব" (Theory of Permanent World Revolution) বলা হয়। তাঁর মতে,

ট্রট্স্কির বিশ্ববিপ্লব তত্ত্ব
(১) সাম্যবাদী ও অসাম্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে সমতা চাই

প্রথমতঃ, সাম্যবাদী সমাজের সঙ্গে ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রের সহাবস্থিতির ফলে অ-সাম্যবাদী রাষ্ট্রে একটা পশ্চাৎপদতার সচেতনতা দেখা দেয়। সেটা সমস্ত সাম্যবাদী দেশের পক্ষেই ক্ষতিকর।

দ্বিতীয়তঃ, কেবলমাত্র একটি দেশে সাম্যবাদ স্থাপিত হলে তার ফলে মার্ক্স্‌বাদ-লেনিন্‌বাদ একটা সংকীর্ণ জাতীয় মতবাদে পরিণত হবে। ট্রট্স্কির মতে মার্ক্স্‌বাদ-লেনিন্‌বাদ প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক।

(২) মার্ক্স্‌বাদ লেনিন্‌বাদ আন্তর্জাতিক

তৃতীয়তঃ, ধীরে ধীরে সাম্যবাদকে বিশ্বব্যাপ্ত না করে তুললে শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির চাপে সাম্যবাদী দেশগুলির অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। তাই সাম্যবাদী দেশগুলির নিজেদের স্বার্থেই বিশ্ব-বিপ্লব তত্ত্বে বিশ্বাসী হওয়া উচিত।

(৩) সাম্যবাদী রাষ্ট্রের আত্ম-রক্ষার স্বার্থ

ট্রট্স্কির সঙ্গে স্তালিনের তত্ত্বগত লড়াই শুরু হবার কারণ ট্রট্স্কির বিশ্ববিপ্লব তত্ত্বের বিরুদ্ধে স্তালিনের সমালোচনা। স্তালিন্ ট্রট্স্কির তত্ত্বের পরিবর্তে "একটি দেশে সাম্য-বাদ প্রতিষ্ঠার যুক্তি" ("Theory of Socialism in one Country") ব্যাখ্যা করেন। স্তালিন্ বলেন, প্রথমতঃ, ট্রট্স্কির তত্ত্বটি মেন্‌শেভিক্‌দের তত্ত্বের মত অবাস্তব। বিপ্লবের নামে যে শিশুসুলভ হঠকারিতার বিরুদ্ধে লেনিন্ সতর্ক করে দেন, স্তালিনের মতে ট্রট্স্কির তত্ত্ব সে ধরনের হঠকারিতাকেই প্রশ্রয় দেবে। এতে সাম্যবাদী দেশগুলির বিপদ।

ট্রট্স্কির বিরুদ্ধে স্তালিনের যুক্তি : (১) অবাস্তবতা, হঠকারিতা

দ্বিতীয়তঃ, স্তালিন্ বলেন, সব দেশে প্রায় এক সঙ্গেই সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটানোর মত পরিস্থিতি থাকে না। তাঁর মতে, বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে সোবিয়েত রাশিয়াকেও উন্নয়নের মধ্যবর্তী কোন কোন ধাপ বাদ দিয়ে পরবর্তী ধাপে উঠতে হয়েছে। তাঁর মতে বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে না ওঠার এটা একটা কারণ।

(২) সব দেশের পরিস্থিতি এক নয়

তৃতীয়তঃ, স্তালিনের মতে ট্রট্স্কির তত্ত্ব সমর্থন করার অর্থ হল রুশ্ প্রলেতারীয় শ্রেণীর ওপর অনাস্থা প্রকাশ—রুশ্ সর্বহারা যেন এতই দুর্বল যে তাদের নিরাপত্তার জন্য বাইরের সাম্যবাদী রাষ্ট্রের সাহায্যের দরকার! স্তালিনের এই বিশেষ যুক্তিটি কার্যতঃ রুশ্‌দের কাছে ট্রট্স্কির নীতিকে বেশ অপ্রিয় করে তোলে।

(৩) রুশ্ সর্বহারারা আত্মরক্ষায় সমর্থ

অনেকের সন্দেহ যে, লেনিনের পর সোবিয়েত রাশিয়ায় নেতৃত্ব দখলের জন্য সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রট্স্কিকে রুশ জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই স্তালিনের এই দ্বন্দ্ব— তা তাত্ত্বিক নয়, ক্ষমতা দখলের। ট্রট্স্কির জীবনীকার আইজাক ডয়েট্শারের (Isaac Deutscher) তাই আক্ষেপ—ডন্ কুইক্জোটের (Don Quixote) মত ঐ লোকটিকে "অদ্ভুত লোক" বলে সরিয়ে দেওয়া হল ("odd man out")। ১৯২৭ সালে স্তালিন্ তাঁকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করেন ও দু বছর বাদে নির্বাসিত করেন। নির্মম ও রহস্যজনকভাবে, ডয়েট্শারের ভাষায়, এই "ধ্রুপদী মার্কস্বাদী" ("Classical Marxist") নিহত হন।

স্তালিন-ট্রট্স্কি দ্বন্দ্ব ক্ষমতা-দখলের দ্বন্দ্ব, ট্রট্স্কি ধ্রুপদী মার্কস্বাদী (ডয়েট্শার)

কট্টর স্তালিন্পন্থীরা অবশ্য বলেন যে, ট্রট্স্কি ছিলেন "শোধনবাদী প্রতিবিপ্লবী" (Revisionist counter-revolutionary)। তাই স্তালিন্ তাঁর প্রতি এই কঠোরতা দেখিয়েছিলেন।

স্তালিন্পন্থীদের বক্তব্য

(খ) **স্তালিন্ বনাম টিটো :** ট্রট্স্কির সংগে দ্বন্দ্বের পর থেকেই স্তালিন্ ধীরে ধীরে পার্টিকে সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করেন। বুখারিন্, কামানেভ্ (Kamanev) প্রভৃতি তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের তিনি ধীরে ধীরে নেতৃত্বের সারি থেকে সরিয়ে দিলেন। প্রতিবিপ্লবী ও শোধনবাদী শত্রুদের দণ্ড দেবার নামে তিনি কঠোরভাবে "বিশুদ্ধিকরণ" (Purges) নীতি গ্রহণ করেন। বহু নেতা ও কর্মীকে হত্যা করা হল। হিট্লারের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য "লৌহমানব" স্তালিন্ অপূর্ব ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার সংগে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়া আক্রমণ হিট্লারের অবিবেচনার চরম নিদর্শন। হিট্লারের পরাজয়ের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও স্তালিন্ তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় দেন।

লৌহমানব স্তালিনের কঠোরতা, ২য় বিশ্বযুদ্ধে রুশের জয়লাভ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই স্তালিন্ ঘুরে ফিরে ট্রট্স্কির নীতির দিকেই ঝুঁকতে লাগলেন। তাই তিনি "সমাজতান্ত্রিক অবরোধ নীতি" ("Policy of socialist encirclement") অনুসরণ করতে লাগলেন। ১৯৪৯ সালে সমাজতন্ত্রী চীনের অভ্যুত্থানের পর থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে কম্যুনিজ্মের সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্তালিনের নেতৃত্বে পোল্যাণ্ড, হাংগেরী প্রভৃতি পূর্ব ইউরোপীয় সাম্যবাদী দেশগুলিকে নিয়ে সোবিয়েত জোট গড়ে উঠল। কিন্তু দীর্ঘদিন স্তালিনের সংগে কমিন্ফর্মের (Cominform বা Communist Information) সহযোগী হয়েও যুগোশ্লাভিয়ার সাম্যবাদী নেতা মার্শাল টিটো (Marshall Josip Broz Tito ১৮৯২—১৯৮১) রুশ্ জোটে যোগ দিতে চাইলেন না।

কিন্তু স্তালিন্ ঘুরে ফিরে ট্রট্স্কির নীতিই গ্রহণ করেন : যুদ্ধোত্তরকালে সোবিয়েত জোট গঠন

টিটোর সঙ্গে স্তালিনের দ্বন্দ্বের মূল কারণ শুধু দুজনের ব্যক্তিত্বের সংঘাত নয়,

নীতির সংঘাতও এর সঙ্গে জড়িত। স্তালিন্ পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে সোবিয়েত জোটে যোগ দেবার সময় বলেন যে, ঐ রাষ্ট্রগুলির বামপন্থী সরকার গঠনে সোবিয়েত সরকার সাহায্য করবে, তবে তাতে যোগ দেবে না। কিন্তু ধীরে ধীরে সেখানে রুশ্ প্রভাব প্রচণ্ডভাবে বিস্তৃত হতে লাগল। টিটো এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন ও সেজন্য তিনি রুশ্ জোটে যোগ দেন নি। ফলে তিনি ও তাঁর সমাজতন্ত্রী দল কমিন্‌ফর্ম থেকে বিতাড়িত হন। স্তালিন্-টিটো অন্তর্দ্বন্দ্ব মার্ক্‌স্, লেনিন্ ও ট্রট্‌স্কির বিশ্বসাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার আদর্শকে অনেকটা ম্লান করে দিয়েছে এবং মার্কিন ও রুশ্ এ দুটি জোটের বাইরে "তৃতীয় বিশ্ব" ("Third World") এবং নির্জোট আন্দোলনের (Non-alignment with Power Blocs) আবির্ভাবকে নির্মম, বাস্তব সত্যে পরিণত করেছে। পৃথিবীর সাম্যবাদী আন্দোলনও এজন্য বেশ ধাক্কা খেয়েছে।

স্তালিন্-টিটো দ্বন্দ্বনীতিগত ঃ এর পরিণতি

॥ মার্ক্‌স্‌বাদ-লেনিন্‌বাদের ব্যাখ্যাকারগণ ঃ মাও সে তুং, হো চি মিন্॥

(ক) মাও সে তুং এর বক্তব্য ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই সাম্যবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের সংঘর্ষের ফলে চীনে গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। জাপান চীন আক্রমণ করার পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে চীনের দুপক্ষই সমবেতভাবে দেশের সাধারণ শত্রুর, অর্থাৎ জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজী হন। সাম্যবাদীদের নেতা ছিলেন মাও সে তুং বা মাও ঝে ডং (Mao-tse Tung বা Mao Zedong) (১৮৯৩-১৯৭৬)। জাতীয়তাবাদীদের নেতা ছিলেন চিয়াং কাই শেক (Chiang Kai Shek)। মাও ও চিয়াং দুজনেই "এশিয়ার মুক্তিসূর্য," চীনের নবজাগরণের নেতা, ডাক্তার সান্-ইয়াৎ সেনের (Sun yat Sen) দুই জামাই। কিন্তু নীতিগতভাবে দুজনে বিরোধী ছিলেন। শেষে ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর চীনে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, পরাজিত চিয়াং ফরমোজা বা তাইপেতে আশ্রয় নেন।

সাম্যবাদী চীনের জন্ম (১লা অক্টোবর, ১৯৪৯)

মার্ক্‌স্‌বাদী-লেনিন্‌বাদী আঙ্গিক অনুসরণ করে মাও ১৯২১ সালে সাংহাই শহরে চীনা কম্যুনিস্ট্ পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তিনি এই দলের পলিট্‌ব্যুরোর (Politbureau অর্থাৎ Political Bureau বা রাজনৈতিক বিভাগের) চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ধনী কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি পার্টির জন্য, তাঁর আদর্শের জন্য অপরিসীম আত্মত্যাগ স্বীকার করেন। তিনি বারবার বন্দী হন, বার-বার আত্মগোপন করেন। ধীরে ধীরে তিনি জনগণের মধ্যে সাম্যবাদী প্রচার চালিয়ে যান। পার্টির একাংশকে শক্তিশালী সংগ্রামী গণ-ফৌজরূপে, অর্থাৎ লাল ফৌজরূপে সুগঠিত করে তোলা হয়। আকস্মিক গেরিলা যুদ্ধের (Guerilla War) কায়দায় আচম্‌কা শত্রুপক্ষকে খতমের অভিযান পরিচালনা করে মাও বিশাল চীনের বিভিন্ন অঞ্চলকে ক্রমে মুক্ত অঞ্চলে

মাও সে তুং এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ গেরিলা খতম অভিযান ও হুনান্ কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব (১৯২৬)

অর্থাৎ সাম্যবাদী ঘাঁটিরূপে গড়ে তোলেন। ১৯২৬ সালে হুনান কৃষক আন্দোলনের সুযোগ্য নেতারূপে মাও খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। এ বছরই কৃষকসংগ্রাম, সাম্যবাদী মতাদর্শ, পার্টি, ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন ভাষণের মধ্যে ও পত্রপুস্তিকায় তাঁর মৌলিক সাম্যবাদী চিন্তাধারা প্রকাশ করেন।

মহাচীনের সাম্যবাদী মহাবিপ্লবের অধিনায়করূপে মাও এর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁর নেতৃত্বে সুদীর্ঘ পথপরিক্রমার (Long March) কর্মসূচী।

সুদীর্ঘ পথপরিক্রমা ("লং মার্চ"), ১৬ই মার্চ, ১৯৩৪

১৯৩৪ সালের ১৬ই মার্চ কিয়াংশি অঞ্চলে মাওবাদী ও জাতীয়তাবাদী দুই দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ প্রবল সংঘর্ষের রূপ ধারণ করে। সরকারী সাহায্যপুষ্ট জাতীয়তাবাদী-গণের দ্বারা বহু বিপ্লবী নিহত হন। মাওবাহিনী কৌশলে গোপনে দক্ষিণ কিয়াংসি অঞ্চলে সরে আসে। ফলে চতুর্থ দিনেই মাও এর জয় সূচিত হয়। তখন দক্ষিণ ও পশ্চিম কিয়াংসির মুক্ত অঞ্চল থেকে প্রায় ১ লক্ষ গণসংগ্রামী নিয়ে মাও বিজয় মিছিল শুরু করেন। এ দীর্ঘ পথপরিক্রমার ফলে ১১টি এলাকার ২০ কোটি ব্যক্তির কাছে মাও নিজে তাঁর পার্টির সেনাপতি চু তে ও অন্যান্য সহকর্মীদের সংগে নিয়ে সাম্যবাদী বৈপ্লবিক জয়যাত্রার বাণী পেঁছে দিলেন।

সাময়িকভাবে জাতীয়তাবাদী সরকারের সংগে সহযোগিতা করে জাপানকে হঠালেও

সাম্যবাদী চীনা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা (১লা অক্টোবর, ১৯৪৯)

মাও চীনের অভ্যন্তরে গোপনে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সম্প্রসারণের উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছিলেন। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর তাঁর পক্ষে চীনে বিপ্লব সম্পূর্ণ ও সফল করতে কোন অসুবিধাই হল না। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর মাওয়ের নেতৃত্বে সাম্যবাদী চীনা প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল। পরদিনই সোবিয়েত রাশিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া এই সরকারকে স্বীকৃতি দিলেন।

মাও সে তুংয়ের সাম্যবাদী চিন্তা দুটি ধারায় প্রবাহিত। একটি হল মার্কসবাদী-

মাও-এর তত্ত্ব

লেনিনবাদী হিসাবে তাঁর মতামত; অন্যটি তাঁর নিজস্ব, মৌলিক চিন্তাধারা।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অনেকগুলি নীতি মাও গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ, তিনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের শুধু সমর্থক নন, ব্যাখ্যাকারও। বস্তুর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি মাও এর সমর্থন ঃ
(১) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

পরিবর্তনধর্মিতার কারণ হিসাবে তিনি এই দ্বন্দ্বকে ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বন্দ্ব এই পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করে। উদাহরণ দিয়ে মাও বলেন যে, প্রয়োজনীয় বিশেষ অবস্থা থাকার জন্য ডিম মুর্গীর ছানায় রূপান্তরিত হয়, পাথরের টুকরোর ক্ষেত্রে তা হয় না। মার্কস ও লেনিনের মতই মাও আধিবিদ্যক (metaphysical) পরিবর্তনরূপে দ্বন্দ্বের হেগেলীয় সংজ্ঞা গ্রহণ করেন নি। মার্কসের, বিশেষতঃ লেনিনের মত অনুসরণ করে মাও বলেন যে দ্বন্দ্ব সার্বিক।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কস ও লেনিনের বস্তুবাদ মাও সম্পূর্ণভাবে মেনে নেন। তিনি সমস্ত অমূর্ততার (abstraction) বিরোধী ছিলেন। তাই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রূপে তিনি বলেন—বুর্জোয়া বা প্রোলেতারিয়ত কোন আত্ম-আবদ্ধ শ্রেণী (class-in-itseif) নয়, তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক অগ্রগতির বা পশ্চাদ্‌গতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মাও প্রচার করেন যে, প্রকৃতি ও সমাজ পরস্পর-যুক্ত।

(২) বস্তুবাদ

তৃতীয়তঃ, মার্কস ও লেনিনের মত মাও ঐতিহাসিক স্তরভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাসকে সমর্থন করেছেন। স্মরণীয় যে, সাম্যবাদী বিপ্লবের পূর্ব মুহূর্তে রাশিয়া ও চীনের অবস্থা ছিল আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ধনতান্ত্রিক। তবে কৃষিপ্রধান চীনে সামন্ততন্ত্রের প্রভাবই বেশী ছিল। ঊর্ধ্ব না থাকলে নিম্ন হয় না। অর্থনৈতিক কাঠামোকে তাই মাও ভিত্তি (Base) এবং বাকী সব কিছুকে বহিরঙ্গ (Superstructure) বলেছেন। এ ক্ষেত্রে মার্কস ও লেনিনের মতও অনুরূপ।

(৩) শ্রেণীবিন্যাস ঐতিহাসিক স্তরভিত্তিক

চতুর্থতঃ, মার্কস ও লেনিনের মত মাও উগ্র বামচিন্তা (UltraiLeftism), সংশোধনবাদ (Revisionism), আত্মচিন্তনমুখীনতা (Subjectivism), অর্ধক্রিয়াতত্ত্ব (Putschism) প্রভৃতি ছদ্ম-বুর্জোয়া ঝোঁকের বিরুদ্ধে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এগুলিকে লেনিন "শিশুসুলভ হঠকারিতা" বলে অভিহিত করেন ও এগুলি পরিহার করতে নির্দেশ দেন।

(৪) ছদ্মবুর্জোয়া ঝোঁকের বিরোধিতা

পঞ্চমতঃ, লেনিনের মতই মাও কম্যুনিস্ট আন্দোলনে সুশৃংখল, সাম্যবাদে দীক্ষিত, সংঘবদ্ধ পার্টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি লেনিনের "অগ্রগামী বাহিনী তত্ত্ব," "পুরঃস্থিতিতত্ত্ব" (Vanguard theory) শুধু সমর্থন করেন নি, তার সর্বাত্মক ভূমিকাকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

(৫) পার্টি সর্বাত্মক

ষষ্ঠতঃ, মাও লেনিনের "প্রাক্সিস" তত্ত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তার সঙ্গে রণনীতি ও রণকৌশলের সংযুক্তি আবশ্যক। মাওয়ের চিরস্মরণীয় উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। "রণনীতি ও রণকৌশল যদি সঠিক হয়, তবে একটি স্ফুলিংগই বৈপ্লবিক পটভূমিকার বারুদের স্তূপে বিরাট দাবানল সৃষ্টি করবে।" মাও বলেছেন—ক্ষেত্রবিশেষে প্রাক্সিস তাত্ত্বিক জ্ঞানের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

(৬) প্রাক্সিস তত্ত্ব সমর্থন

মাওয়ের নিজস্ব সাম্যবাদী ও বৈপ্লবিক চিন্তাও অত্যন্ত চমকপ্রদ। প্রথমতঃ, বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়ত শ্রেণীদ্বয়ের চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে তিনি মার্কস ও লেনিনের বক্তব্যকে আরও বাস্তবমুখী করেন। এই দুটি শ্রেণীর প্রত্যেকটির মধ্যেই কতকগুলি উপ-শ্রেণী আছে। ১৯২৬ সালের সুবিখ্যাত হুনান কৃষক আন্দোলন সম্পর্কিত

মাওয়ের নিজস্ব, মৌলিক চিন্তাধারা ঃ (১) শ্রেণীচিহ্নিত-করণের সূচক নির্ণয় ঃ বুর্জোয়া, প্রোলেতারিয়েত প্রত্যেকটির মধ্যে অসংখ্য উপশ্রেণী, তাদের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন

ইস্তাহারে তিনি বলেন যে, দুটি বিরোধী শ্রেণী ও মধ্যবর্তী উপ-শ্রেণীগুলি নিয়ে সমকালীন চীনের জনসমষ্টির মধ্যে ছিল পূর্ণ বুর্জোয়া জমিদার ও "কম্প্রাডোর" (মুৎসুদ্দি বা দালাল সওদাগর), মাঝারি বুর্জোয়া, পেতিবুর্জোয়া, আধা-প্রোলেতারিয়েত, পূর্ণ প্রোলেতারিয়েত ও লুম্পেন সম্প্রদায়। মধ্যস্বত্ব-ভোগীগণ মাঝারি বুর্জোয়ার অন্তর্গত; নিম্ন ধাপের বুদ্ধিজীবী ও কারিগর পেতিবুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্গত; গরীব কৃষক, দোকানদার, ফেরিওয়ালারা আধা-প্রোলেতারিয়েতের অন্তর্গত; চীনের সে সময়কার ২০ লক্ষ শিল্পশ্রমিক পূর্ণ প্রোলেতারিয়েতের অন্তর্গত; আর লুম্পেনদের মধ্যে ছিল বাউন্ডুলে, অসংবদ্ধ বিরাট জনসমষ্টি। মাওয়ের মতে পূর্ণ বুর্জোয়ারাই প্রোলেতারিয়েতের প্রকৃত শ্রেণীশত্রু। এদের বিরুদ্ধেই পূর্ণ প্রোলেতারিয়েত তার অন্তর্গত অন্য উপশ্রেণীগুলির সাহায্যে সাম্যবাদী বিপ্লব গড়ে তুলবে।

(২) পার্টি সম্বন্ধে মাও স্তালিনবাদী

দ্বিতীয়তঃ, পার্টি সম্বন্ধে লেনিনীয় তত্ত্বকে মাও আরও তাৎপর্যপূর্ণ করেন। এ ক্ষেত্রে মাও প্রায় স্তালিনবাদী। পার্টি প্রচারক, শিক্ষক ও বিপ্লবের ধাত্রী। পার্টির ভূমিকা সর্বাত্মক। এর অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসাবে মাও বলেন যে, (ক) পার্টি যেন তার একাংশকে গণফৌজে রূপান্তরিত করে; (খ) পার্টি পাহারাদার হিসাবে কাজ করবে, যাতে বুর্জোয়াদের ও অন্য প্রতিবিপ্লবীদের অনুপ্রবেশ সে রুখতে পারে; (গ) ধনী ও মধ্যবর্তী কৃষক, এমন-কি লুম্পেনদের একাংশকেও বুঝিয়ে বিপ্লবমুখী করে তোলা পার্টির কাজ। তবেই ত পার্টি যথার্থ সাম্যবাদী বিপ্লবের "অগ্রগামী বাহিনী" হয়ে উঠতে পারে।

(৩) গণরণকৌশল ঃ গেরিলা-যুদ্ধ ; স্থানিক, চলমান যুদ্ধ, শ্রেণীশত্রু নির্মূলীকরণের সর্বাত্মক খতম অভিযান ঃ পার্টির একাংশের গণফৌজে রূপান্তর

তৃতীয়তঃ, মাও-এর নিজস্ব মতবাদ বলতে বোঝায় গেরিলাযুদ্ধের মতবাদ (guerilla war)। অনেকে বলেন যে, তিনি এ ক্ষেত্রে লেনিনের "প্রাক্সিস্" তত্ত্বকে আরও বিপ্লবধর্মী করেন। গেরিলাযুদ্ধ বলতে মাও যে রণকৌশল বুঝিয়েছেন, তার মধ্যে পড়ে শত্রুপক্ষের "পরিবেষ্টন ও অবদমনের" বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা, শত্রুকে প্রলুব্ধ, প্ররোচিত করে লড়াইয়ের গভীর স্তরে টেনে এনে, বাধা দেবার কোন সুযোগ না দিয়ে তাকে আক্রমণ, প্রয়োজনমত পশ্চাদপসরণ, সাময়িকভাবে আক্রমণ না করা, আবার সময় বুঝে পাল্টা আক্রমণ হানা। সমস্ত রণক্ষেত্রে যুদ্ধ না-চালানোর দূরদর্শিতার ওপরও মাও গুরুত্ব দিয়েছেন। তার মানে এ নয় যে, মাও স্থানিক যুদ্ধ (positional war) সমর্থন করেন। তিনি চাইছেন—চলমান যুদ্ধ, বুর্জোয়া শত্রুপক্ষের নির্মূলীকরণের যুদ্ধ, এক কথায় সর্বাত্মক খতম অভিযান। পার্টির একাংশকে এজন্য গণফৌজরূপে গড়তে হবে। অতর্কিতে শত্রুকে আক্রমণ করে যুদ্ধ করার স্পেনীয় কায়দাই গেরিলা-

যুদ্ধ নামে পরিচিত। মাও এই যুদ্ধকে সুসংহত গণসংগ্রামে পরিণত করতে চান। এ সংগ্রামে বেসামরিকদেরও পার্টি মারফত সামিল করে তুলতে হবে।

চতুর্থতঃ, মাওয়ের যুদ্ধনীতির ব্যাখ্যা শুনে কেউ যাতে তাঁকে নৃশংস, অমানবিক বলে মনে না করেন, সেজন্য মাওবাদীরা তাঁর অসংহতিতত্ত্বের (Contradictions) উল্লেখ করেন। সাম্যবাদী সমাজ একঘেয়ে, একপেশে চিন্তাধারা সৃষ্টি করে—এ প্রবণতাকে প্রশ্রয় না দেবার জন্য মাও বলেন যে, প্রকৃত সাম্যবাদী সমাজে নানা বর্ণের শত কুসুমশোভিত উদ্যানের শোভার মত নানা মত থাকা আবশ্যক ("Let a hundred flowers blossom, let a hundred schools of thought contend.")। কোন গোঁড়ামিকে মাও প্রশ্রয় দিতে চান নি। আলোচনা, সমালোচনা ও পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর তিনি জোর দেন। তবে সাম্যবাদবিরোধী, শোধনবাদী চিন্তাধারা (Revisionism), নাশকতামূলক প্রচেষ্টা (sabotage) বা শৈল্পিক অবক্ষয় তিনি পার্টিকে সহ্য করতে বারণ করেন। অনেকে বলেন যে, তাঁর এই সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করেই ১৯৫৮-৫৯ সাল থেকে চীনে "সাংস্কৃতিক বিপ্লব" (Cultural Revolution) ঘটেছিল।

(৪) অসংহতিতত্ত্ব

সব শেষে সাম্যবাদী বিপ্লবের সাফল্যের শর্তগুলি মাও নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট করে দেন। এগুলি হল—(ক) গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তা প্রসারের জন্য ব্যাপক গণশিক্ষা, (খ) সাম্যবাদী আন্দোলনে সকলকে সামিল করে তাকে সর্বাত্মক করে তোলা, (গ) পার্টিকে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক অর্থে প্রকৃত "অগ্রগামী বাহিনী" রূপে গড়ে তোলা, (ঘ) পার্টির একাংশকে গণফৌজে রূপান্তরিত করা ও তাকে লাল ফৌজের (Red Army) সহযোগী করে তোলা।

উপসংহার : সাম্যবাদী বিপ্লবের সাফল্যের শর্ত

(খ) হো চি মিন্-এর বক্তব্য :

হো চি মিন্ (১৮৯০—১৯৬৯) প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফরাসী কম্যুনিস্ট্ পার্টি ও ভিয়েতনামের শ্রমিক দলের প্রতিষ্ঠাতারূপে বিখ্যাত। মধ্য ভিয়েতনামের হিমু লিউ গ্রামে দরিদ্র কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। বিপ্লবী নেতারূপে আত্মগোপন করার সময় তাঁর ছদ্মনাম ছিল "হো চি মিন্।" ছদ্মবেশ ধারণে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ ছিল। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গোপনে আন্দোলন চালাবার সময় জাহাজের নাবিক ও পাচক, সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার, খবরের কাগজের হকার রূপে নানা বিচিত্র কাজে তিনি বিপ্লবী ও মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীরূপে দেশবিদেশ ভ্রমণ করেন। ফরাসী কম্যুনিস্ট্‌দলের (French Communist Party) তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর দুদিন পরে তিনি মস্কো আসেন। সান্ ইয়াৎ সেনের প্রিয়পাত্র হো হংকং এ আসার পর কারারুদ্ধ হন এবং সেখান থেকে পালিয়ে যান। ফরাসী ঔপনিবেশিকতা থেকে ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামের ও সমাজতন্ত্রী ভিয়েতনাম

হো চি মিন্-এর পরিচিতি

গঠনের জন্য তিনি গুপ্ত সংগঠনকে শক্তিশালী করে তোলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চীনে চিয়াং কাই শেকের আমলে কারাগারে ও ফরাসী সরকারের কারাগারে বন্দীরূপে দীর্ঘকাল তিনি নির্যাতন সহ্য করেন। চীনে চৌদ্দ মাস জেল খাটার পর ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মুক্ত হন। ঐ সময়ে মাও-এর অনুকরণে গেরিলা-যুদ্ধ চালিয়ে তিনি ভিয়েতনামের ৬টি এলাকাকে মুক্ত অঞ্চল করে তোলেন, ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে স্বাধীন সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

হো মার্ক্‌স্‌ ও লেনিনের সমর্থক

হো চি মিন্‌ ছিলেন খাঁটি মার্ক্‌স্‌বাদী ও লেনিন্‌পন্থী। লেনিনের মৃত্যুর পরে সোবিয়েত সরকারী পত্রিকা "প্রাভ্‌দা"য় (Pravda) লেনিনের স্মৃতির উদ্দেশে তাঁর যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়, তার শেষ পঙ্‌ক্তিতে তিনি লেখেন—"আমাদের কাজের মধ্যে লেনিন্‌ চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন" ("Eternal Lenin will live for ever in our work·")।

হো লেনিন্‌বাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন

লেনিন্‌বাদের যে দিকগুলি সাংবাদিক ও বক্তারূপে হো তুলে ধরেন, তা হল লেনিনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সাম্যবাদী বক্তব্য। স্বদেশ আনাম (বর্তমান ভিয়েতনাম) ছাড়াও আল্‌জিরিয়া, মরক্কো, তিউনিস্‌ প্রভৃতি অঞ্চলগুলিকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে শোষণ করেছে, সেখানকার অধিবাসীদের ওপর কিভাবে বর্বরোচিত, নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে, তার তাৎপর্য বুঝতে ও বোঝাতে হো লেনিন্‌বাদের সাহায্য নেন। তাঁর মতে, লেনিন্‌বাদই যে-কোন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের মুক্তিসংগ্রামের ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একমাত্র পথপ্রদর্শক।

॥ মার্ক্‌স্‌বাদ-লেনিন্‌বাদের অতি-আধুনিক ব্যাখ্যা ॥

মার্ক্‌স্‌বাদ-লেনিন্‌বাদের অতি-আধুনিক ব্যাখ্যা: (১) ইউরো-কম্যুনিজ্‌ম্‌, (২) নব্য বামপন্থা

সোবিয়েত রাশিয়াতে ১৯১৭ সালে ও চীনে ১৯৪৯ সালে মার্ক্‌স্‌বাদী-লেনিন্‌বাদী আদর্শের ওপর ভিত্তি করে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বর্তমান শতাব্দীকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। কিন্তু বর্তমান যুগ থেমে নেই। নানা মতের, নানা পথের ঘাত-প্রতিঘাত এ-যুগকে শুধু চলমান বিবর্তমান করে রেখেছে, তাই নয়। এ সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এ-যুগের যন্ত্রণা, অশান্তি, অস্থিরতাকে বিমূর্ত করে তুলেছে। মার্ক্‌স্‌বাদ-লেনিন্‌বাদের নতুন নতুন ব্যাখ্যার সঙ্গে কোন কোন ব্যাখ্যাকার মার্ক্‌সীয়-লেনিনীয় মতাদর্শকে অবলম্বন করে নব্য বামপন্থা (New Leftism) নির্দেশের চেষ্টা করেছেন। এই অতি-আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে মার্ক্‌স্‌বাদ-লেনিন্‌বাদের অনুষঙ্গরূপে দুটি বিশেষ মতবাদকে চিহ্নিত করা যায়। একটি হল ইউরোকম্যুনিজ্‌ম্‌ (Euro-communism), অপরটি·

নব্যবামপন্থা (New Leftism)। এ দুটি অতি-আধুনিক মতবাদের মধ্যে তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতার (sophistication) বা পদ্ধতিগত বৈচিত্র্যের (application) পার্থক্য রয়েছে। আবার এ দুটির মধ্যে কিছু কিছু মৌলিক মিলও লক্ষণীয়।

॥ ইউরোমকম্যুনিজম্ ॥

ইতালীর কম্যুনিস্ট্ নেতা বের্লিঙ্গার (Berlinguer) সর্বপ্রথম ১৯৭৬ সালে পূর্ব বের্লিনে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় কম্যুনিস্ট্ দলগুলির সম্মেলনে "ইউরোকম্যুনিজম্" (Euro-communism) কথাটি ব্যবহার করেন। তারপর ইতালি, ফ্রান্স্ ও স্পেনের কম্যুনিস্ট্ নেতাগণ ১৯৭৭ সালের মাদ্রিদ্ শীর্ষ সম্মেলনে ইউরোকম্যুনিজমের বৈশিষ্ট্যগুলি স্বীকার করে নেন। প্রথমতঃ, সোবিয়েত নেতৃত্বের বাইরে বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের কম্যুনিস্ট্ দলগুলির মধ্যে একটা সহাবস্থিতি গড়ে তোলা। দ্বিতীয়তঃ, কম্যুনিস্ট্ দেশগুলিতে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেওয়া। তৃতীয়তঃ, সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের প্রসঙ্গে "সর্বহারা" কথাটির ব্যাখ্যার আধুনিকীকরণ। চতুর্থতঃ, বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রগুলির সংগেও প্রয়োজনমত সহযোগিতা করা। পঞ্চমতঃ, সমস্ত সমধর্মী বাম ও অন্য শক্তিগুলিকে একত্রিত করা। ষষ্ঠতঃ, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে সাহায্য করা।

ইউরোকম্যুনিজমের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

ইউরোকম্যুনিজমের আদর্শের **প্রধান সমর্থকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য** হলেন—যুগোশ্লাভিয়ার **মিলোভান্ জিলাস্** (Milovan Djilas), ইতালির বের্লিঙ্গার, ফ্রান্সের মার্শাই (Marchais) এবং স্পেনের সান্তিয়াগো কারিল্লো (Santiago Carrillo)। এঁদের মধ্যে তত্ত্বগতভাবে স্পেনের কম্যুনিস্ট্গণ কারিল্লোর দ্বারা প্রভাবিত, ইতালির কম্যুনিস্ট্গণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই লোকান্তরিত আন্তনিও গ্রামস্চির দ্বারা প্রভাবিত।

এই মতের প্রধান সমর্থক : গ্রামস্চি ও সান্তিয়াগো কারিল্লো

আন্তনিও গ্রামস্চির (১৮৯১—১৯৩৭) তাত্ত্বিক বক্তব্য ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচের (Croce) সমষ্টিবাদের (Collectivism) দ্বারা প্রভাবিত। ইতালীতে ফাসিস্ত্ মুসোলিনীর কারাগারে বন্দী অবস্থায় লিখিত বিবরণীর ("Prison Diaries") মধ্যে গ্রামস্চির মতামত সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ, তিনি মার্ক্সীয় আদর্শের বিরুদ্ধে গিয়ে "অর্থনৈতিকতার" ("Economism") পরিবর্তে "রাজনীতিকতার" ("Politicism") ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এদিক থেকে তিনি লেনিন্পন্থী। কারণ, দুজনেই পার্টির ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, গ্রামস্চি সবচেয়ে বেশী।

গ্রামস্চির পরিচিতি ও মতাদর্শ : (১) "রাজনীতিকতা" বেশী গুরুত্বপূর্ণ

দ্বিতীয়তঃ, গ্রামস্চি ইতালির তুরিন্ শহরে প্রথম সমাজতন্ত্রী দল স্থাপন করেন এবং ১৯২৬ সালে গ্রেপ্তার হন। ১৯২৪ সালে মুসোলিনীর অভ্যুত্থানের পরে ইতালীতে

যে শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট চলে, তার নেতৃত্বে তিনি ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি ছোট ছোট কল-কারখানায় শ্রমিক সঙ্ঘ (Factory-Council) গড়ে তোলেন। তাঁর ধারণা, এভাবেই শ্রমিক-আন্দোলনকে সুগঠিত করে, বুদ্ধিজীবী ও জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে সমাজতন্ত্রী দলের সাহায্যে বিপ্লব ঘটানো যায়। তাই তিনি পার্টিকে শুধু নীচু স্তরের সংগ্রামীদের (Sub-altern Class) নিয়ে গঠিত না করে সমাজের সর্বস্তরের ব্যক্তিদের নিয়ে পার্টিকে গড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।

(২) পার্টির ওপর গুরুত্বদান

তৃতীয়তঃ, কর্তৃত্ব (Hegemony) সম্পর্কেও গ্রামস্‌চির বক্তব্য মৌলিক। কর্তৃত্ব দেবেন সকলেই। বুদ্ধিজীবীরা (Intellectuals) প্রোলেতারিয়তকে শিক্ষিত করে তুলবেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মার্কস্‌বাদীদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন—মার্কসীয় বা অনুরূপ বৈপ্লবিক তত্ত্ব ছাড়াই বিপ্লব ঘটানো যায় কিনা। গ্রামস্‌চি মনে করেন—যায়। কারণ, বৈপ্লবিক পরিবেশ থাকলে শ্রবিকদের বলিষ্ঠ অ-তাত্ত্বিক সাধারণ জ্ঞানই (Non-theoretical commonsense) তাদের পার্টি গড়তে প্রবৃত্ত করবে, পার্টির আন্দোলনকে বিপ্লবে পরিণত করবে।

(৩) "কর্তৃত্বের" ব্যাখ্যা ঃ
এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

অনেকে গ্রামস্‌চির তত্ত্বকে ছদ্ম-গণসমাজতন্ত্রী (Pseudo-Social Democracy) বলে গণ্য করেন। কারণ, তিনি বুদ্ধিজীবীদের ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর গুরুত্বকে লঘু করেছেন।

গ্রাম স্‌চির মতের সমালোচনা ঃ
(১) তিনি কি
ছদ্ম-গণসমাজতন্ত্রী ?

দ্বিতীয়তঃ, তাঁর মতে, বলিষ্ঠ সাধারণ জ্ঞানই বিপ্লবের মতাদর্শ হতে পারে। তা যদি হয়, তা হলে সেই জ্ঞান সত্যিই "বলিষ্ঠ" কিনা, তা জানার কোন উপায় তিনি বলেন নি—সবটাই পটভূমি ও পরিস্থিতির ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর আদর্শ বিকৃতরূপে বিপ্লবের নামে হঠকারিতা সৃষ্টি করতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে, তাঁর মতবাদের মধ্যে শ্রমিকদের প্রতি, শোষিতদের প্রতি তাঁর আন্তরিক দরদ, সুগভীর ভালোবাসা ফুটে উঠলেও মার্কস্‌-বাদ-লেনিনবাদের ব্যাকরণ থেকে তিনি অনেকখানি বিচ্যুত।

(২) বলিষ্ঠ সাধারণ জ্ঞান
বিপ্লবচেতনা নাও
হতে পারে

সান্তিয়াগো কারিল্লো (১৯১৬—) স্পেনের এক দরিদ্র শ্রমিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মতে, প্রথমতঃ ধনতন্ত্রকে যেমন গণতন্ত্রের সঙ্গে সমার্থক মনে করা ভুল, তেমনি, সোবিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্রকে প্রকৃত গণতন্ত্র বলা ভুল। তাই, ইউরোপীয় কম্যুনিজম্‌কে তিনি মার্কিন ও সোবিয়েত দুটি জোট থেকে নিরপেক্ষ রাখতে চান। এ ক্ষেত্রে তিনি যুগোশ্লাভিয়ার ইউরোকম্যুনিস্ট্‌ জিলাসের দ্বারা প্রভাবিত।

সান্তিয়াগো কারিল্লোর জীবনী ও
মত ঃ (১) সোবিয়েত রাশিয়া
প্রকৃত গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র
নয় ; ইউরো-কম্যুনিজম্‌কে
সোবিয়েত-নিরপেক্ষ করার
পক্ষে যুক্তি

দ্বিতীয়তঃ, কারিল্লো বলেছেন যে, সাম্যবাদী আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত করার ক্ষেত্রে সোবিয়েত রাশিয়া ব্যর্থ। ১৮৬৪ সালে, ১৮৮৫ সালে ও ১৯১৯ সালে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিক (সাম্যবাদী) সম্মেলন (Communist International বা Comintern) স্থাপিত হয়। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই শেষ সম্মেলন ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং তা পুনরায় আহূত হয় নি। ফলে, সোবিয়েত রাশিয়া আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের বদলে এক ধরনের জাতীয় সমাজতন্ত্র সমর্থন করে চলেছে। তাই, ইউরো-কম্যুনিজমের অন্যতম দাবী হিসেবে এই মতবাদের সমর্থক রাষ্ট্রগুলির মতগত স্বাধীনতা (Ideological autonomy) কারিল্লো সমর্থন করেন।

(২) ইউরোকম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলির মতগত স্বাধীনতা চাই

তৃতীয়তঃ, কারিল্লো মনে করেন যে, ইউরো-কম্যুনিজমের মাধ্যমে নতুন ধরনের সমাজতন্ত্রবাদ (New Socialism) প্রতিষ্ঠা করা যায়। যেমন—কৃষকদের জমি বিতরণ না করে সমবায়ী অথবা সমষ্টিভিত্তিক খামার (Co-operative Collective Farms) স্থাপন করা সহজতর।

(৩) সমবায়ের মত বিকল্প পদ্ধতিও গ্রহণযোগ্য

চতুর্থতঃ, "স্পেন প্রসঙ্গে" ("Dialogue on Spain") গ্রন্থে কারিল্লো বলেন যে, মার্ক্স ও লেনিনের পর থেকে রাষ্ট্রের চেহারার পরিবর্তন ঘটেছে। রাষ্ট্র বলতে এখন শুধু আরক্ষা ও প্রতিরক্ষা বাহিনী বোঝায় না। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে "একচেটিয়া পুঁজি" ("monopoly capitalism") ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ব্যাপকভাবে সরকারী প্রচারমাধ্যমগুলি এমনভাবে কাজ করে চলে যে, ধনতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। কোন মার্ক্সবাদী যদি এই সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির গুরুত্ব না বোঝেন, তা হলে তিনি মার্ক্সবাদের সিদ্ধান্তগুলি শুধু হাল্কা করে দেখবেন ("If a Marxist does not see this difference, then that is because he does nothing but chew over formulas.")। স্পেন ও পর্তুগালে এ ধরনের "রাজনৈতিক পুলিশের" ("political police") তৎপরতা আছে। স্পেনের গণতান্ত্রিক মোর্চা (Democratic Junta), ক্যাথলিক সম্প্রদায় ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যে কিছু ঐক্যের কথাবার্তা মাঝে মাঝে চালালেও কারিল্লো আশাবাদী নন।

মার্ক্স ও লেনিনের সময়ের "রাষ্ট্রের" চেহারা বদলেছে: স্পেনের নজির

তবুও কারিল্লো গণতান্ত্রিক পথে সমাজবাদী ঐক্য (Socialist Popular Front) স্থাপনে ("to advocate a democratic road to socialism") উৎসাহী। সেজন্য তিনি সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দলগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে চান। ইউরো-কম্যুনিজম প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ১৯৭৬ সালে এ-বিষয়ে কারিল্লোর বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর সোবিয়েত রাশিয়াতে তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল ও ছদ্মগণসমাজতন্ত্রী বলে বর্ণনা করা হয়। এর পাল্টা জবাবে কারিল্লো বলেন যে, পশ্চিমী বুর্জোয়া গণতন্ত্র এত জটিল ব্যবস্থা যে, আধুনিক পরিবর্তিত পটভূমিকায় ধ্রুপদী মার্ক্সবাদ-

ইউরোকম্যুনিজম সোবিয়েত রাশিয়া স্বীকার করে না

লেনিনবাদের যুক্তিগুলিকে অনমনীয়ভাবে প্রয়োগ করে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ত দূরের কথা, সংস্কার সাধনও সহজ নয়।

॥ মার্ক্সবাদ ও অ্যাক্সনধর্মী নব্য বামপন্থা : এর্নেষ্টো ("চে") গুয়েভারা ও রেজিস্ দেব্রের "অ্যাকসন্" তত্ত্ব ॥

নব্য বামপন্থী : গুয়েভারা ও দেব্রে

নব্য বামপন্থীদের মধ্যে মার্ক্সবাদকে যাঁরা বিপ্লবতত্ত্বরূপে তাঁদের কার্যপদ্ধতির বা "অ্যাকসনের" (Action) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন এর্নেস্টো ("চে") গুয়েভারা (Ernesto "Che" Guevara) এবং রেজিস দেব্রে (Regis Debray)।

দুজনের পরিচিতি

চে গুয়েভারা (১৯২৮—১৯৬৭) কিউবাতে উগ্র সাম্যবাদী বিপ্লব সফল করে সেখানে ফিদেল কাস্ত্রোকে (Fidel Castro) সাম্যবাদী সরকারের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর রেজিস দেব্রেকে (১৯২৯—) বলিভিয়াতে অনুরূপ আন্দোলনের সাহায্যে সমাজতন্ত্রী বিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করতে গিয়ে আততায়ীর হাতে নিহত হন। বলিভিয়াতে আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

দুজনের মতবাদের বৈশিষ্ট্য (১) ছাত্র ও লুম্পেনদেরও গেরিলা গণযুদ্ধের সামিল করতে হবে

চে ও রেজিস দুজনেই "প্রোলেতারিয়ত" শ্রেণীর মধ্যে কৃষক, শ্রমিক ছাড়া লুম্পেন (বা বাউণ্ডুলে) এবং ছাত্রদের সংযুক্ত করেন। দেব্রে কিউবায় শ্রমিকদের চেয়ে ছাত্র ও কৃষকদের ভূমিকাকে বড় করে দেখেন। তা ছাড়া তাঁরা মাও-এর গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্বকে বৈপ্লবিক রণনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন।

(২) ধনতন্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী

দ্বিতীয়তঃ, কিউবাতে মানুষের জীবনধারা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ("Man and Socialism in Cuba") চে বলেছেন যে, ধনতন্ত্র শ্রমিককে কর্মক্লান্ত, নীতিবিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ করে তোলে। এই বিচ্ছিন্নতা (Alienation) রোধের জন্যও তিনি ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ চান।

(৩) বিপ্লব নিষ্ঠুর, অমানবিক নয়

তৃতীয়তঃ, চের মতে, বৈপ্লবিক হিংস্রতা অমানবিক নিষ্ঠুরতা নয়। বিপ্লব অগণিত সর্বহারাদের দুর্দশামোচনের জন্য মানবতাবোধের উচ্চতম আদর্শের প্রতীক এবং মার্ক্সবাদী আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বলপ্রয়োগ সমর্থনযোগ্য। লেনিন বলেন যে, বলপ্রয়োগ বিপ্লবের ধাত্রী ("Force is the midwife of revolutions")।

॥ মার্ক্সবাদের অন্য অতি-আধুনিক ব্যাখ্যা ॥

মার্ক্সবাদ জনগণকে ভাবিয়ে তুলেছে, ভাবিয়ে তুলছে, ভাবিয়ে তুলবে

মার্ক্সবাদ এমন একটা ব্যাপক ও বিস্তৃত মতাদর্শ, যা নানা দিক থেকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ১৮৮৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পর থেকে বহু ব্যাখ্যাকার তাঁর মতবাদকে মৌলিক যুক্তিতর্কের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে, মার্ক্স সম্বন্ধে কৌতূহল অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, মার্ক্সবাদ নানা দেশের অগণিত ব্যক্তিকে ভাবিয়ে তুলেছে, ভাবিয়ে তুলছে ও তুলবে।

(ক) গেওর্গ্ লুকাক্স্ (Georg Luka'cs) (১৮৮৫—১৯৭১) একজন প্রখ্যাত হাঙ্গেরীয় মার্ক্স্বাদী দার্শনিক। তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট্ সম্প্রদায়ের (Frankfurt School) একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ফিশ্টের (Fichte) ইতিহাসদর্শন সমর্থন করেন। অর্থাৎ, তিনি জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় মানমর্যাদার ক্ষেত্রে ইতিহাসের প্রভাবকে স্বীকার করেন। কিন্তু পরে তিনি কান্ট্ ও হেগেলের বিশ্বজনীন (Cosmopolitan) ঐতিহাসিক চিন্তাধারাকে সঠিক বলে গ্রহণ করেন। তারপর তিনি মার্ক্স্বাদে বিশ্বাসী হন। তিনি মার্ক্স্বাদের সঙ্গে হেগেল্বাদের একটা সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করেন।

(ক) গেওর্গ্ লুকাক্স্ হেগেলের সামগ্রিকতার তত্ত্বের সঙ্গে মার্ক্স্বাদের সমন্বয়ের চেষ্টা করেন

লুকাক্স্ বলেছেন যে, মার্ক্স্ই হেগেলের সামগ্রিকতার তত্ত্বকে (Concept of Totality) সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। কারণ, মার্ক্স্ হেগেলীয় অর্থে সর্বহারা প্রোলেতারিয়তকে একমাত্র "সমগ্র" (the universal class) বলে গণ্য করেছেন। বুর্জোয়া শ্রেণী একটি অংশমাত্র। সমগ্রের অর্থাৎ সর্বহারার সঙ্গে তার কেবল একটা আংশিক সম্পর্ক আছে। এই দিকটিকে লুকাক্স্ মার্ক্স্বাদের অজ্ঞাত পরিক্রমা ("the unknown dimension of Marxism") বলে বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসের তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেও ("the theory of the Novel") মার্ক্স্বাদী ব্যাখ্যার দ্বারা লুকাক্স্ বলেছেন যে, সমগ্রই শিল্প বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটায় ("The primacy of the category of Totality is the bearer of the principle of Revolution in science and art.")।

(খ) কার্ল্ কর্ষ্ (Karl Korsch) (১৮৮৯—১৯৬১) "নব্য মার্ক্স্বাদী" রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। লুকাক্সের মত তিনিও মার্ক্স্বাদ্ সম্পর্কে তাঁর তিনটি বিখ্যাত প্রবন্ধে ("Three Essays on Marxism") হেগেলকে সমর্থন করে বলেন যে, মানুষের চেতনা অর্থনৈতিক পটভূমি (Base) এবং বহিরঙ্গ (Superstructure) রচনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করলেও অন্য প্রভাবও ("other factors") সৃষ্টি করে থাকে। কর্ষ্ মার্ক্সের "মূলধন" ("Das Kapital") গ্রন্থের একটি অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেখানে মার্ক্স্ স্বীকার করেন যে, আদিম সাম্যবাদী সমাজে (Primitive Communism) অর্থনৈতিক ছাড়া অন্য প্রভাবের কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যেত। কর্ষ্ মার্ক্সের "লুই নাপোলিয়ঁর অষ্টাদশ ব্রুমেয়ারের" ("Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte") গ্রন্থের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্মরণীয় যে, ফরাসী বিপ্লবীদের দিনপঞ্জীর দ্বিতীয় মাসে ব্রুমেয়ারের ১৮ তারিখে (অর্থাৎ, ১৭৯৯ সালের ৯ই নভেম্বর) নাপোলিয়ঁ ফ্রান্সের প্রথম কনসাল রূপে তাঁর ব্যক্তিগত স্বৈরতন্ত্র চালু করেন। মার্ক্স্ এই তারিখটিকে উপলক্ষ করে নাপোলিয়ঁর ভ্রাতুষ্পুত্র লুই বোনাপার্তের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকার রহস্য ভেদ করেন। লুই

(খ) হেগেল্পন্থী কার্ল্ কর্ষ্ বলেন—মার্ক্স্ "অর্থনৈতিক" ছাড়া অন্য প্রভাবের কথাও স্বীকার করেছেন

দুর্নীতি ও স্বৈরতার জন্য অপ্রিয় হলেও কৃষকদের ওপর আমলাদের বিভ্রান্তিকর প্রভাবের ফলে সে সময়ে কৃষকদের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হন। এই আপাত-অঘটনের ব্যাখ্যা দিয়ে মার্ক্স বলেন যে, অর্থনীতি ছাড়াও আমলাতান্ত্রিক (অর্থাৎ রাজনৈতিক) প্রভাব বুর্জোয়া শ্রেণীকে সাময়িকভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রেখে দিতে পারে।

(গ) **হার্বার্ট মার্কুস** (Herbert Marcuse) (১৮৯৮—১৯৭৯) লুকাক্সের মত ফ্রাঙ্কফুর্ট সম্প্রদায়ের দার্শনিক। ব্যক্তিজীবনের ওপর যৌনতার (Libido) প্রভাব এবং অবদমিত অতৃপ্তির দরুন লোকভয়, পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল প্রভৃতির অমিত প্রভাব ব্যাখ্যা করে জিগমুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) (১৮৫৬—১৯৩৯) মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি নতুন দৃষ্টিকোণ উন্মোচিত করেন। মার্কুস ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সংগে মার্ক্সবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। "সভ্যতার ওপর যৌনতার প্রভাব" ("Eros and Civilisation") নামক তাঁর গ্রন্থ ও ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণকে (Psychoanalysis) কেন্দ্র করে তাঁর প্রবন্ধগুলি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ফলে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সঙ্গে তিনি সামাজিক অনুষংগকে (social environment) যুক্ত করেন।

(গ হার্বার্ট মার্কুসের মতবাদ—(১) মার্কুস মার্ক্সবাদের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা করেন

দ্বিতীয়তঃ, মার্কুস মার্ক্সের বিপ্লবাত্মক বলপ্রয়োগ নীতি সমর্থন করেন। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজে বিচ্ছিন্নতাবাদ (Alienation) সম্পর্কে মার্ক্সীয় তত্ত্ব তিনি সমর্থন করেন নি। মার্ক্স বলেন যে, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকের শ্রমজাত উৎপাদন পুঁজিপতিগণ আত্মসাৎ করে ও তা থেকে তাদের বঞ্চিত করে নিজেরা সেই উৎপাদনের মূল্যের পরিমাণ "উদ্বৃত্ত মূল্য" (Surplus Value) রূপে ভোগ করে। ফলে, ধনতন্ত্রে শ্রমিকগণ তাঁদের শ্রমের ফল প্রাপ্তির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে ব্যক্তিগত নিঃসংগতার ও শ্রেণীগত বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে পড়েন। মার্ক্সের সময়ের তুলনায় বর্তমান সময়ের ধনতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে, বিচ্ছিন্নতাবাদ সম্পর্কে মার্ক্সীয় ধ্রুপদী তত্ত্ব মার্কুস গ্রহণ করেন নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত ধনতন্ত্রে বিচ্ছিন্নতা এমন একটি ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার ঝোঁক, যা ফ্রয়েডের "অবদমিত অতৃপ্তি তত্ত্বের" দ্বারাই কেবল ব্যাখ্যা করা যায়। এ-সব উন্নত ধনতন্ত্রে শ্রমিকের "মৌলিক চাহিদার" (real needs) বদলে সৃষ্টি হচ্ছে বেশী বেশী কেনাকাটার জন্য একটা কৃত্রিম প্রতিযোগিতা ("artificial consumer needs")। মার্কুস এই অস্বাস্থ্যকর, কৃত্রিম, কেনাকাটার প্রতিযোগিতার নাম দিয়েছেন "ক্রয়োচ্ছ্বাস" ("Consumerism")। প্রতিবেশী আরেকটি নতুন গাড়ী কেনার পর একটিমাত্র গাড়ীর মালিক আরেকটি কেনেন। একজন ক্রেতা নতুন মডেলের গাড়ী কিনলে প্রতিবেশীও তাই করতে ছোটেন। ফলে, মার্কুস বলেন—

(২) মার্কুসের বিচ্ছিন্নতাবাদের ব্যাখ্যা: মার্কিনী বা অনুরূপ উন্নত ধনতন্ত্রে "ক্রয়োচ্ছ্বাস", প্রোলেতারিয়েতের একাংশের বুর্জোয়াদের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি

ব্যক্তি নিজের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিবেশীর কৃত্রিম আচার-আচরণের, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির শিকার হন। তাঁর মতে, ধনতন্ত্রী সমাজে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা এজন্যই। এর ফলেই মার্কিন ধনতন্ত্রের মত উন্নত অবস্থাতেও ব্যক্তি পায় প্রাচুর্য, পায় না মর্যাদা ("there is affluence without dignity.")। ধনতন্ত্র এভাবেই নিছক একটা আর্থিক লেন-দেনের বন্দোবস্ত ("the cash nexus") হয়ে পড়ে। ব্যক্তির অমানবত্ব (dehumanisation) ঘটে। প্রোলেতারিয়ত শ্রেণীর একাংশও এভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্গত ("emobourgeoisified") হয়ে পড়ে। এই অদ্ভুত শ্রেণীবিন্যাসের ফলে উন্নত প্রোলেতারিয়ত শ্রেণীর ("aristocracy of labour) প্রতিবিপ্লবী হয়ে যাবার সম্ভাবনাও প্রবল। মার্কুস্ তাই হিপীদের (Hippies) মত বেকার, বাউণ্ডুলে লুম্পেনদের ("drop-outs") শিক্ষিত করে তাদের সাহায্যে প্রোলেতারিয়ত শ্রেণীকে প্রসারিত করে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন চালাতে উপদেশ দিয়েছেন।

(ঘ) **এরিখ্ ফ্রোম্** (Erich Fromm) (১৯০০—১৯৮০) ফ্রাঙ্কফুর্ট সম্প্রদায়ের অর্থনীতিবিদ্ ও মনোবিজ্ঞানী। তিনিও ফ্রয়েডের মতবাদের সাহায্যে মার্ক্সবাদের ব্যাখ্যা করেন এবং মার্কুসের মত তিনিও ব্যক্তির আচরণের ওপর পারিপার্শ্বিকের অর্থাৎ সামাজিকতার প্রভাব স্বীকার করেন। ধনতন্ত্র কিভাবে শ্রমিকের শ্রমকে "পণ্যে" (commodity) পরিণত করে, তার উত্তরে মার্ক্সের বক্তব্যকে ফ্রোম্ আরো পরিস্ফুট করেন। "মার্ক্সের মানবতাবাদ" ("Marx's concept of Man") শীর্ষক গ্রন্থে তিনি শ্রমিকের অধঃপতন ঘটানোর জন্য মার্ক্সের মতই ধনতন্ত্রকে দায়ী করেন। তবে এ সমস্যার মার্ক্সীয় সমাধানের বদলে তিনি ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতির ওপরই তাঁর আস্থা প্রকাশ করেন।

(ঘ) এরিখ্ ফ্রোম্ : ফ্রয়েডীয় মার্ক্সবাদী : "শ্রম" কিভাবে "পণ্যে" রূপান্তরিত ?—ফ্রোমের ব্যাখ্যা

(ঙ) **জাঁ পল্ সার্ত্র্** (Jean-Paul Sartre) (১৯০৫—১৯৮০) আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও দার্শনিক। তাঁকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলেও তিনি ব্যক্তিগত কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি অস্তিত্ববাদের (Existentialism) প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকাররূপে পরিচিত এবং এর সাহায্যে মার্ক্সবাদের ব্যাখ্যা করেন। সংক্ষেপে অস্তিত্ববাদের বক্তব্য হল—বস্তুর অস্তিত্ব তার অস্তিত্বের ধারণার পূর্বগামী। সার্ত্রের মতে, মার্ক্সবাদ গ্রাহ্য ; কারণ, মার্ক্স তাঁর নিজের ভাবনাচিন্তার বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর অস্তিত্বকে একটা মতাদর্শে পরিণত করেছেন ("Marx's philosophy is authentic, because he reduced his own existentialism to the status of an ideology.")।

(ঙ) জাঁ-পল্ সার্ত্র্ : অস্তিত্ববাদ

সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ অনুসারে ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে তার নিজের অধীন। ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ ("single universal" বা "singu-

larly lived unit")। এই সত্তাকে তার নিজের অস্তিত্ব প্রকাশে বাধা দেওয়া উচিত নয়। সার্ত্র সমাজের ওপর মার্ক্সের গুরুত্ব আরোপকে যেমন সঠিক মনে করেন, হেগেলের মত চৈতন্যের ওপর অর্থাৎ ভাবগত চিন্তনের ওপর গুরুত্ব-দেওয়াকেও সেভাবে সঠিক মনে করেন। সুতরাং সার্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতা সমর্থন করেন এবং বলপূর্বক ব্যক্তিস্বাধীনতা রোধের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পাল্টা বলপ্রয়োগকেও সমর্থন করেন। এই কারণেই তিনি শ্রমিক, কৃষক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ছাত্রদেরও মিলিত অভিযান সংগঠনের জন্য মার্ক্সীয় প্রোলেতারিয়ত তত্ত্বের সম্প্রসারণের ওপর জোর দেন। ১৯৬৮ সালের মে মাসে প্যারিস্ শহরে সরকারের বিরুদ্ধে কয়েকদিনব্যাপী যে বিরাট ছাত্রবিক্ষোভ দেখা দেয়, সার্ত্র তাকে সমর্থন করেন। তবে সুশৃঙ্খল ছাত্রবিক্ষোভ শেষে উগ্রপন্থী দাঙ্গায় পরিণত হতে পারে, তা তিনি কল্পনা করেন নি।

সার্ত্র মার্ক্সবাদের অস্তিত্ববাদী ব্যাখ্যা করেন; তাঁর মতে ছাত্ররাও প্রোলেতারিয়তের অন্তর্ভুক্ত

সার্ত্র ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিসত্তার শৃঙ্খল বিমোচনের উদ্দেশ্যে মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁর ধারণা, এর ফলে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ দূর হবে। ভিয়েতনামে মার্কিন হস্তক্ষেপের ও মার্কিন সৈন্যদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হন।

মার্ক্সবাদ ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা-বোধ দূর করবে

(চ) **থিয়োডোর আডর্নো** (Thedor Adorno) (১৯০৩—১৯৬৯) ফ্রাঙ্ক্‌-ফুর্ট্ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের অন্যতম। তাঁর মতে, মানব-সভ্যতার ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ("individualisation of civilisation") বাঞ্ছনীয় নয়। হেগেলীয় আদর্শ অনুসারে তিনি সভ্যতাকে একটা অখণ্ড জীবনপ্রবাহ বলে ব্যাখ্যা করেন। তিনি মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় থেকে প্রয়োজনীয়কে বাছাইএর জন্য তাকে একটি নেতিবাচক পদ্ধতি ("Negative Dialectics") রূপে তিনি ব্যাখ্যা করেন। এই কারণে আডর্নোর মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যাকে গোঁড়া মার্ক্সবাদীগণ অ-মার্ক্সীয় বলে মনে করেন।

(চ) হেগেলপন্থী থিয়োডোর আডর্নো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে বিশেষ "অ-মার্ক্সীয়" অর্থে সমর্থন করেন

অনুরূপভাবে, লেনিনের প্রাক্সিস্ সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যাকেও অ-লেনিনীয় বলে অনেকে গণ্য করেন। তাঁর মতে, প্রাক্সিস্ লেনিনের কল্পিত শুধু একটা স্বয়ংক্রিয় প্রোলেতারীয় প্রয়োগ পদ্ধতি নয়। এটা হল একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, যা শ্রেণীনির্ভর বা সমাজনির্ভর নয়, সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিনির্ভর।

প্রাক্সিস্ সম্পর্কেও তাঁর "অ-লেনিনীয়" ব্যাখ্যা

(ছ) **লুই আল্‌থুস্যার** (Louis Althusser) (১৯১৯—) অতি-আধুনিক যুগের একজন বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক। তিনি মার্ক্স্ এবং লেনিন্ সম্পর্কে তাঁর যে মতামত প্রকাশ করেন, সেগুলি, এবং সেগুলি সম্পর্কে কাল্লিনিকসের (Callinicos) টীকা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

(ছ) লুই আল্‌থুস্যারের পরিচিতি

অ্যালথুস্যার, ফ্রাঙ্কফুর্ট্ সম্প্রদায়ের অন্যান্য দার্শনিকদের মত হেগেলীয় দর্শনের ও মার্কসবাদের সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। মার্কসবাদকে "বিশুদ্ধ বিজ্ঞান" (Pure Science) রূপে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর মতে, জ্ঞানরাজ্যের প্রহরী রূপে বিজ্ঞানের মধ্যে অ-বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা হল দর্শনের ভূমিকা ("Philosophy is the gate-keeper of Science.")। অর্থাৎ, মতাদর্শ (Ideology) থেকে দর্শন বিজ্ঞানকে মুক্ত করে রাখবে। তাঁর কথায়, মতাদর্শ হল "পুনর্বিম্বিত প্রতিচ্ছবি" ("camera obscura"), আসল রূপের প্রকাশ নয়। সুতরাং, আলথুস্যারের মতে, "জার্মান আদর্শবাদ ("German Ideology") সম্পর্কে গ্রন্থ লেখার পর থেকে মার্কস্ যা কিছু লেখেন, সেগুলিই প্রকৃত অর্থে মার্কস্‌বিজ্ঞান (Marxian Science), তার আগেকার রচনাগুলি "বিজ্ঞান" নয়।

আলথুস্যার হেগেল ও মার্কসের মতের সমন্বয়ের চেষ্টা করেন : মার্কস বিজ্ঞানের শুদ্ধিকরণের প্রচেষ্টা

কাল্লিনিকস্ বলেছেন যে, আলথুস্যারের মার্কসবাদের এ ব্যাখ্যা সঠিক নয় বলে অনেকের ধারণা। প্রথমতঃ, বৈজ্ঞানিকতা (Scientificity) সম্পর্কে বিচারের ভার কার ওপর থাকবে, তা নিয়ে মতদ্বৈধতা থাকতে পারে।

আল্ থুস্যারের ব্যাখ্যার সমালোচনা : (১) বৈজ্ঞানিকতা নির্ণয় কঠিন

দ্বিতীয়তঃ, মার্কসবাদীরা (Marxiologists) বলতে পারেন যে, মার্কস্ "বিজ্ঞান" এবং "মতাদর্শ"—এ দুটির মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নির্দেশ করেন নি। মার্কস্ যখন হেগেলপন্থী ছিলেন, তখন তাঁর "অর্থনৈতিক ও দার্শনিক প্রবন্ধাবলীর" ("Economic and Philosophical Manuscripts") মধ্যে এক স্থানে লিখেছেন যে, "শ্রেণীকে" (Class) যদি বিজ্ঞানসম্মত বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে "বিজ্ঞান" এবং "মতাদর্শ"—দুটিকেই "বিজ্ঞান" বলা যায়, কারণ, দুটিরই উৎস হল "শ্রেণী"।

(২) মার্কস্ "বিজ্ঞান" ও "মতাদর্শের" মধ্যে পার্থক্য দেখান নি : দুটিরই উৎস "শ্রেণী"

(জ) **লেস্‌জেক্ কোলাকাউস্কি** (Leszek Kolakowski) (১৯১০—) পোল্যান্ডের একজন প্রখ্যাত দার্শনিক। "মার্কসীয় দর্শনের অতিক্রান্তি" ("Marxism and Beyond") সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, কাণ্টীয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক দর্শনের ভিত্তিতেই মার্কসবাদকে সমষ্টিতন্ত্রের অতিমাত্রিকতার ঝোঁক থেকে মুক্ত করা যায়। কারণ, কাণ্ট্ ব্যক্তিকে আত্মসর্বস্ব (Individual as an end in himself) বলে ব্যক্তির আত্মিক মূল্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

(জ) মার্কসবাদ ব্যক্তিকেন্দ্রিক : লেস্‌জেক্ কোলাকাউস্কি

॥ অ্যাক্‌সনধর্মী নব্য বামপন্থা ও উল্লিখিত অতি-আধুনিক ব্যাখ্যাগুলি কি মার্ক্সীয় ? ॥

সোবিয়েত মার্কসবাদীগণ যে অর্থে ইউরোকমু্যনিজ্‌মকে "প্রতিক্রিয়াশীল" বলে ব্যাখ্যা করেছেন, সেভাবেই তাঁরা নব্য বামপন্থা এবং অতি-আধুনিক, বিশেষতঃ,

ফ্রাংকফুর্ট সম্প্রদায়ের নব্য-মার্কসবাদী ব্যাখ্যাকে "অ-মার্কসবাদী" বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের কারুর কারুর মতে, এ ব্যাখ্যাগুলির অনেকগুলি "সুন্দর, কিন্তু অনুপযোগী খেলনা" ("beautiful, but useless toys")। কিন্তু, অন্য অনেকে এই ব্যাখ্যাগুলির, বিশেষতঃ, মাও, মার্কুস, গুয়েভারা, গ্রামসচি প্রভৃতির বক্তব্যের মধ্যে কিছু কিছু সারকথা খুঁজে পান। সেদিক থেকে চিন্তা করলে এগুলিকে মার্কসবাদের সম্প্রসারণ ও চলমান জগতের প্রগতির সঙ্গে তাকে গতিশীল করে তোলার প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। যে-কোন মতবাদের মত মার্কসবাদও আপেক্ষিক।

শুদ্ধপন্থী মার্কসবাদীগণ স্বীকার না করলেও নব্য বামপন্থার বেশ কিছু মার্কসবাদকে প্রগতিশীল করে রাখবে

॥ গণসমাজতন্ত্র ॥

ডগলাস্ জে (Douglas Jay) গণসমাজতন্ত্রের (Democratic Socialism)। যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় যে, এই মতবাদ এমন একটি আদর্শ, যার দ্বারা ব্যক্তিবর্গের দারিদ্র্য দূর করা যায় এবং মানবজাতির সুখ বৃদ্ধি করা যায় ("Democratic Socialism...... is the best cure for poverty and the best method of furthering the happiness of the human race.")। আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে সামাজিক মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি, ইতিহাস এবং রাজনীতির সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে আন্তর্বিভাগীয় পদ্ধতির (Interdisciplinary method) সাহায্যে যোগসূত্র স্থাপন করে গণসমাজতন্ত্র উদারনৈতিকতা এবং মার্কসবাদের মধ্যবর্তী যেন একটা তৃতীয় বিকল্প মতাদর্শরূপে গড়ে উঠেছে।

গণসমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা : গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয় (ডগলাস্ জে ও ডার্বিন্)

প্রখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিবিদ্ ডার্বিন্ (E. F. M. Durbin) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে ("The Politics of Democratic Socialism : An Essay on Social Policy") গণসমাজতন্ত্র সম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তার শুরুতে তিনি এই মতাদর্শের দুটি প্রধান অঙ্গের উল্লেখ করেছেন। তাদের একটি হল গণতন্ত্র (Democracy), অপরটি সমাজতন্ত্র (Socialism)। অর্থাৎ, গণসমাজতন্ত্র এমন একটা মতাদর্শ, যার তাত্ত্বিক ও ফলিত, দুটি ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র বর্তমান যুগের এই দুটি প্রধান মতবাদের সাহায্য লাগে। অতএব, ডার্বিনের মত গণসমাজতন্ত্রবাদীগণ গণসমাজতন্ত্রকে একটা সমন্বিত মতাদর্শ (synthetic concept) বলে গণ্য করেন।

ডার্বিনের ব্যাখ্যা

ডার্বিন্ গণসমাজতন্ত্রের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের একটা কার্যকর সন্নিবেশ রচনার চেষ্টা গণসমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়। গণতন্ত্রের, অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—সরকার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের

শাসিতের কাছে শাসকের দায়িত্ব ও সাম্য—দুটি আদর্শের দুটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়

দ্বারা গঠিত আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে। সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল - উৎপাদনের বণ্টনের ক্ষেত্রে সাম্য, অর্থনৈতিক, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ। সুতরাং, ডার্বিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী **গণতন্ত্রের দায়িত্বশীলতা এবং সমাজতন্ত্রের সাম্য—এই দুটি নীতি নিয়ে গণসমাজতন্ত্র।**

ডার্বিন: প্রথমে সমাজতন্ত্রবাদীগণ ধনতন্ত্রের যে সমালোচনা করেন, সেগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমতঃ, বলা হয় যে, ধনতন্ত্র যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন করে পুঁজিপতিদের হাতে অনেক বাড়তি অর্থ জমা করে। মার্কসের "উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব" (Theory of Surplus Value) এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পুঁজিপতিদের একচেটিয়া ব্যবসার রাজত্ব একচ্ছত্র, এবং তাঁদের শক্তি ক্রমবর্ধমান (Capitalism is expansionist.)।

ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের বক্তব্য : (১) মার্কসীয় উদ্বৃত্তমূল্যতত্ত্ব

দ্বিতীয়তঃ, বর্ধিষ্ণু পুঁজিপতিগণ তাঁদের বাড়তি অর্থ নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে ব্যবহার করেন। সংবাদপত্র প্রভৃতি প্রচারমাধ্যম, রাজনৈতিক দল প্রভৃতি সংগঠন এবং নির্বাচন প্রভৃতি গণপ্রশাসনিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য তাঁরা অজস্র অর্থ ব্যয় করেন। ফলে, গড়ে ওঠে তাঁদের কায়েমী স্বার্থ (vested interests)।

(২ কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি

তৃতীয়তঃ, ধনতন্ত্রের আমলে শ্রমিকদের মজুরি ক্রমহ্রাসমান। পুঁজিপতিগণের অবাধ শোষণের ফলে, শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্য "উদ্বৃত্ত মূল্য" থেকে ক্রমাগত বঞ্চিত হতে হতে শ্রমিকগণ ক্রমশঃ ন্যূনতম দারিদ্র্য-সীমার নীচে পতিত হন।

(৩) মজুরির ক্রমহ্রাসমানতা

সমাজতন্ত্রবাদীদের এই তিনটি সমালোচনার বিরুদ্ধে ডার্বিন: জবাব দিয়েছেন এবং আরও কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন। প্রথমতঃ, তিনি বলেন যে, ধনতন্ত্র বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণীর হাতে বাড়তি অর্থ জমা করলেও সমাজতন্ত্রবাদীদের যুক্তি অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত তার ফলে ধনিক শ্রেণীর আত্মহত্যাই সূচিত হয়। কোন শ্রেণী এভাবে ঠাণ্ডা মাথায় নিজের হত্যাকে পাকাপাকি ব্যবস্থারূপে মেনে নিতে চান না, যেমন, কোনও ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আত্মঘাতী হতে চান না।

এগুলির বিরুদ্ধে ডার্বিনের বক্তব্য : (১) মানুষ ঠাণ্ডা মাথায় শোষণের কথা ভাবে না

দ্বিতীয়তঃ ডার্বিনের মতে, শ্রমিকদের মজুরি ধনতন্ত্রে ক্রমশঃ কমতে থাকে, এ-রকম ধারণা ভুল। তিনি মনে করেন যে, তুলনামূলকভাবে এবং চরমভাবে জনগণের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির মধ্যে ("between relative and absolute movements in the standard of living") পার্থক্য নির্ণয় করতে সমাজতন্ত্রবাদীগণ সমর্থ হন নি। জনগণের স্বাচ্ছন্দ্যের মান দেশ, কাল ভেদে নিতান্তই আপেক্ষিক।

(২) ধনতন্ত্রে শ্রমিকদের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে

তৃতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রবাদীগণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকদের মজুরি কম হবার বিরুদ্ধে যে বিপদসংকেত সম্বন্ধে সচেতন করেছিলেন, বাস্তবক্ষেত্রে তার কোন অস্তিত্ব নেই। শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস পায় নি, বরং বৃদ্ধি পাবার মুখে।

(৩) মজুরিও বাড়ে

চতুর্থতঃ, মার্ক্‌স্‌ আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের নতুন ধরনের ভূমিকাগুলি উপেক্ষা করেছেন। ডার্বিনের মতে, পুঁজিপতিরা বর্তমানে তিন রকম ভূমিকা পালন করেন—পরিচালক (Director) রূপে, পুঁজি সরবরাহকারী (Rentier) রূপে এবং প্রাতিষ্ঠানিক অধিনায়ক (Manager) রূপে। এই তিন রকম দায়িত্ব বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের হাতে অর্পিত হলেও পুঁজিপতিদের চতুর্থ ভূমিকা থাকে সংযোগরক্ষক সংগঠক (Co-ordinator) রূপে। এই ভূমিকাগুলি পালনের কোন কোন ক্ষেত্রে পুঁজিপতিগণের সঙ্গে শ্রমিকগণও জড়িত থাকে।

(৪) বর্তমানে পুঁজিপতিদের ভূমিকা মার্ক্সীয় ব্যাখ্যানুগ নয়

পঞ্চমতঃ, মার্ক্‌স্‌বাদীদের মতে, একমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটে। ডার্বিন্‌ এই যুক্তিটিকে একপেশে এবং অতিমাত্রিক বলেছেন। ব্যাপারটা এত সরল, সহজ নয়। এই প্রসঙ্গে ডার্বিন্‌ একটা মজার ছড়ার উল্লেখ করেছেন। ছড়াটিতে কষ্ট-কল্পনার দ্বারা জুতার একটি পেরেক হারানোকেই শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ বলে ধরা হয়েছে!

(৫) অর্থনৈতিক কারণই একমাত্র কারণ নয়: "পেরেক হারানো ছড়া"

"পেরেক হারালো, তাই জুতোও হারাল,
জুতোর অভাবে ঘোড়াও অকেজো হল,
ঘোড়ার অভাবে সহিসের কাজ রইল না,
সহিসের অভাবে যুদ্ধে হারতে হল,
যুদ্ধে হারার দরুন হার চূড়ান্ত হল,
হার চূড়ান্ত হবার জন্য সাম্রাজ্য হাতছাড়া হল,
তাই পেরেক হারালো—সবই হারালো।"

("For the sake of a nail the shoe was lost
For the sake of the shoe the horse was lost
For the sake of the horse the rider was lost
For the sake of the rider the battle was lost
For the sake of the battle the war was lost
For the sake of the war the kingdom was lost
So all was lost for the loss of a nail")।

ষষ্ঠতঃ, ডার্বিনের মতে, মার্ক্‌স্‌ সামাজিক পরিবর্তনের কার্য-কারণ সম্পর্ক যেভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন, তার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির বা শ্রেণীর

পক্ষে অপরকে বঞ্চনা বা শোষণের প্রবৃত্তিকে যদি স্বাভাবিক, অতএব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলে ধরা হয়, তাহলে তা হবে রীতিমত অযৌক্তিক। কারণ, ডার্বিন্‌ বলেন, যান্ত্রিকভাবে এরকম আত্মসাৎকারী স্বয়ংক্রিয় জীবরূপে (robot-like) মানুষকে ধরে নিলে সামাজিক মনোবিজ্ঞানের বা সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের মানসিকতাকে নিতান্ত বিকৃত বলে মনে করা হয়। মানুষের মধ্যে সামাজিকতা স্বাভাবিক, সহজাত প্রবৃত্তি।

(৬) মানুষের একাংশকে স্বাভাবিকভাবে শোষক ধরে নেওয়ার অর্থ মানুষের সহজাত সামাজিকতাকে অস্বীকার করা

সপ্তমতঃ, ডার্বিনের মতে মার্ক্সবাদ ধরে নেয় যে, ব্যক্তি সচেতনভাবে, যুক্তিনির্ভর হয়েই পরান্নহরণকারী (man is rationally acquisitive)। কিন্তু এই যুক্তির বিরোধিতা করে ডার্বিন্‌ বলেন যে, ইতিহাসের সমস্ত ঘটনা এরকম গাণিতিক যুক্তিতর্কের দ্বারা নির্ধারিত হয় না ("All forces which control the forces of history are not by any means exclusively rational.")।

(৭) "মানুষ স্বভাবতঃই পরান্নহরণকারী" বলা ঠিক নয়

অষ্টমতঃ, ডার্বিন্‌ মার্ক্সবাদীদের ভবিষ্যদ্বক্তার ভূমিকাকে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে, মার্ক্স ও এঙ্গেলসের যুগ্ম প্রচেষ্টায় লিখিত "সাম্যবাদী ইস্তাহারে" ("Communist Manifesto") এ ধরনের এমন একটা অতি-নাটকীয় ভবিষ্যদ্বাণী করার ঝোঁক রয়েছে, যাকে ধর্মীয় গোঁড়ামির পর্যায়ে ফেলা যায় ("Witness the dogmatism of the Manifesto······the history of all hitherto existing society is the history of class struggle.")।

(৮) মার্ক্সবাদের ভবিষ্যদ্বক্তার ভূমিকা ধর্মীয় গোঁড়ামির তুল্য

নবমতঃ, ডার্বিন্‌ মনে করেন যে, সাম্যবাদী রাষ্ট্রে কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রী দল ছাড়া অন্য দলের অস্তিত্ব স্বীকার না করার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে একাধিক সম্ভাব্য রাজনৈতিক দল থাকার সুফল থেকে শ্রমিকগণ বঞ্চিত হন। ("There is no conceivable reason why the Communist Party should deny to the working class a choice between working class Parties.")।

(৯) সমাজতন্ত্রী দেশে বহু দল থাকবে না কেন?

দশমতঃ, ১৯৩৫ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সমিতির সপ্তম বিশ্বসভায় (Seventh World Congress of the Third International, 1935), হিটলারের হামলা রুখবার জন্য সর্বপ্রথম মার্ক্সবাদীগণ "বুর্জোয়া" গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারলেন। ডার্বিন্‌ বলেন যে, এর পূর্বে মার্ক্সবাদীগণ এ দুটিকে এক বলে কল্পনা করেছিলেন, যদিও এ দুটির মধ্যে আকারগত এবং প্রকারগত, উভয় প্রকার পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(১০) "বুর্জোয়া" গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

মার্ক্সের এবং মার্ক্সবাদীদের যুক্তিগুলি খণ্ডন করে ডার্বিন্ গণসমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। তিনি কাউট্স্কির (Kautsky) গ্রন্থের ("The Dictatorship of the Proletariat") একটি উদ্ধৃতি সমর্থন করে বলেন যে, গণতন্ত্র ছাড়া প্রকৃত সমাজতন্ত্র স্থাপন করা যায় না ("No Socialism without Democracy.")।

তাই গণতন্ত্র ছাড়া সমাজতন্ত্র হয় না

ডার্বিন্ গণসমাজতন্ত্রের যে কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে—ধনতন্ত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহযোগিতা, বিভিন্ন প্রতিযোগীর এবং স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ("relevant spheres") সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, অনগ্রসর, দরিদ্র প্রভৃতি দুর্বলশ্রেণীর সাহায্যের জন্য সেবামূলক ব্যবস্থা ("Ameliorative measures"), সম্ভাব্য ক্ষেত্রের সামাজিকীকরণ বা সমাজমূলক ("Socialisation measures") ব্যবস্থা, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ("Prosperity measures"), ক্ষতিপূরণ সহযোগে সম্পত্তি অধিগ্রহণ। এ সমস্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ডার্বিন্ একটি গণসমাজতন্ত্রী রাজনৈতিক দলের ভূমিকার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, ডার্বিনের পরিকল্পিত গণসমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের (British Labour Party) এবং পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স্, হল্যাণ্ড্, ডেন্মার্ক্, বেল্জিয়াম্, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া (নরওয়ে ও সুইডেন) প্রভৃতি দেশের সামাজিক গণতন্ত্রী দলের (Social Democrat Party) কর্মসূচীর অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।

ডার্বিনের মতে, গণসমাজতন্ত্রের ভূমিকা সেবামূলক সমাজমূলক উন্নয়নমূলক

॥ গণসমাজতন্ত্র মূলতঃ বৃটিশ্ মতবাদ ঃ ইংলণ্ডে এর প্রসার ॥

মোজেস্ (Moses) থেকে লেনিন্ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রবাদের বিখ্যাত ইতিহাস-রচয়িতা আলেক্জাণ্ডার গ্রে (Alexander Grey) বলেছেন যে, ফ্রান্স্ ও পোল্যাণ্ডে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটলেও ইংলণ্ডে লেনিনের রচনাবলী ও ১৯১৭ সালের রুশ্ বিপ্লবকে অবলম্বন করেই মার্ক্সবাদের চর্চা শুরু হয়। তাঁর মতে, ইংলণ্ডে মার্ক্সবাদের প্রসারের বিলম্বের কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ, মার্ক্সের রচনাপ্রকাশের সময়ে (১৮৬৫ থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত) ইংলণ্ডের শ্রমজীবীগণ ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় রাষ্ট্রের সামগ্রিক সমৃদ্ধির অনেকটা ভাগ পেয়ে খুশী ছিলেন।

গণসমাজতন্ত্র কেন মূলতঃ ব্রিটিশ্ মতবাদ ?—গ্রের ব্যাখ্যা
(১) শ্রমিকদের সন্তুষ্টি

দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডের শ্রমিক সংস্থাগুলি তখন আইনের চক্ষে স্বীকৃতি লাভ করে ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ও সুগঠিত হয়েছিল।

(২) শ্রমিক সংস্থার সন্তুষ্টি

তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ড্ তখন বেন্থাম্ ও মিলের হিতবাদী আদর্শের ও উদারনৈতিকার বিশেষ সমর্থক ছিল। নানাপ্রকার সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তখন থেকেই ইংলণ্ড্ ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পরিবর্তে জনকল্যাণকর রাষ্ট্ররূপে নিজেকে গড়ে তুলছিল। ১৮৬৭ সালের সংস্কার আইনের (Reforms Act of 1867) ফলে শ্রমজীবীগণ ভোটের অধিকার লাভ করেন।

(৩) হিতবাদের প্রভাব

চতুর্থতঃ, ফেবিয়ান্ সমাজবাদের (Fabian Socialism) প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা লাভের ফলে ইংলণ্ডে এমন একটা জনমত তৈরি হল, যার সারকথা হল যে, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সংহতি আনা যায়।

(৪) ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রের প্রভাব

পঞ্চমতঃ, ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য এমন যে সেখানে সমাজতন্ত্রবাদীদের অভিযোগ ছিল প্রধানতঃ ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে নয়। উদারনৈতিকতার সমর্থক গ্রীন্ ভূস্বামীদের হাতে অত্যধিক জায়গাজমি রাখার ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, ইংলণ্ডে এ ধরনের অসম ব্যবস্থার জন্যই সেখানে সাধারণ কৃষকগণ দারিদ্র্যের কবলে পড়েছিলেন। রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব (Ricardian theory of Rent) ইংলণ্ডের এই বিশিষ্ট অর্থনৈতিক কাঠামোকে অবলম্বন করেই প্রচারিত হয়। এই অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য ব্রিটিশ গণ-সমাজতন্ত্রীগণ মার্ক্সের পরিবর্তে জন স্টুয়ার্ট্ মিলের উদারনৈতিক অর্থনীতির দিকেই ঝুঁকেছিলেন।

(৫) অভিযোগ ছিল প্রধানতঃ ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে

ষষ্ঠতঃ, ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই ইংলণ্ডে গণসমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের প্রধান কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। ইংরেজগণ অত্যন্ত রক্ষণশীল (Conservative)। কোনরকম উগ্র, উদ্দাম প্রবণতাকে তাঁরা সাধারণতঃ প্রশ্রয় দেন না। তাই ফরাসী বিপ্লবের পরেও পার্শ্ববর্তী ইংলণ্ডে কোনরকম বিপ্লব দেখা দেয় নি। স্বৈরতন্ত্রী রাজা ১ম চার্লসের শিরশ্ছেদের পরে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলেও তা ইংলণ্ডে দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ল্যাস্কির মত গণসমাজতন্ত্রীও ইংলণ্ডের সংবিধানে বংশগত রাজতন্ত্রের (hereditary monarchy) অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, যদিও একই পদ্ধতিতে গঠিত, অভিজাততান্ত্রিক লর্ডস্ সভার উচ্ছেদের জন্য তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন।

(৬) ইংলণ্ডের রক্ষণশীল জাতীয় চরিত্র বিপ্লবকে মেনে নিতে চায় না

॥ ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রবাদ ॥

অদ্ভুত শোনালেও যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইংলণ্ডে ফেবিয়ান্ সভা (Fabian Society) ডাকা হয়, তার সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। ১৮৮২ সালে টমাস্

ডেভিড্‌সন্ (Thomas Davidson) নামে একজন স্কট্ অধ্যাপকের কাছে সমাজদর্শন শেখার জন্য দশ বারো জন ছাত্র লণ্ডনে একটি সভায় নিয়মিত মিলিত হতেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, সমাজ-সংস্কার ছাড়া সমাজের ব্যাপক উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। সেজন্য তাঁরা ব্যক্তিকে অধিকতর সমাজ-সচেতন করে তোলার উপায় সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন। এভাবে মাঝে মাঝে সভাসমিতি চালাবার পর তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, প্রগতিশীল সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল প্রগতিশীল আইনকানুন প্রবর্তন।

ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রের শুরু: লণ্ডনে সমাজদর্শনের কিছু শিক্ষার্থীর ঝোঁক

১৯০৮ সালে এ যুগের প্রখ্যাত **ইংরেজ** নাট্যকার **জর্জ্ বার্নার্ড্ শ'** (George Bernard Shaw) "ফেবিয়ান্ প্রবন্ধাবলীর" (Fabian Essays) যে বিখ্যাত ভূমিকা লেখেন, তাতে তাঁদের সমাজ-সংস্কার সংস্থার নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে, প্রাচীন রোমের সেনাপতি ফেবিয়াস্ কাঙ্ক্‌টেটরের (Fabius Cunctator) মত "অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা" নেবার জন্য ও ফেবিয়াসের মতই প্রগতিশীল আইনকানুনের মারফত সমাজের পরিবর্তন সাধনের জন্য ফেবিয়ান সমিতির সদস্যগণ প্রস্তুত থাকবেন। ফেবিয়াস্ নাকি হ্যানিবালের (Hannibal) দ্বারা রোম আক্রান্ত হলে রোমকে বাঁচাতে এরকম নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

বার্নার্ড্ শ'র সমর্থন

ফেবিয়ান্ সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য প্রথমতঃ, ধীরে চলার নীতি (gradualism) সমর্থন। সমিতির মতে, সমাজতন্ত্র স্তরগতভাবে (phase by phase) প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ধরনের স্তরবিন্যস্ত গণসমাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন বলেই এ সমিতির সদস্যগণ ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রকে "বিবর্তন-মূলক সমাজতন্ত্র" (Evolutionary Socialism) আখ্যা দিয়েছেন। এর বিপরীত হল মার্ক্‌স্‌বাদী সমাজতন্ত্র। কারণ মার্ক্‌স্‌বাদ "বিপ্লবাত্মক সমাজতন্ত্রে" (Revolutionary Socialism) বিশ্বাসী।

ফেবিয়ান্ সমিতির লক্ষ্য
(১) ধীরে চলার নীতি গ্রহণ

দ্বিতীয়তঃ, ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রীগণ তাঁদের মতবাদের পক্ষে জনমতগঠনের জন্য ব্যাপক প্রচার-অভিযানের (propaganda বা "permeation") ওপর জোর দেন। এই মতবাদের সমর্থকগণ মনে করতেন যে, এর ফলে মধ্যবিত্ত, দরিদ্র বুদ্ধিজীবী সব শ্রেণীর ব্যক্তিদেরই এই গণসমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করে নেওয়া যাবে। গণসমাজতন্ত্র ধীরে ধীরে সর্বাত্মক গণ-আন্দোলন (mass-movement) হয়ে উঠবে।

(২) প্রচার অভিযান

তৃতীয়তঃ, ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রের নেতাগণ প্রচার করেন যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্য দিয়েই প্রকৃত ও স্থায়ী সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব। এর ফলে প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের (Universal Adult Franchise) মাধ্যমে নির্বাচন ব্যবস্থা পরিচালনা, নির্বাচিত সংসদের কাছে দায়ী প্রগতিশীল মন্ত্রিসভা গঠন,

(৩) প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান

আইনসভার মারফত সমাজের সর্বাত্মক উন্নয়নের জন্য আইনসভাকে ব্যবহার প্রভৃতি কার্যসূচীর ওপর তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন।

সিড্‌নি ওয়েব্ (Sidney Webb), বার্নাড্‌ শ', সিড্‌নি অলিভার, (Sidney Oliver), অধ্যাপক গ্রাহাম্ ওয়ালাস্ (Graham Wallas)—এই চারজন বিশিষ্ট নেতা ফেবিয়ান্ সমিতির "নেতৃচতুষ্টয়" (Big Four) নামে বিখ্যাত হন। এঁদের সকলেই এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, ফেবিয়ান্ গণসমাজতন্ত্র ধ্বংসাত্মক কোন প্রতিবিপ্লব নয়, সমাজের ধীর, সুস্থির সংগঠনমূলক রূপান্তরলাভ ("not a destructive insurrection, but a constructive process of social evolution")।

ফেবিয়ান্ সমিতির প্রধান সমর্থকগণ

॥ ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রের উৎস ॥

ফেবিয়ান্ গণসমাজতন্ত্রের প্রথম মূল উৎস মার্ক্সের চিন্তাধারা। সমাজের কল্যাণসাধন করতে হলে উৎপাদনের মাধ্যমগুলির সামাজিকীকরণ (Socialisation of production) অবশ্য প্রয়োজন—মার্ক্সের এই সমাজতান্ত্রিক নীতি ফেবিয়ান্‌গণ সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন। ফলে, তাঁরা জমি ও মূলধনকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার ওপর গুরুত্ব দেন। ফেবিয়ান্ প্রবন্ধাবলীর অন্তর্গত একটি মূল্যবান্ নিবন্ধে বার্ণাড্‌ শ' ফেবিয়ান্ সমিতির যে অর্থনৈতিক কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন, তার মধ্যে মার্ক্সীয় অর্থনীতির প্রভাব সুস্পষ্ট।

ফেবিয়ান্ গণসমাজতন্ত্রের মূল উৎস: (১) মার্ক্সবাদ

সিড্‌নী ওয়েব্ মার্ক্সীয় ইতিহাসদর্শনকে ফেবিয়ান্ গণসমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক চিন্তাধারার মূল সূত্র বলে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, ফরাসী পণ্ডিত দ্য তক্‌ভিল্ (De Tocqueville) এই মার্ক্সীয় ইতিহাসচেতনারই সঠিক প্রবক্তা ছিলেন। ওয়েবের মতে, মার্ক্সীয় ইতিহাসচেতনা শুধু সমাজতান্ত্রিক নয়, গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী। এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই ফেবিয়ান্ ইতিহাসদর্শন ব্যাখ্যা করে ওয়েব্ ঘোষণা করেন যে, গণতান্ত্রিক পথেই সামাজিক পরিবর্তন হয়, সমাজ বিবর্তনের অপেক্ষায় থাকে এবং সাংবিধানিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজকে পরিবর্তন করা যায়। তাই তিনি বলেন যে, গত শতাব্দীর মধ্যে শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধতা, বৃহত্তম নিয়োগকর্তারূপে রাষ্ট্রের আবির্ভাব (emergence of the State as the largest employer) — এ জাতীয় ঘটনাগুলি মার্ক্সীয় আদর্শে রূপায়িত ফেবিয়ান্ গণসমাজতান্ত্রিকতার অর্থনৈতিক লক্ষ্যের অব্যর্থতা প্রমাণ করে।

সিড্‌নি ওয়েবের মত

দ্বিতীয়তঃ, গ্রে-র মতে ফেবিয়ান্ গণসমাজতন্ত্রের অন্যতম উৎস জন্ স্টুয়ার্ট মিলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা। ফেবিয়ান্‌গণ মার্ক্সবাদের কতকগুলি সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করেন নি। তাঁরা হিংসাশ্রয়ী, শোষণভিত্তিক শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজের ক্রমিক প্রগতিশীলতার পথে উন্নতির তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করেছেন। অর্থাৎ, ফেবিয়ান্‌গণ হিংসাত্মক বিপ্লবে বিশ্বাসী নন। এদিক থেকে ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রীগণের চিন্তাধারার সঙ্গে গান্ধীবাদের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়।

(২) জন্ স্টুয়ার্ট্ মিলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা

মিল্ ব্যক্তি স্বাধীনতার পূজারী ছিলেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের হাতে সমষ্টিবদ্ধ কর্তৃত্বের দ্বারা জনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করলে (collective restraint) তার ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন হবে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কৃষকদের হাতে জমির স্বত্ব সমর্পণ (peasant proprietorship), শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি বিধিবদ্ধকরণ প্রভৃতি সমাজকল্যাণকর ব্যবস্থাগুলি মিল্ সমর্থন করেন।

॥ ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রবাদের কর্মসূচী ॥

(১) শ্রম ও পুঁজির সামাজিকীকরণ

ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রধান বক্তব্য হল ঃ সম্পদ সমাজের, তাই তার বণ্টন সামাজিক হওয়া উচিত ("Social in its origin, wealth should be social in its distribution also.")। সুতরাং উৎপাদনের মাধ্যমগুলির, অর্থাৎ শ্রম ও পুঁজির সামাজিকীকরণ (socialisation of the means of production) ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রবাদীর প্রধান কর্মসূচী।

(২) গণতান্ত্রিক সমাজ স্থাপন

দ্বিতীয়তঃ, এই সামাজিকীকরণ রাষ্ট্রের মারফত হবে বলেই ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকীকরণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(৩) উদারনৈতিক মূল্যবোধ গঠন

তৃতীয়তঃ, ফেবিয়ান তাত্ত্বিকগণ পরমতসহিষ্ণুতা, স্বাধীনতা, সাম্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উদারনৈতিক, মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার ওপরও গুরুত্ব দিয়েছেন।

॥ ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রের মূল্যায়ন ॥

ফেবিয়ান্‌দের মূল্যায়ন ঃ
(১) সীমাবদ্ধতা

ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে ধ্রুপদী মার্ক্‌স্‌বাদীগণ নানা সমালোচনা করেছেন। প্রথমতঃ, বলা হয় যে, এই সমাজতন্ত্র কোন বিশেষ সুস্পষ্ট মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নি। তাই এর প্রেক্ষাপট সীমিত।

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদের উদ্দেশ্যও সীমিত—দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ধীর গতিতে সমাজতন্ত্র প্রসারিত করা। কিন্তু যে কায়েমী স্বার্থগুলির বাধাদানের

ফলে এই সীমিত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে, সেগুলি এতই শক্তিশালী যে, এই মতবাদের মৃদু বা লঘু প্রভাব সেখানে কার্যকর হতে পারে না। সেজন্য এই মতবাদ ইংলণ্ডের শ্রমিকদের তেমন উৎসাহিত করে নি। এ মতবাদ সমস্ত সমাজতান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বৈপ্লবিক ("It is the least revolutionary of all types of socialism.")।

(২) উদ্দেশ্য সীমিত, বৈপ্লবিকতা কম

কিন্তু ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রের কৃতিত্ব উপেক্ষা করা যায় না। প্রথমতঃ, এই মতবাদ ইংলণ্ডের শ্রমিকদলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় ইংলণ্ডে উদারপন্থী (Liberal) দলের প্রাধান্য থাকলেও এই মতবাদের প্রভাবেই ইংলণ্ডে উদারপন্থীদের প্রাধান্য ক্রমশঃ কমে গিয়ে শ্রমিকদলের আবির্ভাব ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে।

ফেবিয়ান্দের গুণ ঃ
(১) ইংলণ্ডে শ্রমিক দল গঠন

দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডের মত রক্ষণশীল দেশে এই মতবাদ যতটা কার্যকর হয়েছে, এর চেয়ে উগ্রতর অন্য কোন মতবাদ ততটা কার্যকর হত না। ফেবিয়ান্ দলের নমনীয়তা, ধীরগতিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের সাহায্যে সমাজের সর্বাত্মক রূপান্তর সাধনের কর্মসূচী ইংলণ্ডে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এর বদলে কোন বাঁধা-বুলি-কপ্‌চানো, শ্লোগান্‌সর্বস্ব সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী (doctrinaire socialism) বৃটিশ্ জনগণ আদৌ গ্রহণ করতেন কিনা সন্দেহ।

(২) ইংলণ্ডের উপযোগী সমাজতন্ত্র

॥ গণসমাজতন্ত্রের অন্যান্য প্রধান সমর্থকগণ ॥

গণসমাজতন্ত্র প্রধানতঃ ব্রিটিশ্ মতাদর্শ। তাই ফেবিয়ান্‌গণ ছাড়া এর প্রধান সমর্থকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হ্যারল্ড্ ল্যাস্কি (Horold Laski)। সর্ব-ইউরোপীয় ক্ষেত্রে এর প্রধান সমর্থক হলেন এডুয়ার্ড বেয়ার্নস্টাইন্ (Eduard Bernstein)। তবে ফেবিয়ান্ গোষ্ঠীর ওয়েব্‌দম্পতির অর্থাৎ সিড্‌নি ওয়েব্ (Sidney Webb) এবং তাঁর পত্নী বিয়েট্রিশ্ ওয়েবের (Beatrice Webb) মতবাদ সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা করা দরকার।

গণসমাজতন্ত্রের অন্য সমর্থক ঃ ওয়েব্‌দম্পতি, ল্যাস্কি, বেয়ার্নস্টাইন্

(ক) **সিড্‌নি ওয়েব (১৮৫৯—১৯৪৭) ও বিয়েট্রিশ পর্টার্ (ওয়েব্)** (১৮৫৮—১৯৪৩) পৃথক্‌ভাবে ও বিয়ের পর ফেবিয়ান্ দলের কর্মধারাকে অব্যাহত রাখেন ও ব্রিটিশ্ গণসমাজতন্ত্রকে এবং ব্রিটিশ্ শ্রমিক দলকে অধিকতর জনপ্রিয় করে তোলেন। "লণ্ডন্ স্কুল্ অফ্ ইকনমিক্স্ অ্যাণ্ড্ পলিটিকাল্ সায়ান্স্" (London School of Economics and Political Science বা সংক্ষেপে L. S. E.)-এর সংবর্ধনে তাঁদের অবদান স্মরণীয়। এটি এখন অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি সমাজবিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও

(ক) ওয়েব্‌দম্পতির পরিচিতি

গবেষণার কেন্দ্রস্থলরূপে বিশ্ববিখ্যাত। ইংলণ্ডের প্রথম শ্রমিকদলীয় মন্ত্রিসভা সিডনি ওয়েবকে "লর্ড" উপাধিতে (Lord Passfield) ভূষিত করেন।

ওয়েব্‌-দম্পতি ইংলণ্ডে ধনতন্ত্রের অবক্ষয় লক্ষ্য করেন ও তার কারণ বিশ্লেষণ করেন। তাঁরা সমস্ত গ্রন্থই যুগ্ম গ্রন্থকাররূপে রচনা করেন। তাঁদের মতে, উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের দরিদ্রদের অর্থসাহায্যের জন্য যে ব্যবস্থা (Poor Law) প্রচলিত ছিল, তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। তাঁদের মতে, এ ধরনের সাহায্য দানের পরিবর্তে দেশের অর্থনীতির আমূল সংস্কার দরকার। তাঁরা সেই সংস্কারের হদিস পেয়েছিলেন সোবিয়েত সাম্যবাদের মধ্যে। সোবিয়েত সাম্যবাদী ব্যবস্থাকে তাঁরা "নতুন সভ্যতা" ("a new civilisation") বলে অভিনন্দন জানান।

তাঁদের ওপর মার্কসীয় প্রভাব

ইংলণ্ডে শ্রমিক-আন্দোলনকে সুগঠিত করার ক্ষেত্রেও ওয়েব্‌দম্পতির অবদান স্মরণীয়। তাঁদের রচিত এই আন্দোলনের ইতিহাস ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি পর্যায়ের মূল্যবান্‌ দলিল। তাঁরা শিল্পে গণতন্ত্র (Industrial Democracy) স্থাপন করতে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। তাঁদের মতে, এভাবেই গণতন্ত্র সফল হয়। গণসমাজতন্ত্রীরূপে তাঁরা প্রচলিত আইনকানুন সংস্কারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। একই কাজে নারী ও পুরুষের মজুরির সমতা, ম্যানর ও বরো নামক ইংলণ্ডের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার এবং কারাব্যবস্থার সংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে যুগ্ম গ্রন্থকাররূপে তাঁরা বহু পুস্তিকা ("Fabian Tracts") রচনা করেন।

ইংলণ্ডে শ্রমিক, নারী প্রভৃতির জন্য ও অন্য ক্ষেত্রে সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্বদান

(খ) **হ্যারল্ড্‌ ল্যাস্কি** (১৮৯৩ – ১৯৫০) বর্তমান যুগের একজন সুবিখ্যাত শিক্ষক, রাজনীতিবিদ্‌, প্রচারক ও সংগঠক। ইংলণ্ডের অন্তর্গত ম্যাঞ্চেস্টারের এক ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ইহুদি ধর্মের সংকীর্ণতার গণ্ডী ছেড়ে তিনি মুক্ত, উদারনৈতিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হন। অক্‌স্‌ফোর্ড্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকার সময়ে তিনি সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। অর্থসংকট থেকে মুক্ত হবার জন্য তিনি বৃটিশ্‌ শ্রমিক দলের পত্রিকায় ("Daily Herald") নিয়মিত প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন, পরে কানাডার ম্যাক্‌গিল্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৬ সালে তিনি প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্‌ গ্রাহাম্‌ ওয়ালাসের অবসর গ্রহণের পর লণ্ডন্‌ স্কুল্‌ অফ্‌ ইকনমিক্সে রাজনীতির অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হন। অজস্র গ্রন্থ, পত্রপুস্তিকার মধ্যে দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারিত হয়েছে। তাঁর সুললিত ভাষা, শব্দচয়নে চাতুর্য, ভাবের গভীরতা তাঁর একাধিক রাজনৈতিক গ্রন্থকে (বিশেষতঃ "A Grammar of Politics"-কে)

(খ) হ্যারল্ড্‌ ল্যাস্কির পরিচিতি তাঁর গণ-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতির বিবর্তন

ক্লাসিক্ধর্মী ও বিশ্ববাসীর কাছে প্রিয় করে তুলেছে। একাধিকবার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয়। কিন্তু শোনা যায় যে, কোন কোন রক্ষণশীল বিচারক তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারা পছন্দ করেন নি।

ব্রিটিশ্ শ্রমিক দলের সংগঠক অধ্যাপক ল্যাস্কি ভারতদরদী ছিলেন

ব্রিটিশ্ শ্রমিক দলের অন্যতম সচিব হিসাবে ল্যাস্কি একদিকে যেমন দলের গণ-সমাজতন্ত্রী আদর্শ সমর্থন করেন, অন্যদিকে তেমনি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। লণ্ডনে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের তাত্ত্বিক নেতা ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন ও আরও অনেকে তাঁর কৃতী ছাত্র ছিলেন। গান্ধীজী, নেহেরু প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ইংরেজ ভারতদরদী, উদারপন্থী মানবতাবাদীরূপে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

ল্যাস্কির রাষ্ট্রচিন্তার ৩টি ধারা

ল্যাস্কির রাজনৈতিক চিন্তা তিনটি ধারায় প্রবাহিত—সমাজতান্ত্রিকতা, গণ-তান্ত্রিকতা ও আন্তর্জাতিকতা।

(১) মার্ক্সবাদের প্রভাব

প্রথমতঃ, মার্ক্সবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ল্যাস্কি ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার ওপর গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে অর্থ-নৈতিক সাম্য না থাকলে সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তিনি সামাজিক নিরাপত্তা (Social Insurance) ব্যবস্থাকে বহুমুখী ও সুবিস্তৃত করাতে চান।

(২) মিলের ও ফেবিয়ানদের প্রভাব

দ্বিতীয়তঃ, মার্ক্সবাদের চেয়ে ল্যাস্কি বৃটিশ্ গণসমাজতন্ত্রের দ্বারা, বিশেষতঃ ওয়েব্-দম্পতি ও অন্যান্য ফেবিয়ানদের দ্বারা বেশী প্রভাবিত হন। তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের একটি গ্রন্থে ("State in Theory and Practice") তিনি বলেন যে, সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রভাব ছাড়াও ব্যক্তিত্ব, ঐতিহ্য, ন্যায়বোধ প্রভৃতির প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ("I fully admit the influence of personality, tradition, logic as factors in the making of change.")। তাই দেখা যায় যে, ল্যাস্কি মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্র ও সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগ, শ্রমের, সঞ্চয়ের ও বিনিয়োগের প্রবৃত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি কব্ডেন প্রমুখ ধনতন্ত্রী ও গ্রীন্ প্রভৃতি উদারনৈতিক রাজনীতিবিদ্দের মত সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করেন, কিন্তু এই অধিকারকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য জীবনধারণের ন্যূনতম উপকরণ ("Civic Minimum") গুলিকে সমভাবে বণ্টনের ওপর জোর দেন। শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুসারে সকলের বৃত্তিনির্বাচনের অধিকার তিনি স্বীকার করেন, আনুপাতিক করনীতির (Progressive taxation) দ্বারা বেশী সচ্ছলদের কাছ থেকে বেশী কর নিয়ে করলব্ধ অর্থ অনগ্রসরদের মধ্যে পুনর্বণ্টনের (Re-distributive taxation) ব্যবস্থা করে তিনি সাম্য বজায় রাখতে উপদেশ দেন। সাম্যবাদী রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে—এ কথা মনে

রেখে ল্যাস্কি মিলের মত ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব নির্দেশ করেন, নানাভাবে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের প্রস্তাব দেন।

ল্যাস্কির গণতান্ত্রিকতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল—তাঁর বহুত্ববাদ (Pluralism)। তাঁর মতে, অস্টিনের অদ্বৈতবাদী সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্রীভবন সমর্থন করে। রাষ্ট্রশক্তির বিকেন্দ্রীকরণের জন্য তিনি সমাজের অসংখ্য সংস্থাগুলিকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সার্বভৌম করার পক্ষে বহুত্ববাদী মতকে সমর্থন করেন। এ মত অবাস্তব বলে পরিত্যক্ত হলেও ভারতীয় গণতন্ত্রের পঞ্চায়তী ব্যবস্থার মত সর্বনিম্ন স্তরে ("grass-roots level") রাষ্ট্রশক্তির গণতান্ত্রিকীকরণের প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়িত করে তোলে।

বহুত্ববাদ সমর্থন

তৃতীয়তঃ, অস্টিনের সার্বভৌম তত্ত্বের কড়া সমালোচক হিসাবে ল্যাস্কি বলেন যে, এই মতবাদ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির অধীনে রাখতে চেষ্টা করে। ধনতন্ত্রী, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবেই যুদ্ধের সাহায্য তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করার চেষ্টা করে। উগ্র, বিকৃত জাতীয়তাবাদ তাদের প্রধান সহায়। ভবিষ্যতে পৃথিবীকে যুদ্ধমুক্ত করার জন্য ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাই ল্যাস্কি আন্তর্জাতিকতার আদর্শকে সমর্থন করেন ও বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্র (World Federation) স্থাপন করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বিকেন্দ্রীকরণ সমর্থন করেন। এ ক্ষেত্রে ল্যাস্কির মতবাদ লেনিনবাদী ও মানবতাবাদী।

(৩) আন্তর্জাতিকতা : লেনিন-বাদের ও মানবতাবাদের প্রভাব

(গ) **এডুয়ার্ড বেয়ার্নস্টাইন** (১৮৫০—১৯৩২)-কে সর্ব-ইউরোপীয় ক্ষেত্রে গণসমাজতন্ত্রের প্রচারক বলে গণ্য করা হয়। জার্মানীর বের্লিন শহরের শ্রমিক-পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ব্যাঙ্কে কিছুকাল কাজ করার পর ১৮৭২ সালে তিনি জার্মান গণসমাজবাদী দলে (German Social Democratic Party) যোগ দেন। গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী বলে সন্দেহ করে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করতে থাকে। তাই দীর্ঘ কুড়ি বছর তিনি দেশত্যাগী হয়ে সুইজারল্যান্ড ও ইংলন্ডে আত্মগোপন করেন। ইংলন্ডে থাকতে থাকতে ফেবিয়ান গণসমাজতন্ত্রীদের প্রভাবে তিনি এই মতবাদের প্রতি আন্তরিকভাবে আকৃষ্ট হন ও মার্কস-বিরোধী হয়ে যান। এঙ্গেলসের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বের জন্য তিনি আগেই তাঁর সুবিখ্যাত মার্কসবিরোধী বক্তব্য প্রচার করতে দ্বিধাবোধ করেন। তাঁর গণসমাজতান্ত্রিক মতামতের দুটি দিক—একটি হল তাঁর মার্কসবিরোধিতা ; অপরটি হল নিজস্ব তত্ত্ব। এ দুটি দিকেরই ব্যাখ্যা রয়েছে "সমাজতন্ত্রের সমস্যা" ("Problems of Socialism") গ্রন্থে এবং ১৮৯৮ সালে জার্মান গণসমাজবাদী দলের কাছে লেখা তাঁর একটি বিরাট পত্রের মধ্যে। ঐ দলের মতাদর্শকে সংশোধন করতে বলার প্রস্তাব দেওয়ার জন্য তাঁর মতাদর্শকে "শোধনবাদ" ("Revisionism") বলা হয়।

এডুয়ার্ড বেয়ার্নস্টাইনের সংক্ষিপ্ত জীবনী : তাঁর শোধন-বাদী গণসমাজতন্ত্রের ক্রমবিকাশ

মার্ক্স্‌বাদের বিরোধিতার জন্য বেয়ার্ন্‌স্টাইন্‌ যে যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন, সেগুলি অনেকের মতে, খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমতঃ, তিনি বলেন যে, মার্ক্স্‌বাদও কল্পনাশ্রয়ী। কারণ, মার্ক্স্‌ ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ঘটনাটিকে একটা স্বাভাবিক উল্লম্ফন বলে ধরে নিয়েছেন।

তাঁর মতে (১) মার্ক্স্‌বাদও কল্পনাশ্রয়ী

দ্বিতীয়তঃ, সর্বহারাদের একনায়কত্ব সম্পর্কিত মার্ক্সীয় তত্ত্বকে বেয়ার্ন্‌স্টাইন্‌ "অগণতান্ত্রিক" বলে আখ্যা দিয়েছেন। দরিদ্রদের ওপর ধনীদের অত্যাচার যেমন গণতন্ত্র সমর্থন করে না, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকদের হাতে সংখ্যালঘু সচ্ছলদের লাঞ্ছনাকেও গণতন্ত্র সমর্থন করে না। ফলে "সর্বহারাদের একনায়কত্ব" এক শ্রেণীর ব্যক্তিদের বদলে সমাজে অন্য এক শ্রেণীর কর্তৃত্বের গণতন্ত্র-বিরোধী তৎপরতা।

(২) এবং অগণতান্ত্রিক

তৃতীয়তঃ, বেয়ার্ন্‌স্টাইনের মতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে মার্ক্সের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ছিল না।

(৩) মধ্যবিত্ত উপেক্ষিত

চতুর্থতঃ, মার্ক্সের উদ্বৃত্ত-মূল্যতত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করে বেয়ার্ন্‌স্টাইন্‌ বলেন যে, "উদ্বৃত্তের" পরিমাণ নির্ণয় কঠিন ব্যাপার। যন্ত্রযুগের বিরাট অগ্রগতির ফলে একসময়ের দক্ষ শ্রমিক পরে " অদক্ষ" বলে বিবেচিত হতে পারে। দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতার (Productivity) তারতম্যের ফলে "উদ্বৃত্তের" গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্য ঘটে। বেয়ার্ন্‌স্টাইন্‌ বরং বলেন যে, সমাজই উদ্বৃত্তমূল্যের প্রাপক ("Surplus Value should go to society")।

(৪) উদ্বৃত্তমূল্যের "উদ্বৃত্ত" নিরূপণ সহজ নয়

পঞ্চমতঃ, বেয়ার্ন্‌স্টাইনের অভিযোগ যে, মার্ক্স্‌ বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়ত শ্রেণীদুটির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করেছেন। যেমন —বর্তমান যুগের যৌথমূলধনী কারবারে (Joint Stock Company) শেয়ার ক্রয়কারীরাও মূলধন সরবরাহকারীর ভূমিকা নেয়। সুতরাং পুঁজিপতিদের ভূমিকাকে আর কেন্দ্রীভূত ও শোষণকারী বলা চলে না। দরিদ্রগণও আগের তুলনায় অনেক বেশী ভোগ্যবস্তু ভোগ করছে। এমন-কি তাদের অনেকে উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

(৫) বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়তের রূপান্তর

ষষ্ঠতঃ, বেয়ার্ন্‌স্টাইনের মতে, মানুষের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক হল—মানুষ কাজ-পাগলা, কাজের জন্যই সে অনেক সময় কাজ করতে ভালবাসে ("work for its own sake")। মার্ক্স্‌ ব্যক্তির এই ঝোঁকটির কথা মনে রাখেন নি।

(৬) মানুষ কাজ পাগলা

মার্ক্স্‌বাদের সমালোচনার পর বেয়ান্‌স্টাইন্‌ সমকালীন জার্মান গণসমাজবাদী দলকে যে উপদেশ দিলেন; তার মধ্যেই তাঁর গণসমাজতন্ত্রবাদী কর্মসূচী পরিস্ফুট।

রাষ্ট্রের উচ্ছেদের বদলে তিনি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকীকরণ ও তার সামাজিকীকরণ দাবি করেন। শ্রমিকদের সংগঠনকে প্রকৃত অর্থে শ্রমিকদরদী করে তুলতে হবে। ধনতন্ত্রকে বর্জন না করে তা থেকে মেহনতী মানুষকে সবচেয়ে বেশী সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য তাকে ব্যবহার করতে হবে। শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও হিংসা সৃষ্টি করে। তার বদলে বেয়ান্‌স্টাইন চান শ্রেণী-সহযোগিতার তত্ত্ব (class-collaboration), যা সকলের মধ্যে ঘৃণার পরিবর্তে আনবে প্রেম ও মৈত্রী। মতাদর্শকে শুধু অর্থনীতির মধ্যে সীমিত না রেখে তাকে নীতিবোধের আওতায় আনতে হবে ("Socialism not on economics only, but on morals and ethics")।

বেয়ান্‌স্টাইনের প্রস্তাব বিবর্তনমূলক গণসমাজতন্ত্র

॥ উপসংহার ঃ রাজনৈতিক মতবাদের আপেক্ষিকতা ॥

উদারনৈতিকতা, মার্কসবাদ ও গণসমাজতন্ত্র – এই তিনটি প্রধান মতাদর্শের আলোচনার পর মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, রাজনৈতিক মতাদর্শ বা মতবাদ সব সময়েই আপেক্ষিক (relative)। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে, যেমন নতুন নতুন মতবাদ বা মতাদর্শ অংকুরিত বা আবির্ভূত হয়েছে, তেমনি পুরানো মতবাদের রূপান্তরের মধ্যেও একই মতবাদকে হয়ত নতুনভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যাচ্ছে। কোন মতবাদই সামাজিক বিবর্তনের বাইরে থেকে জন্মলাভ করে নি, করতে পারে না। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকেই আরিস্টটল্, রুশো, মঁতেস্কিএ, কোঁৎ (Comte), জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্, মার্কস্ প্রমুখ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্গণ রাষ্ট্রনৈতিক আপেক্ষিকতাবাদরূপে (theory of relativly of Government) প্রচার করেছেন।

সব রাজনৈতিক মতাদর্শই আপেক্ষিক

রাজনৈতিক আপেক্ষিকতার কথা মনে রেখেই বলা যেতে পারে যে, উদারনৈতিকতা বা মার্কসবাদ বা গণসমাজতন্ত্র, বা অন্য যে-কোনও মতবাদ অথবা মতাদর্শকে কখনই অপরিবর্তিত বা অনমনীয় বলে চিন্তা করা যায় না। যেমন—উদারনৈতিকতার সমর্থকগণ উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য এই মতাদর্শকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা – এ দুটির মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যও উদারনৈতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এই মতবাদকে সমর্থন করেছেন। আবার দেখা যায়, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সমর্থন করলেও সোবিয়েত রাশিয়া ও চীনা প্রজাতন্ত্রের মধ্যে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই মতবাদের প্রয়োগমূলক তারতম্য কিছু কিছু দেখা যায়। গণসমাজতন্ত্রীগণও নিজেদের সমাজতন্ত্রী, এমন-কি, মার্কসবাদী বলে দাবী করবেন।

কোন মতাদর্শই একেবারে অনমনীয় নয়

তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, মতবাদগুলির মধ্যে তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও পার্থক্য থাকলেও তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে কিছু কিছু এমন বৈশিষ্ট্য থাকে

যা থেকে তাদের চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করা সহজ হয়। যে সমাজতন্ত্রীরা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী, যাঁরা শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনতে চান, তাঁদের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বলা যায়। যাঁরা ধীরগতিতে গণতান্ত্রিক সংবিধানের মাধ্যমে এরকম পরিবর্তন আনতে চান, তাঁদের বলা যায় "গণসমাজতন্ত্রী" যাঁরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার আদর্শের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, তাঁরা হলেন "উদারনৈতিক"।

তবুও প্রত্যেক মতবাদের কিছু কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকে

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লক্ষ্যবিন্দু হলো সমাজবদ্ধ মানুষ—সমাজবদ্ধ মানুষের কল্যাণ—কবি জীবনানন্দের ভাষায় "পৃথিবীর ক্রমমুক্তি"। তাই রাজনৈতিক মতাদর্শ বহু শতাব্দীর সূক্ষ্মদর্শী মনীষীদের রাষ্ট্রচিন্তার ক্রমবিকাশের এক ধারাবাহিক ইতিহাস। সভ্যতার সূচনা থেকেই তার জন্ম। তবু মনীষীদের স্বপ্নে-দেখা সেই পৃথিবীকে মানুষ সাম্প্রতিকতম কালেও পায় নি। অথচ বিশ্বের দেশ-দেশান্তরের সাম্প্রতিকতম রাষ্ট্রব্যবস্থা বা রাজনৈতিক ভাবধারা নিঃসন্দেহে সেই মনীষীদের রাষ্ট্রচিন্তারই ক্রম-পুঞ্জিত পরিণাম-ফল। সেই সঙ্গে একথাও স্মর্তব্য যে, কোন দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাই এখনও পায়নি সেই কাঙ্ক্ষিত সম্পূর্ণতা। কাজেই, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রূপ-রূপান্তর এগিয়ে চলবে তার ইতিহাস-নির্দিষ্ট ক্রমবিকাশের পথে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লক্ষ্য হল, কবি জীবনানন্দের ভাষায়—"পৃথিবীর ক্রমমুক্তি

সারাংশ

প্রগতিশীল ভাবনাচিন্তাই রাজনৈতিক মত সৃষ্টি করে। প্রচারধর্মী মতই মতাদর্শ।

উদারনৈতিকতা মতবাদটির রূপ ও রূপান্তর: এ মতবাদের আবির্ভাবের কারণগুলি হল—মার্টিন লুথারের প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত; ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ; কোয়েকার আন্দোলনের মত সপ্তদশ শতাব্দীর ছোটখাটো আন্দোলন; রেনেসাঁস (পুনর্জাগরণ) আন্দোলনের প্রভাব—গ্রীকো-রোমান সভ্যতার পুনরুদ্ধার, মানবতাবাদের জন্ম; মার্কিন উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা-সংগ্রাম (১৭৭৬); ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯): ব্যক্তিস্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার; দার্শনিক নৈরাজ্যবাদের ও শেলী, বায়রন প্রভৃতি রোমান্টিক কবিদের প্রভাব; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে শিল্প-বিপ্লবের ফল; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব; মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহায্যে সংস্কার আন্দোলন; ইংলণ্ডে হিতবাদের,নরওয়ে সুইডেনে সামাজিক গণতন্ত্রের উদ্ভব: হালেভি ও মির্ডালের ব্যাখ্যা; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথার অবলুপ্তি: লিঙ্কনের প্রচেষ্টা; নারীমুক্তি ও নারী প্রগতির আন্দোলন: জন স্টুয়ার্ট মিলের অবিস্মরণীয় নেতৃত্ব; যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন: "যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই": ল্যাস্কি ও বার্ট্রাণ্ড রাসেলের নেতৃত্ব।

উদারনৈতিকতার বৈশিষ্ট্য ঃ পরস্পরবিরোধী ভাবের সহাবস্থিতি, নমনীয়তা ; বিরুদ্ধ আদর্শের মধ্যেও সমন্বয়ী প্রচেষ্টা ; স্বাধীনতা ; মানবিকতা ; যুক্তিবাদ ঃ প্রোটেস্টান্ট ও রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রভাব ; বিজ্ঞানচিন্তার, কৌতূহলী, উদ্ভাবনী দৃষ্টির উন্মেষ ; ধর্মনিরপেক্ষতা ; স্বাধিকারবাদ ও স্বৈরতন্ত্র-বিরোধিতা ; প্রাচীন ও মধ্য যুগ থেকে আধুনিকতার পথে মানবাত্মার গৌরবময় উত্তরণ (ল্যাস্কি)।

উদারনৈতিকতার সংজ্ঞা ঃ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক। লর্ড হবহাউসের সংজ্ঞা ঃ মুক্ত, অখণ্ড জীবন-প্রবাহ, প্রতিবাদী আন্দোলনের অনুপ্রেরণা।

উদারনৈতিকতার মুখ্য সমর্থকদের মতামত ঃ (ক) **টমাস্ পেন্** ব্যক্তিস্বাধীনতা, সাধারণ বুদ্ধির গুরুত্ব, প্রাকৃতিক অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা সমর্থন করেন। তাঁর অন্যান্য বক্তব্য—রাষ্ট্রের বদলে সমাজের ওপর গুরুত্বদান ; তাঁর ওপর কোয়েকার মতের প্রভাব। (খ) **জেরেমি বেন্হাম্** হিতবাদী সংস্কার আন্দোলনের নেতা ছিলেন। হবহাউস্ তাঁর মতের সমালোচনা করেন। (গ) **জন্ স্টুয়ার্ট মিলের** রাষ্ট্রদর্শনে মনীষার সঙ্গে মননশীলতার বিস্ময়কর সমাবেশ লক্ষণীয়। শিক্ষাবিস্তার, ঔপনিবেশিকতা-বিমোচন, ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, নারীগণের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা তাঁর মতবাদের অন্তর্গত। তিনি ছোটমাপের বুর্জোয়া নন, সমাজতন্ত্রী। (ঘ) **টমাস্ হিল্ গ্রীন্** আদর্শবাদী, কিন্তু গণমুখী, নীতিবাদী অধ্যাপক। তাঁর মতে, বলপ্রয়োগ নয়, ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছাই তাকে রাষ্ট্রানুগত করে তোলে, কারণ, ব্যক্তির মধ্যে সাধারণের মঙ্গল-চিন্তার (common good) লক্ষণ বর্তমান। গ্রীনের সার্বভৌমতত্ত্ব রুশো ও অস্টিনের মতের সমন্বয়। তাঁর দণ্ডনীতি আদর্শবাদী, কিন্তু বাস্তবধর্মী, সমন্বয়ী। তাঁর সম্পত্তির তত্ত্ব অনেকাংশে সমাজতান্ত্রিক। মিল্, গ্রীন্, ল্যাস্কি বৃটিশ গণসমাজতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভ। (ঙ) **লর্ড হবহাউস্** উদারনৈতিকতার সমাজতাত্ত্বিক, বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা করে সাম্য ও স্বাধীনতাকে তার দুটি লক্ষণ রূপে উল্লেখ করেন। (চ) **ওয়াল্টার লিপ্‌মানের** মতে উদারনৈতিকতার আধুনিক সংজ্ঞা—সবাই মানবত্বের অধিকারী, ব্যক্তিসত্তা অবিনশ্বর। তিনি অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনাজাতীয় সমস্ত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার বিরোধী। তাঁর মতে, সোবিয়েত রাশিয়া মার্ক্‌স্‌বাদ থেকে বিচ্যুত, সেখানে ক্ষমতার লড়াই প্রবল।

মার্ক্‌স্‌বাদ ঃ লেনিনের মতে, এর ৩টি প্রধান উৎস ঃ জার্মান দর্শন, ব্রিটিশ্ অর্থনীতি ও ফরাসী সমাজবাদ।

হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদী দর্শনের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও মার্ক্‌সের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মৌলিক, সমাজতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক (প্লেখানভ)। হেগেলপন্থী ফয়রবাখের সঙ্গে মার্ক্‌সের পার্থক্য মার্ক্‌সের "থিসিস্" গুলির মধ্যে প্রকাশিত।

মার্ক্‌সের "উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বের" ওপর ব্রিটিশ্ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদ্‌দের প্রভাব দেখা যায়।

মার্ক্‌স্ "সাম্যবাদী ইস্তাহারে" সমকালীন ফরাসী ও জার্মান কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করেছেন। প্রুধোঁর সমালোচনার জন্য তিনি বিখ্যাত।

মার্ক্‌সের শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব ঃ এ তত্ত্ব বুর্জোয়া (ধনিক) ও প্রোলেতারিয়ত (সর্বহারা) শ্রেণীদুটির সাম্যবাদী বিপ্লবের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে।

মার্ক্‌সের ইতিহাসচেতনাকে এঙ্গেল্‌স্ মর্গানের নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেন। প্লেখানভ্ হেগেলের ভাববাদী ইতিহাসদর্শনের বদলে মার্ক্‌স্‌বাদকে যুক্তিনিষ্ঠ ইতিহাসবিজ্ঞানরূপে ব্যাখ্যা করেন।

নিকোলাই বুখারিন্ মার্ক্‌স্‌বাদের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেন।

লেনিন্ মার্ক্‌স্‌বাদের সম্প্রসারণ করেন। মার্ক্‌স্‌বাদ এখন মার্ক্‌স্‌বাদ-লেনিন্‌বাদে রূপান্তরিত হয়েছে। লেনিন্‌বাদের বৈশিষ্ট্য—"বস্তুর" সংজ্ঞা, সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্র সম্বন্ধে, বুর্জোয়াদের আত্মঘাতী ভূমিকা, রাষ্ট্রের অবক্ষয়, ধনতন্ত্রের স্ববিরোধিতা, "প্রাক্সিসের" (ব্যবহার্যতার) তত্ত্ব, সঠিক মতাদর্শের

গুরুত্ব, জাতিসমস্যার কারণ ও সমাধান, "অগ্রগামী বাহিনী" ("ভ্যানগার্ড") রূপে পার্টির সর্বাত্মক ভূমিকা, সর্বহারার একনায়কত্ব সম্পর্কে আলোচনা।

রোজা লুক্সেমবুর্গ ও লেনিনের সঙ্গে "পার্টির" ভূমিকা সম্পর্কে মতপার্থক্য হয়। ভারতে সমকালীন ব্যবসায়ীদের ইংরেজবিরোধী ভূমিকার শ্রেণীভিত্তিক মূল্যায়ন নিয়ে এম. এন. রায়ের সঙ্গে লেনিনের মতপার্থক্য হয়। এ দুটি তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব মার্কসবাদের ইতিহাসে বিখ্যাত।

স্তালিন মার্কসীয়-লেনিনীয় দর্শনে অর্থনীতির তাৎপর্য, ভাষার সামাজিকীকরণ, পার্টির সার্বিক ভূমিকা প্রভৃতি ব্যাখ্যা করেন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আন্তর্জাতিক ভূমিকাকে কেন্দ্র করে স্তালিনের সঙ্গে ট্রট্স্কির ও টিটোর মতপার্থক্য ঘটে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ও সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠাতা রূপে মাও-সে তুংয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। হুনান কৃষক-আন্দোলন, গেরিলা গৃহযুদ্ধ ও দীর্ঘ পথ পরিক্রমা ("লং মার্চ") পরিচালনার পর ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর সাম্যবাদী চীনা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও মাওয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মাওবাদের বৈশিষ্ট্য : দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, শ্রেণীবিন্যাস, পার্টির ও প্রাক্সিসের প্রকৃতিনির্ণয়, গেরিলা গণযুদ্ধের তাৎপর্য, গণরণকৌশল ও অসংহতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা।

সমাজতন্ত্রী ভিয়েতনামের ও ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হো চি মিন সাম্রাজ্যবাদী গণসংগ্রামে লেনিনবাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অতি-আধুনিক ব্যাখ্যা : ইউ-রোকম্যুনিজম ও নব্য বাম পন্থা।

ইউ-রোকম্যুনিজমের ব্যাখ্যাকাররূপে ইতালির আন্তনিও গ্রামসচি ও স্পেনের সান্তিয়াগো কারিল্লোর বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ।

রাজনীতিকতার ও পার্টির ওপর বেশী গুরুত্বদান, "কর্তৃত্বের" ও তাতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা— গ্রামসচির মার্কসবাদী লেনিনবাদী ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য। গ্রামসচির মতের সমালোচনা—তিনি কি ছদ্ম-গণসমাজতন্ত্রী?

সান্তিয়াগো কারিল্লোর মতে, সোবিয়েত রাশিয়া প্রকৃত গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র নয়; ইউরোপীয় কম্যুনিজমকে সোবিয়েত-নিরপেক্ষ করার পক্ষে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন। সমবায়ের মত বিকল্প পদ্ধতিও তাঁর মতে গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন—মার্কস ও লেনিনের সময়ের "রাষ্ট্রের' চেহারা বদলেছে : স্পেনের নজির।

সোবিয়েত রাশিয়া ইউরোকম্যুনিজমকে "প্রতিক্রিয়াশীল" এবং ধ্রুপদী মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরোধী বলে মনে করে।

নব্যবামপন্থার অ্যাকসন তত্ত্বের দুই প্রধান সমর্থক এর্নেস্টো ("চে") গুয়েভারা ও রেজিস দেব্রে। দুজনেই কিউবার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে বলিভিয়ায় ব্যর্থ সাম্যবাদী বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন, চে নিহত হন। দুজনের মতবাদের বৈশিষ্ট্য—(১) ছাত্র ও লুম্পেনদেরও গেরিলা গণযুদ্ধের সামিল করতে হবে, (২) ধনতন্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী, (৩) বিপ্লব নিষ্ঠুর, অমানবিক নয়।

মার্কসবাদ জনগণকে ভাবিয়ে তুলেছে, ভাবিয়ে তুলছে, ভাবিয়ে তুলবে। মার্কসবাদের অতি-আধুনিক অন্য ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে গেওর্গ লুকাকস, কার্ল কর্ষ, হার্বার্ট মার্কুস, এরিখ ফ্রোম, জাঁ-পল সার্ত্র, থিয়োডোর আডোর্নো, লুই আলথুস্যার ও লেসজেক কোলাকাউস্কির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের কেউ কেউ কান্ট অথবা হেগেলের মতের সঙ্গে, কেউ বা ফ্রয়েডের মতের সঙ্গে মার্কসবাদের সমন্বয় সাধনের পক্ষপাতী।

অ্যাকসানধর্মী নব্য বামপন্থা ও উল্লিখিত অতি-আধুনিক ব্যাখ্যাগুলিকে ইউ-রোকম্যুনিজমের ব্যাখ্যার মতই সোবিয়েত রাশিয়ার ধ্রুপদী মার্কসবাদীগণ "অ-মার্কসীয়" বা "অ-লেনিনীয়" "বলেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাগুলির অনেকগুলিকেই মার্কসবাদের সম্প্রসারণের ও তাকে প্রগতিশীল করে তোলার প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। যে-কোন মতবাদের মত মার্কসবাদও আপেক্ষিক।

গণসমাজতন্ত্র শাসিতের কাছে শাসকের দায়িত্ব (গণতান্ত্রিকতা) ও সাম্য (সমাজতন্ত্র)—দুটি আদর্শের সমন্বয়। এটি প্রধানতঃ বৃটিশ মতাদর্শ। ইংলণ্ডের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকাই এর মূল কারণ। এর সমর্থকগণ মার্কসবাদের সমালোচনা করে বলেছেন, কেন তাঁরা মার্কসবাদকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে চান নি। তাই মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও গণসমাজতন্ত্রীদের নিজস্ব বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। ফেবিয়ান সমিতির সভ্যদের, বিশেষতঃ ওয়েব-দম্পতির এবং ডার্বিন, ল্যাস্কি ও বেয়ার্নস্টাইনের গণসমাজতান্ত্রিকতার ব্যাখ্যা ও তার মূল্যায়ন তাই তাৎপর্যপূর্ণ।

———

শাসনতন্ত্র

'সুচেতনা, এইপথে আলো জেলে—এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ।'

—জীবনানন্দ দাশ

১

শাসনতন্ত্র

"The essential characteristic of the State is its political and legal nature. This is manifested in its governmental organization ; hence the most satisfactory classification is based on the similarities and differences of governmental forms."

—Aristotle.

॥ শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা ॥

সুশৃঙ্খলভাবে যে কোনও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য দরকার কতকগুলি নিয়মকানুন। **শাসনতন্ত্র বা সংবিধান** বা **গঠনতন্ত্র** (Constitution) এই নিয়মকানুনগুলির সমষ্টি। রাষ্ট্রের মত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানেরও শাসনতন্ত্র থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। রাষ্ট্রের যে অংশ সরকাররূপে (Government) রূপায়িত, শাসনতন্ত্র ছাড়া সেই সরকারের প্রকৃতি, সংগঠন ইত্যাদি ভালভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, সরকারের সঙ্গে জনগণের যোগসূত্র সন্ধানও সম্ভব নয়।

শাসনতন্ত্র বা সংবিধানের সংজ্ঞা

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শাসনতন্ত্রের নানা সংজ্ঞা দিয়ে গেছেন। অস্টিন্ (Austin) বলেন যে শাসনতন্ত্র হল এমন একটা ব্যবস্থা যার দ্বারা সরকারের চরম ক্ষমতা বাইরের কাঠামোর মধ্যে বাস্তব রূপ লাভ করে। লর্ড ব্রাইস্ (Lord Bryce) বলেন যে, শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রের একটা ছাঁচ, যেটি আইনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে এবং এর ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে কতকগুলি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নিজেদের সুনির্দিষ্ট কার্যকলাপ, অধিকার এবং দায়দায়িত্ব নিয়ে বেড়ে ওঠে। ইংরেজ আইনবিদ্ ডাইসি (Dicey) বলেন যে, শাসনতন্ত্র হল রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের সুবিধার জন্য এবং এই ক্ষমতা নানাভাবে সুবিন্যস্ত করার জন্য কতকগুলি নিয়মকানুনের সমষ্টি। প্রখ্যাত জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লিবেয়ার (Lieber) মনে করেন যে, শাসনতন্ত্র শুধু একটা সরকারী কাঠামোমাত্র নয়, এর মাধ্যমে নাগরিকের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট হয়। তিনি বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে রাষ্ট্র এবং নাগরিকের মধ্যে এই শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয় বিভিন্ন সনদ, আইনকানুন, আদালতের সিদ্ধান্ত প্রভৃতির দ্বারা। আবার, ইংলণ্ডের মত দেশে এই শাসনতন্ত্র গড়ে ওঠে নানারূপ রীতিনীতি এবং অলিখিত প্রথার (Conventions) প্রচলনের মারফত। শাসনতন্ত্রের এই সমস্ত সংজ্ঞাগুলি পর্যালোচনা করে গিল্‌ক্রাইস্ট্ (Gilchrist) বলেছেন যে, রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হল এমন কতকগুলি লিখিত বা অলিখিত নিয়মকানুনের সমষ্টি, যেগুলির দ্বারা সরকারের সংগঠন, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে শাসনক্ষমতা বণ্টন প্রভৃতি বিষয়ে

অস্টিন্, ব্রাইস্, ডাইসি, লিবেয়ার, গিল্‌ক্রাইস্ট্ ও স্ট্রং এর সংজ্ঞা

কতকগুলি সুস্পষ্ট নীতির সৃষ্টি হয়। প্রখ্যাত শাসনতন্ত্রবিদ্ স্ট্রং (Strong) এর মতে, যে নিয়মকানুনগুলির দ্বারা সরকারের ক্ষমতা, নাগরিক অধিকার এবং সরকার ও নাগরিকের মধ্যে সম্পর্ক স্থির করা হয়, সেই বিধিগুলির সমষ্টিকে শাসনতন্ত্র বলে। শাসনতন্ত্র সম্পর্কে এই সংজ্ঞাগুলি থেকে সাধারণভাবে জানা যায় যে, সংবিধান এমন কতকগুলি মৌল রীতিনীতি, যেগুলির দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

তাহলে শাসনতন্ত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলি জানা গেল, সেগুলি হল—প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্র কতকগুলি নিয়মকানুনের সমষ্টি। এগুলি সরকার এবং নাগরিকবৃন্দ সকলেই মানতে বাধ্য। হয় চিরাচরিত প্রথা হিসাবে, নয়ত লিখিত দলিল হিসাবে দেশের সর্বোচ্চ আদালত এগুলিকে গ্রাহ্য করে ও বিশেষভাবে সম্মান দেখায়। দ্বিতীয়তঃ, আইনসভা (Legislature), নির্বাহী বিভাগ (Executive) এবং বিচার বিভাগ (Judiciary)—সরকারের এই তিনটি বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক, এদের প্রত্যেকের পৃথক ভূমিকা ইত্যাদি শাসনতন্ত্র নির্দিষ্ট করে দেয়। তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রের অন্তর্গত এবং সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাদের ক্ষমতার এলাকা স্থির করে দেয় এবং এর ফলে সরকারী শাসন-ক্ষমতা বণ্টিত ও হস্তান্তরিত (distributed and delegated) হয়। চতুর্থতঃ, শাসনতন্ত্রের বিধানগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের মত দেশে লিখিত রূপ লাভ করে। আবার, ইংলণ্ডের মত দেশে সম্পূর্ণভাবে অলিখিত রীতি-নীতি, প্রথা প্রভৃতির মাধ্যমে এগুলি অভ্যাসজনিত মান্যতা লাভ করে। তাই শাসনতন্ত্র লিখিত বা অলিখিত যাই হোক না কেন, তা দেশের সর্বোচ্চ আইন (Supreme Law of the Land) রূপে প্রসিদ্ধি ও স্বীকৃতি লাভ করে। মার্কসবাদীগণ অবশ্য সংবিধানকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেন। তাঁরা মনে করেন, সমাজে ধনোৎপাদন ও বন্টন-ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক কিনা, তা সংবিধান থেকে বোঝা যায়। তাই ধনতন্ত্রে ও সমাজতন্ত্রে সংবিধানের রূপরেখা স্বতন্ত্র ও বিপরীত।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ
এক. কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি ;
দুই. সরকারের ৩টি বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ ;
তিন. সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ

॥ শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ ॥

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে ধ্রুপদী অর্থাৎ প্রাচীন গ্রীক যুগ থেকে শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টা চলে আসছে। জ্ঞানবৃদ্ধ সক্রেটিস (Socrates) রাজতন্ত্র (Monarchy), অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) এবং গণতন্ত্র (Democracy) এই তিনটি প্রধান ভাগে শাসনতন্ত্রের সরকারী রূপকে পৃথকভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, রাজতন্ত্র হল এক ব্যক্তির সুশাসন। তবে যদি রাজা আইনের মর্যাদা রক্ষা না করেন, তাহলে রাজতন্ত্রের বিকৃত রূপে স্বৈরাচারতন্ত্রের (Despotism বা Tyranny) আবির্ভাব ঘটে। সক্রেটিসের মতে সুশাসক যদি নিঃস্বার্থভাবে বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শে দেশ শাসন করেন, তাহলে গড়ে ওঠে অভিজাততন্ত্র। কিন্তু এর বিকৃতি ঘটে যখন শাসকবর্গ সম্পত্তির মালিকদের

ধ্রুপদী (প্রাচীন গ্রীক) প্রচেষ্টা ঃ সক্রেটিস

দ্বারা প্রভাবিত হন। তখন দেখা দেয় ধনিকতন্ত্র (Plutocracy)। সক্রেটিসের মতে, গণতন্ত্রকে আদর্শ শাসনব্যবস্থারূপে স্বীকার করা যায় না। এটা হল এক ধরনের বিকৃত শাসনতন্ত্র। কারণ, এখানে নির্বোধ ব্যক্তিদের প্রাধান্য সূচিত হয়।

সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো (Plato) গুরুর বিশ্লেষণ অনুসরণ করেই শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। কিন্তু তিনি কেবলমাত্র জ্ঞানের ভিত্তিতেই শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে, সম্পূর্ণ জ্ঞানী, দার্শনিক শাসকদের (Philosopher-Kings) শাসন হল আদর্শ শাসনতন্ত্র। এ ক্ষেত্রে আইনের কোনও প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় প্রকার শাসনতন্ত্রে জ্ঞানীদের প্রভুত্ব না থাকায় সেখানে আইনের প্রয়োজনীয়তা বেশী দেখা দেয়। কেন না সেখানে আইনের চাপে শাসনক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করার ব্যবস্থা করা হয়। প্লেটোর মতে, গণতন্ত্রের মত শাসনতন্ত্রে নির্বোধ ব্যক্তিদের প্রভাব থাকে। এ ক্ষেত্রে আইনকানুন বলবৎ থাকলেও কেউ তা মানতে চায় না।

প্লেটোর প্রচেষ্টা

॥ আরিস্টটলের শাসনতন্ত্রবিভাগ নীতি ॥

প্লেটোর সুযোগ্য শিষ্য আরিস্টটল্ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি ধরনের এবং শাসনক্ষমতা কতজন লোকে ভোগ করে থাকে, এই দুটি মাপকাঠি অনুসরণ করে শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগের ব্যবস্থা করে গেছেন। তাই তাঁর প্রস্তাবিত এ দুটি মাপকাঠিকে গুণবাচক (qualitative) এবং সংখ্যাবাচক (quantitative) এই দুই পর্যায়ে ফেলা যায়। যে শাসনতন্ত্র নাগরিকদের জীবন সুন্দর ও মঙ্গলময় করে তোলে, তাকে তিনি স্বাভাবিক (normal) বলে বর্ণনা করেছেন। আবার, যে সরকার এ আদর্শ থেকে বিচ্যুত, তাকে তিনি বিকৃত (perverse বা abnormal) বলে বর্ণনা করেছেন।

আরিস্টটলের দ্বিমুখী মানদণ্ড ঃ গুণগত ও সংখ্যাবাচক

আরিস্টটলের দ্বিতীয় নিরিখ হল সংখ্যা। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব যখন এক ব্যক্তি, মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বা বহু ব্যক্তি প্রয়োগ করে, তদনুসারে তিনরকম শাসনতন্ত্র দেখা যায়।

সংখ্যাগত নিরিখ

সুতরাং আরিস্টটলের দুটি বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে শাসনতন্ত্রকে ছয় প্রকার ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি ছকের সাহায্যে আরিস্টটলীয় শাসনতন্ত্র বিভাজন ব্যাখ্যা করা যায়। সেই শাসনতন্ত্র বিভাজনের ছকটি নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

আরিস্টটলের ছক

এক ব্যক্তির শাসন		মুষ্টিমেয় ব্যক্তির শাসন	বহু ব্যক্তির শাসন
স্বাভাবিক রূপ	রাজতন্ত্র	অভিজাততন্ত্র	সাধারণতন্ত্র
বিকৃত রূপ	স্বৈরাচারতন্ত্র	ধনিকতন্ত্র	গণতন্ত্র

আরিস্টটলের পরিকল্পিত শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগের বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছে। স্ট্রং (Strong) বলেন যে বর্তমান যুগের শাসনতন্ত্রগুলি বেশীর ভাগই মিশ্র ধরনের। যেমন, ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ দেখা যায়। বর্তমানে ইংলণ্ডের রাণী রাজতন্ত্রের প্রতীক। লর্ড্‌স্‌ সভা (House of Lords) এখানকার আইনসভার উচ্চকক্ষ। এখানে বংশমর্যাদা, গুণ ইত্যাদির স্বীকৃতিস্বরূপ সদস্য মনোনীত করা হয়। সুতরাং এই সভা যেন ইংলণ্ডের অভিজাততন্ত্রের প্রতীক। আবার, কমন্স্‌ সভা (House of Commons) এখানকার আইনসভার নিম্নকক্ষ। এই কক্ষের সদস্যগণ সাধারণতঃ প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। সুতরাং কমন্স্‌ সভা ইংলণ্ডে গণতন্ত্রের প্রতীক।

আরিস্টটলের সমালোচনা ঃ
১. বর্তমান সংবিধানগুলি প্রায়ই মিশ্রধরনের

দ্বিতীয়তঃ, আরিস্টটল্‌ গণতন্ত্রকে নিকৃষ্ট শাসনতন্ত্র বলে নিন্দা করেছেন। সে যুগে গ্রীসের ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। অনেক সময় সেখানে নেতৃবৃন্দকে বিভ্রান্ত করার জন্য অন্যান্য নাগরিকগণ বক্তৃতা প্রভৃতির অপব্যবহারের দ্বারা গণতন্ত্রকে উন্মত্ত জনতার শাসনতন্ত্রে পরিণত করত। সেই তাৎক্ষণিক অর্থে আরিস্টটল গণতন্ত্রকে নিন্দা করেছেন। কিন্তু বর্তমানে গণতন্ত্রকে আদর্শ শাসনতন্ত্র বলে প্রশংসা করা হয়। কারণ, এই শাসনতন্ত্রে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, শাসন-পরিচালনার ব্যাপারে জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রভৃতি প্রতিফলিত হয় এবং জনগণ স্বাবলম্বী, দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল নাগরিকরূপে নিজেদের গড়ে তুলতে সমর্থ হন। বর্তমানে গণতন্ত্রকে যে অর্থে আদর্শ শাসনতন্ত্ররূপে বর্ণনা করা হয়, আরিস্টটল্‌ মিশ্র শাসনতন্ত্রকে (Polity) সেই অর্থে আদর্শ শাসনতন্ত্ররূপে বর্ণনা করেছেন।

২. আরিস্টটলীয় অর্থে গণতন্ত্র নিকৃষ্ট, বর্তমান যুগে আদর্শ শাসনতন্ত্র

তৃতীয়তঃ, আরিস্টটলের সময়ে গ্রীসে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত থাকলেও সেখানে ক্রীতদাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। তাই বর্তমান যুগের বিচারে তাঁর পরিকল্পিত মিশ্র শাসন-ব্যবস্থাকেও (Polity) আদর্শ শাসনব্যবস্থা বলা চলে না, এই ব্যবস্থা ছিল বৈষম্যমূলক। তবে আরিস্টটলের শাসনতান্ত্রিক শ্রেণীবিভাগ মূলতঃ নৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণসাধনই তাঁর মতে রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রিক শাসনতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ এবং উদ্দেশ্য। আধুনিক রাষ্ট্রের বা শাসনতন্ত্রের মূল লক্ষ্যও তাই। গণতন্ত্র ও অ-গণতন্ত্র এই দুই প্রধান বিভাগে শাসনতন্ত্রগুলিকে বিভক্ত করার জন্য ১৯৪৮ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো সভা সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এই দ্বিপাক্ষিক বিভাজনের প্রধান ভিত্তি হল আরিস্টটলীয় নৈতিক বিভিন্নতা। তাই আজকাল মানবতাবাদী কল্যাণকর রাষ্ট্রকে (Welfare State) অভিনন্দন জানানো হয়, আর শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যুদ্ধবাদী জঙ্গী বা আগ্রাসী বা পুলিসী রাষ্ট্রের তীব্র নিন্দা করা হয়।

৩. দাসব্যবস্থা চালু থাকার জন্য অ্যারিস্টটল বর্ণিত আদর্শ সংবিধানও বৈষম্যমূলক

আরিস্টটলের পরিকল্পনার গুণ ঃ উচ্চ নৈতিকতার আদর্শের ওপর গুরুত্ব আরোপ

॥ শাসনতন্ত্রবিভাগ সম্পর্কে আধুনিক প্রচেষ্টা ॥

আধুনিক প্রচেষ্টা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসনতত্ত্ববিদ্ ম্যারিয়ট্ (Marriot) এবং লীকক্ (Leacock) শাসনতন্ত্রবিভাগ সম্বন্ধে তাঁদের যে মতামত দিয়েছেন, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সেগুলিকে খুব মূল্যবান বলে মনে করেন।

ম্যারিয়টের প্রস্তাব : শাসনক্ষমতার বন্টনের ভিত্তিতে সংবিধান বিভাজন : এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়

ম্যারিয়ট্ সরকার কর্তৃক প্রশাসনক্ষমতা কিভাবে বিভিন্ন শাসনতন্ত্রে আঞ্চলিক ভিত্তিতে বণ্টিত হয় তার ওপর ভিত্তি করেই শাসনতন্ত্র বিভাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নীতি অনুসারে শাসনতন্ত্রকে প্রধানতঃ দুটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়—এককেন্দ্রিক (Unitary) এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal)। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্রে সমস্ত শাসনক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত করে দেওয়া হয়। বিপরীতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক দুরকম সরকারের হাতে শাসনক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত করে দেওয়া হয়। তাই ইংলণ্ডে এককেন্দ্রিক সরকার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রচলিত।

ম্যারিয়টের সমালোচনা : হুয়্যারের যুক্তিঃ যুক্তরাষ্ট্রে এককেন্দ্রিকতার ঝোঁক

ম্যারিয়টের শাসনতন্ত্রবিভাগ নীতি শাসনক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টনের ওপর নির্ভরশীল বলে এটি বাস্তবভিত্তিক। কিন্তু সর্বত্র সমানভাবে বা সাধারণভাবে এই নীতি প্রযোজ্য নয়। হুয়্যার (Wheare) আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশগুলির শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, নানা ঘটনার চাপে ও প্রতিক্রিয়ায় বর্তমানে বহু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বেশী। এগুলি প্রায় নতুন ধরনের এককেন্দ্রিক সরকার বললেও খুব ভুল করা হয় না।

লীককের প্রস্তাব : গণতন্ত্র ও স্বৈরাচারতন্ত্র এবং রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত ও মন্ত্রিসভা-চালিত-সরকার

লীকক শাসনতন্ত্রের যে আধুনিক শ্রেণীবিভাগ করেছেন, তাতে তিনি সরকারকে গণতন্ত্র এবং স্বৈরাচারতন্ত্র এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। স্বৈরাচারতন্ত্র বলতে তিনি একনায়কতন্ত্রকেই (Dictatorship) বুঝিয়েছেন। কিন্তু গণতন্ত্রের মধ্যে তিনি ইংলণ্ডের মত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ম্যারিয়টের মত তিনিও গণতন্ত্রকে সরকারী শাসনক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টনের নীতির ওপর ভিত্তি করে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। আবার, সরকারের পরিচালকমণ্ডলী সেই শাসনতন্ত্রের অন্তর্গত জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত আইনসভার কাছে কতটা দায়ী, তার ভিত্তিতে তিনি এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় এই দুপ্রকার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকেই দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি হল ইংলণ্ডে (বা বর্তমানে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের মত দেশে) মন্ত্রিসভা-চালিত বা সংসদীয় বা দায়িত্বশীল সরকার (Cabinet বা Parliamentary বা Responsible Government), আরেকটি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত (Presidential) সরকার, যেখানে রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্রে নির্দিষ্ট

কয়েক বছরের জন্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন।

কিন্তু লীককের নির্দিষ্ট শাসনতন্ত্রবিভাগ ত্রুটিপূর্ণ। তিনি একনায়কতন্ত্রের মধ্যে শুধু তাঁর পরবর্তীকালের হিট্‌লারের মত বা স্বৈরাচারী কোন রাজার মত শাসকের নেতৃত্বে পরিচালিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বেচ্ছাচারিতাকেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আধুনিক সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট দেশগুলিতেও (যেমন সোবিয়েত রাশিয়া, চীন প্রভৃতি) এক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা লক্ষ্য করা যায়। এই দেশগুলিতে মেহনতী মানুষের সার্থক প্রতিনিধিরূপে সাম্যবাদী দল ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। দ্বিতীয়তঃ, লীকক তাঁর একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থায় সামরিক একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থার বা জঙ্গী একনায়কতন্ত্রের উল্লেখ করেন নি। আধুনিক যুগে বহু দেশে প্রায়ই সামরিক অভ্যুত্থান বা কু দ্য'তা (Coup d'etat) ঘটতে দেখা যায়। তখন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত অনেক শাসনতন্ত্রকে সামরিক শক্তির চাপে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বাধীনে অবলুপ্ত করে একদলীয় একনায়কতন্ত্র স্থাপন করা হয়।

লীককের সমালোচনা ঃ আধুনিক স্বৈরাচারতন্ত্রের মধ্যেও প্রকারভেদ

আসল কথা, বর্তমানে শাসনতন্ত্র প্রস্তুত ও অনুমোদিত হয় একটা বিশেষ কাঠামোকে নিয়ে। সাধারণতঃ, কোনও নির্বাচিত গণপরিষদ (Constituent Assembly) বহু আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের পর এবং অনেক খসড়া নিয়ে বিবেচনার পর একটি লিখিত শাসনতন্ত্র পছন্দ করেন। এবং সেটি গৃহীত হয়। পরে সেই দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রভাবে প্রয়োজনমত শাসনতন্ত্রের অনেক ধারা, এমন কি তার মূল কাঠামো পর্যন্ত, বদলানো হয়। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে প্রথমে সম্পত্তির অবাধ অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়। কিন্তু পরে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ করে দেশের অগণিত দরিদ্রদের জীবনধারণের মান উন্নত করার জন্য এবং সংখ্যালঘু ধনিকশ্রেণীর সর্বময় কর্তৃত্ব দূর করার জন্য সরকার সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করেন নি। বহু ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর ভারত সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে। ব্যাংক জাতীয়করণ ইত্যাদির উপযোগিতা আজ প্রগতিশীল সরকার হিসাবে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই ভারতীয় সংবিধানের বহু ধারা পরবর্তীকালে প্রয়োজনের তাগিদে জনগণের ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে পরিবর্তন করে নিতে হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শাসনতন্ত্র কখনই একটা স্থিতিশীল ব্যবস্থা নয়। রাষ্ট্রের মূল আদর্শগুলিকে কালের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে সরকার রূপায়িত করে চলে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট জনগণ তো নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না। নতুন নতুন ঘটনার আকস্মিকতায় তারা সাময়িকভাবে অভিভূত হয় বটে, কিন্তু পরিবর্তিত পটভূমিকার সঙ্গে তাল রেখে তারা নতুন নতুন সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে। শাসনতন্ত্রই হল তাদের এই অপরূপ জীবনসংগ্রামের

উপসংহার ঃ গণপরিষদের ভূমিকা ঃ কোন সংবিধানই স্থিতিশীল নয়, বরং গতিশীল

সৈনিক হবার জন্য প্রধান হাতিয়ার। শাসনতন্ত্র যদি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রত্যাশিত রূপদানে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিক্ষুব্ধ জনতা গৃহযুদ্ধ, সামরিক অভ্যুত্থান, রক্তক্ষয়ী বিপ্লব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাদের অতৃপ্তি বা অসন্তোষ সংঘবদ্ধভাবে, অত্যন্ত উগ্রভাবে দূর করবার চেষ্টা করে।

সুতরাং বলা চলে যে, প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রও প্রগতিশীলতার অগ্রপশ্চাৎ গতির সঙ্গে তাল রেখে চলে। এক শাসনতন্ত্র পরিত্যক্ত হয়ে নতুন শাসনতন্ত্রের জন্ম হয়। তাই রাষ্ট্র দীর্ঘস্থায়ী হলেও শাসনতন্ত্র কখনও অপরিবর্তনশীল থাকে না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে ভাইম্যার প্রজাতন্ত্রের (Weimer Republic) জন্ম হয়। হিণ্ডেনবুর্গ (Hindenburg) প্রথম রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। কিন্তু হিট্‌লারের অভ্যুত্থানের ফলে জার্মানীর এই শাসনতন্ত্র পরিত্যক্ত হয় এবং তাঁর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাঁর পতনের পর ১৯৪৫ সালে জার্মানী দ্বিখণ্ডিত হয় এবং দুই জার্মানীতে দুটি পৃথক, বিভিন্ন মতাদর্শ-অনুসরণকারী শাসনতন্ত্রের জন্ম হয়। শাসনতন্ত্র আপেক্ষিক (relative) ; কারণ রাষ্ট্রজীবন আপেক্ষিক, ব্যক্তিজীবনও সমভাবে আপেক্ষিক।

ঘটনাপ্রবাহের চাপে প্রগতিশীল সংবিধানও প্রতিক্রিয়াশীল বা রক্ষণশীল হয়ে ওঠে : হিট্‌লারের অভ্যুত্থান

আধুনিক শাসনতন্ত্রবিদ্ লোয়েন্‌স্টাইন্ (Lowenstein) সংবিধানকে আদর্শানুগ (Ideologically-oriented), নামসর্বস্ব (Nominal) এবং শব্দার্থগত বিচারে বোধ্য (Semantic)—এই তিনপ্রকার ভাগে বিভক্ত করেছেন। সোবিয়েত রাশিয়া, চীনা প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলির সংবিধান "আদর্শনুগ"। সামাজিক ও সাংবিধানিক সামঞ্জস্য নির্দেশ না করলে সেই সংবিধানকে লোয়েনস্টাইন "নামসর্বস্ব" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি সমাজতন্ত্রী সংবিধানগুলিকে "শব্দার্থগত বিচারে বোধ্য" বলে ব্যাখ্যা করেছেন। উল্লেখ্য যে, মার্ক্‌স্‌বাদী সাংবিধানিকগণও সমাজে শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিফলনের সূত্র ধরে সংবিধানকে "বুর্জোয়া সংবিধান" (Bourgeois Constitution) এবং "মেহনতী মানুষের সংবিধান" (Workers' Constitution) এই দুইভাগে ভাগ করে থাকেন।

লোয়েনস্টাইনের প্রস্তাব : সংবিধানের ওপর মতাদর্শের প্রভাব—মার্ক্‌সীয় দৃষ্টিতে সংবিধান

॥ লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্র ॥

অনেক শাসনতন্ত্রবিদ্ শাসনতন্ত্রকে লিখিত (Written) এবং অলিখিত (Unwritten) এই দুইভাগে ভাগ করে থাকেন। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতীয় প্রজাতন্ত্র** প্রভৃতি বহু দেশের শাসনতন্ত্র **লিখিত**। যখন শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা-উপধারাগুলি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত কোন গণপরিষদের সদস্যদের দ্বারা আলোচিত হবার পর লিখিত দলিলরূপে গৃহীত হয়, তখন শাসনতন্ত্রকে **লিখিত শাসনতন্ত্র** বলে। পরে এই শাসনতন্ত্রের কোন কোন ধারা বা উপধারা আইনসভার অনুমোদনে পরিবর্তিত হয় এবং এই ধরনের নতুন আইনগুলিও মূল দলিলের অংশীভূত বলে বিবেচিত হয়।

লিখিত বনাম অলিখিত শাসনতন্ত্র

আবার ইংলণ্ডে অলিখিত শাসনতন্ত্র প্রচলিত। যখন শাসনতন্ত্র বলতে কোনও বিশেষ দলিল বোঝায় না এবং রাষ্ট্রপরিচালনার প্রধান বিধানগুলি প্রচলিত প্রথা, রীতি-নীতি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সাংবিধানিক সূত্রাবলীর রূপ লাভ করে এবং দেশের জনসাধারণ সেগুলিকে "শাসনতন্ত্র" রূপে মান্য করে চলে, তখন সেই শাসনতন্ত্রকে অলিখিত শাসনতন্ত্র বলে।

উদাহরণ : ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত

লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হল যে, শাসনতন্ত্রের বিধানগুলি লিপিবদ্ধ থাকায় এ ক্ষেত্রে তাদের আইনগত ব্যাখ্যা সম্পর্কে জটিলতার অবকাশ খুব কম। শাসনতন্ত্রের ধারাগুলি সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকার ফলে পেশাদারী শাসনতান্ত্রিক আইনজ্ঞের সাহায্য ছাড়াও সাধারণ লোকে এগুলি সম্বন্ধে সহজে ধারণা করতে পারে। তাই এই ধরনের সংবিধান সহজবোধ্য। দ্বিতীয়তঃ, পেশাদারী আইনবিদ্, বিচারক ও শাসকবর্গও লিখিত শাসনতন্ত্রের ধারাগুলি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারেন। তাই তাঁরা লিখিত শাসনতন্ত্র পছন্দ করেন। তৃতীয়তঃ, লিখিত গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের নানা মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত রাশিয়া, প্রজাতন্ত্রী চীন ও ভারতের শাসনতন্ত্রে এই নাগরিক অধিকারগুলি পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ আছে। রুশ, চীনা ও ভারতীয় শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের রাষ্ট্রের প্রতি নানারকম দায়দায়িত্ব পালনের কর্তব্য সম্বন্ধেও উল্লেখ করা আছে। তাই অনেকে বলেন যে, লিখিত শাসনতন্ত্রের অধীনে থেকে নাগরিকগণ তাঁদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সহজেই সচেতন হতে পারেন। চতুর্থতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি দেশে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত, সেখানে শাসনতন্ত্র লিখিত থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয়প্রকার শাসনপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রত্যেকের শাসনক্ষমতা, শাসনকার্যের দায়দায়িত্ব কেবলমাত্র লিখিত দলিলের দ্বারাই নির্ধারিত করা সম্ভব। যদি তা নিয়ে দুই শাসনপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভবিষ্যতে কোনও বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে লিখিত শাসনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলির ভিত্তিতেই উচ্চতর আদালত সে বিরোধের মীমাংসা করে থাকেন। পঞ্চমতঃ, লিখিত সংবিধানের প্রধান গুণ হল তার স্থায়িত্ব। কারণ, এই সংবিধানকে পরিবর্তন করতে বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হয়। লিখিত সংবিধান প্রায়ই অনমনীয়। সুতরাং সংবিধান স্থিতিশীল। ষষ্ঠতঃ, লিখিত শাসনতন্ত্রে বিচারবিভাগের প্রাধান্য থাকে। ফলে, কেন্দ্রীয় বা অঙ্গরাজ্য সরকারের ও নাগরিকদের অধিকাররক্ষা সহজ হয়, যদি অবশ্য বিচারালয় নিরপেক্ষ ও ন্যায়নীতিনিষ্ঠ হয়।

লিখিত শাসনতন্ত্রের গুণ : স্পষ্টতা, সহজবোধ্যতা, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার দান, নাগরিকদের কর্তব্য নির্দেশ, যুক্তরাষ্ট্রে অপরিহার্যতা, স্থিতিশীলতা, বিচারালয়ের প্রাধান্য

লিখিত শাসনতন্ত্রের অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও অনেকে এর কয়েকটা দোষের কথাও উল্লেখ করেন। প্রথমতঃ, লিখিত শাসনতন্ত্রের ধারাগুলি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শাসনক্ষমতার ভাগবাঁটোয়ারা নির্দেশ করে যে শাসনব্যবস্থা প্রচলন করে, তা

থেকে জনগণের মনে একটা বিভ্রান্তি সহজেই দেখা দেয় যে এ ব্যবস্থা যেন চিরস্থায়ী, পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা। ফলে, একে পরিবর্তন করার প্রসঙ্গ ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেক সময় জনগণের মানসিকতা সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে উঠতে পারে না। সেই প্রস্তুতির জন্য নেতাদের বহু যুক্তি দেখাতে হয়, সংবাদপত্র, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি গণতান্ত্রিক সরকারের জনমতগঠনের বিভিন্ন মাধ্যমগুলিকে কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, কেউ কেউ মনে করেন যে, লিখিত শাসনতন্ত্র বহু ক্ষেত্রে প্রগতিশীল জনমতের পরিপন্থী হয়, স্থিতিশীল, প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারধর্মকে বজায় রাখে, এমন কি তার ভিত্তিতে কায়েমী স্বার্থ তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখার একটা শক্তিশালী উপায়ও খুঁজে পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিখিত শাসনতন্ত্রের উদাহরণ অনেকে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে থাকেন। তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের বিধানগুলি লিখিত দলিলে আশ্রিত হলেই যে তারা পবিত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ, চিরপ্রগতিশীল ও অভ্রান্ত থেকে যাবে, তা মনে করা ভুল। শাসনতন্ত্র মানুষের প্রগতিশীলতা বা প্রতিক্রিয়াশীলতাকেই স্থানকালভেদে রূপায়িত করে। তাই ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী ও অনুপ্রাণিত রাজনৈতিক দলগুলি অনেক সময় একই শাসনতন্ত্রের ধারাগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা ও অপপ্রচার করে থাকেন। চতুর্থতঃ, লিখিত শাসনতন্ত্রের ধারাগুলির প্রকৃত ব্যাখ্যা জানার জন্য প্রায়ই বিবদমান গোষ্ঠীদের উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়। বিচারালয় এতে পরোক্ষভাবে ক্ষমতাবান হয়ে পড়ে, এক ধরনের কায়েমী স্বার্থে পরিণত হয়, বিবদমান গোষ্ঠীদের হয় অজস্র অর্থ ব্যয় এবং সময়ের ক্ষতি। পঞ্চমতঃ, মার্কসবাদীগণ মনে করেন যে, শ্রেণীবৈষম্যযুক্ত সমাজে আদালতের নিরপেক্ষতা অবাস্তব।

লিখিত সংবিধানের দোষ ঃ জনমনে আপাতস্থায়িত্বসূচক বিভ্রান্তি, কায়েমীস্বার্থের জন্ম, রক্ষণশীলতা, বিচারালয়ের প্রাধান্যলাভ ও কায়েমীস্বার্থ, এ বিষয়ে মার্কসীয় মন্তব্য

অলিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হল এই যে, প্রথমতঃ, জাতীয় জীবনের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পারম্পর্যের সঙ্গে তাল রেখে, দেশের জনগণের নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এই শাসনতন্ত্র ক্রমশঃ গড়ে ওঠে। এইভাবে শাসনতন্ত্র জনগণকে উজ্জ্বলতর, সমৃদ্ধতর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রগামী করে তোলে, যেন একটা কালচার গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ট্রেভেলিয়ান (Trevelyan) প্রমুখ বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ তাই বলেছেন যে, ইংলণ্ডের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সব রকমের ইতিহাসই ভালভাবে বুঝতে গেলে ইংলণ্ডের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস ঠিকমত বোঝা দরকার। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডের ইতিহাসে জাতীয় জীবনের ধারাবাহিকতা এর অলিখিত শাসনতন্ত্রের প্রভাবে প্রভাবিত। এই ধারাবাহিকতার মধ্যে সহজেই অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। কিভাবে ইংলণ্ডে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটল, কিভাবে রাজতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে পরিণত হল, এই ধাপগুলি ইংরেজদের পিতৃপিতামহের পূর্বতন অস্তিত্বের মতই তাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনে এক একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন রেখে গেছে, ঐতিহ্যগত ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। তৃতীয়তঃ, অনেকে মনে করেন যে

শুধুমাত্র লিখিত শাসনতন্ত্রেই ব্যক্তিস্বাধীনতা সুরক্ষিত করা যায়। এ কথা যে কত ভুল, তা ইংলণ্ডের অলিখিত শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা করলে বেশ বোঝা যায়। পৃথিবীর বহু দেশে এখন লিখিত শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছে। তার কত আগে থেকে ইংলণ্ডে অলিখিত শাসনতন্ত্র কার্যকর হয়ে এসেছে। এখনও এই দেশে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে অলিখিত শাসনতন্ত্রের বিধানগুলি মান্যতা লাভ করে থাকে। অনেকের মতে, ব্যক্তিস্বাধীনতা এমন সুপরিকল্পিতভাবে অন্য কোন্ দেশের লিখিত শাসনতন্ত্রে সংরক্ষিত হতে পেরেছে, তা ভাববার বিষয়। মার্ক্সবাদীগণ অবশ্য মনে করেন যে, পুঁজিবাদী সমাজের আদালত কদাচিৎ ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে। চতুর্থতঃ, অনেকের মতে, সাধারণতঃ নমনীয় হবার ফলে অলিখিত সংবিধান যুদ্ধ প্রভৃতি জরুরী অবস্থায় বিশেষভাবে কার্যকর।

অলিখিত শাসনতন্ত্রের গুণ: জাতীয় কাল্চার গঠনে সহায়ক, ট্রেভেলিয়ানের মন্তব্য; ঐতিহ্যগত ধারাবাহিকতা বজায় থাকে; নাগরিক অধিকার সুরক্ষা করাও সম্ভব, জরুরী অবস্থাতে কার্যকর

কিন্তু **অলিখিত শাসনতন্ত্রের** বেশ কয়েকটি **দোষ** সহজেই বোঝা যায়। প্রথমতঃ, এই শাসনতন্ত্রের অনেক বিধান অস্পষ্ট বলে মনে হতে পারে। তাই সংবিধানের স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, শাসকগণ ইচ্ছামত এই বিধানগুলি নিজেদের খেয়ালখুশী অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে পারেন। অবশ্য একথা ঠিক যে, ইংলণ্ডের জনগণের নিয়মতন্ত্রপ্রীতি অত্যন্ত প্রগাঢ় হবার ফলে শাসকগণ শাসনতন্ত্রের এরকম অপব্যাখ্যা করতে সাহসী হন না। কিন্তু তবুও এ সম্ভাবনা থেকেই যায়। তৃতীয়তঃ, অলিখিত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রবর্তন করা কখনই সম্ভব বা বাঞ্ছনীয় নয়। ইংলণ্ডে অলিখিত শাসনতন্ত্র যুগ যুগ ধরে প্রচলিত থাকার ফলে শাসনতন্ত্রবিদ্গণ একরকম ধরেই নিয়েছেন যে সেখানে কোন দিনই এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হবে না।

অলিখিত শাসনতন্ত্রের দোষ: সংবিধানের অস্পষ্টতা, যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করার প্রবণতা, যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অসুবিধা

লিখিত এবং অলিখিত এই দুই ভাগে শাসনতন্ত্রকে বিভক্ত করার প্রচেষ্টা কার্যতঃ অবাস্তব। লর্ড ব্রাইস্ (Lord Bryce) ঠিকই বলেছেন যে, প্রত্যেক দেশের শাসনতন্ত্রই কিছু অলিখিত, কিন্তু সুপ্রচলিত, প্রথা এবং কিছু লিখিত দলিলপত্রাদির মিশ্রণে সংগঠিত। ধরা যাক্ ইংলণ্ডের অলিখিত শাসনতন্ত্রের কথা। এই অলিখিত শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান অংশ অনেক সংসদীয় বিধান এবং লিখিত ঘোষণা। ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা জনের (King John) দ্বারা স্বীকৃত ম্যাগ্না কার্টা (Magna Carta), ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দের সুবিখ্যাত বিল্ অফ রাইট্স্ (Bill of Rights), ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দের অ্যাক্ট অফ্ সেট্ল্মেন্ট্ (Act of Settlement), ১৯১১ এবং ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের পার্লামেন্ট অ্যাক্ট (Parliament Act) প্রভৃতি লিখিত দলিলের মারফত ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের অনেক বিধান সুস্পষ্ট আকার লাভ করেছে। আবার, ধরা যাক্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের কথা। এই শাসনতন্ত্রটি মূলতঃ একত্রিশ পৃষ্ঠার একটি ছোট দলিল।

উপসংহার: ব্রাইসের মন্তব্য—প্রায় সব সংবিধানেই লিখিত ও অলিখিত অংশ মিশ্রিত থাকে, কেন না সংবিধান স্থিতিশীল নয়, গতিশীল

কিন্তু দীর্ঘ ২০০ বছর ধরে বহু উপধারার সংযোজনের ফলে, শাসনতন্ত্রের অনেক পরিবর্তিত ধারার অন্তর্ভুক্তির ফলে এবং দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের দ্বারা বিঘোষিত শাসনতন্ত্রের বহু জটিল অংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হবার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান শাসনতন্ত্র বোধ হয় হাজার পৃষ্ঠার একটি সুবৃহৎ গ্রন্থের আকার ধারণ করবে। উপরন্তু মার্কিন শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশ ছাড়াও এমন একাধিক বিষয় আছে, যা মূল শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয় নি, কিন্তু পরে ঐ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নির্বাচনব্যবস্থা। মার্কিন শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ রাষ্ট্রপতিকে সাধারণ জনগণের পছন্দ-অপছন্দের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য তাঁর নির্বাচনের ব্যাপারটি একটি নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে ছেড়ে দেন। জনগণ প্রত্যক্ষভাবে এই নির্বাচকমন্ডলীর সদস্যদের নির্বাচন করেন। পরে নির্বাচকমন্ডলীর সদস্যগণ মিলিতভাবে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির দ্বারা রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ যখন দলগত ভিত্তিতে ভোট দিয়ে রাষ্ট্রপতির নির্বাচকমণ্ডলীতে বিশেষ কোনও দলের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করে তোলেন, তখনই জানা যায় কোন্ দলের প্রার্থী শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। অর্থাৎ, মূল লিখিত সংবিধানে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনব্যবস্থা পরোক্ষ করে রাখা হলেও পরবর্তীকালে দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যক্ষভাবেই নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে, শাসনতন্ত্র লিখিতই হোক বা অলিখিতই হোক, নতুন নতুন প্রথা, আদালতের ব্যাখ্যা, সরকারী ঘোষণাপত্র ইত্যাদির সুবিন্যস্ত সংযোজনেই এক একটি শাসনতন্ত্র আধুনিকত্বের এবং প্রগতিশীলতার পর্যায়ে উন্নীত হয়। শাসনতন্ত্র একটা নির্জীব স্থাপত্য নয়। এটা হল কোনও দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক, সচেতন, জৈবিক, রাষ্ট্রসত্তার বাহ্য প্রতিকৃতি।

॥ সংবিধান বিভাজনের আরেকটি বিকল্প ॥

নমনীয় বা সুপরিবর্তনীয় ও অনমনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র

বিকল্প প্রস্তাব ঃ নমনীয় বা সুপরিবর্তনীয় ও অনমনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান

শাসনতন্ত্রকে লিখিত এবং অলিখিত এই দুইভাগে ভাগ করার পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত নয়। এই বিভাগপদ্ধতির অবাস্তবতা প্রমাণ করে লর্ড ব্রাইস্ শাসনতন্ত্রের বিভাজনের একটি বিকল্প উপায় স্থির করেছিলেন। কোন্ শাসনতন্ত্র অন্যের তুলনায় কিভাবে সংশোধন করা যায় তার ভিত্তিতে তিনি শাসনতন্ত্রগুলিকে নমনীয় বা সুপরিবর্তনীয় (flexible) এবং অনমনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় (rigid) এই দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

যে শাসনতন্ত্রের বিধানগুলি যেভাবে সাধারণ আইন আইনসভার দ্বারা রচিত বা সংশোধিত হয়, ঠিক সেই প্রণালীতেই এবং সেই কর্তৃপক্ষের দ্বারাই বিধিবদ্ধ বা

সংশোধিত হতে পারে, ব্রাইস্ সেই শাসনতন্ত্রের নাম দিয়েছেন **নমনীয় বা সুপরিবর্তনীয়** শাসনতন্ত্র। এ ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক আইন এবং সাধারণ আইন সমান মর্যাদা লাভ করে থাকে। **ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র শাসনতন্ত্র নমনীয়** ; কারণ, এদেশের আইনসভা যেমন আইন প্রণয়নের অধিকারী, তেমনি আইন সংশোধনেরও অধিকারী। সংবিধান সংশোধনের জন্য বিশেষ কোনও পদ্ধতি ইংলণ্ডে অনুসৃত হয় না। অর্থাৎ, যেভাবে সাধারণ সংখ্যাধিক ভোটের দ্বারা (simple majority of votes) আইনসভা সাধারণ আইন প্রণয়ন করে, সেইভাবেই একই প্রণালীতে সে সংবিধানও সংশোধন করে থাকে। সংবিধান সংশোধনের জন্য আইনসভার সংখ্যাধিক ভোটের কোনও ন্যূনতম পরিমাণ ইংলণ্ডের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট করা নেই। স্মরণীয় যে, বর্তমানে শুধু **ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রই পুরোপুরি নমনীয়**।

সংবিধানের সংশোধন-পদ্ধতির পার্থক্য অনুসারে এই বিভাজন

অপরপক্ষে, যে শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য কোনও বিশেষ কার্যক্রম অনুসরণ করা প্রয়োজন হয়, অথবা কোনও বিশেষ পরিষদ গঠন করতে হয়, সেই শাসনতন্ত্রকে ব্রাইস্ **অনমনীয়** বা **দুষ্পরিবর্তনীয়** বা **কঠোর** শাসনতন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হল অনমনীয়** শাসনতন্ত্রের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। এ দেশে সাধারণ আইন যেভাবে সংশোধিত হয়, সেই ভাবে সংবিধান সংশোধন করা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার দুটি কক্ষ—প্রতিনিধিসভা (House of Representatives) এবং সেনেট্ (Senate)। পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্য নিয়ে গঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার দুটি কক্ষে প্রত্যেকটির মোট সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যবৃন্দ প্রস্তাব আনবেন। তারপর সেই সংশোধন প্রস্তাব তাঁদের সম্মতিসহ পঞ্চাশটি অংগরাজ্যের আইনপরিষদগুলির কাছে পাঠানো হবে। আঞ্চলিক আইনপরিষদগুলির তিন-চতুর্থাংশ যদি ঐ সংশোধনী প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে সম্মত হয়, তবে ঐ বিশেষ সংশোধন প্রস্তাবটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবে।

উদাহরণ : ইংলণ্ড্ (নমনীয়) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (অনমনীয়)

॥ নমনীয় ও অনমনীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের তুলনা ॥

নমনীয় সংবিধান	অনমনীয় সংবিধান
১. সংবিধানের পরিবর্তন পদ্ধতি সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতির মত।	১. সংবিধান পরিবর্তন পদ্ধতি বিশেষ ধরনের।
২. সুতরাং এখানে সাধারণ আইন (Ordinary Law) এবং সাংবিধানিক আইনের (Constitutional Law) মধ্যে পার্থক্য নেই।	২. এই সংবিধানে সাংবিধানিক আইনের পৃথক্ অস্তিত্ব ও চিহ্ন থাকে।
৩. সাধারণ আইন ও সাংবিধানিক আইনের উৎস একই।	৩. সাধারণ আইন ও সাংবিধানিক আইনের উৎস পৃথক্।

নমনীয় সংবিধান	অনমনীয় সংবিধান
৪. এই সংবিধান লিখিত বা অলিখিত দুই-ই হতে পারে।	৪. এই সংবিধান সাধারণতঃ লিখিত।
৫. এখানে আইনসভা সার্বভৌম।	৫. এখানে লিখিত সংবিধানকেই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বলা হয়।
৬. যেহেতু আইনসভা সার্বভৌম, তাই আইনসভার দ্বারা অনুমোদিত আইনের যাথার্থ্য নিয়ে বিচারালয় কোন সিদ্ধান্ত করতে পারে না।	৬. সংবিধানবিরোধী মনে করলে বিচারালয় যে কোন আইনকে বাতিল করে দিতে পারে।

নমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান **গুণ** হল এই যে, প্রথমতঃ, দেশের পরিবর্তিত রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে শাসনতন্ত্রকে সহজেই খাপ খাইয়ে নেওয়া চলে। ব্রাইস্ তাই বলেছেন যে, অভাবনীয় ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সংবিধানের কাঠামো নষ্ট না করেই নমনীয় শাসনতন্ত্রকে প্রসারিত ও নমিত করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের নমনীয়তার জন্য ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে, জনসাধারণকে সশস্ত্র বিপ্লবের বা তীব্র বিক্ষোভের পথে ধাবিত হতে হয় নি।

নমনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ ঃ গতিশীলতা, সশস্ত্র বিপ্লব বা অশান্তির সম্ভাবনা কম

কিন্তু **নমনীয় শাসনতন্ত্রের দোষ** রয়েছে। প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্র যেমন পরিবর্তনশীল হওয়া দরকার, তেমনই তার স্থায়িত্বও দরকার। দ্বিতীয়তঃ, নমনীয় শাসনতন্ত্র যে রাষ্ট্রে প্রচলিত, সেখানে যে কোনও অছিলায়, যে কোনও সাময়িক গণ-উত্তেজনার চাপে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য দাবী উঠতে পারে। ফলে, কায়েমী স্বার্থ সুরক্ষিত হতে পারে, দলবাজি বৃদ্ধি পেতে পারে। তৃতীয়তঃ, তথাকথিত গণতান্ত্রিক নমনীয়তা ও শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের নামে শুধু ছেলেখেলা হতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলনেতাগণ আইনসভায় ভোটাভুটির জোরে সংবিধানকে নিজেদের হাতের পুতুলে পরিণত করতে পারেন। কায়েমী স্বার্থের চাপে প্রকৃত অর্থে নাগরিক অধিকারগুলি বিপন্ন হতে পারে। চতুর্থতঃ, সংশোধনী প্রস্তাবটি আইনসভার নিকট উপস্থাপিত অন্যান্য সাধারণ আইনের খসড়ার সঙ্গে সমতুল্য বলে বিবেচিত হবে। সেজন্য শাসনতন্ত্রের যথোচিত মর্যাদা, গুরুত্ব ও পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গত ৩৫ বছরে ৪৪ বার সংবিধান সংশোধনের জন্য ভারতীয় সংবিধানের পরিবর্তনপদ্ধতির বিরুদ্ধে অনেকে সমালোচনা করেন।

নমনীয় শাসনতন্ত্রের দোষ ঃ স্থায়িত্ব ব্যাহত হবার সম্ভাবনা, কায়েমী স্বার্থের জন্ম, সংখ্যাগরিষ্ঠদের চাপ, সংবিধানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ

অনমনীয় শাসতন্ত্রের প্রধান **গুণ** হল তার স্থায়িত্ব ও স্পষ্টতা। শাসনতন্ত্র রচনার সময় জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত গণপরিষদে অনেক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অনমনীয় শাসনতন্ত্রের বিধানগুলি রচিত হয়। সাধারণতঃ এই শাসনতন্ত্র লিখিত দলিলের সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। এর বিধানগুলিও তাই লিখিত আকার

ধারণ করে। তাই শাসনতন্ত্র পরিচালনার ব্যাপারে কোনও অনিশ্চয়তা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের বিধানগুলি স্থায়ীভাবে দীর্ঘদিন সক্রিয় থাকার ফলে জনগণের বা রাষ্ট্রের জীবনের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয় না। যখন তখন জনগণ সাময়িক উত্তেজনার বা খেয়ালখুশীর চাপে শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য আন্দোলন করতে পারেন না। তৃতীয়তঃ, এই সংবিধানে প্রায়ই জনগণের অধিকার লিখিত থাকে। ফলে, জনগণ তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকে। তাই অনমনীয় শাসনতন্ত্রকে গণতন্ত্রের সহায়ক বলে অনেকে মনে করেন। চতুর্থতঃ, সাংবিধানিক আইনকে সাধারণ আইনের চেয়ে উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। তাই অনমনীয় সংবিধানের প্রতি জনগণ শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় অনমনীয় সংবিধানে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতা ও অধিকার স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট থাকার ফলে অনমনীয় সংবিধান চরমভাবে কেন্দ্রাভিমুখী হতে পারে না, বরং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের (Decentralisation of Power) সুবিধা হয়।

অনমনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ ঃ স্থায়িত্ব, স্পষ্টতা, নাগরিক অধিকার সুরক্ষা, সংবিধানের বিশেষ মর্যাদা, যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের সম্ভাবনা

কিন্তু অনমনীয় শাসনতন্ত্রের আবার কতকগুলি গুরুতর দোষ আছে। প্রথমতঃ, সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল যে, প্রয়োজনমত অনমনীয় শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০০ বছরের সুদীর্ঘ শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এই শাসনতন্ত্র এ পর্যন্ত মাত্র ২২ বার সংশোধিত হয়েছে। মার্কিন শাসনতন্ত্র অনেক বেশী রক্ষণশীল হয়ে উঠত, যদি প্রচুর প্রথাগত বিধান এবং বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তের সংযোজনে এই অনমনীয় শাসনতন্ত্রটি সমৃদ্ধ না হত। এই জন্যই রীচি (Ritchie) তাঁর বিখ্যাত মন্তব্য করেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনমনীয় শাসনতন্ত্রে সংবিধান-বহির্ভূত অনেক কিছু সংযোজিত হবার ফলেই এই সংবিধান প্রগতিশীলতার পথে ধাবমান হতে পেরেছে ডারউইনের বিবর্তনবাদী পথে, নিউটনের গাণিতিক স্থিতিশীল পথে নয় ("The American Constitution is a living organism. It is a Darwinian and not Newtonian affair……")। কিন্তু সর্বদা এই বৈশিষ্ট্য না-ও দেখা যেতে পারে। তখন দেখা যায় চরম রক্ষণশীলতা, জনগণের তীব্র ক্ষোভ, অশান্তি। দ্বিতীয়তঃ, অনমনীয় শাসনতন্ত্র বিচারালয়কে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সাংবিধানিক ব্রগ্যান (D. W. Brogan) মার্কিন সুপ্রীম কোর্টকে তাই ঠাট্টা করে "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভার তৃতীয় কক্ষ" ("third chamber of American Congress") বলে সমলোচনা করেছেন। অনেকের অভিযোগ যে, এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ হয়ে পড়ে।

অনমনীয় শাসনতন্ত্রের দোষ ঃ রক্ষণশীলতা, বিচারালয়ের প্রাধান্য ও কায়েমী স্বার্থসৃষ্টি

সুতরাং শাসনতন্ত্রকে নমনীয় এবং অনমনীয় এই দুই ভাগে ভাগ করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আদর্শ শাসনতন্ত্র এমন হওয়া উচিত যে, গতি এবং স্থিতি এই দুটি পরস্পরবিরোধী প্রবণতাকে যেন দরকারমত স্বীকার করে নেওয়া

সম্ভব হয়। মনে রাখা দরকার যে, সংবিধানের প্রকৃত নমনীয়তা তার সংশোধনের সাবলীলতার ওপর নির্ভর করে না। এই নমনীয়তার প্রাণকেন্দ্র জন-মানসিকতা। জনগণ পছন্দ করলেই, জনমত সোচ্চার হলেই শাসনতন্ত্র পরিবর্তন এমন কি পরিত্যক্তও হতে পারে। তাই দেখি, ফরাসীদেশের তৃতীয় প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান (Third French Republic) সাংগঠনিক দিক থেকে অত্যন্ত নমনীয় হলেও ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সে দেশে কোনও সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। আবার, দুশো বছরের পুরাতন অনমনীয় মার্কিন সংবিধান নানা প্রকার রীতিনীতি, বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত (judge-made law) ইত্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ, মাত্র ২২ বার সংশোধিত হয়েও তা যথেষ্ট গতিশীল রয়েছে।

॥ ভারতীয় শাসনতন্ত্রের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ॥

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে ভারতীয় শাসনতন্ত্র কার্যকর। এ দিনটি ভারতীয়দের কাছে চিরস্মরণীয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ভারত ইংরেজ সরকারের নামমাত্র নিয়ন্ত্রণাধীন ডোমিনিয়ান্ (Dominion) রূপে পরিগণিত হত। ডোমিনিয়ান্‌গুলি প্রাক্তন ইংরেজ উপনিবেশ। ডোমিনিয়ান্ স্বায়ত্তশাসনের অর্থ কার্যতঃ সব ব্যাপারেই স্বাধীনতাপ্রাপ্তি। ডোমিনিয়ান্‌গুলি অন্য রাষ্ট্রদের সঙ্গে দূতবিনিময় করতে পারে, অন্য রাষ্ট্রদের সঙ্গে সন্ধি বা অন্য চুক্তিতে বদ্ধ হতে পারে, অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করতে পারে। তাই ডোমিনিয়ান্‌গুলি বাস্তব অর্থে সার্বভৌম (*de facto* sovereign) ; কিন্তু সব আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রেই এদের ইংরেজ রাজমুকুটের (British Crown) অর্থাৎ ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর চূড়ান্ত অনুমোদন নিতে হয়। এদের সর্বোচ্চ শাসক গভর্নর জেনারেল (Governor-General). তিনি ইংরেজ রাজমুকুটের অনুমোদনে নিযুক্ত হন। কিন্তু এই সব অনুমোদনের ব্যাপারে ইংলন্ডের রাজা বা রাণী নামমাত্র শাসকের ভূমিকাই পালন করে থাকেন। তিনি যেমন নিজের দেশের মন্ত্রিসভা বা আইনসভার সিদ্ধান্ত কখনও অমান্য করেন না, তেমনি কোনও ডোমিনিয়ান্ সরকারের মন্ত্রিসভা বা আইনসভার সিদ্ধান্তও অমান্য করেন না। কিন্তু এ কথা বিতর্কাতীত যে, শাসনতান্ত্রিক আইনের চুলচেরা বিচারে ডোমিনিয়ানগুলি নামমাত্রভাবে হলেও ইংরেজ সরকারের কর্তৃত্বাধীন। তাই সূক্ষ্মভাবে এগুলির মান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গার্নার (Garner) এগুলিকে "প্রায়-স্বাধীন ("independent or nearly so") বলে অভিহিত করলেও আইনের বিচারে এগুলিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলা যায় না।

ভারতীয় সংবিধানের স্বরূপ : ১৫ই আগস্ট (স্বাধীনতা দিবস) ও ২৬শে জানুয়ারী (প্রজাতন্ত্র দিবস) — উভয়ের তাৎপর্য

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে ভারত নিজেকে "সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" ("Sovereign Democratic Republic") বলে ঘোষণা করেছে। সুতরাং এ দিনটি থেকেই ভারত তার বহুপ্রত্যাশিত "পূর্ণ স্বরাজের" আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করতে সক্ষম হল। তাই ১৫ই আগস্ট তারিখটি ভারতে "স্বাধীনতা দিবস" (Independence Day) রূপে পালিত হলেও ২৬শে জানুয়ারী তারিখটি যেন আরও গুরুত্ব-

প্রজাতন্ত্র দিবসের বিশেষ তাৎপর্য

পূর্ণ। কারণ এ দিনটি হল "প্রজাতন্ত্র দিবস" বা "সাধারণতন্ত্র দিবস" (Republic Day), ভারতে ইংরাজ-রাজের পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বরাজের অভ্যুদয়।

ভারতের প্রজাতন্ত্রী সংবিধানের মধ্যে ৩৯৫ টি ধারা এবং ৯টি তালিকা (Schedule) রয়েছে। এই শাসনতন্ত্রের **প্রথম বৈশিষ্ট্য** হল এটি একটি লিখিত শাসনতন্ত্র এবং পৃথিবীর দীর্ঘতম লিখিত শাসনতন্ত্র। এই সংবিধান রচনাকালে গণপরিষদ (Constituent Assembly) ইংলন্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি বহু উন্নত দেশের শাসনতন্ত্রের অনেক মূল্যবান বৈশিষ্ট্য ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত করেছেন। ইংলন্ডের মত ভারতে কেন্দ্রে ও অংগরাজ্যগুলিতে মন্ত্রিসভা-পরিচালিত শাসনতন্ত্র (Cabinet বা Parliamentary type of Government) প্রবর্তিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়েছে। সোবিয়েত রাশিয়ার মত নাগরিকদের মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকার প্রবর্তনের জন্য ভারতীয় সংবিধানও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তা ছাড়া ভারতের নানা অঞ্চলে অসংখ্য আঞ্চলিক সমস্যা। এদেশে ভাষা, ধর্ম, লিপি নিয়ে পৃথক্ পৃথক্ বহু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বসবাস করেন। তাঁদের নানা অধিকার নিয়ে সংবিধান-রচয়িতাগণকে ভাবতে হয়েছে ও সংবিধানে তার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এই সকল কারণে ভারতের শাসনতন্ত্রটি একটি বিরাট দলিলের আকার ধারণ করেছে। উপরন্তু এই বিশাল লিখিত দলিলের সঙ্গে বহু প্রথাগত বিধানও কার্যকর। যেমন, কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের আইনসভার সভ্যগণ যে বিশেষ সংসদীয় সুবিধা ও অধিকার (Parliamentary privileges) ভোগ করেন, সেগুলি লিখিতভাবে ভারতীয় সংবিধানে নেই। সেগুলি ব্রিটিশ্ পার্লামেন্টের সভ্যগণ প্রথাগত বিধানের মারফত যে সুবিধাগুলি ভোগ করে থাকেন, তাদেরই অনুরূপ। ভারতীয় সংবিধানে তাই বলা আছে। সুতরাং ভারতীয় সংবিধানে লিখিত ও অলিখিত উভয় প্রকার নীতির সমন্বয় দেখা যায়।

ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য: [১] বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন সংবিধানের মত না হলেও ভারতীয় শাসনতন্ত্রে সংবিধানের প্রাধান্য সূচিত। ১৯৬৭ সালে গোলকনাথ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট্ সিদ্ধান্ত করেন যে, মৌলিক অধিকারগুলি সংকোচনের জন্য সংবিধান পরিবর্তনের কোন ক্ষমতা পার্লামেন্টের নেই। তারপর ৪২তম সংশোধনী আইনে পার্লামেন্ট্‌কে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়, সংবিধানের প্রাধান্য প্রায় লুপ্ত হয়। এরপর ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সুপ্রিম কোর্ট্ বলেন যে, সংবিধানের মৌল কাঠামো বদলাবার অধিকার পার্লামেন্টের নেই। ৪২-তম সংশোধনী আইনে পার্লামেন্টকে এই অধিকার দেওয়া হলেও ১৯৮০ সালের মিনার্ভা মিল্‌স্ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট্ ৪২তম সংশোধনী আইনটিকেই নাকচ করে দিয়েছেন।

[২] সংবিধানের প্রাধান্য সূচিত

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের **তৃতীয় বৈশিষ্ট্য** হল, এতে ভারতের সার্বভৌম ও প্রজাতন্ত্রী স্বরূপ বিশেষ জোরের সঙ্গে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। **সংবিধানের প্রস্তাবনায়** (Pre-

amble) ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভারত একটি পূর্ণ সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ("Sovereign Democratic Republic")। তা ছাড়া প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভারতের সংবিধান নাগরিকদের চিন্তা, ভাবপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্মানুষ্ঠান পালন প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীনতা ("Liberty of thought, expression, belief, faith and worship") সংরক্ষণ করবে। সংবিধান নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়াদর্শ ("Justice, social, economic and political") প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হবে। সংবিধান ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে মানমর্যাদা ও সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে সাম্যনীতি ("Equality of status and opportunity") অনুসরণ করবে। সংবিধান ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ("unity of the nation") এবং ব্যক্তির মর্যাদা ("dignity of the individual") প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হবে এবং ভারতীয়দের এক অখণ্ড ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে ("Fraternity") আবদ্ধ করবে। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধন অনুসারে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে অতিরিক্তভাবে "সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ" ("Socialist, secular") প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

[৩] প্রজাতন্ত্রী সংবিধান

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় অনেক সুমহান্ আদর্শের কথা বলা হয়েছে। এগুলি যে নিছক ফাঁকা বুলি নয়, তা বোঝাবার জন্যই যেন সংবিধানে নাগরিকদের নানারকম মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং জনকল্যাণকর রাষ্ট্ররূপে (Welfare State) ভবিষ্যতে সরকারের দ্বারা রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য নির্দেশক কতকগুলি প্রগতিশীল নীতি (Directive Principles of State Policy) ঘোষণা করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় "গণতন্ত্র" ও "প্রজাতন্ত্র" এই দুটি বিশেষণে ভারতীয় রাষ্ট্রকে ভূষিত করাটাও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। "প্রজাতন্ত্র" হলেও সেটা গণতন্ত্র নাও হতে পারে। কারণ, কোনও সামরিক নেতা বা কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দল প্রজাতন্ত্রের মুখোশ ধারণ করে দেশে তাঁদের ব্যক্তিগত বা দলগত স্বৈরাচার স্থাপন করতে পারেন। সংবিধানে তাই "সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" কথাগুলি দিয়ে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে ভবিষ্যতে ভারতে কোনও প্রকার স্বৈরাচারী শাসনের অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের (Adult Franchise) নীতিকে মেনে নিয়েছে। ফলে যেখানে পরাধীন ভারতে, অর্থাৎ ইংরাজ আমলে, মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৪ থেকে ১৮ অংশ ভোটদাতা ছিলেন, সেখানে বর্তমানে স্বাধীন ভারতে এই অঙ্ক দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫০ থেকে ৫২ ভাগ।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার তাৎপর্য

ইংলণ্ডের কর্তৃত্বাধীন ডোমিনিয়ানগুলি নিয়ে গঠিত কমনওয়েলথ (Commonwealth of Nations) সংগঠনের প্রধানমন্ত্রীগণ ১৯৪৯ সালে যখন লণ্ডনে মিলিত হন, ভারত তখন ছিল একটি ডোমিনিয়ান্। ভারতের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই সংস্থায় ভারতের অন্তর্ভুক্তি ঘোষণা করেন। কিন্তু ভারতের

দাবী অনুযায়ী কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ সংগঠনের পূর্বেকার নাম থেকে "ব্রিটিশ্‌" কথাটি বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং ইংলণ্ডের রাজমুকুটকে শুধু কমন্‌ওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের, সংস্কৃতির বিরাট, অপরূপ ঐক্যের প্রতীকরূপে (Symbol of Unity) স্বীকার করে নেওয়া হয়। সে সময় অনেকে কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ সংগঠনে ভারতের অন্তর্ভুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে বলেন যে এর ফলে ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবে। কিন্তু তখন ভারত সরকার ঘোষণা করেন যে, কমন্‌ওয়েল্‌থের সদস্য হিসেবে ভারত কোনভাবে ইংলণ্ডের বশ্যতা স্বীকার করবে না। যে কোনও সময়ে ভারত ইচ্ছা করলে ডোমিনিয়ান্‌ অবস্থা থেকে পূর্ণ সার্বভৌমত্বের অবস্থায় উন্নীত হতে পারে এবং কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ ছেড়েও দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ভারত ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে ডোমিনিয়ান্‌ শাসনতন্ত্র ত্যাগ করে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে। কমন্‌ওয়েল্‌থে ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকা তার পূর্ণ সার্বভৌমত্ব লাভের পথে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। তা ছাড়া কমন্‌ওয়েল্‌থে অন্তর্ভুক্ত থাকার ফলে ভারতের পক্ষে নানাপ্রকার বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সুযোগসুবিধা লাভ সম্ভব হয়েছে।

কমন্‌ওয়েল্‌থে ভারতের অবস্থিতির তাৎপর্য

ভারতীয় সংবিধানের **চতুর্থ বৈশিষ্ট্য** হল এর গণতান্ত্রিকতা। সংবিধানের প্রস্তাবনায় সগর্বে ঘোষণা করা হয়েছে—"আমরা ভারতের জনসাধারণ সকলে" ("We, the People of India") সমবেতভাবে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই "লিখিত শাসনতন্ত্র গ্রহণ করছি এবং নিজেদের পরস্পরের কাছে এটি উপহার দিচ্ছি।" বিশিষ্ট শাসনতন্ত্রবিদ্‌গণ ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় সুস্পষ্টভাবে "জনগণের" গৌরবজনক ভূমিকার কথা উল্লেখ করার পেছনে আয়ার-ল্যাণ্ডের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের প্রভাব দেখতে পান।

[৪]ভারতীয় সংবিধানের গণতান্ত্রিকতা ঃ প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের **পঞ্চম বৈশিষ্ট্য** হল যে, এতে ভারতকে একটি প্রগতিশীল জনকল্যাণকর রাষ্ট্ররূপে (Welfare State) গড়ে তোলার জন্য নানারকম সাংবিধানিক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নাগরিকদের নানাপ্রকার মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলি সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকার না থাকলে গণতন্ত্রকে সফল করে তোলা যায় না।— ল্যাস্কি (Laski) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের এই মত। হয়ত গণ-তন্ত্রের এই আধুনিক তাত্ত্বিক দিকটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেই ভারতীয় শাসতন্ত্রে ভবিষ্যৎ সরকারের দ্বারা রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্য কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতি (Directive Principles of State Policy) ঘোষিত হয়েছে। এই নীতিগুলিতে এমন অনেক পন্থার কথা বলা হয়েছে, যেগুলির দরুন নাগরিকদের আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার জন্য শাসনতন্ত্রে বিশেষ প্রতি-শ্রুতি দেওয়া হয়েছে। যেমন—নাগরিকদের চাকুরীর অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। সমান শ্রমের বিনিময়ে সমান মজুরীর হার স্বীকার করা হয়েছে। ন্যূনতম বেতনের

[৫]ভারতে জনকল্যাণকর সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠনের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি

অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। নাগরিকদের বেকারত্ব প্রভৃতি অর্থনৈতিক বিপদ থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মাতৃত্বের সময়ে সাহায্য, অবৈতনিক শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হবে বলে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। শাসনতন্ত্রের অন্যান্য অনেক ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে ভারতীয় নাগরিকদের অধিকারকে অন্যতম মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য নানারকম ব্যবস্থা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মার্ক্সবাদী সমালোচকগণ মন্তব্য করেন যে, মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy) অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয়বিধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহাবস্থিতির দরুন এবং সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু না হবার ফলে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের এই জনকল্যাণকর বিধিগুলি সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হতে পারছে না ও পারবে না।

ভারতীয় সংবিধানের **ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য** হল এর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। সাধারণতঃ কোনও বড় দেশে নানা বর্ণের, নানা ধর্মের, নানা শ্রেণীর নানা ভাষাভাষী লোক থাকলে সেখানে জাতীয় সংহতি বজায় রাখার জন্য "একের মধ্যে বহুর" বৈচিত্র্যে ("Unity in diversity") রূপায়িত শাসনব্যবস্থাই হল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং একাধিক আঞ্চলিক সরকার থাকে। জাতীয় স্বার্থ যেখানে বেশী জড়িত বা যেসব ক্ষেত্রে দেশের সর্বত্র এক ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, সেই সব ক্ষেত্রে আইনপ্রণয়ন এবং প্রশাসনের মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। যেমন—দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয় এবং মুদ্রানীতি, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতির মত ব্যবস্থা পরিচালনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেও কেন্দ্রীয় (Union) সরকারের হাতে এই সব বিষয়ের ভার ন্যস্ত। আবার অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেও শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি আঞ্চলিক বিষয়ের ওপর নীতিনির্ধারণ, আইন-প্রণয়ন প্রভৃতির ভার দেওয়া হয়েছে অঙ্গরাজ্যগুলির (States) ওপর। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কানাডা প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশের মত যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব খুব বেশী। উপরন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকত্বের (Dual Citizenship) নীতি অনুসৃত হয়। অর্থাৎ একজন মার্কিন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং নিজের অঙ্গরাজ্যের নাগরিক। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কিন্তু এই নীতি অনুসরণ করা হয় নি। অর্থাৎ ভারতের একজন নাগরিক কেবল ভারতীয় নাগরিক, যদিও সকল ভারতীয় নাগরিক নিজ নিজ অঙ্গরাজ্যের নাগরিক না হলেও এখনও কমনওয়েলথের নাগরিক।

[৬] ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত

সপ্তমতঃ, ভারতের শাসনতন্ত্রে নমনীয়তা এবং অনমনীয়তার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সেজন্য বিখ্যাত শাসনতন্ত্রবিদ্ হুয়্যার (Wheare) ভারতীয় সংবিধানকে প্রশংসা করেছেন। সূক্ষ্ম শাসনতান্ত্রিক আইনের বিচারে ভারতের শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় বলা উচিত। কিন্তু শাসনতন্ত্রে এমন অনেক বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলি সম্বন্ধে কোনও সংশোধনী প্রস্তাব আনতে গেলে তার জন্য

বিশেষ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় না। কতকগুলি উদাহরণসহ ভারতের শাসনতন্ত্রের এই বিশেষত্বটি সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। মোটামুটি বলা যায় যে, **ভারতের শাসনতন্ত্র সংশোধনের তিনটি উপায়** আছে ; (ক) কতকগুলি ক্ষেত্রে, যেমন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, তাদের মধ্যে প্রশাসনিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, বিচারালয়, আইনসভায় অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব, শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে কোনও সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করতে হলে তা কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষেই সদস্যদের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া চাই এবং অঙ্গরাজ্যগুলির অন্ততঃ অর্ধেকের বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের এই বিষয়গুলির সংশোধন পদ্ধতিটি মোটামুটিভাবে **অনমনীয়** বলা যায়। (খ) ভারতীয় শাসনতন্ত্রের অন্যান্য ধারাগুলি সংশোধন করতে হলে প্রস্তাবটির পক্ষে কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন থাকা চাই। এই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য আবার কেন্দ্রীয় আইনসভার মোট সদস্যসংখ্যার অন্ততঃ অর্ধেক হওয়া চাই। ভারতীয় সংবিধান সংশোধনের এই ব্যবস্থাটিও **অনমনীয়** শাসনতন্ত্রের নজির। (গ) সিকিমের মত নতুন অঙ্গরাজ্যের সৃষ্টি বা কোনও অঙ্গরাজ্যের পুনর্গঠন, কোনও অঙ্গরাজ্যে আইনসভার উচ্চকক্ষ স্থাপন বা বিলোপ প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে শাসনতন্ত্র সংশোধন করার প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষে সাধারণ সংখ্যাধিক্যের ভোটেই (simple majority) গৃহীত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ভারতের শাসনতন্ত্রের **নমনীয়তা** বিশেষ লক্ষণীয়। **কেশবানন্দ ভারতীর মামলায়** রায় দান করতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করেছেন যে, ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলি সম্পর্কে ধারাগুলি পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইনসভা উভয় কক্ষের সাধারণ সংখ্যাধিক্যের ভোটে পরিবর্তিত করতে পারে। সুতরাং বর্তমানে ভারতীয় শাসনতন্ত্রে **নমনীয়তার** দিকেই **বেশী** ঝোঁক দেখা যায়।

[৭] নমনীয়তা ও অনমনীয়তার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের **অষ্টম বৈশিষ্ট্য** হল কেন্দ্রে এমন এক শাসনব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যার ফলে রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকার (Presidential form of Government) এবং মন্ত্রিসভা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা (Cabinet বা Parliamentary form of Government) একই সঙ্গে প্রচলিত। কিন্তু সূক্ষ্মবিচারে বলা যায় যে, ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট প্রথাগত শাসনব্যবস্থার দিকেই ঝোঁক বেশী। ভারতের রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মত পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার দ্বারা নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রপতির মত তাঁর পদে থাকাকালীন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না। বরং ভারতের রাষ্ট্রপতি ইংলন্ডের রাজমুকুটের মত নিয়মতান্ত্রিক শাসক। অর্থাৎ, আইনতঃ তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার উপদেশ অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক শাসকরূপে কাজ করতে বাধ্য।

[৮] রাষ্ট্রপতিচালিত সরকার ও মন্ত্রিসভাচালিত সরকারের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান

নবমতঃ, ভারতের সংবিধানে কেন্দ্রে দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা প্রবর্তন করা হয়েছে। অবশ্য, অঙ্গরাজ্যগুলিতে কোন কোন ক্ষেত্রে আইনসভার একটি মাত্র কক্ষ রাখা হয়েছে। ল্যাস্কি প্রমুখ অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আইনসভায় দ্বিতীয় কক্ষ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁদের মতে দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা ব্যয়বহুল এবং এখানে চূড়ান্তভাবে আইন গ্রহণ করতে গেলে অযথা দেরী হয়। আইনসভার প্রথম কক্ষের যুক্তিতর্কগুলি দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যগণ আবার উত্থাপিত করে থাকেন। ফলে অযথা পুনরুক্তিজনিত সময় নষ্ট হয়। কিন্তু লর্ড ব্রাইস্ প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এবং ফাইনার (Finer), জেনিংস্ (Jennings) প্রভৃতি শাসনতন্ত্রবিদ্‌গণ আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। এর দ্বারা আইনের প্রস্তাবগুলি একাধিকবার ভালভাবে বিচার করা যায় এবং হঠাৎ উত্তেজনার চাপে আইনপ্রণয়নের ব্যবস্থা বন্ধ করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র গৃহীত হবার সময় সেখানকার শাসনতন্ত্র-রচয়িতাগণ যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির সমান প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে তাদের অধিকার বিশেষ-ভাবে সংরক্ষণ করার জন্য দ্বিতীয় কক্ষের অর্থাৎ সেনেটের (Senate) প্রচলন করেন। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষের অর্থাৎ রাজ্যসভার (Council of States) গঠনের ব্যাপারে অঙ্গরাজ্যগুলির সমান প্রতিনিধিত্বের নীতি স্বীকার করা হয় নি।

[৯] কেন্দ্রে ও কোন কোন অঙ্গরাজ্যে দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভার প্রবর্তন

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের **দশম বৈশিষ্ট্য** হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত এখানে বিচার-বিভাগকে সংবিধানের ধারাগুলি সম্পর্কে ভাষ্যদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যাগত কোন সমস্যা দেখা দিলে তার নিষ্পত্তির ভার ন্যস্ত রয়েছে সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ওপরে। কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যগুলির সঙ্গে অথবা অঙ্গরাজ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্দিষ্ট ক্ষমতাবণ্টন সম্পর্কে কোনও বিরোধ উপস্থিত হলে মার্কিন শাসনতন্ত্রে তার মীমাংসার ভারও উচ্চতম বিচারালয়ের ওপর দেওয়া আছে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হলে তার প্রতিকারের ভার এই আদালতের ওপর ন্যস্ত। ভারতীয় শাসনতন্ত্রেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুসৃত এই ব্যবস্থাগুলি স্থান পেয়েছে। কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আজকাল যে ঝোঁক দেখা যায়, তাতে বোঝা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত বিচারবিভাগীয় প্রাধান্যের ও অভিভাবকত্বের নীতি (Judicial Supremacy বা System of Judicial Review) বর্তমানে ভারতে প্রায় পরিত্যক্ত হতে চলেছে। এর বদলে বরং ইংলণ্ডের মত সংসদীয় সার্বভৌমত্বের (Parliamentary Sovereignty) নীতি এখন অনুসৃত হচ্ছে। ধরে নেওয়া যায় যে, বিচারালয়গুলির চেয়ে আইনসভায় জনমানসের প্রতিফলন অনেক সুস্পষ্ট ; কারণ আইনসভা জনগণের সার্বিক ভোটের দ্বারাই গঠিত।

[১০] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধাঁচে উচ্চতম বিচারালয় প্রতিষ্ঠা ; কিন্তু ইংলণ্ডের মত সংসদীয় সার্বভৌমত্বই প্রাধান্য লাভ করেছে

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের **একাদশতম বৈশিষ্ট্য** হল এই যে, সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State) রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতীয়

সংবিধানে ধর্মবিশ্বাসের এবং ধর্মানুষ্ঠানের জন্য সকল নাগরিককেই সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে কোন ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে স্বীকার করা হয় নি। ফলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির নিরাপত্তা স্বীকৃত। সকল ধর্মের নাগরিকগণই ভারতীয় রাষ্ট্রে সব রকম পদ, এমন কি রাষ্ট্রপতির সর্বোচ্চ পদও পাবার অধিকারী। খালিস্তানী প্রভৃতি যাঁরা ভারতের নানা অঞ্চলে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের নামে বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তাঁদের ভারতীয় সংবিধানের এই জাতীয়তাবাদী দিকটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত। কোন কোন সমালোচক ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের যুক্তি অনুসারে ভারতকে "ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র" বলে অভিহিত না করে একে "অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র" (Non-communal state) বলতে চান।

[১১] ধর্মনিরপেক্ষতা বা অসাম্প্রদায়িকতা

সবশেষে বলা যায় যে, ভারতীয় সংবিধানে **কেন্দ্রপ্রবণতার ঝোঁক** রয়েছে। জরুরী অবস্থার সময়ে রাষ্ট্রপতি তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ কেন্দ্রপ্রধান করে তুলতে পারেন। কিন্তু শাসনতন্ত্রবিদ্‌গণ ভারতীয় রাষ্ট্রে অন্য সময়েও কেন্দ্রের প্রাধান্যের নজির উল্লেখ করেন। বিস্তৃত কেন্দ্রীয় ও যুগ্ম আইনপ্রণয়ন তালিকা, অঙ্গরাজ্যের তালিকাভুক্ত বিষয়ের জন্যও কেন্দ্রীয় আইনপ্রণয়ণের ব্যবস্থা রাখা, এই তিনটি তালিকার বিষয়গুলির বাইরে উদ্বৃত্ত আইনপ্রণয়নক্ষমতা (Residuary Powers) কেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ, অঙ্গরাজ্যগুলির রাজ্যপালগণের ও এই রাজ্যগুলিতে রাষ্ট্রপতি মারফত সর্বভারতীয় কৃত্যকের অধীনস্থ ভারতীয় অফিসার প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্মচারীদের চাকুরীনিয়ন্ত্রণ, রাজ্যের আইনসভার দ্বারা অনুমোদিত বিলকে রাষ্ট্রপতির বাতিল করার ক্ষমতা, রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশদানের ক্ষমতা, অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব ও অন্যান্য জাতীয় সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত ক্ষমতা —ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্গত এই সমস্ত ব্যবস্থাকে কেন্দ্রাভিমুখী এবং অঙ্গরাজ্যস্বার্থের বিরোধী বলে সমালোচনা করা হয়। অপরপক্ষে ভারতে ধর্ম, ভাষা, প্রজাতি, লিপি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপুল বৈচিত্র্য থাকার জন্য এবং ভারতের সর্বত্র প্রশাসনিক অক্ষুণ্ণতা ও সংহতি বজায় রাখার স্বার্থে অনেকে ভারতীয় সংবিধানের কেন্দ্রপ্রবণতার ঝোঁককে স্বাভাবিক, বাস্তব ও আবশ্যিক পরিণতি বলে ব্যাখ্যা করে এর সপক্ষে অনেকে জোরালো বক্তব্য পেশ করেছেন। সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ হয়্যারের (Wheare) বিশ্লেষণ অনুসরণ করে তাঁরা বলেন যে, পৃথিবীর সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রেই এই ধরনের জটিল সমস্যার দরুন সব যুক্তরাষ্ট্রেই আজ কেন্দ্রপ্রবণতার ঝোঁক দেখা যায়। তা সত্ত্বেও হয়্যার ভারতের মত এই ধরনের কেন্দ্রাভিমুখী যুক্তরাষ্ট্রগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রপ্রতিম শাসনতন্ত্র ("Quasi-federal Constitutions") বলে চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং এদের যুক্তরাষ্ট্রিকতা কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে তাঁরা স্বীকার করেন না।

[১২] সংবিধানের কেন্দ্র-প্রবণতা ; এ বিষয়ে হয়্যারের মত : ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্র-প্রতিম

সারাংশ

শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন **সংজ্ঞা** —(১) এমন সব নিয়মের সমষ্টি, যার দ্বারা সরকারের চরম ক্ষমতা বাস্তব রূপ লাভ করে (অস্টিন্) ; (২) যা আইনানুগ ও যার দ্বারা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও তার অনুষঙ্গ গড়ে ওঠে (ব্রাইস্) ; (৩) এমন কতকগুলি নিয়ম যেগুলির দ্বারা সার্বভৌম ক্ষমতা সুবিন্যস্ত হয় (ডাইসি) ; (৪) এমন একটি সরকারী কাঠামো যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক নির্দিষ্ট হয় (লিবেয়ার) ; । (৫) যে লিখিত ও অলিখিত নিয়মাবলীর দ্বারা সরকারের রূপরেখা স্থির হয় (গিলক্রাইস্ট্) ; (৬) যে নিয়মগুলির দ্বারা সরকারের ক্ষমতা, নাগরিক অধিকার এবং উভয়ের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় (স্ট্রং) ।

শাসনতন্ত্রের **বৈশিষ্ট্য**—(১) শাসনতন্ত্র কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি । (২) সরকার ও নাগরিকগণ এগুলি মানতে বাধ্য । (৩) এর দ্বারা **আইনসভা, নির্বাহীবিভাগ ও বিচারবিভাগ—সরকারের এই ৩টি বিভাগের** মধ্যে সম্পর্ক স্থির হয় । (৪) এর দ্বারা সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শাসনক্ষমতা বণ্টিত ও হস্তান্তরিত হয় । (৫) মার্ক্সীয় মতে, সমাজে শ্রেণীবৈষম্য বা সাম্য আছে কিনা তা জানা যায় ।

শাসনতন্ত্রের **শ্রেণীবিভাগ**—সক্রেটিস, প্লেটো, **আরিস্টটলের শ্রেণীবিন্যাস** । আরিস্টটলের গুণগত ও সংখ্যাবাচক মানদণ্ড অনুসারে —এক ব্যক্তির শাসনে রাজতন্ত্র (স্বাভাবিক রূপ), স্বৈরাচারতন্ত্র (বিকৃত রূপ), মুষ্টিমেয় ব্যক্তির শাসনে অভিজাততন্ত্র (স্বাভাবিক রূপ), ধনিকতন্ত্র (বিকৃত রূপ), বহু ব্যক্তির শাসনে সাধারণতন্ত্র (স্বাভাবিক রূপ), গণতন্ত্র (বিকৃত রূপ) ।

আরিস্টটলের শ্রেণীবিভাজনের **সমালোচনা**—(১) বর্তমান যুগে মিশ্র শাসনতন্ত্র প্রচলিত, কোন এক প্রকার শাসনতন্ত্র নয় । (২) আরিস্টটলের যুগে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ত্রুটিপূর্ণ হলেও বর্তমান-যুগে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র আদর্শ শাসনতন্ত্র । (৩) আরিস্টটলের যুগে দাসব্যবস্থা চালু থাকার ফলে তাঁর কল্পিত স্বাভাবিক তিনপ্রকার শাসনতন্ত্রও বৈষম্যমূলক ছিল ।

কিন্তু সংবিধানকে জনকল্যাণের মাধ্যমরূপে স্বীকৃত করায় আরিস্টটলের সাংবিধানিক পর্যালোচনা উচ্চতর নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই হিসাবে এখনও প্রশংসনীয় ।

শাসনতন্ত্র বিভাগ সম্পর্কে আধুনিক প্রচেষ্টা : (১) সরকারের ক্ষমতা আঞ্চলিক ভিত্তিতে কিভাবে বণ্টিত হয় (ম্যারিয়ট্) । তদনুসারে দুই প্রকার শাসনতন্ত্র—যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক । (২) কিন্তু আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রগুলিতে প্রায়ই কেন্দ্রপ্রবণতার ঝোঁক দেখা যায় (হয়্যার) । (৩) স্বৈরাচারতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র এবং মন্ত্রিসভা-পরিচালিত ও রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকার (লীকক্) ।

আধুনিক যুগে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত গণপরিষদ আলাপ-আলোচনার পর শাসনতন্ত্র রচনা ও অনুমোদন করে । যেমন—ভারতের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান এ ভাবে রচিত ।

শাসনতন্ত্র কোন স্থিতিশীল ব্যবস্থা নয়, যুগের সঙ্গে, তাল রেখে নানা ঘটনার, ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শাসনতন্ত্র নিরত গতিশীল ।

শাসনতন্ত্রের ওপর ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব প্রচণ্ড । উদাহরণ—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীতে নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় । কিন্তু অসংখ্য ঘটনার ক্রমিক প্রভাবে অবশেষে সেখানে এই নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই হিট্লার ক্ষমতাসীন হন ও জার্মানীতে স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র স্থাপিত হয় ।

লোরেন্স্টাইনের প্রস্তাব—সংবিধানের ওপর মতাদর্শের প্রভাব । মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে শাসনতন্ত্র ।

লিখিত বনাম অলিখিত শাসনতন্ত্র—তাদের দোষ ও গুণ বিচার ।

লিখিত শাসনতন্ত্রের গুণ—(১) স্পষ্টতা, (২) সহজবোধ্যতা, (৩) নাগরিক অধিকারের সুরক্ষা ও কর্তব্যপালনের নির্দেশ। (৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনের সুবিধা। (৫) সংবিধানের অনমনীয়তার জন্য তার স্থিতিশীলতা। (৬) বিচারবিভাগের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র, অংগরাজ্য ও নাগরিক—প্রত্যেকের অধিকার রক্ষার সুবিধা।

লিখিত শাসনতন্ত্রের দোষ—(১) জনমনে বিভ্রান্তি—সংবিধান যেন একটা চিরস্থায়ী পাকাপাকি বন্দোবস্ত। (২) ফলে প্রতিক্রিয়াশীল, কায়েমী স্বার্থের জন্ম হতে পারে। (৩) সংবিধানের প্রগতিশীলতা ব্যাহত হতে পারে। (৪) একই সংবিধানের বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে শেষ পর্যন্ত আদালতের সালিশী প্রয়োজন হয়। কিন্তু তার ফলে বিচারালয় এক ধরণের কায়েমী স্বার্থে পরিণত হয়। বিবদমান গোষ্ঠীদের অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়। মার্কসীয়গণের বিশ্বাস—শ্রেণীবৈষম্যমূলক সমাজে আদালতের নিরপেক্ষতা অবাস্তব।

অলিখিত শাসনতন্ত্রের গুণ—(১) জাতীয় জীবনের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে, ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ও পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ ধরনের সংবিধান যেন একটা কালচার গড়ে তোলে। ট্রেভেলিয়ান্ দেখিয়েছেন কিভাবে ইংলণ্ডের কালচার অলিখিত শাসনতন্ত্রকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। (২) সংবিধানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের ঐতিহ্যগত ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। (৩) অলিখিত শাসনতন্ত্রেও নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত রাখা সম্ভব। ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত। (৪) জরুরী অবস্থাতেও কার্যকর।

অলিখিত শাসনতন্ত্রের দোষ—(১) সংবিধানের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার প্রয়োজন। (২) তা না হলে যে যা খুশী ব্যাখ্যা করবে। (৩) এই শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠনে অসুবিধা।

লিখিত বনাম অলিখিত শাসনতন্ত্র ঃ উপসংহার—ব্রাইসের মতে বর্তমানে কোন ক্ষেত্রেই শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ লিখিত বা সম্পূর্ণ অলিখিত নয়। প্রায় সব রাষ্ট্রেই মিশ্র সংবিধান প্রচলিত, কিছুটা লিখিত, কিছুটা অলিখিত। উদাহরণ—ইংলণ্ডের অলিখিত শাসনতন্ত্রে বহুবিধ লিখিত অ্যাক্টের সংযোজন হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিখিত সংবিধানে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার উল্লেখ নেই। অথচ সেখানে সংবিধান-বহির্ভূত শক্তিরূপে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মত ঘটনায় তার প্রাধান্য সুস্পষ্ট।

সংবিধানবিভাজনে **লর্ড ব্রাইসের বিকল্প প্রস্তাব**—শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন-পদ্ধতি অনুসারে সংবিধান দুপ্রকার—নমনীয় বা সুপরিবর্তনীয়, অনমনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয়। ইংলণ্ডের মত রাষ্ট্রে সাধারণ আইন বিধিবদ্ধ হবার মত পদ্ধতিতে সংশোধিত হলে সংবিধান হবে "নমনীয়", মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে এজন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বিত হবার ফলে সেসব ক্ষেত্রে সংবিধান অনমনীয়।

নমনীয় সংবিধানের গুণ—(১) রাষ্ট্রীয়, সামাজিক বা অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সংবিধানকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। (২) প্রয়োজনমত সাংবিধানিক পরিবর্তনের ফলে সশস্ত্র বিপ্লব বা অশান্তির সম্ভাবনা থাকে না।

নমনীয় সংবিধানের দোষ—(১) যথেচ্ছ সংবিধান পরিবর্তন তার স্থায়িত্বকে ব্যাহত করতে পারে। (২) কায়েমী স্বার্থ, দলবাজি ইত্যাদির সম্ভাবনা থাকে। (৩) আইনসভায় ভোটাভুটির জোরে সংখ্যাগরিষ্ঠগণ সংবিধানকে নিজেদের হাতের পুতুলে পরিণত করতে পারেন। (৪) সাংবিধানিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে পার্থক্য না থাকায় সংবিধানের পবিত্রতা, গুরুত্ব ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে পারে।

অনমনীয় সংবিধানের গুণ—(১) স্থায়িত্ব ও স্পষ্টতা। (২) সংবিধান জনগণের খেয়ালখুশী বা উত্তেজনার চাপে বদলানো যায় না। (৩) নাগরিক অধিকার প্রায়ই লিখিত ও সুরক্ষিত থাকে। সুতরাং নাগরিকদের অধিকারবোধ জাগ্রত হয়। (৪) সাংবিধানিক আইনকে সাধারণ আইনের চেয়ে উঁচুতে রাখা হয়। (৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়।

অনমনীয় সংবিধানের দোষ—[১] প্রয়োজনমত সংবিধান পাল্টানো যায় না। ফলে দেখা যায় চরম রক্ষণশীলতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও অশান্তি। [২] বিচারালয় প্রাধান্য পেতে পারে ও তার কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি হতে পারে।

নমনীয় বনাম অনমনীয় সংবিধান : **উপসংহার** : প্রায় সব রাষ্ট্রেই নমনীয় ও অনমনীয় এই দু-প্রকার বৈশিষ্ট্য মিশ্রভাবে দেখা যায়। ভারতের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানে এই দুটি সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। নমনীয়তা বা অনমনীয়তা শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে জন-মানসিকতার ওপর।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের স্বরূপ : ১৫ই আগস্ট [স্বাধীনতা দিবস] এবং ২৬শে জানুয়ারী [প্রজাতন্ত্র দিবস]—ভারতীয় সাংবিধানিক ইতিহাসে এই তারিখ দুটির তাৎপর্যগত পার্থক্য।

ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য—[১] এটি পৃথিবীর বৃহত্তম লিখিত শাসনতন্ত্র। [২] এতে সংবিধানের প্রাধান্য সূচিত। [৩] এতে ভারতের সার্বভৌম ও প্রজাতন্ত্রী স্বরূপ প্রকাশিত। প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার ব্যাখ্যা। কমনওয়েলথে ভারতের অবস্থিতির সাংবিধানিক তাৎপর্য। [৪] গণতান্ত্রিকতা—প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে। [৫] ভারতে জনকল্যাণকর সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র-গঠনের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি। [৬] ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত। [৭] নমনীয়তা এবং অনমনীয়তার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান। এই সামঞ্জস্য ভারতীয় সংবিধান সংশোধনী পদ্ধতির তিন প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে রূপায়িত। [৮] রাষ্ট্রপতিচালিত সরকার এবং মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান। [৯] কেন্দ্রে ও কোন কোন অঙ্গরাজ্যে দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভার প্রবর্তন। [১০] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধাঁচে উচ্চতম বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা; কিন্তু ইংলণ্ডের মত সংসদীয় সার্বভৌমত্বই প্রাধান্য লাভ করেছে। [১১] ধর্মনিরপেক্ষতা বা অসাম্প্রদায়িকতা। [১২] সংবিধানে কেন্দ্রপ্রবণতার ঝোঁক। হুয়ার কেন ভারতীয় সংবিধানকে যুক্তরাষ্ট্রপ্রতিম শাসনতন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন—তাঁর উক্তিটির সাংবিধানিক তাৎপর্য।

২

সরকারের রূপবর্ণনা ও বৈচিত্র্যচিত্রণ

"When we turn our gaze from the past to the future, an extension of federalism seems to me the most probable of the political prophecies relative to the form of Government."

—Sidgwick

সক্রেটিস (Socrates), প্লেটো, (Plato) এবং আরিস্টটল (Aristotle) গুরুশিষ্য পরম্পরায় এই তিনজন প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক রাষ্ট্রের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এঁদের আলোচনার মধ্যে আরিস্টটলের বিশ্লেষণই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে সবচেয়ে সুবিদিত। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিচারে সব রাষ্ট্রেরই প্রকৃতি এক। কারণ, জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখন্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব—এই **চারটি সাধারণ উপাদানের সহাবস্থানের ফলে সব রাষ্ট্রই এক ধরনের।** আসলে সরকারই রাষ্ট্রের পরিচালক। সরকারের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। **তাই রাষ্ট্রের প্রকারভেদ প্রকৃতপক্ষে সরকারেরই প্রকারভেদ।**

ধ্রুপদী ব্যাখ্যায় সকল রাষ্ট্রেরই ৪টি উপাদান ঃ জনসমষ্টি, ভূখন্ড, সরকার, সার্বভৌমত্ব। কিন্তু সরকারের প্রকারভেদ আছে

এই কারণগুলির জন্য আরিস্টটলের রাষ্ট্রীয় শ্রেণীবিভাগ বর্তমান যুগে সন্তোষ-জনক বলে বিবেচিত হয় না। তাই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও শাসনতন্ত্রবিদ্‌গণ রাষ্ট্রের পরিবর্তে সরকারের শ্রেণীবিভাগের ওপরই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।

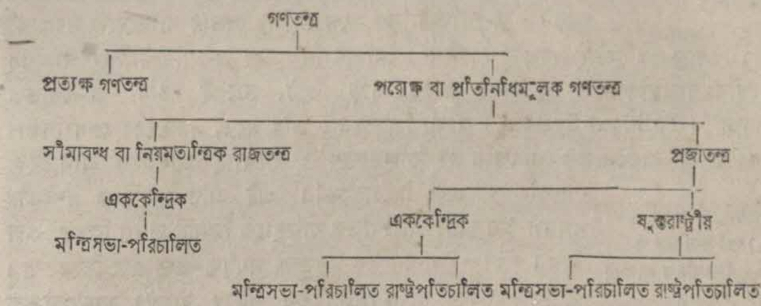
এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্র ও মানবদেহের সাদৃশ্যগত কিছু যুক্তি উত্থাপন করা হয়। রাষ্ট্র কতকগুলি নির্দিষ্ট উপাদানে গঠিত। মানবদেহও অসংখ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা নির্মিত। সেই অর্থে সব রাষ্ট্রই এক রকম, যেমন, মোটামুটিভাবে সব মানুষই এক রকম। কিন্তু বিভিন্ন মানুষের প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুযায়ী কেউ হয়ত স্বার্থপর, কেউ বা নিঃস্বার্থ; কেউ ধার্মিক, কেউ অধার্মিক। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখা যায়। মানুষের মস্তিষ্ক যেমন তার সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সরকারও তেমনি রাষ্ট্রের সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করে। সরকার যেন রাষ্ট্রের মস্তিষ্কস্বরূপ। সেজন্য মানুষের মেধা, স্মৃতি, সচেতনতা ইত্যাদির তারতম্যের বিচার না করে যেমন সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রকার মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় না, তেমনি সরকারের রকমফের না দেখে, তাদের মধ্যে ভেদাভেদ না বুঝে রাষ্ট্রেরও প্রকৃতিগত পার্থক্য নির্ণয় সম্ভব নয়। কার্ল ফ্রিডরিশ প্রভৃতি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ তাই **রাষ্ট্রের গঠনমূলক (structural) পার্থক্য** নির্ণয়ের ওপর যেমন জোর দেন, তেমনি **রাষ্ট্রের কর্মপ্রকৃতি-**

মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভিন্নতার মধ্যেও মানব-সমাজের বিভিন্নতা থাকার মত একই চারটি উপাদান সংযুক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারী কাঠামো বিভিন্ন হতে পারে

গত (functional) পার্থক্য নির্ণয়ের ওপরও ততটা গুরুত্ব আরোপ করেন। বলা বাহুল্য যে, রাষ্ট্রের গঠনমূলক ও প্রকৃতিগত এই দু'রকমেরই ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের প্রকারভেদ নির্ণয় করা তখনই সুসম্পন্ন ও সার্থক হয়ে ওঠে যখন রাষ্ট্রের প্রধান ও বাহ্য রূপকার হিসাবে সরকারের বিশ্লেষণ করা হয়। বিভিন্ন প্রকার সরকারের গঠনমূলক ও প্রকৃতিগত ভেদাভেদ জানতে পারলেই রাষ্ট্রের স্বরূপ বা রূপান্তর বোঝা সহজ হয়ে উঠবে।

রাষ্ট্রের পার্থক্য ঃ গঠনমূলক, কর্মপ্রকৃতিগত

বিখ্যাত সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ লীকক (Leacock) আধুনিক কালের উপযোগী হিসাবে সরকারকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—স্বৈরতন্ত্র (বা একনায়কতন্ত্র) এবং গণতন্ত্র। গণতন্ত্রকে আবার তিনি কয়েকটি উপবিভাগে (sub-system) ভাগ করেছেন। একটি ছকের সাহায্যে এই শ্রেণীবিভাগ দেখানো যেতে পারে।



আধুনিক রাষ্ট্রগুলির সাংগঠনিক (structural) এবং কর্মধারাগত (functional) জটিলতার দিকে নজর দিয়েই লীকক্ সরকারবিভাজনের এই ছকটি তৈরী করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, সরকারের অংশগুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের (distribution of powers) ওপর ভিত্তি করে এবং সরকারের আইনসভার প্রতি দায়িত্বশীলতার ওপর ভিত্তি করে তাঁর এই শ্রেণীবিন্যাস। সংক্ষেপে, যে সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী, তাকে তিনি বলেছেন "এককেন্দ্রিক"। যেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক—এই দু'রকম সরকারের হাতে বিন্যস্ত, তাকে তিনি "যুক্তরাষ্ট্রীয়" সরকার বলেছেন। আবার, ইংলণ্ডের মত রাষ্ট্রে যে সরকারে শাসনবিভাগ (যেমন মন্ত্রিসভা) আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল, সেখানে সংসদীয় বা "মন্ত্রিসভা-পরিচালিত" সরকার রয়েছে ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত রাষ্ট্রে শাসনবিভাগ (রাষ্ট্রপতি) আইনসভার কাছে দায়ী থাকে না বলে সেখানকার সরকারকে "রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার" বলা হয়।

লীককের শ্রেণীবিভাগের মানদণ্ড ঃ [১] কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কত [২] সরকার আইনসভার কাছে দায়ী কি না

॥ সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাধারা ॥

আধুনিক মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডেভিড্ ইস্টন্ (David Easton) মনে করেন যে, আরিস্টটলের ধ্রুপদী শ্রেণীবিভাগ বা লীককের আধুনিক শ্রেণীবিভাগ—কোনটিই আধুনিক যুগের সরকারগুলির প্রকৃতি-বিশ্লেষণে সহায়ক নয়। কারণ, এই সমস্ত প্রচেষ্টা বাস্তবানুগ নয়। প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্র একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপমাত্র (formal system)। কিন্তু এই রূপকে বাস্তবায়িত করে তোলে অসংখ্য অ-প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা ও উপসংস্থা (informal system বা sub-system)। আইনসভা, আমলাতন্ত্র এগুলি প্রাতিষ্ঠানিক রূপের বিভিন্ন প্রতিফলন। বণিক্‌গোষ্ঠী, শ্রমিকসংঘ প্রভৃতি স্বার্থ-গোষ্ঠী (Interest group) বা চাপগোষ্ঠী (Pressure group) অ-প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থারূপে রাষ্ট্রের সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। অ-প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থাগুলির প্রভাব ব্যতিরেকে সরকারী শ্রেণীবিভাজনকে ইস্টন্ সমর্থন করেন না। প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক উভয়বিধ সংস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে যে সমগ্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তাকেই তিনি "রাজনৈতিক ব্যবস্থা" (Political System) আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, সরকারের শ্রেণীবিভাগের বদলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার এই চিহ্নিতকরণ ও ব্যাখ্যাই অধিকতর আধুনিক, বাস্তবভিত্তিক এবং বিজ্ঞানধর্মী। এই অতি-আধুনিক ইস্টনীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—উদারনৈতিক গণতন্ত্র, সর্বাত্মকতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র। এই তিন প্রকার ব্যবস্থাতেই শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্তরূপে স্বীকৃত এবং প্রযুক্ত হয়। আবার, আদর্শ হিসাবে গ্রাহ্য কতকগুলি পছন্দসই ব্যবস্থা থাকার ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা একটা মূল্যসূচক ব্যবস্থারূপেও (Value-system) গড়ে ওঠে। এই মূল্যজ্ঞাপক আদর্শগুলির যথাযথ ভেদাভেদ নির্ণয় ও তাদের গ্রহণবর্জনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণও (Authoritative allocation of Values) রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান কর্মসূচী।

সরকারের শ্রেণী-বিন্যাসের পরিবর্তে ডেভিড্ ইস্টনের বিকল্প : বরং রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ অধিকতর বাস্তবানুগ

রাজনৈতিক ব্যবস্থা : (১) প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থার ঘাত-প্রতিঘাত : (২) মূল্যসূচক ব্যবস্থাও বটে

মার্কসবাদীগণ সরকারী ব্যবস্থাকে, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতার প্রভাবে গঠিত সামগ্রিক, মূলতঃ অর্থনৈতিক, সমাজসংস্থারূপে দেখতে চান। তাই অতীতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রণালীর পারম্পর্য অনুসারে তাঁরা রাষ্ট্রের এই ধারাবাহিক অবস্থাভেদ লক্ষ্য করে দাসমালিকানার সরকার, সামন্ততন্ত্রী সরকার, ধনতন্ত্রী বা পুঁজিবাদী সরকার এবং সমাজতান্ত্রিক সরকার—এই কয়টি সরকারী রূপ সম্বন্ধে তাঁদের ব্যাখ্যা প্রচার করেছেন।

সরকার সম্বন্ধে মার্কসীয় শ্রেণীবিভাগ : সরকার হল ইতিহাস ও অর্থনৈতিক প্রভাবের যোগফল

কয়েকটি কারণে সরকার সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানসম্মত। প্রথমতঃ, তাঁরা অর্থনৈতিক প্রভাবকে সরকারের পিছনে সক্রিয় বলে মনে করেন। ফ্যাসিবাদী,

স্বৈরাচারী, সামরিক সরকার রূপে আধুনিক যুগে যে বিভিন্ন বিচিত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সরকারী সংগঠনের মধ্যে বিমূর্ত হয়ে থাকে, তার আসল চেহারাটি মার্কসীয় ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত স্বার্থগোষ্ঠী, চাপগোষ্ঠী, ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভা, সামরিক প্রশাসন, আমলাতন্ত্র, সরকারী সংগঠনের মধ্যে এদের সমস্ত ঘাতপ্রতিঘাত আসলে ক্ষমতার লড়াই, নয়ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তারের উপলক্ষ্য হিসাবে দেখা দেয়। ক্ষমতার লড়াই আবার চূড়ান্ত ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব ছাড়া কিছুই নয়।

সরকার সম্বন্ধে মার্কসীয় ব্যাখ্যা বিজ্ঞানভিত্তিক: কারণ এখানে (১) সরকারের ওপর অর্থনৈতিক প্রভাব দেখানো হয়েছে, (২) সরকারকে সাম্যের লক্ষ্যে পৌঁছুবার মাধ্যমরূপে কল্পনা করা হয়েছে

দ্বিতীয়তঃ, মার্কসবাদীগণ মনে করেন যে, সর্বহারার একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat) নামক আদর্শ বিপ্লবোত্তর সমাজে সাম্যবাদী দল সর্বহারার নেতৃত্বে সমাজকে ধনতান্ত্রিক থেকে সমাজতন্ত্রী অবস্থায় উন্নীত করবে। সুতরাং বিপ্লবোত্তর এই চরম পরিস্থিতিতে দল বা পার্টি এবং সরকার একত্রিত হয়ে এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বা উত্তরণের পথে জনসমষ্টিকে পরিচালিত করে। তখন রাষ্ট্রব্যবস্থা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হবে ("the state will wither away")। কারণ, প্রাক্-বিপ্লব যুগে রাষ্ট্র পুঁজিপতি বুর্জোয়া শ্রেণীর শোষণযন্ত্র ছিল। বিপ্লবোত্তর যুগে রাষ্ট্রের বিকল্প হবে এমন একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে দল, সরকার ও সমাজ একাকার হয়ে আদর্শ সাম্যবাদী, সমভোগবাদী পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। মার্কসবাদীগণ এভাবে সরকার সম্বন্ধে যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, তা হল—সরকার চরম আদর্শগত লক্ষ্য (end) নয়, লক্ষ্যে উপনীত হবার মাধ্যমমাত্র (means to the end)। গান্ধীজী, মানবেন্দ্রনাথ রায়, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতি রাজনীতিবিদ্‌গণও **"দলবিহীন গণতন্ত্র"** (Partyless Democracy) বলতে এই ধরনের বক্তব্যই উপস্থাপিত করেছেন।

॥ এককেন্দ্রিক সরকার ॥

প্রসিদ্ধ ইংরেজ শাসনতত্ত্ববিদ্ স্ট্রং (Strong) বলেছেন যে, **এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায়** (Unitary Government) **কেন্দ্রীয় সরকারের সার্বিক প্রাধান্যই** সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সমস্ত দেশে একটিমাত্র শাসনব্যবস্থা প্রচলিত এবং একটিমাত্র সরকারের হাতে, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, সমস্ত শাসনক্ষমতা

এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য : (১) সর্বত্র শাসনব্যবস্থা এক (২) শাসনতন্ত্র নমনীয়

কেন্দ্রীভূত। অবশ্য শায়ার, (Shire),-বরো (Borough), প্রদেশ, জেলা, মহকুমা, থানা, ব্লক প্রভৃতি নানা বিভাগে বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকতে পারে। কিন্তু এই অঞ্চলগুলি শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞা এবং পরিচালনার অধীন। এদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা থাকে না, নিজস্ব কোন সত্তা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার এই অঞ্চলগুলিকে কতকগুলি একক (Unit) হিসাবে এদের কাছে কিছু শাসনক্ষমতা অনুদান (delegation of power) করে। কিন্তু তার অর্থ শাসনব্যবস্থা বিভাজন বা বিকেন্দ্রীকরণ নয়। কারণ, ইচ্ছামত কেন্দ্রীয় সরকার নিজের সুবিধামত নতুন আঞ্চলিক একক সৃষ্টি করে এককগুলিকে পুনর্গঠিত করতে পারে,

তাদের এলাকা কমাতে বা বাড়াতে পারে, এমন কি তাদের অবলুপ্ত করেও দিতে পারে। সাধারণতঃ এককেন্দ্রিক সরকারে সংবিধানের প্রাধান্য সূচিত হয় না, আইনসভাই সহজে সাংবিধানিক সংস্কার সাধন করতে পারে। সুতরাং মোটামুটি বলা যায় যে, **এককেন্দ্রিক সরকারে শাসনব্যবস্থা নমনীয়।** সংবিধান লিখিত বা অলিখিত হতে পারে। এখানে শাসনতান্ত্রিক স্থিতিস্থাপকতা পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এখানে সংবিধান প্রধান নয়, কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রধান। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার এই কেন্দ্রাভিমুখী প্রাধান্যের ওপর জোর দিয়ে তাই ইংরেজ শাসনতন্ত্রবিদ্ ডাইসি (Dicey) বলেছেন যে, এই শাসনব্যবস্থায় একই কেন্দ্রীয় ব্যক্তি চূড়ান্তরূপে আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা স্বভাবসিদ্ধভাবে প্রয়োগ করে থাকে। আদালতের এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব নেই। **ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত।**

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ : (১) শাসনতন্ত্রে সমতা ও সরলতা

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান **গুণ** হল এই যে, প্রথমতঃ, সমস্ত দেশে একই রকমের আইনকানুন ও শাসননীতি অনুসরণ করা হয়। সেজন্য শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে কিংবা শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন জটিলতা দেখা যায় না।

(২) জরুরী অবস্থায় উপযোগী

দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের সময় বৈদেশিক এবং প্রতিরক্ষাবিষয়ক ক্ষেত্রে একই শাসননীতি সমানভাবে প্রয়োগ করার জন্য এই রকম পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বা **জরুরী অবস্থায়** এককেন্দ্রিক সরকারের **সাফল্য** বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুটি মহাযুদ্ধের সময়েই ইংলণ্ডে এককেন্দ্রিক সরকার একই শাসনতন্ত্রের ছত্রছায়ায় দেশবাসীকে আশ্রিত রেখে, খুব সুন্দরভাবে সমরনীতি পরিচালনা করে, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রচণ্ড শক্তিশালী শত্রুদের বিরুদ্ধে দেশকে অবশেষে জয়ী করে তোলে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও ইংলণ্ডের এককেন্দ্রিক সরকার চরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছিল।

(৩) ব্যয় কম

তৃতীয়তঃ, দেশে একই শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় সামগ্রিকভাবে শাসনপরিচালনার ব্যয় সংকুচিত করা যায়। একাধিক সরকার প্রচলিত থাকার অর্থ শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যয়বাহুল্য।

(৪) কেন্দ্র-রাজ্য লড়াই নেই

চতুর্থতঃ, এককেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে কোনরকম ক্ষমতার লড়াইয়ের সম্ভাবনা থাকে না। সমস্ত সরকারী ক্ষমতা একটিমাত্র কর্তৃপক্ষের হাতে থাকার ফলে সরকার প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে পারে। একই কাজ সরকারকে একাধিকবার সম্পন্ন করতে হয় না। গেটেল্ (Gettell) তাই ঠিকই বলেছেন যে, এককেন্দ্রিক সরকারের প্রশাসনিক কর্মকুশলতা বিশেষভাবে স্বীকৃত।

(৫) শাসনের ক্ষেত্রে ও আইনপ্রণয়নে গতিশীলতা

পঞ্চমতঃ, ইংলণ্ডের মত দেশে যেখানে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা নমনীয় শাসনতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত, সেখানে প্রগতিশীল সমাজের দাবী, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে তাল রেখে প্রশাসন চলে এবং আইনসভা প্রয়োজন অনুসারে আইন প্রণয়ন করে। **ফলে, সরকার স্বচ্ছন্দে প্রগতিশীল হয়ে উঠতে পারে।**

ষষ্ঠতঃ, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাকে সহজেই একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়ে তোলা যায়। জরুরী অবস্থার সময় একভাবে, স্বাভাবিক সময়ে অন্যভাবে, ঐ দুই সময়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় আর একভাবে দেশের শাসনতন্ত্র চালনা করা যায়। ফলে, এই অবস্থায় আঞ্চলিক সরকারগুলিও অনেক বেশী দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে পারে।

[৬] সরকারকে যে-কোন অবস্থায় খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়

[৭] আন্তর্জাতিক চুক্তির শর্তাদি পালন সহজ

সপ্তমতঃ, রাষ্ট্রে সর্বত্র একই সরকার চালু থাকার ফলে ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য থাকার জন্য সরকার আন্তর্জাতিক চুক্তি, সন্ধি প্রভৃতি সংক্রান্ত দায়িত্ব সহজে পালন করতে পারে।

অষ্টমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকার প্রধান হবার ফলে এককেন্দ্রিক সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপদান সহজসাধ্য। হয়্যার বলেছেন যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণের আবশ্যকতার জন্যই বহু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বর্তমানে কেন্দ্রমুখী হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

[৮] অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ সহজসাধ্য

[৯] ক্ষমতাবিভাজন না থাকায় সরকারী বিভাগগুলির মধ্যে সুসংহতি

নবমতঃ, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার একাধিক ঐকিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতাবিভাজন নীতি অনুসরণ করে না। তাই এই ব্যবস্থায় দেশের ঐক্য, জাতীয় সংহতি সুন্দরভাবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা।

কিন্তু **এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার** অনেক **ত্রুটি** দেখা যায়। প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকার চরম ক্ষমতাশালী হবার ফলে এই শাসনব্যবস্থায় সব সময়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায় না। সুদূর কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের অভাব-অভিযোগ দূর করা বিজ্ঞানের অতি-আধুনিক অগ্রগতির যুগেও সহজসাধ্য নয়। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে জটিল জাতীয় দায়িত্ব অর্পিত থাকে। তাই এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে কেন্দ্রের উপেক্ষার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। ফলে, তারা ভীষণভাবে কেন্দ্রবিরোধী হয়ে উঠতে পারে। এভাবে এককেন্দ্রিক সরকার সুশাসনের পথে বাধা হয়ে উঠতে পারে। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে সংঘটিত ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব ফ্রান্সের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থার প্রতি চরম ঔদাসীন্যেরই শোচনীয় পরিণতি। যেহেতু আঞ্চলিক স্বার্থের সমবায়ে জাতীয় স্বার্থ গঠিত, তাই এককেন্দ্রিক সরকারের আঞ্চলিক স্বার্থসংরক্ষণে ব্যর্থতা শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতীয় স্বার্থকেই ক্ষুণ্ন করে।

এককেন্দ্রিক সরকারের ত্রুটি [১] কেন্দ্রের পক্ষে দূরবর্তী অঞ্চলের সমস্যা সমাধান কঠিন

দ্বিতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ কোনও অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের প্রতিনিধিরূপে শুধু সেই অঞ্চলেরই স্বার্থসিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হতে পারেন। এর ফলেও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অন্যান্য আঞ্চলিক এককগুলির অসন্তোষ জমে ওঠে এবং গণতন্ত্রের আদর্শ বিঘ্নিত হয়। কেননা গণতন্ত্র সাম্য ও ন্যায়বিচারের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

[২] কেন্দ্রীয় প্রশাসক কার্যতঃ আঞ্চলিক প্রতিনিধিরূপে অঞ্চলকেই প্রাধান্য দেন

তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষের মত বিরাট বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে ধর্ম, ভাষা প্রভৃতির ভিত্তিতে বহুধাবিভক্ত অঞ্চলগুলিকে "একের মধ্যে বহু"র বৈচিত্র্যে সুসংবদ্ধ ও সমন্বিত করতে গেলে এককেন্দ্রিক সরকার সফল হতে পারে না। শাসনব্যবস্থা সুপরিচালনা রাষ্ট্রের জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলেই সম্ভব হয়ে ওঠে। এইভাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কার্যকর হয়। কিন্তু বিশাল দেশের দূরবর্তী বিভিন্ন আঞ্চলিক এককগুলির জনসাধারণের পক্ষে কেন্দ্র-পরিচালিত সমস্ত কার্যকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংযুক্ত হওয়া অসম্ভব। ফলে, এককেন্দ্রিক সরকার অগণতান্ত্রিক হয়ে পড়তে পারে।

[৩] ভারতের মত বৈচিত্র্যময় রাষ্ট্রের পক্ষে অনুপযোগী

চতুর্থতঃ, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সাধারণতঃ ব্যক্তিগত অথবা দলগত স্বৈরাচারতন্ত্র অথবা কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীভবনের ফলে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত একতরফা, একপেশে শাসনতন্ত্র কায়েম করে। কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমাগত আঞ্চলিক সরকারগুলির কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করে। ফলে, একদিকে এক ধরনের স্বৈরাচারতন্ত্র কায়েম হবার সম্ভাবনা, অপর দিকে এক ছাঁচের, একই ধরনের প্রশাসনব্যবস্থা ও আইনপ্রণয়ন ব্যবস্থা প্রচলিত হবার ফলে জনজীবনে ও প্রশাসনিক কর্মসূচীতে বৈচিত্র্য থাকে না।

[৪] ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক দলগত গোষ্ঠীতন্ত্র ও কেন্দ্রীভূত শাসনতন্ত্রের উদ্ভব

পঞ্চমতঃ, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের ভূমিকা সীমিত থাকায় তাদের রাজনৈতিক জ্ঞানের উন্মেষ কম হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণের মতে, বৈচিত্র্যবিহীন ছোট রাষ্ট্রগুলির পক্ষে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রই ভাল। ইংলণ্ড্ দেশটি ছোট হলেও সেখানে স্কট্ল্যাণ্ড্ এবং ওয়েল্সের অধিবাসীগণের মধ্যে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের সচেতনতা বেশ লক্ষণীয়। তবুও সাধারণভাবে ইংরেজ জাতীয় চরিত্র রক্ষণশীলতার প্রভাবে প্রভাবিত। ইংরেজ জাতীয় চরিত্রের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যই ইংরেজদের এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা সচল রাখতে সাহায্য করেছে। রাজতন্ত্রও ইংলণ্ডে এককেন্দ্রিক সরকার কায়েম রাখার পক্ষে অনুকূল শাসনতান্ত্রিক পরিবেশ রচনা করেছে।

[৫] জনগণের ভূমিকা সীমাবদ্ধ

এককেন্দ্রিক সরকার : উপসংহার

॥ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ॥

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা (Federal Government) বিশ্বশাসনতন্ত্রের ভাণ্ডারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যবান অবদান। **ডাইসীর ভাষায়,** জাতীয় সংহতির সঙ্গে আঞ্চলিক স্বাধিকারের রাজনৈতিক সামঞ্জস্যবিধানের কৌশলই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ("A federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of state rights")। তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয়

যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে ডাইসির সংজ্ঞা

শাসনব্যবস্থা গঠনের জন্য দুটি বিশিষ্ট পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের দ্বারা অন্য কোনও অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ("integration by absorption")। দ্বিতীয়তঃ, একাধিক অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সঠিক ঐক্য অনুভূত হলেও তাদের সম্পূর্ণ একীভূত না হয়ে "ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য" ("Unity in diversity") প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে ডাইসি বলেছেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়েও তারা তাদের স্বাতন্ত্র্য ("Union but not unity") বজায় রাখল।

ডাইসির সংজ্ঞায় যুক্তরাষ্ট্রের দুটি বৈশিষ্ট্য : (১) বৈচিত্র্য রক্ষার তাগিদ, (২) জাতীয় সংহতি রক্ষার তাগিদ

ডাইসী যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার শর্তগুলি সহজেই চোখে পড়ে। বিভিন্ন অঞ্চলগুলি পাশাপাশি থাকা চাই। তাদের ঐক্যবদ্ধ হবার ইচ্ছার সঙ্গে স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য (autonomy) বজায় রাখার ইচ্ছা সমান তীব্র হওয়া চাই। তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে বৈচিত্র্য থাকা চাই। কোন অংশ সমগ্রভাবে বাকি অংশগুলির তুলনায় যেন বেশী সমৃদ্ধ বা শক্তিশালী না হয়। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে যেন ক্ষমতার ভারসাম্য (power equation or power equilibrium) বজায় থাকে।

হুয়্যারের সংজ্ঞা : যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের প্রাধান্য

যে সরকারে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রের নিজ নিজ ক্ষমতা সঠিক পরিচালনার জন্য সংবিধান উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে, হুয়্যার সেই সরকারকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলেছেন। তাঁর সংজ্ঞাটির তুলনায় ডাইসির সংজ্ঞা সংক্ষিপ্ত হলেও সঠিক।

হুয়্যারের মতে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনার শর্তাবলী : [১] বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার তাগিদ ; [২] ভৌগোলিক সামীপ্য, [৩] অর্থনৈতিক সুবিধা-লাভের প্রত্যাশা ; [৪] পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থিতি

হুয়্যার বিভিন্ন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভাব, আঙ্গিক প্রভৃতির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের প্রধান শর্তগুলি হল অঙ্গরাজ্যগুলির ভৌগোলিক সান্নিধ্য, জাতীয় ঐক্যবোধ, মিলনস্পৃহা এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ইচ্ছা। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তা সৃষ্টি করে কতকগুলি ঘটনার পারম্পর্য। যেমন— বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদ, স্বাধীনতালাভ ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার প্রয়োজন, ভৌগোলিক সামীপ্য, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধালাভের সম্ভাবনা, পাশাপাশি এক ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা কাঠামো চালু থাকা ইত্যাদি। এই ঘটনাগুলি সম্মিলিতভাবে বা এগুলির অধিকাংশ সমবেতভাবে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অনুকূল পরিবেশ গঠনের সহায়ক।

ডাইসি এবং হুয়্যার এই দুই বিশিষ্ট শাসনতন্ত্রবিদ্ একটি বিষয়ে একমত যে, যুক্তরাষ্ট্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের জন্য প্রধান সহায়ক হল কেন্দ্রাভিমুখী এবং কেন্দ্র-

বিরোধী এই দুটি বিপরীত প্রভাবকে শাসনতন্ত্রে মিলিত করার সম্ভাবনা। যদি সে সম্ভাবনা না থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট শাসনব্যবস্থাটি হয়ে উঠবে এককেন্দ্রিক। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখ-করা যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের শর্তগুলির কোন কোনটি পালিত না হলেও সেখানে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন অন্যান্য কারণে সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু দূরে অবস্থিত হয়েও আলাস্কা এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আগে বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র পূর্ব পাকিস্তানরূপে সমগ্র পাকিস্তানী যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল অত্যন্ত বেশী। তাছাড়া, শুধু ধর্মের ঐক্য ব্যতীত প্রাক্তন পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের জনগণের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের অন্য কোন শর্ত পালিত হয় নি। বর্তমানে এই ঐস্লামিক ঐক্যের মধ্য দিয়েই পাকিস্তান ও মুজিবোত্তর বাংলাদেশী প্রজাতন্ত্রের সামরিক শাসকপ্রধানদ্বয় উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যোগসূত্র বার করার জন্য সচেষ্ট।

ডাইসি ও হয়্যারের ব্যাখ্যার তুলনা: দুজনেই কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের সমন্বয়ের ওপর জোর দিয়েছেন; দুজনেই বলেন যে, কোন কোন শর্ত না থাকলেও, যেমন, কোন দূরের অঞ্চলকে নিয়ে, যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়েছে: হাওয়াই ও আলাস্কার এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নজির

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ॥

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান **বৈশিষ্ট্য হল এটি একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন আঞ্চলিক সরকারের সংমিশ্রণে** গঠিত এক অভিনব দ্বিবিধ শাসনব্যবস্থা (two-tier system)। তাই এই শাসনব্যবস্থায় সব অঙ্গরাজ্যই স্বতন্ত্র একক-রূপে নিজ নিজ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও এ-ব্যাপারে সমান ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু **জাতীয় সংহতি এবং ঐক্য বজায় রাখার জন্য এবং পরস্পরের সাধারণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য** কিছু ক্ষমতা তারা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পণ করে। **স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক** পরিচালনা, মুদ্রানীতি প্রচলন প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতির স্বার্থ যেখানে সমধিক জড়িত এবং যে ক্ষেত্রে দেশের সর্বত্র একই প্রকারের নিয়মকানুন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন, সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ওপর আইন প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক পরিচালনার ভার দেওয়া হয় **কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। ভূমিরাজস্ব, আমোদপ্রমোদের ওপর কর স্থাপন প্রভৃতি** সম্পূর্ণ স্থানীয় বিষয়ের ওপর কর্তৃত্ব প্রয়োগের ভার দেওয়া থাকে **আঞ্চলিক সরকারের ওপর। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রথম** এবং প্রধান **বৈশিষ্ট্য** হল যে এখানে কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক এই দুরকমের শাসনব্যবস্থার সহাবস্থিতি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য: দুটি বৈপরীত্যের সমন্বয়সাধন

যুক্তরাষ্ট্রের এই বৈশিষ্ট্যের প্রভাব [১] কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যে দুরকম শাসনব্যবস্থা

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনে দুপ্রকার সরকারী ব্যবস্থা একই সঙ্গে প্রচলিত থাকার ফলে সেখানে **এই দুপ্রকার সরকারের হাতে ক্ষমতা বণ্টনের ব্যবস্থা** থাকা দরকার।

(২) উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা-বণ্টন ব্যবস্থা

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য-সরকারকে এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে তাদের নিজের নিজের ক্ষেত্রে শাসন এবং আইনপ্রণয়ন সম্পর্কিত ক্ষমতা বণ্টন করে দেবার জন্য প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের **লিখিত শাসনতন্ত্র** রচনা অপরিহার্য কর্তব্য। উপরন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং অঙ্গরাজ্য সরকার থাকায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং অঙ্গরাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন পাকাপাকিভাবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট করে দেবার জন্য এখানে **শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য** স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য। এই শাসনতন্ত্র যেন বারবার তুচ্ছ দাবীর ভিত্তিতে সংশোধিত না হয়। সেজন্য সাধারণতঃ প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রীয় **শাসনতন্ত্র অনমনীয়** হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যে-কোন সাধারণ আইন আইনসভায় সাধারণ সংখ্যাধিক্যের বলে যেভাবে বিধিবদ্ধ হয়, **সংবিধান সংশোধনের** আইন সেভাবে বিধিবদ্ধ হয় না। তার জন্য **চাই বিশেষ ব্যবস্থা**। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনমনীয় শাসনতন্ত্রে এরকম বিশেষ ব্যবস্থাটি উল্লেখ করা আছে। প্রজাতন্ত্রী ভারতের লিখিত সংবিধানেও এরকম ব্যবস্থার উল্লেখ আছে।

(৩) অনমনীয় শাসনতন্ত্র এবং সংবিধানের প্রাধান্য

চতুর্থতঃ, কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় (যেমন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) **দ্বৈত নাগরিকত্বের** নীতি মেনে নেওয়া হয়। অর্থাৎ, নাগরিক একই সঙ্গে তার নিজের মূল অঙ্গরাজ্যের এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নাগরিক। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু এই দ্বৈত নাগরিকত্বের নীতি অনুসরণ করা হয় নি।

(৪) দ্বৈত নাগরিকত্ব

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পঞ্চম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলঃ সর্বোচ্চ বা **যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের অভিভাবকত্ব**। যদি শাসনতন্ত্রের কোনও ব্যাখ্যা নিয়ে কোনও বিবাদ উপস্থিত হয়, অথবা যদি নাগরিকের কোনও মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, অথবা যদি কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বা একাধিক আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত ক্ষমতাবণ্টন নীতি নিয়ে কোনও বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের হাতে সেই বিরোধ মীমাংসার চরম ক্ষমতা দেওয়া হয়।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের অভিভাবকত্ব

ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় **রাজস্ববণ্টন নীতি** (Federal Finance)। রাজস্ব ছাড়া সরকার চলতে পারে না, কারণ রাজস্বই হল তার আয়। অতএব কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকার এই দুপক্ষকেই তাদের নিজ নিজ আয়ের সম্পর্কে বোঝাপড়া করে নেওয়া দরকার। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য নির্দিষ্ট কয়েক বছর বাদে আলাদা আলাদা যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ববণ্টন নীতি ঘোষিত হয়। এজন্য প্রত্যেকবার আলাদা উপদেষ্টা-সংস্থা নিযুক্ত হন। এইভাবে চিরাচরিত নীতি অনুসরণ না করে সাময়িকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ববণ্টনের নীতি ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন। কারণ, ভারত সরকার উন্নয়নশীল অর্থনীতি এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে এমন একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন, যার ফলে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যই প্রতিটি পাঁচসালা পরিকল্পনার (Five Year Plan) পর আগের

(৬) বিশেষ রাজস্ববণ্টন নীতি ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পদ্ধতি

তুলনায় কিছুটা বেশী উন্নত হয়ে ওঠে। তাছাড়া, ঐ দীর্ঘ মেয়াদের ব্যবধানে সামাজিক, রাষ্ট্রিক প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। সেজন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনও স্থায়ী রাজস্ববণ্টন নীতি অনুসরণ করে চলে না।

সপ্তমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক আঞ্চলিক সরকারকেই **সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে চুক্তি** স্বাক্ষর করতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্নতার দাবীতে দক্ষিণাঞ্চলের অঙ্গরাজ্যগুলি ১৮৬১ সালে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সঙ্গে যে গৃহযুদ্ধ চালিয়েছিল, তার অবসানের পর বিচ্ছিন্নতাকামী রাষ্ট্রগুলি পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

(৭) যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চুক্তিবদ্ধভাবে আনুগত্য স্বীকার

সোবিয়েত রাশিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কোন অঙ্গরাজ্য সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইচ্ছা করলে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। কিন্তু রুশ অঙ্গরাজ্যগুলির এই অধিকার নামমাত্র। কারণ, সমস্ত রুশ শাসনব্যবস্থা একই এবং একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসাবে কম্যুনিস্ট দল নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ও করে রাখে। সেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারে কেন্দ্রীভূত। প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্য সেখানে একই সাম্যবাদী আদর্শে পরিচালিত। উপরন্তু কেন্দ্রের অনুমতি ছাড়া কোনও অঙ্গরাজ্য কখনও সোবিয়েত সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্রী ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। ভিসিন্স্কির (Vyshinsky) মত সোবিয়েত আইনবিদ্‌গণ মনে করেন যে, এইভাবে রুশ সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীভবন নীতি (Democratic Centralism) কার্যকর।

অষ্টমতঃ, অনেক শাসনতন্ত্রবিদের মতে, **দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে খুবই আবশ্যক। সাধারণতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নিম্নকক্ষে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সদস্য হন। উচ্চ কক্ষে সাধারণতঃ ছোটবড় নির্বিশেষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যের সমানসংখ্যক প্রতিনিধি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

(৮) দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা ও উচ্চ কক্ষে অঙ্গরাজ্যগুলির সমপ্রতিনিধিত্ব

॥ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের জন্মবৃত্তান্ত ॥

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, প্রত্যেক সরকারই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলে। সরকারের এই বিবর্তনের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য ও কাল্‌চারের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মার্ক্‌স্‌-বাদীগণ অবশ্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার তারতম্যকেই এই ঐতিহাসিক বিবর্তনের ব্যাখ্যার মূল সূত্র বলে মনে করেন।

সব সরকারের মত এই সরকারও ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল

প্রখ্যাত সংবিধান-বিশেষজ্ঞ স্ট্রং (Strong) যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম প্রসঙ্গে দুটি ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। যথা—অন্তর্ভুক্তি পদ্ধতি (Integration by absorption) এবং সংযুক্তিকরণ পদ্ধতি (Federal process)। স্ট্রংয়ের উপস্থাপিত পদ্ধতি দুটির ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

স্ট্রংয়ের বর্ণিত দুটি পদ্ধতি : [১] অন্তর্ভুক্তি পদ্ধতি, [২] সংযুক্তিকরণ পদ্ধতি

অন্তর্ভুক্তি পদ্ধতির ফলে আগেকার দিনে পরাজিত কোন রাষ্ট্র বিজয়ী রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধির মারফত ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। অথবা, জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোন প্রজাতি (ethnic group) পার্শ্ববর্তী অন্য রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পড়েছে। এই সব ক্ষেত্রেই কোন সন্ধির দ্বারা এই মিলন পাকাপাকি রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু স্ট্রং-এর মতে , এর ফলে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই পদ্ধতি সাম্রাজ্যবাদী। বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের (U.N. Charter) অনুশাসন অনুযায়ী কোন রাষ্ট্র যুদ্ধের মারফত সাম্রাজ্যবিস্তারে লিপ্ত হতে পারে না। সুতরাং বলা যায় যে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে অন্তর্ভুক্তি পদ্ধতি আর কার্যকর হতে পারে না।

অন্তর্ভুক্তি পদ্ধতি সাম্রাজ্যবাদী ও এক-কেন্দ্রিক ; সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে এই পদ্ধতি পরিত্যক্ত

স্ট্রং বলেছেন যে, সংযুক্তিকরণ পদ্ধতির দ্বারাই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে। এই পদ্ধতি বিশেষ এক ধরনের মিলন (integration), তাকে অন্তর্ভুক্তি বলা যায় না। ডাইসির ব্যাখ্যা অনুসারে এই মিলন এমন একটা সমন্বয় যেখানে সমবায়ী অংশগুলি মিলিত হয়েও তাদের স্বাতন্ত্র্যজনিত পূর্বেকার অস্তিত্ব হারাবে না ("They must desire union but not unity")। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করেই ডাইসি যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁর স্মরণীয় সংজ্ঞায় বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র এমন একটা শাসনব্যবস্থা, যেখানে জাতীয় ঐক্য ও ক্ষমতা এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের অধিকার সমন্বিত হয় (A Federation is "a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of state rights")।

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রকৃত পদ্ধতি হল যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি : এ বিষয়ে স্ট্রং ও ডাইসির মতৈক্য

॥ সন্ধিসমবায় বা রাষ্ট্রসমবায় ॥

ধ্রুপদী শাসনতন্ত্রবিদ্‌গণ পূর্বেকার এক ধরনের রাষ্ট্রসংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আগেকার দিনে (প্রায় শতাধিক বর্ষ আগে) কতকগুলি রাষ্ট্র কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নিজেদের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধিকার ত্যাগ না করে সন্ধির মারফত একপ্রকার কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করত। এই সংগঠনকে "সন্ধি-সমবায়" বা "রাষ্ট্রসমবায়" (Confederation) বলা হত। যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সরকারের সঙ্গে সন্ধিসমবায়ের সাদৃশ্য শুধু এইটুকু যে, উভয়বিধ ব্যবস্থাই একাধিক শাসনাঙ্গের মিলিত সংস্থা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসমবায়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যই বেশী এবং সেই বৈসাদৃশ্য চরমভাবে দেখা দেয়। যথা—যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধান সার্বভৌম এবং সেই সংবিধানের প্রাধান্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বাত্মক। ধরা যাক—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কথা। ভারতীয় সংবিধান পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বিহার, অন্ধ্র প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যগুলিকে সাংবিধানিক সার্বভৌমত্বের আওতায় কতকগুলি সাধারণ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছে। কাজেই,

সন্ধিসমবায়ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি নিজেদের সার্বভৌমত্ব বর্জন করে না ; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির সার্ব-ভৌমত্ব নেই

ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবার আগে সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল না, পরেও সার্বভৌম রইল না। কিন্তু ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জার্মান রাষ্ট্র প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়াকে নিয়ে যখন রাষ্ট্রসমবায়রূপে গঠিত হল, তখন তাদের প্রত্যেকে আগেও যেমন সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল, পরেও তেমনি তাদের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখল।

অতি-আধুনিক যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোবিয়েত রাশিয়া এই দুটি বৃহৎ মতাদর্শগতভাবে পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্রের প্রাধান্যের ফলে বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার মেরুকরণ (Polarisation of Power) দেখা যায়। এই দ্বিমেরু-বিভক্ত আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসমাজে (Bipolar internationl society) ছোটবড় বিভিন্ন রাষ্ট্রই দুটি বৃহৎশক্তিগোষ্ঠীর কোন একটির সঙ্গে জোটবন্ধ। যেমন ন্যাটো গোষ্ঠী অর্থাৎ উত্তর অতলান্তিক উপকূলভুক্ত রাষ্ট্রগুলি (NATO বা North Atlantic Treaty Organisation) মার্কিনী শক্তির সঙ্গে জোটবন্ধ। আবার, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি পূর্ব ইউরোপীয় কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলি ওয়ারশ চুক্তি (Warsaw Pact) অনুসারে সোবিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে জোটবন্ধ। এই দুটি জোটের প্রত্যেকটির সঙ্গে আবন্ধ রাষ্ট্রগুলি জোটবন্ধ হবার আগে যেমন আইনতঃ সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল, জোটবন্ধ হবার পরেও তারা তাদের আইনগত রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেয় নি। সুতরাং আধুনিক জোটবন্ধতার মধ্য দিয়ে ধ্রুপদী কালের সন্ধিসমবায়ের পুনরাবির্ভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সন্ধিসমবায়ের অতি-আধুনিক উদাহরণ : জোটবন্ধ ধ্রুপদী রাষ্ট্র-সমবায়ের পুনরাবির্ভাব : যেমন, ন্যাটো ও ওয়ারশ চুক্তির দুটি বিরোধী জোট

॥ যুক্তরাষ্ট্র ও সন্ধিসমবায়ের মধ্যে তুলনা ॥

প্রথমতঃ, সন্ধিসমবায়ে জোটবন্ধ রাষ্ট্রগুলি আইনগত অর্থে সার্বভৌম। যুক্তরাষ্ট্রেও অঙ্গরাজ্যগুলি সংবিধানের মারফত কিছুটা স্বাতন্ত্র্য (autonomy) ভোগ করে। তাদের এই স্বাতন্ত্র্যকে (autonomy) কখনই সার্বভৌমত্ব (sovereignty) বলা চলে না। উইলোবি (Willoughby) এর কারণ নির্দেশ করে বলেন যে, সন্ধিসমবায়ে সম্মিলিত রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতার উৎস নিজেদের সার্বভৌম সত্তা, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতার উৎস হলঃ সংবিধান এবং সেই সংবিধানের ওপর তাদের কর্তৃত্ব খুব সীমাবন্ধ।

[১] সন্ধিসমবায়ের চুক্তিবন্ধ রাষ্ট্রগুলি সার্বভৌম, যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি সার্বভৌম নয়

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রবর্তিত হলে একটা নতুন জাতি ও একটা নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রের পত্তন হয়। কিন্তু সন্ধিসমবায়ের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলি জোটবন্ধ হয়েও নিজেদের সার্বভৌম সত্তা বজায় রাখে বলে এই প্রকার সংগঠনের দ্বারা কোন নতুন জাতি বা সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে ওঠে না। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাকামী অঙ্গরাজ্যগুলি একটি রাষ্ট্রসমবায় (Southern Confederacy) গড়ে তুলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। কিন্তু হলকম্বি

[২] সন্ধিসমবায়ের ফলে নতুন জাতি, নতুন রাষ্ট্র জন্মায় না : যুক্তরাষ্ট্রে এর ব্যতিক্রম

(Holcombe) বলেছেন যে, এই দক্ষিণী রাষ্ট্রসমবায়ও সূক্ষ্ম আইনগত বিচারে "রাষ্ট্রসমবায়" ছিল না। কারণ, এই অঙ্গরাজ্যগুলি সমবায়ী সংগঠনে যোগ দেবার পূর্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য ছিল মাত্র।

তৃতীয়তঃ, উইলোবি প্রমুখ মার্কিনী আইনবিদ্‌গণ বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র কোন চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট হয় না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও হয় নি। সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law) হল যুক্তরাষ্ট্রীয় সংগঠনের মৌল ভিত্তি। কারণ, এ শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য সর্বত্র স্বীকৃত। কিন্তু সন্ধিসমবায়ের মূল ভিত্তি হল চুক্তি। চুক্তির দ্বারাই একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ধিসমবায় সৃষ্টি হয়। আবার, অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবন্ধ হবার অধিকার রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের একটা প্রধান লক্ষণ।

(৩) সন্ধিসমবায়ে সমবায়ী রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব প্রধান, যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান প্রধান

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য সূচিত হবার দরুণ সেখানে সংবিধানের সর্বপ্রধান ভাষ্যকার ও কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যগুলির উচ্চতম অভিভাবকরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় উচ্চতম আদালত অপরিহার্য। কিন্তু সন্ধিসমবায়ে রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব তারা নিজেরাই রক্ষা করার অধিকারী। সেখানে সংঘবন্ধ রাষ্ট্রগুলি নিজেরাই নিজেদের অভিভাবক।

[৪] সন্ধিসমবায়ে সমবায়ী রাষ্ট্রগুলি প্রত্যেকে নিজের অভিভাবক, যুক্তরাষ্ট্রে বিচারালয় অভিভাবক

পঞ্চমতঃ, সন্ধিসমবায়ের কেন্দ্রীয় সংগঠন সমবায়ী রাষ্ট্রগুলির জনগণের ওপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ন্যাটো সংস্থার প্রধান দপ্তর বেল্‌জিয়ামের অন্তর্গত ব্রুসেল্‌স্‌ শহরে। এই দপ্তর ন্যাটোর জোটবন্ধ রাষ্ট্রগুলির কাছে নানা প্রস্তাব সুপারিশ করতে পারে; কিন্তু এর অন্তর্ভুক্ত সমবায়ী রাষ্ট্রগুলি প্রত্যেকেই সার্বভৌম হবার ফলে সদর দপ্তরের কোন সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ কার্যকর করা বা না-করা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রগুলির ইচ্ছাধীন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানপ্রদত্ত ক্ষমতার বলে যে কোন আদেশ-উপদেশের মাধ্যমে অঙ্গরাজ্যগুলির নাগরিকদের ওপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

[৫] সমবায়ী রাষ্ট্রের-জনগণের ওপর সন্ধি-সমবায়ের প্রভাব পরোক্ষ, যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রভাব প্রত্যক্ষ

ষষ্ঠতঃ, সন্ধিসমবায়ের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি নিজেদের সার্বভৌম শক্তির মাধ্যমে সমবায় পরিত্যাগ করার অধিকারী। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাজ্যগুলির এ অধিকার নেই, কেননা তারা কেউই সার্বভৌমত্বের অধিকারী নয়।

[৬] সমবায়ী রাষ্ট্রগুলি বিচ্ছিন্ন হতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রে পারে না

সপ্তমতঃ, সন্ধিসমবায় বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতকগুলি রাষ্ট্রের সমবায়। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই তারা সমবায় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলেও পারে, কারণ, তারা সার্বভৌম। এর পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসাবে বলা যায় যে, এর ফলে সন্ধি-সমবায় যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় স্বল্পায়ু হবার সম্ভাবনা।

[৭] তাই যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় সন্ধিসমবায় স্বল্পায়ু

অষ্টমতঃ, সাধারণতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-নাগরিকত্ব নীতি বলবৎ থাকে। অর্থাৎ-নাগরিক একই সঙ্গে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের এবং নিজের অঙ্গরাজ্যের নাগরিক। কিন্তু সন্ধি-

সমবায়ের সদর দপ্তর সাধারণতঃ এভাবে নিজস্ব পৃথক কোন নাগরিকত্ব সমবায়ী রাষ্ট্রগুলির জনগণের ওপর অর্পণ করতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে সমবায়ী রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকটির নাগরিকত্বই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিকদের একমাত্র নাগরিকত্ব। কমনওয়েলথভুক্ত (Commonwealth) রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে অবশ্য এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। ১৯৪৯ সালের সন্ধির ফলে কমনওয়েলথ কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি ডোমিনিয়ান (Dominion) এবং ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি প্রজাতন্ত্র (Republic) নিয়ে গঠিত হয়। ফলে কমনওয়েলথ একটি সন্ধিসমবায়। সুতরাং ভারতীয় বা শ্রীলঙ্কার নাগরিক একই সঙ্গে কমনওয়েলথেরও নাগরিক। তবে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনবিদদের মতে, কমনওয়েলথের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির নাগরিকগণ প্রায়ই তাঁদের নিজেদের রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্বের ওপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। ফলে, তাঁদের কমনওয়েলথ নাগরিকত্বকে সূক্ষ্ম আইনগত বিচারে ও ব্যবহারিক অর্থে "ফলপ্রদ নাগরিকত্ব" (Effective Citizenship বা Effective Nationality) বলা চলে না।

[৮] যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিনাগরিকত্ব থাকে, সন্ধিসমবায়ে থাকে না ; তবে কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলির নাগরিকগণ দ্বিনাগরিকত্বের অধিকারী হলেও তাদের নাগরিকদের কমনওয়েলথ নাগরিকত্ব "ফলপ্রদ নাগরিকত্ব" নয়

॥ যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ ॥

সাধারণতঃ বলা যায় যে, সাংগঠনিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারগুলি সবই এক রকমের। কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক দুরকমের সরকার, তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী ক্ষমতাবণ্টন ব্যবস্থা, শাসনতন্ত্রের অনমনীয়তা, সাংবিধানিক প্রাধান্য, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের অভিভাবকত্ব, রাজস্ববণ্টন নীতি ইত্যাদি সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রেই লক্ষণীয়।

সাংগঠনিক অর্থে যুক্তরাষ্ট্রগুলি এক ধরনের

কিন্তু কতকগুলি বিশেষ কারণে **যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাগুলির মধ্যে বিভিন্নতা** দেখা যায়। প্রথমতঃ, **ক্ষমতাবণ্টন** নীতির পার্থক্য। দ্বিতীয়তঃ, **সাংবিধানিক প্রাধান্য বজায় রাখার নীতির** পার্থক্য। তৃতীয়তঃ, **সংবিধান সংশোধনের নীতির পার্থক্য**। চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুযায়ী **কার্যনির্বাহপ্রণালীর পার্থক্য**।

বিভিন্নতার কারণ ঃ [১] ক্ষমতাবণ্টন নীতি, [২] সাংবিধানিক প্রাধান্য, [৩] সংবিধান শোধন পদ্ধতি, [৪] কার্যনির্বাহ প্রণালী

ক্ষমতাবণ্টন নীতির পার্থক্য অনুযায়ী প্রধানতঃ, **দুরকমের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা** দেখা যায়—**মার্কিনী** ও **কানাডীয়**। মার্কিনী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারের শাসনক্ষমতা ও আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা দুটি পৃথক তালিকায় উল্লেখ করা আছে। কিন্তু এমন কতকগুলি ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষেত্র ভবিষ্যতে উপস্থিত হতে পারে, যেগুলি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার বা আঞ্চলিক সরকার এদের যে-কোনও একটির কর্তৃত্ব প্রয়োগ আবশ্যকীয়। এগুলি হল কতকগুলি **অবশিষ্ট ক্ষমতা** (Residuary powers)। কানাডীয় শাসনতন্ত্রের ৯১ ধারা অনুযায়ী

ফলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুরকমের যুক্তরাষ্ট্র ঃ [১] মার্কিনী ; [২] কানাডীয় ; ক্ষমতাবণ্টন নিয়ে দুইয়ের পার্থক্য

অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পিত হয়েছে। অর্থাৎ, এই ক্ষমতাগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের রচিত আইনকানুন চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি অঙ্গরাজ্যগুলি ভোগ করে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে **সাংবিধানিক প্রাধান্য বজায় রাখার নীতির পার্থক্য অনুযায়ী দুরকমের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার** দেখা যায়—**মার্কিনী** এবং **সুইজারল্যাণ্ডের** যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ২, ৩ ও ৬(২) ধারা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ আদালত সাংবিধানিক প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা করে এবং শাসনতন্ত্রের অভিভাবকরূপে কাজ করে। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বদলে এই কাজের ভার দেওয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার ওপর। তাছাড়া, সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আর একটি অভিনব ব্যবস্থার দ্বারা সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। স্থইজারল্যাণ্ডে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy) প্রচলিত। অর্থাৎ, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্যের অর্থই হল শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য। যদি ৩০ হাজার ভোটদাতা অথবা ৮টি ক্যাণ্টন (Canton) বা অঙ্গরাজ্য দাবী করে যে কোনও বিশেষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন জনগণের অনুমোদন না পেলে বলবৎ হবে না, তা হলে ঐ আইন গণভোটের দ্বারা অনুমোদন লাভ না করলে আইন বলে গ্রাহ্য হবে না।

মার্কিনী ও সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য : [১] সাংবিধানিক প্রাধান্য রক্ষা নিয়ে

শাসনতন্ত্রের সংশোধন-ব্যবস্থার পার্থক্যের ভিত্তিতেও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে তফাৎ দেখা যায়। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে** তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের আইনসভার অনুমোদন ছাড়া সংবিধান সংশোধন করা যায় না। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র অনমনীয়। **সুইজারল্যাণ্ডের** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র অপেক্ষাকৃত নমনীয়। কারণ, সেখানে নির্দিষ্টসংখ্যক জনগণ যদি উদ্যোগী হন, তাহলে তাঁদের স্বাক্ষরযুক্ত গণ-উদ্যোগের দ্বারা সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে এবং পরে গণভোটের দ্বারা ঐ সংশোধনী আইন গৃহীত হলে তা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে।

[২] সংবিধান সংশোধন ব্যবস্থা নিয়ে

আধুনিক শাসনতন্ত্রবিদ্‌গণ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে **কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের কার্যনির্বাহ-পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে চতুর্থ প্রকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার** উল্লেখ করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আধুনিক রাষ্ট্রিক জীবনের জটিলতা দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কেন্দ্রাভিমুখী ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার এই কেন্দ্রাভিমুখিতার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারের সম্পর্কটা পুরোপুরি প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার উভয়েই মনে করে যে তারা সমগ্র জাতির একটি সামগ্রিক রাজনৈতিক সত্তার অংশবিশেষ। তারা যেন সমগ্র জাতির পূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। এই অর্থেই আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে **সমবায়িক বা সহ-সক্রিয়** (Co-operative or Parti-

কার্যনির্বাহপ্রণালী নিয়ে গঠিত সমবায়িক বা সহ-সক্রিয় যুক্তরাষ্ট্র: যেমন—ভারত

cipatory) যুক্তরাষ্ট্র বলা হয়। ভারত এই ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কারণ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে নানা কারণে কেন্দ্রের প্রাধান্য স্থাপিত। কিন্তু তাই বলে অঙ্গরাজ্যগুলি কেন্দ্রের নিছক আজ্ঞাবহ কতকগুলি পরিচারক নয়। এরা যেন সমস্ত সৌরব্যবস্থার চারপাশের গ্রহমণ্ডলী। ছোটবড়-নির্বিশেষে একই নিয়মে এরা কেন্দ্রের চারপাশে সাধারণ গতিবেগকে আশ্রয় করে চলমান। কেন্দ্রীয় সরকারও এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলিকে সাধারণ অভিভাবকত্বের বন্ধনে, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার টানে বেঁধে রেখেছে। অবশ্য এই আদর্শগত ভারসাম্য রক্ষা বাস্তবক্ষেত্রে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে কোন কোন সময়ে সম্ভব হচ্ছে না। জাতীয় স্বার্থের প্রতি কোন কোন ক্ষেত্রে উদাসীন হয়ে অঙ্গরাজ্যগুলি নিজেদের স্বার্থকে বড় করে দেখছে। আবার কেন্দ্রীয় সরকারও অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের স্বার্থ দেখতে গিয়ে পৃথক্‌ভাবে কোন কোন বিশিষ্ট অঙ্গরাজ্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে। এই দুটি দুর্ঘটনারই ফলশ্রুতি এক—জাতীয় ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা, আঞ্চলিকতা ইত্যাদির আবির্ভাব।

॥ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার গুণ ॥

মার্কিন দেশ যে অনবদ্য শাসনব্যবস্থা পৃথিবীর শাসনতন্ত্রের ভাণ্ডারে উপহার দিয়ে গেল তা হল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। ঐক্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে, কেন্দ্রাভিমুখী এবং কেন্দ্রবিরোধী গতিবেগের মধ্যে, স্বাধীনতা ও সুসংবদ্ধতার মধ্যে, স্বায়ত্তশাসন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাষ্ট্রের জীবনকে একটা সামগ্রিক, নিটোল রূপে রূপায়িত করে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একক রাজ্যগুলি নিজেদের স্বাধিকার বজায় রাখতে চায়, আবার একটি কেন্দ্রীয় শাসনের আশ্রয়ে আশ্রিত হয়ে কতকগুলি সাধারণ সুযোগ সুবিধাও ভোগ করতে চায়। সুতরাং, প্রথমতঃ, সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় আইন প্রচলন করে, আঞ্চলিক স্বাধিকার রক্ষার জন্য আঞ্চলিক সরকারদের হাতে প্রয়োজনমত আইনপ্রণয়ন করার ক্ষমতা দিয়ে দেয়। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে দ্বৈত নাগরিকত্ব চালু থাকলেও সেখানে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠা অসম্ভব হয় নি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণঃ [১] জাতীয় ও অঙ্গরাষ্ট্রীয় দুরকম আইন থাকার সার্থকতা

দ্বিতীয়তঃ, ভারতের মত আঞ্চলিক বৈচিত্র্যে ভরা দেশের পক্ষে এই শাসনব্যবস্থাই অধিকতর বাস্তবভিত্তিক। ভারতে নানা বর্ণের, ধর্মের, ভাষার, বংশগত প্রজাতির অস্তিত্ব সর্বজনবিদিত। এইসব বৈচিত্র্য নিয়ে এক একটি অঙ্গরাজ্যে অসংখ্য সমস্যা। এই অঙ্গরাজ্যগুলিকে আংশিকভাবে আঞ্চলিক স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে এরা নিজেদের স্বার্থে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখতে খুবই ব্যগ্র হয় এবং সাধারণ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত থেকে সহযোগিতা ও সহানুভূতির সুদৃঢ় যোগসূত্রে সম্মিলিত হয়। সোবিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ভাষা, ধর্ম প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে অসংখ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বসবাস করে। তাদের সকলকেই সমান মর্যাদা এবং সমান ক্ষমতার অধিকারী করে, একই সাম্যবাদী

[২] সংখ্যালঘুদের রক্ষার জন্য ভারতের ও সোবিয়েত রাশিয়ার মত দেশে এর সার্থকতা

আদর্শে অনুপ্রাণিত করে গড়ে উঠেছে সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক সমস্যার, বিশেষতঃ সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান সহজ হয়।

[৩] ব্রাইস্ বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো সহজ

তৃতীয়তঃ, মার্কিন প্রজাতন্ত্রে ইংরেজ দূত ও সেখানকার সংবিধানের প্রধান ভাষ্যকাররূপে খ্যাত অধ্যাপক ব্রাইস্ বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক দু'প্রকার শাসনব্যবস্থা চালু থাকায় যুক্তরাষ্ট্রে সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সর্বদা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো চলে। আঞ্চলিক সরকারে বহু বৈচিত্র্য থাকে।

[৪] ব্রাইসের মতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংকার স্বৈরাচারী হতে পারে না

চতুর্থতঃ, লর্ড্ ব্রাইসের মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অনেক শাসনক্ষমতা থাকলেও তার পক্ষে স্বৈরাচারী হওয়া সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে অঙ্গরাজ্যগুলিও বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। কারণ, লিখিত শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের পারস্পরিক ক্ষমতা ও অধিকার সুনির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ।

[৫] নাগরিক অধিকার সংবিধানে বিধিবদ্ধ ; ফলে বিপ্লবের সম্ভাবনা কম

পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় লিখিত শাসনতন্ত্রে সাধারণতঃ নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে জনগণের মধ্যে সন্তোষ ও সম্প্রীতি দেখা যায়, হিংসাত্মক বিপ্লব ইত্যাদির সম্ভাবনা কম থাকে।

[৬] অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সুবিধা : সোবিয়েত রাশিয়াতে ও ভারতের সাত বা পাঁচসালা পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা

ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টিত হয়, রাজস্ব এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বও বণ্টিত হয়ে থাকে। উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশকে সহজেই ধীরে ধীরে উন্নত এবং স্বনির্ভর করে তোলা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, **সোবিয়েত রাশিয়ার সাতসালা এবং ভারতের পাঁচসালা পরিকল্পনার** (Seven or Five Year Plans) মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে এই দুই দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকার ফলে।

সপ্তমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে অনেকে অর্থনীতির শ্রমবিভাগ (Division of Labour) পদ্ধতির তুলনা করে থাকেন। সমাজে একই মানুষ নানা কাজে শ্রমিকরূপে সমান দক্ষ ও পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু শ্রমবিভাগ থাকলে এক একটা বিশেষ কাজে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিক গড়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের বেলাতেও তাই। বিরাট দেশের প্রত্যেক প্রান্তের প্রয়োজন অনুসারে শাসনকার্য সম্পাদন করা একটিমাত্র সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। সব কাজ করতে গিয়ে বহু কাজই ভালভাবে সম্পাদিত করা এ সরকারের পক্ষে অসম্ভব। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে যেন কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে একই শাসনকার্যের অংশবিশেষকে অবলম্বন করে এক ধরনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শ্রমবিভাজন নীতি বিধিবদ্ধ হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা শুধু শাসনক্ষমতা বণ্টনের তালিকা নয়, কাজের জন্য কর্মবণ্টনের, শ্রমবণ্টনেরও তালিকা। ফলে, যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসনে দক্ষতা আসে।

[৭] অর্থনৈতিক শ্রমবিভাগের মত শ্রমবণ্টনের ও কর্মবণ্টনের সুবিধা

অষ্টমতঃ, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক দুরকমের সরকার একই সঙ্গে একই দেশে একই শাসনতন্ত্রের অধীনে কার্যকর থাকার ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় নাগরিকগণ রাষ্ট্র সম্বন্ধে বেশী সচেতন হয়ে ওঠার এবং অধিকতর প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পান। ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষাদান অন্যান্য শাসনব্যবস্থার চেয়ে সহজ এবং সার্থক হয়ে ওঠে। জনপ্রশাসনতন্ত্রে (Public Administration) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় সাধারণতঃ এ ধরনের ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে তার যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র সফল করার জন্য গণতান্ত্রিক নাগরিক গড়ে তোলা সহজ।

[৮] দুরকম শাসনব্যবস্থা থাকায় জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষালাভের সুযোগ বেশী

নবমতঃ, ছোট ছোট রাষ্ট্র অনেক সময় দুর্বল ও শাসনচালনায় অসমর্থ এককরূপে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির পক্ষে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অশান্তি সৃষ্টি করে তুলতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এ ধরনের দুর্বল, ছোট রাষ্ট্রগুলি মিলিতভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। একা তাদের কারুর পক্ষে এই শক্তিসংগ্রহ অসম্ভব। কার্ল ফ্রিড্রিশ্ ঠিকই বলেছেন যে, প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি যদি প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে নিজেদের গড়ে তুলত, তাহলে হয়ত আজকের সুসমৃদ্ধ, ক্ষমতাশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন সেখানে হত না। কানাডীয় যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়েও এ কথার সত্যতা প্রমাণ করা যায়। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার থাকলেও কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার অনগ্রসরতা দূর করার জন্য অন্য অঙ্গরাজ্যের তুলনায়, এমন কি বামফ্রন্ট-শাসিত পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে, ত্রিপুরায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকার ফলেই সেটা সম্ভব হয়েছে।

[৯] দুর্বল অঙ্গরাজ্যগুলি সবলের সাহায্যে মিলিতভাবে উন্নত হতে পারে

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দোষ-ত্রুটি ॥

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান দোষ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গেটেল (Gettell) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নজীর দেখিয়ে বলেন যে, প্রথমতঃ, এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে প্রায়ই ক্ষমতার এলাকা এবং পরিমাণ নিয়ে বিবাদবিসম্বাদ দেখা দেয়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা দুর্বল শাসনব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা এক ধরনের **ক্ষমতার ভারসাম্য** (Balance of Power) স্থাপনের চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত এ শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন এককের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন ও ভোগ নিয়ে তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এক অঙ্গরাজ্য অন্য অঙ্গরাজ্যকে অথবা কেন্দ্রকে দোষারোপ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতে ৭০ দশকের গোড়ায় যখন অকংগ্রেসী সরকার ভারতের নানা অঙ্গরাজ্যে গড়ে ওঠে, তখন এবং বর্তমানে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারা অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ তোলেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রবিরোধি-

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ত্রুটি : [১] ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন ; কেন্দ্র-অঙ্গরাজ্য লড়াইয়ের সম্ভাবনা : অকংগ্রেসী পশ্চিমবঙ্গ সরকার বনাম কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকার

তার অভিযোগ তোলেন। কিন্তু কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার আবার পশ্চিমবঙ্গের এই অভিযোগ অস্বীকার করেন।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একাধিক শাসন-প্রতিষ্ঠান থাকার ফলে এই ব্যবস্থার পরিচালনা ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়ায়। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ব্যয়বরাদ্দ, রাজস্ববণ্টন প্রভৃতি বিষয়ে ঘোরতর মতানৈক্য ঘটতে পারে, শাসনতন্ত্রে নির্দিষ্ট নীতিনির্ধারণে প্রায়ই অযথা অবাঞ্ছিত দেরী হয় এবং দ্বৈত বা বহুধাবিভক্ত শাসননীতি প্রচলিত হবার ফলে শাসনকার্যে জটিলতা বৃদ্ধি পেতে পারে বা অবাঞ্ছিত অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

[২] রাষ্ট্রে দুরকম সরকার থাকার জন্য বিরোধ ছাড়াও নীতি-নির্ধারণে বিলম্ব, শাসনকার্যে জটিলতা

তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারকে পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ধীরস্থির ভাবে চলতে হয়। জাতীয় বনাম আঞ্চলিক স্বার্থ, অঙ্গরাজ্যসমূহের অর্থনৈতিক অধিকার ইত্যাদি স্পর্শকাতর প্রশ্ন প্রায়ই কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য সরকারদের বিব্রত করে। ফলে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় জটিলতা, মন্থরতা ও শৈথিল্য দেখা দিতে পারে।

[৩] ফলে প্রশাসনে মন্থরতা, শৈথিল্য

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান সাধারণতঃ লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। তাই প্রয়োজন দেখা দিলে সংবিধানকে সহজে নমনীয় করা যায় না। নানা বিপরীতমুখী স্বার্থের টানাপোড়েন থাকে। ফলে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র দেশের প্রগতিশীলতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

[৪] অনমনীয় শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয়

পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় যদি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে সব দিক দিয়ে সামঞ্জস্য রচিত না হয়, তাহলে রাষ্ট্রে ঐক্যের বদলে চরম বিচ্ছিন্নতা দেখা দিতে পারে। এই অবস্থায় অনেক সময় একক রাজ্যগুলি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের জন্য চেষ্টা করতে পারে। ১৮৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্বই এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা-কামী জনগণের সঙ্গে জাতীয় ঐক্যপ্রার্থী জনগণের গৃহযুদ্ধের ফলে বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় জাতীয় সংহতির জয় হয়।

[৫] অঙ্গরাজ্যগুলির কেন্দ্রবিরোধিতা শেষে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে পারে: ১৮৬১ সালের মার্কিন গৃহযুদ্ধের নজির

ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলি অনেক সময় পরস্পরবিরোধী আইনকানুন প্রস্তুত করে। এর ফলে শুধু যে শাসনতান্ত্রিক অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং জটিলতা বৃদ্ধি পায়, তা-ই নয়। এই ধরনের পরস্পরবিরোধী আইনকানুনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যার সন্ধানে বিবদমান এককগুলি শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় উচ্চতম আদালতের পথে ধাবিত হয়। ফলে, অযথা মামলা মোকদ্দমা চলতে থাকে। এজন্যই অনেকে ব্যঙ্গ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে আইনজীবীদের স্বর্গ (paradise for lawyers) বলে বর্ণনা করেন।

[৬] কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের পরস্পরবিরোধী আইন বিভ্রান্তি ও জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে: ফলে আইনজীবীদের প্রাধান্য

সপ্তমতঃ, কোনও কোনও ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে বড়ো দুর্বল বলে মনে হয়। আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রভৃতি সম্পাদনে কেন্দ্রীয় সরকারের মতের সঙ্গে যদি আঞ্চলিক সরকারগুলির মতের মিল না হয়, তাহলে তাদের বিরোধিতার ফলে সন্ধির বা চুক্তির শর্তগুলি পালনে বিঘ্ন ঘটে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই অবস্থায় ঐ বিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মানমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

[৭] আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনে অসুবিধা

অষ্টমতঃ, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিতে পারে। প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম্ লিঙ্কন্ (Abraham Lincoln) যখন ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কুখ্যাত ক্রীতদাসপ্রথা বন্ধ করার নীতি গ্রহণ করেন, তখন দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যগুলি তাঁর এই চিরস্মরণীয় প্রগতিশীল নীতিটি মেনে নিতে পারে নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঐতিহাসিক গৃহযুদ্ধের এটাই হল শোচনীয় পরিণতি। এ ধরনের ঘটনার পরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মনে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে শুরু হয়।

[৮] আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্যের বিরোধের সম্ভাবনা: মার্কিন গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা

নবমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনপরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক এই দু'প্রকার সরকারের মধ্যে বিভক্ত। ফলে, শাসনপরিচালনায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে আংশিকভাবে দায়িত্ব লোপ পেতে পারে। কোনও বিপজ্জনক জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হলে প্রত্যেক সরকারই নিজের দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে ফেলার চেষ্টা করে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় নিদারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তখন ভারত ইংলণ্ডের অধীন ছিল এবং ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয় নি। তবুও একটা বিরাট দেশে কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকার একই সঙ্গে কর্মরত থাকলে কিভাবে এক সরকার অপরের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে তার অকাট্য প্রমাণ মেলে। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেল। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে দায়ী করল, আর প্রাদেশিক সরকার দায়ী করল কেন্দ্রীয় সরকারকে। বর্তমানে কেন্দ্র-অঙ্গরাজ্য সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ভারত সরকার ও অঙ্গরাজ্য-সরকারগুলির কোন কোনটির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছে, তাতে তথ্য ও তত্ত্বের সংখ্যার চেয়েও যেন পারস্পরিক বিশ্বাস ও বোঝা পড়ার অভাবজনিত মান-অভিমানের পালাই অনুষ্ঠিত হচ্ছে—এ অভিযোগ অনেক নিরপেক্ষ দেশপ্রেমিকের।

[৯] কেন্দ্র বা অঙ্গরাজ্য যে কেউ অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজের অপদার্থতা ঢাকতে চেষ্টা করতে পারে

॥ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কি কি অবস্থায় সফল হয় ॥

সাধারণতঃ শাসনতন্ত্র রচিত হলেই যে সেই শাসনব্যবস্থা কার্যকর ও সফল হয়ে উঠবে, তা নয়। শাসনতন্ত্র স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত (auto-regulated) ব্যবস্থা নয়। সব রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে কতকগুলি বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর। কেননা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সব কিছুই সতত পরিবর্তনশীল মানুষ ও সমাজকে কেন্দ্র করে কল্পিত। এই অর্থে **রাষ্ট্রবিজ্ঞানই আপেক্ষিক** (relative)।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আপেক্ষিক: তাই যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাফল্যের শর্তগুলি জানা দরকার

তাই দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার ওপর।

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ সিদ্ধান্ত করেন যে, বিভিন্ন অঞ্চল পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী কোনও রাষ্ট্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিছক বাঁচার তাগিদেই যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলে। এই একতা সাময়িক হলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় ঐক্য সুবিধাবাদী জোটে পরিণত হয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের প্রথম শর্ত হল ঐক্যবোধ ও সংহতিবোধ। স্থায়ী যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য এই ঐক্য সম্পূর্ণভাবে জাতীয় ঐক্যে রূপান্তরিত হওয়া দরকার এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পক্ষেই তা সম্ভব।

(১) জন্ স্টুয়ার্ট্ মিলের মতে, দরকার ঐক্য ও সংহতির বোধ

দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির অধিবাসীরা কেন্দ্রীয় সরকারে অংশ গ্রহণ করবে ঠিকই। কিন্তু এটা সম্ভব হয়, যদি যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব বেশী না হয়। ভৌগোলিক সামীপ্য না থাকায় ব্রিটিশ্ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

(২) ভৌগোলিক সামীপ্য

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে ছোটবড় নির্বিশেষে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের স্বার্থকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে তাই ৫০টি অঙ্গরাজ্যের প্রত্যেকটি থেকে ২ জন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ভারতের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে অর্থাৎ রাজ্যসভায় (Council of States) কিন্তু এই নীতি অনুসৃত হয় নি। অনেকের মতে এই ধরনের অঙ্গরাষ্ট্রিক বৈষম্য না থাকাই আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে কাম্য।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে অঙ্গরাজ্যগুলির সমপ্রতিনিধিত্ব

চতুর্থতঃ, গিল্ক্রাইস্ট্ (Gilchrist) মনে করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রকে এক জাতির ভিত্তিতে গড়ে তোলার ওপর। সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তা সহজেই জাগ্রত হয়, যদি রাষ্ট্র ও জাতীয়তার সীমানা একই হয়ে দাঁড়ায়।

(৪) রাষ্ট্র ও জাতির সীমারেখার অভিন্নতা

পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক এবং কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ সালিশীকর্তা হল যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাফল্যের অন্যতম শর্ত হল এই বিচারালয়ের নিরপেক্ষতা ও প্রাধান্য বজায় রাখা।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের নিরপেক্ষতা

ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে আয়তন, জনসংখ্যা, সম্পদ ইত্যাদির সমতা থাকা চাই। একটি অঙ্গরাজ্য যদি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য শরিকের চেয়ে এই সব দিকে বেশী শক্তিশালী হয়ে পড়ে, তা হলে তার আধিপত্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা অবশেষে কার্যতঃ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়ে উঠবে। জার্মান্ সাম্রাজ্যের মধ্যে উনবিংশ

(৬) অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে আয়তন, জনসংখ্যা ও সম্পদের ক্ষেত্রে সমতা

শতাব্দীর শেষ দিকে প্রুশিয়া সাম্রাজ্যভুক্ত অন্য এলাকাগুলির চেয়ে বহু বিষয়ে শক্তিশালী হয়ে পড়ে। ফলে, এই এলাকাগুলি প্রুশিয়ার তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত হয়ে পড়েছিল।

সপ্তমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের দ্বৈততা থাকার ফলে এখানে নানারকম সাংবিধানিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। মার্কিন ও সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে দ্বৈত নাগরিকত্বও দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের এই জটিলতা সম্বন্ধে নাগরিকগণ ভালভাবে সচেতন না হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সফল হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু এই সচেতনতা গড়ে ওঠে তখনই, যখন নাগরিকগণ বিদ্যাবুদ্ধিতে, শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত থাকেন। নাগরিকদের রাজনৈতিক সচেতনতাও প্রয়োজন। সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার অধ্যাপক **র‍্যাপার্ড্** (Rappard) **সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্যের প্রধান কারণ** হিসাবে সেখানকার নাগরিকদের বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষ, রাজনৈতিক সচেতনতা ইত্যাদির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **হ্যামিল্টন্** (Hamilton) তাঁর যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত রচনাবলীতে (The Federalist) ঠিকই মন্তব্য করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে পৃথক্‌রূপে প্রধান কয়েকটি রাষ্ট্রের সমষ্টি হলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা হল সম্পূর্ণ ভিন্নসত্তাযুক্ত অন্য একটি রাষ্ট্র। বলা বাহুল্য, যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকদের ত্যাগ ও শ্রমের ওপর ভিত্তি করেই একের মধ্যে বহুর এই অপরূপ রাষ্ট্রসত্তা গড়ে উঠতে পারে। এই সত্তা স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও অভিন্ন, অভিন্নতার মধ্যেও স্বতন্ত্র। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের সাফল্য মূলতঃ নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রীয় পৌরনীতির (Federal Civics) ওপর।

(৭) দ্বৈত নাগরিকত্ব ও নাগরিক সচেতনতা : সুইজারল্যান্ড প্রসঙ্গে র‍্যাপার্ডের ব্যাখ্যা

অষ্টমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় যদি অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতার ভাব বর্তমান না থাকে, তাহলে সেই যুক্তরাষ্ট্র কখনই সফল হতে পারে না। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের একটি প্রধান শর্ত হল অঙ্গরাজ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে এবং কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থাগত ঐক্য থাকা। দুঃখের কথা, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক হিংসা, দ্বন্দ্ব প্রভৃতির জন্য এই যুক্তরাষ্ট্রকে অনেক সময় বহু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং হচ্ছে। যখনই কোনও নতুন ইস্পাত কারখানা কিংবা কোনও তৈল-শোধনাগার স্থাপনের কথা কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, তখনই বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য তাদের নিজের নিজের এলাকায় যাতে ঐ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাগুলি কার্যকর হয়, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে খুবই নিরপেক্ষ ও কঠোর থাকতে হবে। বলা বাহুল্য, এর ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ভীষণ তিক্ততা ও ভুলবোঝাবুঝি ঘটে থাকে। এতে জাতীয় ঐক্য প্রচণ্ড ব্যাহত হয়। আর প্রশ্রয় পায় আঞ্চলিক সংকীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতা।

(৮) অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বন্ধুত্বভাব

নবমতঃ, যে সব যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে,

সেখানে ঐ দলগুলির মধ্যে আপসের মনোভাব ও জাতীয় স্বার্থে দলীয় সংকীর্ণতার

(৯) রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সহমর্মিতা

ঊর্ধ্বে ওঠার মত চেষ্টা ও আন্তরিকতা থাকা চাই। গোলটেবিল বৈঠকের দ্বারা, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যাগুলির সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা না করলে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্বই বিপদের সম্মুখীন হয়। পঞ্জাবের অকালিদের খালিস্তানী আন্দোলন, ত্রিপুরায় "আমরা বাঙ্গালী" চিন্তাধারা এইসব দিক থেকে জাতীয় সংহতির পথে বিপজ্জনক। অন্ধ্রের "তেলুগু দেশম্" দলকেও এখন "ভারত দেশম্" এর পক্ষে ভাবতে হচ্ছে।

॥ এককেন্দ্রিক সরকার বনাম যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ॥

তুলনামূলক আলোচনা

একেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে পার্থক্য : সাংগঠনিক ও প্রকৃতিগত

এককেন্দ্রিক সরকার এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার যেন উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মত, একে অন্যের বিপরীত। **সাংগঠনিক (structural)** এবং **প্রকৃতিগত (constitutional) দিক থেকে** এদের পার্থক্য দেখানো যেতে পারে।

সাংগঠনিক দিক থেকে বলা যায় যে, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটিমাত্র (অর্থাৎ কেন্দ্রীয়) সরকারের হাতে সমস্ত শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত। অঙ্গরাজ্যগুলির কোনও অস্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য সেখানে নেই। সুতরাং এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-বিভাজনের কোনও প্রয়োজন অনুভূত হয় না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক দু'রকমের সরকার থাকে। তাই এই শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা-বিভাজনের প্রশ্ন ওঠে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে প্রথম প্রধান পার্থক্য হল এই যে, **একটিতে শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে, অপরটিতে শাসনক্ষমতা** বিকেন্দ্রীভূত থাকে।

সাংগঠনিক পার্থক্য : (১) এককেন্দ্রিক সরকারে শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, যুক্তরাষ্ট্রে বিকেন্দ্রীভূত

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সর্বদাই **লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র** দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত এবং অনমনীয় হতে পারে, অথবা অলিখিত এবং নমনীয় হতে পারে। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সরকার এককেন্দ্রিক। এখানকার সংবিধান লিখিত এবং অনমনীয়। কিন্তু ইংলণ্ডের মত এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অলিখিত এবং নমনীয়।

(২) এককেন্দ্রিক সংবিধান লিখিত বা অলিখিত, নমনীয় বা অনমনীয় হতে পারে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান সর্বদাই লিখিত ও অনমনীয়

তৃতীয়তঃ **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের** শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা করলে বেশ বোঝা যায় যে, এই শাসনব্যবস্থায় সরকারের কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক অংশের মধ্যে **আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা ও শাসন ক্ষমতা বণ্টিত** হয়। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় লিখিত সংবিধান যেন একটা দলিলের কাজ করে থাকে। দু'ধরনের সরকার থাকে বলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বাস্তবক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের এই প্রাধান্য সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু এককেন্দ্রিক সরকারের শাসনতন্ত্র সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মত অত

(৩) যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা ও শাসনক্ষমতা বণ্টিত ; এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে তা দেখা যায় না

অনমনীয় নয়, সংবিধানিক ক্ষেত্রে আদালতের প্রাধান্যও সেখানে কম। তাই **এককেন্দ্রিক সরকারের শাসনতন্ত্রে আইনসভার প্রাধান্য** সূচিত হয়।

একেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য : (১) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বৈচিত্র্যময় দেশে অধিকতর প্রযোজ্য

প্রকৃতিগত পার্থক্যগুলি নিয়ে বিচার করলে বলা যায় যে, **এককেন্দ্রিক সরকার** সাধারণতঃ ছোট, **বৈচিত্র্যহীন দেশের পক্ষে** বেশী সফল হয়ে ওঠে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সাধারণতঃ বিপুল বৈচিত্র্যবহুল দেশে অধিকতর সাফল্য লাভ করতে পারে।

(২) এককেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্র-অঙ্গরাজ্যের মধ্যে কর্মবিভাজন নেই, যুক্তরাষ্ট্রে আছে

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা অর্থনীতির **শ্রমবিভাগ** (Division of Labour) পদ্ধতির মত **কর্মবিভাগ** (Division of functions) নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একাধিক সরকারের হাতে কিছু কিছু দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে এ ধরনের শাসনবিষয়ক অথবা আইনপ্রণয়নবিষয়ক দায়দায়িত্বের ভাগ-বাঁটোয়ারা করার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। **সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় থাকে ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য, এককেন্দ্রিক সরকারে দেখা যায় বৈচিত্র্যবিহীন ঐক্য।**

(৩) এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকতা নেই, যুক্তরাষ্ট্রে থাকে

তৃতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকত্ব নীতি প্রচলিত, অর্থাৎ, এই সব দেশের কোন নাগরিক সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, আবার সে নিজের অঙ্গরাজ্যেরও নাগরিক। ফলে, যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক মানসিকতার মধ্যে দ্বৈততা দেখা যায়। কিন্তু **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে** নাগরিকত্বের মধ্যে **কোনও দ্বৈততা নেই।** কারণ, সরকার একটিমাত্র : একক, নাগরিকত্বও এক ও অবিভাজ্য।

উপসংহার : সব সরকারই আপেক্ষিক

এককেন্দ্রিক বনাম যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈপরীত্য সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কিছু বলা যায় না। সরকার সব সময়েই আপেক্ষিক। মহাকালের পটভূমিকায় বিচিত্র ঘটনা-প্রবাহের প্রভাবে, অসংখ্য, অসাধারণ সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতে জনমানস রাষ্ট্রিক, শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানাভাবে নিজেকে প্রতিফলিত করে তোলে। তাই দেখা যায় যে, হয়ত কোনও দেশের শাসনতন্ত্র-রচয়িতাগণ মৌলিক শাসনতন্ত্ররূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কাঠামো বেছে নিয়ে শাসনতন্ত্র রচনা করলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল, সেই শাসনতন্ত্র কার্যতঃ এককেন্দ্রিক শাসনতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত একটা কাঠামো তৈরী করে নিয়েছে। তাই এক সরকারের সঙ্গে অন্য সরকারের সাংগঠনিক, প্রকৃতিগত বা কর্মপদ্ধতিগত তুলনা করতে গেলেই **সরকারের** বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহণের সাধারণ সূত্র হিসাবে **আপেক্ষিকতার সূত্রকে মেনে নিতেই হয়।** সরকারের আপেক্ষিকতাবাদের এই নীতি (Theory of Relativity of Government) প্রবীণ গ্রীক দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আরিস্টটল্ প্রয়োগ করেন। আধুনিক যুগে এই বিষয়টিকে নব্যনীতির রূপদান করেন প্রখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্।

এই আপেক্ষিকতার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, **আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আধুনিক যুগ যুক্তরাষ্ট্রের যুগ।** প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ব্যয়বাহুল্য, বিভিন্ন অঞ্চলে পরস্পর-বিরোধী আইনকানুন প্রচলনের সম্ভাবনা, সরকারের দ্বৈততা প্রভৃতির ফলে শাসনতান্ত্রিক জটিলতা, কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বা এক বা একাধিক আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা, সেই বিরোধ দূরীকরণের জন্য বিচারালয়ের দ্বারস্থ হওয়া, ফলে বিচারালয়ের প্রাধান্য ইত্যাদি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বহু অসুবিধা বা দোষত্রুটি এই সরকারের গঠনপদ্ধতির নানাপ্রকার সংস্কারের মাধ্যমে দূর করে নেওয়া যায়। এই সমস্ত কারণে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ আধুনিক যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনকে এবং সাধারণ মানুষের মনকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে তুলেছে।

আপেক্ষিক সূত্র ধরে বলা যায় আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্তমান যুগ যুক্তরাষ্ট্রের যুগ

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে বিভিন্ন অংশের বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অনবদ্য ঐক্য স্থাপনের একমাত্র উপায়রূপে ভারতবর্ষ প্রভৃতি বিশাল বৈচিত্র্যবহুল দেশগুলি নিজেদের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে। বর্তমান কালে **সোবিয়েত রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** এই দুটি দেশ দুটি বিভিন্ন অর্থনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। তারা তাদের নিজেদের শাসনব্যবস্থা ঐ তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর সুগঠিত করে রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুঁজিবাদ বা ধনতান্ত্রিক (Capitalism) আদর্শে ঘোর বিশ্বাসী। অপরপক্ষে, সোবিয়েত রাশিয়া সাম্যবাদের বা কমিউনিজমের (Communism) একনিষ্ঠ উপাসক। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, এই দুটি বিপরীতধর্মী দেশই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে অবলম্বন করে আজ উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে। **সুইজারল্যান্ড** ছোট দেশ হলেও এখানকার অধিবাসীরা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বদলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের (Direct Democracy) দ্বারা নিজেদের সুদৃঢ় নাগরিক চেতনা, কঠোর পরিশ্রম, সুগভীর দেশপ্রেম এবং মহান্ ত্যাগের আদর্শে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারী ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে সফল করে তুলেছে। অতএব দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি অত্যন্ত সহজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে। সুইজারল্যান্ডে ফরাসী, ইতালীয় ও জার্মান্ তিনপ্রকার প্রজাতির সাংস্কৃতিক সমন্বয় সম্ভব হতে পেরেছে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার দ্বারা। সোবিয়েত রাশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ভাষা, বর্ণ, ধর্ম প্রভৃতির পার্থক্যে বিভিন্ন অগণিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থকে জাতীয় ঐক্যের মধ্যে সম্মিলিত হতে সহায়তা করেছে।

সোবিয়েত রাশিয়া, সুইজারল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নজির

॥ আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্র প্রবণতা ॥

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশগুলির শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা করে

হুয়্যার (Wheare) বলেছেন যে আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারগুলির মধ্যে কেন্দ্রাভিমুখিতার ঝোঁক দেখা যায়। যুদ্ধ প্রভৃতি গুরুতর জাতীয় সমস্যা থেকে দেশকে রক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিকে কেন্দ্রীয় আদেশ কার্যকর করে অঙ্গরাজ্যগুলি থেকে সৈন্যসংগ্রহের অধিকার দেওয়া হয়েছে। বেকারত্ব প্রভৃতি গুরুতর অর্থনৈতিক সঙ্কট দূরীকরণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি সকলেই কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের অধীন। আজকাল বহু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারই পরিবহণব্যবস্থা সম্প্রসারণ করার ফলে এই ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কর্তৃত্বে রাখা হয়। গ্যাস, বিদ্যুৎ সরবরাহ, রেলচলাচল প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসৃত হয়। মার্কিন, যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে নানারূপ জনহিতকর কর্মসূচী রূপায়ণে সচেষ্ট। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশগুলি **জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের** (Welfare State) **ভূমিকা** গ্রহণ করার ফলে এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের **কর্তৃত্ব** সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র **পাঁচসালা পরিকল্পনা** (Five Year Plan) কার্যকর করে তোলার জন্য বিশেষ আগ্রহী। এই উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক ও সমাজকল্যাণের পরিকল্পনাগুলি চালু করার জন্য ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাজ্যগুলিকে নানাভাবে নির্দেশ ও উপদেশ দিয়ে তাদের ওপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে বহাল রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট।

হুয়্যার বলেন—আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রগুলির কেন্দ্রপ্রবণতার কারণ : (১) জনকল্যাণকর রাষ্ট্ররূপে তার কার্যসূচীর বিস্তার ; (২) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার তাগিদ ; (৩) গ্যাস, বিদ্যুৎ প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য সরবরাহের চাপ ;(৪) সামরিক প্রয়োজন

॥ বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ॥

ল্যাস্কি প্রভৃতি বহুত্ববাদী (Pluralist) রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, অস্টিনের সার্বভৌমত্ব নীতি রাষ্ট্রকে পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারের ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা করে রাখে। ফলে, সার্বভৌম রাষ্ট্রের ইচ্ছায় যে-কোনও সময়ে আন্তঃ-রাষ্ট্র সংঘর্ষ লেগে যেতে পারে। কাজেই বিশ্বশান্তি চিরস্থায়ী করার পথে প্রধান বাধা হল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব। সেজন্য বহুত্ববাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, বিশ্বশান্তি স্থাপনের একমাত্র উপায় আন্তর্জাতিকতার আদর্শকে চরম সত্য বলে মেনে নেওয়া এবং সার্বভৌম, জাতীয় রাষ্ট্রগুলি বিলুপ্ত করে দিয়ে একটি বিশ্বযুক্তরাষ্ট্র (World Federation) গড়ে তোলা। কেবল যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি গ্রহণ করলেই জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে ন্যায্য ক্ষেত্রে মেনে নিয়ে একটি অখণ্ড আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসংস্থা গড়ে তোলা যায়। বিশ্বযুক্তরাষ্ট্র গঠন করলে বিভিন্ন জাতির আত্মগরিমা ও আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে যুদ্ধবিরোধী, শান্তিকামী প্রকৃত আন্তর্জাতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়। ফলে, সমস্বার্থমূলক আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির পরিচালনার ভার থাকবে বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রের সরকারের হাতে, অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণের ভার থাকবে জাতীয় সরকারগুলির হাতে। ১৯১৯ সালে লীগের বা জাতিসংঘের স্থাপনার সময় থেকে বর্তমান

ল্যাস্কির ন্যায় বহুত্ববাদীগণের মতে, বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রই বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য একান্ত কাম্য

যুগ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ ক্রমশঃ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে। আজকের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (U. N.) উত্তরাধিকার-সূত্রে ভবিষ্যতে একটি বিশ্বযুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠে পৃথিবীকে মহাসমরের অভিশাপ থেকে চিরমুক্ত করে রাখতে পারবে—এ বিশ্বাসকে আজ আর কেউ কল্পনাবিলাস বলেন না। বিশ্বযুক্তরাষ্ট্র আগামী দুনিয়ার ভাগ্যগগনে ধ্রুবতারারূপে নিশ্চয়ই আবির্ভূত হবে আশা করাটা খুব অন্যায় নয়।

॥ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ ॥

ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার প্রাক্কালে গণপরিষদের (Constituent Assembly) সদস্যগণ ভারতকে যুক্তরাষ্ট্ররূপে, না এককেন্দ্রিক রাষ্ট্ররূপে, কিভাবে গড়ে তোলা যায়, সে সম্পর্কে একটি গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন হন। বহু তর্ক-বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রী ভারতের শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। ভারতীয় সংবিধানের প্রথম ধারায় ভারতকে একটি "অঙ্গরাজ্য সমবায়" রূপে ("Union of States") উল্লেখ করা হয়েছে। গণপরিষদে বিতর্কের সময় ভারতীয় শাসনতন্ত্রের অন্যতম স্রষ্টা ডক্টর আম্বেদকার বলেন যে, ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ব্রিটিশ নর্থ আমেরিকা অ্যাক্টে (British North America Act, 1867) কানাডাকে ডোমি-নিয়ন শাসনব্যবস্থায় উন্নীত করার সময় এই বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়। এই বাক্যাংশ দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের কোনও অসুবিধা দেখা দেয় নি, শুধু এইটুকু বোঝান হয়েছে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সময় কোন অঙ্গরাজ্য কোনও চুক্তিতে আবদ্ধ হয় নি। ফলে, কোন চুক্তিভঙ্গের অজুহাতে কোনও অঙ্গরাজ্যই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোনদিন বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের বিচ্ছিন্নতাবাদী গৃহযুদ্ধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি বজায় রইল। মনে হয়, কানাডীয় সংবিধান রচনার সময় সেখানকার সংবিধান-রচয়িতাগণ মার্কিন অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁদের বুদ্ধিকে উজ্জ্বল করে তোলেন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ: ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র একটি অঙ্গরাজ্য-সমবায়

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারত শাসন আইন (Government of India Act, 1935) অনুযায়ী ভারতে একটি **যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের পরিকল্পনা** ইংরেজ সরকার সর্ব-প্রথম গ্রহণ করে। কিন্তু তখন ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলি একই স্বাধীন কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্গত ছিল না। তখন ভারতে ছোটবড় অনেক দেশীয় রাজ্য (Native States) ছিল। তৎকালীন পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ইংরেজ সরকারকে ভারতে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলির সঙ্গে একদফা এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে আর এক দফা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হত। কিন্তু নানা কারণে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভিত্তিতে ইংরেজ সরকারের পরিকল্পিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। প্রজাতন্ত্রী ভারতের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল দেশীয় রাজন্যবর্গের বিরোধিতা। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতে ইংরেজ সরকার কর্তৃক শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেশীয়

রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে রাজন্যবর্গ ঘোষণা করেন যে, তাঁরা স্বাধীন ভারতের সঙ্গে অধীনস্থ অঙ্গরাজ্যরূপে অবস্থান করতে বাধ্য নন। কারণ, তাঁদের মতে, ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ভারতের প্রদেশগুলির ক্ষমতা-হস্তান্তরের চুক্তি ঘোষিত হলেও দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ইংরেজ সরকারের পূর্বেকার চুক্তি অনুযায়ী পূর্ববর্তী অবস্থাই (Status quo ante) স্থায়ী হবার কথা। অর্থাৎ ইংরেজ সরকার ভারত ছেড়ে গেলেও দেশীয় রাজ্যগুলি আগের মতই চরম ক্ষমতার (Paramountcy) অধিকারী। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের যোগ্য সেনাপতি এবং প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন কূটনৈতিক **সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অক্লান্ত চেষ্টায়** এবং দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে অনেক কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত ভারতের সমস্ত দেশীয় রাজ্যই কোন না কোন প্রদেশের সঙ্গে মিলিত হল। ফলে পরবর্তীকালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যরূপে তারা ভারতীয় শাসনতন্ত্রের কর্তৃত্বাধীন হল।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আইনের প্রভাব ; সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কূটনীতির প্রভাব

ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের মত **সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যই এই শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত** হয়েছে। যথা, প্রথমতঃ, ভারতের **শাসনতন্ত্র লিখিত।** যদিও এই শাসনতন্ত্র নমনীয়তা এবং অনমনীয়তার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করেছে, তবুও এই শাসনতন্ত্রে **অনমনীয়তার দিকেই ঝোঁক বেশী।** সংবিধানের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলির পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শাসনতন্ত্রের এই অনমনীয়তা বা দুষ্পরিবর্তনীয়তা বা কঠোরতা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য : (১) লিখিত সংবিধানে অনমনীয়তার দিকেই ঝোঁক

দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে **ক্ষমতা-বণ্টনের** জন্য **তিনটি তালিকা** উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম তালিকাটি কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List), দ্বিতীয়টি আঞ্চলিক তালিকা (State List) এবং তৃতীয়টি যুগ্ম তালিকা (Concurrent List) নামে পরিচিত। প্রথম তালিকায় কেন্দ্রীয় সরকার যে বিষয়গুলি সম্পর্কে আইনপ্রণয়ন করতে পারে, তা উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, আয়-ব্যয় প্রভৃতি যে বিষয়গুলির সঙ্গে সমগ্র জাতির স্বার্থ সমধিক জড়িত, সেগুলি এবং মুদ্রানীতির মত যে সমস্ত বিষয়ে ভারতের সর্বত্র এক ধরনের আইন-কানুন প্রচলিত থাকা উচিত, সেগুলি কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্গত। আঞ্চলিক তালিকায় স্থান পেয়েছে শুধু আইনপ্রণয়নের সেই বিষয়গুলি যেগুলির ভার দেওয়া যায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের হাতে। যেমন—আঞ্চলিক রাজস্ব, সমবায়, আরক্ষা বা পুলিশ, আমোদ-প্রমোদের ওপর করস্থাপন, ভূমিরাজস্ব। যুগ্ম তালিকাটিতে আইনপ্রণয়নের এমন কতকগুলি বিষয় স্থান পেয়েছে যেগুলির ওপর কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক উভয় প্রকার

(২) কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন : ৩টি তালিকা - কেন্দ্রীয়, যুগ্ম, আঞ্চলিক

সরকারই আইনপ্রণয়ন করতে পারে। যেমন—শ্রমকল্যাণ, বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি।

তৃতীয়তঃ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি **সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত** (Supreme Court) স্থাপন করা হয়েছে। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই প্রাধান্য রক্ষা করার প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের ওপর। অর্থাৎ শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারাগুলির ব্যাখ্যা নিয়ে কোনও শাসনতান্ত্রিক গোলযোগ উপস্থিত হলে বা শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতার বা আইনপ্রণয়ন করার ক্ষমতার প্রকৃতি বা সীমানা নিয়ে কোনও বিরোধ উপস্থিত হলে অথবা শাসনতন্ত্রে সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি (Fundamental Rights) ক্ষুণ্ণ হলে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের সিদ্ধান্তই চরমভাবে গ্রাহ্য।

(৩) সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের অবস্থিতি ঃ কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা

ভারতের সংবিধানে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে হলে সেগুলির আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। (ক) প্রাথমিক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতা ও আইনপ্রণয়নক্ষমতা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করে যে তিনটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে কেন্দ্রীয় তালিকায় ৯৭টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্তর্গত যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকায় মাত্র ৫৯টি বিষয়ের উল্লেখ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তালিকায় ৬৮টি বিষয়ের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন সংবিধান সংশোধনী বিধি গৃহীত হবার পর বর্তমানে ভারতের সংবিধানের কেন্দ্রীয় তালিকায় আছে ৯৭টি বিষয়, যুগ্ম তালিকায় আছে ৪৭টি এবং রাজ্য তালিকায় আছে ৬৬টি বিষয়। (খ) ভারতীয় শাসনতন্ত্রে যুগ্ম তালিকায় যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির ওপরেও কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলে আইনপ্রণয়ন করতে পারে। লক্ষণীয় যে, ভারতীয় শাসনতন্ত্রের অন্তর্গত যুগ্ম তালিকায় ৪৭টি বিষয় স্থান পেয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রাভিমুখী কানাডার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের অন্তর্গত যুগ্ম তালিকাতে মাত্র ২টি বিষয় স্থান পেয়েছে। সুতরাং যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ের ওপরেও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বের কথা মনে করলে বোঝা যায় যে, যুগ্মতালিকার মধ্যেও ভারতে আঞ্চলিক সরকারের ওপর **কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বের ছাপ সুস্পষ্ট।**

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতার লক্ষণ ঃ (১) কেন্দ্রীয় তালিকা ও যুগ্ম তালিকার বিস্তৃতি ; (২) যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে পরস্পরবিরোধী হলে কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ হওয়া ; (৩) কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বৃত্ত ক্ষমতার অধিকারী , (৪) আঞ্চলিক তালিকাভুক্ত বিষয়েও কেন্দ্রের আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা ; (৫) জরুরী অবস্থার কেন্দ্রের বিশেষ ক্ষমতালাভ

(গ) ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ২৫১ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি যুগ্মতালিকাভুক্ত

কোনও বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক আইন পরস্পরবিরোধী হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইন চূড়ান্তভাবে গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির ওপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব সুস্পষ্ট।

(ঘ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে **কেন্দ্রীয় সরকারকে** তিনটি তালিকার বাইরে কোনও বিষয়ের ওপরও আইনপ্রণয়ন করার **উদ্বৃত্ত ক্ষমতা** (residuary powers) দেওয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে এই ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলি ভোগ করে থাকে। কানাডীয় যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মত কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত।

(ঙ) ভারতীয় সংবিধানের ২৪৯ ধারা অনুযায়ী রাজ্যসভা (Council of States) অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষ যদি মোট সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের উপস্থিতিতে এবং ভোটের জোরে কোনও প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, আঞ্চলিক তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ের ওপর জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্রীয় আইনসভার কোনও আইন রচনা করা প্রয়োজনীয়, তা হলে এক বছর পর্যন্ত এবং রাজ্যসভার অনুমোদনে আরও এক বছর পর্যন্ত সেই বিষয়টি আঞ্চলিক তালিকা থেকে বহির্ভূত বলে এবং কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। ফলে, ইচ্ছা করলে এই বিষয়টির ওপর যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার আইনপ্রণয়ন করতে পারে।

(চ) ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৩৫২, ৩৫৬ এবং ৩৬০ এই তিনটি ধারায় রাষ্ট্রপতিকে তিনটি ক্ষেত্রে **জরুরী অবস্থা** (Emergency) ঘোষণা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যদি ভারতের কোনও অঞ্চল আক্রান্ত হয়, কিম্বা ভারতের অভ্যন্তরে কোনও গোলযোগ উপস্থিত হয়, অথবা যদি ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিংবা যদি কোনও রাজ্যপালের বিবৃতি অনুযায়ী জানা যায় যে, সেই অঙ্গরাজ্যের শাসনকার্য সাংবিধানিক নিয়মকানুন অনুযায়ী পরিচালনা করা সম্ভব নয়, তা হলে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে সমগ্র দেশে বা দেশের কোনও বিশেষ অংশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। এই অবস্থায় ভারতীয় সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে দেশে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করার অধিকার দিয়েছে। এরকম জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রয়োজন মনে করলে আঞ্চলিক আইনসভার কোনও ক্ষমতা নিজে প্রয়োগ করে সেই অঙ্গরাজ্যে প্রযোজ্য আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং ভারতের যে-কোনও অংশে জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় প্রশাসনও আইন জারী করতে পারে।

এ তো গেল **আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে** ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগের কতকগুলি সম্ভাব্য ক্ষেত্র। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে **প্রশাসনিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও** (Administrative Relations) **কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের** চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যায়।

(কক) ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ২৫৬ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক ভারতীয় অঙ্গরাজ্যই কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনকানুন মেনে চলতে বাধ্য। সংবিধানের ২৫৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন অঙ্গরাজ্য কখনও কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনপ্রকার অসুবিধায় ফেলতে পারবে না। (কখ) রেলপথ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যানবাহন, প্রতিরক্ষা প্রভৃতির ক্ষেত্রে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির ওপর কেন্দ্রের সর্বময় কর্তৃত্ব ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টরূপে ঘোষিত। সংবিধানের ২৫৮ ধারা অনুযায়ী অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে অঙ্গরাজ্যে কোনও নির্দিষ্ট কাজে নিয়োগ করতে হলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের সম্মতি আবশ্যক। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি এমনভাবে নানা বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল যে এ ধরনের ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ না করলে তাদের নিজেদেরই অস্তিত্ব (viability) বিপন্ন হতে বাধ্য। (কগ) অঙ্গরাজ্যের শাসনব্যবস্থার পুরোধা রাজ্যপাল (Governor) নিজেই রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত প্রশাসক। তিনি তাঁর কাজের জন্য সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতির মারফত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়ী থাকেন। নিজের অঙ্গরাজ্য সম্পর্কে তিনি নিয়মিতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিবৃতি দাখিল করেন ও এর যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করে থাকেন। রাজ্যপালের বিবৃতির ওপরই সেই অঙ্গরাজ্যে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসনপরিচালনা অসম্ভব বিবেচনা করলে সেই অঙ্গরাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে রাষ্ট্রপতি সেখানকার শাসনভার সাময়িকভাবে নিজের, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের, কর্তৃত্বাধীন করবেন কিনা, তা পুরোপুরি নির্ভর করে। অনুরূপভাবে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টগুলির বিচারপতি নিয়োগের মাধ্যমেও বিচারব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্ব আছে। মরিস্ জোন্স্ (Morris Jones) মন্তব্য করেছেন যে, এইভাবে ভারতীয় বিচারব্যবস্থার ওপর কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে। (কঘ) কেন্দ্রীয় সরকার আয়কর, কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক প্রভৃতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কোষাগারের জন্য অর্থসংগ্রহ করে থাকে। এইভাবে সংগৃহীত রাজস্ব বণ্টনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সংবিধানের ২৮০ ধারা অনুযায়ী যে উপদেষ্টা সমিতি নিয়োগ করেন, তার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই এই রাজস্বের কিছু অংশ অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হয় এবং অঙ্গরাজ্যগুলি এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে বণ্টনব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য। (কঙ) ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতির হাতে সমস্ত অঙ্গরাজ্যগুলির ওপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব আরোপ করার জন্য প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। জরুরী অবস্থা ছাড়াও অন্য সময়ে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয়

প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রের ক্ষমতা বেশী। উদাহরণ—(১) কেন্দ্রীয় আইনের বাধ্যতা; (২) রেলপথ প্রভৃতির ওপর কেন্দ্রের কর্তৃত্ব; (৩) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যপাল, বিচারপতি ইত্যাদি নিয়োগের মারফত কেন্দ্রীয় প্রাধান্য; (৪) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা; (৫) কেন্দ্রীয় কৃত্যকের সব উচ্চরাজকর্মচারী রাষ্ট্রপতির অর্থাৎ কেন্দ্রের দ্বারা নিযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত; (৬) আন্তঃরাজ্য বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সালিশী ক্ষমতা

কৃত্যকের (Central Services) নানা প্রশাসনিক বিভাগে নানা প্রকার উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করে থাকেন। যেমন, আই. এ. এস. (Indian Administrative Service) প্রভৃতি কর্মক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিভূরূপে অঙ্গরাজ্যগুলিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থার শীর্ষে থাকেন। অবশ্য, অঙ্গরাজ্যগুলিরও নিজস্ব এলাকাভুক্ত প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যগুলিতে কাজ করে থাকেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্য সরকারের মধ্যে প্রশাসনিক সংযোগ স্থাপনের জন্য (Co-ordination between the Centre and the States) এবং ভারতের সর্বত্র কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় দেশের সর্বত্র প্রশাসনব্যবস্থা সুপরিচালনার উদ্দেশ্যে অঙ্গরাজ্যের কর্তৃত্বাধীন প্রশাসনিক কর্মীগণের শীর্ষে থাকেন কেন্দ্রীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ। এইভাবেই কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক আমলাতন্ত্রগুলির (Bureaucracy) মধ্যে জৈবিক যোগসূত্র রচিত হয়। (কচ) ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে যে, একাধিক অঙ্গরাজ্যের মধ্যে যদি নদ-নদীর জল-বিভাজন বা অন্য কোনও বিষয় নিয়ে কোনরকম বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতির সালিশী বা মধ্যস্থতায় সেই বিরোধের মীমাংসার ব্যবস্থা করা হবে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার এবং অঙ্গরাজ্য সরকারের মধ্যে কোনও বিবাদবিসম্বাদের নিষ্পত্তির ভার কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে এজন্য বিশেষ সালিশী বোর্ড (Ad-hoc Arbitration Board) গঠন করতে পারেন।

ভারতের প্রজাতন্ত্রী সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত এবং প্রশাসনিক বিষয়ে যে সম্পর্কের ব্যাখ্যা দেওয়া হল, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব সত্যিই অপ্রতিহত। অন্যান্য আরও অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের অবতারণা করা যায়, যার ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের চরম আধিক্য সূচিত হয়। যেমন, ধরা যাক—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং সুইজারল্যাণ্ডের দ্বৈত নাগরিকত্বের নীতি (Dual Citizenship)। অর্থাৎ, নাগরিক পৃথক্‌ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের এবং অঙ্গরাজ্যের নাগরিক। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ঐকিক। অর্থাৎ, ভারতীয় নাগরিকগণ সকলেই কেবলমাত্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এই ঐকিক নাগরিকত্বের প্রকৃত তাৎপর্য হল এই যে, এর ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব সুপ্রকাশিত।

উপসংহার : ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রপ্রবণ

অনেকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির উর্ধ্বে কেন্দ্রীয় সরকারের চরমাধিপত্যের নিদর্শনগুলি উল্লেখ করে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা আদৌ যুক্তরাষ্ট্রীয় কিনা সে সম্পর্কে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। কেউ কেউ ত' ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে আসলে এককেন্দ্রিক শাসনতন্ত্র বলে ব্যাখ্যা করেন।

॥ ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান কেন কেন্দ্রাভিমুখী ॥

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় প্রভাব চূড়ান্তভাবে বজায় রাখার জন্য গণপরিষদে সংবিধান-রচয়িতাগণ সময় সময় যে যুক্তিগুলি উত্থাপন করেছিলেন, অনেকের মতে, সেগুলি বাস্তবিকই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ ক্ষেত্রে অকাট্য। সেগুলি থেকেই বোঝা যায় যে, ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারকে সবচেয়ে শক্তিশালী করে তোলার প্রতি এত ঝোঁক কেন।

গণপরিষদ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্রপ্রবণ করতে চেয়েছিলেন

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত যখন দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হল, তখন সাম্প্রদায়িকতার তীব্র দাহে দেশ প্রজ্বলিত। ভারতের নতুন প্রজাতন্ত্রের জন্মমুহূর্তে অনেক ঝুঁকি, অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল ভারতীয়দের। জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি অসামাজিক প্রবণতার চাপে নবীন ভারতের জাতীয় জীবন তখন অত্যন্ত সঙ্কটময় হয়ে ওঠে। দেশবিভাগের ফলে জাতীয় সরকারকে সীমান্তের অপর প্রান্ত থেকে আগত সংখ্যাতীত উদ্বাস্তুদের নিদারুণ সমস্যা নিয়ে অত্যন্ত বিব্রত হতে হয়। জাতির জীবনের এই চরম দুর্দিনে প্রজাতন্ত্রী ভারতের নতুন সংবিধানের স্রষ্টাগণ তাঁদের প্রজ্ঞাদৃষ্টি দিয়ে আগামী দিনের ঘটনাবলী যেন প্রত্যক্ষ করে স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারকে সর্বশক্তিমান্ করে না তুললে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে চিরস্থায়ী করে রাখার উদ্দেশ্যে তাঁরা ভারতে এমন একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন যে, যে-কোনও অসামাজিক, জাতীয়তাবিরোধী ঝোঁকের সঙ্গে মোকাবিলা করার মত একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে তোলা যায়। ভারতীয় সংবিধান রচনার পেছনে এই চাঞ্চল্যকর ঐতিহাসিক পটভূমিকা স্মরণ করলে সহজেই বোঝা যায় যে, সংবিধান-রচয়িতাগণ শুধু যে জাতীয় সংগ্রামে সুদক্ষ সেনাপতির কাজ করেছিলেন, কিংবা নানাদিক দিয়ে দেশসেবকরূপে সফল হয়েছিলেন, তাই নয়; দেশের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রেও তাঁরা তাঁদের সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎদৃষ্টির প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের সুদীর্ঘ ৩৮ বছর পরেও ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংবিধানিক সমস্যা সম্পূর্ণভাবে মীমাংসিত হয় নি। এই সমস্ত যুক্তি দেখিয়ে ভারতের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। তাঁর মতে, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কথা আলাদা করে ভেবে দেখা দরকার। ভারতের মত বিশাল, বৈচিত্র্যবহুল দেশে তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাও অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা থেকে বেশ কিছু আলাদা, অসাধারণ হবে বই কি!

এর তাৎক্ষণিক কারণ: দেশবিভাগের পর সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, জাতিভেদ প্রভৃতি কঠোরভাবে দমনের তাগিদ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতার পক্ষে কতকগুলি যুক্তি কেবল ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে যুক্ত। যেমন—ঐতিহ্যগত কারণ। ইংরেজ শাসন ভারতীয়

ইতিহাসের কেন্দ্রপ্রবণতার ঝোঁককে পাকাপাকি করে তুলেছিল। স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস জাতীয় কংগ্রেস দলই পরিচালিত করে। তার নেতাগণও ভারতের ইতিহাসের ও ভারতের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এই ঐক্যবাহী ঐতিহ্যকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। ভারতে ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে জনতাদলের সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইন গৃহীত হত কিনা সন্দেহ। তাছাড়া, ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিরোধী দলগুলির উল্টোপাল্টা কথাবার্তা ও সমবেতভাবে কেন্দ্রে কংগ্রেস-বিরোধী কোন বিকল্প সরকার গঠনের নিদারুণ ব্যর্থতাই কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রচণ্ড শক্তিশালী করে তুলেছে এবং তুলছে। ভারতে একচেটিয়া অর্থব্যবস্থারূপে ধনতন্ত্রের রূপান্তরের জন্যই এই কেন্দ্রিকতা—এই মার্কসবাদী যুক্তি এখানে অতিসরলীকৃত (simplistic) বলে মনে হয়। কারণ, ভারতের ধনতন্ত্র এখনও এরকম পরিণত রূপ লাভ করে নি।

অতীত বা ঐতিহ্যগত কারণ ঃ ইংরেজযুগ পর্যন্ত ভারত সরকারের কেন্দ্রপ্রবণতার ঝোঁক ; বিরোধী দলগুলির কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে শোচনীয় ব্যর্থতার দরুণ কেন্দ্রে কংগ্রেস দলের নিরঙ্কুশ ক্ষমতালাভ ; ভারতে একচেটিয়া বুর্জোয়া কর্তৃত্বের প্রভাবের যুক্তি কেন পুরোপুরি খাটে না

তাছাড়া, হুয়্যার (Wheare) পৃথিবীর বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করে যে মূল্যবান সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা হল এই যে, আধুনিক সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারেই কেন্দ্রাভিমুখিতার ঝোঁক দেখা যায়। যুদ্ধ প্রভৃতি জরুরী অবস্থা থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য, শিল্পোন্নতি, পরিবহণব্যবস্থা সম্প্রসারণ প্রভৃতির জন্য, জনকল্যাণকর বিবিধ প্রকল্প রূপায়ণের জন্য, উপরন্তু নিয়মিত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পৃথিবীর সমস্ত আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকেই কেন্দ্রাভিমুখী হতে হয়েছে।

হুয়্যারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রগুলি কম বেশী কেন্দ্রপ্রবণ

বরং অনেকে বলেন—আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভাণ্ডারে ভারতের তরফ থেকে যে দামী অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়া হয়েছে, তা হল সহযোগিতামূলক বা সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা (Co-operative or Participatory Federalism)। মার্কিনী ও কানাডীয় ধ্রুপদী দ্বৈত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার (Classical Dualistic Federalism) বদলে এই সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে অতি-আধুনিক পরিণতি। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল কথা হল এখানে কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যের মধ্যে সম্পর্কটা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নয়। তাদের সম্পর্ক হল বন্ধুত্বের, আস্থার, মৈত্রীর সম্পর্ক, একই জাতির সামগ্রিক, সাধারণ স্বার্থের সার্থকতম সিদ্ধিলাভের জন্য সহানুভূতিমূলক প্রচেষ্টায় অংশীদারের সম্পর্ক। তাই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রের কোনও নির্দেশকে অঙ্গরাজ্যগুলি বাধ্যতামূলক আদেশরূপে দেখতে অভ্যস্ত নয়। আবার, কেন্দ্রীয় সরকারও ছোটবড়-নির্বিশেষে সব অঙ্গরাজ্যকেই যেন একই যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিতে চায়। তাই ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আধুনিক

ভারতে নয়া যুক্তরাষ্ট্রের নজির ঃ সহযোগিতামূলক বা সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং শাসনতন্ত্রবিদ্‌দের কাছে একটা নতুন পরীক্ষার প্রস্তুতি, একটা নতুন দৃষ্টিকোণের পর্যায়ক্রমিক উন্মোচন।

॥ সংসদীয় গণতন্ত্রঃ ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভা-পরিচালিত, দায়িত্বশীল সরকার ॥

ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিখ্যাত ইংরেজ শাসনতন্ত্রবিদ্‌ স্যার আইভর জেনিংস্‌ (Sir Ivor Jennings) সংসদীয় গণতন্ত্রের বা **ক্যাবিনেট ব্যবস্থার বৈশিষ্টাগুলি** খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। সংসদীয় বা ক্যাবিনেট প্রথাগত শাসনব্যবস্থা বলতে বোঝায় এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে আইনসভার বা সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাগণ মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেট্‌ (Cabinet) গঠন করেন। তাঁরা তাঁদের কার্যকলাপের জন্য সংসদের কাছে দায়ী থাকেন। এজন্য এই শাসনব্যবস্থাকে দায়িত্বশীল সরকার (Responsible Government) অথবা সংসদীয় গণতন্ত্র-(Parliamentary form of Democracy) বলে। **সংসদীয় গণতন্ত্রের এই** সাধারণ সংজ্ঞা দেবার পর জেনিংসের পথ অনুসরণ করে **মন্ত্রিসভা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি** এবার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাক।

জেনিংস্‌ এর মতে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ ঃ দায়িত্বশীলতা

প্রথমতঃ, মন্ত্রিসভার সকল সদস্যই আইনসভার সদস্য হবেন। এইভাবে আইনসভা এবং নির্বাহী বিভাগ—সরকারের তিনটি অংশের দুটির মধ্যে আত্মিক, জৈবিক সহ-যোগিতা লক্ষিত হয়। সাধারণ নির্বাচনে যে দল দ্বিকক্ষযুক্ত আইনভার নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, মন্ত্রিগণ তার সদস্য, অথবা আইনসভার উচ্চকক্ষে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য। কিংবা আইনসভার সদস্য না হলেও মন্ত্রী হবার অন্ততঃ ৬ মাসের মধ্যে তাঁদের কোনও উপনির্বাচনে আইনসভার নিম্নকক্ষের নির্বাচিত সদস্য হতে হয় বা সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে উচ্চকক্ষের সদস্য হতে হয়।

জেনিংস্‌ এর ব্যাখ্যার এর বৈশিষ্ট্য ঃ (১) মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য

দ্বিতীয়ত,ঃ মন্ত্রিসভা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিগণ হলেন আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। এর অর্থ হল এই যে, মন্ত্রিসভা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল প্রধানমন্ত্রীর (Prime Minister) নেতৃত্বে মন্ত্রিত্ব পরিচালনা করে, সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধীদলের ভূমিকা গ্রহণ করে। অবশ্য, কোনও কোনও সময়ে এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রমও ঘটতে দেখা যায়। গত দুটি মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয় এবং একদলীয় অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার বদলে ইংলণ্ডে বহুদলীয় জাতীয় মন্ত্রিসভা (National Coalition Cabinet বা War Cabinet) গঠিত হয়। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে সর্বপ্রথম দেখা গেল ভারতের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের আইনসভায় কোনও একটি নির্দিষ্ট দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে নি। তখন ঐ অঙ্গরাজ্যগুলিতে

(২) মন্ত্রিগণ আইন-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা

একাধিক রাজনৈতিক দলের সংগঠনে বহুদলীয় মন্ত্রিসভা (Coalition Cabinet) গঠিত হয়।

তৃতীয়তঃ, মন্ত্রিসভা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলী বা ক্যাবিনেট আইনসভার কাছে তাঁদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী থাকেন। যদি আইনসভার কোনও কক্ষে (সাধারণতঃ সম্পূর্ণ নির্বাচিত নিম্নকক্ষে) মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বা কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব (Vote of no-confidence) গৃহীত হয়, তা হলে সমষ্টিগতভাবে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। তাই আইনসভার কাছে মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্বই (Collective responsibility) হল সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অবশ্য, কোনও বিশেষ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সংসদ অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করলে মন্ত্রীদের সকলকে পদত্যাগ করতে হলেও প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করলে মন্ত্রিসভার পতনের পর সেই মন্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুরাতন মন্ত্রীদের নিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী যদি নিজে পদত্যাগ করেন, তার অর্থও হল সমগ্র মন্ত্রিসভার পতন। সেক্ষেত্রে অন্য দলের নেতাকে বা নেতাদের ডেকে বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান যেতে পারে, অথবা আইনসভার নিম্নকক্ষ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন আহ্বান করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার নিকট মন্ত্রিসভার দায়িত্বের কতকগুলি বিশেষ দিক আছে। মন্ত্রিগণ বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ (Budget) আইনসভার কাছে পেশ করার সময় আইনসভায় তাঁদের নিজ নিজ দপ্তরের কার্যাবলীর বিরূপ সমালোচনা হলে সেই সমালোচনার যথোচিত উত্তর দেবেন, নিজ দপ্তরের আয়-ব্যয় সম্পর্কে সংসদ-সদস্যদের ভালভাবে বোঝাবার চেষ্টা করবেন, আইনসভায় তাঁদের নিজ নিজ দপ্তর সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন উঠলে যথোচিত প্রশ্নোত্তর দানের মাধ্যমে আইনসভার সদস্যদের সন্তুষ্ট ও ওয়াকিবহাল রাখার চেষ্টা করবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যদি কোনও মন্ত্রিসভার দ্বারা উপস্থাপিত বাজেট সংসদ গ্রহণ না করেন, তার অর্থও হল মন্ত্রিসভার পতন। অনুরূপভাবে বাজেটের কোন একটি প্রস্তাবের একাংশও যদি সংসদ ছাঁটাই প্রস্তাবের (Cut Motion) দ্বারা ভোটাধিক্যে বাতিল করে দেন, তাহলেও মন্ত্রিসভার পতন সূচিত হয়।

(৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে ও মন্ত্রিগণ স্বতন্ত্রভাবে আইনসভার কাছে দায়ী ; বাজেট বিতর্কের জবাব, প্রশ্নোত্তর, বিবৃতিদান, ইত্যাদির মারফত এই দায়িত্ব বাস্তবায়িত

মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকারের সবচেয়ে খাঁটি নমুনা হিসাবে **ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার** উদাহরণ দেওয়া হয়। ইংলণ্ডে রাজা বা রাণী সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক শাসক। তিনি রাজত্ব করেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "শাসন" করেন না (The British Crown "reigns, but does not govern")। তাঁর নামে শাসনব্যবস্থার প্রকৃত পরিচালক হলেন প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা এবং আইনসভা।

ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত

মন্ত্রিসভা-চালিত অর্থাৎ **সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য** হল আইনসভার সার্বভৌমত্ব। বিখ্যাত ইংরেজ শাসনতন্ত্রবিদ্ হারমন্ ফাইনার (Hermon Finer)

এই প্রসঙ্গে একটি উক্তি উদ্ধৃত করেন। বলা হয় যে, ব্রিটিশ আইনসভা সব কিছুই করতে পারে, শুধু পুরুষকে নারী অথবা নারীকে পুরুষ করা ছাড়া। মন্ত্রিসভা আইনসভার একটা কমিটি। আধুনিক শাসনতন্ত্রবিদ্ স্ট্রং (Strong) এর মতে, মন্ত্রিগণের মধ্যে একই রাজনৈতিক চিন্তা, সংহতি এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আনুগত্য ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর ফলে সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসনবিভাগ ও আইনসভার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় থাকে।

হারমন্ ফাইনার ও স্ট্রং বলেন যে, ক্যাবিনেট্ শাসনব্যবস্থার মন্ত্রিসভা আইনসভার একটা কমিটি; তাই তাদের মধ্যে সুসম্পর্কের সম্ভাবনা

সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান গুণ হল এই যে, প্রথমতঃ, সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান নামমাত্র শাসক। ফলে, মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছাচারী হতে পারে। কিন্তু শক্তিশালী বিরোধী দল (Opposition) থাকলে এই আশঙ্কা দূর হয়। এখানে সরকারের শাসনবিভাগ এবং আইনসভা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়। বেজ্‌হট্ (Bagehot) ব্রিটিশ্ মন্ত্রিসভাকে আইনসভার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বর্ণনা করেছেন। ল্যাস্কি মনে করেন যে, এই সরকারে আইনসভা এবং শাসনবিভাগের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সহযোগিতার ভাব গড়ে ওঠে, উভয়ের মধ্যে জৈবিক ঐক্য ("organic unity") স্থাপিত হয়।

সংসদীয় গণতন্ত্রের গুণঃ (১) বেজ্‌হট্ বলেন, যে, এতে মন্ত্রিসভা ও আইনসভার মধ্যে জৈবিক ঐক্য গড়ে ওঠে

দ্বিতীয়তঃ, সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভার শীর্ষে থাকেন প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী। জেনিংস্ বলেছেন যে, সৌরমন্ডলে যেমন সূর্যের একাধিপত্য, মন্ত্রিসভা-চালিত ব্যবস্থায় তেমনি প্রধানমন্ত্রীর চরম নেতৃত্ব। তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে। সুতরাং সংসদীয় গণতন্ত্র জনমতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। উপরন্তু আইনসভায় জনমতের বিভিন্ন দিকগুলি বিরোধী ও অন্যান্য সভ্যদের তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে নিয়মিত প্রতিবিম্বিত হয়। এইভাবে সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে আইনসভার দৈনন্দিন ঘটনাবলী ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। মন্ত্রিসভার বৈদেশিক নীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে দেশ-বিদেশের জনগণ অবিলম্বে সঠিক ধারণা করতে সমর্থ হন।

(২) বিরোধী দল থাকার সংখ্যাগরিষ্ঠের মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না; প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে, জনমত সুগঠিত হয়

তৃতীয়তঃ, সংসদীয় গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকার্য চালিয়ে থাকেন। যদি মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্যগণের আস্থাভাজন না থাকেন, তাহলে বিরোধী দল সরকার গঠনের সুযোগ পান। অথবা আইনসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে, জনগণ কখনই তাঁদের ইচ্ছার বিপরীত কোনও শাসনতন্ত্র চালু থাকতে দেন না। অবাঞ্ছিত মন্ত্রীদের ও সেই দলের সভ্যদের পুনর্নির্বাচন হয় না। এজন্য চরম বিপরীত নীতি সমর্থন করেও সংসদীয় গণতন্ত্রে এক দলের পর আর একদল বিনা রক্তপাতে শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠতে পারে। এইভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রে

(৩) শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তন সম্ভব

বেশ শান্তিপূর্ণভাবে শাসনক্ষমতার হস্তান্তর সম্ভব হয়ে ওঠে, রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে জনগণ ধাবিত হবার প্রয়োজন বোধ করেন না।

চতুর্থতঃ, ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থা সব অবস্থায় নমনীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডে যথাক্রমে শ্রমিক (Labour) এবং রক্ষণশীল (Conservative) দল ক্যাবিনেট গঠন করে। কারণ, দুটি সাধারণ নির্বাচনের পর ঐ দুটি দল কমন্স্‌সভায় (House of Commons) অর্থাৎ ব্রিটিশ আইনসভার নিম্নকক্ষে পর পর সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। শ্রমিকদল সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। তাই তারা ইংলণ্ডে লোহ ও ইস্পাত শিল্প সরকারী কর্তৃত্বে আনে এবং এ ধরনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে জাতীয়করণের ব্যবস্থা পাকা করে। পরে রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় আসীন হয়ে এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, বিপরীতমুখী মতাদর্শ নিয়ে মন্ত্রিসভা দুবার গঠিত হলেও শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এই দলগত, ফলে নীতিগত বিপরীতমুখিতার সম্মুখীন হয়েও ইংলণ্ড কোনভাবে বিপর্যস্ত হয় নি। দুটি মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডে জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ও দেশ দেশকে বিপনমুক্ত করে।

(৪) শাসনব্যবস্থা সব অবস্থায় নমনীয়; দুটি বিশ্বযুদ্ধের সময়েই ইংলণ্ডে সর্বদলীয় জাতীয় মন্ত্রিসভা গড়ে ওঠে

পঞ্চমতঃ, মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের মন্ত্রিগণ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন থাকেন বা থাকতে বাধ্য হন। দেশের সাধারণ মানুষ কি চান, কোথায় সরকারী ব্যর্থতা, কি-ভাবে সে ব্যর্থতা দূর করা যায়, সে সম্পর্কে মন্ত্রিসভা সুস্পষ্ট ধারণা করতে সমর্থ হন। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভ মন্ত্রীদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় ভূমিকা থাকার ফলে। দলীয় ব্যবস্থা যত সুগঠিত হয়, সংসদীয় শাসনব্যবস্থাও তত উন্নত হয়ে ওঠে। এদিক থেকে বিচার করলে সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থার স্থায়িত্বলাভের সম্ভাবনা বেশী।

(৫) মন্ত্রিগণ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, তাই তাঁরা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে সজাগ থাকতে পারেন

ষষ্ঠতঃ, ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিগণকে সব সময় আইনসভার কাছে শাসন সম্পর্কে নানাভাবে জবাবদিহি করতে হয়। যদি দেশে বিরোধী দল সুগঠিত এবং সদুদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, তাহলে বিরোধী দলের সদস্যারা মন্ত্রিসভাকে কখনই দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠতে দেন না। বিরোধী দলের সত্যিকার জনদরদী ভূমিকা থাকলে মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থা আদর্শ শাসনব্যবস্থা হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ক্যাবিনেট প্রথার এই গুণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিরোধী দলের ভূমিকার ওপর এবং সরকার বিরোধী দলের সঙ্গে কি সম্পর্ক রাখেন বা রাখতে চান তার ওপর। ইংলণ্ডে প্রধানমন্ত্রীকে যেমন শাসনবিভাগের অপরিহার্য অংগ বলে মনে করা হয়, বিরোধী দলের নেতাকেও (Leader of the Opposition) সমানভাবে জাতীয় নেতা হিসাবে কল্পনা করা হয়। ইংলণ্ডে এই দুটি পদেরই নেতাদ্বয় সরকারী তহবিল থেকে বেতন পাওয়ার অধিকারী। ইংলণ্ডে বিরোধী দলের নেতার এই

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য এ যুগের প্রখ্যাত নাট্যকার এবং হাস্যরসিক বার্নার্ড শ' (Bernard Shaw) মন্তব্য করেছেন যে, ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধদলের নেতাকে কাছের মানুষরূপে তাঁর পত্নীর চেয়েও বেশী চিনে থাকেন ("The English Prime Minister knows the Leader of the Opposition better than he does his own wife.")। ইংলণ্ডে তাই আইনসভায় বিরোধী দলকে রাজা বা রাণীর অনুগত সরকারের বিরুদ্ধ পক্ষ বলে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়। একে বলা হয় রাজমুকুটের অনুগত সরকারের বিরুদ্ধ পক্ষ (Her Majesty's কিংবা His Majesty's Opposition)। এজন্য ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার জেনিংস্ বলেছেন যে, আইনসভায় **সুগঠিত বিরুদ্ধ দল থাকা সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ।**

(৬) বিরোধী দলের দাপটে সরকার সৎ, দক্ষ, তৎপর হতে বাধ্য; ইংলণ্ডের নজির; সেখানে বিরোধী নেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত ও সম্মানিত

সপ্তমতঃ, মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি দেশের নানা সমস্যা সম্পর্কে প্রকাশ্যে আলোচনার জন্য প্রায়ই সভা-সমিতি আহ্বান করে। সংবাদপত্রগুলি সরকারী নীতি, আইনসভার ঘটনাবলী ইত্যাদি সম্পর্কে খবরাখবর প্রকাশ করে, বেতার প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারী নীতি জনগণের মধ্যে প্রচারিত হয়। ফলে জনসাধারণ খুব সুন্দর এবং সহজভাবে রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করেন।

(৭) মন্ত্রিসভার কাজকর্ম প্রকাশ্য ও গণমাধ্যমগুলির দ্বারা প্রচারিত; ফলে জনমত গঠন ও জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষালাভ সহজ

অষ্টমতঃ, মন্ত্রিসভা আইনসভার কাছে ব্যক্তিগততাবে এবং সমষ্টিগতভাবে দায়ী থাকে বলে এই শাসনব্যবস্থাকে দায়িত্বশীল সরকার বলা হয়। ফলে· শাসকগোষ্ঠী কখনও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে না। যখনই মন্ত্রিসভার মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষিত হয়, তখনই আইনসভা সরকারকে নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করে। এই ঘটনার চরম পরিণতি হল নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান। পাছে মন্ত্রিসভাকে কখনও আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থা হারাতে হয় অথবা মন্ত্রীদের আবার নতুন ব্যয়বহুল নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে হয়, সেই ভয়ে মন্ত্রিসভা যা খুশী তা করতে পারে না।

(৮) নানা নিয়ন্ত্রণের ফলে সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না

কিন্তু **সংসদীয় শাসনব্যবস্থার** কিছু কিছু **দোষত্রুটিও** দেখা যায়। **প্রথমতঃ, এই** শাসনব্যবস্থা শাসনক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির (Theory of Separation of Powers) বিরোধী। এই শাসনব্যবস্থায় কার্যতঃ আইনসভা এবং শাসনবিভাগ এই দুটি বিভাগেরই ক্ষমতা মন্ত্রিসভা করায়ত্ত করে রাখে। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থার সর্বপ্রধান ত্রুটি হল এর কেন্দ্রাভিমুখিতা। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, এই শাসনব্যবস্থায় সরকার আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। কিন্তু বর্তমানে সংসদীয় গণতন্ত্র পৃথিবীর যতগুলি উন্নত দেশে অনুসৃত হয়, সর্বত্রই রাজনৈতিক দলব্যবস্থা অত্যন্ত সুগঠিত। দলীয় শৃঙ্খলা রাজনৈতিক দলগুলি এত কঠোরভাবে অনুসরণ করে চলে যে, আইনসভা মন্ত্রিসভাকে চালনা করার বদলে মন্ত্রিসভাই যেন আইনসভাকে চালনা করে থাকে। যদি কোনও সদস্য ব্যক্তিগতভাবে আইনসভায় তাঁর দলের বিরুদ্ধে অর্থাৎ

মন্ত্রিসভার নিরপেক্ষ সমালোচক হিসাবে কোনও বক্তব্য পেশ করেন, তাহলে তিনি অবশ্যাই তাঁর দল থেকে বিতাড়িত হন। যে কোনও সুচতুর সংসদ-সদস্য এ ভাবে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যবনিকা টানতে অনিচ্ছুক হবেন। তা ছাড়া আইনসভার নির্বাচন পদ্ধতি আজকাল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সেজন্য আইনসভার সরকারী দলের সদস্যগণ সব সময় প্রধানমন্ত্রীকে খুশী রেখে চলেন। কারণ, প্রধানমন্ত্রী বিরূপ হলে সংসদের অধিবেশনের পূর্ণ কার্যকাল শেষ হবার আগেই তিনি তাকে ভেঙ্গে দিয়ে পুনরায় নির্বাচন আহ্বান করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আইনসভার প্রাক্তন সদস্যদের সকলকেই নতুন নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে গেলে বিপুল খরচের সম্মুখীন হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, সংসদীয় গণতন্ত্র হল দেশে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত একনায়কতন্ত্রী সরকার। প্রধানমন্ত্রী আবার পরিচালিত হন চতুর আমলাবর্গের (Bureaucracy) দ্বারা। সেজন্য বলা হয়, যে ইংলণ্ড সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্মভূমি, সেই ইংলণ্ডেই ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থা আসলে ক্যাবিনেট স্বৈরাচারিতায় (Cabinet Dictatorship) পরিণত হয়েছে। ইংলণ্ডে সম্প্রতি মন্ত্রিসভার এই স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে জনমত সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। র‍্যামসে ম্যুয়ার (Ramsay Muir) এই প্রবণতার কড়া সমালোচনা করেন। লর্ড হিউয়ার্ট (Lord Hewart) একে "নব্য স্বেচ্ছাচার" (New Despotism) বলে নিন্দা করেছেন। তিনি মন্ত্রিসভার তুলনায় আইনসভার ক্ষমতার হ্রাসপ্রাপ্তির আর একটি কারণ দেখিয়েছেন। আইনসভায় সাধারণতঃ বিভিন্ন আইনের মূল নীতি রচিত হয়। তারপর এই নীতিগুলি কার্যকর করে তোলার জন্য এবং খুঁটিনাটি বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য ভার দেওয়া হয় আমলাদের ওপর এবং শাসনবিভাগীয় আদালতগুলির (Administrative Tribunal) ওপর। এর ফলে শাসনবিভাগ দেশের শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তগুলি স্থির করে, শাসনবিভাগীয় আদালতগুলি তার প্রয়োগ সম্পর্কে সহানুভূতিসুলভ রায় দিয়ে থাকে। এই ব্যবস্থাগুলিকে আইনসভা কর্তৃক শাসনবিভাগকে ক্ষমতা-সমর্পণ (Delegated Legislation) এবং শাসনবিভাগীয় বিচারব্যবস্থা বা দ্রোয়া আদ্‌মিনিস্ত্রাতিফ্‌ (Administrative Adjudication অথবা Droit Administratif) বলা হয়। এর ফলে মন্ত্রিসভা আইনসভার এবং বিচারবিভাগের অনেক ক্ষমতা আত্মসাৎ করেছে। এজন্য বলা হয় যে, ক্যাবিনেট-ব্যবস্থা ক্ষমতা বিভাজন নীতির (Separation of Powers) পরিপন্থী।

সংসদীয় ব্যবস্থার ত্রুটি ঃ (১) মন্ত্রিসভার মারফত ক্ষমতার কেন্দ্রাভিমুখিতা ; তার কারণ— প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, তিনি আইনসভা ভেঙ্গে পুনর্নির্বাচন করলে ব্যয়বহুল ও অনিশ্চিত নির্বাচনের সম্মুখীন হতে সংসদীয় বিধায়কগণের অনিচ্ছা ; আমলাদের প্রাধান্য ; ফলে মন্ত্রিসভার স্বৈরাচার, লর্ড হিউয়ার্টের ভাষায় "নব্য স্বেচ্ছাচার"

দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিগণ সাধারণতঃ সখের রাজনীতি করে থাকেন। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলেও তাঁদের শাসনবিভাগীয় দক্ষতা না থাকতেও পারে। খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কোন মন্ত্রী দৈনন্দিন শাসনব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে সুদক্ষ শাসকের মত আয়ত্ত করতে পারেন। এ অবস্থায় তাঁরা পেশাদার আমলাদের ওপর ক্রমশঃ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। আইন-

(২) আমলাতন্ত্রের প্রাধান্যের কারণ

বিষয়ক ক্ষমতা প্রত্যার্পিত হবার ফলেও আমলাগণ মন্ত্রীদের নামে শাসনকার্য চালিয়ে থাকেন। এইভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার কর্তৃত্ব নামমাত্র হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রকৃতপক্ষে আমলাতন্ত্রই ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে।

(৩) রজনী পাম্ দত্ত প্রভৃতি মার্ক্সবাদীদের ব্যাখ্যায় সংসদীয় গণতন্ত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্তৃত্বে থাকে ও তাদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করে

তৃতীয়তঃ, রজনী পাম্ দত্ত (Rajni Palme Dutt) প্রভৃতি মার্ক্সবাদীগণের ধারণা যে, ধনতান্ত্রিক দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রে বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতি জনমত সংগঠনের যে মাধ্যমগুলি থাকে, সেগুলি ধনিক বা বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্তৃত্বে থাকে। ফলে, এসব ক্ষেত্রে সুস্থ জনমত গঠিত হতে পারে না বলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকারের বদলে কায়েমী স্বার্থের দ্বারা চালিত বিকৃত গণতন্ত্রের সূচনা হয়।

চতুর্থতঃ, মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনতন্ত্রে দলীয় নীতি সম্পূর্ণভাবে জাতীয় নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে দেশে রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থা অনুযায়ী ক্যাবিনেট ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। পূর্বে ফরাসী প্রজাতন্ত্রে এত বেশী রাজনৈতিক দল ছিল যে ঘন ঘন মন্ত্রিসভার অদলবদল হত, আইনসভায় কোনও একটি নির্দিষ্ট দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেত না। ফলে তখন ফরাসী প্রজাতন্ত্রে নিয়মিতভাবে বহুদলীয় মন্ত্রিসভা (Coalition Cabinet) গঠিত হত। কিন্তু এই মন্ত্রিসভা কোন কোন সময়ে একমাসেরও বেশী স্থায়ী হত না। অতএব সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা যদি সুগঠিত না থাকে, তাহলে সেখানে তার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা খুব সন্দেহজনক। জাতীয় স্বার্থের বদলে দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ হলে জনগণও দুর্নীতিগ্রস্ত, দলবাজ মন্ত্রীদের ওপর ধিক্কার দিতে থাকবেন।

(৪) এই সরকারে রাজনৈতিক দলাদলির ঝোঁক বেশী থাকে

পঞ্চমতঃ, "অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট" এই প্রবাদটি ক্যাবিনেট ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রযোজ্য হয়ে ওঠে। মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রধানমন্ত্রীকে শাসন চালাতে হয়। তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা ইত্যাদিতে অনর্থক সময় ব্যয় হয়। তাই সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভাকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গেলে খুব দেরী হয়। এজন্য অনেকে এমনও মনে করেন যে, সংসদীয় গণতন্ত্র জরুরী অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করার পক্ষে অযোগ্য। মন্ত্রীদের মধ্যে ঐক্য না থাকলে হয়ত সমগ্র মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং বার বার মন্ত্রিসভার পতন হলে শাসনব্যবস্থা পশ্চাদ্‌গামী হয়ে যায়। এজন্য বহুদলীয় মন্ত্রিসভা (Coalition Government) অস্থায়ী হবার সম্ভাবনা।

(৫) মন্ত্রিদের মধ্যে সংহতির অভাব থাকলে এ সরকারের ভবিষ্যৎ খারাপ ঃ বহুদলীয় কোয়ালিশান সরকারের অভিজ্ঞতা

ষষ্ঠতঃ, মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারে প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী এবং দলীয় নেতারা অত্যন্ত ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন। এ অবস্থায় মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। তাঁরা স্বেচ্ছাচারী, বিলাসী, অকর্মণ্য, অহঙ্কারী সমালোচনাকাতর এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠতে পারেন। ভারতে কেন্দ্রে ও অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের

(৬) মন্ত্রিগণ বিলাসী অহঙ্কারী, অকর্মণ্য ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, অথচ গদি ছাড়তে চান না

সংসদীয় গণতন্ত্র ধনিক বুর্জোয়া শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হয়ে ওঠে। কারচুপি বা রিগিং (Rigging), জাল ভোটদান, ভুয়া ভোট, প্রকৃত ভোটদাতাদের নাম বাদ যাওয়া—ইত্যাদি দুর্নীতির ব্যবস্থা থাকে।

নবমতঃ, দেশপ্রেম না থাকলে সংসদীয় গণতন্ত্রকে সফল করা চলে না। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল কথাই হল—রাজনৈতিক দলব্যবস্থা। কিন্তু মনে রাখা দরকার, দল কখনই বড় নয়, রাষ্ট্র বড়, দেশ বড়, জাতি বড়। সংসদীয় নেতাদের বিলাসবাহুল্য, উদ্ধত অহংবোধ, বেপরোয়া মনোভাব, ব্যাপক দলবাজি দেশকে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাই নয় ; এর ফলে জনগণ শেষ পর্যন্ত সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দলব্যবস্থা— সব কিছুর ওপর আস্থা হারাতে পারেন। "যে যায় লঙ্কায়, সেই রাবণ হয়ে যায়"—বিলাসী, অহঙ্কারী সংসদীয় নেতাদের সম্বন্ধে জনসাধারণের এই তিক্ত অভিব্যক্তি তাঁদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও বেদনার দ্যোতক। এ ধরনের জনমত, অনীহা, শেষ পর্যন্ত জনগণকে চরমভাবে নিষ্ক্রিয় করে তোলে। পেছনে শোনা যায় সামরিক বা স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্তদের (Fascists) পদধ্বনি। ব্যর্থ গণতন্ত্রের পদাঙ্ক ধরেই জার্মানীতে হিটলারের, ইতালিতে মুসোলিনির আবির্ভাব ঘটে।

(৯) দেশপ্রেম, ত্যাগ, ধৈর্য প্রভৃতি মূল্যবোধের আবশ্যকতা ঃ মন্ত্রী ও বিধায়কগণ যেন দলবাজ, অহঙ্কারী, বিলাসী না হয়ে পড়েন ; সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যর্থতা মানেই ফ্যাসিবাদের পদক্ষেপ

॥ রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থা ॥

রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থার (Presidential type of Government) প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সরকার এবং আইনসভা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। এই শাসনব্যবস্থা তাই ক্ষমতাবিভাজন নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য এই শাসনব্যবস্থা মন্ত্রিসভা-চালিত শাসন-ব্যবস্থার ঠিক বিপরীত।

রাষ্ট্রপতিচালিত সরকারের বৈশিষ্ট্য—(১) ক্ষমতা-বিভাজন নীতির প্রয়োগ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির (President) ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করলে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সরকারী শাসনব্যবস্থার শীর্ষে থাকেন। তিনি চার বছরের জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত কয়েকজন নির্বাচকের এক সভার দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তাঁর কার্যকালের মধ্যে তিনি কারুর কাছেই দায়ী থাকেন না। অবশ্য, তিনি যদি তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নিম্নকক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে সভার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের ভিত্তিতে অভিযোগ আনতে পারে এবং উচ্চকক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের ভিত্তিতে দোষী বিবেচিত হলে তাঁকে পদচ্যুত করা যায়। এই ব্যবস্থাটিকে রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি (Impeachment of the President) বলে। এই বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া তাঁকে তাঁর পদ থেকে বিচ্যুত করা যায় না।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির নজির ; তিনিই সর্বেসর্বা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ইচ্ছামত তাঁর শাসনকার্য চালিয়ে যেতে পারেন। সুতরাং তাঁর পদের স্থায়িত্ব সুবিদিত। রাষ্ট্রপতি তাঁর নিযুক্ত অধীনস্থ সচিবদের নিয়ে "ক্যাবিনেট" (Cabinet) গঠন করেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করে দিতে পারেন। এই সচিবগণ কেউই আইনসভার সদস্য নন। তাঁরা সকলেই সাধারণতঃ আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন না। তাঁদের দায়িত্ব শুধু একটিমাত্র পদে অধিষ্ঠিত তাঁদের নিয়োগকর্তার অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির কাছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির "ক্যাবিনেট" (Cabinet) আছে বটে, কিন্তু এই ক্যাবিনেট সংসদীয় গণতন্ত্রে সক্রিয় মুখ্য-মন্ত্রীর দ্বারা গঠিত "ক্যাবিনেট" নয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতির মনোনীত সদস্যদের কেউই আইনসভার সদস্য নন, আইনসভার কোনও দলের নির্বাচিত নেতা নন। এঁদের দায়িত্ব শুধু রাষ্ট্রপতির কাছে। রাষ্ট্রপতি অবশ্য জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন। সেই অর্থে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় তথাকথিত মন্ত্রিসভাও পরোক্ষে জনসাধারণের কাছে দায়ী থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আইনসভা ও শাসনবিভাগের মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও তাঁর "ক্যাবিনেট" ঃ এই "ক্যাবিনেটের" সভ্যগণ আইনসভার সভ্য নন, রাষ্ট্রপতির অধস্তন সচিবমাত্র

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থায় সাধারণতঃ ক্ষমতাবিভাজন নীতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ ও বিচারবিভাগ পরস্পরের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত। আইনসভা রাষ্ট্রপতিকে গুরুতর দোষে অভিযুক্ত না হলে ও অভিযোগ প্রমাণিত না হলে পদচ্যুত করতে পারে না। দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং সংবিধানের সার্বভৌমত্ব বলবৎ রাখার উদ্দেশ্যে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা স্বীকৃত, সম্মানিত ও সংরক্ষিত হয়।

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের বৈশিষ্ট্য ঃ (২) বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য

তৃতীয়তঃ,রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকারে শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে আইনসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে, রাষ্ট্রপতি সে দলের না-ও হতে পারেন। আবার, আইনসভার এক কক্ষে একটি দলের প্রাধান্য, অন্য কক্ষে হয়ত অন্য দলের প্রাধান্য।

(৩) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আইনসভার বিধায়কগণ রাষ্ট্রপতির দলের নাও হতে পারেন

রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকারের প্রথম উল্লেখযোগ্য **গুণ** হল এর দীর্ঘস্থায়িত্ব। মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে। সেখানে প্রত্যেকবার সাধারণ নির্বাচনে একই দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না-ও পেতে পারে, মন্ত্রিসভা না-ও গঠন করতে পারে। ঘন ঘন মন্ত্রি-সভা বদলের ফলে মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের অস্থায়ী ও অনিশ্চয়-তার ভাব সরকারী মহলকে অসুবিধার সম্মুখীন করে তোলে। রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় তা হয় না। কারণ, রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবার আগে সাধারণতঃ পদচ্যুত করতে পারে না।

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের গুণ ঃ (১) দীর্ঘস্থায়িত্ব

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতাবিভাজন নীতি অনুসৃত হয়। সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগ নিজের নিজের এলাকায় অপ্রতিহতভাবে শাসনক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার লাভ করে। শাসনতন্ত্র এইভাবে সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেয় বলে রাষ্ট্রপতি আইনসভা কিংবা বিচারসভার ওপর কোনও কর্তৃত্ব করতে পারেন না, বিচারালয় এবং আইনসভাও রাষ্ট্রের শাসন-বিভাগের পুরোধা রাষ্ট্রপতির ওপর কোন প্রকার আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয় না।

(২) ক্ষমতাবিভাজনের ফলে সরকারের কোন বিভাগ অপরের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারে না

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তাই যুদ্ধ প্রভৃতি জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে খুব দ্রুত এবং স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দেশকে সঙ্কটমুক্ত করতে পারে। ১৯৩১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট (Franklin Roosevelt) বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় চরম সঙ্কটের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্ব ইত্যাদি চরম বিপর্যয় দেখা দিলে দেশের জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং দেশকে রক্ষা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও তাঁর নেতৃত্ব প্রশংসনীয়। ঐ বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান (Truman) তৎকালীন পৃথিবীতে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক আর্থিক অনুদানের নীতি ঘোষণা করেন।

(৩) রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন ব্যক্তিকেন্দ্রিক; তাই জরুরী অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব: ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও ট্রুম্যানের নেতৃত্বের নজির

চতুর্থতঃ, যদি কোনও দেশে অসংখ্য রাজনৈতিক দল থাকে, তাহলে অনেক সময় আইনসভায় তাদের কারুরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় মন্ত্রিসভা গঠন অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় এই ধরনের বিপর্যয় কখনই ঘটতে পারে না। কেননা রাষ্ট্রপতির মন্ত্রিসভা আসলে তাঁর মনোনীত, তাঁরই কাছে দায়ী তাঁর উপদেষ্টা সচিবগোষ্ঠী। ফলে, রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত স্বাধীনভাবে, দলনিরপেক্ষভাবে তাঁর কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর নেতৃত্বে নীতিগ্রহণ ও তার রূপদান করা যায়, শাসকমণ্ডলীর প্রশাসনিক দক্ষতা-অর্জন সহজ হয়, দেশের সার্বিক উন্নতি ঘটে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ব্যবস্থাপক সভার কাছে শাসনকার্যের জন্য শাসকদের কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। ফলে, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারে শাসকগণ শাসনকার্যে মন দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি যদি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন, তাহলে সরকারও সবল ও স্থায়ী হয়। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু দিনের জন্য সরকারী নীতির ধারাবাহিকতা ও নিরবচ্ছিন্নতা বজায় থাকে। প্রয়োজন হলে সরকার কঠোর অথবা কোমল হতে পারেন।

(৪) রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে স্বাধীন, দলনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব

পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে সবচেয়ে সুবিধাজনক। কারণ, দেশের ঐক্য ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্য একই সঙ্গে বজায় রাখা একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানেই সম্ভব। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান সবচেয়ে বেশীকার্য-কর হতে পারে যদি সেখানে জাতীয় ঐক্য এবং আঞ্চলিক স্বাধিকারের (autonomy) মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, জনগণের আস্থাভাজন একজন রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থার শীর্ষে থাকেন। পূর্বে রাজতন্ত্রে রাজা যে ধরনের নেতৃত্ব দিতেন, আধুনিক গণতন্ত্রে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে রাষ্ট্রপতি সেই রকম নেতৃত্ব দানের জন্য স্বীকৃত এবং সম্মানিত। দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার তিনি মূর্ত প্রতীক। দেশের সঙ্কটকালে তিনিই ত্রাণকর্তা। দক্ষ রাষ্ট্রপতির প্রশাসনও দক্ষ হতে বাধ্য।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী

কিন্তু **রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের** মধ্যেও অনেক দোষত্রুটি খুঁজে পাওয়া যাবে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-প্রণালী পর্যালোচনা করলে এই দোষ-ত্রুটিগুলি সহজেই চোখে পড়বে।

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের দোষ

প্রথমতঃ, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসরণ করার ফলে রাষ্ট্রপতি, আইনসভা এবং বিচারসভার মধ্যে হয়ত সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতি বজায় নাও থাকতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন অনেক সময় দেখা গেছে যখন রাষ্ট্রপতি হয়ত রিপাবলিকান (Republican) দলের নেতা, কিন্তু আইনসভার কোনও বা উভয় কক্ষে হয়ত ডেমোক্র্যাটিক (Democratic) দলের প্রাধান্য। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতি ও মার্কিন কংগ্রেসের আইনসভার মধ্যে সংঘর্ষ ও মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য। তখন শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের কাজের মধ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সরকার অচল হয়েও যেতে পারে।

(১) ক্ষমতাবিভাজন নীতির অপব্যবহারের সম্ভাবনা—রাষ্ট্রপতি ও আইনসভার বিধায়কদের মধ্যে দলগত পরিস্থিতি বিপরীত হলে সম্ভাব্য অশান্তি

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্বের ওপর। কিন্তু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রপতির আমলে শাসনবিভাগ সরকারের অন্য দুই বিভাগের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে চেষ্টা করে। নিজের শাসনকালের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায় না। তা ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে দৈনন্দিন শাসনকার্যের জন্য কারুর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। তিনি বেতারভাষণ অথবা সাংবাদিক-সম্মেলনের মারফত স্বচ্ছন্দে সরাসরি দেশবাসীর কাছে বা বিদেশের জনগণের কাছে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে সক্ষম। এর ফলে রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হতে পারে। রাষ্ট্রপতি অপদার্থ হলেও নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী তাঁর কার্যকাল শেষ হবার আগে তাঁকে পদচ্যুত করা যায় না। জনগণকে পরবর্তী নির্বাচনকাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। সুতরাং রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্বের তারতম্যের ওপর এই প্রকার শাসনব্যবস্থা জরুরী অবস্থায় উপযোগী না অনুপযোগী, তা নির্ভর করে।

(২) ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় সরকারী নীতি মূলতঃ রাষ্ট্রপতির নির্দেশে আমলাতন্ত্রই রচনা করে থাকে। আইনসভার এতে কোনও হাত নেই। কিন্তু আইনসভায় রাষ্ট্রপতির বিরোধী দলের প্রাধান্য থাকলে তিনি তাঁর নীতি কার্যকর করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হবেন। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগের ওপর দোষারোপ করতে পারে। শাসনকার্যের দায়-দায়িত্ব নির্ণয় তখন খুব কঠিন হয়ে ওঠে। সুতরাং রাষ্ট্রপতি-চালিত ব্যবস্থায় দায়িত্ব নির্ণয় প্রায় অসাধ্য হতে পারে।

(৩) আইনসভার নিয়ন্ত্রণ না থাকায় প্রশাসনে একে অন্যের ওপর দোষ চাপায় ; ফলে দায়িত্ব-নির্ণয়ের অসুবিধা

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রপতি আইনসভার কাছে দায়ী নন। সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভাই দৈনন্দিন শাসনকার্যের জন্য কি ধরনের আইনকানুন থাকা প্রয়োজন বা শাসনকার্য কিভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন, সে সম্পর্কে অবহিত থাকে এবং শাসকমণ্ডলীকে সে বিষয়ে সচেতন ও দায়িত্বশীল করে তোলে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নিভৃতে এ সম্বন্ধে কি চিন্তা করে থাকেন, এ বিষয়ে তাঁর মতামত কি—তা আইনসভায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সঠিক জানতে পারেন না। ফলে, দেশ সুশাসিত হতে পারে না।

(৪) আইনসভার ভূমিকা গৌণ ; ফলে রাষ্ট্রপতির নীতি, মনোভাব জানা যায় না ; তাই সুশাসন বিঘ্নিত হয়

পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভার এক একটি উপসমিতি বা কমিটি আইনের খসড়া তৈরী করে ও তদনুসারে আইন তৈরী হয়। আইনপ্রণয়নের দায়িত্ব আইনসভায় কেন্দ্রীভূত থাকতে পারে না। আইনপ্রণয়নের সামগ্রিক দায়িত্ব কারুর ওপর থাকে না। ফলে, আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার চরম দায়িত্বহীন সরকারে পরিণত হয়, জাতীয় স্বার্থ বহু ক্ষেত্রে ব্যাহত হতে পারে।

(৫) আইনসভার উপসমিতিগুলি আইন প্রণয়ন করে ঃ তার ত্রুটি

॥ মন্ত্রিসভাচালিত বনাম রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ॥

সব সরকারই আপেক্ষিক। মন্ত্রিসভাচালিত সরকারের সঙ্গে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের তুলনামূলক আলোচনা করলে এদের পারস্পরিক সুবিধা-অসুবিধার কথা সম্বন্ধে ধারণা আরও সুস্পষ্ট হয়। লর্ড ব্রাইস্ বলেন যে, মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর দায়িত্বশীলতা ; অর্থাৎ, মন্ত্রিসভা সব দিক দিয়ে আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। আর ব্রাইসের মতে, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর স্থায়িত্ব। কারণ, রাষ্ট্রপতি একবার নির্বাচিত হলে তাঁর কার্যকালের নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রান্ত হবার পূর্বে তাঁকে পদচ্যুত করা যায় না। তা হলে বলা যায় যে, আইনসভা এবং শাসনবিভাগের সঙ্গে সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই এ দুটি শাসনব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্নতা কল্পনা করা হয়। ফলে, এ দুটি শাসনব্যবস্থার মধ্যে, পরস্পরবিপরীত সুবিধা-অসুবিধা লক্ষিত হয়।

মন্ত্রিসভাচালিত ও রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের তুলনা ঃ সব সরকারই আপেক্ষিক। ব্রাইসের মতে, ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থা বেশী দায়িত্বশীল ; রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার বেশী স্থিতিশীল

দায়িত্বশীলতার গুণে শাসনবিভাগ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত আইনসভার মাধ্যমে জনগণের কাছে দায়ী থাকে। ফলে, ক্যাবিনেট ব্যবস্থাটি, প্রকৃতপক্ষে, গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। আইনসভার তর্কবিতর্ক, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জনগণ সরকারী ঘটনাবলী সম্পর্কে, সরকারী নীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলব্যবস্থা দোষযুক্ত হলে ঘন ঘন মন্ত্রিসভা বদল হয়, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, সরকারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও লোকে সন্দিহান হয়ে ওঠে।

দায়িত্বশীলতার গুণ ও দলাদলির দোষ—দুই গুণাগুণ নিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র চিহ্নিত

অপরপক্ষে, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির স্থায়িত্ব সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত। ফলে, সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে, সরকারী নীতির মধ্যে একটা স্বাভাবিক গতি, ধারাবাহিকতা এবং নিরবচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিত্বপরায়ণ রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে দেশ উন্নত, সুশাসিত, প্রগতিশীল হয়ে উঠতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি "বাণী" (Message) পাঠিয়ে আইনসভার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন। কিন্তু গোলমাল বাধে আইনসভার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক নিয়ে। এই সম্পর্ক সুনিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়ে ওঠে, যদি আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং রাষ্ট্রপতি যে দলের সমর্থনে নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেই দল একই হয়। রাজনৈতিক ঘটনাচক্রে যদি এই একদলীয়তা না ঘটে, তাহলে আইনসভা এবং শাসনবিভাগের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ অনিবার্য। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার এভাবে চরম দায়িত্বহীন, স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে রূপান্তরিত হতে পারে।

স্থিতিশীলতার গুণ ও আইনসভার সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা-জনিত দোষ—দুই নিয়ে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার চিহ্নিত

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত পৃথিবীর দুটি বৃহৎ, উন্নত দেশে যথাক্রমে মন্ত্রিসভা-চালিত ও রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থা খুব সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর হয়ে এসেছে। এর কারণগুলি নিয়ে অনুসন্ধান করতে গেলে ঐ দুটি দেশের সুদীর্ঘকালের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার।

কতকগুলি বিশেষ কারণে ইংলণ্ডে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যথাক্রমে সংসদীয় গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার সফল হয়েছে

॥ ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভাচালিত শাসনব্যবস্থার সাফল্যের কারণ ॥

ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভাচালিত শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য কতকগুলি কারণ আছে।

প্রথমতঃ, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত হলেও এখানে দীর্ঘদিন ধরে অনেক গণতান্ত্রিক প্রথার জন্ম হয়েছে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেই প্রথাগুলি সম্মানিত এবং পালিত হয়ে এসেছে। যেমন ধরা যাক—মন্ত্রিসভার নেতা প্রধানমন্ত্রী আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হবেন, এটা প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজা পঞ্চম জর্জ সম্রাটের বিশেষ স্বাধীন বিচারক্ষমতা (Prerogative) প্রয়োগ করে স্থির করে দেন। আইনসভার নিম্নকক্ষ

ইংলণ্ডে সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের কারণঃ (১) সেখানে নানা প্রথা, রীতিনীতির মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য জন্ম নিয়েছে

সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত। তাই সূক্ষ্ম গণতান্ত্রিকতার দাবীতে আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই প্রধানমন্ত্রীর সম্মাননীয় পদে নিয়োগ করা উচিত। পরে পৃথিবীর অন্য বহু দেশে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের চাপে প্রধানমন্ত্রী অনেক সময় দেশের আইনসভার উচ্চকক্ষ থেকেও নির্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু ইংলন্ড্ এ ব্যাপারে তার গণতান্ত্রিক প্রথাটি কখনই ক্ষুণ্ণ হতে দেয় নি।

দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভাচালিত শাসনব্যবস্থা সফল হবার পিছনে রয়েছে সরকার দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে অকৃপণ সহযোগিতা এবং সৌহার্দ্য। প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলের নেতা দুজনেই প্রত্যেককে বন্ধুর মত দেখেন ; এঁদের কেউই অন্যজনকে শত্রু বলে ভাবেন না। দেশের জনসাধারণও প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর বিরোধী দলনেতাকে সমান সম্মানের চক্ষে দেখেন। দুজনেই সরকারী তহবিল থেকে তাঁদের সম্মানদক্ষিণা পেয়ে থাকেন, কারণ শাসনতন্ত্রে দুজনেরই পদ সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত ও সম্মানিত। সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে এই সহযোগিতার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে ইংলণ্ডের দেশবাসীর সকলের মধ্যেই এক অকৃত্রিম জাতীয়তাবোধ থেকে। এর ফলেই সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলি দলীয় নীতির উর্ধে জাতীয় নীতিকে তুলে ধরেন। দেশপ্রেম এবং পরমতসহিষ্ণুতা অত্যন্ত সুগভীর না হলে এ ধরনের জাতীয়তাবোধ ও সহনশীলতা গড়ে ওঠে না। তাই গত দুটি মহাযুদ্ধের সময়ে জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বহুদলীয় মন্ত্রিসভা ইংলণ্ডে খুব সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর হয়েছিল।

(২) সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতা

তৃতীয়তঃ, মন্ত্রিসভাচালিত সরকারকে প্রতিনিধিমূলক সরকারও (Representative government) বলা হয়ে থাকে। কারণ, আইনসভায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই এ ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা গঠন করে থাকেন, মন্ত্রিসভা তাঁদের কাছেই দায়ী থাকেন। কি ধরনের প্রতিনিধি সাধারণ নির্বাচনে আইনসভায় তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করবেন, সেটা ভোটদানের সময়ে জনগণ স্থির করে দেন। ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভাচালিত শাসনব্যবস্থার সাফল্য অনেকখানি সম্ভব হয়েছে ইংরেজ জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা ও দূরদর্শিতার জন্য।

(৩) জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা

॥ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিচালিত শাসনব্যবস্থার সাফল্যের কারণ ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থা সফল হবার পেছনে কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত হলেও সেখানে কতকগুলি প্রথাগত বিধান অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যেমন, মার্কিন দেশে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার প্রভাব। ২০০ বছর আগে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিপিবন্ধ ও গৃহীত হয়, তখন তাতে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার কোন উল্লেখই ছিল না। পরে শাসনতন্ত্র পরিচালনার সময় পরিচালকগণ ধীরে ধীরে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন। এই পরবর্তী রাজনৈতিক অনুভূতির ফলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা প্রথা হিসাবে স্বীকৃত এবং সম্মানিত হতে

থাকল। মার্কিন শাসনতন্ত্রে শাসনবিভাগ এবং আইনসভাকে পরস্পরের কর্তৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। কারণ, এই শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ ক্ষমতাবিভাজন নীতি অনুসরণ করে সরকারের তিনটি বিভাগকে নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন এবং স্বয়ংক্রিয় করে রেখেছেন। কিন্তু কোনও শাসনতন্ত্রই সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সচেতন, জৈবিক ঐক্যের বাঁধন এড়াতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রেও তাই। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, মার্কিন দেশের রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগের কর্ণধার হিসাবে রাষ্ট্রপতি আইনসভার কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে সেখানে জৈবিক ঐক্য না থাকায় হয়ত সংঘর্ষ উপস্থিত হতে পারে এবং সেখানে রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে সকলের অজ্ঞাতসারে একটা বোঝাপড়া, একটা পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং তার ফলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি সমস্ত দলনেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের সাফল্যের কারণ: (১) সংবিধান লিখিত হলেও সেখানে কিছু কিছু প্রথা গড়ে উঠেছে; ফলে ক্ষমতাবিভাজন নীতির কঠিন কাঠামোর বাইরে শাসনবিভাগ ও আইনসভার মধ্যে জৈবিক ঐক্য স্থাপিত হয়েছে

দ্বিতীয়তঃ, অনেকে মনে করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে তাঁর নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হবার আগেই পদচ্যুত করা যায় না বলে তিনি স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু এ যুক্তি যে কত ভ্রান্ত, তা প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের (Richard Nixon) ক্ষেত্রে প্রমাণিত। তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা হয় যে, তিনি ওয়াটারগেট (Watergate) নামক হোটেলে তাঁর বিরুদ্ধ দলের বিভিন্ন নেতাদের কথাবার্তা, গোপন আলোচনা আড়ি পেতে শোনার ব্যবস্থা করতেন এবং নানাভাবে তাঁদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতেন। তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী (Watergate scandal) নামে এক সময়ে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। নানা সূত্রে অভিযোগগুলি প্রমাণিত হবার ফলে তাঁর বিচারব্যবস্থার (Impeachment) আয়োজন হয় এবং অবশেষে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্ন উত্থাপন করলে বলতে হয় যে, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীও ক্ষেত্রবিশেষে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেন। আইনসভার কাছে তাঁর দায়িত্ব নামমাত্র। একথাও বলা যায় যে, মন্ত্রিসভা-চালিত দেশের প্রকৃত সর্বাধিনায়ক প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থার চরম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাষ্ট্রপতি— এঁরা দুজনেই শেষ পর্যন্ত তাঁদের কার্যকলাপের জন্য জনগণের কাছেই দায়ী থাকেন। তাই দেখা যায়, তাঁরা উভয়েই তাঁদের নীতির অনুকূলে প্রবল জনমতগঠনের উদ্দেশ্য সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন, কিংবা দূরদর্শনের সাহায্যে তাঁদের মতামত প্রচারের চেষ্টা করে থাকেন। তাছাড়া, প্রধানমন্ত্রীই হোন বা রাষ্ট্রপতিই হোন, ক্ষমতার অপব্যবহার করলে কেউই বিচারবিভাগের কর্তৃত্ব এড়াতে পারেন না। মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সনের ওপর যেমন

(২) মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সনের ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী নিয়ে বিচার ও পদচ্যুতি প্রমাণ করে যে, মার্কিন শাসনব্যবস্থার রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না

বিচারবিভাগ চাপ সৃষ্টি করেছিল, জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তানাকার (Tanaka) বিরুদ্ধেও দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগ এনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তাঁকে আদালতের সম্মুখে হাজির করা হয়েছিল।

॥ মন্ত্রিসভাপরিচালিত ও রাষ্ট্রপতিচালিত শাসনব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সম্ভব কি ? ॥

আধুনিক শাসনতন্ত্রবিদ্‌গণ কেউ কেউ বৃটিশ ছাঁচের মন্ত্রিসভাচালিত শাসনব্যবস্থার এবং মার্কিনী ঢঙের রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থার গুণগুলি নিয়ে কোনও সমন্বয় সাধন করা যায় কিনা তা ভেবে দেখেছেন। তাঁদের মতে, **সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থায় এই সমন্বয়** সার্থকভাবে রূপায়িত। সুইজারল্যাণ্ডে যৌথ শাসকমণ্ডলীর (Plural বা Collegiate Executive) সংগঠন বিচিত্র ধরনের। চার বছরের জন্য সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা তার সদস্যদের মধ্য থেকে ৭ জনকে বাছাই করে যৌথ শাসনপরিষদরূপে নিয়োগ করে। এই ৭ জন শাসক তাঁদের কার্যকালের মেয়াদ ফুরোবার পূর্বে পদচ্যুত হন না। তাঁরা নির্দিষ্ট কালের জন্য একটি স্থায়ী মন্ত্রিসভারূপে কাজ করে থাকেন। এই দিক থেকে বিচার করলে তাঁরা মার্কিনী ঢঙ-এর রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির সমতুল্য। আবার, তাঁরা সুইজারল্যাণ্ডের আইনসভায় তাঁদের নিজ নিজ দপ্তরের কার্যকলাপ সম্পর্কে বাৎসরিক ব্যয়বরাদ্দ আইনসভার কাছে দাখিল করেন, নিজ নিজ দপ্তর সম্বন্ধে আইনসভার সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। এক কথায় বলতে গেলে, এঁরা যেন ইংরাজী মন্ত্রিসভাচালিত শাসকমণ্ডলীর মত কাজকর্ম করে থাকেন এবং আইনসভার কাছে অনেক দিক দিয়ে দায়ী থাকেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব এবং মন্ত্রিসভাচালিত শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব এই দুইয়ের মিলনে সুইজারল্যাণ্ডের যৌথ শাসকমণ্ডলীর সংগঠন অভিনব, সন্দেহ নেই। এ দুই বিপরীতমুখী শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন গুণগুলি একত্রিতভাবে আদর্শ সরকার সংগঠনের কাজে দরকারমত ব্যবহার করা যায়।

মন্ত্রিসভাচালিত সরকার ও রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয়ের সম্ভাবনা : সুইজারল্যাণ্ডের নজির

কিন্তু **সুইজারল্যাণ্ডের যৌথ শাসকমণ্ডলীর সাফল্যের পেছনে** আবার এমন কতকগুলি **কারণ** রয়েছে যেগুলি অনেকাংশে আঞ্চলিক। সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকাকার র‍্যাপার্ডের (Rappard) মতে, সেখানকার যৌথ শাসকমণ্ডলী সফল হবার প্রধান কারণ হল দেশটির স্বল্প আয়তন এবং সীমিত জনসংখ্যা। দ্বিতীয়তঃ, দেশটিতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy) ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার ফলে সেখানে জনগণ দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, গণতান্ত্রিকতা প্রভৃতি সুমহান্ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ফলে, তাঁরা আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে এক ধরনের সংহতিসাধনের প্রচেষ্টাকে কার্যকর করে তুলতে

অত্যন্ত আগ্রহী। তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক কারণেও সুইজারল্যাণ্ডের অবস্থা অতুলনীয়। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সুইজারল্যাণ্ডের চির-নিরপেক্ষতা (Permanent Neutrality) পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই স্বীকার করে নিয়েছে। হিট্‌লার, মুসোলিনির মত শক্তিশালী একনায়ক নেতাগণও সুইজারল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করতে সাহসী হন নি। ফলে সুইজারল্যান্ড্‌কে কখনই যুদ্ধ প্রভৃতি জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় নি। তাই এখানকার জনগণ যৌথ শাসনব্যবস্থা, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রভৃতি অভিনব শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি বেশ নির্বিবাদে, স্বচ্ছন্দে বাইরের রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এড়িয়ে কার্যকর করে তোলার সুযোগ খুঁজে পেয়েছেন ও সে সুযোগের সদ্ব্যবহারও করেছেন।

র‍্যাপার্ড; সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা সফলর কারণ, (১) ছোট দেশ, অল্প জনসংখ্যা; (২) অধিবাসীদের দেশপ্রেম, জাতীয়তা, গণতান্ত্রিকতা (৩) আন্তর্জাতিক প্রভাব;

ভারতীয় শাসনব্যবস্থার স্বরূপ: এটি মন্ত্রিসভাশাসিত না রাষ্ট্রপতিচালিত শাসনব্যবস্থা? ॥

প্রজাতন্ত্রী ভারতের শাসনতন্ত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার শীর্ষে রাষ্ট্রপতিকে (President) রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি বিশেষ এক পরোক্ষ নির্বাচনপদ্ধতি অনুসারে ভারতের জনগণ দ্বারা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। এই পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু না হলে বা তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে বা কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রত্যেকটি কক্ষের সদস্য-সংখ্যার মোট দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিসাপেক্ষে ও তাঁদের ভোটে কোনও গুরুতর দোষে দোষী প্রমাণিত না হলে তাঁর পদচ্যুতি ঘটে না। সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে আনুষ্ঠানিক, শাসনবিষয়ক, আইনবিভাগীয় ও বিচারবিভাগীয় নানা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হলে তাঁকে জরুরী ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থা: রাষ্ট্রপতির নির্বাচন-পদ্ধতি ও ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি ভারতের সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ করেন। তাঁরই নামে ভারতসরকারের সমুদয় আদেশপত্র প্রকাশিত হয় এবং তিনিই ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ শাসক বলে দেশবিদেশে স্বীকৃত ও সম্মানিত।

রাষ্ট্রপতির শাসন-বিভাগীয় ক্ষমতা

ভারতীয় সংবিধানের ৫৩ ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্রে বর্ণিত তাঁর সমস্ত ক্ষমতাই তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োগ করবেন। কিন্তু সংবিধানের ৭৪ (১) ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকবেই ("There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the exercise of his functions")। লক্ষণীয় যে, সংবিধানের এই ধারাটিতে "There will be" এই বাক্যাংশটির বদলে "There shall be" এই ব্যাকাংশটি ব্যবহৃত হয়েছে।

মন্ত্রিসভার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক: রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক, তিনি স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না

"will be"-র বদলে "shall be" এই বাধ্যতাসূচক বাক্যাংশের ব্যবহার খুবই অর্থবহ। এর দ্বারা বোঝায় রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ব্যতীত কখনই কাজ করতে পারেন না। তিনি স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেন না।

ভারতীয় সংবিধানের ৭৫ ধারায় একদিকে বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছানুযায়ী পদচ্যুত করতে পারেন। আবার ঐ একই ধারায় বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমন্ডলী ভারতীয় আইনসভার নিম্নকক্ষের অর্থাৎ লোকসভার কাছে দায়ী থাকবেন। সংবিধানের একই ধারায় এরকম পরস্পরবিরোধী ব্যবস্থা উল্লিখিত হওয়ায় অনেকে ভারতের রাষ্ট্রপতির পদটির সঠিক সাংবিধানিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হন।

রাষ্ট্রপতির কাছে মন্ত্রিসভার দায়িত্বের সাংবিধানিক তাৎপর্য

গণপরিষদে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের খসড়ায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যকলাপ নিয়ে বিতর্ক চলার সময় সংবিধানের অন্যতম প্রধান রচয়িতা ডক্টর আম্বেদকার ঘোষণা করেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপতির পদটি ইংলণ্ডে র নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা বা রাণীর পদের সমতুল্য। নির্বাচিত হলেও ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের রাজমুকুটের (British Crown) মত নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার নেতা এবং জাতির জাতীয়তার প্রতীকরূপে বিবেচিত হবেন এবং এই হিসেবে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা পাবেন। ডক্টর আম্বেদকার এর পর আরও বলেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থায় আইনসভার কাছে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে দায়ী মন্ত্রীরাই হবেন প্রকৃত শাসক এবং রাষ্ট্রপতিকে সর্বদাই তাঁদের উপদেশ অনুযায়ী শাসনকার্য চালাতে হবে ("The real rulers of the country are the Ministers who stand collectively responsible to the Legislature and the President has almost always to act on the advice of the Ministers")।

ভারতীয় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজমুকুটের তুলনা: দুজনেই নিয়মতান্ত্রিক শাসক

কিন্তু প্রখ্যাত শাসনতন্ত্রবিদ্ ও আইনজ্ঞ বিচারপতি ডক্টর দুর্গাদাস বসু ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির পদের একটি সূক্ষ্ম আইনানুগ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য নন। ইংলণ্ডে রাজা বা রাণীর শাসনবিষয়ক আদেশপত্রগুলি সবই বিভাগীয় মন্ত্রীর দ্বারা সহ-স্বাক্ষরিত হয়ে থাকে। তার ফলে ইংলন্ডে শাসন বিভাগীয় সব ক্ষেত্রেই রাজমুকুট তাঁর ব্যক্তিগত বা পদগত দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকেন, প্রকৃত প্রশাসনিক দায়িত্ব বর্তায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর ওপর। ভারতীয় রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে একটু অন্যরকম। তাঁর ক্ষেত্রে তাঁর স্বাক্ষরিত আদেশপত্র ইত্যাদির ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর বদলে থাকে বিভাগীয় সচিবের সহ-স্বাক্ষর। ফলে ভারতীয় রাষ্ট্রপতির শাসন-বিভাগীয় দায়িত্ব ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর মত নামমাত্র নয়। ভারতের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব আইনগত সূক্ষ্ম অর্থে প্রকৃত ও বাস্তব দায়িত্ব।

এ বিষয়ে দুর্গাদাস বসুর বক্তব্য

তবে বিচারপতি ডক্টর বসু আশা প্রকাশ করেছেন যে, গণপরিষদে তখন ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপতির পদ সম্পর্কে আম্বেদকারের মত তীক্ষ্ণধী, দূরদর্শী, প্রাজ্ঞ শাসনতত্ত্ববিদ্‌গণ যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, প্রথাগতভাবে রাষ্ট্রপতির পদটি সেই ধরনেরই হতে থাকবে এবং প্রথাগত বিধানের ভিত্তিতেই ভারতের রাষ্ট্রপতির পদটি সব দিক থেকেই ইংলণ্ডের রাজমুকুটের পদটির মত নিয়মতান্ত্রিক শাসকের পদে পরিণত হবে। সুখের বিষয় ভারতে এই দিক থেকে প্রয়োজনীয় শাসনতান্ত্রিক প্রথা রচিত হয়েছে এবং ভারতের প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র চালু হবার ৩৫ বছর পরেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, ভারতের রাষ্ট্রপতির পদটি ইংলন্ডের রাজা বা রাণীর পদের মত নিয়মতান্ত্রিক শাসকেরই পদ।

এ বিষয়ে আম্বেদকারের বক্তব্য

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের সংবিধান-রচয়িতাগণ আশা করেছিলেন ভারতকে ইংলণ্ডের মত মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনতন্ত্রের প্রয়োগক্ষেত্ররূপে দেখতে। ভারতের সংবিধানের ৭৪ (১) ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শীর্ষে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করবেন। সংবিধানের ৭৫ ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিগণ সমবেতভাবে লোকসভার কাছে দায়ী থাকবেন, যদিও তাঁরা রাষ্ট্রপতির অভিলাষ অনুযায়ী নিজ পদে বহাল থাকবেন। মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতিকে নিজ নিজ বিভাগ সম্বন্ধে যে উপদেশ দেবেন, সেটা থাকবে গোপনীয় এবং কোনও আদালতে সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উত্থাপন চলবে না। এই সমস্ত সাংবিধানিক ধারাগুলি স্মরণ করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ভারতের প্রকৃত শাসনব্যবস্থা মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থা।

আসলে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থা কার্যতঃ মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থা

এইভাবে বিচার করলে ভারতের শাসনব্যবস্থা ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার মত। ইংলণ্ডে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। কিন্তু ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। এই সাংবিধানিক পার্থক্যটি আসলে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে কোনও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারবে বলে মনে করা উচিত নয়। ইংলণ্ডের মত, বলতে গেলে যে কোন দেশের মত, ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার ঊর্ধ্বে একজন ব্যক্তিকে রাখা দরকার। ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে বংশগত রাজতন্ত্র (Hereditary Monarchy) প্রচলিত থাকার ফলে দেশের কেন্দ্রস্থলে সর্বোচ্চ এক ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারটা খুব সহজ দাঁড়িয়ে গেছে। রাজা বা রাণী উত্তরাধিকারসূত্রে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দেশের সর্বোচ্চ শাসকপদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু ভারতকে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করার ফলে রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে এক সর্বোচ্চ শাসককে অধিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারটা ভারতের সাংবিধানিকদের কাছে প্রথমে কিছুটা জটিলতা সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা কেউ কেউ সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় যৌথ শাসকমণ্ডলীর মত কিছু একটা কেন্দ্রের শীর্ষে রাখবার পক্ষে ঝুঁকছিলেন। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার তুলনা : দু'জায়গাতেই সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত ; কিন্তু ইংলণ্ডে এককেন্দ্রিক সরকার ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র রয়েছে, ভারতে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও প্রজাতন্ত্র

আদর্শ অনুসরণ করে তাঁরা জনগণের পরোক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করে এই সমস্যাটির সমাধান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ইংরেজ আদর্শ অনুযায়ী কেন্দ্রে ও অঙ্গরাজ্যগুলিতে মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। এইভাবে ভারতীয় সাংবিধানিকগণ মার্কিনী এবং ইংরেজ পদ্ধতিগুলির সমন্বয়ে ভারতে এক অভিনব শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করলেন। ফলে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার শীর্ষে নিয়মতান্ত্রিক শাসকরূপে রাষ্ট্রপতিও রইলেন, আবার প্রকৃত শাসক হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নেতা বা নেত্রী হিসাবে প্রধানমন্ত্রীও রইলেন। এইভাবে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের স্থায়িত্ব এবং মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের দায়িত্বের মধ্যে একটা জৈবিক সমন্বয় সাধিত হল।

আবার সুইজারল্যান্ডের মত ভারতেও যুক্তরাষ্ট্র, সেখানকার মত ভারতেও রাষ্ট্রপতি-শাসিত ও মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার-ব্যবস্থার সমন্বয় দেখা যায়

ভারতীয় শাসনতন্ত্র রচিত হবার সময় থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে কেন্দ্রাভিমুখী থাকতে হয়েছে। ফলে এখানে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনের নিয়মতান্ত্রিকতা মেনে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে কেন্দ্রাভিমুখী রাখতে হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, প্রাদেশিকতা, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য, উদ্বাস্তুসমস্যা প্রভৃতির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে শিশু-রাষ্ট্র রূপে ভারত যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল, আজ যৌবনের শেষ প্রান্তেও তাকে সেই ধরনের সমস্যাগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। জাতীয় ঐক্য, সংহতি বজায় রেখে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের অগ্রগতি সাধন তার মূল লক্ষ্য। উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি সরকারকে যথাসম্ভব দ্রুততালে কার্যকর করে তুলতে হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতকে এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাদ্বয়ের মধ্যে যেভাবে সামঞ্জস্য বিধান করে এগিয়ে চলতে হয়েছে বা হচ্ছে, ঠিক সেভাবে তাকে মন্ত্রিসভা-চালিত এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা দুটির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। শুধু ধর্ম, সংস্কৃতি, কৃষ্টি বা ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে নয়, সাংবিধানিক ক্ষেত্রেও এই সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস প্রজাতন্ত্রী ভারতের সংবিধানকে অদ্বিতীয় করে রেখেছে।

ভারতীয় শাসনব্যবস্থা আবার যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা-দ্বয়ের সমন্বয়

কোন কোন সমালোচক মনে করেন যে, ভারতীয় সংবিধানে একটা জগাখিচুড়ি মিশ্র শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং প্রকৃত অর্থে ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয় নি। এই সমালোচকদের যুক্তিগুলি হল—প্রথমতঃ, ভারতে শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব। কিন্তু এজন্য বিরোধী দলগুলিই দায়ী, ভারতীয় সংবিধানকে বা তার রচয়িতা-গণকে দায়ী করা চলে না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, ১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় কেন্দ্রে বিকল্প সরকার গঠনের জন্য সুযোগ চেয়ে তাঁরা জনগণের কাছে ভোটভিক্ষা করেন। কিন্তু ভোটের ফলে দেখা গেল, অন্ধ্রে "তেলুগু দেশম্" দল ছাড়া বাকী বিরোধী দলগুলি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জনগণের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, কংগ্রেস লোকসভার তিন-চতুর্থাংশ ভোট লাভ করে পুনরায় কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন ভারতে জগাখিচুড়ি মিশ্র শাসনব্যবস্থা প্রচলিত এর পক্ষে যুক্তি :
(১) ভারতে শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব ; কিন্তু এজন্য বিরোধী দলগুলিই দায়ী, শাসন-ব্যবস্থা দায়ী নয়

দ্বিতীয়তঃ, বলা হয় যে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি নামসর্বস্ব শাসক নন। এ কথা সত্যি যে, রাষ্ট্রপতির হাতে জরুরী অবস্থায় ও স্বাভাবিক অবস্থায় প্রযোজ্য বহু ক্ষমতা আছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রাভিমুখী, এ কথাও ঠিক। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এই সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শে প্রয়োগ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আবার লোকসভার কাছে দায়ী থাকে। সুতরাং ভারতে ইংলণ্ডের মতই দায়িত্বশীল সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকর রয়েছে।

(২) রাষ্ট্রপতি নামসর্বস্ব শাসক নন; কিন্তু অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মত তিনি সব ক্ষমতাই মন্ত্রিসভার নির্দেশে প্রয়োগ করেন

তৃতীয়তঃ, কেউ কেউ বলেন যে, ভারতীয়দের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি ফলতঃ অসার। কিন্তু এই অভিযোগের বিরুদ্ধেও যুক্তি দেখানো হয়। নাগরিক অধিকার সব উন্নত রাষ্ট্রেই চরম অধিকার নয়, অধিকারগুলি সব সময়ে সীমাবদ্ধ। ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতার আশ্রয় নিয়েই পশ্চিম বঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার অপারেশান্ বর্গা, বেকার ভাতা দান প্রভৃতি জনহিতকর অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তা ছাড়া, ভারতে সরকারী ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত, বিচার বিভাগকেও স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাখা হয়েছে। বিচারবিভাগ বহু ক্ষেত্রে ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন। কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও নির্বাচন-ব্যবস্থার মারফত প্রদত্ত জনগণের রায় লোকে মেনে নিচ্ছেন। শ্রীমতী গান্ধীর মত নেত্রীও একবার নির্বাচনে পরাজয়কে মেনে নিয়েছিলেন। বামপন্থী ও অন্য বিরোধী নেতৃবৃন্দ সংসদীয় গণতন্ত্রকে মেনে নিয়ে, তাঁদের ভাষায়, তার "সীমাবদ্ধতা" জেনেশুনে মন্ত্রিসভা গঠন করতে বা মন্ত্রিসভায় নিজেদের আসন সুরক্ষিত করতে সদাই সচেষ্ট। এই সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় যে, নানা বাধাবিঘ্ন, সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র মিশ্র শাসনতন্ত্ররূপে মোটামুটি সফল।

(৩) বলা হয়—ভারতীয়দের গণতান্ত্রিক অধিকার অসার: কিন্তু স্বাধীন, নিরপেক্ষ বিচারালয় এগুলির রক্ষক, বিরোধী দলগুলি "সীমাবদ্ধ ক্ষমতার" কাঠামোর মধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ অংশীদার

॥ রাজতন্ত্র ॥

রাজতন্ত্র (Monarchy) হল আদিম শাসনব্যবস্থাগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। সামাজিক বিবর্তনের একটি অতীত অবস্থায় রাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। যে শাসনব্যবস্থায় সমস্ত শাসনক্ষমতা কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি অর্থাৎ রাজা বা রাণীর কাছে সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত ও কেন্দ্রীভূত থাকে, তারই নাম রাজতন্ত্র। আরিস্টটল্ মনে করেন যে, প্রাচীনকালে কোনও বীরপুরুষ যখন কোন অঞ্চলের জনগণকে বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করতেন, তখন জনগণ তাঁর মাথায় রাজার মুকুট পরিয়ে দিতেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক রাজতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রে এইভাবে সৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ জুলিয়াস্ সীজারের (Julius Caesar) প্রথমে সেনাপতি ও পরে সম্রাটের পদপ্রাপ্তির ইতিহাস স্মরণীয়। এই কারণেই প্রাচীনকালে

রাজতন্ত্র সামাজিক বিবর্তনের একটি স্তর; এ নিয়ে আরিস্টটল্, ম্যালিনাওস্কি, লোওভির বক্তব্য

রাজাকে শূরসম্রাট (Heroic Monarch) রূপে কল্পনা করা হত। ম্যালিনাওস্কি (Malinowski), লোওভি (Lowie) প্রভৃতি আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন যে, আদিম যুগে বাহুবলই ছিল সমাজের বিভেদমুখী শক্তিগুলিকে পরাস্ত করে ঐক্য-স্থাপনের প্রধান উপায় এবং যে বীরপুরুষ এভাবে আদিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হতেন, তিনিই হতেন রাজা।

ইতিহাস থেকে তিন ধরনের রাজতন্ত্রের নজীর মেলে—**চরম** (Absolute) **রাজতন্ত্র, নির্বাচিত (Elected)** রাজতন্ত্র ও **সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত (Constitutional বা Limited)** রাজতন্ত্র। সামন্ততন্ত্র, সৈন্যদল প্রভৃতিকে আশ্রয় করে প্রাচীনকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চরম রাজতন্ত্র গড়ে ওঠে। ভারতে প্রাচীন হিন্দু রাজাগণ চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি দেবকুলের বংশধর বলে নিজেদের জাহির করতেন। খৃষ্টধর্ম এবং ইস্‌লাম প্রচলনের পর পৃথিবীর অনেক দেশের রাজারা ঐ ধর্মের কোন একটির সঙ্গে নিজেদের রাজকীয় সত্তাকে মিলিয়ে দিলেন। ফলে মধ্যযুগ থেকে ইউরোপের অনেক দেশে রোমান ক্যাথলিক (Roman Catholic) ধর্মের প্রভাবে পোপের কর্তৃত্বে যাজকতন্ত্রের সমর্থনে চরম রাজতন্ত্র অনেক অঞ্চলে পরিপুষ্ট হতে লাগল। প্রোটেস্টাণ্ট্ (Protestant) ধর্মের প্রবর্তনের পর থেকে ইউরোপে যাজকতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের মধ্যে অনেক রক্তক্ষয়ী বিরোধ দেখা দিতে থাক। তবুও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর নেতৃত্বে পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য (Austro-Hungarian অথবা Holy Roman Empire) রোমান ক্যাথলিক ধর্মের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায় এবং তুর্কি বা অটোমান্ (Turkish অথবা Ottoman Empire) ইস্‌লাম ধর্মের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। তা ছাড়া ফ্রান্সে বুরবঁ (Bourbon), অস্ট্রিয়ায় হাপ্‌স্‌বুর্গ (Habsburg), রুশদেশে রোমানফ (Romanoff) প্রভৃতি রাজবংশ বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল।

রাজতন্ত্র ৩ প্রকার ঃ চরম, নির্বাচিত ও সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র

চরম রাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি হল—(১) উত্তরাধিকারসূত্রে অর্থাৎ বংশানুক্রমিকভাবে রাজার পদপ্রাপ্তি ; (২) শাসনক্ষমতা রাজার হাতে কেন্দ্রীভূত ; (৩) রাজার হুকুমই আইন ; (৪) জনগণের স্বাধীনতা বা অধিকার না থাকা ; (৫) রাষ্ট্র রাজার সঙ্গে একীভূত। ফরাসী রাজা চতুর্দশ লুই বলতেন, "L'etat c'est moi" (আমিই রাষ্ট্র)। (৬) নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে বহু ক্ষেত্রে রাজার ঘোষণা। ১৭৮৯ সালে ফরাসী দেশে বিপ্লবের সময় পর্যন্ত ফরাসী রাজতন্ত্র এবং ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের সময় পর্যন্ত রাশিয়ার জারতন্ত্র (Czar) চরম রাজতন্ত্রের নিদর্শন।

চরম রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

জাতীয়তাবাদের চাপে ইউরোপের অনেক দেশে বৈদেশিক সম্রাটের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু হয়। ফলে বহু দেশ প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় অথবা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে পরিণত হয়। কিন্তু একথা বলা ভুল যে আজ গণতন্ত্রের যুগে পৃথিবীর সর্বত্রই রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছে। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত মিশরের সম্রাট্ ফারুক চরম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

রাজতন্ত্রের বিবর্তনে জাতীয়তাবাদের ভূমিকা ঃ নেপাল, ভুটান চরম রাজতন্ত্র

এখনও আফ্রিকার কোন কোন উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে, মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন অংশে, **নেপাল, ভূটান** প্রভৃতি কয়েকটি দেশে **চরম রাজতন্ত্র** প্রচলিত।

নির্বাচিত রাজতন্ত্রের উদাহরণ **ভারতের ও রোমের** প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সামন্ত, সেনাপতি ও বুদ্ধিজীবী (অমাত্য) প্রভৃতির সমর্থনে জনগণ প্রকাশ্য সভায় রাজাকে নির্বাচিত করতেন। আধুনিক যুগে আফগানিস্তানে নাদির শাহ এভাবে নির্বাচিত হন। আজকাল নির্বাচিত রাজতন্ত্র প্রায় ক্ষেত্রেই নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। নির্বাচিত রাজতন্ত্রে জনগণ কিছু কিছু অধিকার ভোগ করতেন, রাজাও সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী হতে পারতেন না।

নির্বাচিত রাজতন্ত্রের নজির: প্রাচীন ভারত ও রোম: তার বৈশিষ্ট্য

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ **ইংলণ্ড্**। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গৌরবময় বা রক্তপাতশূন্য বিপ্লব (Glorious or Bloodless Revolution) সংঘটিত হবার ফলে ইংলণ্ডে তখন থেকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত। এই শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রাণী বংশগত উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তাঁরা নামসর্বস্ব শাসক। তাঁদের নামে প্রকৃত শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ। মন্ত্রীরা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের উদাহরণ: কিভাবে ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপিত হল

॥ চরম রাজতন্ত্রের দোষ ও গুণ ॥

চরম রাজতন্ত্রের প্রধান **গুণ** হিসাবে প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হব্‌স্ (Hobbes) যে যুক্তি দেখিয়েছেন সেটা হল এই যে, প্রথমতঃ এই শাসনব্যবস্থায় রাজার ব্যক্তিগত স্বার্থ দেশের সঠিক স্বার্থের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। হব্‌স্ মনে করেন যে, রাজার অভাবে রাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং তার ফলে দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, হব্‌স্ ছিলেন ইংলণ্ডের স্বৈরাচারী স্টুয়ার্ট-বংশীয় রাজা দ্বিতীয় চার্ল্‌সের গৃহশিক্ষক। তাই তাঁর লেখায় স্বাভাবিকভাবেই রাজতন্ত্রের পক্ষে সমর্থন প্রকাশ পেয়েছে।

চরম রাজতন্ত্রের গুণ: (১) হব্‌সের মতে রাজার স্বার্থ ও দেশের স্বার্থ অভিন্ন থাকে

দ্বিতীয়তঃ, রামচন্দ্র, অশোক, আকবর প্রভৃতি আদর্শ রাজাদের উদাহরণ উল্লেখ করে বলা হয় যে, এ ধরনের প্রজাপালক রাজাদের শাসনকালে প্রজাদের সুখ, সমৃদ্ধি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। রাজা খুব দ্রুত দেশের সমস্যা দূর করেন, লোকের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে বিবেচনা করেন, খারাপ আইনকানুন বাতিল করে দেন, ভালো লোকদের যথাযোগ্য পদে নিয়োগ করেন।

(২) প্রজাপালক রাজা আদর্শ

তৃতীয়তঃ, রাজা নির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাচিত হন না। ফলে ঘন ঘন শাসননীতি পরিবর্তিত হয় না, শাসননীতির ধারাবাহিকতা ও নিরবচ্ছিন্নতা অক্ষুণ্ণ থাকে। যতদিন তিনি জীবিত থাকেন, ততদিন রাজা শাসন করেন। সুতরাং রাজতন্ত্র সবচেয়ে স্থায়ী সরকার।

(৩) স্থায়ী শাসনব্যবস্থা

চতুর্থতঃ, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে উন্মত্ত বিপ্লবীদের হাতে রাজতন্ত্রের চরম লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করে প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক **কার্লাইল্** (Carlyle) বলেন যে, একজন সর্বদ্রষ্টা স্বৈরাচারী শাসক রাজারূপে যদি জনগণের সঠিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন, তা হলে **চরম রাজতন্ত্রই হল আদর্শ শাসনব্যবস্থা।**

(৪) কার্লাইল্ বলেন বিপ্লবের আতিশয্যের চেয়ে জনদরদী রাজাই কাম্য

পঞ্চমতঃ, চরম রাজতন্ত্রে রাজার হাতেই সমস্ত শাসনক্ষমতা থাকার ফলে রাজা অত্যন্ত দ্রুতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। রাজাকে মন্ত্রি-সভা বা আইনসভার মত কোন প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন নিতে হয় না। সুতরাং বলা হয় যে, আপৎকালীন অবস্থায় বা জরুরী অবস্থায় চরম রাজতন্ত্র বিশেষভাবে কার্যকর।

(৫) রাজা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন

ষষ্ঠতঃ, সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মতে, রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে বর্বর, অসভ্য আদিম অধিবাসীদের বন্য স্বভাব দূর করতে ও তাদের সুশৃঙ্খল করে তুলতে চরম রাজতন্ত্রের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী রাজার দমননীতির ভয়ে তারা নিয়ম-কানুন মানতে বাধ্য হল। কোথাও বা রাজা নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে জাহির করে, তাদের ধর্মভীরু করতে সক্ষম হলেন। সরকারের ক্রমবিকাশের এই আপেক্ষিকতার (Relativity of forms of government) এবং প্রাচীন সমাজের এই সমাজতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখেই জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ নির্দেশ করেছেন যে, অনগ্রসর সমাজের জনগণকে সভ্য ও ঐক্যবদ্ধ করে তোলার জন্য চরম রাজতন্ত্র উপযোগী।

(৬) সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মত—আদিম, অসভ্য মানুষকে চরমপন্থী রাজা বাহুবল ও ধর্মের সাহায্যে সভ্য ও ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন

সপ্তমতঃ, সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের মত সমর্থন করে লর্ড ব্রাইস্ (Lord Bryce) বলেন যে, বর্তমান যুগে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র (Nation State) গঠনে চরমপন্থী রাজতন্ত্রের যথেষ্ট অবদান আছে। ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দী থেকেই স্বৈরাচারী পোপের ও যাজকদের বিরুদ্ধে সামন্ত ও মধ্যস্বত্বভোগীদের সাহায্যে রাজা ধীরে ধীরে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি রক্ষার জন্য জনগণ ক্রমশঃ রাজছত্রের তলে আশ্রয় নিলেন। আঞ্চলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব ও স্থানীয় জনগণের দেশাচারবোধ—এগুলি সুরক্ষার আদর্শরূপে জাতীয়তাবাদ (Nationalism) গড়ে ওঠে। সুতরাং জাতীয়তাবাদের বিবর্তনে চরম রাজতন্ত্রের ভূমিকা বিশেষভাবে স্বীকার্য।

(৭) ব্রাইস্ বলেন—জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগঠ-নের ক্ষেত্রে চরম রাজ-তন্ত্রের অবদান স্মরণীয়

অষ্টমতঃ, সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনৈতিক দলব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই শাসনব্যবস্থায় অনেক সময় ব্যাপক দলাদলির জন্য জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি হয়। এ অবস্থায় অনেকে সম্পূর্ণ দল-নিরপেক্ষ শাসকের নেতৃত্ব কামনা করেন। শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও জনহিতকর করার জন্যই গ্রীক দার্শনিক প্লেটো "দার্শনিক রাজতন্ত্র" (Philosopher Kings) প্রতিষ্ঠান নির্দেশ দিয়েছিলেন,

(৮) প্লেটো-কল্পিত দার্শনিক রাজতন্ত্রের মারফত চরম রাজতন্ত্র নির্দলীয়, নিরপেক্ষ প্রশাসনের গ্যারাণ্টি

যদিও এক্ষেত্রে তাঁর পরিকল্পিত রাজতন্ত্রের ওপর অভিজাততন্ত্রের (Aristocracy) অনেকটা প্রভাব ছিল।

(৯) ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরম রাজতন্ত্রের আমলে পূর্বে রাজশক্তিই ছিল গণশক্তি

নবমতঃ, একজন ব্যক্তিকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে বলে চরম রাজতন্ত্রের শাসন-প্রণালী অত্যন্ত ঋজু, সহজ, সরল। শাসনব্যবস্থায় নেই কোন জটিলতা, নেই কোন তরফে দায়িত্ব এড়াবার কোন অপচেষ্টা। "রাজার হুকুমে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়"—এজাতীয় প্রাচীন লৌকিক প্রবাদের মধ্যে চরম রাজতন্ত্রের যে চিত্রটি তখন ফুটে উঠত, তা হল—রাজা ছিলেন প্রজারঞ্জক, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে সবচেয়ে অগ্রণী। রাজশক্তি ছিল সে যুগের জনসাধারণের একমাত্র ভরসা, প্রকৃত গণশক্তি।

চরম রাজতন্ত্রের দোষ ঃ (১) রাজার স্বেচ্ছাচারিতা

চরম রাজতন্ত্রের যেমন অনেক গুণের কথা বলা হল, তেমনি এর অনেক **দোষ** আছে। প্রথমতঃ, চরম রাজতন্ত্রে রাজার পক্ষে যথেচ্ছাচারী হবার সম্ভাবনা থাকে। প্রজাগণ রাজার ক্রীড়নক বা ক্রীতদাসের পর্যায়ে নেমে যায়। জনগণের অধিকার, স্বাধীনতা কিছুই থাকে না। রাজার বিরুদ্ধে যেতে লোকে সাহস করে না।

(২) ব্যক্তিসর্বস্ব শাসন-ব্যবস্থায় রাজার ব্যক্তিত্বের দ্বারা চরম রাজতন্ত্র সীমাবদ্ধ

দ্বিতীয়তঃ, নীতিগত কারণেও চরম রাজতন্ত্রকে সমর্থন করা চলে না। চরম রাজতন্ত্র ব্যক্তিসর্বস্ব শাসনতন্ত্র। আদর্শ রাজাও রক্তমাংসে গড়া মানুষ, তিনিও ভুল করতে পারেন। কিন্তু চরম রাজতন্ত্রে তাঁর ভুলত্রুটি সমালোচনা করে তাঁকে সঠিক পথে পরিচালিত করার মত কোন ব্যবস্থা থাকে না। পরিত্রাণের কোন পথ না পেয়ে মানুষ অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ে, নয়ত সংঘবদ্ধ হতে পারলে ও সুযোগ্য নেতৃত্ব লাভ করলে তারা বিপ্লবের পথেও পা বাড়ায়। অতএব, চরম রাজতন্ত্র একটি অনিশ্চিত, অনির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থা। নীতিগত কারণেই একজনের বদলে বহুজনের, অর্থাৎ ব্যক্তিসর্বস্ব চরম রাজতন্ত্রের বদলে জনগণতন্ত্রের মূল্য ও গুরুত্ব অনেক, অনেক বেশী।

(৩) জন্ স্টুয়ার্ট মিলের মতে কার্লাইলের কল্পিত আদর্শ রাজা দুর্লভ

তৃতীয়তঃ, চরম রাজতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ বলেছেন যে, কার্লাইলের পরিকল্পিত কোন আদর্শ রাজা সর্বত্র সব সময়ে পাওয়া যায় না। রাজতন্ত্রে সব সময়েই সুযোগ্য উত্তরাধিকারী লাভ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকে। একজন প্রজাবৎসল রাজার পরবর্তী রাজাও যে দক্ষ ও প্রজাবৎসল হবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ইতিহাসে একজন সবল রাজার পরে দুর্বল রাজার আবির্ভাব অথবা প্রজারঞ্জক সম্রাটের পুত্রকে প্রজাপীড়ক কুশাসক নৃপতি হিসাবে অনেক সময় দেখা গেছে।

চতুর্থতঃ, মিলের মতে প্রজাবৎসল রাজা থাকাটাই দেশের লোকদের রাজনৈতিক জ্ঞানলাভের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অঙ্কের শিক্ষক যদি সমস্ত অঙ্কের

সমাধান নিজেই করে দেন, তা হলে গণিতশিক্ষার্থীরা কোনও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারে না। জনগণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই হল তাদের রাজনৈতিক জ্ঞানের মূল উৎস।

(৪) মিলের মতে, প্রজাবৎসল রাজা নিজেই সব কিছু করে দিলে জনগণ রাজনৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পাবেন কোথায়?

রাজা যদি সব সময় তাঁর প্রজাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেন, তা হলে প্রজারা কখনও রাজনৈতিক জ্ঞান লাভ করবে না, তাদের নাবালকত্ব ঘুচবে না। এজন্য মিল্ চরম রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্রকে আদর্শ শাসনব্যবস্থা বলে ঘোষণা করেছেন। মিলের অকাট্য যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তীকালে বিশিষ্ট ইংরেজ শাসনতন্ত্রবিদ্ ক্যাম্পবেল্ ব্যানারম্যান্ (Campbell Bannerman) ঠিকই মন্তব্য করেছেন যে, গণতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে অন্য কোন ভাল শাসনব্যবস্থার স্থান নেই। ("Good government is no substitute for self-government")। কারণ স্বায়ত্তশাসনের মধ্য দিয়েই জনগণ রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করেন।

পঞ্চমতঃ, রাজতন্ত্রে একজন ব্যক্তির হাতেই শাসনক্ষমতা চরম এবং চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটলে সাধারণতঃ তা জনসাধারণের সঠিক কল্যাণে প্রযুক্ত না হয়ে রাজার স্তাবক ও পারিষদবর্গের স্বার্থে প্রযুক্ত হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে রাজাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একদল কুচক্রী, দুর্নীতিপরায়ণ, বিলাসব্যসনে আসক্ত, অসৎ ব্যক্তিবর্গের একাধিপত্য।

(৫) স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ফলে পারিষদ, স্তাবক, বিলাসীদের নিয়ে রাজসভা গড়ে ওঠে: মিশরের রাজা ফারুকের ও ইরানের শাহের নজির

মিশরের শেষ রাজা ফারুক প্রায়ই নিজের দেশ ছেড়ে সুদূর ইউরোপে আমোদ-প্রমোদে, পানভোজনে, জুয়া-জোচ্চুরিতে দেশের জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেন। মন্টিকার্লোর জুয়ার আসরে বা ক্যাসিনোয় (Casino) তিনি নাকি স্বদেশের রাজকোষের সমস্ত অর্থ বাজী ধরেন—শোনা যায়। কত না বেদনা, ঘৃণা, ক্ষোভ বুকে নিয়ে মিশরীয় জনগণ স্মরণাতীত কাল থেকে তাদের দেশে যে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রবর্তিত ছিল তার শেষ অধিষ্ঠাতা এ হেন সম্রাট্ ফারুকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবে লিপ্ত হন। সম্প্রতি ইরানের স্বৈরাচারী শাহের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভও এইভাবে ঘটে। হয়ত এইভাবেই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ইতিহাসে বারংবার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, গণতন্ত্রের রাজপথ উন্মুক্ত ও প্রসারিত হয়ে ওঠে।

ষষ্ঠতঃ, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা চরম রাজতন্ত্রেই বেশী লক্ষণীয়। ইতিহাসের নির্মম, নিরপেক্ষ বিচারে বুরবঁ কিংবা হাপ্সবুর্গ রাজারা যেন এক একটা নাটকীয় ভূমিকা পালন করে গেলেন, কখনও দেখা গেল অশোক বা আকবরকে, কখনও দেখা গেল হারুণ-অল্-রশিদ কিংবা মহম্মদ তুঘলককে। অথবা বুদ্ধভক্ত রাজা বিম্বিসারের পর হিংসাশ্রয়ী রাজা অজাতশত্রু ইতিহাসের একই রঙ্গমঞ্চে সারিবদ্ধভাবে আবির্ভূত হন। যে চাঞ্চল্যকর সত্যটি ইতিহাসের নাট্যলীলা থেকে প্রতিভাত হয় তা হল এই যে, স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের সাফল্য সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ও আকস্মিক।

(৬) চরম রাজতন্ত্রের সাফল্য সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ও আকস্মিক

সপ্তমতঃ, ঐতিহাসিক বাক্‌ল্‌ (Buckle) ঠিকই বলেছেন যে, রাজা ওপর থেকে তাঁর সিম্ধান্তগুলি চাপিয়ে দেন। এতে জনগণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নষ্ট হয়ে যায়। এমন কি সুবুদ্ধিসম্পন্ন রাজার কার্যাবলীও লোকে হয়ত ঠিকমত বুঝে উঠতে পারে না। মহম্মদ তুঘ্‌লক্‌ সম্বন্ধে অনেকের প্রচলিত ধারণা আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ভুল বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি খেয়ালী বা উন্মাদ ছিলেন না, তাঁর ঘোষিত শাসন-নীতিগুলি নাকি ছিল এত প্রগতিশীল যে লোকে সেগুলির যথার্থ মর্ম সে সময়ে উপলব্ধি করতে পারে নি।

(৭) রাজা ওপর থেকে সিম্ধান্তগুলি জনগণের মাথায় চাপিয়ে দেন; ফলে জনগণের উৎসাহ, উদ্দীপনা নষ্ট হয়

তবে গ্লাড্‌স্টোন্‌ (Gladstone), ম্যাস্টাম্যান্‌ (Masterman) প্রভৃতি লেখকগণ ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসারে **নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের প্রশংসা** করেছেন। তাঁদের ভাষায় বলতে গেলে, সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র এমন এক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যেখানে স্বরাষ্ট্রীয় এবং পর-রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হয়। রাজতন্ত্র এখানে নিরপেক্ষ উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করে। সাধারণ নির্বাচনের ঝড়-ঝঞ্ঝা কেটে গেলে, রাজনৈতিক দলাদলির মেঘগুলি অপসৃত হলে যে স্থিতাবস্থার সৃষ্টি হয় তার অনেকখানি উন্নতমনা রাজা বা রাণীর অবদান।

উপসংহার ঃ গ্লাড্‌স্টোন্‌, মাস্টারম্যান্‌ প্রভৃতির বক্তব্য—সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রই নিরপেক্ষ শাসন কায়েম করতে পারে

॥ নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ বা শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ॥

যে রাজতন্ত্রে রাজা বা রাণী বাহ্যতঃ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হলেও আসলে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শাসনক্ষমতা সমর্পিত, সেই রাজতন্ত্রকে **নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ বা শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র** (Constitutional or Limited Monarchy) বলে। যেমন—ইংলণ্ড্‌।

সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের দৃষ্টান্ত ঃ ইংলণ্ড্‌

সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—প্রথমতঃ, এই প্রকার শাসনতন্ত্রে জনগণ যে প্রতিনিধিদের নির্বাচন করেন, তাঁরাই প্রকৃত শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করেন। রাজা বা রাণী নামসর্বস্ব শাসকমাত্র (Titular head)। কার্যতঃ একে মন্ত্রিসভা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা (Cabinet form of Government) এবং প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Representative or Indirect Democracy) বলাই সঙ্গত এবং বাস্তব। প্রসঙ্গক্রমে ব্রিটিশ্‌ রাজা বা রাণীকে ব্যঙ্গ করে বলা হয় যে, তিনি রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন না ("reigns but does not govern"), তিনি একটি মহাশূন্য ("Magnificent Cipher"), রবারস্ট্যাম্‌প্‌ ("Rubberstamp")।

সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ (১) রাজা বা রাণী নামসর্বস্ব শাসকমাত্র, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী

দ্বিতীয়তঃ, এ ধরনের রাজতন্ত্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকার ফলে এখানে জনগণ নানাপ্রকার অধিকার ভোগ করেন।

(২) জনগণের নানা গণতান্ত্রিক অধিকার থাকে

তৃতীয়তঃ, এই রাজতন্ত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে বা বংশানুক্রমিক সূত্রে রাজার জীবিত জ্যেষ্ঠ পুত্র বা জ্যেষ্ঠা কন্যা সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই নিয়মকে বলে "প্রথম জীবিত জ্যেষ্ঠের অগ্রাধিকার সূত্র (Law of Primogeniture)।

(৩) বংশানুক্রমিক পদপ্রাপ্তি

চতুর্থতঃ, সীমাবন্ধ রাজতন্ত্র এক ধরনের গণতন্ত্র। সুতরাং এর গুণ ও দোষগুলি সাধারণভাবে গণতন্ত্রের গুণ ও দোষের সঙ্গে সমতুল্য। তবুও সীমাবন্ধ রাজতন্ত্রের কিছু কিছু বিশিষ্ট গুণ ও দোষের আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

(৪) সীমাবন্ধ রাজতন্ত্র এক ধরনের গণতন্ত্র

সীমাবন্ধ রাজতন্ত্রের গুণ হল, প্রথমতঃ, এই রাজতন্ত্র স্থায়ী শাসনব্যবস্থা হবার সম্ভাবনা; অবশ্য মন্ত্রিসভা যে রাজনৈতিক দল পরিচালনা করে, সেই দল যদি মন্ত্রিসভাকে স্থায়ী রাখতে পারে। রাজা বা রাণী উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনে আরূঢ় হবার ফলে এই ধরনের রাজতন্ত্রে রাজন্যবর্গ দীর্ঘসময়ের অভিজ্ঞতাকে দক্ষভাবে প্রশাসন কার্যে লাগাতে পারেন।

সীমাবন্ধ রাজতন্ত্রের গুণ: (১) স্থায়িত্ব

দ্বিতীয়তঃ, রাজা বা রাণী নিজে কোন দলের সমর্থকরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করেন না। সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র নির্দলীয় বা নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থারূপে চিহ্নিত হয় এবং জনগণ তার প্রতি আস্থাবান থাকেন।

(২) নিরপেক্ষতা

তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডে রাজমুকুট (Crown) অর্থাৎ রাজা বা রাণীকে "জাতির ঐক্যের প্রতীক" (symbol of unity of the nation") বলে শ্রদ্ধা করা হয়। ইংলণ্ডের ইতিহাসের আধুনিক ব্যাখ্যাকার ট্রেভেলিয়ান্ (Trevelyan) বলেছেন যে, ইংলণ্ডের রক্ষণশীল সমাজকে গতিশীল করে তুলতে এবং সমগ্র দেশে কাল্চারগত একটা ঐক্যকে ব্রিটিশ্ ঐতিহ্যরূপে গড়ে তুলতে রাজতন্ত্রের দান স্মরণীয়। এ কথা ব্রিটিশ্ সমাজতন্ত্রীগণও স্বীকার করেন।

(৩) রাজমুকুট জাতীয় ঐক্য ও ঐতিহ্যের প্রতীক: ইংলণ্ডের নজির

কিন্তু **সীমাবন্ধ রাজতন্ত্রের দোষও** আছে। প্রথমতঃ, বলা হয় যে রাজতন্ত্র এক ধরনের বিলাসিতা, আড়ম্বর, চাটুকারিতা, উন্নাসিকতাকে অনেক সময় প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। রাজা বা রাণীর জীবনযাত্রা-প্রণালীকে সাধারণ লোকে অনুকরণ করে থাকে। ফলে সমাজে এক ধরনের কৃত্রিম অনুকৃতি দেখা দেয়, ফ্যাসান ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই অনুকরণপ্রিয়তা ফাঁপা বাহ্যাড়ম্বর ছাড়া কিছু নয়।

সীমাবন্ধ রাজতন্ত্রের দোষ: (১) এক ধরনের বিলাসিতা, আড়ম্বর, চাটুকারিতার প্রাধান্য

দ্বিতীয়তঃ, রাজতন্ত্রের অর্থই হল রাজপরিবারের জন্য বিপুল ব্যয়ভার। বলা বাহুল্য, এই ব্যয়ভার শেষ পর্যন্ত জনসাধারণকেই বহন করতে হয়। এই ব্যয়ের তুলনায় প্রজাতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ও তাঁর পদের জন্য ব্যয় নিয়ন্ত্রণযোগ্য ও অপেক্ষাকৃত কম হবার সম্ভাবনা।

(২) ব্যয়বাহুল্য

তৃতীয়তঃ, কট্টর গণতন্ত্রপ্রেমীগণ বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনপ্রাপ্তির নীতিকে গণতন্ত্র, সাম্য ও প্রগতিশীলতার বিপরীত বলে মনে করেন। লীকক্ বলেছেন যে, উত্তরাধিকারসূত্রে নির্বাচিত শাসক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কবি বা গণিতজ্ঞের মতই নিরর্থক।

[৩] বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র সীমাবন্ধ হলেও অগণতান্ত্রিক

॥ চরম রাজতন্ত্র বনাম নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ॥

চরম ও সীমাবন্ধ রাজতন্ত্রের তুলনা

চরম রাজতন্ত্র এবং সীমাবন্ধ রাজতন্ত্রের মধ্যে তুলনা করলে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

(১) উত্তরাধিকারসূত্রে আসীন রাজার হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, নিয়মতান্ত্রিক ক্ষেত্রেও উত্তরাধিকারসূত্রে রাজা আসীন, কিন্তু জনগণের প্রাধান্য

প্রথমতঃ, চরম রাজতন্ত্রে রাজা বা রাণী উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষেত্র রাজতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রকে (institutional side) এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, সমগ্র শাসনক্ষমতার তিনি একচ্ছত্র, সার্বভৌম, কেন্দ্রীভূত প্রয়োগকর্তা। কিন্তু ইংলণ্ডের মত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজমুকুট (Crown) উত্তরাধিকারসূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও সেখানে তিনি নামসর্বস্ব শাসক। কার্যতঃ, আসল শাসনক্ষমতা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ভোগ ও প্রয়োগ করে থাকেন।

(২) চরম রাজতন্ত্রে আইনপ্রণয়ন ও পরিবর্তনে রাজার নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে জনগণের ভূমিকা

দ্বিতীয়তঃ, চরম রাজতন্ত্রে আইনপ্রণয়ন বা আইনপরিবর্তন কোনটিতেই জনগণের ভূমিকা নেই, রাজার হুকুমৎই আইন। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত আইনসভার হাতে আইনপ্রণয়ন ও আইনপরিবর্তনের ক্ষমতা থাকে।

(৩) চরম রাজতন্ত্রে জনগণের অধিকার থাকে না, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে থাকে

তৃতীয়তঃ, চরম রাজতন্ত্রে জনগণের স্বাধীনতা বা অধিকার থাকে না, রাজা যতটুকু অধিকার জনগণকে কৃপা করে দেন ততটুকু ছাড়া। ফলে জনগণ রাজার নির্দেশ মানতে বাধ্য, নয়ত তাদের বিপ্লবমুখী হতে হয়। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করতে পারেন, কারণ ইংলণ্ডের মত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র কার্যতঃ গণতন্ত্র।

(৪) চরম রাজতন্ত্রে রাজাই রাষ্ট্র ; নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতীকমাত্র

চতুর্থতঃ, চরম রাজতন্ত্রে রাজা ফরাসী স্বৈরাচারী সম্রাট্ চতুর্দশ লুইয়ের মত নিজেকেই "রাষ্ট্র" বলে অভিহিত করেন। ব্যক্তি রাজা এইভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রাজার সত্তাকে (Monarchy as an institution) সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পারেন। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে সাংবিধানিক আইনের চোখে রাজা ব্যক্তিরূপে প্রধান নন, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানরূপে গুরুত্বপূর্ণ। এবং সে প্রতিষ্ঠান আবার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত।

পঞ্চমতঃ, প্রাচীন যুগের স্বৈরাচারী রাজাগণ চরম রাজতন্ত্রকে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানরূপে বর্ণনা করতেন ও জনগণের কাছ থেকে এজন্য বাড়তি কিছু মান্যতা আদায় করতে চাইতেন। প্রাচীন চীনের রাজাগণ নিজেদের "দেবদূত" বলে দাবী করতেন। এইভাবে রাজতন্ত্রের সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসকে মিলিত করে চরম রাজতন্ত্র প্রায়ই এক ধরনের বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের রূপ গ্রহণ করত। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা এভাবে রাজশক্তির সঙ্গে ঐশী শক্তিকে কখনই মিলিত করেন না। এর ফলেই বোঝা যায় যে, **চরম রাজতন্ত্র সাবেকী যুগের, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র আধুনিক কালের। আগেরটি রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল, পরেরটি প্রগতিশীল।**

(৫) চরম রাজতন্ত্রে রাজার স্বৈরতা ধর্মীয় প্রধানত্বের সঙ্গে জড়িত ছিল; নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে তা নেই

॥ প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র ॥

গণতন্ত্রের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে আধুনিক প্রজাতন্ত্রী সরকারের আবির্ভাব। যে সরকারে কোনও সম্রাট্ বা সাম্রাজ্ঞী শাসনবিভাগের ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত থাকেন না, সেই সরকারের নাম **প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র** (Republic)। প্রজাতন্ত্রে নিয়মতান্ত্রিক শাসকরূপেও কোন সম্রাট্ বা সাম্রাজ্ঞী থাকেন না। সম্রাট্ বা সাম্রাজ্ঞীর পরিবর্তে প্রজাতন্ত্রের শীর্ষে থাকেন একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। এইভাবে প্রজাতন্ত্রে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা মূর্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং মোটামুটিভাবে মার্কিন সংবিধানতত্ত্ববিদ্ **ম্যাডিসনের** (Madison) সংজ্ঞা অনুসারে বলা যায় যে, জনগণ যে সরকারের সমস্ত ক্ষমতার উৎস, তাকেই **প্রজাতন্ত্র** বলে। তাঁর ভাষায়, "A Republic is a Government which derives all its powers dirctly or indirectly from the great body of the people and is administered by persons holding their offices during pleasure, for a limited period or during good behaviour."

প্রজাতন্ত্রের সংজ্ঞা ঃ এর ওপর গণতন্ত্রের প্রভাব

প্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রধান **বৈশিষ্ট্য** গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ, বর্তমানে এই সরকার সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। প্রথমতঃ, এখানে রাষ্ট্রপ্রধান কোন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ক্ষমতার অধিকারী রাজা নন, জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপ্রধান। গার্নার বলেন যে, জনগণের নির্বাচন আধুনিক ঘটনা, উত্তরাধিকারসূত্র প্রাচীনকালের পরিত্যক্ত দুর্ঘটনা।

প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ (১) রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণতন্ত্রকে রাজতন্ত্রের বিপরীত রূপ বলা হয়। এই কথাটি অবশ্য চরম রাজতন্ত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। লক্ষণীয় যে, উভয় ক্ষেত্রেই একজন ব্যক্তি-বিশেষ শাসনব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করেন। কিন্তু চরম রাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে শাসন পরিচালনায় জনগণের কোনও ভূমিকা নেই, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে জনগণের হাতে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা থাকলেও সে ক্ষেত্রে রাজা বা রাণীই থাকেন সর্বোচ্চ শাসকের পদে।

(২) প্রজাতন্ত্র রাজতন্ত্রের বিপরীত রূপ

কিন্তু প্রজাতন্ত্রে সম্পূর্ণভাবে শাসনক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত, তাঁদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন।

(৩) জনগণই শাসনক্ষমতার প্রকৃত উৎস

তৃতীয়তঃ, প্রজাতন্ত্রে জনগণই রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতার প্রকৃত উৎস। এই ক্ষমতা নামসর্বস্ব হলেও অন্য কোন কর্তৃপক্ষ ভোগ করেন না, বা তা প্রয়োগও করেন না।

(৪) টমাস্ পেন্‌ও ব্লুনট্‌শ্‌লির মতে, প্রজাতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য জনগণের সঠিক কল্যাণ সাধন

চতুর্থতঃ, টমাস্ পেন্ (Thomas Paine), ব্লুনট্‌শ্‌লি (Bluntschli) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, জনগণের সার্বিক মঙ্গলবিধানই সাধারণতন্ত্রী সরকারের মুখ্য কাজ ও উদ্দেশ্য। "সাধারণতন্ত্র" কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা করে অনেক সময় বলা হয় যে, "সাধারণের স্বার্থ" যে "তন্ত্রে" রক্ষা করা হয়, তাই হল "সাধারণতন্ত্র"। এ থেকেই সাধারণতন্ত্রের জনকল্যাণকর দিকটি প্রকাশিত হয়। তবে সব সাধারণতন্ত্রই এই উদ্দেশ্য পালন করে না। হিট্‌লারের একনায়কতন্ত্রী, স্বেচ্ছাচারী সাধারণতন্ত্র এই সত্যের ঐতিহাসিক নির্দশন। বর্তমান যুগের জঙ্গী একনায়কতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য।

(৫) সার্বিক ভোটাধিকার ব্যবস্থা

পঞ্চমতঃ, সার্বিক ভোটাধিকার থাকা সাধারণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু পৃথিবীতে বহু সাধারণতন্ত্রে এখনও সার্বিক ভোটাধিকার নেই। পাকিস্তানের নির্বাচন ব্যবস্থায় বিগত ১৯৮৪ সালের "গণভোট" (Referendum) গ্রহণকেও অনেকে নিয়ন্ত্রিত ভোটব্যবস্থা বলে নিন্দা করেছেন।

প্রজাতন্ত্র প্রধানতঃ দুরকম—গণতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক

প্রজাতন্ত্র দু' প্রকার হতে পারে—**গণতান্ত্রিক** ও **অগণতান্ত্রিক**। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন না বটে, কিন্তু তাঁর মন্ত্রিসভা আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। **ভারত এইরকম একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র**। অগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে সাধারণতঃ ব্যক্তিগত বা দলগত প্রাধান্য স্থাপিত হয়। জনগণের প্রতিনিধি বলে শাসকবর্গ দাবী করলেও তাঁরা আসলে নিজেদের ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হন। লাতিন আমেরিকার বহু প্রজাতন্ত্র এ ধরনের স্বৈরতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র।

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে সার্বিক ভোটাধিকার স্বীকৃত

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের স্বরূপ সাধারণতঃ নির্ভর করে এ ধরনের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের জন্য কিরকম নির্বাচনব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হয় তার ওপর। আজকাল গণতন্ত্র মানেই সার্বিক ভোটাধিকার অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতাদের ভোটদানের অধিকার (Universal বা Adult Franchise)। এই সার্বিক অধিকার অনুযায়ী পৃথিবীর সব দেশেই একুশ বছর বা ঐরকম কোনও নির্দিষ্ট বয়সের ভোটদাতাদের অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থাকে কার্যকর করে তোলা হয়।

প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হতে পারেন অথবা তিনি পরোক্ষভাবেও নির্বাচিত হতে পারেন। প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির উদাহরণ মেলে

বলিভিয়া, ব্রাজিল, পেরু প্রভৃতি দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে যে ভাইমার শাসনতন্ত্র (Weimar Constitution) প্রচলিত হয়, তাতে জনগণের দ্বারা রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। তখন ফন্ হিন্ডেনবুর্গ (von Hindenburg) প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি

কিন্তু আজকাল পৃথিবীর বেশীর ভাগ গণতন্ত্রেই রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। ভারতে রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। সেজন্য **ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।**

বর্তমানে প্রায় সর্বত্রই [ভারতেও] রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত

একক বা এককেন্দ্রিক প্রজাতন্ত্র বলতে গেলে বোঝায় যেখানে একজন ব্যক্তি শাসনতন্ত্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি হতে পারেন অথবা একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রপতিও হতে পারেন। **ভারতীয় প্রজাতন্ত্র একক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র,** যদিও ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। তুরস্কের রাষ্ট্রপতি একনায়কতন্ত্রী অর্থাৎ অ-গণতান্ত্রিক। তাই তুরস্কে একনায়কতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র প্রচলিত।

একক বা এককেন্দ্রিক প্রজাতন্ত্র ঃ ভারত

প্রজাতন্ত্র আবার **যৌথ প্রজাতন্ত্রও** হতে পারে। প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র। সেখানে একটি শাসন পরিষদ (Federal Council) শাসনবিভাগীয় **ক্ষমতা** পরিচালনা করে। পরিষদের মধ্যে থেকে পর পর একজন করে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিরূপে কাজ করে থাকেন। সুইস্ যৌথ শাসনপরিষদের সাতজন সদস্যই সমান ক্ষমতাসম্পন্ন এবং এঁরা সকলেই যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার সদস্য, যদিও তাঁরা আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন না। সোবিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডিয়ামও যৌথ প্রজাতন্ত্রের শাসনপরিষদরূপে কাজ করে থাকে।

যৌথ প্রজাতন্ত্র ঃ সুইজারল্যান্ডের নজির

অগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র **জঙ্গী প্রজাতন্ত্রের** রূপও ধারণ করতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকার বহু রাষ্ট্রে প্রায়ই নির্বাচিত প্রজাতন্ত্রী সরকারের পতন ঘটানো হয় জনগণের মধ্যে আকস্মিক বিপ্লবের বা কুদ্যেতাত্ (Coup d'etat) ঘটিয়ে। সাধারণতঃ একজন সামরিক নেতা এই ধরনের বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন এবং তার ফলে তাঁকে রাষ্ট্রপতিরূপে বা তাঁর মনোনীত কোনও ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতিরূপে সরকারের শাসনব্যবস্থার শীর্ষে স্থাপন করা হয়। ফলে যে অগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রটির জন্ম হয়, তা হল পুরোপুরি জঙ্গী বা সামরিক প্রজাতন্ত্র। যেমন বর্তমান পাকিস্তান। অনেক সময়ে এই অগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জঙ্গী রূপটি প্রচ্ছন্ন থাকে। যেমন, ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানকে, তাঁর বংশধরদের ও তাঁর অনুচরদের নৃশংসভাবে হত্যা করে সামরিক বাহিনীর কয়েকজন তাঁদের চক্রান্তে যে

জঙ্গী প্রজাতন্ত্র ঃ দৃষ্টান্ত পাকিস্তান ও বাংলাদেশ

নতুন প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশে স্থাপন করেছিলেন, তার শীর্ষে একজন বেসামরিক নেতা রাষ্ট্রপতিরূপে অধিষ্ঠিত থাকলেও সেটি আধুনিক যুগে একটি অগণতান্ত্রিক, জঙ্গী প্রজাতন্ত্রেরই প্রচ্ছন্ন রূপ। তারপর সেনাপতি জিয়াউর রহমান ও এরসাদ পর পর **বাংলাদেশ সামরিক প্রজাতন্ত্রের** কর্ণধার হন।

প্রজাতন্ত্র অনেক সময়ে **ধর্মভিত্তিক** (Theocracy) কিংবা **ধর্মনিরপেক্ষ** (Secular) হতে পারে। ১৯২৯ সালে ইতালী এবং রোমান ক্যাথলিক যাজকতন্ত্রের সর্বোচ্চ ধর্মযাজক পোপের (Pope) মধ্যে ল্যাটেরান চুক্তি (Lateran Treaty) অনুযায়ী ইতালীর কিছু অংশ নিয়ে ভ্যাটিকান সিটি (Vatican City) নামক নতুন প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। পোপকে **ভ্যাটিকান সিটির** রাষ্ট্রপতির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং এই প্রজাতন্ত্রকে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রধান কেন্দ্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে, এই প্রজাতন্ত্র ধর্মভিত্তিক প্রজাতন্ত্র। **পাকিস্তানের ও বাংলাদেশের** প্রজাতন্ত্রী সংবিধানে বলা হয়েছে যে, সরকার এই দেশদুটিকে ঐস্লামীয় প্রজাতন্ত্ররূপে (Islamic Republic) গঠন করবেন। সংবিধানের কতকগুলি ধারায় আরও বলা হয় যে মুসলমান ছাড়া অন্য কোনও ধর্মের লোক রাষ্ট্রপতির পদে থাকতে পারবেন না। ফলে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ধর্মভিত্তিক প্রজাতন্ত্র। সিংহল সম্প্রতি **শ্রীলঙ্কা প্রজাতন্ত্র** রূপে যে শাসনতন্ত্র গ্রহণ করেছে, তার ৬ ধারায় শ্রীলঙ্কাকে প্রকৃতপক্ষে একটি ধর্মভিত্তিক প্রজাতন্ত্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, তাতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সরকার বৌদ্ধধর্মকে রক্ষা করবেন এবং তার ক্রমোন্নতির চেষ্টা করবেন। ফলে শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে **ভারত** ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র।

ধর্মভিত্তিক প্রজাতন্ত্র ঃ পোপের ভ্যাটিকান সিটি, শ্রীলঙ্কা ; ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র ঃ ভারত

প্রজাতন্ত্রকে আবার সার্বভৌম (sovereign) এবং অসার্বভৌম (non-sovereign) এই দুই ভাগেও ভাগ করা যায়। ভারত একটি **সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র**, কারণ এখানকার শাসনতন্ত্রে কোনও বৈদেশিক রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয় নি। আবার, ১৯০১ এবং ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে সম্পাদিত যথাক্রমে হে-পান্সফোর্ট চুক্তি (Hay-Pauncefort Treaty) এবং হে-ভ্যারিলা চুক্তির (Hay-Varilla Treaty) ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্য আমেরিকার অন্তর্গত পানামা খাল (Panama Canal) অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী করার জন্য **পানামা প্রজাতন্ত্রকে** কার্যতঃ নিজের অধীন এবং **আশ্রিত** একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত করে রেখেছে।

সার্বভৌম, অসার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঃ ভারত, পানামা

প্রজাতন্ত্রকে যে শুধু ধর্মভিত্তিক বা ধর্মনিরপেক্ষ এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় তাই নয়, একে **ভাষাভিত্তিক** (lingual) এবং **ভাষানিরপেক্ষ** (non-lingual) এই দুই ভাগেও ভাগ করা যায়। **সুইজারল্যাণ্ডের** যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের অঙ্গ-রাজ্যগুলিতে এক একটি অঙ্গরাজ্যের প্রধান আঞ্চলিক ভাষার ভিত্তিতে প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের সাংগঠনিক রূপ দেওয়া হয়েছে। তদনুসারে ফরাসী, ইতালীয় এবং জার্মান এই তিন ভাষার ভিত্তিতে আঞ্চলিক

ভাষাভিত্তিক, ভাষানিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র ঃ সুইজারল্যাণ্ড, ভারত

প্রজাতন্ত্রগুলি ভাষাভিত্তিক প্রজাতন্ত্ররূপে স্বীকৃত এবং সংগঠিত। ভারত একটি ভাষা-নিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র। কারণ, হিন্দী সরকারী ভাষারূপে গণ্য হলেও সংবিধানের সংশোধিত ৮ম তফ্‌শীলে ১৫টি ভারতীয় ভাষা স্বীকৃত।

॥ ইংলণ্ড্ কি প্রজাতন্ত্র ? ॥

ইংলন্ড্ বা গ্রেট্ ব্রিটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের (Glorious Revolution) সময়ে সেখানে চরম রাজতন্ত্র অবলুপ্ত হয় এবং তখন থেকেই ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বহাল রয়েছে। রাজা বা রাণীর মৃত্যু বা সিংহাসনচ্যুতি ঘটলে জীবিত জ্যেষ্ঠ পুত্র বা কন্যা উত্তরাধিকার-সূত্রে রাজমুকুট ধারণ করেন। জীবিত থাকা পর্যন্ত বা সিংহাসনচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত রাজা বা রাণী স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

ইংলন্ড্ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ঃ তার বৈশিষ্ট্য ঃ [১] রাজতন্ত্র বংশানুক্রমিক

অপর পক্ষে প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের মত ইংলণ্ডের নাগরিকগণও নানাপ্রকার গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করেন। কারণ, ইংলণ্ডের রাজমুকুট নামসর্বস্ব শাসকমাত্র, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত আইনসভা (পার্লামেন্ট্) এবং ক্যাবিনেট (Cabinet বা মন্ত্রিসভা) প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং বলা যায় যে, ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র রয়েছে, প্রজাতন্ত্র নেই, যদিও প্রজাতন্ত্রের গণতান্ত্রিকতা ইংলণ্ডে বজায় রয়েছে।

[২] নাগরিকদের অধিকার স্বীকৃত, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণই মন্ত্রী হন, তবুও ইংলন্ড্ প্রজাতন্ত্র নয়

॥ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি প্রজাতন্ত্র ? ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হলেন এই রাষ্ট্রের **রাষ্ট্রপ্রধান**। তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির মত পরোক্ষ ব্যবস্থার দ্বারা **নির্বাচিত** হন, উত্তরাধিকার-সূত্রে নিয়মতান্ত্রিক রাজা বা রাণীর মত তিনি নিজের পদ অধিকার করেন না। আবার, গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা তাঁর বিচার (Impeachment) করে তাঁকে **পদচ্যুত** করতেও পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা পদচ্যুত করতে পারে

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে প্রজাতন্ত্রের সব বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সব দিক থেকেই প্রজাতন্ত্র বলা যায়।

তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রজাতন্ত্রভাবে স্বীকৃত

॥ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ॥

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে ভারতে প্রজাতন্ত্রী সংবিধান বলবৎ হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Preamble) ভারতকে একটি সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে অবশ্য ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রকৃতিনির্ণয় সহজসাধ্য নয়। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের স্বরূপ ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গেলে এর শাসনতন্ত্রের অন্যান্য আরও অনেক ধারার উল্লেখ ও ব্যাখ্যা একান্তভাবে প্রয়োজন।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য প্রস্তাবনায় সংক্ষিপ্ত

প্রথমতঃ, ভারতের প্রজাতন্ত্রকে খাঁটি গণতন্ত্র বলা যায়। কারণ এখানকার সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ভোটদানের অধিকারী। সাধারণ নির্বাচনে এই ব্যাপক জনসমর্থনের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত হয়ে থাকে কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভাগুলি। এই আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই কেন্দ্রে এবং অঙ্গরাজ্যগুলিতে মন্ত্রিসভা গঠন করে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নকক্ষের অর্থাৎ লোকসভার কাছে এবং অঙ্গরাজ্যগুলির মন্ত্রিসভা ঐ রাজ্যগুলির বিধানসভার কাছে দায়ী থাকে। অর্থাৎ লোকসভা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব (vote of no-confidence) গ্রহণ করলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। অনুরূপভাবে, কোনও অঙ্গরাজ্যের বিধানসভা সেই রাজ্যের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করলে সেখানকার মন্ত্রিসভারও পতন ঘটে।

[১] ভারত খাঁটি গণতন্ত্র

দ্বিতীয়তঃ, ভারতের প্রজাতন্ত্রকে একটি **ধর্মনিরপেক্ষ বা অসাম্প্রদায়িক প্রজাতন্ত্র** (Secular Republic) বলা হয়। ভারতীয় সংবিধানের ২৫ এবং ২৬ ধারার বিধিগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ভারতে প্রত্যেক ধর্মকে সমান সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র কোনও বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে স্বীকার করে না, কোনও বিশেষ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আলাদাভাবে অর্থ সাহায্য করে না। প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিককে ধর্মবিশ্বাসের এবং ধর্মানুষ্ঠানের অধিকার দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এই ধর্মানুষ্ঠান যেন সামাজিকতার বা ব্যক্তিনিরাপত্তার পথে বিঘ্ন না ঘটায়। তা ছাড়া প্রত্যেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই নিজের ধর্মসম্বন্ধীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে চলবার অধিকারী। এই সব প্রতিষ্ঠান স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হতে পারে এবং তা পরিচালনার ব্যাপারে আইনসম্মত উপায় অবলম্বন করতে পারে।

[২] ধর্মনিরপেক্ষা বা অসাম্প্রদায়িকতা

ভারতের প্রজাতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে স্বায়ত্তশাসিত অর্থাৎ **সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র** বলা হয়। কোনও বৈদেশিক রাষ্ট্রের কোন প্রকার আধিপত্য সংবিধানে স্বীকার করা হয় নি। ভারতীয় রাষ্ট্রপতি কোনও বৈদেশিক সরকারের চাপে কোনও কাজ করতে বাধ্য নন। আন্তর্জাতিক আইন (International Law) অনুসারে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌমত্বের অর্থ হল যে, জনগণ কর্তৃক অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত স্বাধীন ভারত সরকার যে কোনও বিদেশী সরকারের সঙ্গে ইচ্ছামত চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে, রাষ্ট্রদূত আদানপ্রদান করতে পারে, কোনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে, ইচ্ছামত শান্তির বা অনাক্রমণের চুক্তি সম্পাদিত করতে পারে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মত কোনও আন্তর্জাতিক মহাসংস্থার সভ্য হতে পারে।

[৩] সার্বভৌমত্ব

অনেকে কমনওয়েলথে (Commonwealth) ভারতের অন্তর্ভুক্তিকে ভারতের সার্বভৌমত্ব খর্ব হবার একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, কমনওয়েলথে অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে ভারতকে ইংরেজ সরকারের প্রতি কোনরকম আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয় না, ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রকে ভারতের সার্বভৌম

শক্তি হিসাবে মেনে নেওয়া হয় না। ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্ব্বোচ্চ শাসক। তা ছাড়া ভারত ইচ্ছা করলে যে কোনও সময়ে কমন্‌ওয়েল্‌থ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। ১৯৪৯ সালে ভারতে প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা গৃহীত হবার ঠিক পূর্বে ভারতের কমন্‌ওয়েল্‌থে অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই কথাগুলি বলেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, কমন্‌ওয়েল্‌থে যোগদানের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে কমন্‌ওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্ত অন্য দেশগুলির পারস্পরিক সহযোগিতা অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং তাতে ভারতের লাভ হবে।

কমন্‌ওয়েল্‌থে যোগদান ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে না

চতুর্থতঃ, **ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের** অন্যতম প্রধান **বৈশিষ্ট্য** হল এর **সামগ্রিকতা ও অভিন্নতা**। ভারতীয় সংবিধানের প্রথম ধারায় ভারতকে কতকগুলি অঙ্গরাজ্যের সমষ্টি বলে বর্ণনা করা হয়েছে ("India shall be a Union of States")। এর তাৎপর্য হল এই যে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকার প্রত্যেকেই একই সংবিধানের অধীনে থেকে নিজ নিজ এলাকায় সংবিধানসম্মত উপায়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। তা ছাড়া সংবিধানে ব্যবহৃত এই বাক্যাংশটির দ্বারা ভারতের প্রজাতন্ত্র হতে কোনও অঙ্গরাজ্যকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার থেকে চিরকালের মত বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানরচয়িতাগণ ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ব্রিটিশ্‌ নর্থ্‌ আমেরিকা অ্যাক্টের (British North America Act, 1867) এই বাক্যাংশ স্মরণ করেন। এখানে লক্ষণীয় যে এই আইনানুসারে ইংলণ্ড্‌ কানাডায় ডোমিনিয়ান্‌ স্বায়ত্তশসনব্যবস্থা (Dominion Status) প্রবর্তন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখনকার রাষ্ট্রপতি অ্যাব্রাহাম্‌ লিঙ্কন্‌ (Abraham Lincoln) যখন ক্রীতদাসপ্রথা লোপ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন দক্ষিণাঞ্চলের অঙ্গরাজ্যগুলি তার বিরোধিতা করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য সচেষ্ট হয়। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি পরাজিত হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ঐক্য ও অবিচ্ছিন্নতা পুনঃস্থাপিত হয়। ১৮৬৭ সালে কানাডায় ডোমিনিয়ান্‌ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের ঠিক পূর্বে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়, তাতে চিরকালের মত অঙ্গরাজ্যগুলির ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শোচনীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কেন্দ্রের কর্তৃত্ব চিরস্থাপিত হয়। ভারতীয় প্রজাতন্ত্র থেকেও যাতে অঙ্গরাজ্যগুলি কোনদিন বিচ্ছিন্ন না হতে পারে, তার জন্য কানাডার অ্যাক্টের ঐ বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে।

[৪] সামগ্রিকতা ও অভিন্নতা : ব্রিটিশ্‌ নর্থ্‌ আমেরিকা অ্যাক্টের প্রভাব

পঞ্চমতঃ, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বিশেষত্ব হল এই যে, সংবিধানে "গণতন্ত্র" কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতীয় প্রজাতন্ত্র যথার্থভাবে প্রকৃত প্রজাতন্ত্রের উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী। কারণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয়বিধ গণতন্ত্রকে প্রজাতন্ত্র সরকার সার্থক করে তুলতে প্রয়াসী। উভয় ক্ষেত্রেই ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা ও তাদের সুরক্ষা, সমাজের সকলের জন্য সমানভাবে

[৫] ব্যাপকতা

সুযোগদান ও সমানভাবে সকলের মানমর্যাদা স্বীকার করা—এই আদর্শবহুল কর্মসূচী ভারতীয় প্রজাতন্ত্র রূপায়িত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

ষষ্ঠতঃ, ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ভাষাভিত্তিক নয়। তাই একে ভাষানিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র বলা যায়। এ বিষয়টি সংবিধানের ৩৪৩ থেকে ৩৫১ ধারার শর্তগুলি ব্যাখ্যা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়। দেবনাগরী লিপিতে হিন্দী ভাষাকেই ভারতে সরকারী ভাষা বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু সংবিধান চালু হবার পর থেকে ১৫ বছর ইংরাজী ভাষাকে সরকারী কাজে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এমন কি এর পরেও কেন্দ্রীয় আইনসভা ইচ্ছা করলে এই উদ্দেশ্যে ইংরাজী ভাষা প্রচলনের মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। সরকার ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে সরকারী ভাষা সম্পর্কে যে আইন বলবৎ করেন, তাতে বলা হয়েছে যে ইংরাজী ভাষা সরকারী কাজে ব্যবহৃত হলেও একাধিক অঙ্গরাজ্য নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের মধ্যে সরকারী ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্য হিন্দীভাষাও ব্যবহার করতে পারে। কোনও অঙ্গরাজ্যের আইনসভার অনুমোদনসাপেক্ষে সেখানে আঞ্চলিক ভাষাকেও সরকারী কাজে ব্যবহার করা চলতে পারে। সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ভারতের জাতীয় ঐক্য এবং আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ভারতের প্রচলিত অগণিত ভাষাকে ভারত সরকার সমান মর্যাদা দিয়ে থাকেন। অতএব **ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে** একভাষাভিত্তিক (monolingual) প্রজাতন্ত্র না বলে একে **বহুভাষাভিত্তিক** (multilingual) **প্রজাতন্ত্র** বলাই সমীচীন।

[৬] ভাষা-নিরপেক্ষতা

সপ্তমতঃ, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের একটি বাক্যাংশ চিরস্মরণীয় থাকবে। ভারতীয় সংবিধানে ভারতের **জনসাধারণকে শাসনক্ষমতার একমাত্র উৎসরূপে** স্বীকৃতি দিয়ে ভারতীয় শাসনতন্ত্রে **বিশুদ্ধতম প্রজাতান্ত্রিকতার** আদর্শ সন্নিবেশিত হয়েছে। কারণ, সংক্ষেপে বলতে গেলে, শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনাটি শুরু করা হয়েছে এইভাবে— "আমরা জনসাধারণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য, সাম্য বজায় রাখার জন্য, ভারতীয়দের মধ্যে সৌভ্রাত্র্য বজায় রাখার জন্য, ভারতের জাতীয় ঐক্য চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এবং ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করে পরস্পরের কাছে এই সংবিধান উপহার দিচ্ছি ("WE THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social economic and political : LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship ; EQUALITY of status and opportunity : and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation ; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twentysixth day of November, 1949 do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES

[৭] বিশুদ্ধতম প্রজাতান্ত্রিকতা : প্রস্তাবনার মূল কথা হল— জনগণই সরকারের ক্ষমতার মূল উৎস

THIS CONSTITUTION")। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায়, "আমরা ভারতীয় জনগণ" শাসনতন্ত্রের রচয়িতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বোঝায় যে জনগণের ইচ্ছাই ভারতীয় সংবিধানের মূল ভিত্তি। এভাবে জনগণকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মূল উৎসরূপে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করার আর একটি প্রাচীন নজির মেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায়। ভারতের প্রজাতন্ত্র যে প্রকৃতই প্রজাতন্ত্র তা এর চেয়ে স্পষ্টতরভাবে স্বীকার করা যায় না। বিচারপতি ডক্টর দুর্গাদাস বসু তাঁর সাংবিধানিক টীকায় "আমরা ভারতবাসীগণ" বাক্যাংশের একটি আইনগত ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে এই বাক্যাংশের অর্থ হল এই যে, ভারতের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান ভারতের সমগ্র জনসাধারণেরই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি, কেবলমাত্র কতকগুলি বিক্ষিপ্ত অঞ্চলের জনগণের সদিচ্ছায় বা শুভবুদ্ধিতে এর উদ্ভব হয় নি। এখানে লক্ষণীয় এই যে, ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় যেমন "আমরা ভারতবাসীগণ" এই বাক্যাংশের দ্বারা ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রজাতান্ত্রিক দিকটিকে চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, তেমনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের প্রস্তাবনাতেও "আমরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যক্তিবর্গ" সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপনে অনুপ্রাণিত হয়েছি—এই একই ধরনের বাক্যাংশ প্রয়োগ করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংগঠনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতাকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বশক্তির মূল উৎস বলে ধরা হয়েছ, বিশ্ববাসীকে সম্মান দেখান হয়েছে। এই দুটি ক্ষেত্রেই সাংবিধানিক উদ্দেশ্য এক—ব্যক্তিকে সংগঠনের ঊর্ধ্বে স্থাপন করা এবং ব্যক্তিবর্গের যৌথ প্রচেষ্টায়, সক্রিয় সহযোগিতায় ও সাধারণ সদিচ্ছায় পরিকল্পিত ও গৃহীত সংগঠনটির নিয়মতন্ত্রকে সর্বসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে গরীয়ান্ করে তোলা।

সারাংশ

ধ্রুপদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী সকল রাষ্ট্রেরই চারটি উপাদান—জনসমষ্টি, ভূখণ্ড, সরকার, সার্বভৌমত্ব। কিন্তু সরকারের প্রকারভেদ আছে।

সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাধারা—(১) ডেভিড্ ইস্টনের বিকল্প প্রস্তাব—সরকারের শ্রেণীবিভাগের পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ অধিকতর বাস্তবানুগ। (২) সরকার সম্বন্ধে মার্ক্সীয় শ্রেণীবিভাগ—সরকার ইতিহাস ও অর্থনৈতিক প্রভাবের যোগফল।

এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য—(১) রাষ্ট্রের সর্বত্র একই শাসনব্যবস্থা প্রচলিত, (২) শাসনতন্ত্র নমনীয়।

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ—(১) শাসনতন্ত্রে সমতা ও সরলতা, (২) জরুরী অবস্থায় বিশেষ উপযোগী, (৩) ব্যয় কম, (৪) কেন্দ্র-রাজ্য লড়াই নেই, (৫) শাসনের ক্ষেত্রে ও আইনপ্রণয়নে গতিশীলতা, (৬) সরকারকে যে কোন অবস্থায় খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়, (৭) আন্তর্জাতিক চুক্তির শর্তাদি পালন সহজ, (৮) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ সহজসাধ্য, (৯) ক্ষমতাবিভাজন না থাকায় সরকারী বিভাগগুলির মধ্যে সুসংহতি।

এককেন্দ্রিক সরকারের ত্রুটি—(১) কেন্দ্রের পক্ষে দূরবর্তী অঞ্চলের সমস্যা সমাধান কঠিন, (২) কেন্দ্রীয় প্রশাসক কার্যতঃ আঞ্চলিক প্রতিনিধিরূপে অঞ্চলকেই প্রাধান্য দেন, (৩) ভারতের মত বৈচিত্র্যময় রাষ্ট্রের পক্ষে অনুপযোগী, (৪) ব্যক্তিগত অথবা রাজনৈতিক দলগত গোষ্ঠীতন্ত্র ও কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের উদ্ভব, (৫) জনগণের ভূমিকা সীমাবদ্ধ।

উপসংহার: বৈচিত্র্যহীন, ছোট দেশগুলির পক্ষে এককেন্দ্রিক সরকার ভাল।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার: ডাইসির সংজ্ঞা—জাতীয় সংহতির সঙ্গে আঞ্চলিক স্বাধিকারের রাজনৈতিক সামঞ্জস্যবিধানের কৌশলই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা।

যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে হুয়্যারের সংজ্ঞা—যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের প্রাধান্য।

ডাইসি ও হুয়্যারের যুক্তরাষ্ট্র-সম্পর্কিত ব্যাখ্যার তুলনা।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য—দুটি বৈপরীত্যের সমন্বয়। ফলে (১) কেন্দ্র ও অঙ্গ-রাজ্যে দুরকম শাসন, (২) উভয়ের মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন, (৩) লিখিত, অনমনীয় শাসনতন্ত্র এবং সংবিধানের প্রাধান্য, (৪) দ্বৈত নাগরিকত্ব, (৫) বিচারালয়ের অভিভাবকত্ব, (৬) বিশেষ রাজস্ববণ্টন নীতি, (৭) যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চুক্তিগত আনুগত্য, (৮) দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা ও উচ্চকক্ষে অঙ্গরাজ্যগুলির সমপ্রতিনিধিত্ব।

সন্ধিসমবায় বা রাষ্ট্রসমবায়ে রাষ্ট্রগুলি নিজেদের সার্বভৌমত্ব বর্জন করে না, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ-রাজ্যগুলির সার্বভৌমত্ব নেই। সন্ধিসমবায়ের অতি-আধুনিক উদাহরণ—ধ্রুপদী জোটবদ্ধ রাষ্ট্রসমবায়ের পুনরাবির্ভাব: যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ক্ষমতার মেরুকরণের ফলে যথাক্রমে ন্যাটো ও ওয়ারশ' চুক্তিবদ্ধ দুটি বিরোধী জোট রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও সন্ধিসমবায়ের তুলনা—(১) সন্ধিসমবায়ের রাষ্ট্রগুলি সার্বভৌম, যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি নয়, (২) সন্ধিসমবায়ের ফলে নতুন জাতি ও রাষ্ট্র জন্মায় না, যুক্তরাষ্ট্রে এর ব্যতিক্রম, (৩) সন্ধিসমবায়ে রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব প্রধান, যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান প্রধান, (৪) সন্ধিসমবায়ে সমবায়ী রাষ্ট্রগুলি প্রত্যেকে নিজের অভিভাবক, যুক্তরাষ্ট্রে বিচারালয় অভিভাবক, (৫) সমবায়ী রাষ্ট্রের জনগণের ওপর সন্ধিসমবায়ের প্রভাব পরোক্ষ, যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রভাব প্রত্যক্ষ, (৬) সমবায়ী রাষ্ট্রগুলি বিচ্ছিন্ন হতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রে পারে না, (৭) তাই যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় সন্ধিসমবায় স্বল্পায়ু, (৮) যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিনাগরিকত্ব থাকে, সন্ধিসমবায়ে থাকে না। কমনওয়েল্থ নাগরিকত্ব।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ—সাংগঠনিক অর্থে এক হলেও যুক্তরাষ্ট্রগুলির বিভিন্নতা দেখা যায়। বিভিন্নতার লক্ষণ—(১) ক্ষমতাবণ্টননীতি, (২) সাংবিধানিক প্রাধান্য রক্ষা, (৩) সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি, (৪) কার্যনির্বাহ প্রণালী। ফলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুরকমের যুক্তরাষ্ট্র দেখা যায়—মার্কিনী ও কানাডীয়। ক্ষমতাবণ্টন নিয়ে এই দুই যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য আছে, সাংবিধানিক প্রাধান্য রক্ষা নিয়েও এই দুই যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। আবার, সাংবিধানিক প্রাধান্য রক্ষা নিয়ে এবং সংবিধান সংশোধন ব্যবস্থা নিয়ে মার্কিন ও সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য। কার্যনিবাহপ্রণালী নিয়ে গঠিত হয় সমবায়িক বা সহ-সক্রিয় যুক্তরাষ্ট্র (ভারত)।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণ—(১) জাতীয় ও অঙ্গরাষ্ট্রীয় দুরকম আইন থাকার সার্থকতা, (২) ভারত ও রাশিয়ার মত বৈচিত্র্যময় দেশে এর সার্থকতা, (৩) সংবিধানের ব্যাপারে পরীক্ষানিরীক্ষা সহজ (ব্রাইস্), (৪) সরকার স্বৈরাচারী হতে পারে না (ব্রাইস্), (৫) বিপ্লবের সম্ভাবনা কম, (৬) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সুবিধা: সোবিয়েত রাশিয়া ও ভারতের নজির। (৭) অর্থনৈতিক শ্রমবিভাগের মত শ্রমবণ্টনের ও কর্মবণ্টনের সুবিধা, (৮) জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষালাভের সুযোগ বেশী, (৯) দুর্বল অঙ্গরাজ্যগুলির উন্নতি সম্ভব।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ত্রুটি: (১) ক্ষমতার ভারসাম্যরক্ষা করা কঠিন: কেন্দ্র-অঙ্গরাজ্য লড়াইয়ের সম্ভাবনা, (২) বিরোধ ছাড়াও নীতিনির্ধারণে বিলম্ব, শাসনকার্যে জটিলতা, (৩) প্রশাসনে মন্থরতা, শৈথিল্য, (৪) অনমনীয় শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয়, (৫) কেন্দ্রবিরোধিতার জন্য শেষে বিচ্ছিন্নতা, (৬) আইনজীবীদের প্রাধান্য, (৭) আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনে অসুবিধা, (৮) আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও কেন্দ্র-রাজ্যের বিরোধের সম্ভাবনা, (৯) কেন্দ্র বা অঙ্গরাজ্য যে কেউ অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজের অপদার্থতা ঢাকতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের শর্ত : (১) জন্ স্টুয়ার্ট মিলের মতে দরকার ঐক্য ও সংহতির বোধ, (২) ভৌগোলিক সামীপ্য, (৩) রাষ্ট্র ও জাতির সীমারেখার অভিন্নতা, (৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চ কক্ষে অঙ্গরাজ্যগুলির সমপ্রতিনিধিত্ব, (৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের নিরপেক্ষতা, (৬) অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে আয়তন, জনসংখ্যা ও সম্পদের ক্ষেত্রে সমতা, (৭) দ্বৈতনাগরিকত্ব ও নাগরিক সচেতনতা : সুইজারল্যান্ড : র‍্যাপার্ডের ব্যাখ্যা, (৮) অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বন্ধুত্ব, (৯) রাজনৈতিক দলগুলির সহমর্মিতা।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে সাংগঠনিক পার্থক্য হল : (১) এককেন্দ্রিক সরকারে শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ; (২) এককেন্দ্রিক সংবিধান লিখিত বা অলিখিত, নমনীয় বা অনমনীয় হতে পারে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান সর্বদাই লিখিত ও অনমনীয় ; (৩) যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা ও শাসনক্ষমতা বণ্টিত, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে তা নেই।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য হল—(১) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বৈচিত্র্যময় দেশে অধিকতর প্রযোজ্য ; (২) এককেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্র-অঙ্গরাজ্যের মধ্যে কর্মবিভাজন নেই, যুক্তরাষ্ট্রে আছে, (৩) এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে দ্বৈতনাগরিকত্ব নেই, যুক্তরাষ্ট্রে থাকে।

উপসংহার : (ক) সব সরকারই আপেক্ষিক। এই আপেক্ষিকতার সূত্র ধরে বলা যায়—আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্তমান যুগ যুক্তরাষ্ট্রের যুগ। (খ) হুয়্যার বলেন—আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রগুলি কেন্দ্রপ্রবণ ; কারণ—(১) জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্যসূচী বিস্তৃত ; (২) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার তাগিদ ; (৩) নিত্যব্যবহার্য বস্তুর জন্য চাপ ; (৪) সামরিক প্রয়োজন। (গ) বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রই বিশ্বশান্তির রক্ষক (ল্যাস্কি)।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য—(১) লিখিত সংবিধানের ঝোঁক অনমনীয়তার দিকেই, (২) কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে তিনটি তালিকার দ্বারা ক্ষমতাবণ্টন : কেন্দ্রীয়, যুগ্ম ও আঞ্চলিক তালিকা, (৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ক্ষমতা।

ভারতে আইনপ্রণয়ন ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রপ্রবণতা।

আইনপ্রণয়ন ক্ষেত্রে (১) কেন্দ্রীয় তালিকা ও যুগ্ম তালিকার বিস্তৃতি (২) যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ, (৩) উদ্বৃত্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের, (৪) আঞ্চলিক তালিকাভুক্ত বিষয়েও কেন্দ্রের আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা, (৫) জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রের বিশেষ ক্ষমতা লাভ।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে : [১] কেন্দ্রীয় আইনের বাধ্যতা, (২) রেলপথ প্রভৃতির ওপর কেন্দ্রের কর্তৃত্ব, [৩] রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যপাল, বিচারপতি ইত্যাদি নিয়োগের মারফত কেন্দ্রীয় প্রাধান্য, (৪) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা, (৫) রাজ্যের উচ্চতম কর্মচারীরা কেন্দ্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, (৬) আন্তঃরাজ্য বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সালিশী।

গণপরিষদ ভারতকে কেন কেন্দ্রপ্রবণ করেছেন—[ক] তাৎক্ষণিক কারণ—দেশবিভাগের পর সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, জাতিভেদ দমন। [খ] ঐতিহ্যগত কারণ—ইংরেজযুগ পর্যন্ত ভারতে কেন্দ্রপ্রবণতার ঝোঁক। বিরোধী দলগুলির বিকল্প কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে শোচনীয় ব্যর্থতা। কেন্দ্রে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। [গ] হুয়্যারের ব্যাখ্যায় আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রগুলি কেন্দ্রপ্রবণ।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতামূলক, সমবায়িক।

সংসদীয় গণতন্ত্র : ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভা-পরিচালিত, দায়িত্বশীল সরকারের তাৎপর্য—জেনিংসের মতে এর বিশেষ লক্ষণ : দায়িত্বশীলতা। তাঁর মতে এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য।

সংসদীয় গণতন্ত্রের গুণ : (১) মন্ত্রিসভা ও আইনসভার মধ্যে জৈবিক ঐক্য (বেজহট) ; (২) বিরোধী দল থাকায় মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে, (৩) শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তন সম্ভব, (৪) শাসনব্যবস্থা সব অবস্থায় নমনীয়—দুটি বিশ্বযুদ্ধের সময়েই ইংলণ্ডে সর্বদলীয় জাতীয় মন্ত্রিসভা গড়ে ওঠে, (৫) মন্ত্রিগণ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, তাই তাঁরা জনগণের আশা-আকাঙ্খা সম্বন্ধে সজাগ থাকতে পারেন, (৬) বিরোধী দলের দাপটে সরকার সৎ, দক্ষ, তৎপর হতে বাধ্য—ইংলণ্ডের নজির, (৭) মন্ত্রিসভার কাজকর্ম প্রকাশ্য ও গণমাধ্যমগুলির দ্বারা প্রচারিত : ফলে জনমত গঠন ও জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষালাভ সহজ, (৮) নানা নিয়ন্ত্রণের ফলে সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না।

সংসদীয় ব্যবস্থার ত্রুটি -(১) মন্ত্রিসভার মারফত ক্ষমতার কেন্দ্রাভিমুখিতা, তার কারণ—প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব। তিনি আইনসভা ভেঙ্গে পুনর্নির্বাচন ডাকলে তা ব্যয়বহুল। অনিশ্চিত নির্বাচনের সম্মুখীন হতে বিধায়কগণের অনিচ্ছা; আমলাদের প্রাধান্য; ফলে মন্ত্রিসভার স্বৈরাচার, "নব্য স্বেচ্ছাচার।" (লর্ড হিউয়ার্ট); (২) আমলাতন্ত্রের প্রাধান্যের কারণ, (৩) মার্কসবাদীদের ব্যাখ্যায় সংসদীয় গণতন্ত্রে বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্তৃত্ব। (৪) রাজনৈতিক দলাদলির ঝোঁক। (৫) মন্ত্রিদের মধ্যে সংহতির অভাব থাকলে ভবিষ্যৎ খারাপ: বহুদলীয় কোয়ালিসনের অভিজ্ঞতা, (৬) মন্ত্রিগণ বিলাসী, অহংকারী, অকর্মণ্য ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, অথচ গদি ছাড়তে নারাজ, (৭) ঘন ঘন মন্ত্রিসভা পাল্টালে শাসনতন্ত্রের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়।

সরকারের অপেক্ষিকতার ফলে সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্য শর্তসাপেক্ষ। শর্তগুলি—(১) এ ধরনের ঐতিহ্য থাকা, (২) সুগঠিত দলব্যবস্থা, (৩) ধনিকতন্ত্রে পর্যবসিত না হওয়া। পার্লামেন্ট যেন "শুয়োরের খোঁয়াড়" না হয়, (৪) বিধায়কদের দায়িত্ববোধ, অশিষ্ট আচরণ বর্জন; সংসদে স্পীকারের ব্যক্তিত্ব ও নিরপেক্ষতা, (৫) বিরোধী দলগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতনতা। (৬) গণমত প্রকাশের মাধ্যমগুলি স্বশাসিত রাখার ব্যবস্থা; ইংলণ্ডের বি বি সি র নজির, (৭) দারিদ্র্য দূরীকরণ, নির্বাচনে কারচুপি বা রিগিং, ভুয়া ভোট ইত্যাদি দুর্নীতিরোধ, (৯) দেশপ্রেম, ত্যাগ, ধৈর্য প্রভৃতি মূল্যবোধের আবশ্যকতা: মন্ত্রী ও বিধায়কগণ যেন দলবাজ, অহংকারী, বিলাসী না হয়ে পড়েন। সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যর্থতা মানেই ফ্যাসিবাদের পদক্ষেপ।

রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—(১) ক্ষমতাবিভাজন নীতি—মার্কিন রাষ্ট্রপতির নজির—মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও তাঁর "ক্যাবিনেট,"—এই "ক্যাবিনেটের" সভ্যগণ আইনসভার সভ্য নন, রাষ্ট্রপতির অধস্তন সচিবমাত্র। (২) বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য, (৩) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিধায়কগণ রাষ্ট্রপতির দলের নাও হতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের গুণ—(১) দীর্ঘস্থায়িত্ব, (২) ক্ষমতাবিভাজনের ফলে সরকারের বিভাগগুলি স্বাধীন; (৩) ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনের ফলে জরুরী অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ: ২য় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ও যুদ্ধকালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের ও ট্রুম্যানের নেতৃত্ব. (৪) রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে স্বাধীন, দলনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা গঠন সম্ভব। (৫) যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে উপযোগী।

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের দোষ—(১) ক্ষমতাবিভাজন নীতির অপব্যবহারের সম্ভাবনা। (২) ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, (৩) আইনসভার নিয়ন্ত্রণ না থাকার প্রশাসনে দায়িত্ব নির্ণয়ের অসুবিধা, (৪) আইনসভার ভূমিকা গৌণ: ফলে সুশাসন বিঘ্নিত, (৫) আইনসভার উপ-সমিতিগুলির আইনপ্রণয়ন: তার ত্রুটি।

মন্ত্রিসভাচালিত বনাম রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার—সব সরকারই আপেক্ষিক; ব্রাইসের মতে ক্যাবিনেট-ব্যবস্থা বেশী দায়িত্বশীল, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার বেশী স্থিতিশীল। দায়িত্বশীলতার গুণ ও দলাদলির দোষ—দুই গুণাগুণ নিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র। স্থিতিশীলতার গুণ ও আইনসভার সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনাজনিত দোষ—দুই নিয়ে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার। বিশেষ কারণে ইংলণ্ডে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যথাক্রমে সংসদীয় গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার সফল হয়েছে।

ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভাচালিত শাসনব্যবস্থার সাফল্যের কারণ—(১) সেখানে নানা প্রথার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ঐক্যের উদ্ভব। (২) সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতা, (৩) জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের সাফল্যের কারণ: (১) সংবিধান লিখিত হলেও কিছু কিছু প্রথা গড়ে উঠেছে: ফলে ক্ষমতাবিভাজন নীতির কঠিন কাঠামোর বাইরে শাসনবিভাগ ও আইনসভার মধ্যে জৈবিক ঐক্য স্থাপিত। (২) ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সনের বিচার ও পদচ্যুতি। মার্কিন রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না।

মন্ত্রিসভাচালিত ও রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয়ের সম্ভাবনা; সুইজারল্যাণ্ডের নজির।

র‍্যাপার্ডের মতে সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার সাফল্যের কারণ: (১) ছোট দেশ, অল্প জনসংখ্যা, (২) অধিবাসীদের দেশপ্রেম, জাতীয়তা, গণতান্ত্রিকতা ইত্যাদি মূল্যবোধ, (৩) আন্তর্জাতিক প্রভাব—সুইজারল্যাণ্ড চিরনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

সারাংশ

ভারতীয় শাসনব্যবস্থা মন্ত্রিসভাচালিত না রাষ্ট্রপতি-শাসিত ?—রাষ্ট্রপতির নানাবিধ ক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি ইংলণ্ডের রাজমুকুটের মত নিয়মতান্ত্রিক শাসক। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে কার্যতঃ ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত (আম্বেদকার ও দুর্গাদাস বসু)। দু-দেশেই সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত, ইংলণ্ডে এককেন্দ্রিক সরকার ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র রয়েছে, ভারতে যুক্তরাষ্ট্র ও প্রজাতন্ত্র। আবার, সুইজার-ল্যাণ্ডের মত ভারতেও রাষ্ট্রপতিশাসিত ও মন্ত্রিসভাচালিত সরকারব্যবস্থার সমন্বয় হয়েছে। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক ব্যবস্থান্বয়ের সমন্বয়।

ভারতে নাকি জগাখিচুড়ি মিশ্র শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। কারণ, (১) ভারতে শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব। কিন্তু এজন্য বিরোধী দলগুলিই দায়ী, শাসনব্যবস্থা দায়ী, নয়। (২) রাষ্ট্রপতি নামসর্বস্ব শাসক নন। কিন্তু অন্যান্য গণতন্ত্রের মত তিনি সব ক্ষমতাই মন্ত্রিসভার নির্দেশে প্রয়োগ করেন। (৩) ভারতীয়দের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি অসার। কিন্তু স্বাধীন, নিরপেক্ষ বিচারালয় এগুলির রক্ষক। বিরোধী দলগুলি "সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কাঠামোর" মধ্যেও সংসদীয় গণতন্ত্রের অংশীদার। সুতরাং নানা বাধাবিঘ্ন, সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র মিশ্র শাসনতন্ত্ররূপে সফল।

রাজতন্ত্র—আরিস্টটল, ম্যালিনাওস্কি, লোওভি প্রভৃতির মতে রাজতন্ত্র সামাজিক বিবর্তনের একটি স্তর। রাজতন্ত্র ৩ প্রকার ঃ চরম, নির্বাচিত ও সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রের বিবর্তনে জাতীয়তাবাদের ভূমিকা। নেপাল ও ভুটানে চরম রাজতন্ত্র প্রচলিত, ইংলণ্ডে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র। প্রাচীন ভারতে ও রোমে নির্বাচিত রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল।

চরম রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—(১) বংশানুক্রমিকতা, (২) রাজার হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, (৩) রাজার হুকুমই আইন, (৪) জনগণের অধিকার না থাকা, (৫) রাজার কথায়, "তিনিই রাষ্ট্র," (৬) রাজা ঈশ্বরের দূত।

চরম রাজতন্ত্রের গুণ—(১) হবসের মতে রাজার স্বার্থ ও দেশের স্বার্থ অভিন্ন। (২) প্রজাপালক রাজা আদর্শতুল্য ; (৩) স্থায়ী শাসনব্যবস্থা, (৪) বিপ্লবের আতিশয্যের চেয়ে জনদরদী রাজাই কাম্য (কার্লাইল) ; (৫) রাজা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, (৬) সমাজতত্ত্ববিদদের মতে আদিম, অসভ্য মানুষকে চরম রাজতন্ত্র বাহুবল ও ধর্মের সাহায্যে সভ্য, ঐক্যবদ্ধ করেছিল, (৭) জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে চরম রাজতন্ত্রের অবদান (ব্রাইস) ; (৮) প্লেটো-কল্পিত দার্শনিক-রাজতন্ত্রের মারফত চরম রাজতন্ত্র নির্দলীয়, নিরপেক্ষ প্রশাসনের গ্যারাণ্টি, (৯) ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরম রাজতন্ত্রের আমলে রাজশক্তিই ছিল গণশক্তি।

চরম রাজতন্ত্রের দোষ—(১) রাজার স্বেচ্ছাচারিতা, (২) ব্যক্তিসর্বস্ব শাসনব্যবস্থায় চরম রাজতন্ত্র সীমাবদ্ধ, (৩) জন্ স্টুয়ার্ট মিলের মতে কার্লাইলের কল্পিত আদর্শ রাজা দুর্লভ, (৪) মিলের মতে প্রজাবৎসল রাজা নিজেই সব কিছু করে দিলে জনগণ রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ পাবেন কোথায় ? (৫) স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের আশ্রয়ে পারিষদ, স্তাবক, বিলাসীদের নিয়ে রাজসভা গড়ে ওঠে। মিশরের রাজা ফারুকের ও ইরানের শাহের নজির, (৬) চরম রাজতন্ত্রের সাফল্য অনিশ্চিত, আকস্মিক, (৭) রাজা সিদ্ধান্তগুলি জনগণের মাথায় চাপিয়ে দেন ; তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা নষ্ট হয়।

উপসংহার ঃ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রই নিরপেক্ষ শাসন কায়েম করতে পারে, চরম রাজতন্ত্র নয় (গ্লাডস্টোন, মাস্টারম্যান)।

নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ বা শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (ইংলণ্ড)।

সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ (১) রাজা বা রাণী নামসর্বস্ব শাসকমাত্র, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি-গণই ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী, (২) জনগণের নানা অধিকার, (৩) সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র এক ধরনের গণতন্ত্র।

সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের গুণ- (১) স্থায়িত্ব, (২) নিরপেক্ষতা, (৩) রাজমুকুট জাতীয় ঐক্য ও ঐতিহ্যের প্রতীক ঃ ইংলণ্ডের নজির।

সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের দোষ ঃ (১) বিলাসিতা, আড়ম্বর, চাটুকারিতার প্রাধান্য, (২) ব্যয়বাহুল্য, (৩) বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র সীমাবদ্ধ হলেও অগণতান্ত্রিক।

চরম ও সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের তুলনা—(১) চরম রাজতন্ত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে আসীন রাজা স্বেচ্ছাচারী, শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেও উত্তরাধিকারসূত্রে রাজা আসীন, কিন্তু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ প্রধান, (২) চরম রাজতন্ত্রে আইন প্রণয়ন ও পরিবর্তনে রাজার ভূমিকাই প্রধান ; নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে জনগণের ভূমিকাই প্রধান, (৩) চরম রাজতন্ত্রে জনগণের অধিকার থাকে না,

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে থাকে, (৪) চরম রাজতন্ত্রে রাজাই রাষ্ট্র, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতীকমাত্র, (৫) চরম রাজতন্ত্রে রাজার স্বৈরতা ধর্মীয় প্রধানত্বের সঙ্গে জড়িত, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে তা নয়।

প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ (১) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি রাষ্ট্রপ্রধান। (২) প্রজাতন্ত্র রাজতন্ত্রের বিপরীত রূপ, (৩) জনগণই শাসনক্ষমতার প্রকৃত উৎস, (৪) প্রজাতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য জনগণের সার্বিক কল্যাণসাধন (টমাস্ পেন্, ব্লুন্ট্শ্লি)। (৫) সার্বিক ভোটাধিকার ব্যবস্থা।

একক বা এককেন্দ্রিক প্রজাতন্ত্রে একজন ব্যক্তি শাসনতন্ত্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। যেমন— ভারত। একনায়কতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রেও তাই, তবে সেখানে প্রজাতন্ত্র অগণতান্ত্রিক। যেমন তুরস্ক।

অন্যান্য প্রজাতন্ত্র ঃ যৌথ প্রজাতন্ত্র (সুইজারল্যান্ড), জঙ্গী প্রজাতন্ত্র (পাকিস্তান, বাংলাদেশ), ধর্মভিত্তিক প্রজাতন্ত্র (পোপের ভ্যাটিকান সিটি, শ্রীলঙ্কা), ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র (ভারত), সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র (ভারত), অসার্বভৌম প্রজাতন্ত্র (পানামা), ভাষাভিত্তিক প্রজাতন্ত্র (সুইজারল্যান্ড), ভাষানিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র (ভারত)।

ইংলণ্ডে নাগরিকদের অধিকার স্বীকৃত, রাজা বা রাণী নামসর্বস্ব শাসক. নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণই মন্ত্রী হন ও ক্ষমতাবান্। এই প্রজাতান্ত্রিক গুণগুলি থাকলেও ইংলণ্ড্ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরূপে রাষ্ট্রপ্রধান। আইনসভা তাঁকে পদচ্যুত করতে পারে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রজাতন্ত্র।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ প্রস্তাবনায় তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ; (১) ভারতীয় প্রজাতন্ত্র খাঁটি গণতন্ত্র, (২) ধর্মনিরপেক্ষতা, (৩) সার্বভৌমত্ব, কমন্ওয়েল্থে অন্তর্ভুক্তি ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে না, (৪) সামগ্রিকতা ও অভিন্নতা ঃ ব্রিটিশ্ নর্থ্ আমেরিকা অ্যাক্টের প্রভাব, (৫) ভাষানিরপেক্ষতা, (৭)বিশুদ্ধতম প্রজাতান্ত্রিকতা ঃ প্রস্তাবনার মূল কথা হল—জনগণই সরকারের ক্ষমতার মূল উৎস।

৩ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

"The manhood of the individual is dignified by his political enfranchisement and he is usually raised to a higher level by the sense of duty which it throws upon him." —Lord Bryce

আরিস্টটল্ শাসনতন্ত্রের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন, তাতে গণতন্ত্রকে একটি বিকৃত শাসনব্যবস্থা বলে নিন্দা করেছেন। সে সময়ে গ্রীসে ছোট ছোট নগররাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। নাগরিকগণ নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হয়ে সরকারের নানাপ্রকার কার্য পরিচালনা করে তাঁদের নাগরিক দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু কার্যতঃ সভা-সমিতির মধ্যে কোন কোন গোষ্ঠীর নেতারা নাগরিকদের বক্তৃতার তরঙ্গে আন্দোলিত করার চেষ্টা করতেন। ফলে শান্ত ও নিরপেক্ষভাবে নাগরিকদের পক্ষে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে (Direct Democracy) অংশ গ্রহণ করা প্রায়ই অসম্ভব হয়ে উঠত। তাঁর সুবিখ্যাত বিপ্লবতত্ত্বে আরিষ্টটল্ বলেছেন যে উন্মত্ত জনতার দলপতির দ্বারা প্রভাবিত গণতন্ত্র পরে স্বৈরাচারতন্ত্রে পরিণত হয়। তাঁর আমলে গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলিতে নাগরিক অধিকার লাভ করতেন মুষ্টিমেয় লোক। তখন শারীরিক পরিশ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নাগরিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য উন্নত মানসিকতার অধিকারী বলে বিবেচনা করা হত না। তাই গ্রীক গণতন্ত্রে কারিগর প্রভৃতি মেহনতী ব্যক্তিদের কোন নাগরিক অধিকার দেওয়া হত না। গ্রীসদেশে সে সময় ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। এই ক্রীতদাসগণও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন। নারীদেরও নাগরিক অধিকার ছিল না, যদিও প্রাচীন স্পার্টায় বিদেশে যুদ্ধরত পুরুষদের অনুপস্থিতিতে কার্যতঃ মহিলাগণই রাজকার্য পরিচালনা করতেন।

আরিস্টটল্ তখনকার গ্রীসের গণতন্ত্রে জনতার উন্মত্ততার নিন্দা করেন; তা ছাড়া তখন গ্রীসে কারিগর, দাস ও নারীগণ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে অংশ নিতেন না

আরিষ্টটলের যুগের পাশে আজকের যুগকে রাখলে এই দুটি সময়ে গণতন্ত্র সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার বা সক্রিয়ভাবে গণতন্ত্র পরিচালনার ব্যবস্থাগুলির মধ্যে অনেক তফাৎ দেখা যায়। **বর্তমানকালে গণতন্ত্র পরোক্ষ বা প্রতিনিধি-মূলক।** কারণ, রাষ্ট্রের জনসংখ্যা এবং আয়তন অনেক বেড়ে যাওয়ায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র পরিচালনা সম্ভব নয়। বর্তমানে তাই সাধারণ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ আইনসভায় প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেন, তাঁরাই মন্ত্রিসভা গঠন করে একাধারে আইনসভায় ও শাসনবিভাগে নেতৃত্ব দান করে থাকেন। দাসপ্রথা আজ অবলুপ্তপ্রায়।

আধুনিক গণতন্ত্র পরোক্ষ বা প্রতিনিধি-মূলক

১৯৪৮ সালে ইউনেস্কোর সভায় শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন কাঠামোগুলির মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তারই ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করার জন্য প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে, গণতান্ত্রিক ও গণতন্ত্রবিরোধী এই দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করে আধুনিক যুগে শাসনতন্ত্রের উৎকর্ষ বিচারের জন্য গণতন্ত্রকেই প্রধান মানদণ্ড হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। শাসনতন্ত্রটি গণতন্ত্রের আদর্শ মেনে চলে কিনা তাই হল শাসনতন্ত্রটির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচারের প্রধান ভিত্তি। সুতরাং গণতন্ত্রকে আজ শুধু শাসনতন্ত্রের একটা বিভাগ বলেই কল্পনা করা হয় না, শাসনতন্ত্রের দোষ-গুণ বিচারের অর্থাৎ শাসনতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ বিচারের মাপকাঠি বলেও একে ধরে নেওয়া হয়। শুধু তাই নয়। শিল্প, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি, ললিতকলা সব কিছুকেই আজ গণতান্ত্রিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয় এবং গণতন্ত্রের পথে আলোচ্যমান বিষয়টি কতটা অগ্রসর বা অনগ্রসর তা চিন্তা করে দেখা হয়। এক কথায় বলতে গেলে গণতন্ত্র বর্তমানে শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বা শাসনতন্ত্রের একটা মতাদর্শ বা শাসনব্যবস্থামাত্র নয়। গিডিংসের (Giddings) কথায়, গণতন্ত্র হল আধুনিক যুগের মানবজীবনকে, মানবসভ্যতাকে বিচার করবার একটা মূল্যবোধ। ব্যক্তিকে, রাষ্ট্রকে সমাজকে—সব কিছুকে বুঝে নেবার, চিনে নেবার একটা মূল্যবোধ হল গণতন্ত্র ("A Democracy may either be a form of State, of government, a form of society or a combination of all three......it is a set of values as well")।

ইউনেস্কো সভা (১৯৪৮) গণতন্ত্রকে শাসনব্যবস্থার মানদণ্ড বলে ঘোষণা করেছে—শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক না অগণতান্ত্রিক ?

॥ গণতান্ত্রিকতার ক্রমবিকাশ ॥

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং সাহিত্য সম্পর্কে প্রচুর গবেষণার ফলে গণতন্ত্রকে তখন কিভাবে আদর্শ শাসনব্যবস্থারূপে স্বীকার করে নেওয়া হত তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে সম্রাট্ সব সময় সভা এবং সমিতির পরামর্শে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য কতকগুলি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাতে বলা হয়—গণতন্ত্রকে পুরোপুরি সফল করে তুলতে হলে অভিজাততন্ত্রের কিছু আদর্শ তার মধ্যে রাখতে হবে। অর্থাৎ "গণ" যেন জ্ঞানী, গুণী, সাহসী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সব শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেন। বৌদ্ধযুগে মিথিলার বিদেহ বংশ এবং বৈশালীর লিচ্ছবিগণ গণতান্ত্রিক আদর্শ মেনে চলতেন। এঁদের মিলিতভাবে ভজ্জীয়ান বলা হত। বুদ্ধ তাঁর শিষ্য আনন্দকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ভজ্জীয়ানগণ যতদিন পর্যন্ত জনসমিতির পরামর্শে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন, ততদিন তাঁরা সঠিক আদর্শ পালন করবেন। তিনি আরও বলেন যে, এই শাসকগণ যেন প্রাজ্ঞ এবং সম্মাননীয়দের মান্য করে চলেন। বুদ্ধ এখানে গণতন্ত্রের একটি অবশ্যম্ভাবী ত্রুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

প্রাচীন ভারতে গণতান্ত্রিকতা ঃ মহাভারতের শান্তিপর্বের ও বুদ্ধের গণতান্ত্রিক নির্দেশ ; মিথিলা ও লিচ্ছবিদের নজির

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে সে সময় পূর্বে বৃজিক, লিচ্ছিবিক এবং মাল্যক বংশের, মধ্য ভারতে কুরু এবং পাঞ্চালদের, উত্তর-পশ্চিমে মাদ্রকদের এবং উত্তর ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে কাকুরদের মারফত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কৌটিল্য নিজে অবশ্য রাজাদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষের আবশ্যকতা অনুভব করতেন এবং এর মধ্য দিয়ে সম্রাট্‌কে যুদ্ধে জয়ী হয়ে সর্বশক্তিমান হবার উপায় খুঁজে বার করেন। মৌর্য যুগে এই পদ্ধতিতে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ফলে ভারতে গণতান্ত্রিক আদর্শ সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হয়। সমুদ্রগুপ্তের আমলেও যৌধেয়, মালব, অর্জুনায়ন, বৃষ্ণি প্রভৃতি বংশীয় রাজারা গণতন্ত্রের আদর্শ মেনে চলতেন। স্বৈরাচারী হূণদের আমলে প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্রের আদর্শ ধ্বংস হয়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সে যুগের ভারতে গণতন্ত্রের প্রচলনের নজির মেলে ; মৌর্যযুগে এককেন্দ্রিকতা ও হূণদের স্বৈরাচার অগণতান্ত্রিক ছিল

হোমার (Homer)-এর যুগে প্রাচীন গ্রীসে রাজতন্ত্র অক্ষম বিবেচিত হলে নির্বাচিত শাসকমণ্ডলীর দ্বারা শাসনকার্য চালান হত। সৎ বংশের নেতা অথবা বিত্তবান্ ব্যক্তিগণ এইভাবে নির্বাচিত হয়ে প্রধান শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। কোনও কোনও সময়ে তাঁরা স্বৈরাচারী হয়ে পড়তেন। তারপর দেখা দিত ছোট-খাট গণবিপ্লব। এর ফলে সাধারণ নাগরিকদের হাতে শাসন-হস্তান্তরিত হত। এইভাবে প্রাচীন গ্রীসে ক্রমে ক্রমে এক একটি নগররাষ্ট্রকে (City State) কেন্দ্র করে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের আবির্ভাব হল।

হোমারের যুগে অক্ষম রাজার বদলে উপযুক্ত জনপ্রতিনিধি রাষ্ট্রপ্রধান হতেন ; তাঁদের নজিরকে কেন্দ্র করে গ্রীসে পরে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সূচনা

গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে এথেন্সেই (Athens) গণতন্ত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে। এখানকার গণপরিষদ (Ecclesia) সার্বিকভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করত। পররাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক সবরকম সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই এই গণপরিষদের চূড়ান্ত অনুমোদন দরকার হত। নাগরিকদের গণপরিষদে উপস্থিত হবার জন্য সম্মান-দক্ষিণা দেবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু প্রায়ই দলাদলি এবং স্বার্থপরতার সংঘর্ষে লিপ্ত থাকার ফলে গণপরিষদের সদস্যগণ এথেন্সের গণতন্ত্রকে দীর্ঘস্থায়ী করে তুলতে সক্ষম হন নি। এথেন্সের, তথা সমগ্র গ্রীস্ দেশের, শ্রেষ্ঠ শাসক পেরিক্লিসের (Pericles) নেতৃত্বে এথেন্সীয় গণতন্ত্রে যে স্বর্ণযুগ দেখা দিয়েছিল, তা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে ম্লান হয়ে গেল।

গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে এথেন্সে পেরিক্লিসের আমলকে গ্রীক্ গণতন্ত্রের স্বর্ণযুগ বলা হয় ; ৪র্থ খ্রীষ্টাব্দে এ যুগের সমাপ্তি

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণের মতে গণতন্ত্রের পরবর্তী অনেক নীতি এথেন্সের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। গণপরিষদ চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হলেও এথেন্সে সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত এবং সম্মানিত হত। তবে বেরির (Bury) মতে এথেন্সের গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ ছিল তার নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা। বিচারবিভাগে জনগণের মধ্যে থেকে উপদেষ্টা থাকতেন। অনেক সময় তাঁদের ইচ্ছা বিচারকদের সিদ্ধান্তের ওপরে স্থান পেত। পরবর্তী-কালে গণতান্ত্রিক বিচারব্যবস্থায় জুরি প্রথা (Trial by Jury) এইভাবে গড়ে ওঠে।

বেরির মতে জুরিদের মাধ্যমে বিচারের মত গণতন্ত্রের পরবর্তী বহু সুব্যবস্থা এথেন্সীয়

প্রাচীন গ্রীসের মত রোমেও প্রথমে রাজতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে বিত্তবান্‌গণ (Patricians) ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। এইভাবেই রোমক রাজতন্ত্র অভিজাততন্ত্রে পরিণত হয়। তারপর চলে সাধারণদের (Plebeians) সঙ্গে বিত্তবান্‌দের সুদীর্ঘ ক্ষমতার লড়াই। শেষে এর পরিণতিরূপে নাগরিকগণ সকলেই সমান অধিকার লাভের যোগ্যতা অর্জন করলেন। যে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল, তাতে তিনটি শক্তির সমন্বয় দেখা গেল—রাজতান্ত্রিক শক্তির প্রকাশক ছিলেন প্রতি বৎসর নির্বাচিত দুজন শাসক (Consul) ; অভিজাততান্ত্রিক শক্তির প্রকাশক ছিলেন জ্ঞানী-গুণীদের সেনেট্ সভা (Senate) ; গণতান্ত্রিক শক্তির প্রকাশক ছিলেন জমির মালিকানার ভিত্তিতে বিভক্ত তিন শ্রেণীর ব্যক্তি-বর্গ। ফলে এই ত্রিবিধ শাসনব্যবস্থা কার্যতঃ সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ছিল না।

প্রাচীন রোমে পরাজিত বিত্তবান্‌দের (Patricians) কাছ থেকে অবশেষে সাধারণগণের (Plebeians) ক্ষমতা দখল ঃ কন্সাল, সেনেট্ ও জমির মালিকদের নিয়ে রোমের ত্রিবিধ শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ছিল না

এই প্রসঙ্গে এথেন্সীয় এবং রোমক গণতন্ত্রের মধ্যে একটা তুলনা করা যেতে পারে। রোমকগণ বেশীর ভাগ ছিলেন কৃষিজীবী। তাই তাঁরা সক্রিয়ভাবে শাসন পরিচালনার ব্যাপারে সময় পেতেন না, তাঁদের এতে তেমন উৎসাহও ছিল না। তাঁরা শুধু তাঁদের প্রতিনিধিবর্গ নির্বাচন করে, মাঝে মাঝে আইনপ্রণয়ন সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করে সন্তুষ্ট থাকতেন। ফলে সেনেট্ তাঁদের আস্থাভাজন হয়ে পড়ে এবং গণতন্ত্রের চেয়ে অভিজাততন্ত্রের প্রভাবই রোমক প্রজাতন্ত্রে সবচেয়ে বেশী দেখা দেয়। ক্রমে রোমক প্রজাতন্ত্র রোমক সাম্রাজ্যের প্রসারের ফলে তার মৌল গণতান্ত্রিক সত্তা আর বজায় রাখতে পারল না। আসলে রোমের প্রজাদের শাসনপরিচালনার ব্যাপারে অংশীদার করে রাখতে গেলে রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্য দেশগুলি থেকেও রোমক আইনসভায় প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার দিতে হত। রোমক সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসকমণ্ডলী শেষ পর্যন্ত এ ব্যবস্থা মেনে নিতে পারেন নি। রোমক প্রজাতন্ত্র তাই উপনিবেশভিত্তিক সাম্রাজ্য হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এথেন্সীয় গণতন্ত্রের পতনের প্রধান কারণ হল জনগণের নিজেদের দুর্বলতা, অযোগ্যতা এবং স্বার্থপরতা। নাগরিকরা প্রায়ই শাসনতন্ত্রের খুঁটিনাটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন। ফলে দীর্ঘদিন ধরে কোনও ভাল শাসননীতি অনুসরণ করা সম্ভব হত না। উপরন্তু এথেন্সের সঙ্গে অন্য গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলির, বিশেষ করে স্পার্টার (Sparta) বিরোধ লেগেই থাকত। সুতরাং এথেন্সীয় গণতন্ত্র সংরক্ষণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। লর্ড্ ব্রাইস্ মন্তব্য করেছেন যে, এথেন্সের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এমন অদ্ভুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগের জন্য প্রায়ই ফাটকার (Lottery) ব্যবস্থা করা হত। শুধু সামরিক ক্ষেত্রেই সামরিক দক্ষতার ভিত্তিতে সৈনিক নিযুক্ত হত, অন্যান্য ক্ষেত্রে ভাগ্যের জোরে এক একটি সরকারী পদ কখনও বা অযোগ্য, কখনও বা কিছুটা যোগ্য কর্মীর হাতে পড়ত।

গ্রীসে এথেন্স-স্পার্টা লড়াই ছাড়াও নাগরিকদের যথেষ্ট হস্তক্ষেপ, দায়িত্বপূর্ণ পদে ফাটকাবাজির ফলে অযোগ্যের অনুপ্রবেশ গণতন্ত্রের পতন ঘটালো ; রোম গণতন্ত্রের বদলে সাম্রাজ্যবাদী হয়ে পড়ল

উড্রো উইলসন্ গ্রীক গণতন্ত্রের পর্যালোচনা করে বলেছেন যে, এই গণতন্ত্রে দাসপ্রথা প্রচলিত থাকায় এর ভিত্তি ছিল শিথিল। শুধু এথেন্সেই তাঁর হিসাবে নাগরিকের তুলনায় ক্রীতদাসের সংখ্যা দ্বিগুণ ছিল। অবশ্য বার্কার মনে করেন যে, প্রত্যেক নাগরিকই ক্রীতদাসের মালিক ছিলেন না। আরিস্টটল্ মন্তব্য করেছেন যে, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র নাগরিকগণ পত্নী কিংবা সন্তানের সাহায্যে কায়িক শ্রমের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করতেন। সুতরাং এ কথা ঠিক নয় যে এথেন্সের নাগরিকশ্রেণীর সকলকেই শ্রমিকরা কায়িক শ্রমের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে রাজনীতি চর্চায় মনোনিবেশ করার মত অখণ্ড অবসর দানে সাহায্য করতেন। অর্থাৎ এথেন্সীয় গণতন্ত্র পুরোপুরি শ্রমবিমুক্ত অভিজাতবর্গের অবসর-বিনোদনের ফলশ্রুতি ছিল না।

গ্রীক গণতন্ত্রে দাসপ্রথার জন্য অগণতান্ত্রিকতা : এ বিষয়ে আরিস্টটল্, উড্রো উইল্সন্ ও বার্কারের বক্তব্য

আধুনিক গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের আয়তন এবং জনসংখ্যা সাধারণতঃ গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলির আয়তন এবং জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। তা ছাড়া পূর্বের গণতন্ত্রগুলিতে সর্বত্রই এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত ছিল। স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে কোনপ্রকার সরকার গড়ে উঠতে পারে নি। হিন্দুযুগের গণতন্ত্রে রাজা সার্বভৌম শক্তির ব্যক্তিগত ধারক ও বাহকরূপে পূজিত হতেন। তাই সেই গণতন্ত্রগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের মত ছিল, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে প্রজাতন্ত্র ছিল না। প্রাচীন গণতন্ত্রে আইনসভা, শাসনপরিষদ এবং বিচারবিভাগের মধ্যে ক্ষমতা-বিভাজন নীতি অনুসরণ করা হত না। আরিষ্টটল্ এই নীতি সমর্থন করেন বটে, কিন্তু এই নীতি সরকারের তিনটি বিভাগের প্রত্যেকটির কার্যকলাপ অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পাদনের সহায়ক বলেই তিনি এটি সমর্থন করেন, ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি এটি সমর্থন করেন নি। প্রাচীন গণতন্ত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যে সেখানে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। গ্রীক সাহিত্যে অবশ্য হাটেবাজারে নাগরিকদের এক একটি গোষ্ঠীর নেতাদের (Demos) চীৎকার, উত্তেজনা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। কিন্তু এই গোষ্ঠীগুলির নেতারা সুগঠিত এবং সংঘবদ্ধ বর্তমান গণতন্ত্রের রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দের তুল্য ছিলেন না। গ্রীকযুগে নাগরিকদের রাষ্ট্রের প্রাধান্য মেনে চলার জন্য শিক্ষা দেওয়া হত।

প্রাচীন গ্রীকো-রোমান্ ও হিন্দুযুগের গণতান্ত্রিকতার তুলনা ও সীমাবদ্ধতা : ক্ষমতা-বিভাজন, দলব্যবস্থা ছিল না ; হিন্দুযুগে প্রজাতন্ত্রের বদলে ছিল নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, গ্রীকযুগে প্রকাশ্যে দেখা যেত গণ-উন্মত্ততা

প্রাচীনকালে রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত ছিল, তা হল এই যে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই যেন নাগরিকদের জীবন উৎসর্গীকৃত। বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ এর ঠিক উল্টো। আজকের গণতন্ত্রে নাগরিকদের জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়ার পক্ষে প্রবণতা দেখা যায়। প্রজাদের সুখে রাজার সুখ, প্রজাদের মঙ্গলে রাজার মঙ্গল ("প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ, প্রজানাঞ্চ হিতে হিতম্") এই বাণী মহাভারতে গণতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি রূপে স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু শাসনতন্ত্রের ফলিত ক্ষেত্রে এই নীতি কার্যকর করে তোলার জন্য তেমন বিস্তৃত ব্যবস্থা

গৃহীত হয় নি। আধুনিক গণতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) এবং সমাজতন্ত্রবাদের (Socialism) মধ্যে পারস্পরিক নীতিগত দ্বন্দ্ব দূর করার উদ্দেশ্যেই যেন এই দুই নীতির ব্যবহারিক সুফলগুলির সমন্বয়ের ওপর গড়ে উঠেছে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের (Welfare State) নীতি। তাই ইংলণ্ড, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সমাজতন্ত্রবাদের মূল নীতি হিসাবে রাষ্ট্র সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য ও ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠাকে মূল আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। আবার রাষ্ট্র নাগরিক অধিকারগুলি সাগ্রহে সংরক্ষণের চেষ্টা করে, স্বাধীন ও সাধারণ নির্বাচনী ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত আইনসভার মারফত শাসননীতি নির্ধারণের ব্যবস্থা করে থাকে। **প্রাচীন গণতন্ত্র ছিল রাষ্ট্রিক। আধুনিক গণতন্ত্র হল ব্যক্তিক।**

প্রাচীন ও আধুনিক গণতন্ত্রের তুলনা: প্রাচীন গণতন্ত্র ছিল রাষ্ট্রিক, আধুনিক গণতন্ত্র হল ব্যক্তিক—আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে এ দুটি নীতির সমন্বয় হয়েছে

আধুনিক গণতন্ত্রের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা সুদীর্ঘকাল ধরে মানবজাতির ইতিহাসের ক্রমিক বিবর্তনের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যযুগে রাজতন্ত্র, যাজকতন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্রের সম্মিলিত চাপে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলিতে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিতে লাগল। হব্‌স্, লক্ ও রুশোর দ্বারা সমর্থিত সামাজিক চুক্তি মতবাদে রাষ্ট্রগঠনের পেছনে জনগণের সক্রিয় ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হল। ইংলণ্ডে ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের ফলে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রবর্তিত হল। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে মার্কিন উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করল। ফরাসী দেশে ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে জনগণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ চরম রাষ্ট্রবিপ্লবের আকার ধারণ করল। এই বিপ্লব সফল হবার পর সেখানে সর্বপ্রথম প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল।

গণতন্ত্রের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ক্রমবিবর্তনের ফল; রাজতন্ত্র, যাজকতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের সংঘাত; চুক্তিবাদের প্রভাব; ইংলণ্ডে, মার্কিন উপনিবেশগুলিতে ও ফ্রান্সে রাজনৈতিক বিপ্লব

শিল্পবিপ্লবের (Industrial Revolution) ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সামন্ততন্ত্রের (Feudalism) অবলুপ্তি ও যন্ত্রযুগের সূত্রপাত ঘটল। যন্ত্রের সাহায্যে কম খরচে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হল। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দেখা দিল পুঁজিবাদের (Capitalism) উদ্ভবের মধ্য দিয়ে। কলকারখানায় পুঁজিপতি-শিল্পপতিগণের চরম শ্রেণীস্বার্থপরতা ও কঠোর শ্রমিকদমন নীতির ফলশ্রুতি হিসাবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধ মতবাদরূপে সমাজতন্ত্রবাদ জন্ম নিল। মার্ক্স্ প্রমুখ সমাজতন্ত্রবাদী নেতৃবৃন্দের রচনায় মেহনতী জনতার স্বাধিকারের পক্ষে বিপ্লবাত্মক মতাদর্শ ঘোষিত হল। এরই পরিণতি হিসাবে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ার জনগণ স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে সফল করে তুলল। জারতন্ত্রের পতনের পর সাম্যবাদী সোবিয়েত রাশিয়ার জন্ম হল। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে

আধুনিক গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক বিপ্লবের ফল: শিল্পবিপ্লব, সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব, রুশ সাম্যবাদী বিপ্লব, চীনের জনগণতন্ত্র —এ সবই গণতন্ত্রকে কায়েম করার জন্য মেহনতী মানুষের অক্লান্ত প্রচেষ্টার নিদর্শন

চীনা প্রজাতন্ত্রেও সাম্যবাদী সরকার কায়েম হল। সমাজতন্ত্রবাদের এ ধরনের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বর্তমানে জনগণতন্ত্রের (People's Democracy) প্রবক্তারা মনে করেন যে, নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষিত হলেই মেহনতী জনতার স্বরাজরূপে গণতন্ত্র সত্যিই সফল হয়ে ওঠে। সমাজতন্ত্রেই তা সম্ভব। তাই প্রকৃত গণতন্ত্র হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র।

॥ গণতন্ত্রের কয়েকটি ধ্রুপদী সংজ্ঞা ॥

সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস্ (Herodotus) বলেন যে, সমাজে সকলের হাতে শাসনপরিচালনার ভার থাকলে তাকে গণতন্ত্র বলে। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এথেন্সের সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী, সেনাপতি এবং রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিস্ স্পার্টার সঙ্গে এথেন্সের সুদীর্ঘ পিলোপোনেশীয় যুদ্ধে (Peloponnesian War) নিহত এথেন্সীয় বীরগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে প্রদত্ত তাঁর সুবিখ্যাত ভাষণে (Funeral oration) এথেন্সীয় গণতন্ত্রকে সাম্য ও স্বাধীনতার শাসনতন্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন। সেখানে দেশের সকলের হাতেই শাসনক্ষমতা ন্যস্ত, সেখানে সকলে সমান ন্যায়বিচার ভোগ করার অধিকারী এবং শুধু ব্যক্তিগত গুণের জোরেই সেখানে ব্যক্তি পদমর্যাদা লাভের অধিকারী। স্বাধীনতাকে তিনি গণতন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ বলে বর্ণনা করেন। দৈনন্দিন কাজকর্মে হোক্, রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেই হোক্, গণতন্ত্রের নাগরিকগণ এই স্বাধীনতার আদর্শকেই মেনে চলবেন। পেরিক্লিসের মতে, মাননীয় ব্যক্তিগণ এ শাসনব্যবস্থায় সম্মানিত হন, সৌন্দর্যপ্রীতি, প্রেম, সহানুভূতি গণতান্ত্রিক নাগরিকদের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি করে।

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাসের মতে গণতন্ত্রে জনগণ শাসন পরিচালনা করেন; পেরিক্লিসের সুবিখ্যাত অন্ত্যেষ্টিভাষণ ঃ গণতন্ত্র হল সাম্য ও স্বাধীনতার শাসন

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাকামী দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির পরাজয়ের পর সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় জনগণের কাছে রাষ্ট্রপতি অ্যাব্রাহাম্ লিঙ্কন্ (Abraham Lincoln) তাঁর সুবিখ্যাত গেটিস্বার্গের ভাষণে (Gettysburg speech) আততায়ীর হাতে নিহত হবার কিছুকাল আগে গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তা-ই বিশ্ববন্দিত। তাঁর মতে গণতন্ত্র হল জনগণের, জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা ("Government of the people, for the people, by the people")। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিখ্যাত দেশসেবক বিধানচন্দ্র রায় তাঁর একটি বক্তৃতায় গণতন্ত্রের প্রকৃতিনির্ণয় প্রসঙ্গে লিঙ্কনের সংজ্ঞায় প্রদত্ত বাক্যাংশের সঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্যাংশ যোগ করেন। তার ফলে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দাঁড়াল—জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা এবং জনগণকে নিয়ে শাসনতন্ত্রই হল গণতন্ত্র ("Government of the people, for the people, by the people, with the people")। বিধানচন্দ্রের মতে এই অতিরিক্ত বাক্য সংযোজনের প্রয়োজন

কিন্তু ঘাতকের হাতে নিহত হবার পূর্বে মার্কিন রাষ্ট্রপতি অ্যাব্রাহাম্ লিংকনের চিরস্মরণীয় গেটিস্বার্গ ভাষণে প্রদত্ত সংজ্ঞাই গণতন্ত্রের সুবিখ্যাত সংজ্ঞা—জনগণের, জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাই গণতন্ত্র; ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এর সঙ্গে "জনগণকে নিয়ে" এই বাক্যাংশ যোগ করেন

গণতন্ত্রকে সর্বতোভাবে ব্যাপক গণসংগঠন করে তোলার জন্য, পঞ্চায়ত প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতের মত দেশে একে সম্পূর্ণভাবে গ্রামভিত্তিক করে তোলার উদ্দেশ্যে।

গণতন্ত্র সম্বন্ধে লিঙ্কনের উক্তিটি আজ প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। এই সংজ্ঞার দ্বারা তিনি গণতন্ত্রের তিনটি দিকের উপর জোর দিয়েছেন। প্রথমতঃ, গণতন্ত্রকে তিনি জনগণের শাসনতন্ত্র বলে অভিনন্দিত করেছেন। এর অর্থ হল এই যে, গণতন্ত্র সর্বসাধারণের অধিকারভুক্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত শাসনব্যবস্থা। অর্থাৎ জনগণের স্বাধিকারই গণতন্ত্রের মূল উৎস। দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্রকে জনগণের জন্য স্থাপিত শাসনপ্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করার প্রধান অর্থই হল এই শাসনতন্ত্রটির প্রধান উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা। অর্থাৎ গণতন্ত্র এমনই একটি শাসনব্যবস্থা যার উদ্দেশ্য হল সমস্ত জনসমষ্টির কল্যাণ সাধন। তৃতীয়তঃ, যদি জনসাধারণের প্রকৃত কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্য শাসনতন্ত্রে রূপায়িত করতে হয়, তা হলে তা জনগণের সাহায্য ছাড়া সম্পাদিত করা যায় না। তাই গণতন্ত্রকে লিঙ্কন্ জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। যেখানে জনগণ বা তাদের প্রতিনিধিরা শাসনকার্য পরিচালনা করে না, সেখানে স্থায়ীভাবে তাদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না। অতএব, গণতন্ত্রের মূল কথাই হল লোকায়ত সরকার (People's Government)। গণতন্ত্র এমন এক শাসনব্যবস্থা যার নিয়ন্ত্রণের ভার সমস্ত জনসমষ্টির ওপর ন্যস্ত, যার ওপর সমস্ত জনগণের স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত।

লিঙ্কনের সংজ্ঞার ব্যাখ্যা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ প্রবক্তা জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ (John Stuart Mill) গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতে তিনি বলেছেন যে, আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা এত বেশী যে, সমগ্র জনসংখ্যার পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রপরিচালনার ভার গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা বাস্তবিক পক্ষে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক বা সংসদীয় গণতন্ত্রের (Indirect বা Representative বা Parliamentary Democracy) সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞা অনুসারে গণতন্ত্র এমনই একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে সমগ্র জনসংখ্যা অথবা তার একটি বৃহৎ অংশ নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাহায্যে শাসন পরিচালনা করে ("...where the whole people or some numerous portion of them exercise governing power through deputies periodically elected by themselves")। মিলের এই সংজ্ঞা আধুনিক যুগের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে। আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিনিধিমূলক, রাজনৈতিক দলব্যবস্থা তার প্রাণস্বরূপ। মন্ত্রিসভাচালিত শাসনতন্ত্রে ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত যে রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দল সরকার গঠন করে। মন্ত্রিসভাকে আইনসভা ইচ্ছা করলে পদচ্যুত করতে পারেন।

জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ আধুনিক পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক বা সংসদীয় গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন—এখানে মোট জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাহায্যে শাসন পরিচালনা করে ঃ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের নজির

রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ নাগরিকদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তাঁর একটি উপদেষ্টামণ্ডলী থাকে। কিন্তু ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের রাজার বা রাণীর মত নিয়মতান্ত্রিক ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যে মন্ত্রিসভা গঠন করে, তিনি তার পরামর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতে বাধ্য থাকেন।

ব্রাইস্ জনসংখ্যার সঠিক সমানুপাতিক প্রতিনিধি নির্বাচনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন

লর্ড্ ব্রাইস্ গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, তদনুসারে গণতন্ত্রে ভোটদানের যোগ্যতাসম্পন্ন জনগণের অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশের দ্বারা নির্বাচিত যোগ্য ব্যক্তিগণ এমনভাবে শাসন পরিচালনা করবেন যার ফলে জনগণের ব্যক্তিগত শক্তির সমষ্টি তাদের নির্বাচনে প্রকাশিত মতামতের অনুপাতের সমান হয় ("a government in which the will of the majority of qualified citizens rules taking the qualified citizens to constitute the great bulk of the inhabitants, say, roughly, at least three-fourths, so that the physical force of the citizens coincides with their voting power")। ব্রাইসের এই সংজ্ঞাটি থেকে বেশ বোঝা যায় যে, তত্ত্বগতভাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসন-ক্ষমতা রাষ্ট্রের সকলের হাতে ন্যস্ত থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এটা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে পরিণত হয়। কারণ, গণতন্ত্রে সাধারণ নির্বাচনের মারফত দেশের জনসমষ্টির মতামত প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু আসলে সমস্ত ভোটদাতা একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক মত সমর্থন করে না। ফলে মন্ত্রিসভাচালিত অথবা রাষ্ট্রপতি-শাসিত দেশে গণতন্ত্র কার্যতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেরই শাসনক্ষমতায় পরিণত হয়।

॥ গণতন্ত্রের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ॥

গণতন্ত্রের স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য : (১) গণসম্মতি ও সাম্যের আদর্শ সমর্থন

গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞাগুলি নিয়ে আলোচনা হল সেগুলি পর্যালোচনা করলে **গণতন্ত্রের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য** সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যায়। কোন দেশের শাসনতন্ত্র গণতান্ত্রিক কিনা তা বুঝতে গেলে কতকগুলি বিষয়ের ওপর দৃষ্টি দেওয়া দরকার। প্রথমতঃ, গণতন্ত্র সর্বসাধারণের সম্মতির ওপর, অর্থাৎ সাম্যের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সকলেরই এই শাসনব্যবস্থায় সমান অংশ। কেউই একচেটিয়াভাবে শাসনক্ষমতার অধিকারী নয়। এর অর্থ হল রাষ্ট্র শাসিতের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, শাসকের শক্তির ওপর নয়।

(২) জনমত গঠনের মাধ্যমগুলির স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার স্বীকার, বিরোধী দলকে বিশেষ মর্যাদা দান

দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক আদর্শে ধরে নেওয়া হয় যে, শাসনব্যবস্থা সর্বদাই জনমতের অনুকূলে পরিচালিত হবে। সুতরাং গণতন্ত্রকে জনমতের দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা বলা ভুল নয়। অতএব কোন রাষ্ট্র সত্যিই গণতান্ত্রিক কিনা, তা বিচার করতে গেলে জানা দরকার সেখানে জনমত গঠনের মাধ্যমগুলি সত্যিই স্বাধীন এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত কিনা, নাগরিকদের, বিশেষতঃ বিরোধী দলের সরকারী নীতি সমালোচনা করার অধিকার আছে

কিনা, নাগরিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকার আছে কিনা।

তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে "জন পিছু এক ভোট" (One man one vote) নীতি অনুসরণ করা গণতান্ত্রিক আদর্শ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনের সব ক্ষেত্রেই এই আদর্শটি কার্যকর করে না তুললে এই আদর্শটি শুধু একটি কাগজে সিদ্ধান্তে পরিণত হবে।

(৩) "জন পিছু এক ভোট"

চতুর্থতঃ, গণতন্ত্র পরমতসহিষ্ণুতা, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বোঝাপড়ার (consensus) ব্যবস্থা। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি, আপোষ ও সহযোগিতা থাকা চাই। বিরোধীদলরূপে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের গণতন্ত্রের প্রতি ঠিক ততটাই দায়িত্ব আছে, যতটা আছে শাসকগোষ্ঠীরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের। বলা বাহুল্য, গণতন্ত্র এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দু' দলেরই ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বোঝাপড়া

পঞ্চমতঃ, গণতন্ত্র নিছক একটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নয়, এটা একটা সামগ্রিক জীবনাদর্শ, একটা বিচিত্র মূল্যবোধ। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা থেকেই বোঝা যায় যে, এটি একটি সুনির্দিষ্ট সুস্থ সামাজিক অবস্থা, যা একটা পরিবেশ গঠন করে। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে তাই প্রকৃতভাবে গণতান্ত্রিক করে তোলার জন্য অস্পৃশ্যতাকে অপরাধ বলে ধরা হয়েছে এবং অন্যান্য নানাভাবে গণতান্ত্রিক সাম্যের আদর্শ মেনে নেওয়া হয়েছে। মন্দির, ভোজনাগার, জলাশয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। জমিদারী প্রথার বিলোপ, বৃহদায়তন শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ, নানাপ্রকার জনহিতকর আইনপ্রণয়ন প্রভৃতির দ্বারা ভারতের গণতন্ত্রকে সফল করে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রই যেন আধুনিক প্রগতিশীল গণতন্ত্রের প্রকৃত দৃষ্টান্ত।

(৫) সুস্থ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির উপযোগী মূল্যবোধ : ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের নজির

॥ গণতন্ত্রের আধুনিক সংজ্ঞা ॥

ধ্রুপদী, সঙ্কীর্ণ অর্থে "গণতন্ত্র" বলতে বোঝায় "গণতন্ত্রী শাসনপ্রণালী।" এ ক্ষেত্রে ইংরাজী "ডিমোক্রাসী" (Democracy) কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ওপর জোর দিয়ে বলা হয় যে, "ডিমস্" (Demos) কথাটির মানে "জনগণ", "ক্রেটোজ্" (Kratos) কথাটির মানে "কর্তৃত্ব" বা "ক্ষমতা।" সুতরাং দুটি কথার মিলিত শব্দগত অর্থ হিসাবে ধ্রুপদী ব্যাখ্যায় "ডিমোক্রাসী" কথাটির দ্বারা "জনগণের ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শাসনপ্রণালীকেই" বোঝায়। আব্রাহাম্ লিঙ্কনের সংজ্ঞাকে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা করলে তাই দাঁড়ায়।

গণতন্ত্রের ধ্রুপদী সংজ্ঞাকে অনেকে সঙ্কীর্ণ বলে মনে করেন : গণতন্ত্র কিভাবে সকলের শাসনতন্ত্র ?

কিন্তু গণতন্ত্রের আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ গণতন্ত্রের ব্যাপক, সমাজতাত্ত্বিক দিকগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। ডিলাইল্ বার্ন্সের (Delisle Burns) মতে গণতান্ত্রিক সমাজ সাম্যনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, প্রত্যেকেই সমাজের অঙ্গীভূত, সমাজের কাছে অপরিহার্য বলে বিবেচিত। আধুনিক মার্কিন অর্থনীতিবিদ্ পল্ স্যুইজি (Paul Sweezy) এই বক্তব্যকেই আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে বলেছেন যে, গণতন্ত্রের দুটি বিশিষ্ট নীতির অর্থ হল প্রথমতঃ, জনগণই সরকারের উৎস ; দ্বিতীয়তঃ, সরকার ও জনগণ প্রত্যেকেই অপরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ও অপরিহার্যভাবে জড়িত।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিয়ে নতুন ভাবনাচিন্তা ঃ ডিলাইল্ বার্ন্স্ সাম্যের ওপর জোর দেন ঃ পল্ স্যুইজির মত একই

বার্কারের (Barker) মতে যে সরকার আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে শাসন পরিচালনা করে, তাকেই "গণতন্ত্র" বলে ("Democracy is a system of government by discussion")। যুক্তি-তর্ক, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে ঐকমত্য (consensus) গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তগ্রহণের মৌলিক প্রণালী। সুতরাং লৌকিকতা, গণতান্ত্রিকতা, সামাজিকতা এ কথাগুলির সামাজিক তাৎপর্য একই।

বার্কারের মতে গণতান্ত্রিকতা, লৌকিকতা, সামাজিকতা সমার্থক

ম্যাক্আইভার (MacIver) ব্যাপক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গণতন্ত্রকে লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে, গণতন্ত্র শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়, কে কোন্ উদ্দেশ্যে শাসনকার্যে আত্মনিয়োগ করছে ও করবে, তা যে পদ্ধতিতে স্থির করা হয়, তাকেই "গণতন্ত্র" বলা হয় ("Democracy is not a way of governing, whether by majority or otherwise, but primarily a way of determining, who shall govern and broadly to what ends")। সুতরাং ম্যাক্আইভারের মতে গণতন্ত্র শুধু রাজনৈতিক আদর্শ নয়, গণতন্ত্র একটা মূল্যবান সামাজিক পদ্ধতি। তাই দেখা যায় যে, গণতন্ত্র কার্যতঃ কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলে চিহ্নিত হলেও লোকের বিশ্বাস এই শাসনব্যবস্থা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নাগরিকদের মনে এই বিশ্বাস বা আস্থা সৃষ্টি করে তুলে এই বিশ্বাসকে সমাজের যৌথ অবচেতনার (Collective Subconscious) অঙ্গীভূত করে দেয়। এই সামাজিক অবচেতনতাই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি, তা গণতন্ত্রকে স্বয়ংক্রিয় করে তোলে।

ম্যাক্আইভারের মতে গণতন্ত্র একটা মূল্যবান্ সামাজিক পদ্ধতি : গণতন্ত্রের প্রতি ব্যক্তির আস্থা সমাজের যৌথ অবচেতনার অঙ্গীভূত

॥ গণতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ ॥

গণতন্ত্রের ধ্রুপদী ব্যাখ্যাকারগণ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এই দুটি শ্রেণীতে গণতন্ত্রকে ভাগ করেছেন। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও শাসনতন্ত্রবিদ্গণ গণতন্ত্রের আরও তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ করেন। সে তিনটির নাম ঃ উদারনৈতিক গণতন্ত্র, পশ্চিমী গণতন্ত্র এবং জনগণতন্ত্র। সুতরাং সর্বসমেত গণতন্ত্রকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—(১) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের ৫টি ভাগ

(Direct Democracy), (২) পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক বা সংসদীয় বা দায়িত্বশীল গণতন্ত্র (Indirect or Representative or Parliamentary or Responsible Democracy) ; (৩) উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy) ; (৪) পশ্চিমী গণতন্ত্র (Western Democracy) ; (৫) জনগণতন্ত্র (People's Democracy) ।

॥ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ॥

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে দেশের সমস্ত নাগরিক আইনপ্রণয়নের এবং শাসনপরিচালনার কাজ প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ নিজেরাই সম্পাদান করে থাকে। প্রাচীন গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলিতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল, কিন্তু সেখানকার গণতন্ত্রে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ ব্যক্তি নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা ছিল ক্রীতদাস অথবা মেহনতী মজুর বা কারিগর, নারী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। সুতরাং সংখ্যাগতভাবে বিচার করলে প্রাচীন গ্রীসে এহেন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠের শাসন বা মুষ্টিমেয়তন্ত্র। আধুনিক যুগের রাষ্ট্রগুলির আয়তন এবং জনসংখ্যা বেশী। সুতরাং প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বর্তমান যুগে অচল। তবে সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের বা "ক্যাণ্টনের" (Cantons) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি স্থানীয় সরকারে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ব্যবস্থার কিছু কিছু চিহ্ন এখনও প্রচলিত।

প্রাচীন গ্রীসের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আসলে মুষ্টিমেয়তন্ত্র ; সুইজারল্যাণ্ডে ও মার্কিন স্থানীয় সরকারে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছু কিছু এখনও প্রচলিত

॥ প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেন বজায় রয়েছে ॥

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছু কিছু পদ্ধতি রাখার কারণ হিসাবে বলা হয় যে, প্রথমতঃ, ১ম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে সংসদীয় গণতন্ত্রের নেতাদের শৈথিল্য, মন্থরতা, কোথাও কোথাও অপদার্থতা, কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতিপরায়ণতার জন্য নাগরিকগণ তাঁদের ওপর সুষ্ঠুভাবে কর্তৃত্ব প্রয়োগের কতকগুলি পথ অনুসন্ধান করতে থাকেন। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কতকগুলি ব্যবস্থা তাঁদের খুব পছন্দ হয়েছিল।

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকার কারণ ঃ (১) ১ম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের বহু রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের ব্যর্থতা

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে একবার প্রতিনিধি নির্বাচনের পর জনগণ নীরব, নিষ্ক্রিয় দর্শকরূপে বসে থাকতে চান না। তাঁরা গণতান্ত্রিক নাগরিকরূপে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে আগ্রহী। তাই তাঁরা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কয়েকটি ব্যবস্থা চালু করতে চান।

(২) জনগণ বেশী সক্রিয় হতে চান

তৃতীয়তঃ, কোন কোন সময়ে সহসা কোন জটিল, জরুরী সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধানের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে জনমত যাচাই করার প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রচলিত ব্যবস্থাগুলির কোন কোনটি তখন খুবই উপযোগী হয়ে পড়ে।

(৩) জটিল, জরুরী সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানে গণতন্ত্র ব্যর্থ

॥ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ॥

সুইজারল্যান্ডে প্রচলিত ৪টি ব্যবস্থা গণনির্দেশ, গণপ্রস্তাব বা গণ-উদ্যোগ গণভোট, গণপ্রতিনিধির পদচ্যুতি দাবী

সুইজারল্যান্ডে যে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি প্রচলিত আছে, সেগুলি চার রকমভাবে প্রয়োগ করা হয়। তাদের নাম—(ক) গণনির্দেশ (Referendum), (খ) গণ-প্রস্তাব বা-গণ-উদ্যোগ (Initiative), (গ) গণভোট বা গণ-অভিমত (Plebiscite) এবং (ঘ) গণ-প্রতিনিধির পদচ্যুতি বা প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ (Recall)।

গণনির্দেশের সংজ্ঞা

গণনির্দেশের মাধ্যমে আইনসভা আইনের যে খসড়া তৈরী করে, জনগণের বিবেচনার জন্য সেটির ওপর ভোট নেওয়া হয়। যদি ভোটদাতাগণের বেশীর ভাগ খসড়া-প্রস্তাবটি ভোটে অনুমোদন করেন, তা হলে খসড়া-প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হয়।

দু'প্রকার গণনির্দেশ ঃ আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক

গণনির্দেশ দুপ্রকারের—আবশ্যিক (Obligatory বা Compulsory) এবং ঐচ্ছিক (Optional)। সাংবিধানিক বিধি অনুসারে যে ক্ষেত্রে আইনসভা তার খসড়াগুলি জনগণের অনুমোদনের জন্য পাঠাতে বাধ্য, সেই ব্যবস্থাকে আবশ্যিক গণ-নির্দেশ বলে। সংবিধান সংশোধন, রাষ্ট্রের কোনপ্রকার আঞ্চলিক পুনর্গঠন প্রভৃতি বিষয়গুলি এই পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু নির্দিষ্টসংখ্যক নাগরিকের আবেদনক্রমে যদি আইনসভাকে কোন খসড়া-প্রস্তাব জনগণের অনুমোদনের উদ্দেশ্যে গণভোটের জন্য উপস্থিত করতে হয়, সেখানে গণ-নির্দেশ ঐচ্ছিক।

গণ-উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য ও সংজ্ঞা

আইনসভাকে জনস্বার্থে কোন আইনপ্রণয়নে তৎপর করার জন্য **গণ-প্রস্তাব বা গণ-উদ্যোগের** ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্টসংখ্যক ভোটদাতা কোনও বিষয়ে আইনপ্রণয়নের তাগিদ বোধ করলে তাঁরা সেই আইনের একটি প্রস্তাব খসড়ার আকারে আইনসভার কাছে পাঠাতে পারেন।

গণ-উদ্যোগ দু'রকম ঃ পূর্ণাঙ্গযুক্ত, অপূর্ণ

গণপ্রস্তাব বা গণ-উদ্যোগ দুরকম—পূর্ণাঙ্গযুক্ত (Formulated) এবং অপূর্ণ (Unformulated)। পূর্ণাঙ্গযুক্ত গণপ্রস্তাবে আইনসভার কাছে একটি বিলের সম্পূর্ণ খসড়া উপস্থাপিত হয়। অপূর্ণ গণপ্রস্তাব অনুসারে আইনপ্রণয়ন করতে হলে আইনসভাকে শেষ পর্যন্ত গণভোটের ব্যবস্থা করতে হয়।

স্ট্রং গণভোটকে "জনগণের আদেশ" বলেছেনঃ ভারতবিভাগের সময় শ্রীহট্টে গণভোটের নজির

গণভোট কে শাসনতন্ত্রবিদ্ স্ট্রং "জনগণের আদেশ" বলে বর্ণনা করেছেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমস্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গণভোট নেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতভাগের সময় আসামের শ্রীহট্ট জেলা ভারতে অন্তর্ভুক্ত হবে, না পাকিস্তানে যাবে—এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য গণভোটের ব্যবস্থা করা হয়। কাশ্মীরের কয়েকটি অঞ্চল ভারতে অন্তর্ভুক্ত হবে না পাকিস্তানে থাকবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনেকে গণভোট গ্রহণের প্রস্তাব দেন।

গণপ্রতিনিধির পদচ্যুতি বা প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ অনুযায়ী আইনসভায় নির্বাচিত কোন গণপ্রতিনিধির কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে নির্দিষ্টসংখ্যক ভোটদাতা যদি তাঁর অপসারণ দাবী করেন, তা হলে তাঁর অবশিষ্টকালীন প্রতিনিধিত্ব বাতিল হয়ে যায়। যদি দ্বিতীয়বারের নির্বাচনে আগের নির্বাচিত প্রতিনিধি পুনরায় নির্বাচিত না হন, তা হলে তাঁর পূর্ণ কার্যকাল শেষ হবার আগেই তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়।

গণপ্রতিনিধির পদচ্যুতি প্রার্থনা

॥ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের গুণাগুণ ॥

(১) ছোট এলাকায় যোগ্য গণপ্রতিনিধি নির্বাচন সহজ

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের অনেক গুণের কথা বলা হয়। প্রথমতঃ, "জনগণের শাসনের" মাধ্যমে জনগণ তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে জনসাধারণ শাসনকার্যে সক্রিয় ও উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তাঁরা তাঁদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ থাকেন। ফলে আইনসভা বা শাসনপরিষদ তাঁদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।

(২) জনগণের ভূমিকা সক্রিয়

তৃতীয়তঃ, জনগণ আইনপ্রণয়ন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ফলে তাঁদের রাজনৈতিক জ্ঞান ও সচেতনতা অনেক বাড়ে। আইনপ্রণয়ন করবার ক্ষেত্রগুলি অথবা প্রচলিত আইনকানুনের দোষত্রুটিগুলি সম্পর্কে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সচেতন হন।

(৩) আইনপ্রণয়ন সম্বন্ধে জনগণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভ

(৪) নির্বাচক-নির্বাচিতদের ঘনিষ্ঠতা

চতুর্থতঃ, প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁদের নির্বাচকদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রচিত হয়।

(৫) দলতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত

পঞ্চমতঃ, প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা আইনসভার ওপর দলীয় আধিপত্যের দোষত্রুটি এবং আইনসভার স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ষষ্ঠতঃ, প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আইনসভার অক্ষমতা, উদাসীনতা এবং নিষ্ক্রিয়তাকে দূর করে। আইনসভার দুটি কক্ষের সদস্যগণ যখন জানেন যে আইনসভার বাইরেও ভোটদাতাদের মধ্যে একটি সুচিন্তিত, সংগঠিত, সচেতন আইনপ্রণেতার গোষ্ঠী আছেন, তখন তাঁরা আইনপ্রণয়ন সম্পর্কে এবং আইনসভায় তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে অনেক বেশী দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে বাধ্য হন। আইনসভার দুটি কক্ষের মধ্যে মতান্তর ও মনান্তরের সম্ভাবনা থাকে না।

(৬) আইনসভার সক্রিয়তা

সপ্তমতঃ, নির্বাচিত হবার পর অনেক সময় প্রতিনিধি তাঁর নির্বাচকদের মতামতকে উপেক্ষা করে চলেন। এই মনোবৃত্তি অবাঞ্ছনীয় এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের পক্ষে খুবই বাধা সৃষ্টি করে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র এই বিপদ থেকে গণতন্ত্রকে মুক্ত করার চেষ্টা করে।

(৭) নির্বাচিতের ওপর নির্বাচকদের কর্তৃত্ব

অষ্টমতঃ, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে নির্বাচনোত্তর কোন বিশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণ নির্বাচনের বদলে আংশিকভাবে শুধু সেই জরুরী সমস্যাটি সমাধান করার জন্য জনগণের পরামর্শ নেওয়া যায়।

(৮) জরুরী অবস্থায় জনগণের পরামর্শ নেওয়া যায়

সব শেষে বলা যায় যে, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রই প্রকৃত গণতন্ত্র। জনগণের প্রকৃত মনোভাব কখনই তাঁদের প্রতিনিধিদের মারফত সঠিকভাবে প্রতিফলিত হতে পারে না। তাই পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের এ ধরনের দোষত্রুটি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র দূর করতে পারে। সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দুর্নীতি, নির্বাচনে গলদ প্রভৃতি বহু দোষত্রুটি দেখা যায়। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে সেগুলির নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা থাকে।

সুতরাং প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রই প্রকৃত গণতন্ত্র

কিন্তু **প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের** এত গুণের কথা বলা হলেও এর অনেকগুলি **অসুবিধার** কথা বলা হয়ে থাকে। এই যুক্তিগুলির কতকগুলি তাত্ত্বিক, কতকগুলি ব্যবহারিক। প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কার্যকর হয় যদি রাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবন সহজ ও সরল থাকে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রগুলিতে জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত জটিলতা দেখা যায়। সেজন্য আধুনিক রাষ্ট্রে আইনপ্রণয়নের বিষয়টি আইনসভার একটি উপসমিতির হাতে অর্পণ করা হয়। আইনসভা শুধু আইনপ্রণয়ন সম্পর্কে সাধারণ নীতি নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু উপসমিতিতে থাকেন প্রধানতঃ বিশেষজ্ঞের দল। সাধারণ জনগণের কাছ থেকে আইনপ্রণয়ন সম্পর্কে এই বিশেষজ্ঞতা আশা করা অন্যায়।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের অসুবিধা : (১) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের উপযুক্ত বিশেজ্ঞতার অভাব

দ্বিতীয়তঃ, জনগণ সাধারণতঃ সাময়িক উত্তেজনা, ব্যক্তিগত ঝোঁক, বিদ্বেষ প্রভৃতির চাপে প্রভাবিত হতে পারেন। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে কার্যতঃ তাঁরা কতকগুলি রাজনৈতিক দলের দ্বারা পরিচালিত হন। কিন্তু এই দলগুলি বেশীর ভাগ স্বার্থান্বেষী এবং সুযোগসন্ধানী ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। তাদের দ্বারা চালিত হলে জনগণ প্রকৃতপক্ষে বিপথেই চালিত হন এবং ব্যক্তির, সমাজের এবং রাষ্ট্রের সাধারণ বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য।

(২) জনগণ সাময়িক উত্তেজনা, ব্যক্তিগত ঝোঁক, দলবাজ রাজনীতিবিদ্‌দের প্ররোচনার শিকার হতে পারেন

তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সুইজারল্যাণ্ডের মত ছোট এবং রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন নাগরিকদের দেশেই সফল হতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার র‍্যাপার্ড (Rappard) বলেছেন যে, সুইজারল্যাণ্ডে এই ব্যবস্থাটি সফল হবার প্রধান কারণগুলি হল—দেশটি ছোট, নাগরিকগণ অত্যন্ত সক্রিয় এবং সচেতন। দেশটি আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে চিরদিন নিরপেক্ষ (Permanently Neutralised) থাকার ফলে জনগণ যুদ্ধ প্রভৃতি চরম দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হয়ে চিরকাল শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের আঞ্চলিক গণতান্ত্রিক সমস্যাগুলির সমাধানে মনোনিবেশ করতে পেরেছেন ও পারেন। সব দেশ এ

(৩) ছোট দেশের পক্ষেই প্রযোজ্য ; র‍্যাপার্ডের মতে সুইজারল্যাণ্ডে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বিশেষ কারণে সফল

রকম অনুকূল পরিবেশের সম্মুখীন হতে পারে না। সব রাষ্ট্রের জনগণ রাজনৈতিকভাবে এত সচেতন হতে পারেন না। ফলে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সর্বত্র সফল হতে পারে না।

চতুর্থতঃ, সুইজারল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অসুবিধা সম্পর্কে র‍্যাপার্ড্ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অবহিত করেছেন। সেটি হল এই যে, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত হলে আইনসভা আইনপ্রণয়নের কেন্দ্রস্থল থাকে না, আইনসভার বাইরে আইনপ্রণয়ন স্থানান্তরিত হয়। ফলে লোকে সংবাদপত্রে আইনসভার কার্যকলাপ, প্রতিনিধিদের ভাষণ প্রভৃতি বিষয়ে বিবৃতিগুলি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। আইনসভার সদস্যগণও তাঁদের ব্যক্তিগত ন্যায়ধর্ম, বিবেক এবং বিচারশক্তির ওপর নির্ভর না করে জনগণের তুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেন।

(৪) আইনসভা সম্বন্ধে লোকের অনীহা, সভার বাইরেই দৃষ্টিনিক্ষেপের ঝোঁক

পঞ্চমতঃ, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে আইনসভা মুখ্য আইনপ্রণেতার ভূমিকা ত্যাগ করে গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যদি জনগণের অনুমোদন প্রয়োজন হয়, তা হলে আইনকানুনের ধারাবাহিকতা, স্থায়িত্ব এবং উদ্দেশ্য অনেকাংশে খর্ব হয়। গণতন্ত্রে আইনসভাই আইনপ্রণয়নক্ষেত্র। কিন্তু প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনসভা অত্যন্ত দুর্বল একটি বিতর্কসভার আসরে পরিণত হয়।

(৫) আইনসভা দুর্বল বিতর্কসভা হয়ে ওঠে, আইনের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়

ষষ্ঠতঃ, আধুনিক কালে রাষ্ট্রগুলি এত বৃহৎ এবং তাদের জনসংখ্যা এত বিপুল যে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকে এই সব রাষ্ট্রে সফল এবং কার্যকর করে তুলতে হলে প্রচুর অর্থ, সময় এবং উদ্যোগ প্রয়োজন। সোবিয়েত ইউনিয়নে প্রতিনিধির পদচ্যুতির দাবী স্বীকৃত। কিন্তু সেখানে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল হিসাবে কম্যুনিস্ট্ দলের প্রাধান্য স্বীকৃত থাকার ফলে এই প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করে তোলা কঠিন হয়ে ওঠে না।

(৬) আধুনিক বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যয়বহুল, সময় ও উদ্যোগের অভাব

সপ্তমতঃ, ব্রাইস্ বলেছেন যে, সদাজাগ্রত, সুসংগঠিত জনমতই গণতন্ত্রকে রক্ষা করে; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হলেই গণতন্ত্র সফল বা বিফল হবে এমন ধারণা করা ঠিক নয়।

(৭) গণতন্ত্রের ভিত্তি সুগঠিত জনমত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসন নয়

অষ্টমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক আদালতের বিচারকগণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। মার্কিন শাসনতন্ত্রবিদ্‌দের মধ্যে অনেকে এই ব্যবস্থাটির বিরূপ সমালোচনা করেছেন। কারণ, এই ব্যবস্থায় জনগণকে বিচারকের সঠিক গুণাবলী সম্পর্কে ধারণা করতে বলা হয়। কিন্তু কার্যতঃ জনগণের এ যোগ্যতা নেই। উপরন্তু বিচারকগণ যদি মনে করেন যে শেষ পর্যন্ত জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, তা হলে তাঁরা নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করতে প্রয়াসী হবেন না, বরং তাঁরা আদালতের বাইরে জনতার খেয়াল-

(৮) প্রত্যক্ষভাবে বিচারক নির্বাচনের মার্কিনী ব্যবস্থার কুফল

খ্শীর ওপর বেশী নজর দিয়ে তাদের সন্তুষ্টির জন্য ব্যস্ত থাকবেন। ফলে বিচারালয়ের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা ব্যাহত হবে।

নবমতঃ, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের চারটি পদ্ধতি সব ক্ষেত্রে পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রয়োগ করা চলে না। কারণ এগুলির প্রয়োগ শর্তসাপেক্ষ। (ক) জনগণের উপযুক্ত পরিমাণ রাজনৈতিক সচেতনতা, দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেম না থাকলে এগুলি কার্যকর করা কঠিন। (খ) বিশাল আয়তনের ও বিরাট জনসংখ্যাযুক্ত দেশের পক্ষে এ পদ্ধতিগুলি কাজে লাগানো যায় না। (গ) রাষ্ট্রীয় সমগ্রতাকে আঞ্চলিক সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে রাখার জন্য জনগণের আগ্রহ তীব্র থাকা চাই।

(৯) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের চারটি পদ্ধতি সর্বত্র প্রযোজ্য নয়ঃ তার কারণ

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দোষগুণ নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এর গুণের চেয়ে এর অসুবিধার পরিমাণই বেশী। রুশোর মত আদর্শবাদী দার্শনিকের উপদেশ অনুযায়ী এ গণতন্ত্রকে তত্ত্বগতভাবে সমর্থন করা যেতে পারে বটে, কিন্তু শাসনতন্ত্রের ফলিত ক্ষেত্রে আধুনিক জনজীবনের জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যবস্থা অচল। বলা হয় যে, বর্তমান সমস্যাগুলি ব্যাপক ও জটিল। নাগরিক অর্থনৈতিক সঙ্কটে আক্রান্ত। তার পক্ষে এবং আধুনিক রাষ্ট্রগুলির পক্ষে তাই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পরিবর্তে পরোক্ষ বা সংসদীয় বা দায়িত্বশীল গণতন্ত্র অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তবে, আধুনিক কালে অনেক সংবিধানে গণভোট, গণ-উদ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলির কোন কোনটি গৃহীত হয়।

উপসংহারঃ আধুনিক বৃহৎ রাষ্ট্রে পরোক্ষ গণতন্ত্রই প্রচলিত; ব্যস্ত নাগরিকের পক্ষেও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের অসুবিধা; তবে কিছু কিছু প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত

॥ পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক বা সংসদীয় বা দায়িত্বশীল গণতন্ত্র ॥

আধুনিক শিল্পব্যবস্থা প্রসারিত হবার ফলে, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হবার ফলে, শাসনযন্ত্র পরিচালনায় আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রয়োগের ফলে গণতন্ত্রের স্বরূপ আগেকার তুলনায় অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের সার্বিক কল্যাণসাধনের জন্য রাষ্ট্র আজ মুখ্যতঃ দায়ী। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সহযোগিতা স্থাপনের দ্বারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। রাষ্ট্রিক জীবন আগের তুলনায় অনেক জটিলতাপূর্ণ। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী কর্মসূচী গ্রহণ করতে গিয়ে আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। গণতন্ত্রকে এখন আরও সক্রিয়, আরও ব্যাপক হতে হচ্ছে। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রেই এই ব্যাপক কর্মকাণ্ড রূপায়িত। বর্তমান যুগ হয়ে উঠেছে পরোক্ষ গণতন্ত্রের যুগ, সংসদীয় বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের যুগ।

পরোক্ষ গণতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ

বিপুল আয়তন এবং জনসমষ্টি নিয়ে বর্তমান রাষ্ট্র গঠিত। তাই জনসাধারণের পক্ষে প্রাচীন গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলির নাগরিকদের মত প্রত্যক্ষভাবে আইনপ্রণয়ন বা

শাসনপরিচালনা করা সম্ভব নয়। এজন্য গড়ে উঠেছে পরোক্ষ গণতন্ত্র। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গৃহীত সাধারণ নির্বাচনে নাগরিকগণ আইনসভায় তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকেন। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে এই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আইনসভার সদস্যদের নির্বাচন ঘটে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার মাধ্যমে। যে দলের সমর্থক সদস্যগণ আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন, তাঁরা সাধারণতঃ মন্ত্রিসভা গঠন করেন। যদি কোনও একটি দলের সদস্যগণ আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা (Absolute Majority) লাভ না করেন, অর্থাৎ আইনসভার মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের চেয়ে অন্ততঃ একটি অতিরিক্ত আসন লাভ না করেন, তা হলে একাধিক রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ সম্মিলিত-ভাবে যৌথ মন্ত্রিসভা (Coalition Cabinet) গঠন করেন। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আইনসভা যদি কোন সময়ে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব (No-confidence Motion) গ্রহণ করেন, তা হলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মন্ত্রীকে এবং সমষ্টিগতভাবে সমগ্র মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে এইভাবে আইনসভার প্রাধান্য স্বীকৃত হয় বলে একে সংসদীয় বা পরিষদীয় গণতন্ত্র বলে। এই গণতন্ত্রে আবার মন্ত্রিসভা আইনসভার কাছে দায়ী থাকে বলে একে দায়িত্বশীল সরকারও বলা হয়। জন্ স্টুয়ার্ট্ মিলের সংজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করে বলা যায় যে, যে শাসনব্যবস্থায় জনগণ বা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করে, তাকেই পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র বলা হয়।

জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ প্রদত্ত পরোক্ষ বা সংসদীয় গণতন্ত্রের সংজ্ঞার পুনরাবৃত্তি : এ ব্যবস্থায় জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের দ্বারা নির্বাচিত বিধায়কগণ আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠন করেন

॥ উদারনৈতিক গণতন্ত্র ॥

উদারনৈতিক আদর্শ (Liberalism) গণতন্ত্রের বিকাশে অনেক সহায়তা করেছে। ধনতন্ত্রের (Capitalism) বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের সমর্থকগণ প্রধানতঃ যে সমালোচনা-গুলির উল্লেখ করেছেন, সেগুলির ওপর ভিত্তি করে গণতন্ত্রের শোধনবাদী প্রবক্তাগণ নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকার দান, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নির্দেশ, প্রগতিশীল করনীতির মাধ্যমে দরিদ্র অপেক্ষা ধনীদের বেশী করদানে বাধ্য করা ইত্যাদি উপায়ে ধনতন্ত্রের অসুবিধাগুলি দূর করার প্রস্তাব দিয়েছেন। আবার নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষা, বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার ওপরও তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এইভাবে পৃথিবীর নানা দেশে শ্রমিকদলের নেতৃত্বে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের (Welfare State) আদর্শ বাস্তব রূপ নিয়েছে। এই রাষ্ট্রগুলি গণতান্ত্রিক কাঠামোকে অপরিবর্তিত রেখে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দরকারমত কিছু কিছু সমাজতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের দ্বারা আধুনিক গণতন্ত্রকে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রকৃষ্ট সংরক্ষকরূপে কল্পনা করেছে। বিগত

উদারনৈতিক গণতন্ত্রে ইংলণ্ডের হিতবাদ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রভাব : নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে নানাপ্রকার অর্থ-নৈতিক অধিকার দেওয়া হয়; হ্যারল্ড্ ল্যাস্কি ও ইংলণ্ডের শ্রমিকদলের ভাবনাচিন্তা

শতাব্দীতে বেন্থাম্‌ ও মিলের হিতবাদ (Utilitarianism) উদারনৈতিক গণতন্ত্রের আদর্শকে ইংলণ্ডে অনেক জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এই নীতিতে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের যে কাজগুলির দ্বারা সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোকের মঙ্গল সাধিত হয়, সেগুলিই অভিনন্দন পাবার যোগ্য এবং যে রাষ্ট্র যত বেশী এই ধরনের কাজকর্ম সম্পাদন করে, সেই রাষ্ট্র তত বেশী প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রী। পরবর্তীকালে ইংরেজ সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড্‌ ল্যাস্কি (Harold Laski) সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে গণতন্ত্রের একটা সমন্বয় স্থাপনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর মতে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা একমাত্র গণতন্ত্রেই রক্ষা করা যায়। কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্র সফল করতে গেলে নাগরিকদের নানা প্রকার অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করে রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধন করতে হবে। সুতরাং তত্ত্বগতভাবে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, এই শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতাকে গণতন্ত্রের প্রধান স্তম্ভরূপে দেখা হয়। এর আবশ্যিক পরিণতি হল ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য নাগরিকদের সকল প্রকার স্বাধিকার সংরক্ষণ এবং আইনের অনুশাসন, সরকারের ভিত্তিরূপে শাসিতের সম্মতির ওপর আস্থা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা। এইভাবে উদারনৈতিক গণতন্ত্র রাষ্ট্রের পরিচালনার ব্যাপারে কতকগুলি গণতান্ত্রিক প্রথা এবং রীতি-নীতি, নজির-নিরিখ সৃষ্টি করে চলে। সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির ফলে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু এবং সুষম বণ্টন, দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রভৃতির জন্য গণতান্ত্রিক উপায়ে অর্থাৎ আইনসভায় জনগণের প্রতিনিধিদের সম্মতিসাপেক্ষে নানা প্রকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য চেষ্টা চলে। ইংলণ্ডে শ্রমিক দলের (Labour Party) কর্মসূচী এরকম।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ওপর ১৬৮৮ সালের ইংলণ্ডের, ১৭৭৬ সালের মার্কিন উপনিবেশগুলির, ১৭৮৯ সালের ফ্রান্সের, ১৯১৭ সালের সোবিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাব

শুধু তত্ত্বের দিক থেকে নয়, কতকগুলি বিশিষ্ট আধুনিক ঘটনাও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে দিয়েছে। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে গৌরবময় বিপ্লব সংঘটিত হবার ফলে সেখানে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বদলে গণতন্ত্রের অনুগামী নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছে। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার উপনিবেশগুলি বিদেশী শাসকের, অর্থাৎ ইংলণ্ডের শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই "স্বাধীনতার ঘোষণায়" (Declaration of Independence) নাগরিকদের স্বাধীনতার অধিকারকে তাদের জন্মগত অধিকাররূপে স্বীকার করা হয়। এই ঘোষণায় সামাজিক রাষ্ট্রিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকলে সমান বলে ঘোষণা করা হয়। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে ফ্রান্সেও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের পর গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে সোবিয়েত রাশিয়ায় এইভাবে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে এবং সেখানে মেহনতী জনতার সাম্যবাদী শাসন প্রচলিত হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি উদারনৈতিক গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তিকে অনেক সুদৃঢ় করে তুলেছে।

॥ পশ্চিমী গণতন্ত্র ॥

আধুনিক যুগে উদারনৈতিক গণতন্ত্র ইংলণ্ড্, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে প্রচলিত। এহেন গণতন্ত্রকে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পশ্চিমী গণতন্ত্র (Western Democracy) বলে থাকেন। পশ্চিমী গণতন্ত্রের মূল কাঠামো উদারপন্থী গণতন্ত্রের সঙ্গে সংসদীয় গণতন্ত্রের আদর্শকে মিলিয়ে তৈরী হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্র এই সব দেশে সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে। এই সব দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রিসভা গঠন করেন, আইনসভার কাছে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন ও তাঁর মন্ত্রিসভা দলবদ্ধভাবে দায়ী থাকে। অবাধ এবং প্রকাশ্য নির্বাচনব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকগণ নির্দিষ্ট সময়ে তাঁদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ করেন। এইভাবে তাঁরা শাসনপরিচালনার ব্যাপারে এবং আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভ করে থাকেন। পশ্চিমী গণতন্ত্রে বিরোধী দলগুলির দায়িত্ব যেমন স্বীকার করে নেওয়া হয়, তেমনি শাসনতন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারী দলের সঙ্গে তাদের সমান সম্মান এবং কর্তৃত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। জনমত প্রকাশের মাধ্যমগুলি সাধারণতঃ রাষ্ট্রিক কর্তৃত্বের বাইরে রাখা হয়। ধনতন্ত্রের কাঠামোকে অবলম্বন করে চললেও পশ্চিমী গণতন্ত্রে সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান আদর্শগুলি বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করা হয়। তাই এই সব দেশে প্রয়োজন হলে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে, নানারকম জনকল্যাণকর আইন রচনা করে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা কার্যকর করে তোলার চেষ্টা করে।

পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলি সাধারণভাবে উদারপন্থী গণতন্ত্র ; কিন্তু এদের কোথাও সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত, কোথাও বা রাষ্ট্রপতিশাসিত প্রজাতন্ত্র প্রচলিত ; কোথাও সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র, কোথাও বা প্রজাতন্ত্র

কিন্তু সব পশ্চিমী গণতন্ত্রী দেশই মন্ত্রিসভা-পরিচালিত বা এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত নয়। ইংলণ্ড্ এবং ফ্রান্স্ সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং এই দেশদুটিতে এককেন্দ্রিক সরকার কার্যকর। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত এবং সেখানকার শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি তাঁর শাসনকালে আইন-সভার কাছে দায়ী থাকেন না। সেখানে আইনসভার বিভিন্ন উপসমিতির নেতাগণের নামে তাঁদের নেতৃত্বে আইনকানুন রচিত হয়। তাই পশ্চিমী গণতন্ত্রে কোনও কোনও ক্ষেত্রে শাসনবিভাগ, আইনসভা এবং বিচারবিভাগের কার্যকলাপের মধ্যে ক্ষমতাবিভাজন নীতি (Theory of Separation of Powers) অনুসরণ করা হয়।

কোন কোন পশ্চিমী গণতন্ত্রে সংসদীয় গণতন্ত্র আছে ও তার ফলে আইনসভা সর্বশক্তি-মান, কোথাও বা ক্ষমতা-বিভাজন নীতি প্রচলিত

॥ জনগণতন্ত্র ॥

পৃথিবীর সাম্যবাদী দেশগুলি আজকাল প্রচার করে থাকে যে, গণতন্ত্র সাম্য-বাদের অর্থাৎ কম্যুনিজের আদর্শে গঠিত না হলে প্রকৃত গণতন্ত্র হয় না। সাম্যবাদী বিপ্লবের পর ১৯৪৯ সাল থেকে চীনে যে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে, তাতে সাম্যবাদী দল ছাড়াও অন্যান্য সব রাজনৈতিক দলই অংশগ্রহণ করেছিল। চীনের আদর্শ ছাড়াও

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, রোমানিয়া, বুল্-গেরিয়া, ভিয়েত্নাম্ প্রভৃতি দেশে সাম্যবাদী দলের নেতৃত্বে এবং অন্য সব রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় ও সহানুভূতিকে পাথেয় করে জনগণের যে সার্বিক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের অভিযান সফল হয়েছে, তাকে সাম্যবাদী নেতৃবৃন্দ জনগণতন্ত্রের (People's Democracy) শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলে প্রচার করেন। এই দেশগুলি প্রধানতঃ মার্কস্-বাদ এবং লেনিন্বাদের আদর্শে অর্থাৎ সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত। এই গণ-তন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, এখানে নাগরিকদের অর্থনৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উৎ-পাদন-বণ্টন-ভোগ এই ত্রিবিধ অর্থনৈতিক সাম্যের নীতির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এই সাম্যবাদী নেতাগণ ধনতন্ত্রী পশ্চিমী গণতন্ত্রে যে শাসনব্যবস্থা প্রচলিত, তার কঠোর সমালোচনা করে থাকেন। এঁদের মতে ধনতন্ত্রে সংসদীয় নির্বাচন ধনিক শ্রেণীর স্বার্থেই পরিচালিত হয়ে থাকে। নাগরিকদের যে সমস্ত অধিকার প্রদান করা হয়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে নামসর্বস্ব। মেহনতী জনতার কর্তৃত্ব ছাড়া, অর্থাৎ সাম্যবাদী নীতির প্রয়োগ ছাড়া, অর্থাৎ সাম্যবাদী নীতির প্রয়োগ ছাড়া গণতন্ত্র কখনই সত্যিকারের গণতন্ত্র হয়ে উঠতে পারে না। তাই তাঁদের মতে পশ্চিমী গণতন্ত্রের ঢং-এ যে শাসনতন্ত্র রচিত হয়, তাতে জনগণের স্বার্থ প্রকৃতপক্ষে সংরক্ষিত হতে পারে না। কেননা পশ্চিমী গণতন্ত্রের সাম্যবাদী সমালো-চকগণ মনে করেন যে, সেখানকার আইনসভা হল "শুয়োরের খোঁয়াড়।" অর্থাৎ খোঁয়াড়ের মালিক বলপূর্বক নিজের ইচ্ছামত পশুগুলিকে যেভাবে পরিচালিত করে থাকে, পশ্চিমী গণতন্ত্রের পুঁজিপতিগণও আইনসভায় তাঁদর পরিকল্পিত নির্বাচনপদ্ধতির দ্বারা নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের ওপর ঠিক সেইরকম জবরদস্তি ও স্বেচ্ছাচার প্রয়োগ করে থাকে। শাসকবর্গের ক্ষেত্রেও পশ্চিমী গণতন্ত্রের সমালোচনায় বলা হয় যে তারা মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর তল্পিবাহকমাত্র। বিচারব্যবস্থাও যেন সেখানে একটা প্রহসনে পরিণত হয়। কারণ, বিচারকগণের শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি, ঝোঁক প্রভৃতি সব কিছুই পুঁজিবাদীদের পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ঘটে থাকে। তাই পশ্চিমী গণতন্ত্রে বিচারকদের সিদ্ধান্তগুলি পক্ষপাতদুষ্ট হয় এবং সেগুলি নিশ্চিতভাবে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থকে বজায় রাখার চেষ্টা করে। এজন্যই আইনসভার জনপ্রতিনিধি শাসন-বিভাগের আমলা, বিচারালয়ের হাকিম পশ্চিমী গনতন্ত্রে সব সময় তাঁদের শ্রেণীভিত্তিক চিন্তাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হন। পক্ষান্তরে, জনগণতন্ত্রে সাম্যবাদী দলের সার্বিক কর্তৃত্বে এবং অন্য দলগুলির স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপিত হয়। জনপ্রতিনিধিকে আইনসভায় তার কার্যকাল পূর্ণ হবার পূর্বেই প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেওয়া যায়। আমলার ওপর আঞ্চলিক দলীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। সব শেষে, বিচারালয়ে বিচারপতিগণ জনতার আদালতের (People's Courts) বিচারকের প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে অবতীর্ণ হন।

সোবিয়েত রাশিয়া, চীন ও পোলাণ্ড পশ্চিম ইউরোপীয় সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলি মার্কস্ লেনিনের আদর্শ মেনে চলে; সাম্যবাদীগণ এদের "জনগণতন্ত্র" বলেন তাঁদের মতে সম-ভোগবাদী এই সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলিতেই প্রকৃত গণতন্ত্র আছে: অন্যত্র বুর্জোয়া শ্রেণী পার্লা-মেণ্টকে "শুয়োরের খোঁয়াড়" রূপে চালনা করে

পশ্চিমী গণতন্ত্রের এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থকগণ অবশ্য জনগণতন্ত্রের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে এই সাম্যবাদী দেশগুলিতে বলপূর্বক রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের আনুগত্য আদায় করে নেওয়া হয়। জনগণের বিচারালয় ভারতের গ্রামাঞ্চলে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত ন্যায়পঞ্চায়তগুলির মত গণতান্ত্রিক আদর্শকে মাটির মানুষের খুব কাছাকাছি নিয়ে যাবার জন্য হয়ত উদ্যোগী হয়ে ওঠে। কিন্তু চীন এবং সোবিয়েত রাশিয়ার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই রাষ্ট্রগুলির সমালোচকেরা এদের প্রকৃত গণতন্ত্র বলতে নারাজ। তাঁদের মতে পশ্চিমী গণতন্ত্রে পুঁজিপতিদের প্রভাব থাকলেও সেখানে জনমত স্বাধীন, সজাগ ও সচেতন থাকতে পারে বলে সেই সমস্ত দেশেই কেবল গণতন্ত্র স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়বিচারের নীতি অনুসরণ করতে সক্ষম হয়। পুঁজিপতিগণও জনগণের বিরুদ্ধে যেতে পারেন না। জনগণতন্ত্র সাম্যবাদী দেশগুলিতে নামসর্বস্বমাত্র। বলা হয়—এই দেশগুলিতে আসলে সাম্যবাদী দলের একক নেতৃত্বে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয় এবং জনগণকে সেই শাসনতন্ত্র জোরজবরদস্তির চাপে মানতে বাধ্য করা হয়।

কিন্তু পশ্চিমী, উদারপন্থী গণতন্ত্রের নেতাগণ এর জবাবে বলেন যে, সাম্যবাদী রাষ্ট্রে প্রকৃত গণতন্ত্র নেই, আছে একদলীয় একনায়কতন্ত্র

॥ গণতন্ত্রের গুণবিশ্লেষণ ॥

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র সংসদীয় গণতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর প্রায় অর্ধাংশ সাম্যবাদের প্রভাবে আসার ফলে চীন, সোবিয়েত রাশিয়া, কোরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশগুলিতে এবং পূর্ব ইউরোপের পোল্যান্ড্, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে অবশ্য জনগণতন্ত্র প্রচলিত। তবুও যখন গণতন্ত্রের গুণসম্পর্কে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয়, তখন বাস্তবিক পক্ষে পরোক্ষ বা সংসদীয় বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রেরই গুণগুলির কথাই উল্লেখ করা হয়।

পৃথিবীর প্রায় অর্ধাংশে সাম্যবাদী জনগণতন্ত্র বজায় থাকলেও গণতন্ত্রের দোষগুণ বলতে উদারপন্থী সংসদীয় গণতন্ত্রের দোষগুণই বোঝায়

গণতন্ত্রের বহু গুণের কথা উল্লেখ করা হয়। প্রথমতঃ, গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল ব্যক্তিস্বাধীনতা। নাগরিকগণকে নানাপ্রকার মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়। এভাবে তারা তাদের ব্যক্তিত্ববিকাশের নানা সুযোগলাভ করে। লোকে যেমন নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকে, তেমনি অপরের অনুরূপ অধিকারভোগে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। ফলে গণতন্ত্র একটা স্বাধীন পরিবেশ গড়ে তোলে। এটাই হল গণতান্ত্রিক পরিবেশ।

গণতন্ত্রের গুণ: (১) ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর জোর দিয়ে মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়

দ্বিতীয়তঃ, জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ প্রভৃতি গণতন্ত্রের পূজারীগণ গণতন্ত্রকে আদর্শ শাসনব্যবস্থা বলে মনে করেন। তার প্রধান কারণ—এই সরকারের দায়িত্বশীলতা। মন্ত্রিসভা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিগণ আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন। আইনসভা তাঁদের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করলে মন্ত্রিগণকে পদত্যাগ করতে হয়। সুতরাং সর্বদাই গণতান্ত্রিক সরকার তার কার্যকলাপের জন্য জনগণের কাছে দায়ী

(২) জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল গণতন্ত্রকে আদর্শ শাসন ব্যবস্থা বলেছেন; কারণ, এখানে শাসকগণ স্বৈরাচারী হতে পারেন না

থাকে। এই দায়িত্বশীলতাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে শাসকবর্গের স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে পরিণত হতে দেয় না। সুতরাং গণতন্ত্রের মধ্যে স্বৈরাচারতন্ত্রের কোনও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। তাই গণতন্ত্রকে জনগণের নিজেদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলে অভিনন্দন জানানো হয়। জনসাধারণ সার্বভৌমত্বের অধিকারী হয়। এটাই ত' নাগরিকের কাছে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনের চরম, আদর্শ পরিণতি।

তৃতীয়তঃ, বেন্থাম্ (Benthan), জেমস্ মিল্ (James Mill) প্রভৃতি ইংরেজ হিতবাদী (Utilitarian) দার্শনিকদের মতে, যে কোনও সরকারের উপযোগিতা নির্ভর করে সেই সরকার কতটা পরিমাণে ঘোষিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে তার ওপর। একমাত্র গণতন্ত্রই জনসাধারণের সবচেয়ে বেশী মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করে। সুতরাং কেবল গণতান্ত্রিক সরকারই জনগণের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণের চেষ্টা করতে পারে।

(৩) কেবল গণতন্ত্রই ব্যক্তিবর্গের সার্বিক মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট

(৪) নাগরিকগণ ভাল-ভাবে রাজনৈতিক শিক্ষা-লাভ করেন

চতুর্থতঃ, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই গণতন্ত্রে মুখ্যভাবে বা গৌণ-ভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করতে হয়। ফলে নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে বেশী বিকশিত হবার সুযোগ লাভ করে। নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষালাভ কেবল গণতন্ত্রেই সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে ঘটে থাকে।

পঞ্চমতঃ, গণতন্ত্রে মনে করা হয় যে রাষ্ট্র ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের জন্য একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। এইভাবে গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের ওপরে ব্যক্তিকে স্থান দেওয়া হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করার ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নাগরিকদের ন্যায়বিচার, সাম্য, মৈত্রী এবং সৌভ্রাত্রের রাখীবন্ধনে আবদ্ধ করে। জনগণের আস্থার ওপর গণতান্ত্রিক আদর্শের কার্যকারিতা প্রধানতঃ নির্ভরশীল। গণতন্ত্রে কোনও দল, গোষ্ঠী বা শ্রেণী তাদের সংকীর্ণ শ্রেণীগত স্বার্থসিদ্ধি করতে পারে না। গণতন্ত্র সাধারণের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান।

(৫) রাষ্ট্রের ওপর ব্যক্তির স্থান; তাই সাম্য, মৈত্রী, ন্যায়বিচার, সৌভ্রাত্রের পরিবেশ সৃষ্টি সহজ

ষষ্ঠতঃ, জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ গণতন্ত্রের সমর্থনে যে অকাট্য মনোবৈজ্ঞানিক যুক্তি-গুলি প্রদর্শন করেছেন, সেগুলি অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, গণতন্ত্র মানুষকে আত্মনির্ভর, আত্মশাসিত, আত্মবিশ্বাসী এবং আত্মসচেতন করে তোলে। তাই গণতন্ত্রকে তিনি আত্মশিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট বাহন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। লর্ড্ ব্রাইস্ বলেছেন যে, নাগরিকের চরিত্রের সার্বিক উৎকর্ষ গণতন্ত্রের দ্বারাই সম্ভব। কারণ নাগরিকের পূর্ণ মনুষ্যত্ববোধ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাতেই ঘটে। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্গণ মিল্ ও ব্রাইসের মতের সমর্থনে আরও কতকগুলি মনোবৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করেন। গণতন্ত্র নাগরিকদের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ (Political Participation) তাদের দেশের নানাপ্রকার সমস্যা সম্পর্কে সজাগ করে দেয়। এইরকমভাবে ক্রমাগত তাদের বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের ফলে তাদের মানসিক উন্নতি

(৬) মিল্, ব্রাইস্ প্রভৃতির মত আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের যুক্তি গণতন্ত্র ব্যক্তিকে আত্ম-সচেতন, আত্মশাসিত আত্মবিশ্বাসী ও আত্ম-নির্ভর করে, তার চরিত্র বিকাশের সহায়ক।

ঘটে। দেশের কাজে তাদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। ফলে গণতন্ত্রে নাগরিকগণ দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠেন। শুধু ভোটদানের রাজনৈতিক অধিকারের জন্য নয়, সার্বিক অধিকার লাভ করার ফলে নাগরিকগণ নিজেদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। সরকারকে তাঁরা নিজেদের সরকার বলে মনে করেন, সরকারের সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়তাবোধ জেগে ওঠে। তাঁদের দায়িত্ববোধ এবং কর্তব্যবোধ অনেক উন্নত হয়।

সপ্তমতঃ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থায়ী শাসনব্যবস্থা। আইন ও শৃঙ্খলা এখানে যত ভালভাবে বজায় রাখা যায়, ততটা অন্য কোনও শাসনব্যবস্থায় যায় না। জনগণের চরম অসন্তোষ ও বিক্ষোভ থেকেই বিপ্লবের জন্ম হয়। কিন্তু জনগণ জানেন যে, গণ-তান্ত্রিক সরকার তাঁদের নিজেদেরই সরকার। তাঁরা ইচ্ছা করলে যে কোন সময়ে অবাঞ্ছিত সরকারের অপসারণ ঘটাতে পারেন। তাই গণতন্ত্র বিপ্লবের সম্ভাবনা থেকে, একনায়কতন্ত্রের রক্তারক্তি থেকে মুক্ত থাকে। দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রী, কুচক্রী আমলা, বেপরোয়া প্রশাসক, সকলেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শেষ পর্যন্ত জনগণের কর্তৃত্বের অধীন। এজন্যই গণতান্ত্রিক সরকারকে জনপ্রিয় সরকার বলা হয়। জনগণ সরকারকে প্রগতিশীল করে তুলতে পারেন। সরকারও জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পেরে নিজেদের শাসননীতিকে প্রয়োজনমত পরিবর্তিত করে নিতে পারেন। তাই গণতান্ত্রিক সরকারে শান্তিপূর্ণভাবে আলাপ, আলোচনা, আপোষ ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে দেশের সমস্ত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

(৭) শাসক-শাসিত সম্পর্ক ভাল থাকায় ও শান্তিপূর্ণভাবে সরকার বদলের ব্যবস্থা থাকায় গণতন্ত্রে বিপ্লব, বিক্ষোভের সম্ভবনা কম ; তাই তার স্থায়িত্ব

অষ্টমতঃ, আরিস্টটলের যুক্তি স্মরণ করে গণতন্ত্রের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলতে গিয়ে বার্কার গণতন্ত্রের দুটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, কেবল গণতন্ত্রেই ন্যায়, সত্য, সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে গণতন্ত্র সমতা প্রতিষ্ঠা করে। তা ছাড়া, মিলের কথা প্রতিধ্বনিত করে তিনি বলেছেন যে, শুধু গণতন্ত্রই জনগণের চরিত্র বিকাশের সহায়ক। এই দিক থেকে বিচার করলে গণতন্ত্রকে জনগণের প্রকৃত শাসনতন্ত্র বলে বর্ণনা করা খুবই সঙ্গত। যখনই সমাজে অন্যায় এবং অনাচার দেখা দেয়, তখনই জনসাধারণ নিজেদের মনোবলের জোরেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন।

(৮) আরিস্টটলের কথায় বার্কার বলেছেন—শুধু গণতন্ত্রেই সত্য, ন্যায়, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ রূপায়িত, ব্যক্তি প্রতিবাদের অধিকার পায়

নবমতঃ, গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর সর্বজনীনতা। গণতন্ত্রে বলা হয় যে রাষ্ট্র সকলেরই, এটা কারুর ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ গণতন্ত্রকে শুধু সংখ্যা-গরিষ্ঠের শাসনতন্ত্র বলে বর্ণনা করে ক্ষান্ত হন না, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থও গণতন্ত্রে কত যথার্থরূপে সুরক্ষিত হয়, সেই বিষয়টির প্রতিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে, গণতন্ত্র সকল শ্রেণীরই স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে। কোথায় জুতোর কাঁটা

(৯) গণতন্ত্র সর্বজনীন, অভিজ্ঞতাভিত্তিক শাসনব্যবস্থা ; যার পায়ে জুতো তিনিই জানেন কাঁটা কোথায়, ব্যথা কোথায়

পায়ে লাগে সেটা যে জুতো পায়ে দেয় কেবল সেই বোঝে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ স্বার্থ সম্পর্কে, নিজের সুখসুবিধা সম্পর্কে এই ধরনের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকে। তারই ভিত্তিতে গণতন্ত্রে নাগরিকদের সার্বিক স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। এই যুক্তিটিকে গণতন্ত্রের সমর্থনে অভিজ্ঞতাভিত্তিক (empirical) যুক্তি বলে ধরে নেওয়া হয়।

দশমতঃ, আরিস্টটলের সংজ্ঞায় গণতন্ত্রকে বিকৃত শাসনব্যবস্থারূপে ধরা হলেও তিনি গণ-সার্বভৌমত্বের পক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা প্রকৃত গণতন্ত্রের পক্ষে অকাট্য যুক্তি। তিনি বলেছেন যে, কোনও প্রীতিভোজে পাচকদের চেয়ে ভোক্তাগণই ভোজ্যের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে যেমন সঠিকভাবে মতামত প্রকাশের অধিকারী, ঠিক তেমনি অধিকারী কোনও গানবাজনার জলসায় গায়কের চেয়ে সমঝদার শ্রোতারা। এ ক্ষেত্রে আরিস্টটলীয় যুক্তির প্রধান তাৎপর্য হল এই যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনকার্য চালাবার জন্য সমাজের সব শ্রেণী থেকেই জ্ঞানী-গুণীদের সমবেত প্রচেষ্টাকে সকলের হিতসাধনে ভালভাবে কাজে লাগান যায়। তাই আরিস্টটল ঠিকই বলেছেন—বহুজনের মধ্যেই প্রজ্ঞার প্রকৃষ্ট প্রকাশ ঘটে ("in multitude there is wisdom")।

(১০) আরিস্টটলের আরেক যুক্তি : পাচক নয়, ভোক্তাই প্রীতি-ভোজের ভালমন্দের বোদ্ধা, জলসায় গায়ক নন, শ্রোতাই গানের সমঝদার ; বহুজনের প্রজ্ঞার সার্থকতম সমন্বয় প্রকৃত গণতন্ত্রেই

একাদশতঃ, ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে এখনও পর্যন্ত রাজতন্ত্র অথবা অভিজাত-তন্ত্রের বিকল্প শাসনব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত। গণ-জীবনের সংগঠন, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণে এই সরকারের দক্ষতা ঐতিহাসিকগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। উপরন্তু রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌, দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল সুনাগরিক সৃষ্টি একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাতেই সম্ভব। এজন্যই গণতন্ত্র জাতীয় ঐক্যের, জাতীয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। গণতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে, জনমত গঠনের মাধ্যমগুলিও সরকারী কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত থাকে। এই মুক্ত পরিবেশই গণতন্ত্রে শিল্প, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতির ব্যাপক উন্নতিসাধনে সহায়তা করে। শান্তির সময়ে দেশগঠনের কাজে, যুদ্ধের সময় দেশরক্ষার কাজে জনগণের সুগভীর দেশাত্ম-বোধ, অপূর্ব স্বার্থত্যাগ, ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং অপার উৎসাহ সব সময়েই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে উন্নতির পথে, সমৃদ্ধির শীর্ষে তোলার চেষ্টা করে।

(১১) উন্নতচরিত্রের নাগরিক গণতন্ত্রই গড়ে তোলে ; উদার উন্মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যেই শিল্প, সংস্কৃতি অর্থনীতি উন্নত হয় ; সব সময়েই গণতান্ত্রিক নাগরিক রাষ্ট্রের প্রধান সম্বল

দ্বাদশতঃ, "যুদ্ধ ধ্বংসের যমদূত, শান্তি সৃষ্টির মেঘদূত।" গণতন্ত্রের সর্বাঙ্গীন মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, প্রশান্ত পরিবেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতা পূর্ণভাবে বিকশিত হয়, ব্যক্তির সুকুমার বৃত্তিগুলি বর্ধিত হয়, শান্তির আবহাওয়ায় মানুষের প্রচেষ্টা সৃজনশীলতার পথে ধাবিত হয়। "অন্য দেশগুলির সঙ্গেও সম্পর্কনির্ণয়ের ক্ষেত্রে টিটো, জওহরলাল, ইন্দিরা গান্ধীর মত গণতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থিতি নীতি" (Peaceful Co-existence) অনুসরণ করেন। তাই গণতন্ত্র আন্তর্জাতিক শান্তি ও বিশ্বমৈত্রী স্থাপনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

(১২) 'যুদ্ধ ধ্বংসের যমদূত, শান্তি সৃষ্টির মেঘদূত' ; প্রশান্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার একমাত্র সহায়

সব শেষে বলা যায় যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মত অতি-আধুনিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানও তার সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে সাম্য, আন্তঃরাষ্ট্রিক সহযোগিতা ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি স্থাপনের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক আদর্শ তাই আজ শুধু রাষ্ট্রিক বা জাতীয় আদর্শমাত্র নয়। এর ব্যাপকতা আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে একে আন্তর্জাতিক জীবনাদর্শে রূপান্তরিত করেছে। "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—কবির এ উক্তি গণতন্ত্রের আদর্শেরই সঠিক অভিব্যক্তি। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে যেমন ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে গণতন্ত্র একটা সমন্বয় রচনার চেষ্টা করে, এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের ভেদাভেদ দূর করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সে একটা একতা, এক ধরনের সমতা গড়ে তোলে। গণতান্ত্রিক একতার মূল সূত্র তাই আজ শুধু সঙ্কীর্ণভাবে রাষ্ট্রিক নয়, সচেতন, জৈবিক, আন্তর্জাতিক। এ ঐক্য শাসক-শাসিতের তুচ্ছ ব্যতিহারের অনেক ঊর্ধ্বে, একটা মননসমৃদ্ধ, বিশ্বজনীন, বিপুল একরূপতা। মানুষ ভুল করতে পারে, আবার মানুষ ভুল সংশোধন করতেও সক্ষম। এভাবেই মানবসভ্যতা অগ্রসর হয়েছে মানুষেরই প্রচেষ্টায়। সাধারণ মানুষের চিরন্তন সততা ও সরলতার ওপর, তার চেষ্টা ও নিষ্ঠার ওপর এই অবিচল শ্রদ্ধাই রাষ্ট্রিক এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে পৃথিবীর সর্বত্র সভ্য মানুষের কাছে অন্ন-বস্ত্রের মত অপরিহার্য করে তুলেছে, একে বিশ্বের অমূল্য সম্পদে পরিণত করে রেখেছে।

(১৩) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মত আন্তর্জাতিক সংস্থাও গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে; তাই গণতন্ত্র আজ বিশ্বজনীন, মননসমৃদ্ধ আদর্শ, সভ্য মানুষের কাছে অন্নবস্ত্রের মত অপরিহার্য, বিশ্বের অমূল্য সম্পদ

॥ গণতন্ত্রের সমালোচনা : তার দুর্বলতা, অসুবিধা, বিপদ, বিচ্যুতি ॥

গণতন্ত্রের সগৌরব জয়যাত্রার মাঝেও এর দুর্বলতা, অসুবিধা, বিপদ, ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু কিছু বিরূপ সমালোচনা শোনা যায়। সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে এই সমালোচনাগুলি কিছুটা অতিরঞ্জিত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে এগুলি সংশোধনযোগ্য, কতকগুলি আবার শুধু গণতন্ত্রের সমালোচনা নয়, যে কোনও শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধেই সেগুলি প্রযোজ্য। এগুলি নিয়ে একে একে আলোচনা করা যাক।

গণতন্ত্রের সমালোচনাগুলি বহু ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত, কোন কোনটি সংশোধনযোগ্য

প্রথমেই বলা যায় গণতন্ত্রের বিকৃতির কথা। আরিস্টটল্ গণতন্ত্রকে উচ্ছৃঙ্খল, অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনতার দ্বারা চালিত একটি অস্বাভাবিক অবাঞ্ছনীয় শাসন-ব্যবস্থারূপে সমালোচনা করেছেন। কার্লাইল্ (Carlyle) একে 'মূর্খের রাজত্ব' বলে উপহাস করেছেন। লেকি (Lecky), মেকলে (Macaulay) প্রভৃতি লেখকগণও এই মত সমর্থন করেছেন। অনেক আধুনিক শাসনতন্ত্রবিদ্ মনে করেন যে, আধুনিক জটিল শাসনতন্ত্রের পরিচালনা এবং সমালোচনার জন্য যে বিশেষজ্ঞতা থাকা দরকার, গণতন্ত্রে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে তা দাবী করা উচিত নয়। জনগণের যে সংযম, শৃঙ্খলাবোধ, মাত্রাজ্ঞান এবং নিরপেক্ষতা গণতন্ত্রকে একটি আদর্শ শাসন-

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা : (১) কার্লাইল্, লেকি, মেকলের মতে গণতন্ত্র "মূর্খের রাজত্ব", যথাগুণ্তিই এখানে বড় কথা, মাথাটা নয়; গুণের চেয়ে গণনার জোর বেশী; শাসন-ব্যবস্থা গতানুগতিক, রক্ষণশীল

ব্যবস্থা করে তুলতে পারে, বহু ক্ষেত্রেই তা পাওয়া যায় না। গণতন্ত্রে মাথাগুণতিই বড় কথা, মাথাটা নয় ; গুণের চেয়ে গণনার জোর বেশী। জনগণের প্রাধান্যে গণতন্ত্র সাধারণ এবং নিম্নস্তরের এক গতানুগতিক, রক্ষণশীল শাসনতন্ত্রে পরিণত হয়। কিন্তু এই যুক্তিটি সব সময়ে ঠিক নয়। ইংলণ্ড্, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স্, ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি দেশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে উন্নত এবং সমৃদ্ধ। এদের কোন কোনটি অপরের তুলনায় বেশী উন্নয়নশীল।

(২) মেন্ জনগণের খেয়াল-খুশীর ওপর বিরক্ত ; ঘন ঘন মন্ত্রি-বদলের আশংকা ; ঘন ঘন নির্বাচন দরিদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যয়বহুল

দ্বিতীয়তঃ, হেন্‌রি মেন্ গণতন্ত্রকে অস্থির শাসনতন্ত্ররূপে দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মেন্ বলেছেন যে, জনগণের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী গণতান্ত্রিক সরকার চালিত হয়। বিশেষতঃ, মন্ত্রিসভাশাসিত গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলাদলির ফলে দেশে চরম অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। ফ্রান্সে রাজনৈতিক দলাদলির ফলে ঘন ঘন মন্ত্রিসভার রদবদল সংসদীয় গণতন্ত্রকে একটা বিদ্রূপের বিষয় করে তুলেছিল। ঘন ঘন নির্বাচনব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হলে গণতন্ত্র অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ এই কারণে সংসদীয় গণতন্ত্রকে দরিদ্র, অনগ্রসর দেশের ক্ষেত্রে একটা বিলাসিতা বলে উপহাস করেন।

(৩) গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ; নেতারা ধনী, বাক্‌পটু, কল্পনা-বিলাসী, ধোঁকাবাজ, দুর্নীতিগ্রস্ত হলে সরল অসহায়, দরিদ্র জনগণের বিপদ

তৃতীয়তঃ, আইনসভার মধ্যে কার্যতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ভোটের জোরে নিজেদের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারকে বজায় রাখার চেষ্টা করে। এই সংখ্যাধিক্যের আস্ফালনে সময় সময় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। লোকের দারিদ্র্য, অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বা দলীয় সংগঠনের সুযোগ নিয়ে অনেক সময় ধনী, বাক্‌সর্বস্ব, দলবাজ, কল্পনাবিলাসী, দুর্নীতিপরায়ণ, ধোঁকাবাজ নেতৃবৃন্দ নির্বাচনের সময় আইনসভায় নিজেদের বা নিজের গোষ্ঠীর স্বার্থ সিদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। সৎ, যোগ্য, নিরপেক্ষ, স্বাধীনচেতা লোকে তাঁদের মানমর্যাদা পান না। এই অবস্থায় জনগণের সার্বভৌমত্ব শুধু আনুষ্ঠানিক নীতিমাত্র থেকে যায়, তার বাস্তব রূপায়ন সম্ভব হয় না।

(৪) বিধায়কগণের আইন প্রণয়ন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞতার অভাব

চতুর্থতঃ, আইনসভায় সাধারণ জনপ্রতিনিধিদের বিশেষজ্ঞতার অভাব থাকার ফলে আইনসভায় এক একটি বিশেষজ্ঞের দলের ওপর অর্থাৎ এক একটি ছোট উপসমিতির ওপর আইনপ্রণয়নের প্রকৃত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

পঞ্চমতঃ, রাজনৈতিক দলব্যবস্থা গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য ; বিশেষতঃ, যদি গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে ইংলণ্ডের বা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের মত সংসদীয় গণতন্ত্রের রূপ ধারণ করে। কিন্তু এই দলপ্রথাই আবার অনেক সময়ে গণতন্ত্রের চরম ত্রুটি-বিচ্যুতির হেতু হয়ে দাঁড়ায়। তত্ত্বগতভাবে বিচার করলে স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে, গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। কিন্তু

গণতন্ত্রে নিছক দলবাজির ফলে মন্ত্রিসভা অর্থাৎ শাসনবিভাগ সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ায়। দলীয় স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের চেয়ে বেশী গুরুত্ব লাভ করে। দলের নেতাগণ নির্লজ্জভাবে সরকারী সুযোগসুবিধা ভোগ করে থাকেন। ফলে দুর্নীতি দেখা দেয়। প্রগতিশীলতার পরিবর্তে গতানুগতিকতা, উন্নয়নশীলতার বদলে রক্ষণশীলতা, বৈচিত্র্যের বদলে গড্ডলিকা গণতন্ত্রকে স্থাণু, স্থবির করে তোলে। অথবা, এর চরম বিপরীত অবস্থা দেখা দিতে পারে। তখন জনগণের খেয়ালখুশীর ওপর গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। কিন্তু গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই সমালোচনাটি রাজনৈতিক দলব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা। রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রকৃত ক্ষমতা আবার গণতান্ত্রিক জনগণেরই হাতে। রুশো উপহাস করে বলেছেন যে ইংলণ্ডের জনগণ শুধু নির্বাচনের সময়েই স্বাধীনতা লাভ করে থাকেন। ইংরেজগণ হয়ত রুশোর ব্যাখা অনুযায়ী প্রত্যক্ষ গণসার্বভৌমত্বের অধিকারী নন। কিন্তু অন্ততঃ নির্বাচনকালে তাঁদের সার্বভৌমত্ব রুশো পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারেন নি। তবে সংসদীয় গণতন্ত্রে দলবাজির দরুন গণতন্ত্র অস্থায়ী শাসনব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায়—এরকম যুক্তি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা যায় না। দল বড় নয়, দেশ বড়।

(৫) রাজনৈতিক দলব্যবস্থা গণতন্ত্রে অপরিহার্য হলেও অবাধ, নির্লজ্জ দলবাজী দুর্নীতি ও চরম রক্ষণশীলতার জনক; দল বড় নয়, দেশ বড়

ষষ্ঠতঃ, গণতন্ত্রে নাগরিকদের রুচি, বুদ্ধি প্রভৃতি নীচু স্তরের হয়ে থাকে। তাদেরই অবাধ রাজত্বের ফলে উন্নত মানের সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না। মেন্ ও লেবঁর মতে গণতন্ত্রে শিল্প, কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির গবেষণা এবং ক্রমোন্নতি ব্যাহত হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সিনেমা প্রভৃতি অগণিত নিম্নমান বিকৃত-রুচির ব্যক্তির সন্তুষ্টির জন্য অত্যন্ত স্থূল, এমন কি অশালীন পর্যায়ে নেমে যায়। সাংস্কৃতিক অবক্ষয় বা অপসংস্কৃতির জন্ম হয়। এ যুগের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ নাট্যকার বার্নার্ড্ শ' (Bernard Shaw) এজন্য জনপ্রিয়তার অর্থ করেছেন 'অশালীনতা' ("Popularity means vulgarity")। কিন্তু জনগণের বিচার, বুদ্ধি প্রভৃতিকে এভাবে নিন্দা করে গণতন্ত্রর অসারতা প্রমাণ করা সব সময়ে ঠিক নয়। গণতন্ত্রী জনসাধারণকে উঁচুমানের কোনও আর্টের বা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করে দেবার দায়িত্ব বুদ্ধিজীবী নেতৃবৃন্দেরই। লোকে কখনও ভাল কিছু আস্বাদন করার সুযোগ পেলে খারাপের পেছনে ছোটে না। তা না হলে দুনিয়াতে অসংখ্য খারাপ জিনিস স্বল্পসংখ্যক ভাল জিনিসকে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সমস্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই পরাস্ত করে অপসারিত করে দিত। প্রেয়কে বাদ দিয়ে শ্রেয়কে খুঁজে নিয়ে মানবসভ্যতা এগিয়ে যেতে পারত না।

(৬) মেন্ ও লেবঁর মতে সাধারণের রুচি ও জ্ঞানের ঘাটতির জন্য গণতন্ত্রে অপসংস্কৃতি দেখা দেয়; "জনপ্রিয়তা অশালীনতা" (বার্নার্ড্ শ')

সপ্তমতঃ, ল্যাস্কি প্রভৃতি সমাজতন্ত্রবাদী লেখকগণের মতে গণতন্ত্র কখনই সমাজতন্ত্র ছাড়া সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। গণতন্ত্রের তথাকথিত স্বাধীনতা, ন্যায় এবং সাম্যের নীতি শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ, কুচক্রী রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার

শিকার হয়ে দাঁড়ায়, কোনও পুঁজিবাদী ধনিকশ্রেণীর কর্তৃত্বে কার্যতঃ অলীক হয়ে দাঁড়ায়, অথবা কোনও কায়েমী স্বার্থের চক্রান্তে চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই কোনও বিশিষ্ট চক্রের বা গোষ্ঠীর স্বার্থে আইন প্রণয়ন হয়। এর ফলে দেশের সার্বিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই সমালোচনার কিছুটা তাৎপর্য আছে। গণতন্ত্রের এই ধরনের সম্ভাব্য দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আজকাল কোথাও খাঁটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী (Individualistic) গণতন্ত্র দেখা যায় না। এর বদলে ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের (Welfare State) মতাদর্শ গ্রহণ করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদের সুফলগুলির মধ্যে সমন্বয় স্থাপনে ব্রতী হয়েছে। ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আদর্শ অনুযায়ী এই রাষ্ট্রগুলি নানাভাবে নাগরিক অধিকার রক্ষার চেষ্টা করে। আবার, প্রয়োজনমত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করে এই রাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্রের মঙ্গলবিধায়ক ক্ষমতাকে প্রসারিত এবং ফলপ্রসূ করে তোলে।

(৭) ল্যাস্কি প্রমুখ সমাজতন্ত্রী বলেন, সমাজতন্ত্র ছাড়া গণতন্ত্র সফল হয় না ; ধনতন্ত্রের কায়েমীস্বার্থ গণতন্ত্রবিরোধী ; আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ

অষ্টমতঃ, অ্যালিয়ান্ আয়ারল্যাণ্ড্ (Alleyane Ireland), প্রেস্কট্ হল্ (Prescot Hall) প্রভৃতি জীবনবিজ্ঞানীর অভিযোগ : সাম্যের নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে গণতন্ত্র জন্মগতভাবে অর্জিত (hereditary or genetic) বৈষম্যকে অস্বীকার করে। এই ঝোঁক অবাস্তব ও বিজ্ঞানবিরোধী।

(৮) অ্যালিয়ান্ আয়ারল্যাণ্ড, প্রেস্কট্ হল্ প্রভৃতির মতে গণতান্ত্রিক সাম্যনীতি জীববিজ্ঞানের জন্মগত অর্জনসূত্রের বিরোধী বলে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ

নবমতঃ, অনেকে মনে করেন যে, জরুরী অবস্থায় গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র সত্বর সিদ্ধান্ত নিয়ে আপৎকালীন বিপর্যয় থেকে দেশকে দ্রুতভাবে রক্ষা করতে পারে না। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সাধারণতঃ আইনসভা, মন্ত্রিসভা দলীয় সভা প্রভৃতি সভাসমিতির সদস্যদের পরামর্শ নিয়ে সিদ্ধান্ত স্থির করা হয়। এই বৈঠকী চালে শাসনব্যবস্থা চলার ফলে তাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অহেতুক বিলম্ব হয়। "অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট" এ প্রবাদটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে অনেকে বলেন যে, গণতন্ত্র জরুরী অবস্থায় অক্ষম শাসনব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু দু'টি মহাযুদ্ধের সময়েই ইংলণ্ডে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। অবশ্য তখন সেখানে একদলীয়, যৌথ মন্ত্রিসভা (Coalition Cabinet) স্থাপিত হয়। ইংলণ্ডে দু'বার এই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থাকাকালীন তার যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, উপযুক্ত নেতৃত্ব থাকলে স্বাভাবিক অবস্থা এবং জরুরী অবস্থা এই দুই ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র শক্তিশালী এবং সক্ষম শাসনব্যবস্থা।

(৯) "অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট"—আইনসভা, মন্ত্রিসভা, দলীয় সভা ইত্যাদি নিয়ে বৈঠকী চালে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে জরুরী অবস্থায় গণতন্ত্র বিলম্বিত ; বিপক্ষে দুটি মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের নজির

॥ গণতন্ত্রকে সফল করার উপায় ॥

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন্ ঘোষণা করেন যে, এই যুদ্ধে স্বৈরাচারতন্ত্রী জার্মানীর পতনের ফলে গণতন্ত্রের জয় সূচিত হয়। তাঁর মতে এ যুদ্ধ ছিল গণতন্ত্রকে বাঁচাবার যুদ্ধ ("a war to make the world safe for Democracy")। কিন্তু তারপর জার্মানীতে হিট্‌লারের এবং ইতালীতে মুসোলিনির নেতৃত্বে আরও সুগঠিতভাবে স্বৈরাচারী, একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। গণতন্ত্র পুনরায় একনায়কতন্ত্রের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ফলে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এ যুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজে আরও ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া হয়। সেজন্য এই যুদ্ধের ধ্বংসলীলা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের ওপর প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণ করে। এর শোচনীয় পরিণতি আজ ইতিহাসের পাতায় বিবৃত। অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও প্রথম মহাযুদ্ধের মত গণতন্ত্র শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। এর অর্থ হল যে, গণতন্ত্রের এমন একটা অন্তর্নিহিত নৈতিক শক্তি আছে যে, যে কোনও আক্রমণের বিরুদ্ধে এর জয় অবশ্যম্ভাবী। সাধারণ মানুষের, মেহনতী জনতার সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তিকে, শুভ-কামনাকে মূলধন করে এই শাসনতন্ত্র কাজ করে। অগণিত খেটে-খাওয়া মানুষের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয়, খামখেয়ালী, ক্ষমতালোভী যুদ্ধবাদী, একনায়কতন্ত্রী নেতার হুমকি গণতন্ত্রকে কখনই বিপর্যস্ত করতে পারে না। দু'টি মহাযুদ্ধে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ ঘোষণার অর্থ এ নয় যে সে গণতন্ত্র পরিত্যক্ত হবার ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। -এর অর্থ হল আদর্শ শাসনব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও গণতন্ত্রের সাফল্য কতকগুলি প্রয়োজনীয় শর্তের ওপর নির্ভর করে। এই শর্তগুলি না থাকলে গণতন্ত্রকে কখনই টিকিয়ে রাখা যায় না।

দুটি মহাযুদ্ধেই গণতন্ত্র একনায়কতন্ত্রকে পরাস্ত করে; কারণ, গণতন্ত্র খেটে-খাওয়া মানুষের গড়ে-তোলা শাসনব্যবস্থা; দুটি মহাযুদ্ধ গণতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল; তা থেকে বোঝা যায় যে, কতকগুলি শর্তের ওপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানী এবং ইতালীর ইতিহাস আলোচনা করলেই এই দেশ দু'টিতে স্বৈরাচারী একনায়কের শাসন কেন প্রতিষ্ঠিত হয় তা বোঝা যায়। জার্মানী প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত হবার ফলে ইংলণ্ড্, ফ্রান্স্ প্রভৃতি বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি তার কাছ থেকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দাবী করে। কতকগুলি কিস্তিতে এই ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা থাকলেও এই বিপুল অর্থ তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। অসংখ্য কর্মক্ষম জার্মান পুরুষ যুদ্ধে নিহত হন। দেশব্যাপী চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির চাপের ফলে জার্মানীর অসহায় অবস্থাকে বহু জার্মান 'জাতীয় অপমান' বলে মনে করেন এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা পোষণ করেন। এই চরম দুর্দিনে হিট্‌লার জার্মানদের দেশপ্রেমের ওপর আঘাত করে জাতির ঐক্যের স্বার্থে তাঁর নেতৃত্বে তাঁদের সংগঠিত হবার আহ্বান জানালেন। জার্মান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই জার্মানীতে হিট্‌লারের ও ইতালীতে মুসোলিনির নেতৃত্বে গণতন্ত্র-বিরোধী একনায়কতন্ত্র সেখানে প্রচলিত গণতান্ত্রিক সংবিধানকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে; কারণ, সেই গণতান্ত্রিক সংবিধানকে চালু রাখার মত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত সেখানে তখন ছিল না

জাতির জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব তাঁকে ও তাঁর স্বজাতিদের বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের জন্য উৎসাহিত করে তুলল। জার্মানীতে এক নতুন জাগরণের চিহ্ন দেখা দিল, যদিও সে জাগরণ এক অসুস্থ জাতির নেত্র-উন্মলীনমাত্র। ইতালীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। মহাযুদ্ধে জয়ী হলেও দেশের যুদ্ধোত্তর বেকারত্ব, দারিদ্র্য, জনসংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতি অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ইতালীর যুবকদের মুসোলিনী নতুন এক ঐক্যের সন্ধান দিলেন। অর্থনৈতিক সংকট এড়াবার জন্য ইতালীকে হতে হল সাম্রাজ্যবাদী। আদ্রিয়াতিক উপকূলে, আফ্রিকার আবিসিনিয়ায় তাকে উপনিবেশ স্থাপনে বাধ্য হতে হল। সেই সময়ে জার্মানী এবং ইতালী এই দুই দেশেই গণতান্ত্রিক কাঠামোরূপে একটা সংবিধান চালু ছিল। কিন্তু গণতন্ত্রকে সফল করার মত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত সেই কাঠামোকে নিরাপদে কার্যকর করে তুলতে দেয় নি।

জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ গণতন্ত্রকে সফল করে তোলার জন্য তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন—(ক) সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যেন গণতন্ত্রে আগ্রহী থাকে এবং সেই গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনার জন্য যেন যথোপযুক্ত ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করে: (খ) তারা যেন নিজেদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা বিপন্ন হলে তা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত থাকে; (গ) তাদের নাগরিক কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে তারা যেন অবহিত থাকে এবং সেই কর্তব্যগুলি পালন করতে উদাসীন না হয়। মিলের পক্ষে এই তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার আসল তাৎপর্য হল এই যে, গণতন্ত্রকে সফল করে তুলতে হলে **চাই গণতান্ত্রিক নাগরিক**। সুনাগরিক না থাকলে কখনই গণতন্ত্র গড়ে উঠতে পারে না। সুনাগরিকের গুণ অনেক। তাকে পরমতসহিষ্ণু হতে হবে, অন্য নাগরিকদের সুবিধা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, দরকারমত আপোষ এবং বোঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, এক কথায় দেশের এবং জনগণের সার্বিক স্বার্থ এবং কল্যাণ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্ত: (১) জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ শর্ত আরোপ করেছেন—জনগণের আগ্রহ, প্রয়োজনমত সংগ্রামের প্রস্তুতি নাগরিকদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা: চাই গণতান্ত্রিক নাগরিক

(২) চাই গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য

দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্রকে সফল করে তোলার জন্য **চাই গণতান্ত্রিক পরিবেশ** এবং **ঐতিহ্য**। এ গুলিকে কেন্দ্র করে পরিবেশ গড়ে ওঠে এমন কতকগুলি ঘটনার ওপর রাষ্ট্রের সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। বিচারালয়ের নিরপেক্ষতা রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, প্রকৃতভাবে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক সাম্য প্রকৃতভাবে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। গণতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন সুসমভাবে বণ্টিত হওয়া প্রয়োজন। উৎপাদনের চেয়ে তাই বণ্টন-ব্যবস্থার ওপর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বেশী জোর দেন। উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত হলেও যদি মুষ্টিমেয় শ্রেণী সেই উৎপাদনের ফল আত্মসাৎ করে, তাহলে গণতন্ত্রের সাম্য এবং ন্যায়বিচারের নীতি কার্যকর হতে পারে না। এই কারণে আধুনিক উদারপন্থী গণতন্ত্রগুলি নিজেদের জনকল্যাণকর রাষ্ট্ররূপে গড়ে

(৩) অর্থনৈতিক সাম্য

তুলতে চেষ্টা করে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অবাধ ধনতন্ত্রের সংস্কার সাধন করে অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয়করণের নীতি অনুসরণ করে চলে। আজকাল তাই গণতান্ত্রিক দেশগুলির অধিকাংশেরই সমাজতন্ত্রের কিছু কিছু সুফল শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতি ঝোঁক দেখা যায়।

(৪) জনমতগঠনের মাধ্যমগুলির গণতান্ত্রিকীকরণ চাই: ইংলন্ডের বি বি সির নজির

চতুর্থতঃ, গণতান্ত্রিক পরিবেশ রচনার আরেকটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র হল জনমত গঠনের মাধ্যমগুলির গণতান্ত্রিকীকরণ। ইংলন্ডের সর্বপ্রধান বেতারকেন্দ্র বি. বি. সি. র (B. B. C. বা British Broadcasting Corporation) ওপর সরকারের কোন কর্তৃত্ব নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে একটি স্বায়ত্তচালিত প্রচারকেন্দ্র। অনেক দেশে গণতান্ত্রিক কাঠামো প্রচলিত থাকলেও সেখানে সংবাদপত্রগুলি বড় ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া কর্তৃত্বে পরিচালিত হয় এবং সেগুলি তাদেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

(৫) জঙ্গী ছদ্ম-গণতন্ত্র বা আপাত-গণতন্ত্র সম্পর্কে সাবধানতা দরকার

পঞ্চমতঃ, কোনও কোনও দেশে আবার গণতান্ত্রিক কাঠামোর পেছনে এবং সাম্য, ন্যায়বিচার প্রভৃতি গালভরা বুলি ধ্বনিত হলেও সেখানে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকে। এগুলি আপাত-গণতন্ত্র বা ছদ্ম-গণতন্ত্র বা প্রচ্ছন্ন-গণতন্ত্র (Pseudo-Democracy)। এখানে বহু রাজনৈতিক দলের চিন্তাধারার এবং ভাবনা বৈচিত্র্যের সুযোগসুবিধা থেকে সকলে বঞ্চিত হয়। সব কিছুই একমুখিতার ছাঁচে ঢালা হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন দেশে গণতন্ত্রের মুখোশের আড়ালে সামরিক কর্তৃত্বের মুখ লুকিয়ে থাকে। এ দেশগুলি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক দেশ নয়, এগুলি জঙ্গী রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৬) গরিষ্ঠ, লঘিষ্ঠ দুই সম্প্রদায়কে পরস্পর-নির্ভরশীল হতে হবে; উগ্র গরিষ্ঠদের আধিপত্য বালির বাঁধ রচনা; অজ্ঞ লঘিষ্ঠদের সংকীর্ণতা জাতীয় স্বার্থের বিরোধী

ষষ্ঠতঃ, গণতন্ত্র সকলের শাসনতন্ত্র। তাই এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির আনুগত্য, শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা না পেলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের আধিপত্য স্থাপন বালির বাঁধ রচনার মতই। আবার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়েরও কতকগুলি কর্তব্য আছে। তারা যেন তাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সম্পর্কেই বেশী সচেতন হয়ে সমগ্র জাতির স্বার্থের প্রতি অজ্ঞতা বা ঔদাসীন্য প্রকাশ না করে। এরকম ঝোঁক সংখ্যালঘিষ্ঠ চিন্তাধারাই সৃষ্টি করে।

(৭) সরকারী ও বিরোধী দলগুলিকে দেশপ্রেমিক, বিবেকবান্, ন্যায়বোধসম্পন্ন, পরমতসহিষ্ণু, সংযমী, সংগঠনমূলক, সহযোগী হতে হবে

সপ্তমতঃ, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলির মুখ্য ভূমিকা নির্দেশিত। উন্নত এবং সুন্দর রাজনৈতিক দলব্যবস্থা না থাকলে সংসদীয় গণতন্ত্র কখনই সফল হতে পারে না। দলের নেতাদের দেশপ্রেম, বিবেক এবং ন্যায়বোধকে ভিত্তি করে কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থাটিকে যদি দলীয় নেতাগণ নিজেদের ক্ষমতার লড়াইয়ের "স্টেডিয়াম" বলে কল্পনা করেন, তাহলে রাজনৈতিক দলগুলি বিপন্ন ত হবেই, দেশের স্বার্থ এবং নাগরিক স্বার্থও বিঘ্নিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলের নেতার সম্পর্ক অত্যন্ত সংগঠনমূলক ও সহযোগিতাপূর্ণ হওয়া দরকার। দু'পক্ষকেই রাজনৈতিক স্থিতিস্থাপকতার ধর্ম মেনে চলতে হবে। কারণ গণতান্ত্রিক রাজনীতি এমন একটা অদ্ভুত খেলা, যেখানে দু'পক্ষকেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, কোন পক্ষকেই অনমনীয় মনোভাব নিয়ে থাকলে চলে না। দুপক্ষকেই সংযমী, পরমতসহিষ্ণু হতে হবে।

অষ্টমতঃ, গণতান্ত্রিক সাফল্য নির্ভর করে নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষার মানের ওপর। আরিস্টটল্ প্রাচীনকালে এই কথাটির ওপর জোর দেন। জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ একদিকে যেমন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের দাবী সমর্থন করেছেন, অপরদিকে আবার নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের অভিযান চালাবার জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতাদের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, গণভোটের ব্যাপক প্রসার-সাধনের পূর্বে ব্যাপক গণশিক্ষা বিস্তার অবশ্য প্রয়োজন ("Universal teaching must precede universal enfranchisement")। বর্তমানে ডিকিন্সন্ (G. Lewis Dickinson) এবং মাইকেল্ ওক্শট্ (Michael Oakeshott) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তারের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই উদ্দেশ্যেই আধুনিককালে ইউনেস্কো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের দারিদ্র্যের সমতুল্য নিরক্ষতার যে অভিশাপ অত্যন্ত অসহায় এবং বিপন্ন করে রেখেছে, তা থেকে মুক্তি দেবার জন্য আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে ব্যাপক গণশিক্ষা বিস্তারের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বেতার, তথ্যচিত্র, দূরদর্শন প্রভৃতি শ্রাব্য এবং দৃশ্য মাধ্যমে (audio-viusal aids) গণশিক্ষাদানের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে। অন্ধ এবং বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদের মধ্যে গণশিক্ষা বিস্তারের জন্য যথোপযুক্ত পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যপদ্ধতির ওপর গবেষণা চালান হচ্ছে এবং সেগুলি কার্যকর করারও চেষ্টা করা হচ্ছে।

(৮) নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষার মান উন্নত থাকা চাই ঃ মিল্, লিউইস্ ডিকিন্সন, মাইকেল্ ওক্শট্ গণশিক্ষা প্রসার চান ; ইউনেস্কোর ব্যাপক উদ্যোগ

নবমতঃ, বিশেষজ্ঞ, সৎ এবং দক্ষ প্রশাসন ছাড়া গণতন্ত্রকে সফল করে তোলা যায় না। জেম্স্ বার্নহাম্ (James Burnham) তাই উপদেশ দিয়েছেন যে, গণতান্ত্রিক প্রশাসনকে দক্ষ এবং তৎপর করতে হলে প্রশাসনিক কর্মীদের মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের নেতৃত্ব দেওয়া দরকার। এই নেতৃত্ব ঠিকভাবে নতুন সমাজকে ও নতুন গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পরিচালনা করবে। তাঁর মতে সম্পত্তিগত আইনকানুন এবং সাধারণ বিধিব্যবস্থার উপযুক্ত পুনর্বিন্যাসই হল নতুন গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় "নেতৃত্বগত বিপ্লবের" ("Managerial Revolution") মূল উদ্দেশ্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র হল সংসদীয় শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন। এই ব্যবস্থায় দলগত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে মন্ত্রিসভার রদবদল ঘটে। কিন্তু আমলাতন্ত্রকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

(৯) জেম্স্ বার্নহাম্ গণতন্ত্রে "নেতৃত্বগত বিপ্লব" চান ; চাই সৎ, দক্ষ, বিশেষজ্ঞ, নিরপেক্ষ আমলাতন্ত্র

দশমতঃ, গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে দলীয় নেতৃত্বের ওপর। যে দলই মন্ত্রিসভা গঠন করুক না কেন, দেশের স্বার্থ সম্পর্কে, নাগরিকদের হিতাহিত সম্পর্কে, পরিকল্পিত শাসননীতির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমলাদের উচিত মন্ত্রীদের সতর্ক করে দেওয়া এবং বিভাগীয় সমস্ত নথিপত্রের ধারাবাহিকতার পরিপ্রেক্ষিতে শাসনতন্ত্রে পরিচ্ছন্নতা এবং নিরপেক্ষতার আদর্শ স্থাপন করা। মন্ত্রিদেরও উচিত, আমলাদের প্রগতিশীল, সৎ, দক্ষ কর্মীরূপে প্রকাশ করতে দেওয়া। আজকাল অনেক সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিদের কারুর কারুর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়। জাপানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি এই অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন, কিন্তু তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সবটাই তাঁর অধীনস্থ প্রশাসনবিভাগের কর্মীদের ওপর চাপাবার চেষ্টা করেছেন। "এক হাতে তালি বাজে না" এই প্রবাদটি স্মরণ করে অনেকেই এসব ক্ষেত্রে মনে করেন যে, আমলাতন্ত্রও দুর্নীতিপরায়ণ। সম্ভাব্য অন্তর্দলীয় কোন্দলে যেন আমলাতন্ত্র নিজেদের জড়িয়ে না ফেলেন।

(১০) সৎ, দক্ষ, দেশপ্রেমিক দলীয় নেতৃত্ব এবং মন্ত্রী ও আমলার মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা দরকার

একাদশতঃ, গণতন্ত্রকে সফল করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে দরকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ গড়ে ওঠে জনগণের আত্মসংযম, দেশপ্রেম, পরমসহিষ্ণুতা ইত্যাদি চারিত্রিক গুণের ওপর। দলীয় নেতাগণ বিরোধী নেতাদের মতামতকে গ্রাহ্য বলে মনে করেন না। ইংলণ্ডে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ হল সংগঠনমূলক, দায়িত্বশীল, দেশপ্রেমিক বিরোধীদল (Her Majesty's Opposition)। নাগরিকদের মধ্যে প্রকৃত দেশপ্রেম সঞ্চারিত করার জন্য বাল্যকাল থেকেই মাতাপিতা, শিক্ষক প্রভৃতিকে তৎপর হতে হবে। কেউ কেউ বলেন যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যখন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মৌল মতবিরোধ দেখা দেয় না, তখনই প্রত্যেকে পরমতসহিষ্ণু হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্য থাকলেও ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা অনেক সময় স্বাভাবিক বা বাঞ্ছিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে চীনা সমাজতন্ত্রী নেতা মাও সে-তুঙের (Mao tse-Tung) কথাটি স্মরণযোগ্য—কাননে এক সহস্র ফুল ফুটে উঠলেই যেমন সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় ("If thousand flowers bloom"), সাম্যবাদী, সমাজেরও সেভাবে সুন্দর হয়ে ওঠা উচিত।

(১১) চাই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সংযম, দেশপ্রেম, পরমতসহিষ্ণুতা, সংগঠন মূলক, দায়িত্বশীল, দেশপ্রেমিক বিরোধী দল

দ্বাদশতঃ, কোন কোন রাজনীতিবিদ্ মনে করেন যে, লিখিত সংবিধান, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা ও অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation of Power), স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয়, নাগরিকদের নানাপ্রকার মৌলিক অধিকার সম্প্রদান ও সুরক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি কতকগুলি সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের সাফল্য সুনিশ্চিত হয়।

(১২) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ দরকার

ত্রয়োদশতঃ, অতি-আধুনিক যুগের রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ স্যুম্‌পেটারের (Schumpeter) একটি প্রস্তাব বিশেষভাবে সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি হল গণতন্ত্রকে সফল, সচল, রাখার জন্য সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, যুক্তিবাদী, বিবেকবোধযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের (Political Leadarship) সংগঠনের ব্যবস্থা রাখা। এ ক্ষেত্রে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা থাকা উচিত। রাজনৈতিক দলের নেতাগণ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, শিক্ষিত জনগণ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা—সকলেরই নিজ নিজ ভূমিকা রয়েছে।

(১৩) স্যুম্‌পেটারের মতে যথার্থ মূল্যবোধ সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ

চতুর্দশতঃ, ল্যাস্কি প্রমুখ সমাজতন্ত্রবাদী রাজনীতিবিদ্‌গণ মনে করেন যে, গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে শুধু রাজনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থার দিকে নজর দিলে চলবে না। গণতন্ত্রের সাফল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর। তাই সমাজতন্ত্রবাদীগণ মনে করেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ ব্যক্তিগত মালিকানার জবরদস্তী শোষণ থেকে জনগণকে মুক্ত করা দরকার। অর্থাৎ গণতন্ত্রকে সফল করে তুলতে হলে তাকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে (Socialist Democracy) রূপান্তরিত করতে হবে।

(১৪) ল্যাস্কির প্রস্তাব গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয় চাই

কোনও শাসনব্যবস্থাই একেবারে ত্রুটিবিহীন, নিখুঁত হতে পারে না। শাসনতন্ত্র মানুষের জন্য মানুষেরই সৃষ্টি। সুতরাং মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রের দোষত্রুটির যথাযোগ্য প্রতিফলন ঘটে শাসনতন্ত্রের ওপর। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও তাই। সুইজারল্যাণ্ডে যে পরিবেশে গণতন্ত্র সফল হয়েছে, সেই পরিবেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশা করা অন্যায়। ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে গণতন্ত্রের নীতিগুলি যেভাবে সফল হয়ে এসেছে, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে গণতান্ত্রিক নীতিগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেই ধরনের সাফল্য আশা করা বৃথা। শাসনতন্ত্রের এই আপেক্ষিকতাবাদ (Theory of Relativity of Government) প্রাচীন যুগে আরিস্টটল্‌ এবং আধুনিক যুগে জন্‌ স্টুয়ার্ট্‌ মিল্‌ আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছেন। এই নীতির তাৎপর্যই হল সমাজ এবং মানুষের ক্রমিক পরিবর্তনশীলতার ফলে তাদের নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলির গতিশীলতা। গতিশীলতা ক্ষেত্রবিশেষে অধোগমনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, সময়বিশেষে প্রগতিশীলতার পরিস্থিতি রচনা করে থাকে। কিন্তু একথা ঠিক, চলমান ব্যক্তিজীবনের ও সমাজজীবনের জটিল সমস্যাগুলির সমাধান না করতে পারলে গণতন্ত্রের সাফল্য কামনা করা বৃথা। ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের তারতম্যের জন্য বিভিন্ন দেশে নানা সময়ে অনেক রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা-সমীক্ষার ফলে রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক আপেক্ষিকতাবাদের একটি প্রধান মূল্যবান সূত্র হল যে, নির্দিষ্ট কতকগুলি শর্ত-সাপেক্ষে গনতন্ত্রই হল আদর্শ শাসনব্যবস্থা। "অবমানিত গণতন্ত্র, তোমায় ভালবাসি"

উপসংহার : সব সরকার আপেক্ষিক : পরিবেশের তারতম্য অনুসারে পরীক্ষা নিরীক্ষা-সমীক্ষা গণতন্ত্রকে সফল করবে ; কারণ, গণতন্ত্র থাকছে, থাকবে

("Oh disrespectable democracy ! I love you")—এড্ওয়াড্ কার্পেণ্টারের (Edward Carpenter) এই উক্তিটি চিরস্মরণীয়।

॥ ভারতে গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তগুলি কতদূর কার্যকর ? ॥

পৃথিবীর সকলেই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেন যে, ভারত এশিয়ার তথা বিশ্বের বৃহত্তম গণ-তন্ত্র যেখানে নির্বাচন নাগরিক অধিকার, বহুদলীয় ব্যবস্থা, কেন্দ্র-বিরোধী দল-গুলির সরকার গঠনের অধিকার স্বীকৃত

পৃথিবীর সকলেই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেন যে, ভারত এশিয়ার তথা পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। সবচেয়ে বৃহৎ সংখ্যক নির্বাচক ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন নির্বাচনগুলিতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। ভারতীয় সংবিধান নাগরিকদের নানাপ্রকার মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে। বিচারালয় স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করে। বহুদলীয় ব্যবস্থা (plural-party system) এখানে প্রচলিত থাকার ফলে কেন্দ্রে কংগ্রেসী ও অন্যান্য বহু রাষ্ট্রে অনেক অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা কার্যকর। সকলেই খোলাখুলি বিপক্ষের বা প্রতি-পক্ষের সমালোচনা করতে পারে। এই সমস্ত যুক্তির দ্বারা বলা যায় যে, ভারতে গণতন্ত্র অগ্রগামী।

কিন্তু অনেকের মতে ভারতে গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তগুলি সব ক্ষেত্রে কার্যকর নয় ; (১) সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজতন্ত্র গঠনের প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও মিশ্র অর্থনীতির সীমা-বদ্ধতা

কিন্তু অনেক সমালোচকের মতে ভারতে গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তগুলি বহু ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকর নয়। তাঁদের যুক্তি হল, প্রথমতঃ, নাগরিকগণের অর্জিত রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার-গুলি দেশবাসীদের মধ্যে চরম অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য প্রকৃত অর্থে কার্যকর নয়। এ কথা সত্য যে, ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Preamble) ভারতকে একটি "সমাজতন্ত্রী প্রজা-তন্ত্র" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (Mixed Economy) দরুন সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ এখানে পাশাপাশি সক্রিয়। অনেকের মতে, বেসরকারী উদ্যোগ ভারতে ভালভাবে জনস্বার্থে এখনও নিয়ন্ত্রিত করা হয় নি। এই অভিযোগ শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য নয়, পশ্চিম বঙ্গ ও ত্রিপুরায় সমাজতন্ত্রী বাম-ফ্রণ্ট্ সরকারের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য।

(২) ইংলণ্ডে শক্তি-শালী, দায়িত্বশীল সংগঠনমূলক বিরোধী দলব্যবস্থা আছে, ভারতে নেই

দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডে গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করলে জানা যায় যে, সেখানে সামন্ততন্ত্রের (Feudalism) এবং অভিজাততন্ত্রের নেতৃত্বে ও বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় ক্রমশঃ গণতন্ত্রের সূচনা ঘটে। পরবর্তীকালে শিল্প বিপ্লবের (Industrial Revolution) পর ধনতন্ত্রের উন্নতি ঘটলে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে উদারপন্থী ও সবল রাখার ব্যবস্থা হয়। সরকারী দল ও বিরোধী দল (Opposition Party) এই দ্বিদলীয় শাসনব্যবস্থাও (Two Party System)

ইংলণ্ডের গণতন্ত্রকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সব দিক থেকে গতিশীল রাখতে সাহায্য করেছে।

(৩) ব্যাপক নিরক্ষরতার ফলে জনগণ কুসংস্কার, কুপ্রথার শিকার

তৃতীয়তঃ, ভারতীয় জনগণের একটা বিরাট অংশ, বিশেষতঃ, গ্রামীন জনগণ নিরক্ষর। শিক্ষার অভাবে তারা নানাপ্রকার অজ্ঞতা, কুসংস্কার, কুপ্রথা ইত্যাদির শিকার হয়। বহু সমাজ-সমীক্ষক, সমাজসেবকের এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। ফলে জনগণকে চিরাচরিত বা গতানুগতিক কাঠামো থেকে মুক্ত করে নতুন, প্রগতিশীল, সংস্কারমুক্ত সমাজে উন্নীত করে তোলা কঠিন।

(৪) সুযোগ্য বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব; শিক্ষিত সমাজের বিদ্যা পুঁথিগত, বুদ্ধিজীবীরা বেশীর ভাগ সুবিধাবাদী

চতুর্থতঃ, ভারতীয় গণতন্ত্রে সুযোগ্য, বলিষ্ঠ নেতৃত্বের একান্ত অভাব। শিক্ষিত সম্প্রদায় পুঁথিগত বিদ্যার জোরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। দরিদ্র, নিরক্ষর, নিরন্ন গ্রামবাসীদের ব্যথাবেদনার কাহিনী তাঁরা শোনেন না, শুনলেও নিষ্ক্রিয় থাকেন। বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বেশীর ভাগ সময়েই সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করে চলেন, যখন যে শাসক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তাদের তুষ্ট করে চলার চেষ্টা করেন।

(৫) রাজনৈতিক দলগুলির শোচনীয় ব্যর্থতা, গোষ্ঠীগত অন্তর্দ্বন্দ্ব, স্ববিরোধী কথাবার্তা

পঞ্চমতঃ, ভারতীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলি উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। রাজনৈতিক দলগুলির কর্মীদের কাছে দেশের চেয়ে দল বড়। মুখে "জাতীয় সংহতি" "প্রগতি" ইত্যাদির কথা বললেও তাঁরা দলীয় বা উপদলীয় স্বার্থকেই নির্লজ্জভাবে ও বেপরোয়াভাবে চরিতার্থ করার চেষ্টা করেন। ভারতে বিরোধী দলগুলির শোচনীয় ব্যর্থতার দরুণ কেন্দ্রে ও অঙ্গরাজ্যে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে স্বৈরাচারী মনোভাব গড়ে ওঠার ঝোঁক দেখা যায়। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তীব্র গোষ্ঠীগত অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধিতার লক্ষণগুলিও প্রকট। যেমন, মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললেও নির্বাচনের মুখে বাইরে থেকে বিশেষ সম্প্রদায়ের নেতাদের এনে তাঁদের মারফত ভোট আদায়ের চেষ্টা হয়। স্মরণীয় যে, ইংলণ্ডে সংসদীয় গণতন্ত্র সফল হবার পিছনে রয়েছে শক্তিশালী, দেশপ্রেমী, সংগঠনমূলক কর্মসূচীতে বিশ্বাসী বিরোধী দলের (Her Majesty's Opposition) নেতৃত্ব।

(৬) ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ও অগ্নি-যুগের গৌরবময় ঐতিহ্য থেকে বর্তমান বিলাসী দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাগণ বিচ্যুত

ষষ্ঠতঃ, ভারতে স্বাধীনতাসংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের এবং অগ্নিযুগের আত্মত্যাগী দেশনেতাদের অবিনশ্বর দৃষ্টান্তের উপস্থিতি সত্ত্বেও বর্তমান দেশনায়কগণ, শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কর্ণধারগণ দেশবাসীদের সেই ঐতিহ্যকে স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে সঞ্চিত রাখতে শেখান নি। তাঁদের বিলাসিতা, স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, অহংকার জনমানসে প্রচণ্ড হতাশা ও বেদনা সৃষ্টি করে।

সপ্তমতঃ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ মানেই যুক্তি-তর্ক, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা। এজন্য চাই পরমতসহিষ্ণুতা, আত্মসংযম, পারস্পরিক বোঝাপড়া। ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাগণ সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত, দলগত বা রাজনৈতিক স্বার্থে মিথ্যাভাষণ, অপপ্রচার কুৎসারটনা ইত্যাদি কুৎসিত কাজে লিপ্ত হন, সুকৌশলে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এক পক্ষ বিপক্ষীয় নেতাদের চরিত্রহননের অপচেষ্টা চালায়। বিশেষতঃ, নির্বাচনের সময় ব্যাপকভাবে এ ধরনের দুর্ঘটনাগুলি চোখে পড়ে। নিতান্ত স্পর্শকাতর গোষ্ঠীগত, সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় বিষয়গুলিকে অপচেষ্টার হাতিয়াররূপে ব্যবহার করা হয়।

(৭) পরমতসহিষ্ণুতা, সংযম, বোঝাপড়া ইত্যাদি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বড় অভাব; বিশেষতঃ নির্বাচনের সময় পারস্পরিক চরিত্রহনন

অষ্টমতঃ, দক্ষ, দায়িত্ববোধসম্পন্ন, কর্তব্যনিষ্ঠ, জনদরদী সরকারী কর্মীও আজকাল অত্যন্ত কম দেখা যায়। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মন্ত্রিগণই অনেক সময় নিজেদের ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে সকল বর্গের সরকারী আমলা ও কর্মীদের ন্যায্য ও নিরপেক্ষভাবে প্রশাসন পরিচালনা করতে বাধা দেন—এরকম অভিযোগ বহু নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকের।

(৮) জনদরদী সরকারী কর্মচারী বিরল, মন্ত্রিগণেরও বাধা দান

নবমতঃ, ইংলন্ডে অসংখ্য গণতান্ত্রিক প্রথা গড়ে ওঠার ফলে একটি সুদৃঢ় গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রে এভাবে প্রথাগত পদ্ধতির মারফত কোন গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এখনও সৃষ্টি হয় নি। নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীকে কোন "নিরাপদ" কেন্দ্র থেকে পরবর্তী উপ-নির্বাচনে জয়ী করে তাকে জোরজবরদস্তি করে মন্ত্রিসভায় ঢোকানো, ইচ্ছামত প্রসাদ-বিতরণের জন্য সীমাহীনভাবে মন্ত্রিসভা-সম্প্রসারণ, বিরোধী দলগুলিকে উদ্ধতভাবে অগ্রাহ্য করা, সংসদে সরকারপক্ষের দলীয় সদস্যদের সরকারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমালোচনায় বাধা (whip) দেওয়া—এ সমস্তই ভারতীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ বিপজ্জনক ঝোঁক।

(৯) ইংলন্ডের মত সংসদীয় রীতিনীতি ভারতে এখনও গড়ে ওঠে নি

দশমতঃ, নির্বাচনব্যবস্থায় অনেক সময় ব্যাপকভাবে কারচুপি (rigging), ভুয়া বা বেআইনী ভোটদান, ভোটারতালিকায় ইচ্ছাপূর্বক বড় বহরে ভুলত্রুটি বজায় রাখা, নির্বাচনের সময় বুথ-দখল, ভোটারদের ভীতিপ্রদর্শন, নির্বাচনে সরকারী যানবাহন, কর্মচারী প্রভৃতি দলীয় স্বার্থে ব্যবহার—ইত্যাদি বহু মারাত্মক অভিযোগও প্রায়ই শোনা যায়। ভারতের মত বৃহৎ প্রজাতন্ত্রে সুদূর নয়াদিল্লীতে অবস্থিত নির্বাচনী কমিশনের পক্ষে এ সমস্ত দুর্নীতি দূর করা অসম্ভব। নির্বাচনী নিয়মকানুন অনুসারে এই দুর্নীতিগুলি নিয়ে মামলামোকদ্দমার ফলাফল অত্যন্ত দেরীতে প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া নিয়মকানুনগুলি নানাবিধ কায়দাকানুনের খুঁটিনাটির (technicalities) ওপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। ফলে, দুর্নীতি প্রকাশ্য ও ব্যাপক হলেও তার প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীরা নিতান্ত অসহায় বোধ করেন।

(১০) নির্বাচনে রিগিং, জাল ভোট, ভোটারতালিকায় কারচুপি, বুথদখল, সরকারী কর্মচারীদের দলীয় স্বার্থে নির্বাচনে ব্যবহার ইত্যাদি ঘটনা বিশেষ উদ্বেগজনক

উপসংহারে বলা যায় যে, যে শর্তগুলি ভারতে গণতন্ত্রের সাফল্যের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে সেগুলি প্রায় সব ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক পরিবেশ গঠনের বাধা। সেগুলি বেশীর ভাগই রাজনৈতিক দলগুলি দূর করতে পারে। সেজন্য চাই গভীর আন্তরিকতা, অকৃত্রিম দেশপ্রেম, নিবিড় স্বাজাত্যবোধ।

উপসংহার: এই ত্রুটি-মোচনের দায়িত্ব মূলতঃ রাজনৈতিক দলগুলির

॥ একনায়কতন্ত্র, সামগ্রিক বা সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র : তার সংজ্ঞা ॥

কার্টার (Carter) ও হার্জ (Herz) বলেছেন যে, গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার দুটি বিপরীত মেরুর মত ("Democracy and totalitarianism as systems form polar points on the spectrum of political alternatives.")। সুতরাং গণতন্ত্রকে যদি জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলা যায়, তা হলে কোন ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) বলতে হবে।

কার্টার ও হার্জের মতে গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র দুটি বিপরীত মেরু

যখন একনায়কতন্ত্রী নেতা বা নেতৃগণ রাষ্ট্রের সমস্ত শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রের নামে নিজের বা নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে রাখেন, তখন সেই রাষ্ট্রকে সামগ্রিক বা সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র (Totalitarian State) বলে। সাধারণতঃ কোন মতাদর্শ (ideology) বা কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর মাধ্যমে সামগ্রিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। প্রাচীন রোমে জুলিয়াস সিজার (Julius Caesar), ফরাসী দেশে নাপোলিয়ঁ (বা নেপোলিয়ন, Napoleon) একনায়কতন্ত্রী শাসক ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে হিটলার (Hitler), ইতালীতে মুসোলিনি (Mussolini), স্পেনের সেনাপতি ফ্রাঙ্কো (General Franco), তুরস্কে মুস্তাফা কামাল পাশা (আতাতুর্ক) একনায়কতন্ত্র প্রবর্তন করেন।

একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা: এই শাসনব্যবস্থায় সমস্ত ক্ষমতা নেতা বা তাঁর অনুচরগণের করায়ত্ত ; এর সঙ্গে সামগ্রিক রাষ্ট্রের সম্পর্ক ; জুলিয়াস সীজার, নাপোলিয়ঁ (নেপোলিয়ন), হিটলার, মুসোলিনি, কামাল পাশা একনায়কতন্ত্রী

শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর বিচারে (Political Systems analysis) একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও দুটির মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য আছে। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে রাজা বা রাণী উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি নন। কিন্তু একনায়কতন্ত্রের প্রধান শাসক নিছক সামরিক বা বুদ্ধির জোরে গণতন্ত্রকে অবলম্বন করে পরে সেই গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করে নিজের পদে দীর্ঘদিন স্থায়ী হবার চেষ্টা করে থাকেন। গণতন্ত্রের চটকদার বুলি বা স্লোগানকে (slogan) আশ্রয় করে গণতান্ত্রিক দলব্যবস্থার মাধ্যমেই একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাবকে তাই আপাত-গণতান্ত্রিক (Pseudo-democratic) দুর্ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করা হয়।

একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের মধ্যে তুলনা: একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রকে আশ্রয় করেই আপাত-গণতান্ত্রিকতার অন্তরালে গড়ে ওঠে

॥ একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাবের কারণ ॥

রাজনীতিবিদ্‌দের মতে একনায়কতন্ত্র কোন তাৎক্ষণিক ঘটনা নয়, তার উদ্ভবের পেছনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক ও আন্তর্জাতিক কারণ থাকে। এগুলির কোন কোনটি আবার অন্য কারণের সঙ্গে যৌথভাবে সক্রিয় থাকে। প্রথমতঃ, (ক) রাজনীতির ক্ষেত্রে যে ক্ষমতার লড়াই (Power Politics) দেখা যায়, একনায়কতন্ত্র তার চরম পরিণতি। প্রাচীন রোমে কন্সাল্ (Consul) বা অধিনায়ক পদকে কেন্দ্র করে জুলিয়াস্ সীজারের (Julius Caesar) আবির্ভাব এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। (খ) একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাবের আরেকটি রাজনৈতিক কারণ হিসাবে গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা হয়। বলা হয় যে, গণতন্ত্র ধীর গতিতে পরিবর্তন আনে। কিন্তু যখন কোন জরুরী অবস্থা দেখা দেবার ফলে লোকে অতি দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন প্রত্যাশা করে তখন তারা একনায়কতন্ত্রের দিকে ঝোঁকে। তারা অধৈর্য হয়ে "ধীরে চলার নীতির" (go slow policy) বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। (গ) রাজনীতিবিদ্‌গণ সকলেই স্বীকার করেন যে, একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থাকে আশ্রয় করেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। হিট্‌লার ভোটের মাধ্যমেই জার্মানীর "চ্যান্সেলার" (Chancellor) পদ দখল করেন, তারপরই সন্ত্রাসবাদী পথে রাইখ্‌স্টাগ্ (Reichstag) নামক জার্মান্ আইনসভায় অগ্নি সংযোগ করেন ও এ ধরনের গুপ্ত কার্যকলাপ রোধ করার অজুহাতে আইনসভা ভেঙ্গে দেন। সুতরাং গণতন্ত্রের দলব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতিই পরোক্ষভাবে একনায়কের পথ প্রশস্ত করে দেয়। (ঘ) গণতন্ত্রের চরম বিকৃতি ঘটে যখন আমলাগণ অসৎ, অপদার্থ দায়িত্বজ্ঞানহীন ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠেন। গণতন্ত্রের আদর্শ অনুসারে সরকারী কর্মীরা সকলেই জনসেবক। বিকৃত গণতন্ত্রে জনসেবার পরিবর্তে তাঁরা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হন। তাঁদের মধ্যে কোন কোন দক্ষ আমলা মন্ত্রীদের "কাছের লোক" হয়ে ওঠেন ও নানাপ্রকার কুপরামর্শ দিয়ে ষড়যন্ত্র করে সংসদীয় গণতন্ত্রকে বিকল করে দেন। আমলানির্ভর সংসদীয় গণতন্ত্র গোষ্ঠীভিত্তিক একনায়কতন্ত্রেরই নামান্তর। (ঙ) কোন কোন নেতা নাগরিকদের স্বভাবজাত দেশপ্রেমকে বিকৃত ও জঙ্গী করে তোলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব উগ্র জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রীয় মতাদর্শরূপে গড়ে ওঠে। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানদের জাতীয় লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নেবার জন্য হিট্‌লার এইভাবে জার্মান্‌দের উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী করে তোলেন। বিকৃত জাতীয়তাবাদ ও জঙ্গী সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম।

একনায়কতন্ত্র তাৎক্ষণিক ভাবে আবির্ভূত নয় ; এর উদ্ভবের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক পটভূমি : (১) রাজনৈতিক কারণ— (ক) ক্ষমতার লড়াই ; (খ) গণতন্ত্র ধীর, শিথিল ; মানুষ দ্রুত ফল চায় : (গ) গণতন্ত্রের ব্যর্থতার অন্যান্য কারণ ; (ঘ) দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্র ; (ঙ) উগ্র দেশপ্রেম বা বিকৃত জাতীয়তাবাদ

দ্বিতীয়তঃ, মার্ক্‌স্‌বাদীগণের মতে ধনতান্ত্রিক সমাজ অসম বণ্টনব্যবস্থা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদি সৃষ্টি করে। তখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পটভূমিকা

থাকলেও হয়ত উপযুক্ত নেতৃত্ব বা বিকল্প বিরোধী দল না থাকায় চরম অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্তিলাভের আশায় পরিবর্ত শাসনব্যবস্থারূপে লোকে একনায়কতন্ত্রের প্রতি ঝোঁকে। গুচ্ (G. P. Gooch), কার্ (E. H. Carr) প্রভৃতি খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ্‌গণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী, ইতালী, স্পেন্, তুরস্ক প্রভৃতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে একনায়কতন্ত্রের যুগপৎ আবির্ভাবকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ঐ যুদ্ধে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকেই সবচেয়ে বেশী ঝুঁকি নিতে হয় এবং সেখানকার জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়।

(২) অর্থনৈতিক কারণ ঃ আর্থিক বৈষম্য, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ; গুচ্ ও কারের মতে ১ম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে এজন্যই একনায়কতন্ত্রের জন্ম হয়

তৃতীয়তঃ, মাক্স্ ভেব্যার (Max Weber) প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন যে, ব্যক্তিগত মোহিনী শক্তি বা মহিমার ("ক্যারিস্‌মা" বা Charisma) ফলেই একনায়কতন্ত্রী নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটে। লোকে কুশাসনের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষে কোন মহানায়কের শরনাপন্ন হয়। আরিস্টটল্ ব্যক্তিগত স্বৈরাচারতন্ত্র (Tyranny বা Despotism) বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা বর্তমান যুগে একনায়কতন্ত্রেরই আরেকটি নাম। আদিম কাল থেকেই গোষ্ঠীপতি, কুলপতি, কুলপুরোহিত, সেনাপতি প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে নেতারূপে পূজনীয় হতেন। এঁদের মধ্য থেকেই তখন একনায়কের আবির্ভাব সূচিত হত। চারিত্রিক মহিমার জন্য অর্থাৎ কোন নায়কোচিত গুণের জন্যই ভেব্যারের ব্যাখ্যা অনুসারে গান্ধী, নেহেরু, চার্চিল্, স্তালিন্, নেতাজী প্রভৃতি নেতৃবর্গের প্রাধান্য। এ জাতীয় নেতাদের কেউ কেউ যখন নিজস্ব ব্যক্তিগত শাসনব্যবস্থাকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে ক্ষমতার শীর্ষে থাকার চেষ্টা করেন, তখন একনায়কতন্ত্রী নেতৃত্ব দেখা দেয়। সুতরাং ভেব্যারের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে অন্য দিক থেকে বিচার করলে জানা যায় যে, সুস্থ ও স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অভাব বা ব্যর্থতাই (failure of democratic leadership) একনায়কতন্ত্রের জন্মদাতা।

(৩) মাক্স্ ভেব্যারের নেতৃত্ব সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ঃ নেতার মহিমা বা "ক্যারিস্‌মা" তাঁকে জনপ্রিয় করে ; প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই কারণে নায়কদের নেতৃত্ব ; তাঁদের কেউ অগণতন্ত্রী হলে একনায়ক হয়ে ওঠেন

চতুর্থতঃ, অতি-আধুনিক যুগে পৃথিবীর দুটি বৃহৎ রাষ্ট্র হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েত রাশিয়া। এরা যথাক্রমে ন্যাটো শক্তিগোষ্ঠী ও ওয়ারশ' চুক্তিবন্ধ শক্তিগোষ্ঠী—এই দুটি গোষ্ঠীতে ক্ষমতার মেরুকরণ (Polarisation of power) ঘটিয়েছে। এরা দুজনেই অনেক সময় নিজের গোষ্ঠীগত স্বার্থে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে নিজেদের জোটে আবন্ধ করে রাখতে চায়। সেজন্য প্রায়ই দেখা যায় যে, জোটগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে তারা অনেক সময় চরম অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে সমর্থন জানিয়ে থাকে। যেমন—পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে মার্কিনী ও আফগানিস্তানে সোবিয়েত সরকারের সমর্থন রয়েছে। সুতরাং বলা চলে যে, আন্তর্জাতিক কারণেও বিশ্বে একনায়কতন্ত্রী সরকারের অস্তিত্ব বজায় থাকে।

(৪) একনায়কতন্ত্রের আন্তর্জাতিক ব্যাখ্যা ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে দুটি বিরোধী জোটের রাজনৈতিক প্রশ্রয়েও একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র টিঁকে আছে

॥ একনায়কতন্ত্রের প্রকারভেদ ॥

একনায়কতন্ত্র পাঁচ প্রকার

একনায়কতন্ত্র পাঁচ রকমের হতে পারে। যেমন, (ক) ব্যক্তিগত সামরিক একনায়কতন্ত্র, (খ) আপাত-গণতান্ত্রিক ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্র, (গ) ফ্যাসীবাদী (Fascist) বা নাট্‌সি (Nazi) ব্যক্তিগত বা দলীয় একনায়কতন্ত্র, (ঘ) কম্যুনিস্ট্ (Communist) দলীয় একনায়কতন্ত্র, (ঙ) সম্পূর্ণ একদলীয় একনায়কতন্ত্র।

(১) ব্যক্তিগত সামরিক একনায়কতন্ত্র ঃ সামরিক একনায়ক নকল গণতন্ত্র বা সাজানো নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন ঃ পাকিস্তান, মিশর, বাংলাদেশের নজির

(ক) ব্যক্তিগত সামরিক একনায়কতন্ত্রে দেশের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক চরম অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে কোন সামরিক নেতা রাষ্ট্রিক ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। তিনি হঠাৎ গণ-অভ্যুত্থানের বা কুদ্যেতাত্ (Coup d'etat) এর সাহায্যে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। পাকিস্তানে প্রথমে আয়ুব খাঁ ও পরে ইয়াহিয়া খাঁ, মিশরীয় প্রজাতন্ত্রে কর্ণেল নাশের, বাংলাদেশে জিয়াউর রহমান ও এরসাদ এইভাবে সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। পরে অবশ্য এঁরা সকলেই তাঁদের ইচ্ছামত নকল গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনা করেন বা সাজানো নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন এবং এমনভাবে তাঁদের নেতৃত্বের যথার্থতা (legitimacy) ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন, যার ফলে শাসনতন্ত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে যাঁরা অনভিজ্ঞ, তাঁরা মনে করবেন যে এই সব একনায়কতন্ত্রী সামরিক নেতৃবৃন্দ বুঝিবা জনগণের সমর্থনেই স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।

(২) আপাত-গণতান্ত্রিক ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্র ঃ গণ-রোষ, হতাশা বা সরকারী প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগে বেসরকারী নেতৃত্ব ; জঙ্গী নেতারও এরকম একনায়কত্ব লাভ ; এখানে অভিজাতদের প্রাধান্য ; ইন্দোনেসিয়ার সুকর্ণের নজির

(খ) আপাত-গণতান্ত্রিক ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্রে কোনও বেসামরিক নেতা জনগণের অসন্তোষ ও হতাশার সুযোগ নিয়ে কিংবা প্রচলিত সরকারী প্রশাসন-ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আপাত-গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন। বহু দেশে রাজনৈতিক দলাদলির ফলে গণতন্ত্র বিপর্যস্ত হলে কোনও দলীয় নেতা এভাবে নিজের ব্যক্তিগত স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন গ্রীসে ব্যাসিলিয়াস্ (Bacillius) বলতে এই ধরনের একনায়ককেই বোঝাতো। প্রাচীন রোমক শাসন ব্যবস্থায় মাঝে মাঝে এইরকম একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হত। কিন্তু তখন এই শাসনব্যবস্থা কেবল জরুরী অবস্থায় এবং সীমিত সময় পর্যন্ত প্রযোজ্য থাকত। আধুনিক যুগে বহু ক্ষেত্রেই সামরিক একনায়কতন্ত্র আপাত-গণতান্ত্রিকতার অন্তরালে নিজের সামরিক কর্তৃত্বকে বেসামরিক কর্তৃত্বে রূপান্তরিত করে জনগণের সমর্থনে একনায়কের ব্যক্তিগত স্বৈরাচারকে চিরস্থায়ী করার চেষ্টা করে। তা ছাড়া মন্ত্রিসভা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় অনেক সময় প্রধানমন্ত্রী যদি প্রচন্ড জনপ্রিয় এবং শক্তিশালী হন, তা হলে তিনিও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার শীর্ষে নিজের ব্যক্তিগত শাসন চালিয়ে যেতে পারেন। আইনসভা, মন্ত্রিপরিষদ ইত্যাদি সব কিছুই সেখানে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রকে কেন্দ্র করে, সাংবিধানিক ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়, কিন্তু আসলে অভি-

জাততান্ত্রিক অথবা ব্যক্তিকেন্দ্রিক একনায়কতন্ত্রই কার্যকর হয়ে ওঠে। ইন্দোনেশিয়াতে সুকর্ণের একনায়কতন্ত্র অনেকটা এ ধরনের ছিল।

(গ) **ফ্যাসীবাদী বা নাট্‌সি ব্যক্তিগত বা দলীয় একনায়কতন্ত্র** প্রথম মহাযুদ্ধের পর যথাক্রমে ইতালীতে ও জার্মানীতে মুসোলিনী ও হিট্‌লারের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে। ঐ দু'টি দেশেই শাসনব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল এবং জনগণ প্রচণ্ড অর্থনৈতিক দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। যুদ্ধের তথাকথিত গৌরবজনক ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এই একনায়কতন্ত্রী নেতাগণ দেশের বেকার যুবকদের একত্রিত করেন এবং একটা সুসংবদ্ধ, অগণতান্ত্রিক, জঙ্গী মতাদর্শের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদী, সামরিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেন।

(৩) ফ্যাসীবাদী বা নাট্‌সি ব্যক্তিগত বা দলীয় একনায়কতন্ত্র : হিট্‌লার ও মুসোলিনির নজির; রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে জাত এই একনায়কতন্ত্র যুদ্ধ-বাদী

(ঘ) **কম্যুনিস্ট্ দলীয় একনায়কতন্ত্র** ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সাম্যবাদী বিপ্লবের সাফল্যের পর লেনিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই একনায়কতন্ত্র সর্বহারার সাম্য-বাদী একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariat) বা মেহনতী জনতার একনায়কতন্ত্র বলেও অভিহিত। মার্ক্‌স্‌বাদী সাম্যবাদের ও সমভোগবাদের নীতির ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীকে এ ধরনের একনায়কতন্ত্র স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্বুদ্ধ করেন ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস্ কমিউনের (Paris Commune) নেতৃবৃন্দ। অত্যাচারী জারতন্ত্রের উচ্ছেদের পর ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে যে সোবিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল, সেটিকে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের অর্থাৎ মেহনতী জনতার প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার বলে ঘোষণা করা হল। সোবিয়েত সংবিধানের প্রথমের দিকের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, গোড়াতে এই সরকারে কৃষকদের চেয়ে শ্রমিকদের প্রাধান্য ছিল বেশী। ধনিক এবং ধর্মযাজকদের কোনও ভোটাধিকার স্বীকার করা হয় নি। ১৯৭৭ সালে ব্রেঝ্‌নেভ্ প্রবর্তিত সংবিধানে (Brezhnev Constitution) অবশ্য বলা হয়েছে যে, বর্তমান রুশ সমাজ শ্রমিক, কৃষক সকলেরই পূর্ণ সমর্থন ও আনুগত্য লাভ করেছে। চীনে ১৯৪৯ সালে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র মাও সে-তুঙ (Mao tse-Tung) এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই একনায়কতন্ত্রে কৃষিজীবীদের ভূমিকাকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে পূর্ব ইউরোপীয় একনায়কতন্ত্রগুলিতেও সোবিয়েত ধরনের কম্যুনিস্ট্ দলীয় একনায়কতন্ত্র প্রচলিত।

(৪) কম্যুনিস্ট দলীয় একনায়কতন্ত্র : বিপ্লবের পর ১৯১৭ সালে সোবিয়েত রাশিয়ায় ও ১৯৪৯ সালে চীনে প্রবর্তিত; সাম্যবাদ ও সমভোগবাদের নীতির প্রয়োগে সর্বহারাদের একাধিপত্য; ব্রেঝ্‌নেভ্ সংবিধানে রুশ সমাজের সার্বিক রূপান্তর ঘোষিত; পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রী দেশগুলির নজির

কম্যুনিস্ট্ শাসনব্যবস্থাকে দলীয় একনায়কতন্ত্র বলে অভিহিত করার অর্থ হল যে, এখানে একদলীয় শাসনব্যবস্থা (One Party-system) প্রচলিত। কম্যুনিস্ট্ দলই রাষ্ট্রে একমাত্র স্বীকৃত রাজ-নৈতিক দল। এই দলের মতাদর্শকেই (ideology) একমাত্র মতাদর্শ বলে স্বীকার করা হয়। বেতার, সংবাদপত্র প্রভৃতি সমস্ত প্রচার মাধ্যমগুলিও

কম্যুনিস্ট্ দলীয় এক-নায়কতন্ত্রে কম্যুনিস্ট্ দল রাষ্ট্রের একমাত্র স্বীকৃত দল

(mass-media) রাষ্ট্রের তথা কম্যুনিস্ট্ দলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এজন্য বলা হয় যে, সোবিয়েত রাশিয়া, চীনা প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি সাম্যবাদী রাষ্ট্রে কোনপ্রকার ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকে না, ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে কম্যুনিস্ট্ পার্টির দ্বারা পরিচালিত।

কিন্তু সোবিয়েত্ ও অন্যান্য কম্যুনিস্ট্ রাষ্ট্রের নেতাগণ এই যুক্তি অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, ১৯১৭ সালে সোবিয়েত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সূচনায় বিপ্লবের যুগ থেকে শ্রমিকশ্রেণীর (Dictatorship of the Workers) হাতে রাষ্ট্রচালনার ভার ছিল। রুশ নেতা লিওনিদ্ ব্রেঝ্নেভের (Leonid Brezhnev) উদ্যোগে ১৯৭৭ সালে যে নতুন রুশ সংবিধান কার্যকর হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ার ফলে রুশ সমাজ বর্তমানে প্রকৃতপক্ষে জনগণের রাষ্ট্রে ("a state of the whole people") রূপান্তরিত হয়েছে। সোবিয়েত নেতাগণ মনে করেন যে, এর ফলে একদলীয় শাসনতন্ত্র সেখানে প্রচলিত থাকলেও তার দ্বারা শাসনক্ষমতার গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ (Democratic Centralism) সূচিত হয়। তার অর্থ হল, মেহনতী জনগণের প্রতিনিধিদের হাতেই যথার্থভাবে সেখানে সর্বোচ্চ শাসন ও প্রশাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। তাই সেখানকার শাসনব্যবস্থাকে চিরাচরিত অর্থে "একনায়কতন্ত্র" বলা যায় না। এই শাসনব্যবস্থা সত্যিই গণতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা পরিচালিত।

কম্যুনিস্ট্ নেতাদের মতে ১৯৭৭ সালের ব্রেঝনেভ্ সংবিধানে সমাজের সার্বিক রূপান্তর ঘোষিত : সর্বহারাদের প্রতিভূ কম্যুনিস্ট্দলের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী সমাজ এভাবেই ভবিষ্যতে সমভোগবাদী সমাজে পরিণত হবে

তাঁদের বিশ্বাস এর ফলেই শেষ পর্যন্ত সোবিয়েত শাসনব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে "সমভোগবাদী সমাজে" (communist community) রূপান্তরিত হবে, "রাষ্ট্রের" পরিবর্তে "সমাজের" প্রাধান্য ঘোষিত হবে।

মার্ক্সবাদীরা আরও বলেন যে, সমাজতন্ত্রবাদ ও সমভোগবাদ যথার্থভাবে ও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থারূপে (transitional system) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে সক্রিয় রাখতে হবে। কারণ, পার্শ্ববর্তী প্রতিক্রিয়াশীল ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং সংগঠনমূলক সমাজতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর এই বিশেষ ধরনের একনায়কত্বকে বজায় রাখার আন্দোলনে সামিল হওয়া প্রত্যেক কম্যুনিস্টের পবিত্র কর্তব্য।

অন্তর্বর্তীকালে পার্শ্ববর্তী প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণ রুখতেও সংগঠনমূলক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একনায়কত্ব বাঞ্ছনীয়

মার্ক্সবাদীগণ শ্রেণীগত পার্থক্যকেই রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য বলে চিহ্নিত করেন। তাঁদের মতে তথাকথিত উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy) আসলে ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন। সুতরাং সর্বহারা শ্রেণী যদি সাম্যবাদী বিপ্লবের পর "প্রোলেতারীয় একনায়কত্ব" (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠিত করে, তবে সেই শ্রেণীহীন সমাজকে প্রচলিত অর্থে "একনায়কতন্ত্র" না বলে তাকেই প্রকৃত "গণতন্ত্র" বলে অভিনন্দন জানানো উচিত।

মার্ক্সবাদীরা উদারপন্থী গণতন্ত্রকে ধনতন্ত্র বলে নিন্দা করেন ; তাঁদের মতে প্রোলেতারীয় একনায়কতন্ত্রই প্রকৃত গণতন্ত্র

(৬) **একদলীয় একনায়কতন্ত্রের** প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—সাধারণ নির্বাচনের অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে যে দল মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে, সেই দলই যদি পরে ভোটের মাধ্যমে অত্যন্ত বেশী জনসমর্থন লাভ করে কিংবা যদি কালক্রমে আশাতীতভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে, তা হলে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই দল একনায়কতন্ত্রী হয়ে ওঠে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে এই জাতীয় মন্ত্রিসভার একনায়কতন্ত্র (Cabinet Dictatorship) অর্থাৎ একদলীয় একনায়কতন্ত্রের অস্তিত্বের কথা শোনা যায়। কিন্তু এই একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রবিরোধী নয়। কারণ, সংসদীয় গণতন্ত্রের নীতি অনুসারে নির্বাচন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকার ফলে পরবর্তী কোন সময়ে মন্ত্রিসভার দলগত পরাজয় ঘটলে এজাতীয় মন্ত্রিপরিষদীয় একনায়কতন্ত্রেরও পতন ঘটবে।

(৫) সম্পূর্ণ একদলীয় একনায়কতন্ত্র : ইংলণ্ডে অতি-জনপ্রিয় মন্ত্রিসভার একনায়কত্বের নজির ; এই শাসন গণতন্ত্রবিরোধী নয়

॥ একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ॥

একনায়কতন্ত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্র, জাতি ও শাসক তিনজনকেই অভিন্ন বলে ধরে নেওয়া হয়। ব্যক্তির ভূমিকাকে গৌণ বলে মনে করা হয়। "ফ্যাসিবাদ" ("Fascism") নামক গ্রন্থে মুসোলিনি রাষ্ট্রকে সর্বস্ব বলে ধরে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে, ফ্যাসিবাদ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসিদ্ধির যন্ত্র বলে মনে করে। সকলেই রাষ্ট্রের ভিতরে, রাষ্ট্রের বাইরে বা বিরুদ্ধে কারুর কোন সত্তা নেই। কারণ, রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তিবিবেকের ও ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তির সামগ্রিক ও চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে। তাই একনায়কতন্ত্রে কোন স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয় না। কম্যুনিস্ট একদলীয় একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধেও অনেকে এরকম অভিযোগ করেন। বোরিস্ পাস্তেরনাকের (Boris Pasternak) মত স্বাধীনচেতা বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের মত বহু বুদ্ধিজীবীর নির্যাতনের ঘটনা রুশবিরোধীরা প্রচার করে থাকেন। তাঁদের মতে হিট্লারের আমলে ইহুদি নির্যাতন ও নিধনের চেয়ে এ ঘটনা কম মর্মান্তিক নয়। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের (Cultural Revolution) বাড়াবাড়ি সম্পর্কে সোবিয়েত রাশিয়াও সোচ্চার হয়েছিল। পোল্যাণ্ডে শ্রমিক-নেতা ওয়ালেসার (Walesa) নেতৃত্বে সরকারবিরোধী দীর্ঘমেয়াদী শ্রমিক আন্দোলনকে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থায় শ্রমিকস্বার্থ বিরোধিতার সাম্প্রতিকতম নজির বলে অনেকে মনে করেন।

একনায়কতন্ত্রে (১) ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্র বড় : ব্যক্তিস্বাধীনতা একনায়কতন্ত্রে বিপন্ন ; হিট্লারী জার্মানীর, রুশ, চীন ও পোল্যাণ্ডের নজির

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তির ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে সামরিকীকরণ (regimentation of thought and culture) ঘটায় বলেই মনীষী বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল্ (Bertrand Russell) তার নিন্দা করেন। শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে ঢেলে সাজানো হয় যার ফলে সরকারপক্ষের কোন বিশেষ মতাদর্শকে (Ideology) শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানে, জার্মানী ও ইতালীতে ও কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে

(২) ব্যক্তির চিন্তাভাবনার সামরিকীকরণ, আর্টের রাজনীতিকীকরণ : বার্ট্রাণ্ড্ রাসেলের মতে এভাবে আর্ট্‌কে প্রচারধর্মী করে তোলা হয়

গণনাট্য, গণসঙ্গীত ইত্যাদি জনগণের অবসর-বিনোদনের উপকরণগুলিকে ও জনসংযোগ মাধ্যমগুলিকে (Mass Media) কৌশলে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচার-ধর্মী (Propagandist) করে তোলা হয় বলে রাসেলের অভিযোগ। হিটলারের প্রচার-মন্ত্রী গোয়েবেলস্ (Goebbels)সগৌরবে ঘোষণা করতেন যে, একশ'বার একটি মিথ্যাকে সজোরে প্রচার করলেই সেটা সত্যে পরিণত হয় !

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত বা একদলীয় একনায়কতন্ত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল নাগরিক-দের নানাভাবে ভীতি প্রদর্শন ও দমন-পীড়নের মধ্য দিয়ে তাদের রাষ্ট্রের তথা সর-কারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে বাধ্য করা। নানাভাবে এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা চলে। (ক) "বন্দুকের নলের" বা "বল্লমের খোঁচায়" সাজানো নির্বাচন বা রিগিং (Rigging) অনুষ্ঠিত হয়। ভুয়া ভোটদান, নির্বাচনী বুথ্ দখল, বুথে কৃত্রিম ভীড় সৃষ্টি ইত্যাদির মারফত সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে বাধা দেওয়া হয়, নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয়। (খ) গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্মমভাবে দমনের (subversion of Democracy) ব্যবস্থা হয়। বিরোধীদলের নেতাদের গ্রেপ্তার বা হত্যা করা হয়। হিট্লার রাইখ্স্টাগ্ (Reichstag) নামক জার্মান্ আইনসভায় অগ্নি সংযোগ করে তাকে দগ্ধ ও বিনষ্ট করেন, পরে আইনসভা ভেঙ্গে দেন। রুশ নেতা স্তালিনের আমলে বিরোধী বা সমালোচকদের ব্যাপক গ্রেপ্তার বা হত্যা নামক "শুদ্ধিকরণের" (Purges) জন্য স্তালিনের মত বিশিষ্ট গুণী নেতাও তাঁর দেশবাসীর কাছেও তাঁর মৃত্যুর পর ঘোরতর অপ্রিয় হন ও দীর্ঘদিন সেখানে স্তালিন-বিরোধী আন্দোলন (de-Stalinisation) চলে। (গ) এক-নায়কতন্ত্রী প্রশাসকগণ বিরোধীদের এতই ভয় পান যে, তাঁরা ব্যাপকভাবে গুপ্তচর ব্যবস্থা (espionage) প্রেয়োগ করেন। গুপ্তচরগণ বিরোধী নেতাদের বা বিরোধীদলের ক্ষমতাদখলের বা বিদ্রোহের "চক্রান্ত" সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই চতুরভাবে গুপ্তচরব্যবস্থা চালু রাখতে হয়—এ কথা কৌটিল্য থেকে বর্তমান যুগের কূটনীতিবিদ্গণ সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে গুপ্তচরব্যবস্থা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ও নিপুণভাবে পরিচালনা করা হয়। মুসোলিনির "কালো কুর্তা" পরিহিত দলীয় গুপ্তচরবাহিনী (Black Shirts), হিট্লারের গেস্টাপো (Gestapo) বাহিনী বিশেষ কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। (ঘ) গুপ্তচরবৃত্তিকে অবলম্বন করে চলতে হয় বলে মিথ্যা ও গোপনীয়তা একনায়কতন্ত্রের প্রধান আশ্রয়স্থল। একদলীয় নেতাদের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য বিরোধী নেতাদের চরিত্রহননের ব্যবস্থা করা হয়, অবাধে মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হয়। খোলাখুলি, প্রকাশ্য রাজনীতি গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। কিন্তু একনায়কতন্ত্র এর বিপরীত। সেখানে আভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক, সামরিক, এমন কি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও গোপনে নীতিনির্ধারণ ও তার প্রয়োগ হয়। এর উদ্দেশ্য—জনগণ যাতে প্রকৃত ঘটনা জানতে না পারেন এবং সরকারবিরোধী আন্দোলন যেন দানা না বাঁধে।

(৩) নাগরিকদের নানা-ভাবে ভীতিপ্রদর্শন, দমন পীড়ন ; বন্দুক-বাজি, সাজানো নির্বাচন বা রিগিং, নির্বাচনে নানা কারচুপি আইনসভার কণ্ঠরোধ বিরোধীদের চরিত্র-হনন, গণহত্যা, গুপ্তহত্যা, বন্দীত্ব, নির্বাসন, গুপ্ত-চরব্যবস্থা, মিথ্যা প্রচার

চতুর্থতঃ, একনায়কতন্ত্রে একদলীয় শাসনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সামরিক বাহিনীর মতই রাজনৈতিক দলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলা হয়। রাষ্ট্র, জাতি, নায়ক ও তাঁর দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য গড়ে তোলার জন্য দলে পেশাদারী, বেতনভুক্ কর্মী নিযুক্ত করা হয়। ফলে, "ক্যাডারভিত্তিক" পার্টি ("Cadre-based Party") গড়ে ওঠে। ১৯৩৮ সালের ২৮ শে এপ্রিল ইতালীয় ফ্যাসিস্ত্ (Italian Fascists) দলের যে সংবিধান চালু করা হয়, তার ৪র্থ ধারায় বলা হয় যে, ফ্যাসিস্ত্দের প্রধান কাজ হল রাষ্ট্রকে মেনে চলা ও দরকার হলে রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ করা। হিট্লার বলেন যে, নাট্সি দলের নীতি হল দায়িত্বশীল ওপর-তলার নেতৃত্বের নির্দেশের ওপর আস্থা রাখা ও নিয়মানুবর্তিতা অনুসারে নীচু তলার নেতাদের মেনে চলা ("Authority from above as the result of leadership conscious of its responsibility, confidence and discipline from below")। সোবিয়েত ও চীনা প্রজাতন্ত্রেও মেহনতী জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপদানের প্রতি লক্ষ্য রেখে শৃঙ্খলা, ঐক্য ও সংহতির আদর্শে গঠিত সাম্যবাদী দলকেই একমাত্র রাজনৈতিক দল বলে ঘোষণা করা হয়।

একদলীয়, বেতনভুক্ পেশাদারী, 'ক্যাডার-ভিত্তিক' পার্টি গঠন; দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের দাবি, কারণ, রাষ্ট্র, জাতি, নায়ক ও দল—একই

পঞ্চমতঃ, একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থায় প্রতীক (symbol) প্রভৃতি রূপকল্প বা "মীথের" (Myth) ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জার্মান্ দার্শনিক নীট্সে (Nietzsche) বীরপূজার আদর্শকে (Cult of hero-worship) সমর্থন করে বলেন যে, যোগ্যতম অতিমানবই (Superman) সকলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে দেশকে চালনা করবেন। হিট্লার এ ধরনের অতিমানবিক গুণসম্পন্ন নেতা বা "ফুয়েরার" (Fuhrer বা Leader) রূপে পূজিত হতেন, কামাল পাশাকে "আতা-তুর্ক" অর্থাৎ তুরস্কের রক্ষক, স্তালিনকে "মহান্ স্তালিন্," মুসোলিনিকে "ইল্ দুচে" (Il Duce) বা "মহান্ ডিউক্" প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা হয়। "হাইল্ হিট্লার" (Heil Hitler বা "Holy Hitler") রূপে "পবিত্র" হিট্লারকে পূজা করার জন্য জার্মানদের বিশেষ-ভাবে প্রশিক্ষণ (Drilling) দেওয়া হত। অগণিত প্রচারচিত্রের মধ্যে বার বার ফুটে উঠত সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজের মাঝে হিট্লারের অভিবাদন গ্রহণের সুপরিচিত দৃশ্যগুলি। নানা প্রতীকের মারফত নায়কদের বিশিষ্ট ভাবভঙ্গী, তাঁদের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলা হত। মুস্তাফা কামাল "ধূসর নেকড়ে" ("Grey Wolf") নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। হিট্লারের স্বস্তিক চিহ্ন, রুশ সাম্যবাদী দলের লাল পতাকা, কাস্তে-হাতুড়ি ইত্যাদি প্রতীকগুলির মাধ্যমে ব্যক্তিগত বা একদলীয় নায়কতন্ত্রের আদর্শকে দেশবাসীর মনে গেঁথে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। জনগণকে নায়কতন্ত্রের নির্দিষ্ট ঢঙ্-এ চিন্তা করতে, কাজ করতে শেখানো হয়, নায়কীয় বা দলীয় ঐক্যকে জাতীয় ঐক্যে পরিণত করা হয়, নানারকম ধ্বনি বা শ্লোগান্ (slogan) শোনানো হয়।

(৫) প্রতীক রূপকল্প বা "মীথ্", ধ্বনি বা শ্লোগান্, কুচকাওয়াজ প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব-দান, একনায়ককে উপাধি দিয়ে তাঁর ভাবভঙ্গীর অনুকরণে তাঁর ভাব-মূর্তি উজ্জ্বল করে তোলা

ষষ্ঠতঃ, জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের "মীথ্‌কে" জার্মান্‌ ও ইতালীয় একনায়কতন্ত্রীগণ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। উগ্র, বিকৃত, সাম্রাজ্যবাদী, জঙ্গী জাতীয়তাবাদ এই মীথের বিশিষ্ট অনুষঙ্গ। হিট্‌লার বলতেন—ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, যে-কোনভাবে জার্মান্‌ জাতির প্রাধান্য লাভ করা চাই। তিনি ঘোষণা করেন যে, জার্মানরাই খাঁটি আর্য বা টিউটনিক্‌ (Teutonic) সভ্যতার বংশধর। এই জাতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি। তাঁর মতে, ইহুদিদের মত অন্যান্য "নীচু" জাতের বা সঙ্করশ্রেণীর জনগণের ওপর এই শ্রেষ্ঠ জাতই প্রকৃতির অমোঘ নির্দেশে আধিপত্য বিস্তার করার অধিকারী। ইতালীয় দার্শনিক ও নৃতত্ত্ববিদ্‌ সোরেল্‌ (Sorel) মুসোলিনিকে এই ধরনের "শ্রেষ্ঠ জাতির তত্ত্ব" সমর্থন করতে তত্ত্বগতভাবে সাহায্য করেন।

(৬) জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের মীথ্‌ : হিট্‌লার ও সোরেলের অপপ্রচার

সপ্তমতঃ, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী স্বৈরাচারী সম্রাট্‌ লুই নাপোলিয়ঁর লুই (নেপোলিয়ানের Louis Napoleon) একটি উক্তি থেকেই একনায়কতন্ত্রী সরকারের শাসনকালে সাহিত্য, ললিতকলা প্রভৃতির মূল্যায়ন সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তাঁকে বলা হয় যে তখন ফ্রান্সে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের অভাব দেখা দিয়েছিল। তিনি তাই শুনে তৎক্ষণাৎ বলেন যে তিনি সে বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন। "অপবিত্র" ইহুদিদের সংস্পর্শ থেকে বিশুদ্ধ জার্মান্‌দের দূরে রাখার জন্য হিট্‌লার বৈজ্ঞানিকদের ইহুদিনিধনের পরীক্ষায় প্রবৃত্ত করেন। রুশ-বিরোধীগণ বলেন যে, স্তালিন রাশিয়ায় দলীয় আদর্শের বিরোধী কোন প্রকার সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টির স্বাধীনতা দিতেন না।

(৭) সাহিত্য, ললিতকলা, বিজ্ঞান সব কিছুই একনায়কের নির্দেশে পরিচালিত হয় ; এ বিষয়ে লুই নাপোলিয়ঁ, হিট্‌লার ও স্তালিনের আমলের নজির

অষ্টমতঃ, একনায়কতন্ত্রী মতাদর্শ যুদ্ধবাদী। হিটলার নীট্‌সের মত গ্রহণ করেন। এই মত অনুসারে বলা হয় যে, পৃথিবীতে কেবল শক্তিশালী ব্যক্তিগণেরই বাঁচার অধিকার আছে। মুসোলিনির মতে, মাতৃত্ব যেমন নারীর স্বাভাবিক পরিণতি, যুদ্ধও রাষ্ট্রের পক্ষে ঠিক সেরকম স্বাভাবিক পরিণতি ("War is to a Nation what maternity is to woman.")। ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র অর্থনৈতিক কারণে যুদ্ধকে অপরিহার্য বলে মনে করে। রাষ্ট্রের শিল্পগুলির কাঁচামাল সরবরাহের উৎস হিসাবে ও ঐ শিল্পজাত দ্রব্যগুলির বাজার হিসাবে একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র তার উপনিবেশগুলিকে ব্যবহার করে। তাই একনায়কতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠে। হিট্‌লার জার্মান জাতিকে প্রথম মহাযুদ্ধের শোচনীয় পরাজয় ও অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য উৎসাহিত করেন, এবং প্রাক্তন জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলি পুনরায় দখলের চেষ্টা করেন। তাই তিনি আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর দারিদ্র্য, বেকারত্ব দূর করে ইতালীর অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য মুসোলিনি আদ্রিয়াতিক সাগরের উপকূলে ও আফ্রিকায়

(৮) একনায়কতন্ত্র যুদ্ধবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ; হিট্‌লার ও মুসোলিনির সাম্রাজ্যবিস্তারের নজির ; স্তালিনও হিট্‌লারের সাহায্যে ২য় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে কিছু অংশ দখল করেন ; বর্তমান চীনা-সোবিয়েত বিরোধের অন্যতম কারণ চীনের অভিযোগ—সোবিয়েত রাশিয়া নয়া (বা সামাজিক) সাম্রাজ্যবাদ, যা বিশুদ্ধ মার্ক্‌স্‌বাদের "সংশোধনবাদ"

উপনিবেশ স্থাপনে প্রয়াসী হন। স্তালিনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে হিট্লারের সহযোগিতায় পোল্যান্ড্, এস্থোনিয়া, লাট্ভিয়া ও লিথুয়ানিয়া দখল করেন। বর্তমান চীনা-সোবিয়েত বিরোধের (Sino-Sóviet rift) অন্যতম প্রধান কারণ হল যে, কম্যুনিস্ট্ দুনিয়ায় একচেটিয়াভাবে রুশ প্রাধান্য বিস্তারকে "নয়া সাম্রাজ্যবাদ" ("Social Imperialism") এবং বিশুদ্ধ মার্ক্স্বাদের সংশোধনবাদ ("Revisionism") বলে চীন অভিহিত করে তার তীব্র নিন্দা করে থাকে।

উপসংহারে বলা যায় যে, ব্যক্তিগত বা একদলীয় একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। ফেলে-আসা যুগের বিকৃতমনস্ক, ক্ষমতালোভী, নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি এর বৈশিষ্ট্যরূপে যেন পুনরায় নব কলেবরে আবির্ভূত। আন্তর্জাতিক শান্তি, মৈত্রী ও প্রগতি এ ধরনের সরকারী ব্যবস্থায় বিপর্যস্ত হবার আশঙ্কা। গণতন্ত্রের বিকৃতির পাল্টা জবাব হিসাবে একে গণতন্ত্রের বিকল্প ধরে না নিয়ে আদর্শ গণতন্ত্রের ও প্রকৃত সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ দৃঢ় করাই একান্ত কাম্য।

উপসংহার ঃ একদলীয় বা ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্র বিকৃত, অস্বাভাবিক বিপজ্জনক শাসনব্যবস্থা গণতন্ত্র এর বিপরীত

॥ একনায়কতন্ত্রের গুণাবলী ॥

একনায়কতন্ত্রের সমর্থকগণ সাড়ম্বরে ঘোষণা করেন যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অত্যন্ত শিথিল ও জটিল। মন্ত্রী এবং আমলাদের বৈঠকী চালে আলাপ-আলোচনায় সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে অত্যন্ত বিলম্ব হয়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে একনায়কের ইচ্ছার ওপর শাসননীতি নির্ধারণ এবং শাসনব্যবস্থার পরিচালন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। একাধিক ব্যক্তির মনোরঞ্জনের ফলে গণতান্ত্রিক কায়দায় সেখানে সরকার পরিচালিত হয় না। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত দ্রুত, দক্ষ সুশাসন হয়ে উঠতে পারে। মুসোলিনির একটি বিখ্যাত উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলেন যে, কেবল তাঁর আমলেই ইতালীতে রেলগাড়ীগুলি যথাসময়ে চলাচল করত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে ভাইম্যার্ প্রজাতন্ত্রের (Weimar Republic) নেতাগণ ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত দেশ শাসন করে যে সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারেন নি, হিট্লার অল্প সময়ে সে সমস্যাগুলি দূর করেন।

(১) গণতন্ত্র শিথিল ও জটিল : বৈঠকী চালে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিলম্ব ; একনায়কতন্ত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, প্রশাসন দক্ষ হয়ে ওঠে

দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রী সরকারে অযথা আলাপ-আলোচনার জন্য বেশী সংসদ বা সংস্থা রাখা হয় না। এখানে নানা মুনির নানা মত থাকতে পারে না। সবকিছুই অল্প সংখ্যক ব্যক্তির নির্দেশনায় বা একটিমাত্র দলের নির্দেশে পরিচালিত হয়। সুতরাং সরকারের পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যয়বাহুল্য থাকে না। বহুদলীয় শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন দলের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব, দলবাজি ইত্যাদির ধ্বংসাত্মক কুফল দেখা যায় না।

(২) ব্যয়বাহুল্য, "নানা মুনির নানা মত" নেই

তৃতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের উৎসাহে কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের উন্নতি এবং জনশিক্ষার প্রসার অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে, ব্যাপকভাবে ও সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানী ও ইতালীকে চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করে একনায়কতন্ত্রী সরকারই। সেখানে দেশের সার্বিক সমৃদ্ধি ও সংহতি স্থাপন সম্ভব করে তোলে। রাশিয়ায় স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের পতনের পর সেখানে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে। সোবিয়েত রাশিয়ার সাতসালা পরিকল্পনার (Seven Year Plan) উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, আধুনিক অর্থনৈতিক জটিলতার যুগে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক পরিকল্পনার দ্রুত রূপায়নের মধ্য দিয়ে কত সহজে এবং নিশ্চিতভাবে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

(৩) রাষ্ট্রের উদ্যোগে শিক্ষাবিস্তার, কৃষি, বিজ্ঞান, শিল্প ও অর্থনীতির ব্যাপক, বিস্ময়কর উন্নতি ঘটায়; সোবিয়েত সাতসালা পরিকল্পনার নজির

চতুর্থতঃ, জাতির সঙ্কটকালে, বিশেষ করে যুদ্ধের মত জরুরী অবস্থায় একনায়কতন্ত্র অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভাপরিচালিত শাসনব্যবস্থায় চার্চিলের (Churchill) মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা শাসন-পরিচালনার সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে রেখে প্রায় একনায়কতন্ত্রী শাসকের মত দেশকে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিট্লার এবং মুসোলিনির জোটবদ্ধ শক্তিশালী একনায়কতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রী ইংলণ্ড্ও শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। সুতরাং যুদ্ধের মত জরুরী অবস্থায় একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা বিশেষ কার্যকর।

(৪) যুদ্ধের মত জরুরী অবস্থায় একনায়কতন্ত্র সফল: ইংলণ্ডে চার্চিলের নেতৃত্বের নজির

পঞ্চমতঃ, সাধারণ মানুষ অনেক সময় অজ্ঞ, দরিদ্র এবং অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকে। এই অবস্থায় যদি কোনও উদারপন্থী দেশপ্রেমিক একনায়ক দেশের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন, তা হলে দেশের কল্যাণ অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। তিনি আইনের সংস্কারের দ্বারা দক্ষ কর্মচারীদের সরকারী কাজে নিযুক্ত করে, দেশদ্রোহী, অসামাজিক ও দুর্নীতিপরায়ণদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাতির নবজাগরণের আয়োজন করতে পারেন। দেশবাসীদের মনে ঐক্য, সংহতি, শৃঙ্খলাবোধ, দেশপ্রেম, উৎসাহ এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় ঠিক এইভাবেই। তরুণ তুর্কীর সংগঠনে তুর্কীবীর একনায়ক মুস্তাফা কামালের নাম চিরস্মরণীয়। সোবিয়েত রাশিয়ায় স্তালিনের নেতৃত্বে লাল ফৌজের (Red Army) চেষ্টায় রুশ অধিবাসীগণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে অপূর্ব আত্মত্যাগ স্বীকার করে হিট্লারী হামলার বিরুদ্ধে বিস্ময়কর সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ গড়েছিলেন। সুতরাং রাশিয়ার এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, একনায়কতন্ত্র দেশপ্রেমিক এবং আত্মত্যাগী সুনাগরিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক সময় খুব সফল হয়ে ওঠে।

(৫) দক্ষ, উদারপন্থী, একনায়ক দেশপ্রেমিক সুনাগরিক সৃষ্টি করে দেশের পুনর্জাগরণ ঘটাতে পারেন: "তরুণ তুর্কী" একনায়ক মুস্তাফা কামালের ও ২য় মহাযুদ্ধে স্তালিনের নজির

ষষ্ঠতঃ, একনায়কতন্ত্রকে স্থায়ী ব্যবস্থা বলে অনেকে অভিনন্দিত করেন। তথাকথিত সংসদীয় গণতন্ত্রের নির্বাচনী উত্থানপতনের জোয়ার ভাঁটা এই স্থায়িত্বকে নষ্ট করতে পারে না। ফলে দীর্ঘমেয়াদী প্রশাসন সুশাসনে পরিণত হবার সুযোগ পায়।

(৬) নির্বাচনী উত্থান-পতন না থাকায় একনায়কতন্ত্রে সুশাসনের স্থায়িত্ব

॥ একনায়কতন্ত্রের দোষত্রুটি ॥

গণতন্ত্রের অনেক দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বিকল্প শাসনব্যবস্থা হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও শাসনতন্ত্রবিদ্‌গণ একনায়কতন্ত্রকে সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে, একনায়কতন্ত্রের গুণগুলি সাময়িকভাবে সুবিধাজনক, কিন্তু আখেরে এগুলি কুফল সৃষ্টি করে।

একনায়কতন্ত্রের প্রথম দোষ হল যে, এই শাসনব্যবস্থা ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। চীনের প্রজাতন্ত্রে চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙ নাগরিকদের জীবনে বৈচিত্র্য আনার গুরুত্ব স্বীকার করে এক হাজার ফুল বাগানে ফুটলে যে শোভা দেখা যায় তার উল্লেখ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের (Cultural Revolution) নামে দেশের সর্বত্র অত্যন্ত কঠোরভাবে সাম্যবাদী আদর্শ সঞ্চারিত করার জন্য সরকারী নেতৃত্বে যে প্রচেষ্টা চলেছিল, তার নৃশংসতার বিরুদ্ধে অনেকেই, এমন কি অন্য রাষ্ট্রের কম্যুনিস্ট্ নেতাগণও সোচ্চার হয়েছেন। সোবিয়েত রাশিয়ায় সরকারী নীতি থেকে একটু ভিন্ন ধরনের মতামত পোষণ করলে বা প্রচার করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনেক সময় শাস্তি পেতে হয়। অতি-আধুনিক যুগে নোবেল পুরস্কার জয়ী বরিস্ পাস্তেরনাক্ (Boris Pasternak) এবং সোল্‌ঝিনিৎসিন (Solzhynitsin) এর ক্ষেত্রে রুশ সরকারের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রুশ সরকার "বুর্জোয়া" নোবেল পুরস্কার নিতে তাঁদের যেতে দিতে চান নি, কারণ, তাঁরা তাঁদের লেখায় সরকারের সমালোচনা করেন। রুশ্ কম্যুনিস্ট নেতা ট্রট্‌স্কি (Trotsky) প্রচার করেন যে, সোবিয়েত রাশিয়ায় প্রকৃত সাম্যবাদের বদলে আসলে সেখানে একটা কুচক্রী, ক্ষমতালোভী আমলাতন্ত্রের গোষ্ঠীগত একদলীয় স্বেচ্ছাচারিতা প্রচলিত হয়েছে।

একনায়কতন্ত্রের দোষঃ (১) ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী; চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বাড়াবাড়ি; সোবিয়েত নোবেল পুরস্কার জয়ী পাস্তেরনাক্ ও সোল্‌ঝিনিৎসিনের লাঞ্ছনা; রুশ-নেতা ট্রট্‌স্কির অভিযোগ

দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে, যদি সেখানে সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে, বিশ্বশান্তি ব্যাহত হয়। স্মরণ রাখা দরকার যে, একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকার ফলে জার্মানীকে দুবার মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় এবং দুটি যুদ্ধেই জার্মানীর শোচনীয় পরাজয় এবং ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। আগেই বলা হয়েছে, মুসোলিনি সগর্বে ঘোষণা করেন যে, আন্তর্জাতিক শান্তি কাপুরুষের কাম্য, সুস্থ, সবল পুরুষের পক্ষে নারীর মাতৃত্বের মত যুদ্ধই একান্ত কাম্য, অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিণতি। এ ধরনের

(২) একনায়কতন্ত্র যুদ্ধবাদী ও বিশ্বশান্তির পরিপন্থী, মানবসভ্যতার বিশেষ শত্রু, মুসোলিনির মতে নারীর মাতৃত্বের মতই যুদ্ধ স্বাভাবিক

উক্তি একনায়কতন্ত্রের জঙ্গী রূপটিকে প্রকাশ করে দেয়। রাষ্ট্রের এই আগ্রাসী, সাম্রাজ্যবাদী নীতির সমর্থনে একনায়কগণ চটকদার বুলি অথবা বন্দুকের গুলির আশ্রয় নেন। উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাষণে কাজ না হলে তাঁরা দমনপীড়নের আশ্রয় নেন। সুতরাং একনায়কতন্ত্র বিশ্বশান্তির পরিপন্থী, মানবসভ্যতার বিশেষ শত্রু।

তৃতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রে একজন নেতা, একটি দল এবং একরকমের শাসনতন্ত্র প্রচলিত থাকে। সরকারী নিয়ন্ত্রণে জনমত স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হতে পারে না। রক্তপাতের, তরবারির নীতি অনুসরণের ফলে হত্যা, বন্দীত্ব, নির্বাসন যে-কোন ব্যবস্থা একনায়ক নির্মমভাবে অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করে না। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও তা সাজানো নির্বাচন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, নাগরিকদের ভোটাধিকারের কোন মূল্যই থাকে না। সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকার এবং অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়। বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে কঠোর দমননীতি অনুসরণ করা হয়। এই শাসনতন্ত্র সেজন্য শেষ পর্যন্ত পাশবিক শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ আইনের অনুশাসন, শৃঙ্খলা ইত্যাদি নিশ্চয় মানতে চায়। কিন্তু কোন স্বৈরাচারী ব্যক্তিবিশেষের শাসনের প্রতি সে কখনই চিরকাল শ্রদ্ধাবান্ থাকতে পারে না। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের ধর্মই হল স্বাধীনতা এবং চিন্তাশীলতার প্রতি আকর্ষণ। অবশেষে একনায়কতন্ত্রের প্রতি নাগরিকগণ ঘৃণা প্রকাশ করতে থাকেন, সরকারকে বিদেশী সরকারের মত বলে মনে করেন। সুতরাং একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান সমালোচনা হল এই যে, এর ফলে ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট হয়, নাগরিকগণ রাজনৈতিক শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হন।

(৩) ভীতি প্রদর্শন, হত্যা, বন্দীত্ব, নির্বাসন সাজানো নির্বাচন, বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ প্রভৃতি দমনমূলক ব্যবস্থা শেষে একনায়ক বা তাঁর দলকে জনগণের কাছে অপ্রিয়, ঘৃণার্হ করে তোলে ; স্বাধীন চিন্তার সুযোগ হারিয়ে নাগরিকদের বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট হয়, তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা হয় না

চতুর্থতঃ, একনায়কতন্ত্রে একমাত্র ব্যক্তি বা একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য দেখা যায়। সুতরাং এর ফলে একটি কুচক্রী, ক্ষমতালোলুপ শাসকগোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। রাষ্ট্র বা কোনও রাজনৈতিক দল এভাবে সর্বগ্রাসী হয়ে পড়লে নাগরিকদের উদ্যম, উৎসাহ ও উদ্দীপনা লোপ পায়, দেশপ্রেমও স্তিমিত হয়।

(৪) ক্ষমতালোলুপ, কুচক্রী শাসন

পঞ্চমতঃ, একনায়কতন্ত্রের সমর্থকগণ একথা ভুলে যান যে, একনায়কতন্ত্র কখনই চিরস্থায়ী হতে পারে না। ইতিহাসে বহু দৃষ্টান্ত মেলে যা থেকে একথা প্রমাণিত যে, একনায়কতন্ত্র খুবই স্বল্পায়ু। একনায়ক যত কুশলী শাসকই হন না কেন, তাঁর কার্যকাল স্বল্পমেয়াদী। শাসনতন্ত্রের প্রাণশক্তি হল অকুণ্ঠ এবং একনিষ্ঠ গণ-সমর্থন। ভারতের মত আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশগুলি প্রমাণ করেছে যে, চিরস্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে বিপুল গণ-উদ্দীপনার মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত হয়, তা সংগ্রহ করা একমাত্র গণতন্ত্রেই সম্ভব।

(৫) একনিষ্ঠ, অকুণ্ঠ গণসমর্থনই শাসনতন্ত্রের প্রাণশক্তি ; একনায়কতন্ত্রে তা নেই ; তাই সে স্বল্পায়ু

ষষ্ঠতঃ, জ্ঞানীগুণী, রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা কখনই একনায়কতন্ত্রকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন না। একনায়কতন্ত্রের সমর্থকদের মধ্যে থাকেন কিছু

সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি। তাঁদের হুমকী এবং হামলা অপরাধপ্রবণ, অনগ্রসর ব্যক্তিদের বশীভূত করার জন্য একটা সাময়িক সাফল্য আনতে পারে বটে, কিন্তু স্থায়ীভাবে দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের সমর্থন লাভ এদের ভাগ্যে জোটে না। শেষ পর্যন্ত এমন হয়ে দাঁড়ায় যে একনায়ককে কেবল বাহবা দেওয়া, তাঁর আদেশে বন্দুকের সামনে পড়ে আত্মত্যাগ করার মত কিছু ভাবপ্রবণ ব্যক্তি ছাড়া একনায়কতন্ত্রে অন্য কোনও ব্যক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। তাই এমন কথাও বলা হয় যে একনায়কতন্ত্রে একমাত্র দেশপ্রেমিক হলেন একনায়ক নিজে। দাবার ছকে ঘুঁটি-সাজাবার মত, একই ছাঁচে ঢালা কলের পুতুল তৈরীর কাজই হল একনায়কের একমাত্র কাজ।

(৬) ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জ্ঞানী গুণীরা এর সমর্থক নন; রাজনৈতিক দাবার ছকে একনায়ক ও তাঁর অনুচরগণ ঘুঁটি সাজান, দেশবাসীদের একই ছাঁচে ঢালা কলের পুতুলে পরিণত করেন

সপ্তমতঃ, একনায়কতন্ত্র সাম্যের নীতির বিরোধী। কারণ, এ ব্যবস্থায় নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং সমানভাবে শাসনক্ষমতার অধিকারী হন না। ফলে নেতার প্রতিই তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। তাঁরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেন কখন তাঁদের প্রিয় নেতা সব কিছু ভেবে দেখবেন। তাঁদের স্বাধীন চেতনা, স্বাধীন কার্যক্ষমতা, স্বাধীন চিন্তাশক্তি, এক কথায়, তাঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্তা জড়ীভূত হয়, তাঁরা জড় পদার্থে পরিণত হন। নেতাই সব, বাকীরা নেতার সহচর বা অনুচর—এ জাতীয় কথাবার্তা একনায়কতন্ত্রের অসাম্য-নীতিই প্রকাশ করে।

(৭) একনায়কতন্ত্র সাম্য-বিরোধী; নেতাই সব, বাকীরা তাঁর সহচর বা অনুচর; ফলে ব্যক্তি-গণ নেতানির্ভর, জড়, নিষ্ক্রিয়

অষ্টমতঃ, পাশবিক শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে একনায়কতন্ত্র মানেই দমন-পীড়নের রাজত্ব বোঝায়। বিরোধী দলের বা বিরোধী নেতাদের বেপরোয়া গ্রেপ্তার, নির্বাসন, ব্যাপক গণহত্যা বা গুপ্তহত্যা শান্তি-পূর্ণ মিছিলের ওপর প্ররোচনামূলক পুলিশি বা জঙ্গী হামলা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ-সংবাদপত্র খুললেই প্রতিদিন ব্যক্তিগত বা একদলীয় বা সামরিক একনায়কতন্ত্রী নেতৃত্বের আমলে এ ধরনের খবর ও চিত্র পাওয়া যায়। একনায়কতন্ত্র জনমতের কোন মূল্যই দেয় না, সাধারণ মানুষ অসহায়, উপেক্ষিত থাকে।

(৮) একনায়কতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকার করে না. তাই জনমতের কোন মূল্য দেয় না

নবমতঃ, একনায়কতন্ত্র বিশাল রাষ্ট্রের পক্ষে উপযোগী নয়। রাষ্ট্র ছোট হলেই নায়ক বা তাঁর দল শাসন-কেন্দ্র থেকে দেশের সর্বত্র কর্তৃত্ব বিস্তারে সমর্থ হন। ইরফান হাবিব প্রভৃতি ভারতের নবীন যুগের ঐতিহাসিক দের মতে, দেশবাসীর চরম অর্থনৈতিক সঙ্কট যেমন স্বৈরাচারী মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হয়েছিল, তেমনি এই সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হল দিল্লী থেকে বহু দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে শাসনব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হওয়া। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে যানবাহনের বিরাট অগ্রগতি হলেও পৃথিবীর বহু স্থান প্রাকৃতিক কারণেই দুর্গম থেকে যায়।

(৯) একনায়কতন্ত্র বড় রাষ্ট্রের পক্ষে অনুপ-যোগী আধুনিক ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবের মতে, অর্থ-নৈতিক সঙ্কট ছাড়াও মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে শাসন-পরিচালনার অসুবিধা

॥ উপসংহার : গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র : উভয়ের তুলনা ॥

গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা না করলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের ঠিক বিপরীত শাসনব্যবস্থা। তাই এদের বৈশিষ্ট্যগুলি পরস্পরের ঠিক বিপরীত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যেমন ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠলেও তার ফলে তাদের গণতান্ত্রিক মৌলিক আদর্শ নষ্ট হয় নি। সুতরাং সাধারণ ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, গণতন্ত্রে জনগণের হাতে সমস্ত শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে বলে গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সাধারণতঃ বিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা (Decentralisation)। কিন্তু একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য হল এখানে একটি ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর বা রাজনৈতিক দলের হাতে সমস্ত শাসনক্ষমতার কেন্দ্রীভবন (Centralisation।

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের তুলনা : (১) গণতন্ত্র বিকেন্দ্রীভূত, একনায়কতন্ত্র কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা

দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতার আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। সেখানে থাকে একাধিক রাজনৈতিক দল। সরকার এবং বিরোধী দলগুলি নিজেদের এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা, আলাপ-আলোচনা, আপোস এবং বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সেখানে কাজ করে থাকে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রই বড়, ব্যক্তি গৌণ। ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের নামে স্বৈরাচারী সরকারের একটিমাত্র রাজনৈতিক দলই স্বীকৃত। সোবিয়েত রাশিয়ায় এবং চীনা প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে এই একদলীয় শাসনব্যবস্থা বৈধ বলে ঘোষিত।

(২) গণতন্ত্রে ব্যক্তি বড়, একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্র বড় ; গণতন্ত্র বহুদলীয়, একনায়কতন্ত্র একদলীয়

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্র শান্তিপূর্ণভাবে আন্তঃরাষ্ট্রিক বিরোধের মীমাংসা করে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র সাধারণতঃ সামরিক শক্তির কর্তৃত্বাধীন থাকে। সরকারের আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রীয় সব ব্যাপারেই একটা কঠোর, দমনমূলক জঙ্গী মনোভাব কার্যকর হয়ে থাকে। ফলে, কি আভ্যন্তরীণ, কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণভাবে কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করা হয় না। সব সময়ে একনায়কতন্ত্রী সরকারের মতামতকেই জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং জনগণকে তা মেনে নিতে বাধ্য করা হয়।

(৩) গণতন্ত্রে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যার সমাধান ; একনায়কতন্ত্রে হয় দমন-পীড়ন বা যুদ্ধ

চতুর্থতঃ, গণতন্ত্রে সরকারের প্রধান কাজ জনমতের মাধ্যমগুলিকে স্বাধীন এবং উন্মুক্ত করে রাখা। সরকারী প্রচারকার্যও অবশ্য জনমত-গঠনের মাধ্যমগুলির মারফত যত্নসহকারে চালাবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের মত দেশে বেতারকেন্দ্র বেসরকারী এবং স্বয়ংক্রিয় একটি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধনতন্ত্র প্রচলিত হলেও সেখানকার গণতন্ত্রে পত্রপত্রিকার স্বাধীনতা স্বীকৃত। নিজের দলের আস্থাভাজন থাকলেও সংবাদপত্রের তীব্র সমালোচনার ফলে প্রবল জনমতের চাপে দুর্নীতি-পরায়ণ মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের (Richard Nixon) পদত্যাগের ঘটনা

(৪) গণতন্ত্রে প্রচারব্যবস্থা স্বাধীন, একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ওয়াটারগেট নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সনের পদত্যাগ গণতন্ত্রের নজির ; গণতন্ত্র জনগণের কাছে দায়িত্বশীল ও প্রকাশ্য একনায়কতন্ত্রে সরকার গুপ্ত, নিভৃতির সন্ধানী (ক্রিস্টোফার লয়েড)

গণতন্ত্রেরই জয় সূচনা করে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রী সরকারে প্রচারব্যবস্থা পুরোপুরি সরকারী কর্তৃত্বের আওতায় থাকে। জনগণ শুধু তা জানতে পারে। সরকার তাদের প্রতিক্রিয়াকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলে। ফলে, একনায়কতন্ত্রী সরকারকে দায়িত্বশীল সরকার বলা যায় না, কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল: শাসিতের কাছে শাসকের দায়িত্বশীলতা। জনগণের কাছে রাষ্ট্রের সুস্পষ্টতাই গণতন্ত্রের আদর্শ। কিন্তু ক্রিস্টোফার লয়েডের (Christopher Lloyd) মতে একনায়কতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি হল রাষ্ট্রের গোপনীয়তা।

(৫) একনায়কতন্ত্রী শাসক কল্পনাশ্রয়ী ; হিট্‌লার, মুসোলিনী স্তালিন্‌ ও ভুট্টোর নজির ; গণতন্ত্রীগণও "জনগণ" নামক মিথ্‌কে আশ্রয় করে থাকেন, কিন্তু একনায়কতন্ত্রীদের তুলনায় তাঁদের কল্পনাবিলাসিতা সীমিত

পঞ্চমতঃ, গণতন্ত্রী নেতাগণও "জনগণ" নামক মিথ্‌কে আশ্রয় করে থাকেন। কিন্তু একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা তার তুলনায় বেশী কল্পনাশ্রয়ী। হিট্‌লার জার্মান্‌ জাতির কাছে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিতে পৃথিবীর ওপর আধিপত্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। মুসোলিনী প্রচার করেন যে, ফ্যাসীবাদের দ্বারাই তিনি প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের গৌরব পুনরুদ্ধার করবেন। স্তালিন্‌ রুশ জনগণকে সব সময়ে গণসংগ্রামের (People's War) আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল এই যে, তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময়ে সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি (Non-aggression Pact) স্বাক্ষর করেন এবং সেই সুযোগে পোল্যান্ড্‌ দখল করে নেন। পরে অবশ্য তিনি তাঁর দেশবাসীদের হিট্‌লারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংলন্ড্‌, আমেরিকা প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে তথাকথিত গণসংগ্রামে যোগ দিতে বাধ্য করেন। মেহনতী জনতার ধনতান্ত্রিক দেশের জনগণের সঙ্গে একত্রে এ লড়াই কিভাবে মার্ক্‌স্‌বাদ লেনিনবাদের ভিত্তিতে গণসংগ্রাম বলে সমর্থন করা যায়, তা বোঝা কঠিন। আধুনিক যুগে পাকিস্তানের একনায়কতন্ত্রী নেতা ভুট্টো (Bhutto) তাঁর দেশবাসীদের ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছরের সুদীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হতে আহ্বান জানান। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

(৬) গণতন্ত্রে জনমত বা আন্তর্জাতিকতার দ্বারা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সীমিত ; একনায়কতন্ত্রীদের জাতীয়তাবাদ উগ্র, বিকৃত ও জঙ্গী

ষষ্ঠতঃ, গণতন্ত্রে জাতীয়তাবাদ একনায়কতন্ত্রী জাতীয়তাবাদের মত উগ্র নয়। তার প্রধান কারণ হল, গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে আন্তর্জাতিক নীতির কাছে অনেক ক্ষেত্রে নত করতে হয়। ফলে, কোন গণতান্ত্রিক দেশই অবাধে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখনই বিদেশে কোথাও হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেছে, তখনই তাকে প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছে। তাই ভিয়েতনামের রণাঙ্গন থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে সরে আসতে হয়েছে। একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রকেও এভাবে বাইরের জনমতের চাপে নিজের আভ্যন্তরীণ বা পররাষ্ট্রিক নীতি পরিত্যাগ করতে হয়েছে। কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার মত। পর্তুগালে একনায়কতন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী সালাজার (Salazar) গোয়া প্রভৃতি ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে পর্তুগীজ সৈন্যদের অপসারিত করতে প্রথমে রাজী হন নি। তাঁর নিজের

দেশেও এ-বিষয়ে কোনও মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম নীতির বিরুদ্ধে সেখানকার পত্রপত্রিকায় অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা খোলাখুলিভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়।

(৭) বহুদলীয় গণতন্ত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়, একদলীয় একনায়কতন্ত্রে তা সম্ভব

সপ্তমতঃ, গণতন্ত্রের সমালোচকগণ গণতন্ত্রকে মূর্খ, অজ্ঞ, অশিক্ষিতের শাসনতন্ত্র বলে ব্যঙ্গ করে থাকেন। এর তাৎপর্য হল যে, গণতন্ত্র অপদার্থ, অদক্ষ শাসনব্যবস্থা। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে একজনমাত্র শাসক বা একটিমাত্র রাজনৈতিক দল সর্বেসর্বা থাকায় সেখানে বহু ব্যক্তির যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় না। যুদ্ধ, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রভৃতি জরুরী ব্যবস্থায় একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

(৮) বহুদলীয় গণতন্ত্র একদলীয় একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা স্বল্পায়ু

অষ্টমতঃ, বহুদলীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলির সংঘাত, দলত্যাগ ইত্যাদির ফলে ক্রমাগত রাজনৈতিক উত্থান-পতন দেখা যায়। তাই বলা হয় যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা কম। কিন্তু একদলীয় একনায়কতন্ত্রে এ ধরনের দলীয় সংঘর্ষের সম্ভাবনা না থাকায় গণতন্ত্রের তুলনায় একনায়কতন্ত্রের ভিত্তি বেশী মজবুত। একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের তুলনায় বেশী স্থায়ী।

(৯) গণতন্ত্র সাম্য ও স্বাধীনতার ওপর প্রতিষ্ঠিত; একনায়কতন্ত্র গণতান্ত্রিক স্বায়ত্ত-শাসনের পবিত্রতাকে মানে না

নবমতঃ, গণতন্ত্র স্বাধীনতা ও সাম্যের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী-পুরুষ, প্রজাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারকে কেন্দ্র করে সংসদীয় গণতন্ত্র গঠিত। কিন্তু একনায়কতন্ত্র নির্বাচন-ব্যবস্থার মত অনুষ্ঠানের অথবা বিরোধী দলের বা পঞ্চায়েতের মত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের, এক কথায়, গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পবিত্রতাকে স্বীকার করে না।

(১০) গণতন্ত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর সম্ভব; একনায়কতন্ত্রে সশস্ত্র বিপ্লবই একমাত্র পথ; তাই জেম্‌স্ মিলের মতে গণতন্ত্র "এ-যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার".

দশমতঃ, গণতন্ত্র জনগণের সম্মতির ওপর নির্ভর করে। শান্তিপূর্ণভাবে ব্যালটে ভোট দিয়ে জনগণ সহজেই তাঁদের পছন্দসই রাজনৈতিক দলকে নির্বাচন করে অন্য দলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন। ফলে, সশস্ত্র বিপ্লব বা হিংসাত্মক গণবিক্ষোভ থেকে গণতন্ত্র দেশকে মুক্ত রাখতে পারে। তাই জেম্‌স্ মিল্ (James Mill) সংসদীয় গণতন্ত্রকে "এ-যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার" বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু একনায়কতন্ত্র একমাত্র পশুবলের ওপর নির্ভর করে থাকে, জনমতকে কোনমতে গ্রাহ্য করে না। ফলে, একনায়কতন্ত্রী কুশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের রোষ ক্রমশঃ দানা বাঁধতে পারে। চরম অবস্থায় এই রোষ রক্তাক্ত বিপ্লবের রূপ নিতে পারে।

॥ গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র : উপসংহার ॥

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা থেকে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। গণতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতার আদর্শ অবলম্বন করে থাকে। রাষ্ট্র

ব্যক্তির কল্যাণের জন্য। রাষ্ট্রের অর্থাৎ রাষ্ট্রের নামে কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের প্রাধান্য ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী। সুতরাং **গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই অধিকতর কাম্য।** স্যার হেনরী ব্যানারম্যান (Sir Henry Bannerman) তাই বলেছেন যে, লোকে শুধু সুশাসনই চায় না, নিজেদের শাসনও চায়। সুতরাং সুশাসন কখনই স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প নয় ("Good governmhnt is no substitute for self-government.")। গণতন্ত্র হল জনগণের নিজেদের শাসন, স্বায়ত্তশাসন। গণতন্ত্রের মন্থরতা, ঘন ঘন সরকার-পরিবর্তন, সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সংখ্যালঘিষ্ঠের ওপর নির্যাতন ইত্যাদি অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু সেজন্য গণতন্ত্রকে বর্জন করে একনায়কতন্ত্রের আদর্শকে মেনে নেওয়ার মত ভুল সিদ্ধান্ত আর কিছুই হতে পারে না। একনায়কতন্ত্রের মত বিদ্যুৎগতিতে শাসনচালনা করতে কিংবা জরুরী অবস্থাকে দ্রুত আয়ত্তে আনতে হয়ত গণতন্ত্র সব সময় সমর্থ হয় না। নেতার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা বা মোহিনী শক্তির (Charisma) ও নেতৃপূজার আদর্শে গঠিত হয়ে দ্বারা একনায়কতন্ত্র কিছু কিছু জনহিতকর কাজকর্ম অতি দ্রুত সম্পাদন করতে পারে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রের সুফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাময়িক। গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব তার তুলনায় অনেক সম্ভাবনাময়। সাধারণতঃ একনায়কগণের জেদ, ক্ষমতালিপ্সা, নৃশংসতা ও যুদ্ধপ্রিয়তাই তাঁদের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। লোকে তাঁদের জঙ্গী মনোভাব শেষ পর্যন্ত বরদাস্ত করে না। দেশকে নানা যুদ্ধে জড়িত করে ফেলার জন্য লোকে অবশেষে একনায়কতন্ত্রের বাঁধন থেকে মুক্তি চায়। তাই অত্যন্ত শক্তিশালী হলেও নাপোলিয়*, হিট্‌লার, মুসোলিনির পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস নয়, বন্দুক চালনার ঔচিত্যবোধিকা জনচেতনাই শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার উৎস—এই সিদ্ধান্ত গণতন্ত্রের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

স্যার হেন্‌রি ব্যানারমানের সঠিক উক্তি—"সুশাসন কখনই স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প নয়"ঃ গণতন্ত্রের বিকল্প ত্রুটিমুক্ত, পরিশুদ্ধ, আদর্শ গণতন্ত্রই; বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস নয়, বন্দুক চালনার ঔচিত্যবোধিকা জনচেতনাই ক্ষমতার উৎস

তবুও অতি-আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করলে মাঝে মাঝে বর্তমান যুগে গণতন্ত্রের পূর্ণগ্রাস আধুনিক যুগের সভ্য, শিক্ষিত, শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের বিভ্রান্ত করে তোলে। সমাজবদ্ধ জীব হলেও মানুষ শান্তির সন্ধানী, মুক্তির পিয়াসী। তবুও ত তাকে বারে বারে একদলীয় বা একব্যক্তিক ব্যবস্থার অধীনে থাকতে হয়। এই হেঁয়ালীর জবাবে বলা যায় যে, গণতন্ত্র অনেক দেশে বিপর্যস্ত হবার কারণ হল, এই দেশগুলিতে হয়ত গণতান্ত্রিক পরিবেশ চালু রাখার মত গণতান্ত্রিক নাগরিক নেই, অথবা তাদের নিয়ে সমবেতভাবে একনায়কতন্ত্রী শাসকের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত তেমন যোগ্য নেতৃত্ব নেই। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত রাশিয়া এবং চীনের সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্র এই তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্র গণতন্ত্রের পক্ষে পৃথিবীর অন্য দেশের আন্দোলনগুলিতে সব সময় সমানভাবে সমর্থন জানায় না। এই তিনটি রাষ্ট্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে অনেক সময় নিজেদের ইচ্ছামত হস্তক্ষেপ (Intervention)

করে। তাই দেখা যায়, সোবিয়েত রাশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী ও আফ্‌গানিস্থানে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম ও নিকারাগুয়াতে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির সমর্থনে হস্তক্ষেপ করে। সোবিয়েত রাশিয়ার সমর্থনে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সাম্যবাদী চীন একত্রিত হয়, শুধু এই কারণে যে মার্কিনী এবং চীনা সরকার এইভাবে তাদের সোবিয়েত-বিরোধিতাকে যৌথ, সুসংগঠিত রূপ দিতে পারবে। পৃথিবীতে আজ দুটি জোট (Bloc) আছে। একটির নেতৃত্বের শীর্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনা সরকার। অপরটির নেতৃত্ব দিচ্ছে সোবিয়েত সরকার। যখনই কোথাও গণতন্ত্র বিপন্ন হয়, তখনই সেখানে একটি জোট হস্তক্ষেপ করলে অপর জোটটি তার বিরুদ্ধে যায়। ফলে, পৃথিবীর যে-কোনও দেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কার্যতঃ দুটি জোটে বিভক্ত বৃহৎ ত্রিশক্তির ঠাণ্ডা লড়াইয়ে (Cold War) রূপান্তরিত হয়। এই শোচনীয় সম্ভাবনার হাত থেকে গণতন্ত্রকে বাঁচাবার একমাত্র সঠিক উপায় নির্দেশ করে গেছেন জওহরলাল নেহরু তাঁর বিখ্যাত জোটনিরপেক্ষতা নীতি (Non-alignment with Power Blocs) আবিষ্কারের মাধ্যমে।

তবু কেন মাঝে মাঝে একনায়কতন্ত্রের হুমকি বা হামলা ? এ হেঁয়ালীর জবাব : (১) ইংলিস্টস রাষ্ট্রে হয়ত গণতন্ত্রকে সফল করার শর্ত নেই ; অথবা (২) বর্তমান আন্তর্জাতিক জোট-বন্ধতার জন্য সোবিয়েত ও মার্কিন শিবির-দুটি গণতন্ত্রকে বাঁচাবার প্রশ্ন নিজেদের জোটগত স্বার্থকেই বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ; এক্ষেত্রে বাঁচার রাস্তা একটাই নেহরুর "জোটনিরপেক্ষতা নীতি" সমর্থন

সারাংশ

প্রাচীন গণতন্ত্র রাষ্ট্রিক, বর্তমান গণতন্ত্র ব্যক্তিক।

আধুনিক গণতন্ত্রের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস : রাজতন্ত্র, যাজকতন্ত্র, সামন্ততন্ত্রের সংঘাত ; শিল্পবিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব ; গণতন্ত্রের ওপর অতীতের বিখ্যাত বিপ্লবগুলির প্রভাব।

গণতন্ত্রের কয়েকটি ধ্রুপদী সংজ্ঞা : হিরোডোটাস ও পেরিক্লিসের সংজ্ঞা।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম্ লিঙ্কনের চিরস্মরণীয় সংজ্ঞা—জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত জনগণের শাসনব্যবস্থাই গণতন্ত্র।

জন্ স্টুয়ার্ট্ মিলের আধুনিক পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক বা সংসদীয় গণতন্ত্রের সংজ্ঞা—ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের নজির।

গণতন্ত্রের স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য : (১) গণসম্মতি ও সাম্য। (২) জনমতগঠনের মাধ্যমগুলির স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার স্বীকার ; বিরোধী দলের বিশেষ মর্যাদা। (৩) "জন পিছু এক ভোট।" (৪) গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে বোঝাপড়া। (৫) সুস্থ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির উপযোগী মূল্যবোধ।

গণতন্ত্রের ধ্রুপদী সংজ্ঞা সংকীর্ণ। গণতন্ত্র কিভাবে সকলের শাসনতন্ত্র ?—গণতন্ত্রের আধুনিক সংজ্ঞা। ডিলাইল্ বার্ন্‌স্ ও পল্ সুইজি সাম্যের ওপর জোর দেন, বার্কার গণতান্ত্রিকতা, লৌকিকতা ও সামাজিকতা সমার্থক মনে করেন। ম্যাক্‌আইভার গণতন্ত্রকে সামাজিক পদ্ধতি বলে মূল্যবান্ মনে করেন।

গণতন্ত্র পাঁচ প্রকার :—(১) প্রত্যক্ষ, (২) পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক বা সংসদীয় বা দায়িত্বশীল, (৩) উদারনৈতিক, (৪) পশ্চিমী ; (৫) জনগণতন্ত্র।

গ্রীসের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আসলে মুষ্টিমেয়তন্ত্র।

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেন বজায় রয়েছে? (১) ১ম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের বহু রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের ব্যর্থতা। (২) জনগণ বেশী সক্রিয় হতে চান। (৩) জটিল, জরুরী সমস্যার সমাধানে গণতন্ত্র ব্যর্থ।

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি: সুইজারল্যান্ডে ৪টি ব্যবস্থা প্রচলিত—গণনির্দেশ (আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক), গণপ্রস্তাব বা গণউদ্যোগ (পূর্ণাঙ্গযুক্ত ও অপূর্ণ), গণভোট এবং গণপ্রতিনিধির পদচ্যুতি বা প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের গুণ (১) ছোট এলাকায় যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন সহজ। (২) জনগণের ভূমিকা সক্রিয়। (৩) আইনপ্রণয়ন সম্বন্ধে জনগণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভ। (৪) নির্বাচক-নির্বাচিতের ঘনিষ্ঠতা। (৫) দলতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত। (৬) আইনসভার সক্রিয়তা। (৭) নির্বাচিতের ওপর নির্বাচকদের কর্তৃত্ব। (৮) জরুরী অবস্থায় প্রযোজ্য।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের অসুবিধা—(১) আইনপ্রণয়নে জনগণের উপযুক্ত বিশেষজ্ঞতার অভাব। (২) জনগণ সাময়িক উত্তেজনা, ব্যক্তিগত ঝোঁক, দলবাজ রাজনীতিবিদদের প্ররোচনার শিকার। (৩) ছোট দেশের পক্ষেই প্রযোজ্য। সুইজারল্যান্ডে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বিশেষ কারণে সফল (ব্যাপার্ড)। (৪) আইনসভা সম্বন্ধে লোকের অনীহা। (৫) ফলে, আইনসভা দুর্বল বিতর্কসভা হয়ে ওঠে। (৬) আধুনিক বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যয়বহুল, সময় ও উদ্যোগের অভাব। (৭) গণতন্ত্রের ভিত্তি সংগঠিত জনমত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসন নয়। (৮) প্রত্যক্ষভাবে বিচারক নির্বাচনের ক্ষেত্রে মার্কিন ব্যবস্থার কুফল।

আধুনিক বৃহৎ রাষ্ট্রে পরোক্ষ গণতন্ত্রই প্রচলিত। ব্যস্ত নাগরিকের পক্ষেও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের অসুবিধা। তবে কিছু কিছু প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত।

উদারনৈতিক গণতন্ত্র ইংলন্ডের হিতবাদ ও সমাজতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত। নাগরিকদের অধিকারগুলি স্বীকৃত এবং স্বাধীন, নিরপেক্ষ আদালত দ্বারা সংরক্ষিত। আবার, গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব। ল্যাস্কির ব্যাখ্যা।

পশ্চিমী গণতন্ত্র সাধারণভাবে উদারপন্থী গণতন্ত্র। এরা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র, সংসদীয় বা রাষ্ট্রপতিশাসিত প্রচলিত।

সোবিয়েত রাশিয়া, চীন ও পোল্যান্ড প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপীয় সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলিতে মার্কস-লেনিনের আদর্শ। সাম্যবাদীগণ এদের "জনগণতন্ত্র" ও প্রকৃত গণতন্ত্র বলেন।

গণতন্ত্রের গুণ: (১) ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ। (২) আদর্শ শাসনব্যবস্থা (মিল)। শাসক স্বৈরাচারী হতে পারে না। (৩) কেবল গণতন্ত্রই ব্যক্তিবর্গের সার্বিক মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট। (৪) নাগরিকগণের রাজনৈতিক শিক্ষালাভ। (৫) রাষ্ট্রের ওপর ব্যক্তির স্থান। (৬) মিল, ব্রাইস প্রভৃতির মত আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের যুক্তি: গণতন্ত্র ব্যক্তির চরিত্র বিকাশের সহায়ক। (৭) শান্তিপূর্ণভাবে সরকার বদলের ব্যবস্থা থাকায় বিপ্লব, বিক্ষোভের সম্ভাবনা কম। তাই স্থায়ী। (৮) আরিস্টটলের কথায় বার্কার বলেছেন—শুধু গণতন্ত্রেই সত্য, ন্যায়, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ রূপায়িত, ব্যক্তি প্রতিবাদের অধিকার পায়। (৯) গণতন্ত্র সর্বজনীন, অভিজ্ঞতাভিত্তিক শাসনব্যবস্থা; যাঁর পায়ে জুতো, তিনিই জানেন—কাঁটা কোথায়, ব্যথা কোথায়। (১০) উন্নতচরিত্রের নাগরিক গণতন্ত্রই গড়ে। উদার, উন্মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যেই শিল্প, সংস্কৃতি, অর্থনীতি উন্নত। (১১) "যুদ্ধ ধ্বংসের যমদূত, শান্তি সৃষ্টির মেঘদূত"—প্রশান্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার একমাত্র সহায়। (১২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। তাই গণতন্ত্র বিশ্বজনীন।

গণতন্ত্রের দুর্বলতা, অসুবিধা, বিপদ, বিচ্যুতি—(১) গণতন্ত্র "মূর্খের রাজত্ব," মাথাগুন্তিই বড় কথা, মাথাটা নয়; গুণের চেয়ে গণনার জোর বেশী। (২) জনগণের খেয়ালখুশীর ওপর চলে। ঘন ঘন নির্বাচন ব্যয়বহুল। (৩) নেতারা দোষী হলে জনগণের বিপদ। (৪) বিধায়কগণের আইনপ্রণয়ন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞতার অভাব। (৫) অবাধ, নির্লজ্জ, দলবাজী, দুর্নীতি। (৬) অপসংস্কৃতির আবির্ভাব (মেন ও লেবঁ)। "জনপ্রিয়তা অশালীনতা" (বার্নার্ড শ')। (৭) সমাজতন্ত্র ছাড়া গণতন্ত্র সফল হয়

না (ল্যাস্কি)। (৮) "অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট"—বৈঠকী চালে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে জরুরী
অবস্থায় অচল। (৯) গণতান্ত্রিক সাম্যনীতি জীববিজ্ঞানের জন্মগত অর্জনসূত্রের বিরোধী।
গণতন্ত্রকে সফল করার উপায় : (১) মিলের ৩টি শর্ত : জনগণের আগ্রহ, প্রয়োজনমত সংগ্রামের প্রস্তুতি,
নাগরিকদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা। চাই গণতান্ত্রিক নাগরিক। (২) চাই গণতান্ত্রিক পরিবেশ
ও ঐতিহ্য। (৩) অর্থনৈতিক সাম্য। (৪) জনমত গঠনের মাধ্যমগুলির গণতান্ত্রিকীকরণ চাই। (৫)
শ্রেণী ছদ্মগণতন্ত্র বা আপাত-গণতন্ত্র সম্পর্কে সাবধানতা। (৬) গরিষ্ঠ, লঘিষ্ঠ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে
বোঝাপড়া। (৭) দেশপ্রেম বিবেক ও ন্যায়বোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, সংযম চাই। (৮) রাজনৈতিক শিক্ষার
মান উন্নত থাকা চাই। (৯) বার্ন্‌হ্যাম্‌ গণতন্ত্রে "নেতৃত্বগত বিপ্লব" চান। চাই দক্ষ আমলাতন্ত্র। (১০)
সৎ, দেশপ্রেমিক দলীয় নেতৃত্ব এবং মন্ত্রী ও আমলার মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা দরকার। (১১) সংগঠনমূলক,
দায়িত্বশীল, দেশপ্রেমিক বিরোধী দল চাই। (১২) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ চাই। (১৩) সুম্‌পেটারের
মতে যথার্থ মূল্যবোধসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব চাই। (১৪) ল্যাস্কির প্রস্তাব–গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের
সমন্বয়।

ভারতে গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তগুলি কতদূর কার্যকর ?—পৃথিবীর সকলেই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার
করেন ভারত এশিয়ার, তথা বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। কিন্তু ভারতে গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তগুলি সব
ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। (১) মিশ্র অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা। (২) শক্তিশালী, দায়িত্বশীল, সংগঠনমূলক
বিরোধী দলব্যবস্থা নেই। (৩) ব্যাপক নিরক্ষরতা। (৪) সুযোগ্য, বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব। (৫) রাজ-
নৈতিক দলগুলির শোচনীয় ব্যর্থতা, গোষ্ঠীগত অন্তর্দ্বন্দ্ব। (৬) স্বাধীনতাসংগ্রামের গৌরবময় ঐতিহ্য
থেকে বর্তমান নেতৃত্ব বিচ্যুত। (৭) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব। (৮) দক্ষ, সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ,
সরকারী কর্মচারীও বিরল। (৯) ইংলন্ডের মত সংসদীয় রীতিনীতি গড়ে ওঠে নি। (১০) রিগিং, জাল
ভোট, ভোটার তালিকায় কারচুপি, বুথ্‌দখল, সরকারী কর্মচারীদের দলীয় স্বার্থে নির্বাচনে ব্যবহার ইত্যাদি
দুর্ঘটনা।

একনায়কতন্ত্র, সামগ্রিক বা সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র—গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র দুটি বিপরীত মেরু (কার্টার ও
হার্জ্‌)। একনায়কতন্ত্রে সমস্ত শাসনক্ষমতা নেতা বা তাঁর অনুচরগণের করায়ত্ত। জুলিয়াস্‌ সিজার,
নাপোলিয়ঁ, হিট্‌লার, মুসোলিনি, কামাল পাশার নজির।

একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব তাৎক্ষণিক নয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক ও আন্তর্জাতিক
কারণে এর উদ্ভব। কারণগুলির ব্যাখ্যা গুরুত্বপূর্ণ।

একনায়কতন্ত্র পাঁচ প্রকার—(১) ব্যক্তিগত বা সামরিক, (২) আপাত-গণতান্ত্রিক ব্যক্তিগত, (৩) ফ্যাসীবাদী
বা নাট্‌সী, (৪) কম্যুনিস্ট্‌ দলীয়, (৫) সম্পূর্ণ একদলীয়।

ব্যক্তিগত বা সামরিক একনায়কতন্ত্রে (পাকিস্তান, মিশর, বাংলাদেশ) সাজানো নির্বাচন ব্যবস্থা থাকে।
আপাত-গণতান্ত্রিক ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্রে গণরোষ, হতাশা বা সরকারী প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগে
সামরিক বা বেসরকারী নেতৃত্ব। অভিজাতদের প্রাধান্য। ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ণের নজির।

ফ্যাসীবাদী বা নাট্‌সী ব্যক্তিগত বা দলীয় একনায়কতন্ত্র : হিট্‌লার ও মুসোলিনির নজির।

কম্যুনিস্ট্‌ দলীয় একনায়কতন্ত্র—১৯১৭ সালে সোবিয়েত রাশিয়ায় ও ১৯৪৯ সালে চীনে প্রবর্তিত।
সাম্যবাদ ও সমভোগবাদের নীতির প্রয়োগে সর্বহারাদের একাধিপত্য। ব্রেঝ্‌নেভ্‌ সংবিধানে রুশ সমাজের
সার্বিক রূপান্তর ঘোষিত। পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রী দেশগুলির নজির। এখানে সর্বহারাদের প্রতিভূ
কম্যুনিস্ট্‌ দল একমাত্র স্বীকৃত দল। মার্ক্‌সবাদীদের মতে, তাদের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন সম্পূর্ণ
গণতান্ত্রিক।

জনপ্রিয় মন্ত্রিপরিষদীয় কর্তৃত্ব একধরনের একদলীয় একনায়কতন্ত্র হলেও তা সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরোধী
নয়। ইংলন্ডের নজির।

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :—(১) ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্র বড়। (২)] ব্যক্তির চিন্তাভাবনার রাজনীতিকীকরণ,
আর্টের প্রচারধর্মিতা (বার্ট্রান্ড্‌ রাসেল্‌)। (৩) নাগরিকদের ভীতিপ্রদর্শন, দমন-পীড়ন ; বন্দুকবাজি,
সাজানো নির্বাচন, রিগিং, আইনসভার কণ্ঠরোধ, বিরোধীদের চরিত্রহনন, গণহত্যা, গুপ্তহত্যা, বন্দীত্ব, নির্বা-
সন, গুপ্তচরব্যবস্থা, মিথ্যা প্রচার। (৪) একদলীয়, বেতনভুক্ত্‌, পেশাদারী, "ক্যাডারভিত্তিক" পার্টি গঠন ;
দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের দাবী ; রাষ্ট্র, জাতি, নায়ক ও দল—একই। (৫) প্রতীক, রূপকল্প ("মীথ্‌"),

ধ্বনি (শ্লোগান্) প্রভৃতির ওপর গুরুত্বদান। (৬) জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের 'মীথ্' ঃ হিট্লার ও সোরেলের প্রচার। (৭) যুদ্ধবাদী, সাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্ব—হিট্লার, মুসোলিনি ও স্তালিনের নীতি ; চীনা-সোবিয়েত বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ—"সোবিয়েত রাশিয়া নয়া সাম্রাজ্যবাদী, সংশোধনবাদী।"

একনায়কতন্ত্রের গুণাবলী—(১) গণতন্ত্র শিথিল ও জটিল, বৈঠকী চালে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিলম্ব। একনায়কতন্ত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। (২) "নানা মুনির নানা মত" নেই। (৩) রাষ্ট্রের উদ্যোগে শিক্ষাবিস্তার, কৃষি, বিজ্ঞান, শিল্প ও অর্থনীতির ব্যাপক, বিস্ময়কর উন্নতি ; সোবিয়েত সাতসালা পরিকল্পনার নজির। (৪) যুদ্ধের মত জরুরী অবস্থায় একনায়কতন্ত্র সফল ; ইংলণ্ডে চার্চিলের নজির। (৫) দক্ষ, উদারপন্থী একনায়ক দেশপ্রেমিক সুনাগরিক সৃষ্টি করে দেশের পুনর্জাগরণ ঘটাতে পারেন—"তরুণ তুর্কী" একনায়ক মুস্তাফা কামালের ও ২য় মহাযুদ্ধে স্তালিনের নজির। (৬) নির্বাচনী উত্থান-পতনের জোয়ার-ভাঁটা না থাকায় একনায়কতন্ত্রে সুশাসনের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা।

একনায়কতন্ত্রের দোষত্রুটি ঃ—(১) ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বাড়াবাড়ি ; রুশ নেতা ট্রট্স্কির অভিযোগ। (২) যুদ্ধবাদী ও বিশ্বশান্তির পরিপন্থী, মানবসভ্যতার বিশেষ শত্রু। নারীর মাতৃত্বের মতই যুদ্ধ স্বাভাবিক (মুসোলিনি)। (৩) ভীতিপ্রদর্শন, হত্যা, বন্দীত্ব, নির্বাসন, সাজানো নির্বাচন, বিরোধীদলের কণ্ঠরোধ প্রভৃতি দমনমূলক ব্যবস্থা। একনায়ক বা তাঁর দল জনগণের ঘৃণার পাত্র। (৪) ক্ষমতালোলুপ, কুচক্রী শাসন। (৫) একনিষ্ঠ, অকুণ্ঠ গণসমর্থনই শাসনতন্ত্রের প্রাণশক্তি। একনায়কতন্ত্রে তা নেই। তাই সে স্বল্পায়ু। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জ্ঞানীগুণীরা এর সমর্থক নন। নাগরিকগণ একই ছাঁচে ঢালা কলের পুতুল। (৭) একনায়কতন্ত্র সাম্যবিরোধী, নেতাই সব, বাকীরা তাঁর সহচর বা অনুচর। (৮) জনমতের কোন মূল্য দেওয়া হয় না। (৯) বড় রাষ্ট্রের পক্ষে অনুপযোগী।

গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র ঃ উভয়ের তুলনা ঃ (১) গণতন্ত্র বিকেন্দ্রীভূত, একনায়কতন্ত্র কেন্দ্রীভূত। (২) গণতন্ত্রে ব্যক্তি বড়, একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্র বড় ; গণতন্ত্র বহুদলীয়, একনায়কতন্ত্র একদলীয়। (৩) গণতন্ত্রে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যার সমাধান, একনায়কতন্ত্রে হয় দমনপীড়ন বা যুদ্ধ। (৪) গণতন্ত্রে প্রচারব্যবস্থা স্বাধীন, একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। ওয়াটারগেট্ নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সনের পদত্যাগ। গণতন্ত্র জনগণের কাছে দায়িত্বশীল ও প্রকাশ্য, একনায়কতন্ত্রে সরকার নিভৃতির সন্ধানী (ক্রিস্টোফার লয়েড্)। (৫) একনায়কতন্ত্রী শাসক কল্পনাশ্রয়ী। হিট্লার, মুসোলিনি, স্তালিন্ ও ভুট্টোর নজির। (৬) বহুদলীয় গণতন্ত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়, একদলীয় একনায়কতন্ত্রে তা সম্ভব। (৭) বহুদলীয় গণতন্ত্র একদলীয় একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা স্বল্পায়ু। (৯) গণতন্ত্র সাম্য ও স্বাধীনতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ; একনায়কতন্ত্র গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসনের পবিত্রতাকে মানে না। (১০) নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর সম্ভব। একনায়কতন্ত্রে সশস্ত্র বিপ্লবই একমাত্র পথ। গণতন্ত্র 'এ যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার'।—(জেম্স্) মিল্।

তবু কেন মাঝে মাঝে একনায়কতন্ত্রের হুমকি বা হামলা ? এ হেঁয়ালীর জবাব ঃ—(১) সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে হয়ত গণতন্ত্রকে সফল করার শর্ত নেই। অথবা (২) বর্তমান আন্তর্জাতিক জোটবন্ধতার জন্য সোবিয়েত ও মার্কিন শিবির দুটি গণতন্ত্রকে বাঁচাবার প্রশ্নে নিজের জোটগত স্বার্থকেই বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। এ ক্ষেত্রে বাঁচার রাস্তা একটাই-"জোট-নিরপেক্ষতা নীতি" সমর্থন।

———

৪ সরকার ঃ সাংগঠনিক বিশ্লেষণ

"The government of each state is a unit engaged in expressing and executing the will of the state, and a certain degree of harmony among the various organs, no matter how extensively differentiated is essential."
—Gettell

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কাল্পনিক। তার কার্যকলাপ তার পক্ষ থেকে সরকারই সম্পাদন করে থাকে। এই কার্যকলাপগুলি প্রধানতঃ তিন রকম ঃ আইনপ্রণয়ন, শাসনপরিচালনা এবং বিচার। রাষ্ট্রস্থাপনের আদি পর্বে এই কাজগুলি বর্তমানকালের মত জটিল ছিল না। তাই সে গুলি একই কর্তৃত্বের দ্বারা গোষ্ঠী বা উপজাতির দলপতির নির্দেশে পরিচালিত হত। কালক্রমে, জনজীবনের জটিলতাবৃদ্ধির ফলে এইগুলি পৃথক্ পৃথক্ কর্তৃত্বের হাতে অর্পিত হল। ফলে, আইনসভা (Legislature) আইনপ্রণয়ন, শাসনবিভাগ বা নির্বাহী বিভাগ (Executive) শাসনপরিচালন এবং বিচারবিভাগ (Judiciary) বিচারের নানাপ্রকার কার্য সম্পাদন করে থাকে।

সরকারের ৩টি বিভাগ ঃ আইনসভা, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ

সাধারণতঃ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সার্বিক নির্বাচনের মারফত নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিগণ আইনসভায় আইনপ্রণয়ন করে থাকেন। নাগরিকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা আইনসভায় প্রতিফলিত হয়।

আইনসভার কাজ

মন্ত্রিসভার পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগ গঠিত হয় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের দ্বারা। এঁরা মন্ত্রীরূপে আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতিচালিত শাসনব্যবস্থায় অবশ্য আইনসভার বিভিন্ন সমিতিগুলির নেতারা যে আইন প্রণয়ন করেন, তার নির্দেশে রাষ্ট্রপতি তাঁর নিজস্ব উপদেষ্টাদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রিসভাই হোক্, বা রাষ্ট্রপতির সদস্যগণই হোক্, উভয় ক্ষেত্রেই প্রধান প্রশাসককে সাহায্য করে থাকেন একদল আমলা। সুতরাং আমলাতন্ত্রও (Bureaucracy) আধুনিক শাসকমণ্ডলীর বা নির্বাহীবিভাগের অন্তর্গত।

শাসনবিভাগের কাজ

বিচার-বিভাগের কাজ বলতে বোঝায় বিচারকার্য সম্পাদন করা। কিন্তু বিচারের কাজটি তত সহজ নয়। আধুনিক গণজীবন জটিল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। ফলে, বিচা-

রকগণ প্রধানতঃ আইনসভার দ্বারা গৃহীত এবং শাসনবিভাগের দ্বারা প্রযুক্ত আইন-কানুনগুলির বৈধতা এবং যথার্থতা সম্বন্ধে বিচার করলেও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারের সম্পর্ক নির্ণয়, শাসনতন্ত্রের ওপর সঠিক ভাষ্যদান ইত্যাদি কাজও করে থাকেন।

বিচারবিভাগের কাজ

॥ ক্ষমতাবিভাজন বা ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি ॥

সরকারের তিনটি বিভাগ—আইনসভা, শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ। এই তিনটি বিভাগের ক্ষমতা পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেক বিভাগের হাতেই ন্যস্ত করা উচিত—এই-রকম একটি মতবাদ "আইনে স্বরূপ" (L' Espirit D' Lois "Spirit of the Laws") নামক গ্রন্থে বিখ্যাত ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মঁতেস্‌কিএ (Montesquieu) ১৭৪৮ সালে ব্যাখ্যা করেন। তিনি ইংলণ্ডে ভ্রমণ করে দেখেন যে সেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সংরক্ষিত। কিন্তু সে সময়ে তাঁর রাষ্ট্রের, অর্থাৎ ফরাসীদেশের চরম রাজতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অস্তিত্ব রাজার খেয়ালখুশীর ওপর নির্ভর করত। ইংলণ্ডের চমকপ্রদ নজির দেখে মঁতেস্‌কিএ অভিভূত হয়ে সিদ্ধান্ত করেন যে, সরকারের তিনটি বিভাগ ইংলণ্ডে পৃথকভাবে নিজের নিজের কাজ নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে থেকে সম্পাদন করে থাকে বলেই সেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরক্ষিত। অভিজ্ঞতাপ্রসূত (empirical) যুক্তির ওপর ভিত্তি করেই তিনি ক্ষমতাবিভাজন নীতি (Theory of Separation of Powers) সমর্থন করেন। অর্থাৎ আইনসভা, শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ এই তিনটি সরকারী দপ্তরের একটি অপরের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করলে, কিংবা তার কর্তৃত্ব আত্মসাৎ করলে, সেই সরকারের শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা বিশেষভাবে বিপন্ন হয়।

মঁতেস্‌কিএর ক্ষমতা-বিভাজন নীতি

ক্ষমতাবিভাজন নীতি মঁতেস্‌কিএ-র পূর্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমর্থন করেন। আরিস্টটল্‌ সরকারের কার্যাবলী গণসংসদ (Public Assembly), নির্বাহী প্রশাসক (Magistracy) এবং বিচার-বিভাগ (Judiciary) এই তিন ভাগের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন যে, সরকারের তিন রকম বিশেষ কার্যাবলী যেন স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ দপ্তরের বা ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। অর্থনীতিতে বিভিন্ন ব্যক্তির বিশেষ কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে যে শ্রমবিভাগের (Division of Labour) নীতি সমর্থিত হয়, আরিস্টটল্‌ সরকারের কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রেও সেই বিশেষ কর্মদক্ষতার সুযোগ-সুবিধার ওপর জোর দিয়েছিলেন।

আরিস্টটল্‌ কেন এ নীতির সমর্থক

রোমকযুগে পলিবিয়াস (Polybius) এবং সিসেরো (Cicero) এই দু'জন বিশিষ্ট লেখক এবং বক্তা সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য ক্ষমতা-বিভাজন নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে বিখ্যাত ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জাঁ বোদাঁ (Jean Bodin) মন্তব্য করেন যে, রাজা যুগপৎ

আইনপ্রণেতা এবং বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করলে স্বৈরাচারী রাজার দণ্ডাদেশ হয় চরম নিষ্ঠুরতারই প্রতীক। কিন্তু মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থায় ধর্মযাজকদের প্রভাব থেকে রাজতন্ত্র ইউরোপে ধীরে ধীরে নিজেকে যত মুক্ত করে তুলছিল, ততই স্বৈরাচারী রাজার প্রাধান্যের ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়ছিল। ফরাসী স্বৈরাচারী সম্রাট্ চতুর্দশ লুই (Louis XIV) সদর্পে বলেন, "রাষ্ট্র? সে ত' আমি" (L'etat c'est moi" বা "I am the State")। ইংলণ্ডে রাজা প্রথম চার্লস্ আইনসভা ভেঙ্গে দেন এবং জনপ্রতিনিধিদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা উপেক্ষা করেই নিজের ব্যক্তিগত কর্তৃত্বে আইন-প্রণয়নের ভার নিজের হাতে রাখার চেষ্টা করেন। এর শোচনীয় এবং মর্মান্তিক পরিণতি হল তাঁর শিরশ্ছেদ। সাময়িকভাবে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং অলিভার ক্রমওয়েলের (Oliver Cromwell) নেতৃত্বে ইংলণ্ডে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের ফলে অবশেষে ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং মধ্যযুগে হব্সের মত যে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীগণ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন, তাঁরা ক্ষমতা-বিভাজন নীতি অস্বীকার করতেন। লকের মত যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সমর্থন করতেন, তাঁরা ক্ষমতাবিভাজন নীতি সমর্থন করতেন। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে প্রসিদ্ধ ইংরেজ আইনবিদ্ ব্ল্যাক্স্টোন্ (Blackstone) ক্ষমতা-বিভাজন নীতি সমর্থন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপনাকালে মঁতেসকিঅ-র নীতি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে, মার্কিন শাসনতন্ত্র ক্ষমতাবিভাজন নীতির ভিত্তিতে রচিত হয় এবং হ্যামিল্টন্ (Hamilton), ম্যাডিসন্ (Madison) প্রমুখ তৎকালীন বিখ্যাত মার্কিনী নেতৃবৃন্দ এই নীতির সমর্থনে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ম্যাডিসন্ বলেন যে, সরকারের কোনও বিশেষ বিভাগের হাতে অন্য বিভাগগুলির ক্ষমতা ন্যস্ত হলে তা স্বেচ্ছাচারিতারই নামান্তর ("The accumulation of all powers......in the same hands......may justly be pronounced as the very definition of tyranny")।

ক্ষমতাবিভাজন নীতির ইতিহাস

॥ ক্ষমতাবিভাজন নীতির সমালোচনা : এ নীতি কাম্য নয় ॥

ক্ষমতাবিভাজন নীতি ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার পবিত্র উদ্দেশ্যে সমর্থিত হলেও অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **এই নীতির বিরুদ্ধে** নানাপ্রকার **সমালোচনা** করেছেন। প্রথমতঃ, সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতা যদি পৃথকভাবে বণ্টিত ও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, তা হলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা শুধু সরকারী ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের ওপর নির্ভর করে না। ব্যক্তি-স্বাধীনতার সবচেয়ে মূল্যবান রক্ষাকবচ হল প্রধানতঃ সচেতন, সুগঠিত এবং দায়িত্বশীল জনমত। এই জনমতের অভাবেই অনেক সময় গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের কাঠামোকে আশ্রয় করে দেশে চরম স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র গড়ে উঠতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানী ও ইতালিতে এইভাবেই একনায়কতন্ত্র গড়ে উঠেছিল। দেশের ঐতিহ্য, নাগরিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং স্বাধীনতা রক্ষার একান্ত আগ্রহের জন্যই ইংলণ্ডে ব্যক্তি-

ক্ষমতাবিভাজন নীতির সমালোচনা : এ নীতি কাম্য নয় ; কারণ, (১) এ নীতি ছাড়াই স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়

স্বাধীনতা সুরক্ষিত। তা ছাড়া, মঁতেসকিএ মনে করেন যে, ইংলণ্ডে ক্ষমতাবিভাজন নীতি অনুসৃত হয়। কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। কারণ, ইংলণ্ডের মত এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতাবিভাজন নীতি বাহ্যতঃ প্রযোজ্য। আসলে, এখানে আইনসভার সার্বভৌমত্ব (Parliamentary Sovereignty) স্বীকৃত। সুতরাং আইনসভাই এখানে সবচেয়ে বেশী ক্ষমতার অধিকারী।

দ্বিতীয়তঃ, জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্, ব্লুনট্শ্লি, ফাইনার, ল্যাস্কি ও বার্কার বলেন যে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা পৃথক্ভাবে বণ্টিত করে দিলে তাদের প্রত্যেকের কর্মকুশলতা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ, সরকার যেন একটা জৈবিক সম্মিলন (organic unity), তার বিভাগগুলির পরস্পর এক অচ্ছেদ্য জৈবিক যোগসূত্রে সংযুক্ত। জৈব মতবাদের সমর্থকগণও এই মত পোষণ করেন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সরকারী বিভাগগুলি মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার তাগিদ দেখা দেয় এবং সুদীর্ঘকাল ধরে সেইভাবে শাসনতন্ত্রে প্রথাগত বিধিগুলি গড়ে ওঠে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের রচয়িতাগণ মঁতেসকিএর মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই সংবিধানের বিভিন্ন ধারাগুলির ক্ষেত্রে ক্ষমতাবিভাজন নীতিটিকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মার্কিন শাসনতন্ত্রের সুদীর্ঘ দুশো বছরের কার্যকালে সরকারের তিনটি বিভাগেরই কার্যকলাপ সুসম্পাদনের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার বিধিব্যবস্থা প্রচলিত হয়ে সেগুলি লিখিত সংবিধানেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে।

(২) সরকারের অঙ্গগুলি জৈবিক ঐক্যবন্ধ

তৃতীয়তঃ, সরকারের সব বিভাগের ক্ষমতা সমান নয়। ইংলণ্ড্ ও ভারতের মত পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র (Parliamentary Democracy) প্রচলিত, সেই দেশগুলিতে সংসদের অর্থাৎ আইনসভার প্রাধান্যই বেশী থাকে। ফলে সেই সব দেশে ক্ষমতাবিভাজন নীতি অনুসৃত হয় না। কিন্তু সেজন্য সেই রাষ্ট্রগুলি সুশাসিত নয় অথবা সেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নিরাপদ নয় এ কথা কোন মতেই বলা চলে না, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকুশলতাও কোনভাবে সে দেশগুলিতে হ্রাস পায় নি।

(৩) সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভাই প্রধান

চতুর্থতঃ, জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ বলেছেন যে, চরমভাবে ক্ষমতাবিভাজন নীতি অনুসরণ করলে সরকারের তিনটি বিভাগের প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হয়ে পড়বে। ফলে, শাসনকার্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বিভাগের দক্ষ হয়ে ওঠার পরিবর্তে দেখা দেবে চরম বিশৃঙ্খলা। কোন কোন সময় সরকারের একটি বিভাগ অন্য বিভাগের ওপর টেক্কা মারার চেষ্টা করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্ক্লিন্ রুজ্ভেল্ট্ চরম আর্থিক সঙ্কট থেকে দেশকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে "নববিধান" ("New Deal") নামক কতকগুলি প্রগতিশীল বিধি প্রচলনের কথা ঘোষণা করেন। এতে ব্যক্তিগত ব্যবসার কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের কর্তৃত্ব কায়েম করার প্রচেষ্টার ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু মার্কিন সুপ্রীম্ কোর্ট্ এগুলির মাধ্যমে নাগরিকের অর্থনৈতিক অধিকার ভঙ্গ হবার অজুহাতে এগুলিকে

সংবিধানবিরোধী (unconstitutional) বলে ঘোষণা করেন। তখন রাষ্ট্রপতিকে বাধ্য হয়ে সুপ্রীম্ কোর্টে তাঁর সমর্থকদের অতিরিক্ত বিচারক নিযুক্ত করার হুমকি দেখাবার ফলে কোর্টের শেষ পর্যন্ত সরকারী ব্যবস্থাগুলির বৈধতা স্বীকার করে নেয়। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস আলোচনা করলে আইনসভা এবং বিচারবিভাগের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বেশ লক্ষ্য করা যায়। নাগরিকদের সম্পত্তিরক্ষার মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী এই যুক্তি দেখিয়ে একাধিকবার সুপ্রীম্ কোর্ট্ জনগণের সার্বিক, সাধারণ স্বার্থে সম্পত্তি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে আইনসভায় গৃহীত সরকারের প্রগতিশীল আইনকানুন সংবিধানবিরোধী বলে ঘোষণা করেছে। গোলোকনাথের মামলায় কোর্টের এই সিদ্ধান্ত জনসাধারণের কাছে খুবই অপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরে কেশবানন্দ ভারতীর মামলায় সুপ্রীম্ কোর্ট্ শেষ পর্যন্ত রায় দিলেন যে, ভারতীয় সংবিধানের উল্লেখিত নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলি জনস্বার্থে প্রয়োজনমত অদলবদল করার অধিকার আইনসভার আছে ঠিকই, তবে সংবিধানের পরে মূল কাঠামো বদ্‌লাবার কোন অধিকার সরকারের নেই। ১৯৮০ সালে মিনার্ভা মিলের মামলায় সুপ্রীম্ কোর্ট্ ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় পার্লামেন্ট্ সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি বদ্‌লাতে পারে না। এখানে লক্ষণীয় যে, কোর্ট্ তাঁদের এই সিদ্ধান্তে ভারতীয় সংবিধানের মূল কাঠামো বলতে কি বোঝাতে চান, তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখা করে দেন নি।

(৪) মিলের মতে এ নীতির ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে

পঞ্চমতঃ, কোন কোন শাসনতন্ত্রবিদের মতে সরকারের কার্যাবলীকে ঠিক তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় না। মঁতেস্কিএ যখন তাঁর ক্ষমতাবিভাজন নীতি প্রচার করেন, তখন সরকারের কার্যাবলী আধুনিক যুগের তুলনায় অনেক সহজ ও সরল ছিল। আধুনিক সরকারের কার্যাবলীর এই জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে উইলোবি সরকারের কাজগুলিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলি হল: নির্বাচন, আইন প্রণয়ন, শাসননীতি নিরূপণ এবং শাসন পরিচালনা, আইন-কানুনকে কার্যকর করে তোলা এবং বিচারকার্য। বলা বাহুল্য, এদের একটি সুসম্পন্ন করতে গেলে অন্যান্য বিভাগের সহানুভূতি-সূচক সক্রিয় সহযোগিতা আবশ্যক। যেমন, সংবিধানে নির্বাচন অনুষ্ঠান একটি প্রয়োজনীয় সরকারী দায়িত্ব। কিন্তু শাসনতন্ত্রে এর সমস্ত খুঁটিনাটি বিবৃত করা প্রায় অসম্ভব। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই বিশেষ দায়িত্ব বহন করতে হয় আইন-সভাকে। আবার, ভোটদানের ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ভার দেওয়া হয় শাসন-বিভাগের আমলা ও অন্যান্য প্রশাসকদের ওপর। নির্বাচন শেষে কারুর কোন অভিযোগ থাকলে তার নিষ্পত্তির ভার দেওয়া হয় বিশেষ নির্বাচনী বিচারকদের পর। কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ও এই নিষ্পত্তির কাজে শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়তে পারেন।

(৫) সরকারের জটিল কার্যাবলী সহজে বিভাজ্য নয়

ষষ্ঠতঃ, মঁতেস্কিএ-র ক্ষমতাবিভাজন নীতি কার্যতঃ প্রয়োগ করা সম্ভব হয় যদি সরকারের তিনটি বিভাগ সমান ক্ষমতাসম্পন্ন বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু আসলে

তা ধরে নেওয়া চলে না। যদি সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতা সমান থাকত, তা হলে ক্ষমতাবিভাজন নীতি ঠিকমত প্রয়োগ করলে শাসনকার্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হত। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতাগুলি সমান নয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার সর্বময় কর্তৃত্বই স্বীকৃত। সুতরাং ক্ষমতা-বিভাজন নীতি প্রয়োগ করলেও সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগের কার্যকলাপের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা চলে না, শেষ পর্যন্ত আইনসভা সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবেই। মঁতেস্কিএ-র নীতি অনুযায়ী তাই আধুনিক সরকারের কাজগুলির পার্থক্যীকরণ সম্ভব হয়, কিন্তু কাজের বিভাগ বলতে আলাদা আলাদা সরকারী কর্তৃত্বের সৃষ্টি বোঝায় না।

(৬) ৩ টি বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা যায় না

সপ্তমতঃ, মার্কিন শাসনতন্ত্রবিদ্গণ বলেছেন যে, মঁতেসকিএ-র নীতি হুবহু সেখানকার শাসনতন্ত্রে প্রয়োগ করা হয় নি। মার্কিন সংবিধানের রচয়িতাগণ শুধু এই নীতিটির ততটুকু গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে মার্কিন শাসনতন্ত্রে সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য (checks and balances) রক্ষিত হয়। মার্কিন অধ্যাপক কেভ্ (F. A. Cave) বলেছেন যে, এই নীতিটি মার্কিন সংবিধানে কার্যকর করার পেছনে যে উদ্দেশ্যে ছিল তা হল—যাতে ভবিষ্যতে মার্কিন সমাজের কোনও সংখ্যালঘিষ্ঠ কিন্তু সংগঠিত ও ক্ষমতাবান্ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সংবিধানের কোনও একটি বিশেষ বিভাগের ক্ষমতা করায়ত্ত করে বলপূর্বক তাঁদের নীতিগুলি প্রয়োগ করতে সক্ষম না হন। প্রখ্যাত মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ্ ম্যাকাইভার মনে করেন যে, শুধু মার্কিন শাসনতন্ত্রে নয়, সব শাসনতন্ত্রেই ক্ষমতাবিভাজন নীতির সার্থকতা ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রক্ষাকবচ হিসাবে ততটা নয় যতটা হল সরকারী বিভাগগুলির কাজ একত্রিত হলে তাদের প্রত্যেকের অযোগ্যতা বন্ধ করার জন্য।

(৭) মার্কিন সংবিধানে ও এ নীতি সম্পূর্ণ গৃহীত হয় নি

অষ্টমতঃ, ক্ষমতাবিভাজন নীতি সম্বন্ধে বলা হয় যে, এ নীতি শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব নয় ("Separation of Powers is neither possible, nor desirable")। ভারত ও ইংলণ্ডের মত মন্ত্রিসভাচালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগকে (মন্ত্রিগণকে) আইনসভা নিয়ন্ত্রণ করে। আইনসভায় মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থাপ্রস্তাব গৃহীত হলে তাঁদের পদত্যাগ করতে হয়। ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী বা ভারতের রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হলেও আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে তাঁরা আইনসভার অধিবেশন আহ্বান বা স্থগিত করতে পারেন, আইনসভা ভেঙ্গে দিয়ে পুনর্নির্বাচন আহ্বান করতে পারেন। ইংলণ্ডে লর্ড্ চ্যান্সেলার লর্ডস্ সভার সভাপতি, মন্ত্রিসভার সদস্য এবং সর্বোচ্চ বিচারালয়ের একজন বিচারপতি।

(৮) ক্ষমতাবিভজন নীতি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় : ইংলণ্ড্ ও ভারতের নজির

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ভারতে সর্বপ্রধান বিচারালয়রূপে প্রধান ধর্মাধিকরণের অর্থাৎ সুপ্রীম্ কোর্টের হাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের আইনের বৈধতা বিচারের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতির দ্বারা সম্পাদিত চুক্তি বা কর্মচারী নিয়োগের প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চ কক্ষ সেনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নজির

নবমতঃ, মার্কসবাদীগণ ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সরকারী ক্ষমতার বিভাজনকে নিতান্ত অর্থহীন বলে মনে করেন। সাংবিধানিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা-বিভাজন স্বীকৃত হলে ও আসলে সব কিছুই বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্তৃত্বে থাকে। প্রকৃত সমাজতন্ত্রেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী জনগণের মধ্যে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হয়। সমাজতন্ত্রী সমাজ এই জনগণতান্ত্রিক সম্ভাবনাকে পরিচালনা করে বলে সোবিয়েত সমাজতন্ত্রবাদীগণ তার নাম দিয়েছেন "গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীভবন" (Democratic Centralism)।

(৯) মার্কসবাদীদের মতে, ধনতান্ত্রিক সংবিধানে এ নীতি থাকা না থাকা দুই-ই সমান

॥ উপসংহার : ক্ষমতাবিভাজন নীতির আধুনিক রূপ ॥

মঁতেস্কিএ যখন ক্ষমতাবিভাজন নীতি প্রচার করেন, তারপর প্রায় ২৫০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁর আমলে স্বৈরতন্ত্র কায়েম ছিল। বর্তমান যুগে দুটি বিশ্ব-যুদ্ধেগণতন্ত্র জয়ী হয়েছে। গণতন্ত্রের ওপর সমাজতন্ত্রের প্রভাব এখন সুস্পষ্ট। ফলে মঁতেস্কিএর নীতি আজকাল কেবল আংশিকভাবেই প্রযোজ্য—বিচার বিভাগকে সর্বত্রই সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানরূপে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য বিচারকদের সম্পূর্ণভাবে শাসনবিভাগ ও আইনসভার কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে জনগণকে ভোট দিয়ে বিচারপতি নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে তার কুফলগুলি সর্বজন-স্বীকৃত। জনপ্রিয় বিচারক যে প্রকৃত অর্থে দক্ষ বিচারক হবেন, তা নয়। তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শাসনবিভাগের প্রধানের ওপরই বিচারক নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং বিচারপতিদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ চালাবার মত সাংবিধানিক ও রাজ-নৈতিক পরিবেশ রক্ষা করা হয়।

উপসংহার : এ নীতি প্রযোজ্য নয় ; তবে বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র বাঞ্ছনীয়

॥ শাসনবিভাগ বা নির্বাহীবিভাগ : একক ও যৌথ শাসনবিভাগ ॥

সরকারের যে বিভাগ আইনসভার দ্বারা অনুমোদিত নিয়মকানুনগুলি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে, তাকে শাসনবিভাগ (Executive) বলে। আইন রচনা এবং বিচারকার্য পরিচালনা ছাড়া সরকারের সব বিভাগের কাজকর্মই শাসনবিভাগীয়। আধুনিক জনজীবনের জটিলতা এত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেও সরকারের বিভাগ-গুলির মধ্যে শাসনবিভাগের প্রাধান্য সর্বত্রই সূচিত হয়। এই বিভাগের মারফত

শাসনবিভাগের গুরুত্ব

সরকারের শাসনক্ষমতা বাস্তবে রূপায়িত হয় ও সরকার শাসনকার্য নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। তাই সরকারের এই বিভাগটিকে নির্বাহী বিভাগও বলা হয়।

শাসনপরিষদের শীর্ষে কেবল একজন ব্যক্তি সর্বাধিনায়করূপে নির্বাহীবিভাগীয় কাজকর্ম পরিচালনা করলে সেই শাসনবিভাগকে **একক শাসনবিভাগ** (Single Executive) বলে। যেমন, চরম রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy), একনায়কতন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত শাসনবিভাগ। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সমস্ত শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতি প্রয়োগ করে থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগের শীর্ষে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি। তাই সেই দেশে একক শাসনবিভাগ প্রচলিত। অবশ্য মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত উপদেশ দেবার জন্য একটি উপদেষ্টামণ্ডলী আছে। কিন্তু এই উপদেষ্টা সচিবগণ ক্ষমতায় ও মর্যাদায় মার্কিন রাষ্ট্রপতির সমতুল্য নন, তাঁরা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতির অধীন।

একক শাসনবিভাগ ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

অপর পক্ষে শাসনপরিষদ যদি একাধিক ব্যক্তি নিয়ে সংগঠিত হয়, তা হলে তাকে (Plural or Collegiate Executive) বলে। এই শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, এখানে কোন ব্যক্তিবিশেষ শাসনকার্যের জন্য দায়ী হন না, সমস্ত দায়িত্ব বর্তায় শাসকগোষ্ঠীর ওপর। প্রাচীনকালে স্পার্টা, এথেন্স্ প্রভৃতি গ্রীক রাষ্ট্রে এ ধরনের শাসন প্রচলিত ছিল। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিষদ (Federal Council) এবং সোবিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডিয়াম্ (Presidium) যৌথ শাসন বিভাগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার দুটি কক্ষ যুগ্ম অধিবেশনে ঐ কক্ষদ্বয়ের ৭ জন ব্যক্তিকে সচিবসংঘের শাসক (Councillor) নিযুক্ত করে। এঁদের কার্যকাল চার বছর। এঁরা প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে নিজের নিজের শাসনবিভাগের কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকেন। এঁরা ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে আইনসভার কোনও কক্ষের কাছে দায়ী থাকেন না। এঁদের সভাপতি প্রতি বছর এঁদের মধ্যে থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁকে মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর মত ক্ষমতাবান মনে করা চলে না। কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে বা বিপক্ষে সমান ভোট প্রদত্ত হলে তিনি নির্ণায়ক বা চূড়ান্ত ভোটের (Casting Vote) দ্বারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।

যৌথ শাসনবিভাগ ঃ সুইজারল্যাণ্ড্

সোবিয়েত রাশিয়ার আইনসভার উভয় কক্ষের (Supreme Soviet) অধিবেশন বসে বছরে কেবলমাত্র দুবার। তাই রুশ সংবিধানরচয়িতাগণ দেশে "প্রেসিডিয়াম্" নামে একটি স্থায়ী শাসনপরিষদ গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৩৭ জন সদস্য নিয়ে সুপ্রীম্ সোবিয়েত প্রেসিডিয়াম্ গঠন করে। প্রেসিডিয়াম্ ৪ বছরের জন্য গঠিত হয়। সুপ্রীম্ সোবিয়েত নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হবার আগে বাতিল করে দিলে প্রেসিডিয়াম্ও বাতিল হয়ে যায়। তবে তখন প্রেসিডিয়ামের সভাপতি নতুন সুপ্রীম্ সোবিয়েত গঠিত না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যান। সোবিয়েত শাসনতন্ত্রের ৪৯ ধারা অনুযায়ী

যৌথ শাসনবিভাগ ঃ রুশ্ প্রেসিডিয়াম্

প্রেসিডিয়াম্ শাসনবিভাগীয়, আইনপ্রণয়ন সম্পর্কিত এবং বিচারবিভাগীয় এই তিন রকম কাজই সম্পাদন করে থাকে। এর সদস্যগণ কিংবা সভাপতি সুপ্রীম্ সোবিয়েতের কাছে দায়ী থাকেন না ; বরং মন্ত্রিসভা প্রেসিডিয়ামের কাছে দায়ী থাকে।

ইংলণ্ড্, ভারত প্রভৃতি দেশে মন্ত্রিসভা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকেও যৌথ শাসন-ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের যৌথ শাসন-পরিষদের সঙ্গে তুলনা করলে সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্যাবিনেট সভাকে ঠিক একই পর্যায়ে যৌথ শাসনপরিষদ বলা যায় না। কারণ, ক্যাবিনেট প্রথার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আইনসভার নিকট শাসনপরিষদের দায়িত্বপরায়ণতা, আর সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ কিংবা সোবিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডিয়াম্ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঃ আইনসভার কাছে এদের দায়িত্বশীল না থাকা।

ক্যাবিনেট প্রথার নজির

একক শাসন পরিষদের প্রধান সুবিধা হল যে, সরকারের কাজকর্ম পরিচালনা সম্পর্কে এখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। একই উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট কোনও কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য সরকার ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়তা এবং প্রত্যয়ের সঙ্গে শাসনকার্য নির্বাহ করতে পারেন। অনর্থক তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা প্রভৃতির জন্য সময় নষ্ট হয় না। প্রধান শাসককে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী মতামতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য চেষ্টা করতে হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। সময়ের, অর্থের অপচয় ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্বে এবং যুদ্ধ চলাকালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন্ রুজ্‌ভেল্ট্ সুদক্ষ, ন্যায়পরায়ণ প্রশাসকরূপে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন যে, জনগণ তাঁকে পর পর চারবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন।

একক শাসনপরিষদের সুবিধা

কিন্তু **একক শাসন পরিষদের প্রধান ত্রুটি** হল ঃ একমাত্র ব্যক্তির ওপর রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। ফলে, ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিগত দোষগুণ পুরোপুরি শাসননীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। রাষ্ট্রপতি বা একনায়ক যোগ্য প্রশাসক হলে শাসনব্যবস্থাও উন্নত হয়ে ওঠে। আবার, তিনি অযোগ্য হলে শাসননীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাছাড়া, ব্যক্তিবিশেষের হাতে সমস্ত শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে দিলে স্বৈরাচারতন্ত্রের আবির্ভাব দেখা দিতে পারে।

একক শাসনপরিষদের ত্রুটি

যৌথ শাসনবিভাগের প্রধান সুবিধা হল ঃ একাধিক শাসকের বা নেতার সমষ্টিগত জ্ঞান এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব হয়। "দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ"—এই নীতিটির বাস্তব প্রয়োগ এ-ক্ষেত্রে সম্ভব হয়। ফলে, শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতার আদর্শ মেনে নেওয়া যায়, আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। বহু ব্যক্তির যৌথ প্রচেষ্টায় শাসনকর্তৃপক্ষ কর্মকুশল হয়ে ওঠে। স্বৈরাচারতন্ত্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে না।

যৌথ শাসনবিভাগের সুবিধা

কিন্তু যৌথ শাসনপরিষদের ব্যবস্থাও সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিবিহীন নয়। এখানে একাধিক ব্যক্তির মত অনুসারে শাসনকার্য চালিত হয়। এদের মধ্যে মতের মিল না থাকলে অনেক সময় শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে উঠতে পারে। দেশের শাসন সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। এর ফলে ক্ষমতালাভ এবং দায়িত্বপালনের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা দেয়।

যৌথ শাসনবিভাগের ত্রুটি

এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ড্ প্রভৃতি দেশে ক্যাবিনেট প্রথার সাফল্যের কারণ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। সেই কারণগুলি কার্যকর না হলে এই শাসনব্যবস্থা সেখানে হয়ত ব্যর্থ হত। ক্যাবিনেট কার্যতঃ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে, তাঁর নির্দেশে কাজ করে থাকে। প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রিসভার একচ্ছত্র অধিনায়ক। তিনি ইচ্ছা করলে আইনসভা বাতিল করে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সর্বোচ্চ শাসককে অনুরোধ জানাতে পারেন। ইংলণ্ডের রাজার মত নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য। ফলে, আইনসভাও মন্ত্রিসভার অন্যান্য সভ্যের মত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। সুতরাং ক্যাবিনেটপ্রথার মত আধুনিক যৌথ শাসনবিভাগীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর মারফত সমস্ত শাসকমণ্ডলীর সভ্যদের মধ্যে একটা ভাবসমন্বয় গড়ে ওঠে এবং একটা নির্দিষ্ট কর্মপ্রণালী অনুসরণ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে।

ইংলণ্ডের ক্যাবিনেট ব্যবস্থার নজির

সুইজারল্যাণ্ডের যৌথ শাসনবিভাগীয় ব্যবস্থা সফল হবার কতকগুলি বিশেষ কারণ আছে। প্রখ্যাত সুইস্ শাসনতন্ত্রবিদ্ র‍্যাপার্ড্ (Rappard)-এর মতে, সুইজারল্যাণ্ডের আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নীতি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয় না এবং সেখানে মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য হলেও তাঁরা আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন না। ফলে, সুইস্ শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত এবং মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থা-দুটির আঙ্গিকের এবং বৈশিষ্ট্যের একটা সমন্বয় ঘটেছে। সুইস্ জনগণ তাঁদের দেশপ্রেম, শান্তিপ্রিয়তা, প্রজাতান্ত্রিকতা এবং গণতান্ত্রিকতার আদর্শকে সফল করে তোলার জন্য বরাবরই অত্যন্ত আগ্রহশীল। সুতরাং সুইস্ জাতীয় চরিত্রের বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এ দেশের যৌথ শাসনব্যবস্থাকে সফল করে তুলতে চেষ্টা করেছে। তাছাড়া, যখনই আইনসভায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসকমণ্ডলীর কোনও সচিবের বিরুদ্ধে কোন বিরূপ সমালোচনা করা হয়, তখনই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী পদত্যাগ করার পরিবর্তে সেই সমালোচনা অনুযায়ী তাঁর শাসননীতি অদলবদল করে থাকেন। ফলে, সুইস্ আইনসভায় উগ্রপন্থী বা শক্তিশালী বিরোধী দল গড়ে না উঠলেও কার্যতঃ সেখানকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসকমণ্ডলী আইনসভার কাছে ঠিক ক্যাবিনেট-প্রথা অনুযায়ী মন্ত্রিসভার মত দায়ী থাকে।

সুইজারল্যাণ্ডের যৌথ শাসনব্যবস্থা কেন সফল

॥ শাসনবিভাগের কার্যাবলী ॥

জনকল্যাণকর রাষ্ট্ররূপে আধুনিক শাসনবিভাগের বিস্তৃত কর্মসূচী

শাসনবিভাগকে রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধার বলা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) প্রচলিত ছিল। তখন রাষ্ট্রের কাজ ব্যক্তি জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার মধ্যে সীমিত ছিল। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র জনকল্যাণকর রাষ্ট্র (Welfare State)। ব্যক্তিজীবনের

সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এবং সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাবের ফলে বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যাবলী সুবিস্তৃত। ফলে, আধুনিক রাষ্ট্রগুলির শাসনবিভাগ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।

শাসনবিভাগের কার্যগুলি বিবিধ। প্রথমতঃ, আভ্যন্তরীণ শাসন-পরিচালনা শাসনবিভাগের প্রধান কাজ। আইনকানুন বজায় রাখা, আইনভঙ্গকারীদের শাস্তিদান, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ, জরুরী আইন (Ordinance) প্রণয়ন প্রভৃতি এই কার্যগুলির অন্তর্গত। এই কাজগুলি শাসনবিভাগের স্বরাষ্ট্রদপ্তর (Home Department বা Department of the Interior) সম্পাদন করে।

শাসনবিভাগের কাজ ঃ (১) আভ্যন্তরীণ শাসন-পরিচালনা

দ্বিতীয়তঃ, সামরিক কার্যাবলী শাসনবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রতিরক্ষা বা দেশরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী পরিচালনা, যুদ্ধ পরিচালনা, দেশরক্ষার কাজে বেসামরিক কর্মী নিয়োগ, দরকারমত সামরিক আইন জারী প্রভৃতি এই কার্যগুলির অন্তর্গত। এই বিভাগের হাতেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত।

(২) প্রতিরক্ষাবিভাগীয় কার্য

তৃতীয়তঃ, শাসনবিভাগ পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করে। রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, দূতবিনিময়, নানাপ্রকার চুক্তি-সম্পাদন, আন্তর্জাতিক সভাসংস্থায় প্রতিনিধিপ্রেরণ ইত্যাদি কাজগুলি শাসনবিভাগের পররাষ্ট্রদপ্তরকে সম্পাদন করতে হয়।

(৩) পররাষ্ট্রবিভাগীয় কার্য

চতুর্থতঃ, মন্ত্রিসভাচালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগের মারফত আইনপ্রণয়ন কার্য সম্পাদিত হয়। এই শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগীয় প্রধান আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করতে, স্থগিত রাখতে বা ভেঙ্গে দিয়ে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারেন। আইনসভার অধিবেশন বন্ধ থাকলে প্রয়োজনবোধে শাসক-প্রধান অর্ডিন্যান্স (Ordinance) বা জরুরী আইন প্রণয়ন করতে পারেন। অবশ্য, আইনসভা পরে এই জরুরী আইন অনুমোদন করে। আধুনিক যুগে আইনসভাগুলি সময়ের অভাবে আইনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলির ওপর উপ-ধারা বিষয়ক ও আনুষঙ্গিক আইন (Bye-law) রচনার ভার শাসনবিভাগকে অর্পণ করে থাকে। শাসনবিভাগের এ-ধরনের আইনপ্রণয়নের ক্ষমতাকে "অর্পিত আইনপ্রণয়নক্ষমতা" (Delegated Legislation) বলে।

(৪) সংসদীয় গণতন্ত্রে, আইন, জরুরী আইন, অর্পিত আইন প্রণয়ন

পঞ্চমতঃ, শাসনবিভাগ কিছু কিছু বিচারবিভাগীয় কাজও সম্পাদন করে থাকে। বিচারপতিগণ প্রধান শাসকের দ্বারা নিযুক্ত হন। অপরাধীর দন্ড হ্রাস বা মকুব, বিচারবিভাগের সাহায্যের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ শাসনবিভাগের ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। সরকারী কর্মচারীদের নালিশের সালিসির কাজও বর্তমানকালে শাসনবিভাগ সম্পন্ন করে। এই কাজকে "প্রশাসনিক বিচার" (Administrative Justice) বা ফরাসী ভাষায় "দ্রোয়া আদ্‌মিনিস্ত্রাতিফ্‌" (Droit Administratif) বলা হয়। ইংলন্ড, ফ্রান্স্‌ প্রভৃতি দেশে এ ব্যবস্থা প্রচলিত।

(৫) বিচারবিভাগীয় কার্য

ষষ্ঠতঃ, প্রশাসন পরিচালনার জন্য শাসনবিভাগকে প্রভূত আর্থিক ক্ষমতা দেওয়া হয়। এজন্য অর্থদপ্তর (Finance Department) ও কোষাগার (Treasury) শাসনবিভাগের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। অর্থদপ্তরের অনুমোদন না পেলে সরকারের কোন বিভাগই তার নিজস্ব প্রকল্পগুলি রূপায়িত করতে পারে না।

(৬) অর্থবিভাগীয় কাজ

সপ্তমতঃ, জনকল্যাণকর রাষ্ট্ররূপে আধুনিক রাষ্ট্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহণ ও যোগাযোগ প্রভৃতি বহু বিভাগের ওপর শাসনবিভাগের সার্বিক কর্তৃত্ব প্রকাশিত। এই কাজগুলি আধুনিক রাষ্ট্রের জনসেবামূলক ও প্রগতিশীল ভূমিকাই নির্দেশ করে।

(৭) জনসেবামূলক কাজ

॥ ভারতীয় প্রশাসনব্যবস্থা : একক না যৌথ ? ॥

ভারতে কেন্দ্রে এবং অঙ্গরাজ্যগুলিতে যে শাসনব্যবস্থা প্রচলিত, তাকে সাধারণভাবে মিশ্র শাসনব্যবস্থা (Mixed Executive) বলা চলে। কারণ, এখানে কেন্দ্রে অর্থাৎ সমগ্র ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে শাসনবিভাগের শীর্ষে আছেন রাষ্ট্রপতি (President)। সমস্ত শাসনবিভাগীয় নির্দেশ, হুকুমনামা ইত্যাদি তাঁরই নামে প্রচলিত। কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নামমাত্র শাসক। আসলে, কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের সর্বাধিনায়ক হলেন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রিসভা। এই দিক থেকে বিচার করলে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় একক এবং যৌথ শাসনবিভাগীয় ব্যবস্থার সার্থক সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। একক শাসক হলেন রাষ্ট্রপতি, যৌথ শাসনবিভাগের কর্তা হলেন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংগঠিত ও পরিচালিত কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভা (Union Cabinet)।

ভারতে মিশ্র শাসন প্রচলিত

ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বর্তমানে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থারই অনুরূপ এক ধরনের মিশ্র শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। অঙ্গরাজ্যের একক শাসক হলেন রাজ্যপাল (Governor)। তিনিই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার সর্বাধিনায়ক। কিন্তু সাধারণতঃ রাজ্যপাল রাজ্য-মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রিসভার নির্দেশে কাজ করেন। সেই দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, ভারতের অঙ্গরাজ্যের সংশ্লিষ্ট মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁকে শীর্ষে রেখে গঠিত রাজ্যমন্ত্রিসভা (State Cabinet) হলেন রাজ্যে যৌথ শাসনব্যবস্থার প্রতীক।

ভারতের অঙ্গরাজ্যের শাসনব্যবস্থা

এখানে কিছুটা তুলনামূলক আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভারতের রাষ্ট্রপতির পদটিকে একক শাসকরূপে ইংলণ্ডের রাজমুকুটের (British Crown) সমতুল্য বলে সংবিধানরচয়িতাগণ কল্পনা করেছেন। সুতরাং সাংবিধানিক ধারাগুলি তাঁকে একক শাসকরূপে অধিষ্ঠিত রাখার পক্ষপাতী হলেও তাঁকে স্বেচ্ছাচারী হবার সুযোগ দেয় নি।

ভারতীয় রাষ্ট্রপতির মর্যাদা

ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষেত্রে রাজ্যপাল একক শাসক। তিনি শুধু যে রাজ্য-মন্ত্রিসভার নির্দেশে শাসন করতে বাধ্য তাই নন, ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় বা

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে যত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, তিনি আবার রাষ্ট্রপতির মারফত কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে কাজ করে থাকেন। এদিক থেকে বিচার করলে অঙ্গরাজ্যের প্রধান একক শাসকরূপে স্বীকৃত হলেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালগণ কানাডার যুক্তরাষ্ট্রের লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণরের (Lieutenant Governor) মতই কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশাধীন।

অঙ্গরাজ্যে রাজ্যপাল একক শাসক

সুতরাং মোটামুটি বলা যায় যে, ভারতে নিয়মতান্ত্রিক একক শাসনব্যবস্থা এবং প্রকৃত অর্থে কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা-পরিচালিত ব্যবস্থার মাধ্যমে যৌথ শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। অঙ্গরাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভার দ্বারা পরিচালিত যৌথ শাসনব্যবস্থা হলেও তা শেষ পর্যন্ত স্বাধীন শাসনরূপে কার্যকর থাকতে পারে না, তাকে সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নির্দেশাধীন থাকতে হয়।

ভারতে যৌথ শাসন-ব্যবস্থা রয়েছে

॥ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থা ঃ কেন্দ্রে ও অঙ্গরাজ্যে ॥

ভারতীয় শাসনব্যবস্থা

- কেন্দ্রীয় সরকার
  - কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা
    - কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র (কৃত্যক)
- অঙ্গরাজ্য সরকার
  - রাজ্যমন্ত্রিসভা
    - রাজ্য আমলাতন্ত্র (কৃত্যক)

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রে ও সমস্ত অঙ্গরাজ্যে ইংলণ্ডের মত মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থা (Cabinet System of Government) প্রচলিত রয়েছে। সাধারণতঃ লোকসভায় এবং রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister) এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (Chief Minister) নির্বাচিত হন। প্রধান মন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি এবং মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যপাল নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রিগণ নিযুক্ত হন, মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজ্য-মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রিগণ নিযুক্ত হন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা লোকসভার কাছে এবং রাজ্য-মন্ত্রিসভা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানসভার কাছে দায়ী থাকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে শাসনকার্যে সাহায্য করে থাকেন কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র, রাজ্য মন্ত্রিসভাকে সাহায্য করে থাকেন রাজ্য আমলাতন্ত্র।

ভারতীয় শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামো

॥ ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা : রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী ॥

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনব্যবস্থা : রাষ্ট্রপতি ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার সর্বাধিনায়ক। সংবিধানের ৫৪ এবং ৫৫ ধারা অনুসারে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার দুটি কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন এবং গোপন মনোনয়নপত্র (Secret ballot) অনুসারে এবং একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোটদান প্রণালী অনুসারে নির্বাচিত হন। ফলে, তাঁর নির্বাচন পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে ওঠে না।

ভারতের রাষ্ট্রপতি : নির্বাচনব্যবস্থা

ভারতীয় রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের জটিল পদ্ধতিটি যথাসম্ভব সহজ করে বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচিত সদস্যের এক-একটি ভোটের পরিমাণ ঠিক করার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনসংখ্যাকে বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা দিয়ে প্রথমে ভাগ করতে হবে। ভাগফলকে আবার ১০০০ দিয়ে ভাগ করতে হবে। এই ভাগফলই হল এই বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যা। ভগ্নাংশ এড়াবার জন্য শেষ ভাগকার্যে ভাগশেষ যদি ৫০০র বেশী হয়, তা হলে ভাগফলে ১ যোগ করা হবে, ভাগশেষ ৫০এর কম হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে এবং সেই ভাগফলকেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন-পদ্ধতি : বিধানসভার সদস্যদের ভোটের মান

ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয়কক্ষের অর্থাৎ "সংসদের" নির্বাচিত সদস্যদের প্রত্যেকের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটের পরিমাণ স্থির করার জন্য অঙ্গরাজ্যগুলির প্রত্যেকের বিধানসভার সদস্যদের মোট ভোটসংখ্যাকে উভয়কক্ষের নির্বাচিত মোট সদস্যসংখ্যার দ্বারা ভাগ করতে হবে। এই ভাগফলই হল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক সংসদ-সদস্যের ভোটসংখ্যা। ভাগশেষ ভাজকের অর্ধেকের বেশী হলে ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ করা হবে, কম হলে ভাগশেষ অগ্রাহ্য করে পূর্বের ভাগফলই গ্রহণ করে নেওয়া হবে।

সংসদের সদস্যদের ভোটের মান

এবার একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটব্যবস্থা (Single transferable vote) সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এই নিয়ম অনুসারে রাষ্ট্রপতির পদে একাধিক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বী হলে যিনি সবচেয়ে বেশী ভোট পাবেন তিনিই যে নির্বাচিত হবেন, তা নয়। প্রত্যেক ভোটদাতাকে প্রার্থীদের নাম পছন্দের ক্রমানুসারে তাঁদের ভোটপত্রে প্রকাশ করতে হয়। সমস্ত প্রার্থীদের মধ্যে প্রত্যেকে ভোটদাতাদের প্রথম পছন্দ (first preference) অনুসারে যত মনোনয়ন লাভ করেন সেগুলির যোগফলকে দুই দিয়ে ভাগ করে ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ হবে। এই যোগফলটি অবশ্যপ্রাপ্য সংখ্যা (Quota) বলে ধরে নেওয়া হয় এবং যে প্রার্থী এই "কোটা" লাভ করেন, তিনিই রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত বলে ঘোষিত হন।

রাষ্ট্রপতি হতে গেলে কত ভোট কিভাবে পেতে হবে

যদি দেখা যায়, কোনও প্রার্থীই "কোটা" পান নি, তা হলে প্রার্থীদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে কম সংখ্যক প্রথম পছন্দের মনোনয়ন লাভ করেছেন, তাঁকে নির্বাচন থেকে বাদ দিয়ে তাঁর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি পছন্দের মনোনয়নের যোগফলকে বাকী প্রার্থীদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে সেই মনোনয়ন সংখ্যাগুলি অন্য প্রার্থীদের প্রত্যেকের মনোনয়ন সংখ্যার সঙ্গে যোগ করা হয়। এ সত্ত্বেও যদি দেখা যায় একাধিক প্রার্থীর প্রথম পছন্দের মনোনয়ন সংখ্যা অবশ্যপ্রাপ্য মনোনয়ন সংখ্যা অতিক্রম করলেও প্রত্যেকের মনোনয়ন সংখ্যা সমান, তা হলে শেষ বিচার ভাগ্যের খেলার (Lottery) ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

একক হস্তান্তরযোগ্য পদ্ধতি

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে নির্বাচনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, তা বেশ জটিল। এই জটিল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংবিধানরচয়িতাগণ প্রথম থেকেই খুব আগ্রহী ছিলেন। গণপরিষদে রাষ্ট্রপতির পদ সম্পর্কে যে তর্ক-বিতর্ক চলে, তাতে গোড়া থেকেই সদস্যরা বেশ জোর দিয়ে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের শীর্ষে নিয়মতান্ত্রিক শাসকরূপেই রাষ্ট্রপতিকে রাখার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁরা প্রত্যক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা ত্যাগ করে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত করার ব্যবস্থার ওপর তাঁদের ঝোঁক প্রকাশ করেন। কারণ তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন যে, প্রত্যক্ষ উপায়ে নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রপতি হয়ত নিজের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অনেক বেশী সচেতন হয়ে উঠবেন এবং স্বেচ্ছাচারী একনায়কে পরিণত হতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যেও যে বিশেষ প্রণালীতে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ হয়েছে, তাতে যে জটিলতা রয়েছে, সেটি সমর্থনের জন্যও বিশেষ যুক্তি দেখানো হয়েছে ঃ ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও চরম বৈসাদৃশ্য যেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেখা দিতে না পারে এবং কোনও বিশেষ অঞ্চলের আঞ্চলিক, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর চাপে যেন রাষ্ট্রপতির নির্বাচনব্যবস্থা কখনও পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য এত জটিল ব্যবস্থা কেন চালু হল

রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর যোগ্যতা ঃ ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীকে অবশ্যই ৩৫ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নকক্ষের অর্থাৎ লোকসভার সদস্য হবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্যসরকারের অধীনে অথবা ঐরূপ সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোনও প্রতিষ্ঠানের অধীনে লাভজনক কাজে নিযুক্ত থাকলে তিনি প্রার্থী হতে পারবেন না। আইনসভার অথবা রাজ্য বিধানমণ্ডলীর কোনও সদস্যকে রাষ্ট্রপতির পদে প্রার্থী হতে হলে তাঁকে রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করার সময় থেকে উক্ত সদস্যপদ পরিত্যাগ করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীর যোগ্যতা

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ঃ সাধারণতঃ ভারতীয় রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সংবিধানের ৫৬ এবং ৫৭ ধারা অনুসারে তিনি পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে পাঁচ বছরের পূর্বেই উপরাষ্ট্রপতির (Vice-President) নিকট লিখিত আবেদন পেশ করে পদত্যাগ করতে পারেন। অথবা সংবিধানের ৬১

ধারা অনুসারে তিনি কোন দোষে অভিযুক্ত হলে তাঁকে পদচ্যুত করা যায়। কেন্দ্রীয় আইনসভার যে কোনও কক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রস্তাব আনতে হলে সেই প্রস্তাবে ঐ কক্ষের মোট সদস্যসংখ্যার অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশের স্বাক্ষর থাকা চাই। তারপর প্রস্তাবটি অন্ততঃ মোট সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই। যদি এই অভিযোগের প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় আইনসভার অপর কক্ষের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের সমর্থন লাভ করে, তাহলে রাষ্ট্রপতি তাঁর পদ থেকে অপসারিত বলে ঘোষিত হন। ১৯৬৯ সালের রাষ্ট্রপতির কার্যপরিচালনা বিধি [The President (Discharge of Functions) Act] অনুসারে রাষ্ট্রপতি কিংবা উপরাষ্ট্রপতির মৃত্যু, পদত্যাগ বা পদচ্যুতি ঘটলে সুপ্রীম কোর্টের প্রবীণতম বিচারপতি অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির কাজ চালিয়ে যাবেন। তা না হলে রাষ্ট্রপতির পদ কোন কারণে শূন্য হলে সাধারণতঃ উপরাষ্ট্রপতিই ঐ পদে কাজ চালিয়ে যাবেন।

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল

রাষ্ট্রপতির বেতন, ভাতা ইত্যাদি : ভারতের রাষ্ট্রপতি ভাতা ইত্যাদি ছাড়া বর্তমানে মাসে ১০,০০০ টাকা বেতন পান। এই বেতন আয়করমুক্ত। বিনা ভাড়ায় তিনি সরকারী বাসভবন ব্যবহার করতে পারেন। ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রপতির অবসরকালীন বেতন সম্পর্কিত আইন (President's Pension Act, 1951) অনুসারে রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যকাল সমাপ্ত হলে অথবা কার্যকাল সমাপ্তির পূর্বে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে বাৎসরিক ১৫ হাজার টাকা পেন্‌সন্ বা অবসরকালীন বেতন পেয়ে থাকেন।

রাষ্ট্রপতির বেতন, ভাতা ইত্যাদি

॥ ভারতীয় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা : শাসনবিভাগীয় ॥

ভারতীয় সংবিধানের ৫৩ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে শাসনবিভাগের সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তিনি নিজে বা তাঁর অধীনস্থ প্রশাসকদের মাধ্যমে সংবিধান অনুসারে এই কাজগুলি নির্বাহ করবেন। সংবিধানের ৭৪ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তাঁকে শাসনবিভাগীয় কাজকর্ম সম্পাদনে সাহায্য করবেন। ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম সংশোধন বিধি অনুসারে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য। কিন্তু ৪৪তম সংশোধন বিধি অনুসারে মন্ত্রিসভাকে তাদের দেওয়া কোন পরামর্শ তিনি পুনর্বিবেচনা করতে বলতে পারেন ; তবে পার্লামেন্ট্ যদি পুনরায় মন্ত্রীর পূর্বপ্রদত্ত পরামর্শ গ্রহণ করতে রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানায়, তা হলে তিনি সে পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য। প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রীদের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। এ ছাড়া ভারতের অ্যাটর্নী জেনারেল, কন্ট্রোলার এবং অডিটার জেনারেল, সুপ্রীম্ কোর্টের বিচারপতি, অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতি, রাজ্যপাল প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। এই কর্মচারীদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে দায়ী থাকেন।

রাষ্ট্রপতির শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি ভারতের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। এই পদে আসীন হয়ে তিনি ভারতের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন, আবার শান্তিও স্থাপন করতে পারেন। তবে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভার সম্মতি থাকা চাই। বিদেশের দূতগণকে আমন্ত্রণ এবং বিদেশে দূত প্রেরণও রাষ্ট্রপতির শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার অন্তর্গত। কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতিই ভারতের বিভিন্ন নাগরিককে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির সামরিক ক্ষমতা

॥ ভারতীয় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা : আইনপ্রণয়ন বিষয়ক ॥

ভারতের রাষ্ট্রপতিকে আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রেও অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয়কক্ষের অধিবেশন আহ্বান করতে ও স্থগিত রাখতে হুকুম দিতে পারেন এবং লোকসভা বাতিল করে দিতে পারেন। আইনসভার উভয় কক্ষে ঘোরতর মতানৈক্য দেখা দিলে তিনি উভয়কক্ষের যুক্তবৈঠকও ডাকতে পারেন।

আইনপ্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা

কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় পরিষদের প্রারম্ভিক যুগ্ম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ভাষণ দেন। এই ভাষণে পরবর্তী অধিবেশনের কর্মসূচী ব্যাখ্যা করা হয়। এই ভাষণকে সাংবিধানিক পণ্ডিতগণ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের যুগ্ম অধিবেশনে ইংলণ্ডের রাজমুকুটের সিংহাসন থেকে প্রদত্ত ভাষণের (Speech from the Throne) সমতুল্য বলে মনে করেন। কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই যথাক্রমে ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীকে এবং ভারতের রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ দেবার জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, আইনসভায় তা নিয়ে বিতর্ক চলে। এই প্রস্তাব আইনসভায় সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হলে তবেই মন্ত্রিসভার ওপর আইনসভার আস্থা সূচিত হয়।

সংসদের প্রারম্ভিক যুগ্ম অধিবেশন

ভারতের রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মত নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনসভার কাছে বিবেচনার জন্য তাঁর মতামত জানিয়ে বার্তা (Message) পাঠাতে পারেন।

বার্তা প্রেরণ

সংবিধানের ৩৩১ ধারা অনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয়কক্ষেই কয়েকজন সভ্যকে সদস্যরূপে মনোনয়ন করতে পারেন।

সংসদসদস্য মনোনয়ন

ভারতে নতুন কোনও অঙ্গরাজ্য গঠন, পুরাতন অঙ্গরাজ্যের সীমা পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে কোনও আইন প্রণয়নের প্রস্তাব আইনসভায় পেশ করার পূর্বে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন। এই ব্যবস্থার দ্বারা ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত হয়েছে। সংবিধানের ১১৭ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়া কোনও অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাব কেন্দ্রীয় আইনসভায় উত্থাপিত করা চলে না। আয়কর, সংবিধান অনুসারে প্রচলিত ভাষা প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর কোন আইনের প্রস্তাব আইনসভায় পেশ করার পূর্বে অনুরূপভাবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন আবশ্যক।

রাষ্ট্রপতির অনুমোদন কোথায় আবশ্যক

যখন কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয়কক্ষ কোনও আইনের প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁর কাছে পাঠান, তখন তিনি সম্মতি দিলে অনুমোদিত বিলটি আইনে পরিণত

হয়। তিনি ইচ্ছা করলে সংশোধনসহ কিংবা সংশোধন ছাড়া বিলটি আইনসভার কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে পারেন। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের ১১১ ধারা অনুসারে এই অবস্থায় যদি বিলটি পুনরায় আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং আবার সেটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে পেশ করা হয়, তা হলে রাষ্ট্রপতি তাতে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের বাৎসরিক ব্যয়বরাদ্দ বা বাজেট (budget) প্রভৃতি সমস্ত অর্থসংক্রান্ত বিল (Money Bill) রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভায় উত্থাপন করা যায় না। তাই এ ধরনের বিল রাষ্ট্রপতির পক্ষে কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে ফেরত পাঠাবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। ভারতীয় সংবিধানের এই বিধানগুলি কার্যতঃ পার্লামেন্টের বা ভারতীয় আইনসভার সার্বভৌমত্ব অব্যাহত রেখেছে এবং ভারতের রাষ্ট্রপতিকে ইংলণ্ডের রাজমুকুটের মত নিয়মতান্ত্রিক শাসকের পদে পরিণত করেছে।

অর্থ ও অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতা

॥ ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরী আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা ॥

পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রে জরুরী অবস্থায় প্রশাসককে কিছু কিছু আইন জারী করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। সংবিধানের ১২৩ ধারা অনুসারে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার অধিবেশন কোন কারণে বন্ধ থাকলে রাষ্ট্রপতি জরুরী আইন জারী করতে পারেন। কিন্তু পার্লামেন্টের পরবর্তী অধিবেশন শুরু হলেই এই জরুরী আইন সম্পর্কে বিতর্কের, অনুমোদনের বা বাতিল করার অধিকার পার্লামেন্টের বজায় থাকে। এই অধিবেশন শুরু হবার ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির দ্বারা প্রণীত জরুরী আইন বা অর্ডিন্যান্স্ (Ordinance) কার্যকর থাকে। যদি পার্লামেন্ট তার পূর্বেই কোনও অধিবেশনে এই আইন বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তা হলে ঐ জরুরী আইনের মেয়াদ ছয় সপ্তাহ অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই নিঃশেষিত হবে।

রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স্ (জরুরী আইন) জারী করার ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা সম্পর্কে সমালোচনা করে বিখ্যাত ইংরেজ শাসনতন্ত্রবিদ্ অ্যালান্ গ্লেড্হিল্ (Alan Gledhill) বলেন যে, জরুরী ক্ষমতার সাহায্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে উঠতে পারেন। এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে ভাইমার শাসনতন্ত্রে (Weimar Constitution) নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতির পদ চালু হলেও হিট্লারের মত সুযোগসন্ধানী নেতা এই শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধানের অপব্যাখ্যার সাহায্যে নিজেকে ইচ্ছামত একনায়কতন্ত্রের শীর্ষে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে ভাইমার সংবিধানের কার্যকারিতার পথে তৎকালীন জার্মানীতে কতকগুলি গণতান্ত্রিক প্রথা ও পদ্ধতির অনুপস্থিতি ছিল চরম বাধাস্বরূপ। ভারতে রাষ্ট্রপতির পদটিকে কেন্দ্র করে কয়েকটি গণতান্ত্রিক প্রথা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ দু'বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পর তৃতীয়বার প্রার্থী হন নি। তখন থেকেই ভারতীয় রাষ্ট্রপতির পুনর্নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই গণতান্ত্রিক প্রথা অনুসরণ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতির জরুরী আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার

ভাইমার সংবিধানের নজির

অপপ্রয়োগের কোনও আশঙ্কা নেই। কারণ, রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর, মন্ত্রি-সভার এবং আইনসভার পরামর্শ অনুসারে নিয়মতান্ত্রিক প্রশাসক রূপে কাজ করতে বাধ্য। সুতরাং তাঁর জরুরী ক্ষমতার অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা কম।

অঙ্গরাজ্যের বিধানসভা কোনও আইন অনুমোদন করলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যপাল সেটি ভারতের রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে পাঠাতে পারেন। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়া সেই বিলটি আইনে পরিণত হতে পারে না। সংবিধানের ২০১ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি উক্ত বিলটি সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালের মারফত ওই রাজ্যের বিধানসভার বা বিধানমণ্ডলীর কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাতে পারেন। ওই বিলটি যদি অঙ্গরাজ্যের বিধানসভায় পুনরায় অনুমোদিত হয় ও রাজ্যপাল যদি আবার সেটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্যে পাঠান, তা হলে তাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি না থাকলে বিলটি বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং রাজ্য আইনসভার অনুমোদিত বিলের ক্ষেত্রেই ভারতের রাষ্ট্রপতি চরম নাকচ ক্ষমতা বা ভেটো (Veto) প্রয়োগের অধিকারী। কিন্তু এই ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা কম। কারণ, অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগের মত এ ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক-রূপে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য থাকেন। কেরলে নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভার নেতৃত্বে আইনসভার দ্বারা গৃহীত শিক্ষা সম্পর্কিত বিল (Kerala Education Bill) সম্পর্কে ভেটো প্রয়োগ করার পূর্বে রাষ্ট্রপতি ভারতের সুপ্রীম্ কোর্টের উপদেশ গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে মধ্যপ্রদেশ আইন সভার দ্বারা অনুমোদিত পঞ্চায়তীরাজ সম্পর্কে বিলটির কোন কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আপত্তি থাকার জন্য রাষ্ট্রপতি ঐ বিলটি অনুমোদন করেন নি। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট্ মন্ত্রিসভার দ্বারা অনুমোদিত ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি আইন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে সে "বিল"গুলি তাঁর সম্মতিলাভের অপেক্ষায় রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা অস্ট্রেলিয়ার গভর্ণর-জেনারেল নিজের নিজের দেশের অঙ্গরাজ্যের আইনসভার দ্বারা অনুমোদিত কোনও বিলের ওপর অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারেন না। কেবলমাত্র কানাডার ক্ষেত্রেই গভর্ণর-জেনারেল রাজ্যের প্রধান শাসক অর্থাৎ লেফ্‌টেন্যান্ট্ গভর্ণরের মারফত অঙ্গরাজ্যের আইনসভার দ্বারা গৃহীত কোনও বিলকে বাতিল করতে পারেন। ভারত কানাডার পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

অঙ্গরাজ্যের বিধানসভার বিলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

॥ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা : অর্থসংক্রান্ত ॥

ভারতীয় সংবিধানের ১১৭ ধারায় রাষ্ট্রপতির হাতে অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তাঁর অনুমোদন ছাড়া পার্লামেন্ট্ অর্থসংক্রান্ত কোনও বিল কিংবা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund) থেকে খরচ করার কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় না। তাঁর নির্দেশক্রমে অর্থমঞ্জুরী কমিশন (Finance Commission) গঠিত হয় এবং আয়কর প্রভৃতি কেন্দ্রীয় কর থেকে সঞ্চিত অর্থ ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলিতে বণ্টিত করা হয়। অঙ্গরাজ্য সরকারেরওকরনীতি বা অর্থমঞ্জুরী কমিশনের দ্বারা নির্দিষ্ট

রাষ্ট্রপতির অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা

নীতিবদলের জন্য কোন প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়া আইনসভায় উত্থাপিত হয় না। প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্রপতি পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যাকে তাদের পাট রপ্তানি শুল্কের বদলে বিশেষ আর্থিক সাহায্য দান করতে পারেন।

॥ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা : বিচারবিষয়ক ॥

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসকগণ কিছু কিছু বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৭২ ধারায় রাষ্ট্রপতিকে অপরাধীদের দণ্ড মকুব করা, তাদের দণ্ডের গুরুত্ব হ্রাস করা প্রভৃতি বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি তাঁর এই ক্ষমতা সামরিক আদালত কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারেন। যে ক্ষেত্রে যৌথ আইনপ্রণয়ন তালিকায় উল্লিখিত কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকার উভয়েই আইনপ্রণয়ন করতে পারে, সে ক্ষেত্রে ঐ রকম কোনও আইনভঙ্গের অপরাধে দন্ডিত ব্যক্তি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি তাঁর বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শ করে নেন। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড মকুব করা বা হ্রাস করার ক্ষমতা কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতিই ভোগ করে থাকেন। তবে অঙ্গ-রাজ্যসরকারগুলির দ্বারা গৃহীত কোনও আইনভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কোনও অপরাধ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি তাঁর বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা : বিচারবিষয়ক

॥ রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতা ॥

ভারতীয় সংবিধানের ৩৫২, ৩৫৬ এবং ৩৬০ ধারায় রাষ্ট্রপতির হাতে দেশের তিন রকম জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষ জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ৩৫২ ধারা অনুসারে সমগ্র ভারতে কিংবা ভারতের কোন অংশে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দিলে বা বহিঃশত্রুর আক্রমণে কোনও যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি দেশে সমগ্র-ভাবে বা কোনও অঞ্চলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতা : সংবিধানের ৩টি ধারা : ৩৫২ ধারা

ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুসারে কোনও অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল যদি রাষ্ট্রপতিকে কোনও লিখিত বিবৃতির দ্বারা জানান যে, সেই অঙ্গরাজ্যে আভ্যন্তরীণ কিংবা বৈদেশিক গোলযোগের ফলে সংবিধান অনুসারে শাসন-তন্ত্র পরিচালনা করা অসম্ভব, তা হলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে ঐ অঞ্চলের শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বে আনার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারেন।

৩৫৬ ধারা

সংবিধানের ৩৬০ ধারায় বলা হয়েছে যে, ভারতের সর্বত্র বা তার কোন অংশে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যাহত হলে রাষ্ট্রপতি তাঁর বিশেষ জরুরী ক্ষমতা অনুযায়ী দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করবেন এবং কর্মচারীদের বেতন হ্রাস প্রভৃতির ব্যবস্থার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে পারেন।

৩৬০ ধারা

ভারতীয় সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনী বিধি চালু না হওয়া পর্যন্ত ৩৫২ ধারা অনুসারে ঘোষিত জরুরী অবস্থায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করার ক্ষমতা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা যেত। এমন-কি, নাগরিকগণের কোনও মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে তাঁরা কেউ আদালতের কাছে জরুরী অবস্থা থাকাকালীন অভিযোগ আনতে পারতেন না।

৪৪তম সংশোধনী বিধি

৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুযায়ী জরুরী অবস্থায় পালনীয় যে ১০টি শর্ত বিধিবদ্ধ হয়েছে, সেগুলিকে "জরুরী অবস্থায় দশ দফা রক্ষাকবচ" বলে অনেকে অভিহিত করেছেন। এই শর্তগুলি হলঃ প্রথমতঃ, কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণের ক্ষেত্রেই সংবিধানের ৩৫২ ধারা অনুসারে ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা যাবে। দ্বিতীয়তঃ, জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার প্রস্তাবটি মন্ত্রিসভাকে রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত পরামর্শ বা প্রস্তাবের আকারে পাঠাতে হবে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি এই পরামর্শ মন্ত্রিসভার কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাতে পারেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য। চতুর্থতঃ, ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৯ সংখ্যক অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধানের ২০ ধারায় ব্যক্তিজীবন রক্ষার জন্য এবং ২১ ধারায় ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রদত্ত সাংবিধানিক নিশ্চয়তাসম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি সরকার ভঙ্গ করতে পারবে না। পঞ্চমতঃ, "বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ" এবং সংবিধানে উল্লিখিত এরকম লেখ বা হুকুমনামা জারি করার ক্ষেত্রে মহাধর্মাধিকরণ বা হাইকোর্টের ক্ষমতা খর্ব করা যাবে না। ষষ্ঠতঃ, জরুরী অবস্থা ঘোষণার পিছনে সরকারের কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে বলে কারুর মনে সন্দেহ দেখা দিলে তিনি বিচারালয়ের কাছে জরুরী অবস্থার সরকারী ঘোষণা সম্পর্কে প্রতিবাদপত্র পেশ করতে পারেন। সপ্তমতঃ, সরকারপক্ষকে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ১ মাসের মধ্যে এর পক্ষে পার্লামেন্টের অনুমোদন চাইতে হবে। সংসদের অনুমোদনের পেছনে তার উভয় কক্ষের বিধায়কদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও উভয় কক্ষের মোট বিধায়কদের সর্বাধিক অংশের সমর্থন থাকা চাই। অষ্টমতঃ, পার্লামেন্ট্ প্রস্তাব গ্রহণ করে জরুরী অবস্থার ঘোষণা বাতিল করে দিতে পারে। নবমতঃ, জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলেও সরকারকে সংসদের কার্যবিবরণী যথারীতি প্রকাশ করে যেতে হবে। দশমতঃ, দু'বার ৬ মাস করে এক বছর পর্যন্ত পার্লামেন্ট্ জরুরী অবস্থার মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে পারে।

৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন ঃ "জরুরী অবস্থায় দশ দফা রক্ষাকবচ"

৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুসারে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির (অর্থাৎ শাসনবিভাগের) ক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব করা হয়েছে।

৪৪তম সংশোধনের পরিণাম

॥ ভারতীয় রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ॥

ভারতের রাষ্ট্রপতি আইনতঃ প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী। জরুরী অবস্থায় তিনি প্রচুর ক্ষমতা ভোগ করেন। স্বাভাবিক অবস্থায়ও তিনি অনেক ক্ষমতা ভোগ করেন। সংবিধানের ৭৪ ধারা অনুসারে মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন। মন্ত্রীরা

আইনতঃ তাঁকে সাহায্য করতে ও উপদেশ দান করতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রিগণ সংবিধানের ৭৫ (২) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতির আস্থাভাজন থাকা পর্যন্ত নিজেদের পদে বহাল থাকেন। রাষ্ট্রপতির হাতে শাসনবিভাগীয়, আইনপ্রণয়নবিষয়ক, জরুরী আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত, অর্থসংক্রান্ত এবং বিচারবিভাগীয় প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী; এমন-কি, তাঁর পক্ষে এক-নায়কে পরিণত হওয়াও অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়।

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা

কিন্তু রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা নিয়ে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে বেশ বোঝা যায় যে, ভারতের রাষ্ট্রপতির পদটি ইংলন্ডের রাজা বা রাণীর পদের মত একটি নিয়মতান্ত্রিক শাসকের পদ। এই মতের পক্ষে সাংবিধানিকগণ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন। প্রথমতঃ, সংবিধানের খসড়ায় প্রথমে রাষ্ট্রপতিকে "ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান" ("Head of the Federation") বলে বর্ণনা করা হয়। পরবর্তীকালে সংবিধানের সর্বশেষ খসড়ায় এই বাক্যাংশ বাদ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়েই বোঝা যায় যে, সাংবিধানিকগণ নির্বাচিত মন্ত্রিসভার ওপরই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক: কারণ, (১) সাংবিধানিক ব্যাখ্যা তাই

দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় রাষ্ট্রপতির নানাপ্রকার ক্ষমতা যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক প্রশাসকেরই ক্ষমতা। অর্থাৎ, তাঁর প্রত্যাখ্যাত কোনও আইনের খসড়া যদি কেন্দ্রীয় আইনসভা পুনরায় অনুমোদন করে, তা হলে তিনি সেই বিলটিতে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য। রাষ্ট্রপতির হাতে জরুরী ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু ৪৪তম সংশোধনী আইন বিধিবদ্ধ হবার পর এই সমস্ত ক্ষমতা তিনি কেবল ১০টি শর্তসাপেক্ষে প্রয়োগ করতে পারেন। সংবিধানের ৭৪ ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর বিভিন্ন প্রকার কার্যপরিচালনার জন্য সাহায্য করতে এবং উপদেশ দিতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে একটি মন্ত্রিসভা থাকবেই ("There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions")। এখানে "থাকবেই" ("There *shall* be") এই বাক্যাংশটির প্রয়োগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ ইংলন্ডের মত ভারতের শাসনব্যবস্থাতেও ক্যাবিনেটের বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রাধান্য সূচিত। ভারতীয় সুপ্রীম্ কোর্ট্ রাম জাওয়াইয়া বনাম পাঞ্জাব অঙ্গরাজ্য (Ram Jawaya vs. State of Punjab) মামলাটিতে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

(২) ৪৪তম সংশোধনী আইনের ব্যাখ্যা

তৃতীয়তঃ, গণপরিষদে ভারতীয় সংবিধানের খসড়া নিয়ে আলোচনার সময় প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ সংবিধানরচয়িতা ডক্টর আম্বেদকার ঘোষণা করেন যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান, তবে তিনি শাসকপ্রধান নন। আম্বেদকারের মতে ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর মত ভারতের রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক।

(৩) আম্বেদকারের অভিমত

চতুর্থতঃ, সংবিধান অনুসারে শাসনপরিচালনা সম্পর্কে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তগুলি প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে জানাবেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শাসনপরিচালনা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি নন, মন্ত্রিসভাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী।

(৪) মন্ত্রিসভার প্রাধান্য

পঞ্চমতঃ, ভারতীয় সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনী আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য। ফলে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করতে ও লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ জারি করতে পারেন না। কোন মন্ত্রিসভা নিজের অপসারণের জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেবে—এ ধারণা নিতান্তই অবাস্তব।

(৫) ৪২তম সংশোধনী আইনের ব্যাখ্যা

ষষ্ঠতঃ, ইংলণ্ডে আইনসভার কাছে মন্ত্রিসভার দায়িত্ব প্রথাগত বিধান হিসাবে স্বীকৃত। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৭৫ (৩) ধারা অনুসারে মন্ত্রিসভা লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী। রাষ্ট্রপতি যদি স্বেচ্ছাচারী শাসকের মত কোনও কাজ করেন, তা হলে শেষ পর্যন্ত তিনি আইনসভার সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িত হয়ে পড়বেন। ধরা যাক, কোনও সময়ে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির নির্দেশ মানতে রাজী হলেন না। তাঁর পদত্যাগের পর রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন ; কারণ, সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা নিয়োগ করতেই হবে। নতুন প্রধানমন্ত্রী আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করলে তিনি হয়ত রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা বাতিল করে দিয়ে নতুন আইনসভার নির্দেশ নিতে অনুরোধ করবেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী যদি পুনরায় লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারেন, তাহলে রাষ্ট্রপতি এক অভূতপূর্ব সাংবিধানিক সঙ্কটে জড়িয়ে পড়বেন। এই অবস্থায় হয়ত শেষ পর্যন্ত তাঁর ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ (impeachment) আনা যেতে পারে।

(৬) রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছাচারী হলে তার সম্ভাব্য ফল

সপ্তমতঃ, রাষ্ট্রপতি যাতে সম্ভাব্য কোনও ক্ষেত্রে তাঁর কোন রকম বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে দ্বিধাবোধ না করেন, তার জন্য সংবিধানের ১৪৩ ধারা অনুসারে তিনি কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার প্রাক্কালে ভারতের সুপ্রীম্ কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। ইংলণ্ডের ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের বিচার-বিভাগীয় আইনের (Judicial Committee Act, 1833) ৪ ধারা অনুসারে ইংলণ্ডের রাজমুকুট প্রিভি কাউন্সিলের (Privy Council) কাছে অনুরূপভাবে মতামত চাইতে পারেন এবং কানাডার ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের আইন (Canadian Supreme Court Act, 1906) অনুসারে কানাডার গভর্নর জেনারেল সুপ্রীম্ কোর্টের সঙ্গে অনুরূপভাবে পরামর্শ করতে পারেন।

(৭) সুপ্রীম্ কোর্টের পরামর্শদানের এক্তিয়ার

অষ্টমতঃ, রাষ্ট্রপতি তাঁর ইচ্ছামত যে কোনও নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করতে পারেন না। তিনি অবশ্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, সমাজসেবী, লেখক, দার্শনিক

প্রভৃতি ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যদের কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে অর্থাৎ রাজ্যসভায় (Council of States) সদস্য মনোনীত করতে পারেন। কিন্তু তাঁদের কাউকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেও ভারতীয় সংবিধানের ৭৫ (৩) ধারা অনুসারে তিনি শেষ পর্যন্ত লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকবেন। এর সাংবিধানিক অর্থ হল এই যে, তিনি বা তাঁর নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যদি লোকসভা সংখ্যাধিক্যের ভোটে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব (Motion of no-confidence) গ্রহণ করে, তা হলে তাঁকে এবং তাঁর মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে। সুতরাং শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির আস্থাভাজন হলেই চলবে না, ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বা তাঁর মন্ত্রিসভার অন্য মন্ত্রীদের ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে লোকসভার আস্থাভাজন থাকতে হবে।

(৮) রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার মধ্যে সম্পর্ক

ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা সম্পর্কে এই বিস্তারিত আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতাগণ ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মত তাঁর সীমাবদ্ধ কার্যকালে প্রকৃত ক্ষমতাবান্ প্রশাসকের পদের বদলে ইংলণ্ডের রাজমুকুটের মত একটি নিয়মতান্ত্রিক শাসকের পদ সৃষ্টি করতেই বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তবে একথা মনে করাও ঠিক নয় যে, ভারতের রাষ্ট্রপতির পদটি একটা "জব্বর রকমের অপদার্থ" অথবা একটা "জমকালো সাক্ষীগোপালের" ("Magnificent Cipher") পদের মত নিছক বাহুল্য মাত্র। ইংলণ্ডের রাজমুকুটের মত ভারতের রাষ্ট্রপতিও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সর্বময় নেতা হিসাবে বিশেষ সম্মাননীয় এবং শ্রদ্ধাভাজন। প্রাক্তন বিচারপতি ডক্টর দুর্গাদাস বসু বলেন যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় প্রশাসকরূপে যে সমস্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দেন, সেগুলিতে ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণের মত বিভাগীয় মন্ত্রিগণ কোনও সহস্বাক্ষর প্রদান করেন না। ভারতের রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরিত এই সমস্ত হুকুমনামাগুলিতে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট সচিবগণ সহস্বাক্ষর প্রদান করেন। ফলে, রাষ্ট্রপতির পদটি হুবহু ইংলণ্ডের রাজমুকুটের পদের মত আইনতঃ সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পদে পরিণত হতে পারে নি। এর সুক্ষ্মতম সাংবিধানিক ব্যাখ্যা হল এই যে, ইংলণ্ডে রাজমুকুট যে কোনও ন্যায়-অন্যায়ের উর্ধ্বে থাকেন ("The King can do no wrong")। এই বিখ্যাত শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি ইংলণ্ডের সাংবিধানিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথা হিসাবে সেখানকার শাসনতন্ত্রে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ভূমিকার দ্যোতক। ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী যদি তাঁর স্বাক্ষরিত কোন হুকুমনামার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের স্বারস্থ হতে চান, তা হলে তাঁকে তাঁর সিংহাসন ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁর স্বাক্ষরিত কোনও হুকুমনামার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আদালতের সম্মুখীন হন, তা হলে স্বপদে ইস্তফা না দিয়েও তিনি তাঁর মতামত বিচারকদের কাছে পেশ করতে পারেন।

কিন্তু রাষ্ট্রপতিরও প্রকৃত ক্ষমতা আছে ঃ (১) দুর্গাদাস বসুর অভিমত

দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত বিচারবিবেচনা অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা (Discretionary Powers) খুব অল্প হলেও সময়-বিশেষে তা গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষমতা ইংলন্ডের রাজা বা রাণীর এ ধরনের ক্ষমতার সমতুল্য। যদি কোনও সাধারণ নির্বাচনে কমন্স্ সভায় (House of Commons) অর্থাৎ ইংলন্ডের আইনসভার নিম্নকক্ষে কোনও একটি দল একক বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (absolute majority) লাভ না করে, তা হলে রাজা বা রাণী ইচ্ছা করলে তাঁর নিজের বিশেষ বিচারবিবেচনার ওপর ভিত্তি করে যে দলের নেতা এই অবস্থায় স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করতে সমর্থ হবেন, তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন। কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীই ইংলন্ডের কমন্স্ সভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য রাজমুকুটকে উপদেশ দিতে পারেন। ভারতের রাষ্ট্রপতিও এরকম অবস্থায় লোকসভার যে কোনও দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে বা একাধিক দলের নেতৃবৃন্দকে একটি যৌথ মন্ত্রিসভা (Coalition Cabinet) গঠন করতে অনুরোধ জানাতে পারেন। শ্রীমোরারজির দেশাই-এর পদত্যাগের পর এভাবেই রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডী চৌধুরী চরণ সিংকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী হবার কয়েকদিন বাদেই শ্রীসিং পদত্যাগ করেন ও পুনর্নির্বাচনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন।

(২) রাষ্ট্রপতির বিবেচনাধীন ক্ষমতা ইংলন্ডের রাজমুকুটের মত : কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন ?

তৃতীয়তঃ, ভারতীয় সংবিধানের ৭৮ ধারা অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে সমস্ত বিষয় জানার অধিকারী। তিনি মন্ত্রিসভাকে কোনও মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাতে পারেন।

(৩) রাষ্ট্রপতি বনাম মন্ত্রিসভা

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রপতি জাতির বিশিষ্ট প্রথম সারির নেতা হিসাবে বিশেষ সম্মানিত। বেতার, সংবাদপত্র, দূরদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি ভারতীয় জনগণের কাছে বিশেষ প্রিয়। স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস প্রভৃতি স্মরণীয় দিনগুলি উপলক্ষ্য করে তাঁর প্রদত্ত ভাষণগুলি দেশে-বিদেশে জনগণের কাছে বিশেষভাবে চিন্তার খোরাক যোগায়। ভারতের রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে প্রখ্যাত আইনবিদ্, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ্, শ্রমিকনেতা প্রভৃতি বিভিন্ন খ্যাতিমান ভারতসন্তানের নাম চিরস্মরণীয়। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির উপদেশ ভারতের নরনারীর কাছে বিশেষ আশা ও ভরসা সঞ্চার করে। ভারতের রাষ্ট্রপতি সকল ভারতীয়ের কাছে ভারতের জাতীয় ঐক্যের, ভারতের বৈচিত্র্যপূর্ণ, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতন্ত্রী মতাদর্শের বিমূর্ত প্রতীক।

(৪) জাতির নেতারূপে রাষ্ট্রপতি-পদের গুরুত্ব

॥ ভারতের প্রধানমন্ত্রী : তাঁর ক্ষমতা এবং কার্যাবলী ॥

ভারতের সংবিধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, কার্যাবলী এবং মানমর্যাদা নিয়ে বিচার

করলে বোঝা যায় যে, এই পদটিকে সংবিধানরচয়িতাগণ সম্পূর্ণভাবে ইংলন্ডের রাজমুকুটের মত নিয়মতান্ত্রিক শাসকের পদের সমতুল্য করে রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইংলন্ডের মত ভারতে কেন্দ্রীয় প্রশাসন-ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীই আসল নেতা।

প্রধানমন্ত্রীই ভারতের প্রকৃত শাসক

ভারতের শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, ইংলন্ডে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত ক্যাবিনেটব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে প্রথাগত বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও ভারতে প্রধানমন্ত্রীর পদটি এবং তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত ক্যাবিনেটব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৭৪ (১) ধারা অনুসারে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার শীর্ষে একজন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন এবং তাঁর নেতৃত্বে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্যের জন্য ও উপদেশ দেবার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকবে। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় যে ইংলন্ডে লর্ড সালিসবেরির (Lord Salisbury) অবসর গ্রহণের পর তৎকালীন সম্রাট পঞ্চম জর্জ লর্ড কার্জনের প্রধানমন্ত্রী হবার দাবী প্রত্যাখ্যান করে কমন্সসভার একই দলের নেতা বোনার ল'কে (Boner Law) ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেন। তখন থেকেই ইংলন্ডে প্রথাগত বিধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর পদটি পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের, অর্থাৎ কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার প্রাপ্য পদরূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। যখন হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের (Harold Macmillan) পদত্যাগের পর লর্ড হিউম (Lord Home) প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন, তখন তাঁকে লর্ডস সভার সদস্যপদ পরিত্যাগ করে কমন্স সভার সদস্যপদ গ্রহণ করতে হয়। এই প্রথাগত বিধানটির গণতান্ত্রিক তাৎপর্য হল এই যে, দেশের প্রকৃত উচ্চতম শাসককে অবশ্যই জনগণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিরূপে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত আইনসভার নিম্নকক্ষের সদস্যপদ গ্রহণ করতে হবে। ভারতীয় শাসনতন্ত্র কিন্তু উল্লেখ করা হয় নি যে, কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষের অর্থাৎ রাজ্যসভার কোন সদস্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। তবে এ পর্যন্ত ভারতের সমস্ত প্রধানমন্ত্রীই লোকসভার সদস্য হিসাবে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়েছেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় শাসনতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর পদটি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার প্রাপ্য পদরূপে গণতান্ত্রিক প্রথা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তা ছাড়া সংবিধানের ৭৫ (৩) ধারা অনুসারে প্রধানমন্ত্রী লোকসভার কাছে দায়ী থাকেন। সংবিধানের ৭৫(১) ধারা অনুসারে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। এইভাবে পরোক্ষ উপায়ে সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ঘোষণা করা হয়েছে। এই ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। সুতরাং ক্যাবিনেট-প্রথার প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে মন্ত্রিসভার ওপর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ভারতীয় শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত।

ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর তুলনা

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রথম কাজ হল—মন্ত্রিসভার নেতা হিসাবে মন্ত্রিসভা গঠনে ও পরিচালনায় তাঁর প্রাধান্য বজায় রাখা। নিজের দলের যোগ্য নেতাগণ যাতে মন্ত্রিসভায় স্থান পান, প্রধানমন্ত্রী সেদিকে নজর দেন। মন্ত্রিসভায় আসন বন্টনের সময় তরুণ ও প্রবীণদের মধ্যে তফসিলী ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায় এবং উন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী এমনভাবে সংহতি ও সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন যাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সব দিক থেকে শক্তিশালী হতে পারে। শুধু মন্ত্রিনিয়োগ নয়, মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তরবন্টনের ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁর নেতৃত্বে মন্ত্রিগণ সমগ্র মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তরূপে ঐকমত্যের ভিত্তিতে (unanimity) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মন্ত্রীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী তার সালিসী করেন। এক্ষেত্রেও তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, কারণ প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে সমগ্র মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাজ : (১) মন্ত্রিসভার নেতা হিসাবে

ক্যাবিনেটের কার্যসম্পাদনের জন্য যে কমিটিগুলি আছে, সেগুলির সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় আলোচিত হয় না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এদের সভাপতি। এদের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সংহতি ও সামঞ্জস্য বজায় রাখার দায়িত্ব তাঁরই। তাঁর মাধ্যমেই এদের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশগুলি মন্ত্রিসভা জানতে পারে।

ক্যাবিনেট কমিটি

মন্ত্রিসভাকে না জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সম্পূর্ণ একক দায়িত্বে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। পরে ইচ্ছামত মন্ত্রিসভার কাছে তিনি তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুমোদন (post facto approval) চাইতে পারেন। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এ রকম কাজ করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর একক ক্ষমতা

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে জেনিংস (Jennings) "মন্ত্রিসভার সিংহদ্বারের ভিত্তিপ্রস্তর" ("Keystone of the Cabinet arch") বলে বর্ণনা করেছেন। মন্ত্রিসভার নেতারূপে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও এই বাক্যাংশটি প্রযোজ্য। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে সমান মর্যাদাযুক্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মধ্যে অগ্রণী নেতা" ("Primus inter pares" অর্থাৎ "first among equals") বলা হয়। এর অর্থ হল যে, মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মীমাত্র, তাঁর অধস্তন কর্মচারী নন। কিন্তু ইংলণ্ডের মত ভারতের প্রধানমন্ত্রীরও হাতে যে বিপুল ক্ষমতা ও প্রভাব রয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বরং বলা উচিত "মন্ত্রিসভার মধ্যমণি" অথবা "তারকামণ্ডলীর মাঝে ভাস্বর চন্দ্র" ("Inter stellas luna minors"). এ প্রসঙ্গে অনেকে ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রকে "ক্যাবিনেট শাসিত সরকার" ("Cabinet Government") না বলে "প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার" ("Prime Ministerial Government") বলে উপহাস করে থাকেন।

মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী প্রাধান্য

দ্বিতীয়তঃ, **শাসনবিভাগের নেতা হিসাবেও** ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দায়িত্ব আছে। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংবিধানের ৭৮ ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন এবং আইনপ্রণয়ন সম্পর্কে নিয়মিতভাবে অবহিত করবেন। সংবিধানের ৭৪ (১) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার উপদেশ অনুসারে শাসন পরিচালনা করতে বাধ্য। যদি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ না করেন, তা হলে হয়ত প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে নতুন প্রধানমন্ত্রী লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আস্থাভাজন না থাকলে তাঁকেও পদত্যাগ করতে হবে। যেহেতু সংবিধানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অবস্থিতি আবশ্যিকরূপে স্বীকৃত, সুতরাং নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রারম্ভিক পর্বরূপে রাষ্ট্রপতিকে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে নতুন সাধারণ নির্বাচন আহ্বান করতেই হবে। এ ধরনের কোনও সাংবিধানিক সঙ্কট এখনও পর্যন্ত ভারতে দেখা দেয় নি। তবে সাধারণতঃ এরকম অবস্থায় প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রপতি বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীকে নতুন প্রধানমন্ত্রী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তদারকি মন্ত্রিসভার (Caretaker Cabinet) নেতা হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করতে পারেন।

(২) শাসনবিভাগের নেতা হিসাবে

তৃতীয়তঃ, **আইনসভার নেতা হিসাবেও** প্রধানমন্ত্রী কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তিনি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। সুতরাং লোকসভার অধিবেশনের দিনপঞ্জী স্থির করার জন্য লোকসভার সর্বাধ্যক্ষ (Speaker) এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রপতিকে লোকসভার অধিবেশন ডাকতে, মুলতুবি রাখতে বা লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন আহ্বান করতে অনুরোধ জানাতে পারেন। ইংলন্ডে প্রথাগত বিধান হিসাবে এই অধিকারটি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অধিকাররূপে স্বীকৃত। এখানে স্মরণীয় যে, ১৯৭০ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে চতুর্থ লোকসভা বাতিল করে দিয়ে পুনর্নির্বাচনের জন্য অনুরোধ জানান এবং রাষ্ট্রপতি সেই অনুরোধ মেনে নেন। প্রধানমন্ত্রীকে লোকসভার নেতা (Leader of the House) বলে ধরা হয়। এই পদটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই পদে অধিষ্ঠিত থাকার ফলেই প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন সঙ্কটের সময়ে সমগ্র জাতীয় বা সরকারী নীতিরূপে তাঁর ব্যক্তিগত, দলীয় এবং জাতীয় নীতি ঘোষণা করে থাকেন। বিরোধী দলের নেতাগণও তাঁদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেন এবং সুবিচার দাবী করেন। তাঁরা প্রয়োজন বোধ করলে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাতীয় নীতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির জন্য চাপ দেন এবং প্রধানমন্ত্রীও অনেক সময় সরকার এবং বিরোধী দলগুলির মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ গণতান্ত্রিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য তাঁদের অনুরোধে বিবৃতি দিয়ে থাকেন। জাতীয় নেতারূপে প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষেই ভাষণ দিতে পারেন এবং উভয় কক্ষের অধিবেশনে উপস্থিত

(৩) আইনসভার নেতা হিসাবে

থাকতে পারেন, তবে কেবল লোকসভাতেই তিনি ভোটদানের অধিকারী। যখন আইনসভার কোনও কক্ষে বিরোধী দলগুলির নেতাদের তর্কবিতর্কের ফলে অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা চরম আকার ধারণ করে, তখন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বই আইনসভায় শান্তি এবং শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সংসদের উভয়কক্ষের সর্বাধ্যক্ষদের বিশেষ সহায়তা করে থাকে।

চতুর্থতঃ, **দলীয় নেতা** হিসাবেও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ভূমিকা থাকে। প্রধানমন্ত্রী মুখ্যতঃ লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। সুতরাং সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হবার সময় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সভাসমিতিতে যে ভাষণ দিয়ে থাকেন বা যে বিবৃতি প্রচার করে থাকেন, তাতে উল্লিখিত কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী নিজের পদে অধিষ্ঠিত হবার পর সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করে থাকেন। নির্বাচনের সময় দলনেতারূপে প্রধানমন্ত্রী দেশের সর্বত্র ঝটিকা সফর করে থাকেন ও তাঁর দলকে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে সাহায্য করেন।

(৪) দলীয় নেতা হিসাবে

পঞ্চমতঃ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর মত **জাতীয় নেতা**। সাংবাদিক সম্মেলন, বেতার ভাষণ, দূরদর্শনে অংশগ্রহণ প্রভৃতি জনসংযোগ ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ভারতের মত বৈচিত্র্যপূর্ণ, সমস্যাবহুল দেশে অখণ্ড, ঐক্যবদ্ধ জাতীয় নীতির কথা ঘোষণা করে থাকেন। দুর্ভিক্ষ, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়, বৈদেশিক আক্রমণ প্রভৃতি হাঙ্গামার সময়, বন্যানিয়ন্ত্রণ, খাদ্যাভাব প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ঘোষিত বিবৃতিগুলি সঙ্কীর্ণ দলীয় নীতির ঊর্ধ্বে এক সুমহান্ জাতীয় লক্ষ্যের পথে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করে। তথ্যচিত্র, সমাচার প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই গুরুতর জাতীয় দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

(৫) জাতীয় নেতা হিসাবে

ষষ্ঠতঃ, **আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব** অনস্বীকার্য। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য দেশের প্রধানমন্ত্রীদের মত বিভিন্ন দেশ সফর করে থাকেন। সেখানে তিনি দেশবিদেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে যে ভাষণ বা বিবৃতি দিয়ে থাকেন, সেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগণ ভারত সরকারের নীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করে থাকেন। ফলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বজনমতগঠনে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

(৬) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

উপসংহার ঃ ইংলণ্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড্ অ্যাস্কুইথ্ (Lord Asquith) ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পদের গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, এই পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বই পদটিকে যথোচিত মর্যাদায় ভূষিত করে থাকে ("The office of the British Prime Minister depends on what its holder chooses to make it")। এই কথাটির মধ্যে বিশেষ সত্য নিহিত থাকলেও ইংলণ্ডে, তথা ভারতে প্রধানমন্ত্রীর পদটিই অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ একটি পদ। পদটির প্রাপককে এমন কতক-

উপসংহার ঃ প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা ব্যক্তিত্ব নির্ভর

গুলি কার্য সম্পাদন করতে হয় যার ফলে তাঁর ব্যক্তিত্ববিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

অনেকে মনে করেন যে, ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রীর মত ভারতের প্রধানমন্ত্রীও একনায়কেরই নামান্তর। বাস্তবিক, সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়াও শাসনবিভাগীয় বিভিন্ন ঘোষণায় যে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী তাঁর পদমর্যাদার বলে ভোগ করে থাকেন, তা থেকে এ ধারণা করা স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রীকেও কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। যেমন—প্রথমতঃ, নিজের দলের শৃংখলা এবং সম্প্রীতি বজায় রাখা। নিজের দলের সমর্থকদের মধ্যে তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে কোনও মতভেদ দেখা দিলে তাঁর পদটি বিপন্ন হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলির সহযোগিতা। এই সহযোগিতা লাভ না করলে ভারতের মত বিরাট, বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে প্রধানমন্ত্রী সমভাবে তাঁর নেতৃত্বকে কার্যকর করে তুলতে পারবেন না। তৃতীয়তঃ, বিরোধী দলগুলির সহায়তা ও সহানুভূতি। বিরোধী দলগুলি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা না করে চললে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সুষ্ঠুভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী কি একনায়ক ? তাঁর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

॥ ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ॥

ভারতীয় সংবিধানের ৭৪ (১) ধারার প্রথম অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্যের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে ও উপদেশ দেবে। মন্ত্রিগণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার যে কোন কক্ষের সদস্য হতে পারেন। সংসদের সদস্য না হলে মন্ত্রী নিযুক্ত হবার ৬ মাসের মধ্যে তাঁকে সংসদসদস্য হতে হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিগণের কার্যকাল রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির ওপর নির্ভর করলেও আসলে ইংলণ্ডে প্রচলিত সংসদীয় গণতন্ত্রের নীতি অনুযায়ী তাঁরা লোকসভার কাছে দায়ী। অর্থাৎ লোকসভা তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করলে তাঁরা পদত্যাগ করতে বাধ্য। একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থাপ্রস্তাব গৃহীত হলে অন্যদেরও পদত্যাগ করতে হয়। এর নাম আইনসভার কাছে মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ব (Collective Responsibility)।

ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা : সংগঠন

কেন্দ্রীয় সরকারে তিন প্রকার মন্ত্রী আছেন—ক্যাবিনেট মন্ত্রী (Union Minister), রাষ্ট্রমন্ত্রী (Minister-of-State) এবং উপমন্ত্রী (Deputy Minister)। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কয়েকজন সংসদীয় সচিবও (Parliamentary Secretary) থাকেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন, তাঁদের দপ্তরের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন, তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য দূর করার ব্যবস্থা করেন। তিনি ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন ও রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিসভার কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রধান দায়িত্ব হল প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বকে স্বীকার করে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন

৩ প্রকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

করা, তাঁর নেতৃত্বে ভারতের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দপ্তরভিত্তিক সংগঠনকে জোরদার করা। বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিগণকে নিজ নিজ দপ্তরের কার্যভার গ্রহণ করে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার দায়িত্ব শুধু প্রধানমন্ত্রীর কাছে নয়, আইনসভার কাছেও তার দায়িত্ব রয়েছে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় শাসনবিভাগ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠলে বিভাগীয় মন্ত্রী তার জবাব দেন, সে সম্পর্কে বিবৃতি দেন। আইনসভার বাজেট অধিবেশনের সময় মন্ত্রিগণ নিজ নিজ বিভাগের ব্যয়বরাদ্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রস্তাব পেশ করেন। এ সময় তাঁদের দপ্তরের কার্যকলাপ সম্পর্কে যে সমালোচনা হয়, মন্ত্রিগণ সে সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা

ইংলণ্ডে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে গৃহীত রাজমুকুটের অধীনস্থ মন্ত্রিগণ সম্পর্কিত আইনে (Ministers of the Crown Act, 1937) ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভায় কতজন সদস্য আইনসভার কোন্ কোন্ কক্ষ থেকে নিযুক্ত হবেন, তার সীমা নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ক্ষেত্রে সে রকম কোন সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় নি। এ বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানেও কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই।

সংসদের কোন্ কক্ষ থেকে কতজন মন্ত্রী ?

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিভিন্ন মন্ত্রীদের সাহায্য করে থাকেন কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাতন্ত্র বা কৃত্যক। মন্ত্রিগণ তাঁদের দলীয় নীতি ও আইনসভায় ঘোষিত নীতি আমলাদের জানান, আমলাগণ তদনুসারে তাঁদের পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে থাকেন। ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রিগণ মাসিক ২২৫০ টাকা বেতন ও ৫০০ টাকা ভাতা পান। রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণ যথাক্রমে মাসিক ২২৫০ টাকা ও ১৭৫০ টাকা বেতন পান, কিন্তু কোন ভাতা পান না।

আমলাতন্ত্রের ভূমিকা, মন্ত্রীদের বেতন, ভাতা

॥ ভারতের অঙ্গরাজ্যের প্রশাসনব্যবস্থা : রাজ্যপাল ॥

ভারতের প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যের প্রধান প্রশাসককে রাজ্যপাল (Governor) বলে। তিনি রাষ্ট্রপতির দ্বারা ৫ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। কমপক্ষে ৩৫ বছর বয়স্ক যে কোনও ভারতীয় নাগরিক রাজ্যপাল হতে পারেন। কিন্তু তিনি কোনরকম লাভজনক ব্যবসা করতে পারেন না, বা কেন্দ্রীয় বা রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে যথাক্রমে লোকসভার বা বিধানসভার সভ্য হতে পারবেন না। তিনি ৫ বছর বাদে পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। কোনও রাজ্যপাল একাধিক রাজ্যের রাজ্যপালরূপেও কাজ করতে পারেন। তাঁর কার্যকাল সমাপ্ত হবার আগেও তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারেন। তাঁর মাসিক বেতন ৫৫০০ টাকা। তিনি বিনা ভাড়ায় বাসস্থান পান। তাঁর কার্যকালের মধ্যে তাঁর বেতন হ্রাস করা চলে না।

রাজ্যপাল : নিয়োগ-পদ্ধতি, কার্যকাল, বেতন

রাজ্যপালের শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা (Executive Powers) : প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের হাতে যে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা আছে তদনুসারে তিনি সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের প্রশাসন নিজে অথবা তাঁর নিযুক্ত কর্মচারীদের দ্বারা সম্পন্ন করার ব্যবস্থা

করেন। ভারতীয় সংবিধানের ১৬৪ ধারা অনুসারে রাজ্যপাল সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত

রাজ্যপালের ক্ষমতা ঃ (১) শাসনবিভাগীয়

করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে তিনি অন্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। রাজ্যের অ্যাড্ভোকেট জেনারেল, রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের (State Public Service Commission) সদস্য প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের রাজ্যপাল নিয়োগ করেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির ওপর তাঁদের কার্যকাল নির্ভর করে। বিভিন্ন উপজাতি ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি সম্পর্কে ফি বছর তিনি ভারত সরকারের কাছে বিবৃতি পেশ করেন। রাজ্যে কোনপ্রকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার জন্য কোন ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি তাঁরই সুপারিশক্রমে গ্রহণ করেন।

রাজ্যপালের **আইনবিষয়ক ক্ষমতার** (Legislative Powers) মধ্যে পড়ে তাঁর কতকগুলি বিশেষ কার্য। তিনি রাজ্য বিধানমণ্ডলের অংশরূপে রাজ্য বিধানমণ্ডলের অধিবেশন আহ্বান করতে অথবা মুলতুবি রাখতে এবং রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন বাতিল করে দিতে পারেন। প্রয়োজন হলে তিনি বিধানমণ্ডলে আলোচনার সময় বা অন্য সময় সেখানে বাণী (Message) পাঠাতে পারেন। সাধারণ নির্বাচনের পর এবং প্রতি বছর প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার দিন রাজ্যপাল বিধানমণ্ডলের যুগ্ম অধিবেশনে অথবা বিধানসভায় তাঁর ভাষণ দিতে পারেন। এই ভাষণ দেবার জন্য বিধানসভায় সরকারপক্ষ তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে যে প্রস্তাব পেশ

(২) আইনবিষয়ক

করেন, সেটি গৃহীত না হলে রাজ্যমন্ত্রিসভার পদত্যাগ সূচিত হয়। এ ক্ষেত্রে রাজ্যপালের ভাষণ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতির প্রদত্ত ভাষণের এবং ইংলণ্ডে রাজা বা রাণীর সিংহাসন থেকে পার্লামেন্টে প্রদত্ত ভাষণের সমতুল্য। এই সব ক্ষেত্রেই এই ভাষণগুলিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভার আগামীকালের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় এবং এই ভাষণের জন্য ভাষণদাতাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাবটি আইনসভার কাছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভার আস্থা বা অনাস্থাসূচক প্রস্তাবের তুল্য বলে ধরা হয়।

সংবিধানের ৩৩৩ ধারা অনুসারে রাজ্যপাল প্রয়োজন মনে করলে ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে জনুয়ারী পর্যন্ত ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কয়েকজনকে রাজ্যবিধান-মণ্ডলের সদস্য মনোনীত করতে পারেন। আবার, সংবিধানের

আইনসভার মনোনয়ন সম্পর্কিত ক্ষমতা

১৭১ (৫) ধারা অনুসারে কোন রাজ্যবিধানমণ্ডলে উচ্চকক্ষ থাকলে রাজ্যপাল সেখানে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ললিতকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে খ্যাতিমান ব্যক্তিদের কয়েকজনকে সদস্যরূপে মনোনীত করতে পারেন।

রাজ্যপালের অনুমোদন ছাড়া কোন বিল আইনরূপে পরিগণিত হতে পারে না। কোনও বিল বিধানমণ্ডলে গৃহীত হবার পর তিনি বিলটিতে সম্মতি না দিতে পারেন, অথবা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য তাঁর কাছে পাঠাতে পারেন,

বিল অনুমোদন ঃ তাঁর ভূমিকা

অথবা কোনও সংশোধনী প্রস্তাবসমেত বা সে রকম কোনও প্রস্তাব ছাড়াই পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটি রাজ্যবিধানমণ্ডলের কাছে ফেরত পাঠাতে পারেন। কিন্তু রাজ্যবিধানমণ্ডল যদি বিলটি পুনরায় গ্রহণ করে, তা হলে রাজ্যপাল সেটি অনুমোদন করতে বাধ্য। কিন্তু রাজ্যপালের দ্বারা কোনও

বিল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠান হলে সেটি শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার ওপর। সংবিধান অনুসারে রাজ্যপালের দ্বারা প্রেরিত রাজ্যসরকারের কোনও অর্থবিল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি এভাবে আটকে রাখতে পারেন। রাজ্যপাল প্রয়োজন মনে করলে রাজ্য বিধানমণ্ডল দ্বারা গৃহীত কোন বিল অনুমোদনের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন।

রাজ্যপালের **অর্ডিন্যান্স** বা বিশেষ জরুরী আইন **জারী করার ক্ষমতা** আছে। প্রয়োজন মনে করলে রাজ্য বিধানমণ্ডলের অধিবেশন বন্ধ থাকার সময় তিনি অর্ডিন্যান্স জারী করতে পারেন। রাজ্য বিধানমণ্ডলের অধিবেশন আরম্ভ হবার পর সেটি তাঁর অনুমোদনের জন্য তাঁকে পেশ করতে হয়। যদি আগেই রাজ্য বিধানমণ্ডল এই অর্ডিন্যান্স বাতিল না করে দেয়, তা হলে রাজ্য বিধানমণ্ডলের অধিবেশন শুরু হবার ছ' সপ্তাহ পরে এই অর্ডিন্যান্স বাতিল হয়ে যায়। রাজ্যপাল নিজেও অর্ডিন্যান্সটি যে কোনও সময়ে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। কেন্দ্রীয় কোনও আইনের সঙ্গে রাজ্যপালের দ্বারা ঘোষিত কোন অর্ডিন্যান্সের কোন বিরোধ ঘটলে এবং রাজ্যপালের অর্ডিন্যান্সটি রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী ঘোষিত হলে সেটিকেই চূড়ান্ত বলে ধরা হয়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, রাজ্যপালের অর্ডিন্যান্স জারী করার ক্ষমতা তাঁর স্বেচ্ছাধীন (discretionary) ক্ষমতা নয়। অর্থাৎ এই ক্ষমতা তাঁকে তাঁর মন্ত্রিসভার সাহায্য নিয়ে এবং তাঁর পরামর্শ অনুসারে প্রয়োগ করতে হবে।

অর্ডিন্যান্স (জরুরী-আইন) জারী করার ক্ষমতা

ভারতীয় সংবিধানের ২০২ ধারা অনুসারে রাজ্যপালের হাতে অনেক **অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা** (Financial Powers) দেওয়া হয়েছে। রাজ্যপাল প্রত্যেক আর্থিক বছরের শুরুতে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীকে দিয়ে রাজ্যসরকারের বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাব বিধানসভায় বাজেটের আকারে স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। তাঁর সুপারিশ ছাড়া কোন রকম ব্যয়বরাদ্দের দাবী রাজ্য বিধানসভায় উত্থাপন করা যায় না। তিনি ইচ্ছা করলে রাজ্যের জন্য বেশী ব্যয়বরাদ্দ দাবী করতে পারেন। তাঁর অনুমোদন ছাড়া বিধানসভায় কোন অর্থ বিল উত্থাপন করা যায় না।

(৩) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা

রাজ্যপালের **বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাগুলিও** (Judicial Powers) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজ্যপাল রাজ্যের আদালতের দ্বারা দণ্ডিত কোনও ব্যক্তির দণ্ডাদেশ লঘু করে দিতে পারেন বা তাকে ক্ষমা করতে পারেন। অবশ্য সামরিক আদালত দ্বারা দণ্ডিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাঁর এই ক্ষমতা প্রযোজ্য নয়। মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে কিংবা কেন্দ্রীয় আইনভঙ্গের অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির দণ্ড মকুফ, হ্রাস প্রভৃতির ক্ষমতা কেবল রাষ্ট্রপতির।

(৪) বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা

রাজ্যপালের **স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা** (Discretionary powers) নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। ভরেতীয় সংবিধানের ১৬৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, রাজ্যপাল তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ছাড়া অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে রাজ্য-মন্ত্রিসভার উপদেশ অনুসারে কাজে করতে বাধ্য।

তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাগুলি কোন্‌গুলি সেটাও তাঁর বিবেচনা এবং সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে এবং এ নিয়ে কোন রকম প্রশ্ন করা চলবে না। ভারতীয় সংবিধান প্রচলিত হবার সময় এবং পূর্বে গণপরিষদে এ নিয়ে বিতর্ক চলার সময় যে ধারণা প্রচারিত হয় তার ফলে সকলে তখন ধরে নিতেন যে রাজ্যপালের এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা শুধু আসামের রাজ্যপালের ক্ষেত্রে উপজাতীয় এলাকার শাসন প্রভৃতি পরিচালনার ব্যাপারে রাজ্যপাল প্রয়োগ করবেন। অর্থাৎ তখন রাজ্যপালের ক্ষমতার সাধারণ ব্যাখ্যায় বলা হত রাজ্যপাল সম্পূর্ণভাবে রাজ্য-মন্ত্রিসভার নির্দেশে চালিত নিয়মতান্ত্রিক শাসক।

(৫) স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মত ভারতের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে প্রথম যুক্তফ্রন্ট্‌ যৌথ মন্ত্রিসভা (Coalition Cabinet) গঠন করে। ১৯৪৭ সালের ১৮ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করার জন্য রাজ্যপালকে মন্ত্রিসভা পরামর্শ দেন। কিন্তু তৎকালীন রাজ্যপাল বিধানসভার কয়েকজন সদস্যের স্বাক্ষর অনুসারে ঐ তারিখের পূর্বেই বিধানসভার কাছে মন্ত্রিসভা আস্থাভাজন কিনা তা যাচাই করার জন্য অধিবেশন আহ্বানের নির্দেশ দেন। যুক্তফ্রন্ট্‌ মন্ত্রিসভা রাজ্যপালের এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার অভিযোগে ফ্রন্ট্‌ মন্ত্রিসভা বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে রাজ্যপাল ১৯৬৭ সালের ২১শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট্‌ মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে দেন। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যপালের রিপোর্টের ভিত্তিতেই "সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যে সংবিধান অনুসারে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা সম্ভব নয়" বলে রাষ্ট্রপতি ঐ অঙ্গরাজ্যের শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রের হাতে অর্পণ করেন। বিশেষতঃ, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভাগুলির বিধায়কগণ পূর্বে এত বেশী দল পরিবর্তন করতেন যে রাজ্যবিধানসভায় অনেক সময়েই ঠিক কোন্‌ দল কখন সংখ্যাগরিষ্ঠ আছে তা বোঝা যেত না। ১৯৮৫ সালে দলত্যাগ নিরোধক আইন বিধিবদ্ধ হবার ফলে এরকম দুর্ঘটনা কমবে, মনে হয়।

বিধানসভায় দলগত অবস্থা যাচাইয়ের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট্‌ সরকার বরখাস্ত (১৯৬৭)

বিধায়কদের দলত্যাগের জন্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবার অভিযোগে ১৯৮৪ সালে জম্মু ও কাশ্মীর, সিকিম ও অন্ধ্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালগণ ঐ অঙ্গরাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের পদচ্যুত করেন। হালফিল ঐ তিনটি ক্ষেত্রেই ঐ রাজ্যগুলির অকংগ্রেসী বিরোধী দলগুলি তীব্র প্রতিবাদ করে। অন্ধ্রে তেলুগু দেশমের নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী এন্‌ টি রাম রাও একটা প্রচণ্ড গণ-আন্দোলন শুরু করেন। অন্ধ্রের রাজ্যপাল পদত্যাগ করেন। শেষ পর্যন্ত বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশনে অবিলম্বে তাঁর দলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করবেন—এই শর্তে রাম রাওকে নতুন রাজ্যপাল পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করেন। এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকারী দল সত্যিই সংখ্যাগরিষ্ঠ কিনা তা প্রমাণ করার একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র হল সংশ্লিষ্ট আইনসভা। কিন্তু কোনও মুখ্যমন্ত্রী যদি তাঁর দলের বিধায়কদের

দলত্যাগ বা অন্য কোন কারণে সত্যিই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারান, অথচ সংবিধানের ফাঁক-ফোকর খুঁজে দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট আইনসভার অধিবেশন আহ্বান না করেন, তা হলে তাঁর কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে "সংবিধান বানচাল করার" (Subversion of the Constitution) পর্যায়ে পড়ে এবং তা বন্ধ করার জন্য ঐ অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালকে অগ্রণী হতে হয়। এ সব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ বিধায়কগণের সই করা স্বীকৃতি বা স্মারকলিপির ভিত্তিতে রাজ্যপাল হস্তক্ষেপ করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে পূর্বে আফ্রিকার অন্তর্গত নাইজিরিয়ায় অনুরূপ পরিস্থিতিতে গভর্ণর এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council) অর্থাৎ ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ আদালত গভর্ণরের কার্যপদ্ধতিকে আনুপূর্বিক সমর্থন জানান। অনুরূপ পরিস্থিতিতে ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির রাজ্যপালদের হস্তক্ষেপের সমর্থনে প্রায়ই নাইজিরিয়ার নজির দেখানো হয়ে থাকে। বলা হয় যে, বিধায়কদের সই-সাবুদ জোগাড় করা ছাড়া রাজ্যপালের পক্ষে আইনসভায় দলগত অবস্থা যাচাই করার অন্য কোন পথ নেই, যদিও রাজ্যপাল অঙ্গরাজ্যের বিধানসভার একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাজ্যপাল কেন্দ্রের প্রতিনিধি। তাই এ রকম বিতর্ক কেন্দ্র-অঙ্গরাজ্যের সম্পর্ককে তিক্ত করতে পারে ও চরম অবস্থায় বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দিতে পারে। অবিলম্বে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট গণতান্ত্রিক নীতি প্রবর্তন করে সমস্ত বিতর্কের অবসানের ব্যবস্থা করা দরকার।

১৯৮৪ সালে জম্মু ও কাশ্মীর, সিকিম ও অন্ধ্রে মন্ত্রিসভা বরখাস্তের উদাহরণ ঃ নাইজিরিয়ার নজির ঃ রাজ্যপালের এ ধরনের ক্ষমতা সম্বন্ধে সংবিধান সংশোধন চাই

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যগুলি আব্রাহাম লিংকনের রাষ্ট্রপতি থাকার সময় যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রচেষ্টায় গৃহযুদ্ধ করেছিল। সেই গৃহযুদ্ধে অবশ্য বিভেদপন্থীগণ পরাস্ত হন এবং দেশের সর্বত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে প্রজাতন্ত্রী সংবিধান প্রচলিত হবার পর কেন্দ্রীয় সরকারের সার্বিক কর্তৃত্বকে সংবিধানরচয়িতাগণ একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, যাতে কোনও অঙ্গরাজ্যে যে কোনও অছিলায় কোন রকম বিভেদপন্থী সুবিধাবাদ মাথা তুলতে না পারে। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি ঝোঁক ভারতের জাতীয় ঐক্যকে ব্যাহত করতে পারে। সেই আশঙ্কায় ভারতে কানাডার মত কেন্দ্রাভিমুখী যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যপালের ভূমিকা সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত নেওয়াই সমীচীন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক শাসকরূপেই কাজ চালাবেন, কিন্তু জরুরী বা অস্বাভাবিক অবস্থায় তিনি কেন্দ্রের নির্দেশে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরূপেই (Agent) কাজ করবেন। এই ব্যাখ্যা অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যপালের পদমর্যাদা ব্যাখ্যা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং আইনসভায় অভিযুক্ত (Impeached) না হলে তাঁকে পদচ্যুত করা যায় না। কিন্তু কানাডার ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রদেশগুলির উপ-রাজ্যপালগণ (Lieutenant Governor) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও কানাডার অঙ্গরাজ্যের নজির

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাঁরা দায়ী থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনবোধে তাঁদের পদচ্যুত করতে পারেন।

॥ ভারতীয় অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী : তাঁর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ॥

ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের মত মন্ত্রিসভা-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের বিধানসভায় সাধারণ নির্বাচনের পর যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, তার নেতাই রাজ্যপাল কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রী (Chief Minister) রূপে রাজ্যমন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রিত হন। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে এমন কোনও বাধা নেই যার ফলে দ্বিকক্ষযুক্ত কোনও রাজ্য বিধানমণ্ডলের উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী-পদে নিযুক্ত করা চলবে না। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় যে, মাদ্রাজে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দলের বহু নেতা পরাজিত হন। তখন শ্রীভক্তবৎসলমের পরিবর্তে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীকে মাদ্রাজ বিধানমণ্ডলীর উচ্চকক্ষে সদস্য মনোনীত করে তাঁকেই তখনকার মত মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। অবশ্য সুক্ষ্ম গণতান্ত্রিক প্রথা অনুসারে ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলিতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেওয়া সমীচীন নয়। সুখের বিষয়, এ ধরনের ঘটনা আর ঘটে নি।

অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী : নিয়োগপদ্ধতি

রাজ্যপাল সংবিধানের ১৬৪ ধারা অনুসারে তাঁর সন্তুষ্টি (Pleasure) না থাকলে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করতে পারেন। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৮ই ডিসেম্বরের আগে বিধানসভার কাছে মন্ত্রিসভার আস্থানির্ণয়ের জন্য বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করতে সম্মত হন নি। ফলে রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে পদচ্যুত করেন। এই ধরনের ঘটনা ঐ সময় ভারতের একাধিক অঙ্গরাজ্যে ঘটে। তখন ঐ রাজ্যগুলির বিধানসভাগুলিতে কোনও একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। একাধিক দলের নেতাদের নিয়ে এক একটি অঞ্চলে এক একটি যৌথ-মন্ত্রিসভা গঠিত হত এবং বিধানসভার সদস্যগণ প্রায়ই এক দল থেকে অন্য দলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। কেবল এ ধরনের অস্বাভাবিক অবস্থাতেই রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে পদচ্যুত করতে পারেন, স্বাভাবিক অবস্থায় নয়—রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদ সম্পর্কে এই রকম ব্যাখ্যাটাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। সুতরাং সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার মতই মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের প্রকৃত শাসক বলে ধরে নেওয়াটা শাসনতন্ত্রের সঠিক ব্যাখ্যা বলেই মনে হয়। তবে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে প্রকৃত ক্ষমতাবান্ শাসকরূপে যেভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে সে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি।

কে প্রকৃত শাসক ? রাজ্যপাল না মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যমন্ত্রিসভার নেতা। রাজ্যপাল তাঁর সুপারিশক্রমে রাজ্যমন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন ও তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। তাঁদের মধ্যে কোনও বিষয় নিয়ে মতভেদ হলে মুখ্যমন্ত্রী তার মীমাংসা করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তাঁর নেতৃত্বেই রাজ্যমন্ত্রিসভা সুসংবদ্ধভাবে সরকারী নীতি গ্রহণ করে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাজ ঃ
(১) রাজ্যমন্ত্রিসভার নেতারূপে

শাসনবিভাগের নেতা রূপে মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ দায়িত্ব আছে। তিনি রাজ্যপালকে রাজ্যের শাসন ও আইনপ্রণয়ন সম্পর্কে নিয়মিতভাবে অবহিত করে থাকেন। রাজ্যপাল রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী প্রভৃতি ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারী আদেশ জারী হয়।

(২) শাসনবিভাগের নেতারূপে

রাজ্যের আইনসভার নেতা হিসাবেও মুখ্যমন্ত্রী কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। দ্বিকক্ষযুক্ত রাজ্য-বিধানমণ্ডলীতে সাধারণতঃ তিনি বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতারূপে বিধানসভার স্পীকার এবং বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে বিধানসভায় বিতর্কের অনুষ্ঠানসূচী স্থির করেন। রাজ্যপালকে তিনিই বিধানমণ্ডলের অধিবেশন ডাকতে, মুলতুবি রাখতে বা বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন আহ্বান করবার অনুরোধ জানাতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বিধানসভার অবিসম্বাদিত নেতা (Leader of the House) রূপে এই ধরনের প্রচুর ক্ষমতা থাকার ফলে তাঁর দলের সদস্যগণ অকালে পুনরায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনা এড়াবার জন্য মোটামুটিভাবে তাঁর সিদ্ধান্ত সমর্থন করেই চলেন।

(৩) আইনসভার নেতারূপে

দলীয় নেতারূপেও মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ ভূমিকা আছে। তিনি সাধারণতঃ রাজ্যের বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নির্বাচিত নেতা। সুতরাং বিভিন্ন সভাসমিতিতে তিনি যে ভাষণ দিয়ে থাকেন সেগুলি রাজ্যসরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচী রূপে তাঁর দলের কর্মসূচীগুলিকেই সাধারণ্যে প্রচার করে থাকে। ফলে তাঁর দল তাঁর নেতৃত্বে জনগণের খুব কাছাকাছি আসতে পারে। তাই সাংবাদিক-সম্মেলন, বেতারভাষণ, দূরদর্শনে অংশগ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করেন। রাজ্যে খরা, প্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কিংবা প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস প্রভৃতি জাতীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রদত্ত তাঁর বাণী শুধু রাজ্যের জনগণের কাছেই নয়, সমগ্র ভারতেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

(৪) দলীয় নেতারূপে

অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে বলেন যে, তিনিই রাজ্যর প্রধান শাসক, কারণ, রাজ্যপাল নামসর্বস্ব শাসকমাত্র। কিন্তু এই বক্তব্যের বিরুদ্ধেও অনেক যুক্তি আছে। প্রথমতঃ, সংবিধান অনুসারে রাজ্যপালের "স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার" ক্ষেত্রে রাজ্যপাল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। সে ক্ষেত্রে তিনি

মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতিকে অঙ্গরাজ্য সম্পর্কে নিয়মিত নানা বিবৃতি পাঠিয়ে তাঁকে অঙ্গরাজ্য সম্পর্কে নানা বিষয়ে অবহিত করে থাকেন। এর চরম পরিণতিরূপে রাষ্ট্রপতি ঐ অঙ্গরাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন। সুতরাং রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে সাংবিধানিক সম্পর্কটা সম্পূর্ণ দ্বিপাক্ষিক। কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক, যে দল কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে তার সঙ্গে অঙ্গরাজ্যের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সম্পর্ক ইত্যাদি বিবিধ রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্তরের ওপর নির্ভর করে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের সাংবিধানিক সম্পর্ক।

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

॥ ভারতের অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রিসভা ॥

ভারতীয় সংবিধানের ১৬৩ ধারা অনুসারে ভারতের প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যে রাজ্যপালকে উপদেশ ও পরামর্শ দেবার জন্য একটি রাজ্যমন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সংবিধানের ১৬৪ ধারা অনুসারে সাধারণতঃ রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন ও তাঁর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। রাজ্য-বিধানসভার সদস্য না হলে মন্ত্রী নিযুক্ত হবার ৬ মাসের মধ্যেই তাঁকে বিধানমণ্ডলের সদস্য হতে হবে। রাজ্য-মন্ত্রিসভার মন্ত্রিগণ সাধারণতঃ রাজ্যবিধানসভার কাছে দায়ী থাকেন। তবে সংবিধানের ১৬৩(২) ধারা অনুসারে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করতে পারেন। ভারতে অঙ্গরাজ্য শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন সময়ে যে নজির সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রাজ্যপাল সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি। তাই তাঁর বিবেচনায় বিধান-সভায় মন্ত্রিসভা আস্থাভাজন আছেন কিনা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকলে তিনি তাঁর রাজ্যের মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করতেও পারেন।

অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রিসভা ঃ নিয়োগপদ্ধতি

সংবিধানে এ বিষয়ে কোনও সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও সাধারণতঃ রাজ্যমন্ত্রি-সভায় ক্যাবিনেট সদস্য, রাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রী এই তিন রকম মন্ত্রী থাকেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন, তাঁদের দপ্তরের কার্যকলাপের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন, তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য দূর করার ব্যবস্থা করেন। তিনিই রাজ্যের ক্যাবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন ও রাজ্য-পালকে মন্ত্রিসভার কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত করেন।

৩ রকমের মন্ত্রী থাকেন

রাজ্য বিধানমণ্ডলে রাজ্যমন্ত্রিসভার মন্ত্রিগণ প্রশ্নোত্তর দেন, আইনসভার বাজেট অধিবেশনে নিজ নিজ বিভাগের ব্যয়বরাদ্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রস্তাব পেশ করেন। এ সময় তাঁদের দপ্তরের কার্যকলাপ সম্পর্কে সমালোচনা হলে মন্ত্রিগণ তার কৈফিয়ৎ দেন।

মন্ত্রীদের কাজ

রাজ্য মন্ত্রিসভার বিভিন্ন মন্ত্রীদের সাহায্য করে থাকেন রাজ্যসরকারের আমলাতন্ত্র বা কৃত্যক। মন্ত্রিগণ তাঁদের দলগত নীতি ও রাজ্য বিধানমণ্ডলে ঘোষিত নীতি আমলাদের জানান, আমলাগণ তদনুসারে তাঁদের পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে থাকেন।

আমলাদের ভূমিকা

॥ ভারতের কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের আইনসভা : প্রাথমিক আলোচনা ॥

সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভাই (Legislature) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। ফলে সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে এই বিভাগের ক্ষমতাই সববেয়ে বেশী। চীনের পরলোকগত রাষ্ট্রপতি মাও সে-তুং নাকি উপহাস করে বলতেন যে, পার্লামেণ্ট্ বা আইনসভা হল "শুয়োরের খোঁয়াড়," কারণ তাঁর মতে, ধনতান্ত্রিক দেশে পুঁজিপতিদের শ্রেণীস্বার্থেই আইনসভা পরিচালিত হয় এবং তারাই আইনসভার সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করে থাকে। বিরোধী দলগুলি সাজানো কলের পুতুল বা কাগুজে বাঘের মত নড়াচড়া করে। সমাজতন্ত্রবাদী লেখকদের সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে এই ধরনের বক্রোক্তির মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত থাকলেও ধনতান্ত্রিক দেশেও সংসদীয় গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা বা তার আইনসভাকে অহেতুক নিন্দা করার অর্থ কঠিন বাস্তবকে অস্বীকার করা। সংসদীয় গণতন্ত্রকে অবলম্বন করেই অনেক পুঁজিবাদী দেশ উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে, অন্ততঃ সমাজতন্ত্রী দেশগুলির মতই উন্নত হ:তে পেরেছে। তা ছাড়া সাম্যবাদী দেশগুলিতে মাও সে-তুং এর মত একনায়কতন্ত্রী শাসকের লোকান্তরের পর যে ক্ষমতার লড়াই দেখা দেয়, তার বদলে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্র অনেক সহজে এবং শান্তি-পূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের আয়োজন করে। এই সমস্ত কথা মনে রেখে ধ্রুপদী শাসনতন্ত্রবিদ্গণ গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্রস্থলরূপে আইনসভার প্রতি কেন এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা সহজেই বোঝা যায়। তাঁদের ভাষায় বলা চলে যে, আইনসভা বা ব্যবস্থাপক সভা গণতন্ত্রে জনমতকে প্রতিবিম্বিত করে। জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ ঠিকই বলেছেন যে, ব্যবস্থাপক সভা জনমতের মুকুরস্বরূপ ("Parliament is the mirror of public opinion")।

কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের আইনসভা : প্রাথমিক আলোচনা

॥ আইনসভার কাজ ॥

আইনসভার প্রথম কাজ হল আইনপ্রণয়ন। সমাজতত্ত্ববিদ্গণের মতে প্রচলিত প্রথাগত বিধিগুলিকেই (customary law) আইনসভা রাষ্ট্রীয় আইনরূপে বিধিবদ্ধ করে। জনমতের গতি এবং প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই আইনসভা এ কাজ সম্পাদিত করে। আইন প্রণয়নের সঙ্গে আইনের রদবদলও জড়িত।

আইনসভার কাজ :
(১) আইনপ্রণয়ন

(২) শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ

দ্বিতীয়তঃ, সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা অর্থাৎ শাসনবিভাগ সম্পূর্ণভাবে আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে। আইনসভা (দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় আইনসভার নিম্নকক্ষ) অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করলে মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। অন্যান্য শাসন-ব্যবস্থাতেও সরকারী কর্মচারী নিয়োগ, যুদ্ধঘোষণা, চুক্তি-অনুমোদন ইত্যাদি শাসনবিভাগীয় কার্য আইনসভার অনুমোদনসাপেক্ষ।

(৩) বিধায়কদের নিয়ন্ত্রণ

তৃতীয়তঃ, আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভাকে কিছু কিছু বিচারবিভাগীয় কাজও করতে হয়। বিধায়কদের আচরণবিধি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে আইনসভা বিচারালয়ের সমান ক্ষমতার অধিকারী। এইভাবে ভারতের লোকসভা ১৯৭৯ সালে চিকমাগালুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সদস্যপদ খারিজ করে দিয়েছিল ও পরে ১৯৮১ সালে সেই রায় প্রত্যাহার করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। অনেক সময় অভিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিচারবিভাগীয় তদন্তের জন্য নির্দেশ দান, কমিশন গঠন প্রভৃতি বিচারবিভাগীয় কাজ আইনসভা সম্পাদন করে। ইংলন্ডে পার্লামেণ্টের উচ্চকক্ষ লর্ডস্ সভা (House of Lords) ৭ জন আইনজ্ঞ সদস্য (Seven Law Lords) নিয়ে যে বিচারসভা গঠন করে, সেই বিচারসভাই দেশের সর্বোচ্চ আপীলবিভাগীয় আদালতরূপে কাজ করে।

(৪) সাংবিধানিক

চতুর্থতঃ, সুইজারল্যাডে যুক্তরাষ্ট্রীয় উচ্চতম আদালতের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভাই সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকার রূপে কাজ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলন্ড, ভারত প্রভৃতি দেশে আইনসভা সংবিধান সংশোধনের কাজও করে থাকে।

(৫) জনমত গঠন ও প্রতিফলন

পঞ্চমতঃ, আইনসভা জনমতের দর্পণস্বরূপ। বিধায়কগণ নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার সমস্যাগুলি এখানে উপস্থাপিত করেন, রাষ্ট্রের সাধারণ সমস্যাবলী ও তার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসনবিভাগ এগুলির দিকে নজর রেখে আইন প্রণয়ন করে।

(৬) ব্যয়বরাদ্দ নির্ধারণ

ষষ্ঠতঃ, আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা যেমন মন্ত্রিসভার ওপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে, তেমনি সরকারের আয়ব্যয়ের ওপরও কর্তৃত্ব চালিয়ে থাকে। আইনসভায় বাৎসরিক ব্যয়বরাদ্দ সংক্রান্ত বিল অর্থাৎ বাজেট পেশ করা হয় এবং আইনসভা এই বিল গ্রহণ করলে সরকারের ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর হয়, মন্ত্রিসভাও আইনসভার কাছে আস্থাভাজন রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া কর ধার্য করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে কেন্দ্র করেই ইংলন্ডে স্বৈরাচারী রাজা প্রথম চার্লসের সঙ্গে সংসদের তীব্র বিরোধ শুরু হয়। পরে এই বিরোধ গৃহযুদ্ধে পরিণত হয় এবং অবশেষে স্বৈরাচারী রাজার শিরশ্ছেদের মধ্য দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। করদানের সঙ্গে আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের এই দাবির ওপর ভিত্তি করেই ১৭৭৬

খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তারা ধ্বনি তোলে, "প্রতিনিধিত্ব না থাকলে কর দেওয়া হবে না" ("No taxation without representation.")।

(৭) সংবিধান রচনা

সপ্তমতঃ, কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা অনুসরণ করে আইনসভা গণপরিষদরূপে (Constituent Assembly) কাজ করে। উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় সংবিধান রচনার জন্য তৎকালীন আইনসভা বিশেষ ব্যবস্থা অনুযায়ী গণপরিষদরূপে গঠিত হয় এবং এই পরিষদই ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান রচনা করে।

(৮) নির্বাচনী ক্ষমতা

অষ্টমতঃ, ভারতে রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষ এবং অঙ্গরাজ্যের আইনপরিষদের নিম্নকক্ষগুলি নির্বাচনী সংস্থা (Electoral College) রূপে কাজ করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ডেও আইনসভা এ ধরনের কাজ করে থাকে।

॥ আইনসভার সংগঠন ॥

এককক্ষযুক্ত ও দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা

সাংগঠনিক দিক থেকে দেখলে আধুনিক রাষ্ট্রগুলির আইনসভা এককক্ষযুক্ত (Unicameral) বা দ্বিকক্ষযুক্ত (Bicameral) রূপে গঠিত হতে পারে। চীন, আগেকার পাকিস্তান প্রভৃতি রাষ্ট্রে আইনসভা এককক্ষযুক্ত। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত রাশিয়া, ইংলণ্ড্ প্রভৃতি রাষ্ট্রে আইনসভা দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত।

২য় কক্ষের গঠনপদ্ধতি

দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভার গঠনপদ্ধতি সব রাষ্ট্রে এক রকম নয়। সাধারণতঃ আইনসভার যে কক্ষের সদস্যগণ অবাধ নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন, তাকে আইনসভার নিম্নকক্ষ (Lower House) বলে। জনগণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত বলে এই কক্ষের ক্ষমতা উচ্চকক্ষের ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশী। সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে, প্রকৃতপক্ষে, আইনসভার নিম্নকক্ষের প্রাধান্যই সূচিত হয়।

ইংলণ্ডের নজির

বিভিন্ন রাষ্ট্রে আইনসভার উচ্চকক্ষের গঠনপদ্ধতি এক নয়। ইংলণ্ডে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যাজকগণ এবং সামন্তবর্গ উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে বিভিন্নভাবে মন্ত্রণাসভায় যোগ দিতে শুরু করেন। সৈন্যবিভাগের প্রধানগণ নিম্নশ্রেণীর যাজক, সামন্ত এবং সাধারণ নাগরিকদের (burghers) সঙ্গে মন্ত্রণাকক্ষে যোগ দিতেন। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে ব্রিটিশ্ পার্লামেণ্ট্ উচ্চ এবং নিম্নকক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরে উচ্চশ্রেণীর সামন্তবর্গের জ্যেষ্ঠ পুত্রগণ তাঁদের উত্তরাধিকারসূত্রে (Law of Primogeniture) উচ্চকক্ষের অর্থাৎ লর্ড্স্ সভার সদস্যরূপে স্বীকৃত হন। কানাডায় গভর্নর জেনারেল উচ্চ পরিষদের বা সেনেটের (Senate) সভ্যদের আজীবন সদস্যরূপে মনোনয়ন করে থাকেন। ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যগণ পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির দ্বারা নির্বাচিত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কতকগুলি দেশে ভোটদাতাগণ প্রত্যক্ষভাবে উচ্চকক্ষের সভ্যদের নির্বাচিত করেন।

একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট্ অর্থাৎ উচ্চকক্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য প্রধান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে বর্তমানে আইনসভার উচ্চকক্ষের কোনও প্রকৃত ক্ষমতা নেই। ইংলণ্ডে ১৯১১ সালে এবং ১৯৪৯ সালে লর্ড্স্ সভার হাত থেকে অর্থসংক্রান্ত বিল বাতিল করার এবং অন্যান্য বিল বাতিল করার ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বিলটিকে আটকে রাখার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেনেটের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা রাখার পেছনে একটা ঐতিহাসিক পটভূমিকা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় মঁতেস্কিএ-র ক্ষমতাবিভাজন নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করাই মার্কিন সংবিধানের রচয়িতাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য তাঁরা শাসনতন্ত্রের মধ্যে এমনভাবে আইনসভা ও শাসনবিভাগের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার (Checks and Balances) ব্যবস্থা করেন যে তার ফলে সরকারের তিনটি বিভাগই নিজের নিজের কর্তৃত্বের এলাকায় এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা হিসাবে কাজ করতে পারে। তাই আইনসভার প্রত্যেকটি কক্ষকেই তাঁরা সমান অধিকার দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কালক্রমে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত এবং প্রবীণ নেতাগণই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার বা কংগ্রেসের (Congress) উচ্চকক্ষের অর্থাৎ সেনেটের সদস্যপদে অধিষ্ঠিত হতে থাকেন। তার ফলে, মার্কিন সেনেট্ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চপরিষদরূপে খ্যাতি অর্জন করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নজির

॥ এককক্ষযুক্ত বনাম দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা ॥

আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ থাকা উচিত কিনা—এ প্রসঙ্গ নিয়ে এক সময়ে বিরাট বিতর্ক দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে বহু রাষ্ট্রনীতিবিদ্ নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেছেন ও নানা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন।

২য় কক্ষের সার্থকতা

দ্বিতীয় কক্ষের সমর্থনে যুক্তিগুলি হলঃ প্রথমতঃ, এককক্ষযুক্ত আইনসভা স্বভাবতঃই স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে। জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্, লর্ড্ ব্রাইস্ ও লর্ড্ অ্যাক্টন্ বলেন যে, সমক্ষমতাসম্পন্ন দুটি কক্ষ থাকলে এ ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা দূর হয়। দুটি কক্ষ থাকলে একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

(১) একটি কক্ষের স্বৈরচার দূর হবে

দ্বিতীয়তঃ, লর্ড্ অ্যাক্টন্ মনে করেন যে, আইনসভার দুটি কক্ষ থাকলে ব্যক্তিস্বাধীনতা নিরাপদ থাকে। ব্যক্তিকে তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটিমাত্র কক্ষের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয় না।

(২) ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা

তৃতীয়তঃ, লেকীর মতে, আইনসভার দুটি কক্ষ থাকলে সুচিন্তিতভাবে জনগণের পক্ষে কল্যাণকর আইনপ্রণয়ন সম্ভব হয়। একটিমাত্র কক্ষ অনেক সময় তাৎক্ষণিক আবেগ বা উত্তেজনার চাপে অবাঞ্ছনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারে। কিন্তু নিম্ন পরিষদে আইনের খসড়াটি অনুমোদিত হবার পর উচ্চ পরিষদে সেটি নিয়ে পুনরায় বিতর্ক, আলোচনা চলতে পারে। সেখানে সতর্কভাবে, ধীরভাবে ও বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে খসড়াটি সম্বন্ধে

(৩) সুচিন্তিত আইন-প্রণয়নের সম্ভাবনা

আলোচনা হতে পারে। ফলে, জেনিংস্ এই কাজটি সুসম্পাদনের জন্য ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের লর্ড্স্ সভার প্রশংসা করেছেন।

চতুর্থতঃ, আইনসভার একটিমাত্র কক্ষ থাকলে জনমতের গতিশীলতা যাচাই করা কঠিন হয়। দুটি কক্ষ থাকলে ও তাদের নির্বাচনের সময় পৃথক্ হলে এই গতিশীলতার পরিমাপ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়।

(৪) জনমত যাচাই

পঞ্চমতঃ, দ্যুগুই বলেন যে, সংখ্যালঘু শ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণের জন্য দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা দরকার। আইনসভার একটি কক্ষে প্রত্যক্ষ নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার ফলে সংখ্যালঘুগণ তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাতে সক্ষম হন না। আইনসভার অপর কক্ষে মনোনয়ন পদ্ধতি বা পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি চালু থাকলে সেখানে সংখ্যালঘুগণ প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পান। এই কারণে মার্ক্স্‌বাদীগণ সোবিয়েত আইনসভায় উচ্চ কক্ষ স্থাপনের যৌক্তিকতা সমর্থন করেছেন। তাঁদের মতে, এর ফলে সোবিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক, সংস্কৃতিভিত্তিক বিভিন্ন প্রজাতি-গোষ্ঠী (ethnic groups) আইনসভার উচ্চকক্ষে সমপ্রতিনিধিত্বের মধ্য দিয়ে তাঁদের নিজেদের প্রজাতিগত স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের সুযোগ পান, অথচ সামগ্রিকভাবে সোবিয়েত সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেন।

(৫) সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা ঃ মার্ক্স্-বাদীদের মত

ষষ্ঠতঃ, আধুনিক আইনসভাগুলিকে জনজীবনের বিভিন্ন জটিল দিক নিয়ে আইনপ্রণয়নে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে, আইনসভায় আইনের খসড়া নিয়ে বিশদভাবে আলাপ-আলোচনার মত সময় আইন-সভার থাকে না। আইনসভার দ্বিতীয়কক্ষ এই বিশদ আলোচনা ও পুনরালোচনার আসর (a revising body) হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এ ক্ষেত্রেও ইংলণ্ডের লর্ড্স্ সভার ভূমিকা স্মরণীয়।

(৬) আইনের পুনরালোচনা

সপ্তমতঃ, নির্বাচনী ও দলীয় নীতির ভিত্তিতে গঠিত হলে এক কক্ষযুক্ত আইনসভায় স্বাধীনচেতা, জ্ঞানীগুণীগণ অংশ নেন না। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যয়, উত্তেজনা, দলবাজি প্রভৃতি তাঁরা পছন্দ করেন না। আইনসভার উচ্চ কক্ষে এ-ধরনের বিশিষ্ট গুণীদের মনোনয়ন করলে সমাজ ও রাষ্ট্র তাঁদের সেবালাভের সুযোগ পায়, তাঁদের প্রজ্ঞা, প্রত্যক্ষ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দেশের কাজে লাগে।

(৭) ২য় কক্ষে জ্ঞানী-গুণীদের মনোনয়নের সুবিধা

অষ্টমতঃ, আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষে বৃত্তিগতভাবে বা সাংস্কৃতিক স্বার্থে বিশিষ্ট গুণীদের মনোনীত করা যায়। ভারতের রাজ্যসভার ও অঙ্গরাজ্যগুলির উচ্চ পরিষদে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ললিতকলা, সমাজসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যক্তিদের মনোনয়নের ব্যবস্থা এ-ক্ষেত্রে স্মরণীয়।

(৮) বিশেষ প্রতি-নিধিত্ব ব্যবস্থা সম্ভব

নবমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা আবশ্যক বলে মনে করা হয়। নিম্ন পরিষদ রাষ্ট্রের সমস্ত অঞ্চলের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের

নিয়ে গঠিত হয়। উচ্চ পরিষদে সেই অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থরক্ষার জন্য সম-প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসরণ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চ কক্ষে অর্থাৎ সেনেটে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যের আয়তন ও জনসংখ্যার বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি থেকে ২ জন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। কিন্তু ভারতীয় পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভার গঠনের ক্ষেত্রে এই সমপ্রতিনিধিত্ব নিয়মটি অনুসরণ করা হয় না। অপরপক্ষে, মার্কিনী সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞদের মতে, দ্বিকক্ষযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা বা সেনেট্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঐক্য সংগঠনে প্রচুর সাহায্য করেছে।

(৯) যুক্তরাষ্ট্রে অপরিহার্য

দশমতঃ, আইনসভার দুটি কক্ষ থাকলে দুটি বিভিন্ন কক্ষের বিধায়কগণের যুক্তি ও তথ্য নানা দিক থেকে বিতর্ককে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ব্যাপক করে তোলে। এগুলি সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন, সভা-সমিতি ইত্যাদি শ্রাব্য ও দৃশ্য জনসংযোগ মাধ্যমগুলির (audio-visual mass media) দ্বারা প্রচারিত হয়। তাই বলা হয় যে, আইনসভা দ্বিকক্ষযুক্ত হলে জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা প্রসারিত হয়।

(১০) জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষাবৃদ্ধি

একাদশতঃ, গেটেল্ বলেছেন যে, আইনসভার দুটি কক্ষ থাকলে প্রত্যেক কক্ষ অপরটির নিয়ন্ত্রকরূপে কাজ করে থাকে। এভাবে ব্যস্ত থাকার দরুন আইনসভা শাসনবিভাগের ওপর অযথা কর্তৃত্ব করতে পারবে না। ফলে, শাসনবিভাগ ভালভাবে কাজ করতে পারবে।

(১১) ২টি কক্ষের একে অপরের নিয়ন্ত্রক

দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভার বিপক্ষে যুক্তিগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, গণতান্ত্রিক বিচারে আইনসভা সম্পূর্ণভাবে নির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় পরিষদে বিশেষ শ্রেণীর বা স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের অর্থ হল ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব। এর দরুন দ্বিতীয় কক্ষ রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে দাঁড়ায়। সমাজতন্ত্রী ল্যাস্কি এই দিক থেকেই ইংলণ্ডের লর্ড্‌স্ সভাকে ধনিক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল প্রতিভূ বলে সমালোচনা করেছেন। ল্যাস্কির মতে, লর্ড্‌স্ সভা অগণতান্ত্রিক, কারণ এখানে মনোনীত সদস্যদের প্রাধান্য এবং প্রধানতঃ লর্ডদের জ্যেষ্ঠপুত্রগণের উত্তরাধিকারসূত্রে সদস্যপদ থাকার ফলে এই সভা সরকারের প্রগতিশীল আইনকানুন বাতিল করার চেষ্টা করে থাকে।

২য় কক্ষের বিপক্ষে যুক্তি ঃ (১) ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে ল্যাস্কি আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ রাখার আবশ্যকতা স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয় থাকার ফলে এবং সংবিধানের অভিভাবকত্ব বিচারবিভাগের হাতে থাকার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থরক্ষার জন্য উচ্চ পরিষদ রাখা অনাবশ্যক। অনেক সময় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষই একই রাজনৈতিক দলগুলির দলবাজির আখড়ায় পরিণত হয়।

(২) যুক্তরাষ্ট্রেও আবশ্যক নয় (ল্যাস্কি)

তৃতীয়তঃ, দ্বিতীয় কক্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা থাকলে সেই সম্প্রদায় বরাবর স্বাতন্ত্র্যপ্রার্থী হবে। জাতীয় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে এর কুফল মারাত্মক। তাছাড়া, সংবিধানের নানাপ্রকার বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারাও সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করা যেতে পারে।

(৩) সংখ্যালঘু স্বার্থের জন্যও অনাবশ্যক

চতুর্থতঃ, বলা হয় যে, এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভাতেও সুচিন্তিতভাবে আইনপ্রণয়ন সম্ভব। প্রতিটি আইনের খসড়া বা "বিল" (Bill) ধারাবাহিকভাবে আইনসভায় আলোচিত হয়। এই আলোচনা সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদির সাহায্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এর ফলে বিলটির পক্ষে বা বিপক্ষে জনমত সৃষ্টি হয়। এই জনমতই বিলটির ভাগ্য নির্ণয় করে।

(৪) জনমতই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ

পঞ্চমতঃ, আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ থাকলে আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে অযথা বিলম্ব দেখা দেয়। একই রাজনৈতিক দলগুলির নির্দেশেই আইনপ্রণয়ন নীতি ও বিলের ধারাগুলির ওপর বিতর্ক চলে, একইভাবে ভোটাভুটি হয়। একই যুক্তিতর্কের পুনরাবৃত্তি হয়।

(৫) অযথা বিলম্ব

ষষ্ঠতঃ, ফরাসী লেখক আবে সিএ (Abbe Sieyes) বলেন যে, উচ্চকক্ষ আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে যদি নিম্নকক্ষের সঙ্গে একমত হয়, তা হলে উচ্চকক্ষ অনাবশ্যক, বাহুল্যমাত্র ; যদি একমত না হয়, তা হলে উচ্চকক্ষ অনিষ্টকর ("If the Upper House agrees to the Lower House, it is superfluous ; if it disagrees, it is pernicious.")। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভার দুটি কক্ষে যখন দুটি বিভিন্ন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, তখন তাদের সংঘাত অনেক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

(৬) অনাবশ্যক অথবা অবাঞ্ছিত : আবে সিএ-র মত

সপ্তমতঃ, আইনসভার দুটি কক্ষ থাকলে প্রত্যেকে অপরের ওপর দোষারোপের চেষ্টা করে। ফলে, তাদের প্রত্যেকের দায়িত্বনির্ণয় কঠিন হয়ে পড়ে। একটিমাত্র কক্ষ থাকলে তা হয় না।

(৭) দুটি কক্ষের রেষারেষি

অষ্টমতঃ, গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থা চালু থাকে। একই দল উভয় পরিষদে প্রতিনিধি পাঠায়। সংসদীয় গণতন্ত্রে যে-দল নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে, সেই দলের নেতারাই নিজেদের দলের সমর্থকদের উচ্চ কক্ষে মনোনীত করে। ফলে, দ্বিতীয় কক্ষ থাকলেও কার্যতঃ সেখানে দলবাজি চলার ফলে যোগ্য জ্ঞানীগুণীগণ মনোনীত হতে পারেন না।

(৮) জ্ঞানীগুণীদের অসুবিধা

নবমতঃ, আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ ব্যয়বহুল। কারণ, নিম্নকক্ষের মত উচ্চ কক্ষের বিধায়কদের জন্যও বেতন, ভাতা ইত্যাদি বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়।

(৯) ব্যয়বাহুল্য

দশমতঃ, আইনসভার দুটি কক্ষ থাকলে আইনপ্রণয়ন বিলম্বিত হয়। জরুরী অবস্থায় এই বিলম্ব অনেক সময় রাষ্ট্রের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। অন্য সময়েও জনস্বার্থে আইনপ্রণয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(১০) জরুরী ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত

একাদশতঃ, পৃথিবীর বেশীর ভাগ রাষ্ট্রেই আইনসভার নিম্ন কক্ষ উচ্চ কক্ষের তুলনায় বেশী শক্তিশালী। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে উচ্চ কক্ষের কোন ক্ষমতা থাকে না, সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা আইনসভার নিম্ন কক্ষের কাছেই দায়ী থাকে।

(১১) বেশীর ভাগ রাষ্ট্রেই আইনসভার ২টি কক্ষ

দ্বাদশতঃ, গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে চাই সার্বিক ঐক্য ও সংহতি। আইনবিভাগের ক্ষেত্রেও দুটি কক্ষ থাকলে পারস্পরিক হিংসা ও রেষারেষির দরুন আইনবিভাগের ঐক্য ও সংহতি ব্যাহত হবার সম্ভাবনা।

(১২) জাতীয় সংহতি ব্যাহত

॥ উপসংহার : বহু ক্ষেত্রে আইনসভা দ্বিকক্ষযুক্ত ॥

আইনসভার এক কক্ষ বনাম দ্বিকক্ষ এই নিয়ে যে বিতর্ক চলেছে, সে সম্পর্কে চূড়ান্ত কিছু বলা সহজ নয়। ১৯১৭ সালে ইংলণ্ডে লর্ড ব্রাইসের নেতৃত্বে এ বিষয়ে বিবেচনার জন্য যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেই সম্মেলন দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। তাঁদের সুপারিশ অনুযায়ী দ্বিতীয় কক্ষ নিম্ন কক্ষে গৃহীত আইনের খসড়াগুলি পরীক্ষা করবে এবং তার সংস্কার সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করবে। দুটি কক্ষের দ্বারা গ্রহণযোগ্য আইনগুলি দ্বিতীয় কক্ষ বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করবে। সংবিধান পরিবর্তন সম্বন্ধে কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনপ্রণয়ন সম্বন্ধে জনগণকে ভালভাবে চিন্তা করে দেখবার জন্য উপযুক্ত সময় ও সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় কক্ষ আইনপ্রণয়নে প্রয়োজনমত বিলম্ব ঘটাবে।

দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা : ব্রাইস্ কমিটির সুপারিশ

লর্ড্‌স্ সভার কৃতিত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে জেনিংস্ মন্তব্য করেছেন যে, অর্পিত আইনপ্রণয়নব্যবস্থা (Delegated Legislation) অনুসারে কমন্স্‌সভা আইনের খুঁটিনাটি সম্পর্কে বিস্তৃততর আইনপ্রণয়নের জন্য যে-ক্ষমতা শাসনবিভাগকে দিয়ে থাকে, তার ভিত্তিতে রচিত সরকারী হুকুমনামা (Orders-in-Council)-গুলি লর্ড্‌স্ সভা খুব সতর্কভাবে এবং যোগ্যতার সঙ্গে আলোচনা করে থাকে।

লর্ড্‌স্ সভার সার্থকতা

ব্রাইস্ আদর্শ উচ্চকক্ষ কিভাবে গঠিত হওয়া উচিত, তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ইংলণ্ডে লর্ড্‌স্ সভার অধিকাংশ সদস্যদের বংশপরম্পরায় আসনলাভের ব্যবস্থা তিনি সমর্থন করেন না। তাঁর মতে, ৮৫০ জনেরও অধিক লর্ড্‌স্ সভার সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে একটি ক্ষুদ্রতর লর্ড্‌স্ সভা উচ্চকক্ষরূপে ইংলণ্ডে আরও ভালভাবে কাজ করতে পারবে। তিনি উচ্চকক্ষ গঠনের জন্য দুটি প্রস্তাব করেন। প্রথমটি হল নিম্নকক্ষের সদস্যদের দ্বারা উচ্চকক্ষের সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন। এ প্রসঙ্গে লিস্-স্মিথ্ (Lees-Smith) নরওয়েতে অনুরূপভাবে দ্বিতীয় কক্ষ গঠনের জন্য যে ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, তা স্মরণীয়। ব্রাইসের দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুসারে, আইনসভার নিম্নকক্ষ একটি পৃথক্ নির্বাচকমণ্ডলী বা কমিশন গঠন করবেন এবং সেই কমিশন দ্বিতীয় কক্ষ গঠন করবে।

আদর্শ ২য় কক্ষ : ব্রাইসের মত

আধুনিক শাসনতন্ত্রগুলিতে দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা সব সময়ে রাখা হয় না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বহু রাষ্ট্রে এককক্ষযুক্ত আইনসভা গঠিত হয়। ইংলণ্ডে ১৯৪৯ সালের পার্লামেণ্ট্ আইন (Parliament Act, 1949) অনুসারে লর্ডস্‌সভা গুরুত্বপূর্ণ আইনের খসড়া কমন্স্‌সভায় গৃহীত হবার পর দীর্ঘকাল ধরে সেটিকে আটকে রাখার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯১১ সালের পার্লামেণ্ট্ আইন (Parliament Act, 1911) অনুসারে লর্ডস্‌সভা অর্থসংক্রান্ত বিল সম্পর্কে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হন। বর্তমানে প্রায় সব গণতন্ত্রেই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নিম্নকক্ষের প্রাধান্যই সূচিত হয়। অর্থাৎ আইনসভার উচ্চকক্ষ অর্থসংক্রান্ত বিল বাতিল করতে পারে না এবং কেবলমাত্র নিম্নকক্ষই অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবের মারফত মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করতে পারে। তাছাড়া, যে-সব রাষ্ট্রে আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ রয়েছে, সেখানেও দ্বিতীয় কক্ষের গঠনপদ্ধতি এক রকম নয়। কানাডায় উচ্চ কক্ষের সদস্যগণ সম্পূর্ণভাবে গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হন।

লর্ডস্ সভার ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বিকক্ষযুক্ত। নিম্নকক্ষ অর্থাৎ লোকসভা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভার বেশীর ভাগ সভ্যই বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। রাজ্যপরিষদের সদস্যনির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য থেকে সমানসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাবার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভারতে অনুসরণ করা হয় নি। ভারতের কোন কোন অঙ্গরাজ্যে আইনসভার একটিমাত্র কক্ষ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা প্রবর্তিত হয়, কিন্তু ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ (West Bengal Legislative Council) অবলুপ্ত করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেবলমাত্র লোকসভার কাছেই মন্ত্রিসভা দায়ী থাকে এবং লোকসভাই অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। অনুরূপভাবে অঙ্গরাজ্যের শাসনব্যবস্থায় দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভার ক্ষেত্রে রাজ্যমন্ত্রিসভা নিম্নকক্ষের বা বিধানসভার কাছে দায়ী থাকে এবং বিধানসভাই অর্থবিষয়ক ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে প্রয়োগ করার অধিকারী। এর সাংবিধানিক তাৎপর্য হল—ভারতে আইনসভার নিম্নকক্ষকেই বেশী গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে।

ভারতে কেন্দ্রে ও অঙ্গরাজ্যে কোথাও কোথাও আইনসভার ২টি কক্ষ

॥ ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা : গঠন ও কার্যক্রম ॥

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা বা পার্লামেণ্ট্ দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত। নিম্নকক্ষটি হল লোকসভা (House of the People) এবং উচ্চকক্ষটি হল রাজ্যসভা (Council of States)। কেন্দ্রীয় আইনসভার একটি অংশ হলেও রাষ্ট্রপতি তার সদস্য নন এবং আইনসভার অধিবেশনে আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে ভাষণদান ছাড়া কোনভাবে এর অধিবেশনে যোগদান করেন না।

কেন্দ্রীয় আইনসভার ২টি কক্ষ : লোকসভা, রাজ্যসভা

লোকসভার বর্তমান সদস্যসংখ্যা অনধিক ৫৪৫ জন। প্রাপ্তবয়স্কগণ, অর্থাৎ অন্ততঃ ২১ বছর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিকগণ এর সদস্য নির্বাচিত করতে পারেন। অঙ্গরাজ্যগুলি থেকে ৫২৫ জন এবং কেন্দ্রশাসনাধীন অঞ্চলগুলি থেকে ২০ জন সদস্য নিয়ে এই সভায় অনধিক ৫৪৫ জন সদস্য থাকেন। ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত অনুন্নত বর্ণ এবং উপজাতীয় (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) সম্প্রদায়ের জন্য লোকসভায় আসন সংরক্ষিত। সংবিধানের ৩৩১ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে ইঙ্গভারতীয়দের (Anglo-Indians) মধ্য থেকে দুজন সদস্যকে মনোনীত করতে পারেন।

লোকসভা ঃ গঠন

যে-কোনও ২৫ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক লোকসভার সদস্য হতে পারেন। তবে, ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধি সম্পর্কিত আইন (Representation of the People Act, 1951) অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ভারতের পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের ক্ষেত্রেই সদস্য হবার যোগ্যতা থাকবে না। প্রথমতঃ, নির্বাচন সংক্রান্ত কোন অপরাধে আদালত (Election Tribunal) কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তি। দ্বিতীয়তঃ, কোন অপরাধে দুই বছরের বেশী সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি। তৃতীয়তঃ, নির্বাচনী হিসাব দাখিলের ব্যাপারে বেআইনী আচরণের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তি। চতুর্থতঃ, দুর্নীতি কিংবা রাজদ্রোহাত্মক অপরাধের জন্য সরকারী চাকুরী থেকে বরখাস্ত ব্যক্তি। পঞ্চমতঃ, সরকারী আর্থিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক (Director) বা ম্যানেজিং ডিরেক্টার অথবা কোন লাভজনক সরকারী পদে চাকুরীরত ব্যক্তি। ষষ্ঠতঃ, সরকারী ঠিকাদারী বা অন্যান্য কাজের ভার পেয়েছেন এমন ব্যক্তি।

লোকসভার সদস্যপদ-প্রার্থীর যোগ্যতা

লোকসভার প্রথম অধিবেশনে সদস্যগণ স্পীকার (Speaker) নির্বাচিত করেন। তিনিই লোকসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। রাষ্ট্রপতি লোকসভার অধিবেশন আহ্বান করতে, মুলতুবি রাখতে কিংবা ভেঙ্গে দিতে পারেন। পাঁচ বছর কার্যকাল অতিক্রান্ত হলে, জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে এই মেয়াদ অতিক্রান্ত হলে এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বিশেষ কোনও সাংবিধানিক সঙ্কটের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রপতি লোকসভার নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হবার পূর্বেই তাকে ভেঙ্গে দিতে পারেন।

স্পীকারের ভূমিকা

লোকসভার সদস্য ইচ্ছামত পদত্যাগ করতে পারেন। লোকসভার বিনা অনুমতিতে একাদিক্রমে দু'মাস কোনও সভ্য যদি অনুপস্থিত থাকেন, তবে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। সভ্যগণ মাসিক পাঁচশত টাকা বেতন পান এবং সভার অধিবেশন চলার সময় দৈনিক ভাতা পান। অধিবেশনে যোগদানের জন্য তাঁরা বিনা ভাড়ায় রেলে যাবার সুযোগ, সভার কাজে যাবার পথ-খরচ, টেলিফোনের সুবিধা প্রভৃতি লাভ করেন।

সদস্যদের কার্যকাল, বেতন, ভাতা

সদস্যদের বিশেষ স্বাধিকার

লোকসভার সদস্যগণ বাক্‌স্বাধীনতা, বিবৃতি প্রভৃতি প্রকাশের স্বাধীনতা, আটক না হবার অধিকার, জুরি বা সাক্ষীরূপে আদালতের এক্তিয়ার থেকে মুক্ত থাকার অধিকার প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ স্বাধিকার

(Privileges) লাভ করেন। এই সুবিধাগুলি ইংলণ্ডের কমন্স্ সভার সদস্যগণ ভোগ করে থাকেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভার সদস্যগণও ভোগ করে থাকেন।

লোকসভার কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই ব্যাখ্যা করতে হয় রাজ্যসভার তুলনায় কেন এটি অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন। এর প্রথম কারণ হল এই যে, অর্থসংক্রান্ত বিল (Money Bill) কেবলমাত্র লোকসভাতেই প্রথম পেশ করতে হয়।

লোকসভার ক্ষমতা বেশী
(ক) অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে

লোকসভা এই বিল গ্রহণ করার পর রাজ্যসভায় বিলটি বিতর্কের ও বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু রাজ্যসভায় বিলটি পেঁছানোর দিন থেকে ১৪ দিনের মধ্যে মতামতসহ ঐ বিলটি লোকসভায় ফেরত পাঠাতে হয়। লোকসভা ইচ্ছা করলে ঐ মতামত ছাড়াই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পেশ করতে পারে। ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভা বিলটি লোকসভায় ফেরত না পাঠালে ১৪ দিন পরে সেটি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উভয়কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, লোকসভাই অর্থসংক্রান্ত বিল সম্পর্কে অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানের ৭৫(৩) ধারা অনুসারে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কেবল-মাত্র লোকসভার কাছেই দায়ী থাকে। এর অর্থ হল, লোকসভা যদি মন্ত্রীদের কারুর

(খ) শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে

বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে বা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সমষ্টিগতভাবে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করে, তা হলে যথাক্রমে ঐ মন্ত্রীকে বা সমগ্র মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। ইংলণ্ডে কমন্স্ সভার কাছেই মন্ত্রিসভা দায়ী থাকে, লর্ড্‌স্‌সভা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কোনও অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে না। ইংলণ্ডে অনুসৃত এই প্রথাগত বিধানটিকেই ভারতের সংবিধানে লিখিত রূপ দেওয়া হয়েছে।

লোকসভার কার্যাবলী ঃ
(১) আইনপ্রণয়ন

এবারে লোকসভার ক্ষমতাগুলি নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাক্। প্রথমতঃ, লোকসভা সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় এবং যুগ্ম তালিকার অন্তর্গত বিষয়গুলি নিয়েই আইনপ্রণয়ন করতে পারে। তবে রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যগণ যদি রাজ্যতালিকাভুক্ত কোনও বিষয়ে জাতীয় স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভাকে আইনপ্রণয়ন করতে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে, তা হলে লোকসভা সেই বিষয়েও আইনপ্রণয়ন করতে পারে।

কিছু ক্ষমতা শাসন-বিভাগে সমর্পিত

বর্তমানে প্রচলিত সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুসারে আইনপ্রণয়নের সময় সংক্ষেপ করতে ও আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতামত নেবার জন্য পার্লামেণ্ট্ শাসনবিভাগকে সমর্পিত ক্ষমতাবলে আইনপ্রণয়নের (Delegated Legislation) ক্ষমতা দিয়ে থাকে। এইভাবে প্রণীত আইনকানুনগুলির খসড়া ইত্যাদি অনুমোদন করাও পার্লামেণ্টের দুই কক্ষের জরুরী কাজ।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে ও সরকারের আয়ব্যয় সম্পর্কে আলোচনার অধিকার লোকসভার ক্ষেত্রে রাজ্যসভার তুলনায় বেশী বাস্তব। কারণ, লোকসভা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের বাৎসরিক আয়ব্যয়ের অর্থাৎ বাজেটের (Budget) কোনও প্রস্তাব আংশিকভাবেও মঞ্জুর না করে, তার সাংবিধানিক অর্থ হলঃ মন্ত্রিসভার প্রতি তার আস্থার অভাবজ্ঞাপন। অর্থাৎ, মন্ত্রিসভাকে তখন পদত্যাগ করতে হয়। রাষ্ট্রপতি প্রভৃতি উচ্চ পদের কর্মীদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি লোকসভার অনুমোদনসাপেক্ষ না হলেও লোকসভা এগুলি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে পারে। লোকসভায় ইংলণ্ডের প্রথা অনুসরণ করে বিরোধী দলের নেতাকে সরকারী হিসাবপরীক্ষা সংস্থার (Public Accounts Committee) সভাপতি করা হয়। এই সংস্থা কম্প্ট্রোলার ও অডিটার জেনারেলের বা সর্বপ্রধান ব্যয়নিয়ন্ত্রক ও মহান্ হিসাবপরীক্ষকের (Comptroller and Auditor General) মাধ্যমে নজর রাখেন, যেন সরকারী অর্থের কোনও অপব্যয় না ঘটে।

(২) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা

তৃতীয়তঃ, শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে লোকসভার প্রধান কাজ হল—সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্পর্কে বিভাগীয় মন্ত্রীদের কাছে কৈফিয়ত দাবী করা। লোকসভার সদস্যগণ নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেন। যদি কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়, তা হলে অবশ্য সংক্ষা শাসনতান্ত্রিক বিচারে উ হ মন্ত্রীর পদত্যাগ সূচিত হয় না, কিন্তু এর ফলে নীতিগতভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং তাঁর দপ্তরের সকলেই লোকসভা কর্তৃক অপদস্থ হন।

(৩) মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ

চতুর্থতঃ, লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রভৃতিতে অংশগ্রহণের ক্ষমতা আছে। উপরাষ্ট্রপতি, সুপ্রীম্ কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি, কণ্ট্রোলার ও অডিটার জেনারেল প্রভৃতি উচ্চ পদের কর্মচারীদের পদচ্যুত করার এবং রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত করে পদচ্যুত করার ক্ষমতাও লোকসভার সদস্যগণ ভোগ করে থাকেন।

(৪) নির্বাচনী ক্ষমতা

পঞ্চমতঃ, সংবিধান সংশোধন, নূতন অঙ্গরাজ্য সৃষ্টি, কোনও অঙ্গরাজ্যের সীমানা বা নাম বদল, সুপ্রীম্ কোর্টের বিচারপতির সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষমতাও লোকসভা ভোগ করে।

(৫) সাংবিধানিক ক্ষমতা

ষষ্ঠতঃ, লোকসভার একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা হল বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা। যে-কোন ব্যক্তিকে, এমন-কি লোকসভার সদস্যকেও লোকসভার মানমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগে লোকসভা শাস্তি প্রদান করতে পারে। লোকসভা প্রধান ধর্মাধিকরণের অথাৎ সুপ্রীম্ কোর্টের বিচারকদের সংখ্যাবদল করতে পারে।

(৬) বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা

রাজ্যসভার মোট সদস্যসংখ্যা অনধিক ২৫০ জন। এর মধ্যে ২৩৮ জন পরোক্ষ নির্বাচনের মারফত অঙ্গরাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট অনুসারে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। রাজ্যসভার অবশিষ্ট ১২ জন সদস্যকে বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা, ললিতকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ-

রাজ্যসভার সংগঠন

দের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। এখানে লক্ষণীয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা সুইজারল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে সমানসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাবার নীতি ভারতের রাজ্যপরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় নি।

সদস্যদের কার্যকাল

রাজ্যসভা একটি স্থায়ী সভা। রাষ্ট্রপতি এর অধিবেশন আহ্বান করতে এবং মুলতুবি রাখতে পারেন; কিন্তু একে ভেঙ্গে দিতে পারেন না। দু'ই বছর অন্তর-অন্তর রাজ্যসভার সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যগণ অবসর গ্রহণ করেন। এই অবসর গ্রহণ ঘটে নির্দিষ্ট একটি ক্রমপর্যায় (rotation) অনুসরণ করে।

উপরাষ্ট্রপতির ভূমিকা

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার নির্বাচিত সদস্য না হলেও পদাধিকার বলে এই সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে থাকেন। অন্যূন ৩০ বৎসর বয়স্ক যে-কোনও ভারতীয় নাগরিক রাজ্যসভার সদস্য হতে পারেন। তবে সরকারের অধীনে লাভজনক কোন পদে কাজ করলে এবং আদালত কর্তৃক উন্মাদ বা দেউলিয়া ঘোষিত হলে উক্ত ব্যক্তি রাজ্যসভার সদস্য হতে পারেন না।

সদস্যদের বেতন, ভাতা, স্বাধিকার

রাজ্যসভার সদস্যগণ নির্দিষ্ট হারে মাসিক বেতন এবং সভার অধিবেশন চলাকালে দৈনিক ভাতা পান। এ ছাড়া অধিবেশনে যোগদানের জন্য বিনা ভাড়ায় তাঁরা রেলে ভ্রমণ করতে পারেন এবং সভার কাজে ভ্রমণের জন্য পাথেয় লাভ করে থাকেন। রাজ্যসভার সদস্যগণও লোকসভার সদস্যদের মত বাক্‌স্বাধীনতা, গ্রেপ্তার না হওয়ার অধিকার, জুরি বা সাক্ষীরূপে হাজির না-থাকবার অধিকার ভোগ করে থাকেন।

রাজ্যসভার কাজ ঃ অঙ্গরাজ্যের জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে আইনপ্রণয়ন

রাজ্যসভার কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, সংবিধানরচয়িতাগণ ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার দুটি কক্ষের মধ্যে একে লোকসভার তুলনায় অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দিতে চেয়েছেন। কারণ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা রাজ্যসভার কাছে দায়ী থাকে না, কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট বাতিল করার কোন ক্ষমতাও রাজ্যসভার নেই। তবে সংবিধানে রাজ্যসভার হাতে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া আছে। সংবিধানের ২৪৯ ধারা অনুসারে যদি রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের সমর্থন অনুসারে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত কোনও বিষয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার কোনও আইন গ্রহণ করা উচিত, তা হলে কেন্দ্রীয় আইনসভা রাজ্যতালিকাভুক্ত সেই বিষয়টি নিয়ে আইনপ্রণয়ন করতে পারে।

অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা নামমাত্র

রাজ্যসভার অন্যান্য ক্ষমতাগুলি লোকসভার ক্ষমতার অনুরূপ। অর্থবিষয়ক বিল ছাড়া অন্য যে-কোনও বিল রাজ্যসভায় উত্থাপিত হতে পারে এবং রাজ্যসভার দ্বারা অনুমোদিত না হলে কোনও বিল আইনে পরিণত হয় না। অর্থবিল শুধু লোকসভায় উত্থাপিত করা হয় এবং লোকসভার অনুমোদনের পর রাজ্যসভায় বিলটি পাঠান হয়। কিন্তু বিলটি

রাজ্যসভায় আসার ১৪ দিন বাদে রাজ্যসভার কোনও মতামত থাকুক বা না-থাকুক, এই বিলটি অনুমোদিত বলে ধরা হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা রাজ্যসভার কাছে দায়ী না থাকলেও রাজ্যসভার সদস্যগণ শাসন-বিভাগ সম্পর্কে মন্ত্রীদের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন এবং তাঁদের কাজের সমালোচনা করতে পারেন।

মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ

রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার জন্য রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য যে-প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন, সে প্রস্তাবটি লোকসভায় অনুমোদিত হলে এ বিষয়ে তদন্ত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব লোকসভা এবং রাজ্যসভা সমানভাবে ভোগ করে। এই ধরনের আরও কতকগুলি ক্ষমতা রাজ্যসভা এবং লোকসভা সমানভাবে ভোগ করে। যেমন—সুপ্রীম্ কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন, সর্ব-ভারতীয় কৃত্যক (All India Service) গঠন প্রভৃতি।

রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি সম্পর্কিত ক্ষমতা

॥ ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার দুই কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ॥

সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্মভূমি ইংলন্ড্। সেখানে পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সেখানে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত নিম্নকক্ষ অর্থাৎ কমন্স্‌সভা উচ্চকক্ষ বা লর্ডস্-সভার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। প্রকৃতপক্ষে, কমন্স্‌সভাই আসল ক্ষমতার অধিকারী। এই শাসনতান্ত্রিক ঝোঁক ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রেও দেখা যায়। সুতরাং লোকসভা জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সভ্যদের নিয়ে গঠিত হবার ফলে এই সভাই সংবিধানের বিভিন্ন ধারা অনুসারে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। ইংলণ্ডে অনুসৃত এ সম্পর্কে প্রথাগত বিধানগুলিকে ভারতীয় সংবিধান শুধু লিখিত রূপ দিয়েছে। অবশ্য রাজ্যসভাও প্রধানতঃ নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত। কিন্তু এই সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত।

লোকসভা প্রত্যক্ষভাবে, রাজ্যসভা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত

লোকসভার প্রাধান্য দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে সূচিত হয়। একটি হল, মন্ত্রিসভা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, অপরটি হল বাজেট-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা শুধু লোকসভার কাছেই দায়ী থাকে। অর্থাৎ, কেবলমাত্র লোকসভাই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করে মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, অর্থবিলের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার এই বিল সংশোধন বা প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা নেই। কেবল লোকসভাতেই এ ধরনের বিল উত্থাপিত হয় এবং সেখানে এটি অনুমোদিত হলে এটি রাজ্যসভার বিবেচনার জন্য পাঠান হয়। রাজ্যসভা ১৪ দিনের মধ্যে মতামত-সহ বিলটি লোকসভায় ফেরত পাঠায়। ঐ মতামত গ্রহণ না করেও লোকসভা বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পেশ করতে পারে। রাজ্যসভা বিলটি লোকসভায় ১৪ দিনের মধ্যে ফেরত না পাঠালেও এটি কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয়কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বলে বিবেচিত হয়।

মন্ত্রীদের ও বাজেটের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে লোক-সভারই প্রাধান্য

এ-প্রসঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। ইংলণ্ডে লর্ড্‌স্‌সভা অর্থবিলের অনুমোদনকে শুধু এক মাস বিলম্ব করাতে পারে, কিন্তু এই বিল বাতিল করতে বা সংশোধন করতে পারে না। কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চকক্ষ বা সেনেট্‌ অর্থবিল সম্পর্কে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান-রচয়িতাগণ সেনেট্‌কে একটি নামমাত্র আইনসভারূপে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই তাঁরা এর হাতে অন্য গণতান্ত্রিক দেশগুলির নিম্নকক্ষের সমান ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করেছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, সেনেট্‌ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নকক্ষ বা প্রতিনিধিসভার (House of Representatives) দ্বারা অনুমোদিত অর্থবিলটির শুধু শিরোনামা ছাড়া অন্য সমস্ত অংশের ক্ষেত্রে সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে।

অর্থবিল ঃ ইংলণ্ডের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নজির

ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেট শুধু কমন্স্‌সভার কাছেই দায়ী থাকে। লর্ড্‌স্‌ সভা তাকে পদচ্যুত করতে পারে না। এই প্রথাগত সাংবিধানিক সূত্রটি ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৭৫ (৩) ধারায় লিখিত আকারে স্থান পেয়েছে।

মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ ঃ ইংলণ্ডে

অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষের ক্ষমতা সমান। দুটি কক্ষেই অর্থবিল ছাড়া অন্য বিল তিনটি পাঠের (Three Readings) পর অনুমোদিত হলে সেটি রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর বিলটি আইনে পরিণত হয়।

আইনপ্রণয়ন ঃ ভারতে

অর্থসম্পর্কিত বিল ছাড়া অন্য বিল নিয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভার দুটি কক্ষের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে সংবিধানের ১০৮ ধারায় সেই বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি উভয়কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করবেন। সেই অধিবেশনে উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সদস্যদের সাধারণ ভোটাধিক্যে বিলটি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশ্য এটা খুবই পরিষ্কার যে, লোকসভার সদস্যসংখ্যা রাজ্যসভার সদস্যসংখার দ্বিগুণেরও বেশী। সুতরাং দুই কক্ষের মধ্যে মতভেদ দূরীকরণের জন্য আহূত যুগ্মসভায় কার্যতঃ লোকসভার প্রাধান্যই সূচিত হবে।

দুটি কক্ষের বিরোধ রাষ্ট্রপতি নিষ্পত্তি করবেন

সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং পদচ্যুতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে লোকসভা এবং রাজ্যসভা সমান ক্ষমতা ভোগ করে। তবে রাজ্যসভাকে সংবিধানরচয়িতাগণ একটি বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন। সংবিধানের ২৪৯ ধারা অনুসারে, যদি রাজ্যসভা উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, রাজ্য-তালিকার অন্তর্গত কোনও বিষয়ে জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্রীয় আইনসভার আইনপ্রণয়ন করা প্রয়োজন, তা হলে পার্লামেণ্ট্‌ ঐ বিষয়ে আইন তৈরী করতে পারে।

কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে উভয় কক্ষের ক্ষমতা সমান

ভারতের পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, রাজ্যসভা শুধু একটি বিতর্কসভায় পরিণত হয়েছে। সংবিধান-রচয়িতাগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় উচ্চকক্ষের আদর্শে একে গঠিত হতে দিতে চান নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষ অর্থাৎ সেনেটের সঙ্গে রাজ্যসভার তুলনামূলক আলোচনা করলেই এই বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। সেনেট্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্য থেকে দুজন প্রতিনিধি নিয়ে অর্থাৎ মোট ১০০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। কিন্তু ভারতে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য থেকে সমানসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে রাজ্যসভা গঠিত হয় না। রাজ্যসভা গঠনে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য নিজেদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি পাঠায়। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন সেনেট্ নিম্নকক্ষের মতই অর্থসংক্রান্ত বিল সম্পর্কে অনুমোদন, সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা ভোগ করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, ভারতের সংবিধানরচয়িতাগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শ অনুসরণ না করে ইংলণ্ডে প্রচলিত সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামো অনুসারে আইনসভার দুটি কক্ষের ক্ষমতা ও অধিকার নির্ধারিত করে দিয়েছেন। ফলে, কমন্স্‌সভার মত লোকসভা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী, অপর দিকে লর্ড্‌স্ সভার মত রাজ্যসভার ভূমিকা গৌণ। ভারতে কানাডার মত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গ্রহণ করা হলেও সেখানে ইংলণ্ডের মত আইনসভার সার্বভৌমত্বের নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। লোকসভার প্রভূত ক্ষমতা এবং মর্যাদা এই নীতিটিরই সূচক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা

॥ ভারতীয় পার্লামেন্টের মর্যাদা : ভারতীয় পার্লামেন্ট্ কি সার্বভৌম ? ॥

অনেকে বলেন যে, ভারতীয় সংবিধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ব্রিটিশ্ শাসনতন্ত্রের কতকগুলি ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণ বা সুপ্রীম্ কোর্টের ওপর সংবিধানের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব অর্পিত। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান ভাষ্যকার-রূপে পার্লামেন্টের কিংবা অঙ্গরাজ্যের কোন বিধানসভার দ্বারা প্রণীত ও অনুমোদিত আইনকে সুপ্রীম্ কোর্ট্ সংবিধানবিরোধী (ultra vires) ঘোষণা করতে পারে। সে ক্ষেত্রে কোর্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আবার, ইংলণ্ডের মত সংসদীয় শাসনব্যবস্থা ভারতে চালু হবার ফলে পার্লামেন্ট্ সার্বভৌম। কিন্তু ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরল রাজ্য সরকার সম্পর্কিত মামলায় সুপ্রীম্ কোর্ট্ সিদ্ধান্ত নেন যে, পার্লামেন্ট্ ভারতীয় সংবিধানের "মূল কাঠামো" ("basic structure") বদ্‌লাতে পারে না। "মূল কাঠামো" বলতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে অবশ্য কোর্ট্ কোন সিদ্ধান্ত নেন নি। ১৯৭৬ সালের ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে ঘোষিত হয় যে, ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে পার্লামেন্ট্ নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলির ওপরেও হস্তক্ষেপ করতে পারে।

সংবিধান কর্তৃক ক্ষমতা সীমিত হলেও ভারতীয় পার্লামেন্ট্ স্বক্ষেত্রে সার্বভৌম

কিন্তু ১৯৮০ সালের মিনার্ভা মিলস্ মামলায় সুপ্রীম কোর্ট ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী আইনের সিদ্ধান্তকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন। ১৯৫০ সালে গোপালন্ বনাম মাদ্রাজ সরকারের মামলায় রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি দাস বলেন যে, প্রথমতঃ, ভারতীয় সংবিধান পার্লামেন্টের ক্ষমতা সীমিত করে দিয়েছে ; দ্বিতীয়তঃ, এই সীমার মধ্যে পার্লামেন্টের ক্ষমতা চরম। এ সমস্ত দিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, ভারতীয় পার্লামেন্ট্ ইংলন্ডের পার্লামেন্টের মত চরম সার্বভৌমত্বের অধিকারী নয়।

॥ পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডল ঃ সংগঠন ও কার্যাবলী ॥

পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডল ঃ গঠন

ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বিধানমণ্ডল (State Legislatuae) এক পদ্ধতিতে গঠিত নয়। কোন-কোনটি একটি কক্ষ নিয়ে গঠিত, কোন-কোনটি দুটি কক্ষ নিয়ে। যেখানে আইনসভার দুটি কক্ষ আছে, সেখানে নিম্নকক্ষকে বিধানসভা (Legislative Assembly) এবং উচ্চ-কক্ষকে বিধান পরিষদ (Legislative Council) বলা হয়।

১৯৬৯ সালে ২য় কক্ষ বিলুপ্ত

১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গ বিধানমণ্ডল দ্বিকক্ষযুক্ত ছিল। কিন্তু ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দ যুক্তফ্রন্ট্ সরকার ব্যয়বাহুল্য বর্জনের জন্য, আইনপ্রণয়নে অহেতুক বিলম্ব হ্রাস করার জন্য এবং শুধু নিম্নকক্ষের অস্তিত্ব বজায় রেখে আইনসভার উচ্চকক্ষের রক্ষণশীল, কায়েমী ঝোঁক থেকে রাজ্য বিধানমণ্ডলকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ আইনপ্রণয়ন করে উচ্চকক্ষকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। সুতরাং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিধানমণ্ডল এককক্ষযুক্ত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা (West Bengal Legislative Assembly) নামে অভিহিত।

মোট সদস্যসংখ্যা

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা মোট ২৯৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে তপশীলভুক্ত বর্ণের এবং তপশীলভুক্ত উপজাতীয় ব্যক্তিদের জন্য যথাক্রমে ৪০ টি এবং ১২ টি আসন সংরক্ষিত। এই আসনগুলি ১৯৯০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত উক্ত সম্প্রদায়গুলির জন্য সংরক্ষিত থাকবে। রাজ্যপাল (Governor) দুজন ইঙ্গভারতীয় (Anglo-Indian) সদস্য মনোনীত করে থাকেন।

নির্বাচন পদ্ধতি ঃ সভ্যপদপ্রার্থীদের যোগ্যতা

সংবিধান অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, অর্থাৎ অন্ততঃ ২১ বছর বয়স্ক নাগরিক বিভিন্ন নির্বাচনী অঞ্চল থেকে প্রত্যক্ষভাবে ভোট দিয়ে এমনভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন যেন অন্ততঃ ৭৫,০০০ জনগণের একজন করে প্রতিনিধি বিধানসভায় নির্বাচিত হন। বিধানসভার সভ্য নির্বাচিত হতে হলে প্রার্থীকে অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। আদালতের দ্বারা উন্মাদ বা দেউলিয়া বা কোনভাবে দোষী ঘোষিত হলে কিংবা ভারত সরকার বা রাজ্যসরকারের অধীনে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকলে সে ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হতে পারেন না।

সংবিধানের ১৭২ ধারা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মেয়াদ ৫ বছর। কিন্তু এই কার্যকাল অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই রাজ্যপাল এই সভাকে বাতিল করে দিতে পারেন। তখন পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আবার, রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলে সংবিধানের ১৭২(১) ধারা অনুসারে ভারতীয় পার্লামেন্ট্ এর কার্যকাল প্রত্যেকবার এক বছর করে বাড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু কখনই জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হবার পর ছ'মাসের বেশী এই সভার কার্যকাল বাড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কার্যকাল

পশ্চিম বঙ্গ বিধানসভার সভ্যগণ মাসে নির্দিষ্ট হারে বেতন পান এবং সভার অধিবেশন চলার সময় দৈনিক নির্দিষ্ট হারে ভাতা পেয়ে থাকেন। এ ছাড়া সভ্যগণ অধিবেশনে যোগদানের জন্য বিনা ভাড়ায় রেলে যাতায়াত করতে পারেন এবং সভার কাজে ভ্রমণের জন্য পাথেয় ইত্যাদি লাভ করেন। সভ্যগণ বিধানসভায় বাক্স্বাধীনতা, গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকার অধিকার, সভায় নিজেদের ভাষণ প্রভৃতি সঠিকভাবে প্রচারিত ও সংরক্ষিত করার অধিকার প্রভৃতি বিশেষ কতকগুলি সুবিধা (Privileges) লাভ করে থাকেন। সভ্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজন স্পীকার (Speaker) এবং ডেপুটি স্পীকার (Deputy Speaker) নির্বাচন করেন। স্পীকার, এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার বিধানসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং সভায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেন।

সদস্যদের বেতন, ভাতা, স্বাধিকার, স্পীকারের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার কার্যাবলীর মধ্যে আইনপ্রণয়ন, অর্থসংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ, শাসনবিভাগ-নিয়ন্ত্রণ এই তিনটিই প্রধান। **আইনপ্রণয়নই** বিধানসভার প্রথম কর্তব্য। রাজ্যতালিকাভুক্ত এবং যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ের ওপর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা আইনপ্রণয়ন করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যাবলী: (১) আইনপ্রণয়ন

দ্বিতীয়তঃ, বিধানসভার **অর্থসম্পর্কিত ক্ষমতাও** বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সভ্যগণ নতুন কর প্রবর্তনের জন্য, প্রচলিত করের হার সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করতে পারেন এবং সেগুলি সবই বিধানসভার অনুমোদনসাপেক্ষ। রাজ্যের বাৎসরিক ব্যয়বরাদ্দ-সংক্রান্ত অর্থবিল বা বাজেট বিধানসভায় অনুমোদিত হলে তবেই তা রাজ্যপাল অনুমোদনের জন্য বিবেচনা করতে বাধ্য। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সংবিধানের ১৬৪ (১) ধারা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কাছেই রাজ্যমন্ত্রিসভা দায়ী থাকে। সুতরাং বিধানসভা যদি রাজ্যের বাজেট সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে বাতিল করে দেয়, তার অর্থ হলঃ মন্ত্রিসভার প্রতি বিধানসভার অনাস্থাজ্ঞাপন এবং এর ফলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

(২) অর্থসম্পর্কিত ক্ষমতা

তৃতীয়তঃ, বিধানসভার **শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার** মধ্যে পড়ে রাজ্যের মন্ত্রিসভার ওপর কর্তৃত্ব করা। বিধানসভা রাজ্যমন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সমগ্রভাবে বা কোনও বিশেষ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করলে মন্ত্রিসভাকে

তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করতে হয়। বিধানসভার সভ্যগণ কোনও জরুরী বিষয়ের প্রতি মন্ত্রিসভার দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত হবার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণী (Calling Attention) প্রস্তাব, মুলতুবি প্রস্তাব (Adjournment motion) প্রভৃতির মারফত এবং অন্য নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শাসনবিভাগের বিভিন্ন দপ্তর সম্পর্কে কৈফিয়ত দাবী করেন। এইভাবে রাজ্যবিধানসভা মন্ত্রিসভাকে এবং প্রশাসনকে সৎ, দায়িত্বশীল এবং তৎপর থাকতে সাহায্য করে।

(৩) শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা

(৪) অন্যান্য ক্ষমতা

চতুর্থতঃ, বিধানসভার **অন্যান্য ক্ষমতার** মধ্যে পড়ে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে অবস্থাভেদে অনুমতিজ্ঞাপন।

॥ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা কি সার্বভৌম আইনসভা ? ॥

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শাসনতন্ত্রবিদ্‌গণ একে প্রকৃত অর্থে সার্বভৌম বলতে রাজী নন। এর জন্য তাঁরা নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করেন। প্রথমতঃ, যদি রাষ্ট্রপতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের বিবরণী অনুসারে মনে করেন যে, এখানকার শাসনব্যবস্থা সংবিধান অনুসারে চালান যাচ্ছে না, তা হলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন করতে পারেন। তখন পার্লামেণ্ট্‌ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বদলে রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য আইনপ্রণয়ন করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ঃ
(১) রাজ্যপালের ভূমিকা

দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানের ২৪৯ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চপরিষদ অর্থাৎ রাজ্যসভা উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সভ্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে প্রস্তাব অনুমোদন করতে পারে, যার ফলে জাতীয় স্বার্থে রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বদলে কেন্দ্রীয় আইনসভা আইনপ্রণয়ন করতে পারে।

(২) রাজ্যসভার ক্ষমতা

(৩) জরুরী ক্ষেত্রে

তৃতীয়তঃ, জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বদলে পার্লামেণ্ট্‌ আইনপ্রণয়ন করতে পারে।

চতুর্থতঃ, যদি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার দ্বারা অনুমোদিত যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ের অন্তর্গত কোনও আইন কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক ঐ একই বিষয়ে রচিত আইনের সঙ্গে পরস্পরবিরোধী হয়, তা হলে সংবিধানের ২৪৭ ধারা অনুসারে পার্লামেণ্টের আইনটি চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়।

(৪) যুগ্ম তালিকার ক্ষেত্রে

পঞ্চমতঃ, পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে বিধানসভায় কোনও আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করতে হলে তার আগে রাষ্ট্রপতির সম্মতি নেওয়া প্রয়োজন।

(৫) রাষ্ট্রপতির ভূমিকা

(৬) রাষ্ট্রপতির অনুমোদন

ষষ্ঠতঃ, বিধানসভায় অনুমোদিত হলেও রাজ্যপাল সেই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে পাঠাতে পারেন।

সপ্তমতঃ সম্পত্তি অধিগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি বিল বিধানসভা অনুমোদন করলেও যদি সেগুলি পার্লামেন্টের পূর্বগৃহীত আইনের পরিপন্থী হয়, তা হলে সেগুলি বাতিল হয়ে যায়। এই যুক্তিগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভারতের সংবিধানরচয়িতাগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গ্রহণ করলেও ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গীয় বিধানসভাকে অন্যান্য দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় অঙ্গরাজ্যের বিধানসভার সমতুল্য-করে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক একটি অঙ্গরাজ্যের আইনসভা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তুলনায় প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী এবং নিজের নিজের এলাকাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন। অবশ্য, এ-কথা মনে রাখা উচিত যে, ভারতে যে ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা হয়েছে, তা কানাডার মত কেন্দ্রাভিমুখী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। ভারতে স্বাধীনতা লাভের থেকে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি অসংখ্য সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করার মত একটি দৃঢ় কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের জন্য সংবিধানরচয়িতাগণ একমত হন। কেন্দ্রীয় সরকারকে দৃঢ় না রাখলে আঞ্চলিক এবং জাতীয় ক্ষেত্রে বিশেষ সঙ্কটময় পরিস্থিতির সূচনা হতে পারে। সেজন্যই ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলি কেন্দ্রের তুলনায় কম শক্তিশালী। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাকে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের বিধানসভার মত ক্ষমতাশালী আশা করা শুধু ভারতের সাংবিধানিক কেন্দ্রাভিমুখিতার বৈশিষ্ট্যটিকে অস্বীকার করাই নয়, সমস্যাসঙ্কুল ভারতীয় রাষ্ট্রের কঠিন বাস্তবতাকে বিস্মৃত হওয়া।

(৭) পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব

॥ আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি ঃ ভারতীয় আইনসভায় ॥

ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার, অর্থাৎ, পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ক্ষেত্রে প্রায় এক ধরনের আইনপ্রণয়ন ব্যবস্থা অনুসৃত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণ ভারতীয় নাগরিকদের সকলের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত সভ্যদের নিয়ে গঠিত আইনসভার নিম্নকক্ষের প্রাধান্যই সূচিত হয়। কারণ, বর্তমান গণতান্ত্রিক ধারা অনুসারে আইনসভার নিম্নকক্ষই সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী এবং আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী। এই বিশ্লেষণ অনুসারে কেন্দ্রীয় আইনপ্রণয়ন-ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ, অর্থাৎ লোকসভা উচ্চকক্ষ বা রাজ্যসভার তুলনায় বেশী ক্ষমতাশালী। পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডল ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত দ্বিকক্ষযুক্ত ছিল। সে সময় পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গের আইনসভায় আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে নিম্নকক্ষের, অর্থাৎ বিধানসভার প্রাধান্য সূচিত হত এবং এ-ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের, অর্থাৎ বিধান পরিষদের ভূমিকা ছিল অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ১৯৬৯ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ অবলুপ্ত হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাই হল এ রাজ্যের আইনসভার একমাত্র কক্ষ। এর ফলে, দ্বিকক্ষযুক্ত কেন্দ্রীয় আইনসভার দ্বারা অনুসৃত আইনপ্রণয়নব্যবস্থার তুলনায় এককক্ষযুক্ত পশ্চিমবঙ্গীয় বিধানসভা কর্তৃক অনুসৃত আইনপ্রণয়নব্যবস্থা অনেক সহজ ও সরল হয়ে পড়েছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের আইনসভার আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি একই রকম

পার্লামেন্ট্ যে আইনপ্রণয়নব্যবস্থা অনুসরণ করে, তা মোটামুটিভাবে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের দ্বারা অনুসৃত আইনপ্রণয়ন পদ্ধতির অনুরূপ। ভারতীয় সংবিধানের ১০৭ ধারা অনুসারে অর্থবিষয়ক বিল ছাড়া অন্য যে-কোনও বিল পার্লামেণ্টের যে-কোন কক্ষে উত্থাপন করা চলে। এ ক্ষেত্রে সরকারী বিল (Public Bill) এবং বেসরকারী বিল (Private Member's Bill) এই দুটিভাগে বিলকে বিভক্ত করলে কেন্দ্রীয় আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা আরও সুস্পষ্ট হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কোনও বিল উত্থাপন করতে চাইলে সে বিলটি সরকারী বিল বলে ধরা হয় এবং পার্লামেণ্টের অন্য কোনও সদস্য কোন বিল উত্থাপন করতে চাইলে সেটিকে বেসরকারী বিল বলে ধরা হয়। বেসরকারী বিলের ক্ষেত্রে সরকারী বিল থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র উত্থাপন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তদনুসারে বেসরকারী বিল উত্থাপন করতে হলে তার পূর্বে ১ মাসের বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ দিতে হয়। অবশ্য, স্পীকার ইচ্ছা করলে এর কম সময়ের ব্যবধানেও বিলটি উত্থাপনের জন্য নোটিশ মঞ্জুর করতে পারেন। নোটিশ ঘোষণার পর বেসরকারী বিলটি এজন্য সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষ সমিতির (Committee on Private Members' Bills and Resolutions) কাছে বিচার-বিবেচনার জন্য পাঠান হয়। এই সমিতি বিলটিকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করলে বিলটির আলোচনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তারপর এই বিলটি নিয়ে পার্লামেণ্টের যে-কক্ষে বিলটি উত্থাপিত হয়, সেখানে বিতর্ক ও আলোচনা শুরু হয়।

আবার, ভারতীয় পার্লামেণ্ট্ এ ব্যাপারে ইংলণ্ড্কে অনুসরণ করে ঃ বেসরকারী বিল

সরকারী বিলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী পার্লামেণ্টের যে-কোন একটি কক্ষের বিলটি উত্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। অনুমতি লাভ করলে বিলটি পার্লামেণ্টের উক্ত কক্ষে উত্থাপিত হয়। এর আগেই যদি বিলটি সরকারী ইস্তাহারে বা গেজেটে প্রকাশিত হয়, তা হলে বিলটি "উত্থাপিত" বলে বিবেচিত হয়। এটিকেই বিলের প্রথম পাঠ (First Reading) বলা হয়।

সরকারী বিল

সরকারী কিংবা বেসরকারী বিল এইভাবে উত্থাপিত হলে বিরোধী দলগুলি সাধারণতঃ বিলটি জনমত গ্রহণের জন্য সাধারণ্যে প্রচারিত করার অথবা কোনও নির্দিষ্ট কমিটিতে (Select Committee) বা পালার্মেণ্টের অপর কক্ষের সম্মতি-সাপেক্ষে উভয় কক্ষের যুগ্ম নির্দিষ্ট কমিটিতে (Joint Select Committee) বিলটি পেশ করার প্রস্তাব করে থাকেন। সরকারপক্ষ সাধারণতঃ এই প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করে থাকেন ও বিভাগীয় মন্ত্রী বিলটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংসদ-সদস্যদের অবহিত করার চেষ্টা করেন। সাধারণতঃ সরকারপক্ষ পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকেন বলে সরকার পক্ষ সংশ্লিষ্ট বিলটি সম্বন্ধে যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাই এ ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। সরকার পক্ষ যদি বিলটি সংসদে উত্থাপনের জন্য ব্যগ্র হন, তা হলে বিলটির সাধারণ উদ্দেশ্য নিয়ে এবং এর ধারাগুলি নিয়ে আলোচনা চলে। এই উপলক্ষে দ্বিতীয় পাঠের সময় (Second Reading) সংসদ-সদস্যগণ বিলটির প্রত্যেক ধারা সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই

ভোটাভুটির ফলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিকল্পক্ষেত্রে, সরকারপক্ষ যদি বিলটি উত্থাপিত হবার পর মনে করেন যে, বিলটি কোনও নির্দিষ্ট কমিটিতে বিচার-বিবেচনার জন্য পেশ করা হোক, তা হলে বিলটির বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে মতামত জানিয়ে ও বিচার করে ঐ কমিটি বিবৃতি দাখিল করেন। বিলটির সাধারণ উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিলটি উত্থাপনের পরই অনুমোদিত করে দেবার ফলে এ সম্পর্কে কমিটি কোনও মতামত প্রকাশ করেন না। কমিটির বিবৃতিসম্বলিত বিলের খসড়াটির বিভিন্ন ধারা নিয়ে এবার সংসদ-সদস্যগণ তৃতীয় পাঠের (Third Reading) জন্য বিতর্ক করেন, তাঁদের সংশোধনী প্রস্তাবগুলির ওপর ভোট নেওয়া হয় এবং সাধারণ ভোটাধিক্যে বিলটি অনুমোদিত হলে পার্লামেন্টের অপর কক্ষে বিলটি পাঠান হয়। ঐ কক্ষেও ঠিক আগের মত পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণের পর যদি সংশ্লিষ্ট বিলটি সংসদের দ্বিতীয় কক্ষেও অনুমোদিত হয়, তা হলে বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে পেশ করা হয়। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে বিলটি অনুমোদন না করে সংসদের পুনর্বিবেচনার জন্য তার কাছে এটি ফেরত পাঠাতে পারেন। কিন্তু সংবিধানের ১১১ ধারা অনুসারে ঐ বিলটি সংসদ পুনরায় অনুমোদন করলে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি প্রদান করতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর মত রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। ইংলণ্ডের মত ভারতেও আইনসভার সার্বভৌমত্ব (Parliamentary Sovereignty) সগৌরবে ঘোষিত হয়েছে।

নির্দিষ্ট কমিটির ভূমিকা : ভারতে ও ইংলণ্ডে প্রচলিত পদ্ধতি : ৩টি পাঠ

যদি সংসদের একটি কক্ষে বিলটি অনুমোদিত হবার পর অপর কক্ষ বিলটি ৬ মাসের বেশী সময় ফেলে রাখে, অথবা বিলটি প্রত্যাখ্যান করে, তা হলে ভারতীয় সংবিধানের ১০৮ (১) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশনে বিলটি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারেন। রাজ্যসভার দ্বিগুণেরও বেশী সংখ্যক সদস্য লোকসভার সদস্য। সুতরাং বলা-বাহুল্য, সংসদের যুগ্ম অধিবেশনে লোকসভার প্রাধান্যই এ-ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী।

উচ্চ কক্ষের ভূমিকা

অর্থসংক্রান্ত বিলের ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট যে আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে, তা একটু স্বতন্ত্র। সংবিধানের ১১০ ধারায় অর্থসংক্রান্ত বিলের (Money Bill) যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তার ফলে কর, সরকারী ঋণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund of India), যুক্তরাষ্ট্রীয় জরুরী তহবিল (Contingency Fund of India), মুদ্রানিয়ন্ত্রণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ, অর্থাৎ বাজেট সম্পর্কে যে-কোনও বিলই লোকসভার স্পীকারের সিদ্ধান্তক্রমে "অর্থসংক্রান্ত বিল" রূপে বিবেচিত হয়। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে অর্থ-বিষয়ক বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে কেবল লোকসভাতেই উত্থাপন করতে হয়। কোনও সাধারণ বিলে যদি ভারতসরকারের সঞ্চিত তহবিল থেকে ভবিষ্যতে অর্থব্যয়ের প্রয়োজনীয়তার সম্ভাবনার উল্লেখ থাকে, তা হলে সেটিও এক

অর্থসংক্রান্ত বিল

প্রকারের অর্থবিল। তবে এটি গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিলের মত পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয় এবং এই ধরনের বিল সংসদের যে-কোনও কক্ষেই উত্থাপিত হতে পারে। তবে অর্থসংক্রান্ত বিলের মত এই বিলগুলি উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতির সম্মতি থাকা দরকার।

অন্যান্য বিলের মতই অর্থসংক্রান্ত বিল লোকসভায় উত্থাপিত, বিতর্কিত ও অনুমোদিত হবার পর রাজ্যসভায় পাঠান হয়। রাজ্যসভায় বিলটি পেঁছুবার ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভাকে তার মতামতসহ বিলটি লোকসভায় ফেরত পাঠাতে হবে। লোকসভা এই মতামতগুলি গ্রহণ করতে পারে বা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারে। রাজ্যসভায় বিলটি পেঁছবার ১৪ দিনের মধ্যে এটি লোকসভায় ফেরত না এলে সংশ্লিষ্ট অর্থবিষয়ক বিলটি সংসদের উভয়কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

অর্থবিলের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার ভূমিকা

বাজেট অনুমোদনের ক্ষেত্রে অন্যান্য অর্থবিলের মত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও একটু অন্য ধরনের ব্যবস্থা প্রচলিত। কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় অর্থসচিবই প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসে লোকসভায় বাজেট পেশ করেন। এ উপলক্ষে তিনি জাতীয় সরকারের অর্থনীতি ব্যাখ্যা করে একটি বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। সরকারের আনুমানিক ব্যয়ের তালিকাটির একাংশে সরকারের সঞ্চিত তহবিলের খাতে ধার্য ব্যয় এবং অপর অংশে পার্লামেন্টের অনুমোদন-সাপেক্ষ ব্যয় প্রকাশ করা হয়। প্রথম অংশের ব্যয়গুলি মঞ্জুর করাবার জন্য ফি-বছর পার্লামেন্টের অনুমোদন লাগে না। পার্লামেন্ট্ এ-বিষয়ে ধার্য ব্যয়গুলি নিয়ে শুধু আলোচনা চালাতে পারে। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সুপ্রীম্ কোর্টের বিচারপতি প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি এই ব্যয়গুলির অন্তর্গত। দ্বিতীয় অংশে উল্লিখিত ব্যয়গুলি মঞ্জুর নিয়েই, প্রকৃতপক্ষে, সংসদের সদস্যগণ বাদানুবাদে লিপ্ত হন। বিরোধীদলের নেতাগণ সাধারণতঃ সরকার-পক্ষের প্রস্তাবগুলি নিয়ে তর্ক করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট শাসনবিভাগের দোষত্রুটি সম্পর্কে সমালোচনা করে থাকেন। তাঁরা নানাপ্রকার সংশোধনী প্রস্তাবও উত্থাপন করে থাকেন। লোকসভার স্পীকার লোকসভার নেতা এবং বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে বাজেটের ব্যয়সংক্রান্ত বিতর্ক যাতে যথাশীঘ্র সমাপ্ত হয়, তার ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে সংসদ-সদস্যদের ভোটাভুটির মারফত শেষ পর্যন্ত সরকারের ব্যয়-মঞ্জুরীর প্রস্তাবগুলি লোকসভায় গৃহীত হয়।

বাজেট্ অনুমোদন পদ্ধতি

এইবার বাজেটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে সংসদ-সদস্যদের মধ্যে আলোচনা ও ভোটাভুটি চলে। এটি হল ব্যয়-সংক্রান্ত বিল (Appropriation Bill)। রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে এটিও বাজেট পেশ করার সময় লোক-সভায় অর্থমন্ত্রী উপস্থাপিত করেন। এই বিলটিতেই মঞ্জুরীকৃত ব্যয়গুলির জন্য সরকার কর্তৃক অর্থব্যয় করার প্রস্তাব আইনসিদ্ধ বলে বিতর্কিত হয়।

বাজেটের ভাগ ঃ (১) ব্যয়-সংক্রান্ত

প্রত্যেক নতুন আর্থিক বছর শুরু হবার আগে সরকারকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অর্থ-ব্যয় করার অনুমতি দেবার জন্য লোকসভায় দুটি বিল উত্থাপিত হয়। এদের একটি হল হিসাবমত অনুদানের বিল (Votes on Account), আরেকটির নাম হিসাবমত ব্যয়-সংক্রান্ত বিল [Appropriation (Votes on Account) Bill]। এই দুটি বিল অনুমোদিত হলে নতুন আর্থিক বছরের বাজেট এবং বিনিয়োগ আইন লোকসভার দ্বারা অনুমোদিত হয়। ফলে, আনুষ্ঠানিকভাবে কোন বছরের বাজেট এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইন সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হবার আগেই সরকার প্রয়োজনমত অর্থব্যয় করে প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনে সমর্থ হন।

(২) অনুদান সংক্রান্ত

যদি কোনও বছর সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয় সরকারের প্রয়োজনের তুলনায় কম হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে ধরনের সম্ভাবনা এড়াবার জন্য সরকার চলতি বছরেই অতিরিক্ত অনুদান (Supplementary Grants) অর্থাৎ, প্রয়োজনের অধিক ব্যয় সংসদকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেন। এইভাবে অনুমোদিত অর্থের বেশী ব্যয় হলেও সরকার অতিরিক্ত দাবী সংসদকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেন। আবার দুর্ভিক্ষ, প্লাবন প্রভৃতি দুর্ঘটনার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য সরকারের অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ ধার নেবার প্রস্তাব (Votes on Credit) অথবা জরুরী অনুদানের প্রস্তাব (Exceptional Grants) সংসদকে দিয়ে অনুমোদন করাবার ব্যবস্থা হয়।

(৩) বাড়তি অনুদান সংক্রান্ত

অর্থসংগ্রহের জন্য বাজেটের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে কর বা রাজস্ব সম্পর্কিত বিল (Finance Bill) থাকে। এই বিলটিও অন্যান্য অর্থবিলের মত রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিয়ে লোকসভায় প্রথমে পেশ করতে হয়। কোনও অঙ্গরাজ্যের স্বার্থ এ-ব্যাপারে জড়িত থাকলে সংবিধানের ২৭৪ (১) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতির বিশেষ সম্মতি থাকা প্রয়োজন। এই বিলটি লোকসভায় উত্থাপিত হবার পর বাজেটের অন্যান্য অংশের মত এটিও একই পদ্ধতি অনুসারে সংসদ কর্তৃক এবং অবশেষে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(৪) রাজস্ব সম্পর্কিত

ভারতে কেন্দ্রীয় আইনপ্রণয়ন ব্যবস্থা যে পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হয়, তা ইংলন্ডের পদ্ধতিরই অনুরূপ। এই পদ্ধতি অনুসারে আইনসভার নিম্ন কক্ষ সম্পূর্ণভাবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবার ফলে তারই হাতে প্রকৃত ক্ষমতা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি সরকারের সঞ্চিত তহবিল থেকে ব্যয়িত হয় বলে তার ওপর লোকসভারও ভোটাভুটি করার ক্ষমতা নেই। এজন্য যদি কেউ মনে করেন যে, লোকসভাও পুরোপুরি সার্বভৌম ক্ষমতাবিশিষ্ট আইনসভা নয়, তা হলে তিনি ভুল করবেন। ইংলন্ডের কমন্স্‌সভাও এ-ধরনের ব্যয়গুলির ওপর লোকসভার মত শুধু আলোচনা করতে পারে, এগুলির ওপর ভোটাভুটির কোন ক্ষমতা কমন্স্‌ সভার নেই, লোকসভারও নেই। তাই বলে কমন্স্‌সভার সার্বভৌমত্ব যেমন ক্ষুণ্ণ হয় না, লোকসভার সার্বভৌমত্বও খর্ব হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অর্থসম্বন্ধীয় বিল ছাড়া অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে ইংলন্ডের মত

ভারতীয় পার্লামেন্টেও কোন-না-কোন অবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিলটিকে নির্দিষ্ট কমিটিতে পাঠান হয়। এর কারণ হল এই যে, আধুনিক জনজীবন অত্যন্ত জটিল। ফলে, জীবনের এই বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনসভা যে আইন রচনা করার চেষ্টা করে, সেগুলি নিয়ে সূক্ষ্মভাবে বিচার করার মত বিশেষজ্ঞতা আইনসভার সমস্ত সদস্যদের থাকে না। তাছাড়া, আইনসভার হাতে সময় অত্যন্ত কম থাকে। সুতরাং প্রত্যেকটি বিল বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত নির্দিষ্ট কমিটিতে বিবেচনার জন্য পাঠাবার পর এই কমিটি যে বিবরণী দিয়ে থাকেন, আইনসভার কাছে বিলটি পুনরায় ফেরত আসার পর তৃতীয় পাঠের (Third Reading) সময়ে সংসদ-সদস্যদের সেটি খুব সাহায্য করে থাকে। এই জন্য ল্যাস্কি, ফাইনার, জেনিংস্ প্রভৃতি ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের বিশিষ্ট ভাষ্যকারগণ কমিটি ব্যবস্থাকে আধুনিক আইনপ্রণয়ন পদ্ধতির একটি মূল্যবান অঙ্গরূপে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডের মত ভারতেও সংসদের নিম্নকক্ষের বিরোধীদলের নেতাকে সভাপতি রেখে একটি জাতীয় গণনা-সংস্থা (Public Accounts Committee) গঠিত হয়। এর কাজ হল জাতীয় অর্থ অপচয় বন্ধ করা এবং সরকারকে সৎ, দায়িত্বশীল এবং তৎপর হতে বাধ্য করা। বিরোধীদলের নেতা সভাপতি থাকায় এই সংস্থার চূড়ান্ত বিবৃতিটি নিরপেক্ষ দলিল হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে পরিগণিত হয়।

ভারতের বাজেট পদ্ধতি (১) ব্রিটিশ্ পদ্ধতি গ্রহণ ; (২) কমিটির ভূমিকা বেশী গুরুত্বপূর্ণ : (৩) জাতীয় গণনাসংস্থায় বিরোধীদের ভূমিকা

॥ আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ॥

১৯৬৯ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডল (West Bengal Legislative Assembly) শুধু একটিমাত্র কক্ষ নিয়ে গঠিত। ফলে, পূর্বের তুলনায় বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি অনেক সহজ, সরল এবং দ্রুতভাবে চলে। **অর্থবিষয়ক বিল ছাড়া অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে** মন্ত্রিগণ সরকারী **বিল** উত্থাপন করেন, মন্ত্রিগণ ছাড়া অন্য কোন সদস্য কোনও বিল উত্থাপন করতে চাইলে সেটিকে বেসরকারী বিল বলে ধরা হয়। বেসরকারী বিল হলে সেটি উত্থাপনের পূর্বে রাজ্যবিধানসভার সদস্যকে এক মাসের নোটিশ দিতে হয়। স্পীকার ইচ্ছা করলে এর কম সময়ের ব্যবধানেও বিলটি উত্থাপনের অনুমতি দিতে পারেন। তারপর বিলটি একটি বিশিষ্ট সমিতির (Committee on Private Members' Bills) কাছে পাঠান হয়। কমিটি এটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করলে এটি উত্থাপনের জন্য অগ্রাধিকার দেবার প্রস্তাব করতে পারেন। তারপর সরকারী বিলের মত পদ্ধতি অনুসরণ করে রাজ্যবিধানসভা বিলটি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। সরকারী বিলের ক্ষেত্রে রাজ্যবিধানসভার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বিলটি উত্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। বিধানসভার অনুমতি পেলে বিলটি সেখানে "উত্থাপিত" বলে ধরা হয়। অবশ্য, এর আগে বিলটি সরকারী গেজেটে বা ইস্তাহারে প্রকাশিত হলেও সেটিকে "উত্থাপিত" বলে ধরে নেওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মন্ত্রিগণ অর্থবিল বাদে অন্য সরকারী বিল উত্থাপন করেন

রাজ্যবিধানসভায় কোনও বিল উত্থাপিত হবার পর সে সম্পর্কে বিলের বিষয় নিয়ে কোনও আলোচনা করা চলে না। এই সময়ে সদস্যগণ বিলটি বিবেচনার জন্য অথবা এটিকে নির্দিষ্ট কমিটিতে (Select Committee) পাঠাবার জন্য অথবা বিলটি জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে প্রচারের জন্য প্রস্তাব করতে পারেন। সাধারণতঃ বিরোধী দল বিলটি সাধারণ্যে প্রচারের জন্য প্রস্তাব করে থাকেন এবং সরকারপক্ষ তার বিরোধিতা করেন। এইভাবে বিলটির দ্বিতীয় পাঠ শুরু হয় এবং এ অবস্থায় বিলটির সাধারণ উদ্দেশ্য, উপকারিতা ইত্যাদি নিয়ে রাজ্যবিধানসভায় আলোচনা চলে। বিলটি সাধারণ্যে প্রচারের জন্য কমিটিতে পাঠান হলে সেই কমিটির মতামতসম্বলিত বিবৃতিসহ বিলটি বিধানসভায় ফেরত আসে। তখন বিলটির তৃতীয় পাঠ (Third Reading) শুরু হয়। বিলটি কমিটিতে না গেলেও বিধানসভায় সদস্যদের অধিকাংশের সম্মতি থাকলে এটির তৃতীয় পাঠ শুরু হয়। এই অবস্থায় বিলটির বিভিন্ন ধারাগুলি নিয়ে পৃথক্‌ভাবে এবং বিস্তৃতভাবে তর্কবিতর্ক চলে। সদস্যগণ ইচ্ছা করলে প্রত্যেকটি ধারার ওপর সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। শেষ পর্যন্ত সব কিছুর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় ভোটাভুটির দ্বারা। তখন বিলটি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গৃহীত হল বলে সেটি রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়। রাজ্যপালের অনুমোদন লাভ করলেই বিলটি আইনে (Act) পরিণত হয়।

নির্দিষ্ট কমিটির ভূমিকা : ৩টি পাঠ

অর্থবিষয়ক বিল অনুমোদন সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা একটা বিশেষ ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। ভারতীয় সংবিধানের ১৯৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের অর্থ থেকে ব্যয় করা অথবা বিনিয়োগ করা, ঐ তহবিলে অর্থ জমা দেওয়া, কর ধার্য, বিলোপ বা পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা যদি আইন-প্রণয়ন করতে চায়, তা হলে এই বিষয়ের বিলগুলি অর্থবিল বলে বিবেচিত হবে।

অ[illegible] ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের মত অর্থবিলকে প্রধানতঃ দুটি সাধারণ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কতকগুলি বিল সম্পূর্ণ-ভাবে অর্থসংক্রান্ত বিল। কিন্তু অন্য কতকগুলি বিলের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থব্যয় করার বা ঐ জাতীয় কোন সম্ভাবনার ইঙ্গিত থাকে। এই বিলগুলিও এক ধরনের অর্থসংক্রান্ত বিল। এই দুই ধরনের অর্থবিলই রাজ্যপালের সম্মতি ছাড়া বিধানসভায় উত্থাপিত করা যায় না।

রাজ্যপালের সম্মতি আবশ্যক

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেমন অর্থবিল কেবল নিম্নকক্ষেই অনুমোদন করা চলে, সেইরকম ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভার মধ্যে শুধু নিম্নকক্ষেই অর্থাৎ রাজ্য বিধানসভাতেই অর্থসংক্রান্ত বিল উত্থাপন করা যেত। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ অবলুপ্ত হবার পর থেকে অর্থবিল রাজ্য বিধান-সভাতেই প্রথম উত্থাপন করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় এই বিলটি

উত্থাপন করেন। উত্থাপিত হবার পর বিলটি অন্যান্য বিলের মতই প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পাঠের পর বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত বলে বিবেচিত হয়। দ্বিতীয় পাঠের ক্ষেত্রে বিলটির মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক হয় এবং ভোট হয়। কিন্তু তৃতীয় পাঠের সময় বিলটির প্রত্যেকটি ধারার ওপর বিতর্ক হয়, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সদস্যগণ সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন এবং ভোটাভুটির মাধ্যমে সব কিছুর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় উত্থাপিত কোন বিল অর্থসম্পর্কিত বিল, সে সম্পর্কে সভার সভাপতি অর্থাৎ স্পীকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে ধরা হয়। অর্থসংক্রান্ত বিল রাজ্যবিধানসভা কর্তৃক গৃহীত হলে সেটি অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছে তাঁর অনুমোদনের জন্য পাঠান হয় এবং তাঁর অনুমোদন লাভ করলে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

৩টি পাঠ

বাজেট পাশের ক্ষেত্রে সংসদে যে ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতেও তা করা হয়। বার্ষিক অর্থসংক্রান্ত বিবৃতিতে রাজ্যসরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের (Consolidated Fund) ওপর ধার্য ব্যয়রূপে বিবেচিত হয় এবং এগুলি রাজ্যবিধানসভার ভোটসাপেক্ষ নয়, যদিও বিধানসভা এগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারে। অন্যান্য ব্যয়গুলি অনুমোদনের জন্য বিধানসভার সম্মতি আবশ্যক। বাজেটের প্রথম অংশ এইভাবে উত্থাপিত ও বিতর্কিত হয়ে তার প্রত্যেকটি ব্যয়-মঞ্জুরের ক্ষেত্রে সদস্যগণ বিতর্ক করতে পারেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। তৃতীয় পাঠের ক্ষেত্রে ভোটাভুটি চলে এবং সাধারণতঃ ২১ দিন বাদে বাজেট বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত বলে বিবেচিত হয়। এর পর বাৎসরিক ব্যয় সংক্রান্ত বিল (Appropriation Bill) বিধানসভায় পেশ করা হয়। রাজ্যপালের সম্মতি নিয়ে এটি উত্থাপন করা হয়। এই বিলটি অনুমোদিত হলেই রাজ্যসরকারের বাজেটের মঞ্জুরীকৃত ব্যয়গুলির জন্য সরকার আইনতঃ অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা লাভ করেন।

বাজেট অনুমোদন পদ্ধতি ঃ ব্যয়সংক্রান্ত বিল ও অনুদান বিল

প্রত্যেক নতুন আর্থিক বছর শুরু হবার আগে রাজ্যসরকার বিধানসভায় প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করার অনুমতি চেয়ে দুটি বিল উত্থাপিত করেন—একটি হল হিসাবমত অনুদানের বিল (Votes on Account), অন্যটি হল হিসাবমত বিনিয়োগ বিল [Appropriation (Votes on Account) Bill]। এই দুটি বিল অনুমোদিত হলে নতুন আর্থিক বছরের বাজেট এবং বিনিয়োগ সম্পর্কিত আইন রাজ্যবিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত হবার আগেই রাজ্যসরকার শাসনপরিচালনার জন্য প্রয়োজনমত অর্থব্যয় করার অধিকার লাভ করেন। অতিরিক্ত অনুদান (Supplementary Grant), অতিরিক্ত ঋণগ্রহণের প্রস্তাব (Votes on Credit) অথবা জরুরী অনুদানের প্রস্তাব (Exceptional Grants) ইত্যাদির সাহায্যেও রাজ্যসরকার চলতি আর্থিক বছরে অধিক ব্যয় মেটাবার জন্য, বা খরা, বন্যা

কিভাবে বিলদুটি গৃহীত হয় ; অতিরিক্ত অনুদান বা ঋণ গ্রহণ প্রস্তাব

প্রভৃতি দুর্ঘটনার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য বিধানসভার কাছে অর্থব্যয়ের অনুমতি নেবার ব্যবস্থা করেন।

অর্থসংগ্রহের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাজেটের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে কর বা রাজস্ব-সম্পর্কিত প্রস্তাব (Annual Financial Statement) রাজ্যপালের অনুমতি নিয়ে মন্ত্রিসভা বিধানসভার কাছে পেশ করেন। এই প্রস্তাবটিও রাজ্যবিধানসভায় উত্থাপিত বাজেটের অন্যান্য অংশের মত একই পদ্ধতি অনুসারে বিধানসভা কর্তৃক, এবং অবশেষে রাজ্যপাল কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

রাজস্ব-সম্পর্কিত প্রস্তাব

॥ বিচার-বিভাগ : তার মর্যাদা ও স্বাধীনতা ॥

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী ভারতের তৎকালীন এটর্নি-জেনারেল (Attorney-General of India) শ্রীশীতলবাদ ভারতের উচ্চতম বিচারালয় অর্থাৎ সুপ্রীম্ কোর্টের উদ্বোধন উপলক্ষে ঘোষণা করেন যে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে নাগরিকদের যে বিভিন্নপ্রকার মৌলিক অধিকারগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি সংরক্ষণের জন্য বিচারবিভাগের কর্তৃত্ব থাকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৮ সালে ঘোষিত নেহরু-রিপোর্টে ভারতে এ-ধরনের একটি কেন্দ্রীয় উচ্চতম বিচারালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। ১৯৩৫ সালে ভারতশাসন আইন অনুসারে (Government of India Act, 1935) একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court) স্থাপিত হয়। কিন্তু এই আদালতটি, প্রকৃতপক্ষে, স্বাধীন ছিল না। কারণ, এটি শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলের (Privy Council) অধীন ছিল। সুতরাং ভারতের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানেই সর্বপ্রথম স্বাধীন এবং প্রকৃত মর্যাদাসম্পন্ন সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

বিচার-বিভাগের গুরুত্ব

মঁতেস্কিএ-র ঘোষিত ক্ষমতাবিভাজন নীতি কেবল একটি ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন-সহকারে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি মেনে চলে। সেটি হলঃ বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার নীতি। সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে বিচার-বিভাগই এই অর্থে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিভাগই অপরাধী সম্পর্কে সর্বশেষ মীমাংসক। শাসনবিভাগ যে আইনকানুনের ভিত্তিতে শাসন পরিচালনা করে, আইন-সভা সেগুলি রচনা করে থাকে। এই দুটি বিভাগ ক্ষমতার অপব্যবহার করলে বিচার-বিভাগ ছাড়া অন্য কোনও তৃতীয় পক্ষের কাছে প্রতিকার লাভ করা যায় না। সেজন্য বিচারবিভাগের স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য এবং মর্যাদা প্রত্যেক গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রই অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণের চেষ্টা করে থাকে। গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ পূজারী জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ গণতন্ত্রের পবিত্রতা এবং প্রাধান্য অব্যাহত রাখার পেছনে বিচার-বিভাগের ওপর গুরুতর দায়িত্ব আরোপ করেছেন। যে দেশের বিচারক পর্যন্ত উৎকোচের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হতে পারেন, তাঁর মতে, সে দেশ কত হতভাগ্য। মিথ্যা সাক্ষ্যদান যেমন নাগরিকের পক্ষে ঘোরতর অপরাধ, তেমনি বিচারকের অসাধুতা, প্রগল্ভতাও সমতুল্য অপরাধ। একজন প্রখ্যাত মার্কিন বিচারপতি যথার্থই বলেছেন যে, ন্যায়ধর্মের আলোকবর্তিকা যে-দেশে ঘন তমিস্রায় ম্লান হয়ে যায়, সে দেশের গ্লানি

মঁতেস্কিএ-র বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্যের নীতি সর্বজনগ্রাহ্য

কত ব্যাপক ! ("If the Lamp of Justice goes out in darkness, how great is the darkness !")। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

॥ বিচার-বিভাগের কার্যাবলী ॥

বিচারালয়ের কাজ

বিচারালয়ের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে ব্রাইস্ বলেছেন যে, তার দক্ষতার ওপর সরকারের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে। প্রাচীন কালে শাসনবিভাগ বিচারকার্যও পরিচালনা করত। সে ব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিচারালয়ের কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট।

(১) আইনের ব্যাখ্যা

প্রথমতঃ, বিচারালয় আইনের ব্যাখ্যা করে এবং আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে আইন বলতে আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত বিধান, সাংবিধানিক আইন, প্রথাগত আইন—সবকিছুই বোঝায়।

(২) "বিচারক প্রণীত" আইনের মূল্য

দ্বিতীয়তঃ, প্রযোজ্য আইন যথেষ্ট বলে বিবেচিত না হলে বিচারকগণ তাঁদের বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়বোধ অনুসারে সিদ্ধান্ত নেন। এ রায়গুলি পরবর্তী বিচারকদের কাছে "বিচারক-প্রণীত আইন" (Judge-made laws) রূপে প্রযোজ্য হয়। ফলে, বিচারকগণ আইনের শুধু ব্যাখ্যাকার নন, তাঁরা নতুন আইনের নজিরও সৃষ্টি করেন।

(৩) পরামর্শদান

তৃতীয়তঃ, অনেক সংবিধানের বিধি অনুসারে বিচারালয় শাসনবিভাগকে পরামর্শ দেয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রধান ধর্মাধিকরণের সঙ্গে কোন শাসনতান্ত্রিক বিষয় নিয়ে পরামর্শ করতে পারেন, অবশ্য তিনি সে পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য নন।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান রক্ষা, কেন্দ্র-অঙ্গরাজ্য বিরোধ মীমাংসা

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রধান বিচারালয় থাকাটাই একটা সাংবিধানিক আবশ্যকতা। লিখিত সংবিধানের রক্ষকরূপে সংবিধানের ব্যাখ্যা করা, কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে অথবা অঙ্গরাজ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হলে সুপ্রীম্ কোর্ট্ তার মীমাংসা করে। ভারতীয় প্রধান ধর্মাধিকরণের বা সুপ্রীম্ কোর্টের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

(৫) নাগরিক অধিকার-রক্ষা

পঞ্চমতঃ, ভারতের মত রাষ্ট্রের সংবিধানে বিচারালয়ের ওপর নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার ভার ন্যস্ত। এই উদ্দেশ্যে ভারতের সুপ্রীম্ কোর্ট্ বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকার-পৃচ্ছা ও উৎপ্রেষণ—এই ৫ প্রকার লেখ বা আদেশনামা (Writ) জারি করতে পারে।

(৬) অন্যান্য কাজ

ষষ্ঠতঃ, শাসনবিভাগ ব্যয়সঙ্কোচের জন্য নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ, মৃত ব্যক্তির বা নাবালকের সম্পত্তির তদারকি, দেউলিয়ার পক্ষে আদায়কারীর কাজ করা ইত্যাদি অন্যান্য কতকগুলি কাজও সম্পাদন করে।

॥ বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা কি কি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল ॥

বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা কতকগুলি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। সেগুলি হল—প্রথমতঃ, বিচারকগণের নিয়োগপদ্ধতি সন্তোষজনক হলে তবেই যোগ্য বিচারক নিযুক্ত হবেন। এ ক্ষেত্রে ৩টি পদ্ধতির কথা আলোচিত হয়। (ক) জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ নির্বাচন, (খ) আইনসভা কর্তৃক নির্বাচন, (গ) শাসনবিভাগ কর্তৃক মনোনয়ন।

(১) বিচারক নিয়োগ পদ্ধতি

ফরাসী বিপ্লবের সময়ে জনগণের দ্বারা বিচারক নিয়োগ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে, সোবিয়েত রাশিয়ার ও চীনের কতকগুলি আদালতের ক্ষেত্রে, এবং সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্যাণ্টনে (অঙ্গরাজ্যে) জনগণের ভোটে বিচারক নির্বাচিত হন। কিন্তু ল্যাস্কি, গার্নার প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ এই পদ্ধতির তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁদের মতে, কোন প্রার্থীর বিচারক হবার মত যোগ্যতা-বিচারের ক্ষমতা জনগণের নেই। জনগণ ভাবাবেগে বা উত্তেজনার অতিশয্যে ভুলভ্রান্তি করলে তার ফল মারাত্মক হয়। বিচারকগণ জনগণের তুষ্টিসাধনের জন্য তাদের পছন্দসই রায় দিয়ে যাবেন। জনপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রই সুবিচারক না-ও হতে পারেন। তাছাড়া, গণতন্ত্রের দলীয় শাসনতন্ত্রে বিচারকদের "গণমুখী" করার অর্থই হল : রাজনৈতিক দল, স্বার্থ-গোষ্ঠী ও চাপগোষ্ঠীর হাতে বিচার-ব্যবস্থাকে ইজারা দেওয়া। অনেকে বলেন যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের (Cultural Revolution) সময়ে চীনের গণ-আদালত (People's Court) অনেক ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে তাদের নৃশংসতার জন্য নিন্দিত হয়।

(ক) জনগণের দ্বারা নিয়োগ ত্রুটিপূর্ণ

আইনসভা কর্তৃক বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থার সমর্থনে বলা হয় যে এর ফলে বিচার-বিভাগের ওপর শাসনবিভাগের প্রভাব দূর হবে। সোবিয়েত রাশিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, আলবানিয়া, বুলগেরিয়া, বলিভিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে বিচারকগণকে আইনসভা নির্বাচন করে। কিন্তু এই ব্যবস্থার বিপক্ষে বিস্তর সমালোচনা হয়েছে। বলা হয় যে, সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভা রাজনৈতিক দলব্যবস্থার ভিত্তিতে গঠিত হয়। ফলে, আইনসভার দ্বারা বিচারক নির্বাচিত হলে কার্যতঃ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের কাছে বিচার-বিভাগকে ইজারা দেওয়া হয়।

(খ) আইনসভা কর্তৃক নিয়োগও ত্রুটিপূর্ণ

বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম দুটি পদ্ধতি দোষমুক্ত নয় বলে শাসনবিভাগ কর্তৃক বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থাটিকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। বর্তমানে পৃথিবীর বেশীর ভাগ রাষ্ট্রেই এই পদ্ধতি অনুসারে বিচারক নিয়োগ করা হয়। ল্যাস্কি উপদেশ দিয়েছেন—বিচার-বিভাগীয় মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে এবং ঊর্ধ্বতন বিচারকদের স্থায়ী কমিটির (Standing Committee) অনুমোদনক্রমে এই নিয়োগগুলি পাকা হওয়া উচিত। ভারতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাই অনুসরণ করা হয়। উপরন্তু ভারতে এই নিয়োগের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে প্রতিযোগিতা-মূলক ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হয়।

(গ) শাসনবিভাগ কর্তৃক নিয়োগ ব্যবস্থাই প্রচলিত

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন জননেতা ও সাংবিধানিক আলেকজান্ডার হ্যামিলটন বলেন যে, বিচারালয়ের স্বাধীনতা বিচারকদের কার্যকালের (tenure of office) ওপর নির্ভর করে। স্বল্পমেয়াদী কার্যকাল থাকলে বিচারকগণ দুর্নীতিপরায়ণ, বেপরোয়া বা চঞ্চলমতি হয়ে উঠতে পারেন। সুইজারল্যান্ডে জনগণের দ্বারা বেশীর ভাগ ক্যান্টনে অল্পকালের জন্য বিচারকগণ নির্বাচিত হন। তাঁরা পুনর্নির্বাচিত হলেও তাঁদের পদমর্যাদা ঠিকমত রক্ষা করতে পারেন না। মনে রাখা দরকার যে, সুইজারল্যান্ডে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত এবং এই দেশকে "আদর্শ গণতন্ত্র" বলা হয়।

(২) বিচারকদের কার্যকাল

তৃতীয়তঃ, বিচারপতিগণের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ওপরও বিচারালয়ের স্বাধীনতা অনেকাংশে নির্ভর করে। এগুলি আকর্ষণীয় না হলে বেশী পসারযুক্ত উকিল বা ব্যারিস্টারগণ (Barrister) বিচারক হতে চান না। তখন কম দক্ষ ব্যক্তিগণ বিচারক নিযুক্ত হতে পারেন। তা হলে বিচারালয়ের দক্ষতা ব্যাহত হতে পারে। বিচারপতিদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি বাবদ বরাদ্দ অর্থকে আইনসভার অনুমোদনসাপেক্ষ রাখার এবং তাঁদের কার্যকালের মধ্যে তাঁদের বেতন ভাতা ইত্যাদি হ্রাসের বিরুদ্ধেও অনেকে সুপারিশ করেন। ১৯৩১ সালে জাতীয় অর্থসঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যয়সঙ্কোচের জন্য ইংলণ্ডে একটি আইন গৃহীত হয়। এই আইন অনুসারে যখন বিচারকদের বেতন হ্রাসের প্রস্তাব নেওয়া হয়, তখন বিচারকগণ এই প্রস্তাবটিকে "বিচারালয়ের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ" বলে বর্ণনা করেন। ফলে, এ প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়।

(৩) বেতন, ভাতা ইত্যাদি সুবিধা

চতুর্থতঃ, বিচারালয়ের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা অনেকটা নির্ভর করে বিচারকদের পদোন্নতি, বদলি বা পদচ্যুতির পদ্ধতির ওপর। শাসনবিভাগ (অর্থাৎ, বিচারকদের নিয়োগকর্তা) যদি ইচ্ছামত বিচারপতিদের পদোন্নতি, বদলি বা পদচ্যুতির ব্যবস্থা করে, তাহলে বিচারকগণ ত্রস্ত, দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়বেন, তাঁরা স্বাধীনভাবে ও নির্ভীকভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারবেন না। ১৯৭৩ সালে প্রবীণতার দাবি (Seniority) মান্য না করে ভারতীয় প্রধান ধর্মাধিকরণে (Supreme Court) বিচারপতি অজিত নাথ রায়কে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হলে ঐ আদালতের ৩ জন প্রবীণতর বিচারপতি তীব্র প্রতিবাদ জানান ও পদত্যাগ করেন। ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণের ও মহাধর্মাধিকরণের (High Court) বিচারকগণকে শাসন-বিভাগ ইচ্ছামত বদলি করতে পারেন। অবশ্য, সে ক্ষেত্রে প্রধান ধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে রাষ্ট্রপতির পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যক। পদোন্নতি বা বদলির ক্ষেত্রে ভারতীয় পদ্ধতিগুলি অনেক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এগুলিকে বিতর্কাতীত রাখার চেষ্টা করা উচিত। ভারতে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের মোট সংখ্যাধিক্য এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ কোন বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে তবেই বিচার-পতিকে পদচ্যুত করা যায়। ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের মিলিত আবেদন পেলে তবেই রাজা বা রাণী বিচারপতিকে পদচ্যুত করতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয়

(৪) পদোন্নতি, বদলি, পদচ্যুতির পদ্ধতি

কংগ্রেসের বা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার নিম্নকক্ষ, প্রতিনিধিসভা (House of Representatives) বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে বিচারপতির অভিযুক্তি ঘোষণা (Impeachment) জারি হয়, উচ্চ কক্ষ সিনেট (Senate) বিচারের পর বিচারককে পদচ্যুত করতে পারে। এই সব সাংবিধানিক নিরাপত্তা রাখার অর্থই হল বিচারকদের নিরাপত্তাবিধান।

(৫) ক্ষমতাবিভাজন

পঞ্চমতঃ, মঁতেস্কিএর ক্ষমতাবিভাজন নীতির সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাবটি হল বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা। ভারতে ইংরেজ শাসনকালে শাসনবিভাগে কর্মরত আই. সি. এস. আমলাগণ বিচারপতি নিযুক্ত হতেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতেও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা থাকত। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে এ কুব্যবস্থা রহিত করা হয়েছে।

(৬) সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা

ষষ্ঠতঃ, মার্কস্‌বাদীগণ মনে করেন যে, কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রেই বিচারকগণ শ্রেণীবিহীন সংবিধানের ও সাম্যবাদী সমাজের কাঠামোর মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারবেন। তাঁদের মতে, ধনিক শ্রেণী সংবিধানকে তাদের ইচ্ছামত পরিচালিত করে এবং নিরপেক্ষ হবার ইচ্ছা থাকলেও এই ধরনের সংবিধানে বিচারকগণ তাঁদের সে ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন না।

॥ ভারতের বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ॥

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধানরচয়িতাগণ ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের ক্ষেত্রে এমন একটা বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, ভারতীয় বিচারব্যবস্থা সামগ্রিক, অখণ্ড, অবিচ্ছেদ্য এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্তরবিন্যস্ত (hierarchical)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যগত প্রশাসনে পৃথক্ সুপ্রীম্ কোর্ট্ আছে। তাদের নিজেদের এলাকায় তারা স্বাধীন। কিন্তু ভারতে সুপ্রীম্ কোর্ট্ বা প্রধান ধর্মাধিকরণ সর্বোচ্চ আপীল আদালত, যদিও তার অন্যান্য এক্তিয়ার বা এলাকাও আছে। তার নীচে অঙ্গরাজ্যগুলিতে আছে মহাধর্মাধিকরণ বা হাইকোর্ট্। তার নীচে আবার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতগুলি। সুতরাং প্রখ্যাত শাসনতন্ত্রবিদ্ ও ভারতীয় সংবিধানের প্রধান রচয়িতা ডক্টর আম্বেদকারের ভাষায় বলা যায় যে, ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থ সুপ্রীম্ কোর্ট্ থেকে শুরু করে সবচেয়ে নীচে পঞ্চায়ত পর্যন্ত ভারতের বিচারব্যবস্থা স্তরবিন্যস্ত।

ভারতীয় বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য : (১) অখণ্ড অবিচ্ছেদ্য, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্তরবিন্যস্ত

(২) দেওয়ানী, ফৌজদারী আইন সর্বত্র একই

দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজ আমলের মত এখনও ভারতের সর্বত্র একই দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রচলিত। ফলে, দেশের সর্বত্র একই নিয়মকানুন অনুসরণ করে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতগুলি তাদের কাজকর্ম সম্পাদন করে।

তৃতীয়তঃ, ফরাসীদেশে সম্প্রতি "দ্রোয়া আদ্‌মিনিস্ত্রাতিফ্‌" (Droit Administratif) অনুসারে শাসনবিভাগীয় বিচারব্যবস্থা (Administrative Courts) চালু রয়েছে। ইংলণ্ডে ও ভারতেও এই ধরনের প্রশাসনিক বিচারব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। তদনুসারে সরকারী বা বেসরকারী কর্মীদের চাকরী সম্পর্কিত বিরোধ মীমাংসার জন্য ট্রাইবুনাল (Tribunal) নামক বিশেষ ধরনের শাসনবিভাগীয় বিচারব্যবস্থা প্রবর্তিত। আইনসভাগুলিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বিচারালয় গঠন করতে পারে।

(৩) ফরাসী ও ব্রিটিশ্‌ ঢঙ-এ প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল্‌

চতুর্থতঃ, আইনের চক্ষে নাগরিকগণ সমান বলে বিবেচিত হলেও সুপ্রীম্‌ কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি প্রভৃতি ব্যক্তিদের বিচারের জন্য, অথবা রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার স্পীকার প্রভৃতির বিচারের জন্য বিশেষ বিচারপদ্ধতি নির্দিষ্ট। এই উচ্চ পদাধিকারীদের অনেকের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতের কোনও মামলা দায়ের করা যায় না। অবশ্য সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনী আইনে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন সম্পর্কিত কোন বিরোধের ক্ষেত্রকে সুপ্রীম্‌ কোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত করা হয়েছে।

(৪) উচ্চপদাধিকারীদের বিশেষ সুযোগ

পঞ্চমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সুপ্রীম্‌ কোর্টের তুলনায় ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সুপ্রীম্‌ কোর্ট্‌ অনেক দুর্বল। কারণ, সংবিধানে নির্দিষ্ট ক্ষমতার সীমারেখার মধ্যে থেকে পার্লামেন্ট্‌ তার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে নানা প্রকার আইনকানুন তৈরী করতে পারে।

(৫) মার্কিন সুপ্রীম্‌ কোর্টের শক্তি বেশী

ষষ্ঠতঃ, ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোথাও বিচারব্যবস্থাকে গণমুখী করার কোন উদ্যোগ নেই। নেই কোন ভ্রাম্যমাণ বিচার সভা, নেই মোঘল যুগের মত কোন আম দরবার বা চীনা প্রজাতন্ত্রের মত বর্তমান সমাজতন্ত্রীদেশে প্রচলিত গণআদালত (People's Court)। ইংরেজ আমলে প্রচলিত জুরিব্যবস্থাও (Trial by Jury) বর্তমানে অনেক সীমিত।

(৬) পঞ্চায়েত ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে গণমুখী নয়

সপ্তমতঃ, ভারতীয় বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা ও ব্যয়বাহুল্য এখন প্রবাদবাক্যে পরিণত। বারোচৌদ্দ বছরের আগে অনেক সময় মামলার-মীমাংসা হয় না। দীর্ঘকাল ধরে মামলা চলার দরুন মামলা চালাতে বিবদমান ব্যক্তিদের প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যয়িত হয়।

(৭) দীর্ঘসূত্রতা, ব্যয়বাহুল্য

অষ্টমতঃ, দরিদ্র ব্যক্তিদের পক্ষে বিনা ব্যয়ে আইনের সাহায্য দেবার জন্য সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী আইনে ব্যবস্থা রাখা হয়। তবে এই ব্যবস্থা এখনও ব্যাপকভাবে বাস্তবায়িত হয় নি।

(৮) দরিদ্রদের অসুবিধা

॥ ভারতের বিচারব্যবস্থার ছক ॥

ভারতের বিচারবিভাগের শীর্ষে রয়েছে সুপ্রীম কোর্ট (Supreme Court) এবং সবচেয়ে নীচে অঙ্গরাজ্যগুলিতে রয়েছে মুন্সেফী আদালত বা পঞ্চায়েত। একটি ছকের সাহায্যে ভারতের বিচারব্যবস্থার সামগ্রিক রূপটি সহজে বোঝা যায়।

- (কেন্দ্রীয়) সুপ্রীম্ কোর্ট্
  - (অঙ্গরাজ্যের) হাইকোর্ট্
    - জেলা ও দায়রা জজের আদালত
    - প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত
      - সাবজজের আদালত (দেওয়ানী)
        - মুন্সেফী আদালত
        - পঞ্চায়েত
      - জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত (ফৌজদারী)
        - নিম্ন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত
        - পঞ্চায়েত
    - প্রেসিডেন্সী ছোট মামলার আদালত
    - সহরের দেওয়ানী ও দায়রা আদালত

॥ ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণ : কেন্দ্রীয় ও সর্বোচ্চ বিচারালয় (সুপ্রীম্ কোর্ট্) ॥

সুপ্রীম্ কোর্ট্ বা প্রধান ধর্মাধিকরণ ভারতের বিচারব্যবস্থার শীর্ষে। ভারতীয় সংবিধানের ১২৪ ধারা অনুসারে প্রথমে একজন প্রধান বিচারপতি এবং অনধিক ৭ জন বিচারপতি নিয়ে এই আদালত গঠিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৫৬ সালে এবং ১৯৬০ সালে ভারতীয় পার্লামেন্ট্ বিশেষ আইনের বলে স্থির করেন যে, এই কোর্টে যথাক্রমে ১০ জন এবং ১৩ জন বিচারপতি থাকবেন। বর্তমানে এই কোর্টে বিচারপতি ও ১৭ জন বিচারপতি আছেন। রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার, এবং ১ জন প্রধান প্রয়োজন বোধ করলে সুপ্রীম্ কোর্টের এবং ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলির হাইকোর্টের বিচারপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে সুপ্রীম্ কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। সুপ্রীম্ কোর্টের বিচারপতি ভারতের নাগরিক হবেন, তাঁর আইনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতা থাকা চাই, অথবা অন্ততঃ ১০ বৎসর কোন হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট রূপে কাজ করা চাই।

ভারতীয় সুপ্রীম্ কোর্ট্ঃ সংগঠন

বিচারপতিগণ ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকেন। রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত-ভাবে বিচারপতিগণ পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারেন। সংসদের প্রত্যেক কক্ষের মোট সভ্যসংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সভ্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য সুপ্রীম্ কোর্টের কোন বিচারপতিকে কোন গুরুতর অপরাধে পদচ্যুত করার প্রস্তাব

গ্রহণ করলে রাষ্ট্রপতি তদনুসারে তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন। এই বিশেষ ব্যবস্থাটির দ্বারা সুপ্রীম্ কোর্টের বিচারপতিদের স্বাধীনভাবে এবং প্রকৃত মর্যাদার সঙ্গে কাজ করার মত আত্মসম্মানবোধ এবং নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। সুপ্রীম্ কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাসিক ৫০০০ টাকা এবং অন্য বিচারপতিগণ প্রত্যেকে মাসিক ৪০০০ টাকা বেতন ও অন্যান্য ভাতা পান। ১৯৮৫ সালের ২০শে মে পার্লামেন্ট্ যে আইন অনুমোদন করেছে, তদনুসারে সুপ্রীম্ কোর্টের বিচারকদের পাথেয় বাবদ মাসিক দক্ষিণা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কেবলমাত্র ভারতের কোনও আর্থিক সঙ্কটের জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলেই রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের এই বেতন, ভাতা প্রভৃতি পরিবর্তন করতে পারেন। তাঁদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি ভারতীয় রাষ্ট্রের সঞ্চিত তহবিলের ওপর ধার্য ব্যয় (Expenditure charged on the Consolidated Fund of the Union) বলে গণ্য হয়। তাঁদের এই বেতন, ভাতা প্রভৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যও তাঁদের মানমর্যাদা, স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি রক্ষা করা। তাছাড়া, বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের পর তাঁদের ভারতের কোন বিচারালয়ে বা কোনও কর্তৃপক্ষের তরফে ওকালতি করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর ফলেও সুপ্রীম্ কোর্টের বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিচারপতিদের মর্যাদা

সুপ্রীম্ কোর্টের এলাকাক্ষেত্রগুলি হল—প্রথমতঃ, **মৌলিক এক্তিয়ার** (Original Jurisdiction); দ্বিতীয়তঃ, **আপীল বিষয়ক এক্তিয়ার** (Appellate Jurisdiction); তৃতীয়তঃ, **পরামর্শদানের এক্তিয়ার** (Advisory Jurisdiction); চতুর্থতঃ, **মৌলিক অধিকার রক্ষার এক্তিয়ার**; পঞ্চমতঃ, **অন্যান্য ক্ষমতার এক্তিয়ার**। প্রথমতঃ, সুপ্রীম্ কোর্টের **মৌলিক এক্তিয়ারের** মধ্যে পড়ে প্রধানতঃ ভারত সরকার এবং কোনও অঙ্গরাজ্য সরকারের, অথবা একাধিক অঙ্গরাজ্য সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতা সংক্রান্ত বা আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা নিয়ে কোনও বিবাদ হলে তার মীমাংসা করা। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতের বা সুপ্রীম্ কোর্টের মৌলিক এক্তিয়ারের সমতুল্য। তবে সংবিধান প্রচলিত হবার আগে সম্পাদিত সনদ, সন্ধি, চুক্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে সুপ্রীম্ কোর্টের মৌলিক এক্তিয়ার কার্যকর হতে পারে না।

(১) মৌলিক এক্তিয়ার

দ্বিতীয়তঃ, সুপ্রীম্ কোর্টের **আপীলবিষয়ক এক্তিয়ার** তিন ধরনের মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে জড়িত হতে পারে—শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে আপীল, দেওয়ানী মামলা নিয়ে আপীল এবং ফৌজদারী মামলা নিয়ে আপীল। ভারতের অঙ্গরাজ্যের কোন হাইকোর্ট কোনও মামলা সম্পর্কে যদি মতামত (Certificate) প্রদান করে যে, ঐ মামলাটির সঙ্গে সংবিধান-সম্পর্কিত কোনও গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত, তা হলে, কিংবা সেরকম মতামত কোনও হাইকোর্ট প্রকাশ না করলেও যদি সুপ্রীম্ কোর্ট মনে করে যে, সংশ্লিষ্ট মামলাটির সঙ্গে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কোনও জটিল আইনের প্রশ্ন জড়িত, তা হলে সেই মামলায় প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম্ কোর্টের কাছে আপীল করা চলতে পারে। দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে যদি হাইকোর্ট মনে করে যে, মামলাটির সঙ্গে অন্ততঃ বিশ

(২) আপীল-বিষয়ক এক্তিয়ার

হাজার টাকা মূল্যের কোনও সম্পত্তি জড়িত, অথবা যদি মামলাটি সুপ্রীম কোর্টের কাছে আপীল করার যোগ্য, অথবা মামলাটির সঙ্গে কোনও জটিল সাংবিধানিক আইনের প্রশ্ন জড়িত, তা হলে সেই দেওয়ানী মামলায় প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলে। ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে যদি হাইকোর্ট কোনও আসামীর মৃত্যুদণ্ড দেয়, কিংবা নিম্নতর কোর্টের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত হাইকোর্ট বাতিল করে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, অথবা সাধারণভাবে যদি হাইকোর্ট মনে করে যে, এই মামলাটিতে প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলতে পারে, অথবা মামলাটির সঙ্গে সংবিধানের কোনও গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রস্তাব জড়িত, তা হলে হাইকোর্ট থেকে সেই ফৌজদারী মামলায় প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলে। শুধু হাইকোর্ট নয়, ভারতের যে-কোনও আদালতের যে-কোনরকম সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট তার কাছে আপীল করার বিশেষ অনুমতি (Special Leave) দিতে পারে।

(৩) পরামর্শদানের এক্তিয়ার

সুপ্রীম কোর্টের তৃতীয় এক্তিয়ার হল **পরামর্শদানের এক্তিয়ার**। এই এক্তিয়ার অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতিকে ভারতীয় সংবিধানের ১৪৩ ধারা অনুযায়ী কোনও-আইনসংক্রান্ত বা শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য উপদেশ দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি অবশ্য সেই উপদেশ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য নন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রপতি ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী আইন এবং ১৯৫৯ সালের কেরালা সরকারের শিক্ষাসংক্রান্ত আইনের বৈধতা সম্পর্কে, ১৯৫৯ সালের নেহেরু-নুন চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানের কাছে বেরুবাড়ি হস্তান্তর সম্পর্কে, এবং ১৯৬৪ সালে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা এবং আদালতের অধিকার সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করেন।

(৪) নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার এক্তিয়ার

চতুর্থতঃ, ভারতীয় সংবিধানে ঘোষিত নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলি সংরক্ষণ করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের ওপর অর্পিত হয়েছে। এই সূত্রে প্রয়োজন বোধ করলে কোর্ট বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকারপৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ প্রভৃতি লেখ (Writ) বা হুকুমনামা জারী করতে পারে। ১৯৭৮ সালে গৃহীত ভারতীয় সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনী আইন অনুসারে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলেও জীবনের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পর্কিত নাগরিক অধিকার বলবৎ থাকবে। সুতরাং জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রেও মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘনের প্রতিকাররূপে সুপ্রীম কোর্টের লেখ জারী করার ক্ষমতা খর্ব করা হয় নি।

(৫) অন্যান্য ক্ষমতার এক্তিয়ার

পঞ্চমতঃ, ভারতের সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য নানা ক্ষমতাও রয়েছে। সংবিধান এই আদালতকে অভিলেখ বিচারালয় (Court of Records) রূপে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছে। কোর্ট নিজের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ পুনর্বিবেচিত করতে পারে, আদালত অবমাননাকারীদের শাস্তি দিতে পারে, প্রয়োজনমত কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে, অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্ট থেকে অন্য অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্টে মামলা স্থানান্তরিত করতে

পারে। সংবিধান সংশোধনের বৈধতা বিচারের এক্তিয়ার না থাকলেও সুপ্রীম্ কোর্ট্ সংশোধনী আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে। তবে কেন্দ্রীয় বা অঙ্গরাজ্যের আইনের সাংবিধানিক বৈধতা বিচারের জন্য কোর্টের বিশেষ সাংবিধানিক এজলাসে (Constitution Bench) মামলাটি আনা হয়। কোর্টের অন্ততঃ ৭ জন বিচারপতির উপস্থিতিতে এবং মোট বিচারপতিদের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি থাকলে তবেই সুপ্রীম্ কোর্ট্ সাংবিধানিক আইনকে অবৈধ (ultra vires) বলে সিদ্ধান্ত দিতে পারে।

ভারতের সংবিধান রচনার সময় আশা করা হয় যে, সুপ্রীম্ কোর্ট্ ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়রূপে নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করবে এবং সংবিধানের অভিভাবকরূপে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারের পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের যথোচিত, সন্তোষজনক মীমাংসার চেষ্টা করবে। কিন্তু কার্যতঃ ভারত সরকারের এবং বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য সরকারের অনেক প্রগতিশীল আইন হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম্ কোর্ট বাতিল করে দিয়েছে। পাটনা হাইকোর্ট্ বিহার সরকারের দ্বারা গৃহীত জমিদারী উচ্ছেদ আইনের বিরুদ্ধে দ্বারভাঙ্গার মহারাজার দাবীকে বৈধ বলে ঘোষণা করে। কোর্ট্ সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিহার সরকারের এই আইন সম্পত্তির অধিকারের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের ওপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছে। কোর্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারত সরকারকে সংবিধান প্রচলিত হবার পরের বছরেই অর্থাৎ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত ধারাটিকে এমনভাবে সংশোধন করতে হয়, যার ফলে সরকার সার্বিক স্বার্থে এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার অনুসারে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারবে। ১৯৬৭ সালে গোলোকনাথ বনাম পাঞ্জাব সরকার মামলাটিতে রায় দিতে গিয়ে সুপ্রীম্ কোর্ট্ ঘোষণা করে যে, পার্লামেন্ট্ মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে এমনভাবে আইনপ্রণয়ন করতে পারবে না, যার ফলে এই অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকার কর্তৃক ব্যাঙ্ক্ জাতীয়করণের বিধানটি সুপ্রীম্ কোর্ট্ বাতিল করে দেবার সময় মন্তব্য করে যে, এই আইনটি ব্যাঙ্কগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেবার ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত শাসনতান্ত্রিক বিধান লঙ্ঘন করেছে। ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতীর মামলায় রায় দান করতে গিয়ে সুপ্রীম্ কোর্ট্ সিদ্ধান্ত নেয় যে, পার্লামেন্ট্ সার্বিক স্বার্থে মৌলিক অধিকারগুলির ওপরেও প্রয়োজনমত নানাপ্রকার পরিবর্তন ঘটিয়ে আইনপ্রণয়ন করতে পারে বটে, কিন্তু শাসনতন্ত্রের কতকগুলি বিশিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও মৌলিক রদবদল করার অধিকারী নয়। ১৯৮০ সালের মিনার্ভা মিল্স্ মামলাতেও কোর্ট্ অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করে। সুপ্রীম্ কোর্টের এই ধরনের নানাপ্রকার মতামত প্রকাশের ফলে ভারত সরকারকে প্রায়ই কোর্টের প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে স্মরণ রেখে মৌলিক অধিকার সম্পর্কে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার প্রগতিশীল আইনকানুন প্রচলন করার জন্য অসংখ্যবার সংবিধান সংশোধন করতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, এর ফলে কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করার চেষ্টা করেন, যার জন্য মনে হয় যে, ভারতের সুপ্রীম্ কোর্টের এবং হাইকোর্টের বিচারপতিদের সরকারী প্রগতিশীল কর্ম-

উপসংহার ঃ সুপ্রীম্ কোর্টের ভবিষ্যৎ

সূচী, দৃষ্টিভঙ্গী এবং আইনকানুনের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতির অভাব রয়েছে। এই উপলক্ষে সরকার তরফ থেকে অনেকে বিচারপতিদের এই ধরনের সহানুভূতির প্রতি সদিচ্ছা প্রকাশ (Committed Judiciary) দাবী করেন। সুপ্রীম্ কোর্ট্ যদি যথোচিত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সরকারের উদারনৈতিক এবং সমাজতন্ত্রবাদী কর্মসূচীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ না করেন, তা হলে বারে বারে ভারত সরকারকে সংবিধান সংশোধনের জন্য সচেতন এবং সচেষ্ট থাকতে হবে। এই ধরনের পরিস্থিতি ভারতের মত উন্নয়নকামী দেশের পক্ষে খুবই দুঃখজনক, সন্দেহ নেই।

॥ ভারতের অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন আদালত : মহাধর্মাধিকরণ বা হাইকোর্ট্ ॥

মহাধর্মাধিকরণ (হাইকোর্ট্)

অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও হাইকোর্ট্ হল সর্বোচ্চ আদালত। অবশ্য, সংবিধানের ২৩১ ধারা অনুসারে পার্লামেণ্ট্ই দুই বা ততোধিক অঙ্গরাজ্যের জন্য একটি হাইকোর্ট রাখার ব্যবস্থা অনুমোদন করতে পারেন।

সংগঠন

রাষ্ট্রপতি পশ্চিমবঙ্গ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং তাঁর পরামর্শক্রমে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ করে থাকেন। অবশ্য, হাইকোর্টে কাজের চাপ বেড়ে গেলে দুই বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি অতিরিক্ত বিচারপতিও নিযুক্ত করতে পারেন। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইন অনুসারে হাইকোর্টের বিচারপতি ৬২ বছর পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকেন।

বিচারপতি নিয়োগ পদ্ধতি

অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্ট্গুলিকে ভারতের সংবিধানরচয়িতাগণ ভারতের সামগ্রিক এবং সুসংহত বিচারব্যবস্থার মূল ভিত্তিরূপে চিন্তা করেছিলেন। তাই তাঁরা শাসনতন্ত্রে প্রস্তাব রেখেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মত অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্ট্গুলির বিচারপতি নিয়োগের সময় সংশিলষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালকে ভারতের সুপ্রীম্ কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। সুপ্রীম্ কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি এক অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিকে অন্য অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে বদলী করতেও পারেন।

বিচারপতির পদত্যাগ, বেতন

হাইকোর্টের কোন বিচারপতি রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র পেশ করলে অথবা সুপ্রীম্ কোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হলে, অথবা অন্য কোনও হাইকোর্টে বদলী হলে ৬২ বছর বয়স পূর্ণ হবার আগেই তাঁর পদটি খালি বলে ধরে নিতে হয়। এ ছাড়া, পার্লামেণ্টের মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা অনুমোদিত পদচ্যুতির প্রস্তাব গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের বিচারককে পদচ্যুত করতে পারেন। হাইকোর্টের বিচারপতি মাসিক ৩৫০০ টাকা এবং প্রধান বিচারপতি মাসিক ৪০০০ টাকা বেতন পান। তা ছাড়া, তাঁরা সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত ভাতা, পেনসন প্রভৃতিও পেয়ে থাকেন। রাষ্ট্রপতি ভারতে

কোনপ্রকার অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে যদি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন, তবেই হাইকোর্টের কোনও বিচারপতির মাহিনা প্রভৃতি কমানো যেতে পারে। এইভাবে হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন, চাকুরীর নিরাপত্তা প্রভৃতি সংরক্ষণের দ্বারা ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতাগণ অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিদের সম্মান, মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

বিচারপতি হবার যোগ্যতা

হাইকোর্টের বিচারপতি হতে হলে ভারতের বিচারবিভাগীয় কোন পদে অন্ততঃ ১০ বছর কাজ করতে হবে, অথবা কোন হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেটরূপে কাজ করতে হবে। বিচারকদের অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে এবং তাঁদের বয়স ৬২ বছরের কম হতে হবে। হাইকোর্টের কোনও প্রাক্তন বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টে কিংবা হাইকোর্টে ছাড়া ভারতের অন্য কোনও আদালতে ওকালতি করতে পারেন না।

বিচারপতির কার্যকাল

হাইকোর্টের বিচারকগণ ৬২ বছর বয়স পর্যন্ত নিজপদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন। তবে এর আগেই বিচারপতির কার্যকাল শেষ হতে পারে, যদি তাঁর মৃত্যু হয়, যদি তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন, যদি তিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন বা অন্য কোনও হাইকোর্টে বদলি হন, অথবা যদি তাঁকে সংবিধানে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী পদচ্যুত করা হয়। ১৯৮৫ সালের ২০শে মের অনুমোদিত আইন অনুসারে হাইকোর্টের বিচারপতিদের মাসিক পাথেয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই আইন অনুসারে কোন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের বাইরে থেকে নিয়োগ করা হবে।

হাইকোর্টের এক্তিয়ার
(১) মৌলিক এক্তিয়ার

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ২২৫ ধারা অনুসারে ভারতীয় সংবিধান চালু হবার আগে যে ক্ষমতাগুলি হাইকোর্ট ভোগ করত, সেই ক্ষমতাগুলি ভোগ করার জন্য তার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। প্রথমতঃ, স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রচলিত হবার পর রাজস্ব-সম্পর্কিত বিষয়গুলিও হাইকোর্টগুলির এক্তিয়ারভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের সর্বপ্রধান দেওয়ানী আদালত ও মূল বিচারালয়রূপে কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে। ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রেও এই তিনটি হাইকোর্ট প্রধান বিচারালয়রূপে পরিগণিত হত। তবে বর্তমানে কেবলমাত্র কলকাতা হাইকোর্টই এই ক্ষমতাগুলি ভোগ করে থাকে, মাদ্রাজ ও বোম্বাই হাইকোর্টের ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে আগেকার মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত কোন ক্ষমতা নেই।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে ভারতের প্রত্যেক হাইকোর্টের বিশেষ ক্ষমতা আছে। সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুযায়ী নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকারগুলি ভারতীয় শাসনতন্ত্র স্বীকার করে নিয়েছে, সংশ্লিষ্ট হাইকোর্ট নিজ এলাকার মধ্যে সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে কোনও কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি প্রভৃতির কাছে নানাপ্রকার লেখ (Writ) নির্দেশ বা তাদের কোন আচরণের

কারণ দেখাবার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারী করতে পারে। ৪৪তম সংশোধনী আইনেও কোর্টের এই ক্ষমতা বলবৎ আছে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে রমেশ থাপা বনাম মাদ্রাজ রাজ্যসরকারের মামলা নিয়ে বিচার করতে গিয়ে বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রী বলেন যে, সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুসারে হাইকোর্টের ওপর নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করার যে গুরুতর দায়িত্ব ভারতীয় সংবিধানে হাইকোর্টকে দেওয়া হয়েছে, হাইকোর্ট কখনই তা উপেক্ষা করতে পারে না। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি নাসিরউল্লা বেগ একটি মামলায় সিদ্ধান্ত দিতে গিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, ভারতীয় সংবিধানে শাসনব্যবস্থার নানা ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব শুধু শাসনবিভাগের হাতেই অর্পণ করা হয় নি, অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্টগুলির হাতেও এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

(২) নাগরিকের অধিকার রক্ষা

তৃতীয়তঃ, হাইকোর্টই হল প্রত্যেক অঙ্গরাজের সর্বোচ্চ আপীল আদালত। দেওয়ানী এবং ফৌজদারী সব রকম মামলা নিয়ে কোনও ব্যক্তি অঙ্গরাজ্যের নিম্নতর আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করতে পারে। হাইকোর্ট অনুমতি দিলে তবেই হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়।

(৩) আপীলসংক্রান্ত এক্তিয়ার

চতুর্থতঃ, সংবিধানের ২২৮ ধারা অনুযায়ী কোনও হাইকোর্ট যদি মনে করে যে নিম্ন আদালতে বিচারাধীন কোনও মামলার সঙ্গে সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোনও গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন (Substantial Question of Law) জড়িত, তা হলে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্ট সেই মামলা নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। আদালতের অবমাননার জন্য হাইকোর্ট অবমাননাকারীকে দণ্ড দিতে পারে। সংবিধানের ২২৭ ধারা অনুসারে সামরিক ট্রাইবুনাল (Military Tribunal) ছাড়া অঙ্গরাজ্যের অন্য সমস্ত নিম্নতর আদালত এবং ট্রাইবুনালের ওপর হাইকোর্ট তত্ত্বাবধায়করূপে কাজ করে থাকে।

(৪) অন্যান্য এক্তিয়ার

(৫) প্রশাসনিক আদালতের ওপর কর্তৃত্বের ক্ষমতা

পঞ্চমতঃ, প্রশাসনিক আদালতগুলির (Administrative Tribunals) ক্ষেত্রেও উচ্চতর আদালতরূপে তাদের ওপর তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা হাইকোর্টকে দেওয়া হয়েছে।

(৬) প্রাতিষ্ঠানিক স্তরবিন্যাস সাধন

ষষ্ঠতঃ, ভারতীয় বিচারব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্তরবিন্যস্ত (hierarchical) থাকায় হাইকোর্টের মাধ্যমেই অঙ্গরাজ্যের অধস্তন আদালতগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় ও দেশের সর্বত্র একটা সুসংহত বিচারব্যবস্থা চালু থাকতে পারে।

১৯৭৬ সালের ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী আইন অনুসারে, হাইকোর্টগুলির ক্ষমতা বহুল পরিমাণে হ্রাস করা হয়। কিন্তু ১৯৭৭ সালের ৪৩তম সংশোধনী আইন এবং ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংশোধনী আইন অনুসারে, হাইকোর্টগুলি পূর্বের ক্ষমতা আবার ফিরে পেয়েছে।

৪২তম, ৪৩তম, ৪৪তম সংশোধন

হাইকোর্টের ক্ষমতা নানা কারণে **সীমাবদ্ধ**। প্রথমতঃ, ভারতীয় পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন করে হাইকোর্টের ক্ষমতা হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারে। ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম, ৪৩তম, এবং ৫৪তম সংশোধনী আইনের নজিরগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

হাইকোর্টের ক্ষমতা সীমিত : (১) সাংবিধানিক

দ্বিতীয়তঃ, সামরিক ও অন্যান্য ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা যায় না। এই ক্ষেত্রগুলিতে হাইকোর্টের আপীল এলাকা সীমিত।

(২) সামরিক ট্রাইবুনাল

উপসংহার

এই সমস্ত কারণে অনেকে মনে করেন যে, ভারতের অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্টগুলির ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতের চেয়ে অনেক কম।

॥ ভারতীয় অঙ্গরাজ্যের নিম্ন আদালতসমূহ ॥

ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে যে সমস্ত নিম্ন আদালত আছে, সেগুলি দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিচারব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত বিচারালয়ে যে বিচারকগণ বিচারকার্য সম্পাদন করেন, তাঁদের মধ্যে আছেন জেলা জজ, দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ, সহকারী দায়রা জজ, ছোট আদালতের প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট, সাব-জজ, মুন্সেফ প্রভৃতি।

জেলার বিচার-ব্যবস্থা

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ২৩৩ ধারা অনুসারে রাজ্যপাল অঙ্গরাজ্যের নিম্ন আদালতগুলির বিভিন্ন বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। এঁদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে থাকেন। জেলা জজ জেলার বিচারবিভাগের প্রধান। তিনি রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। কোনও ভারতীয় নাগরিক অন্ততঃ ৭ বছর হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট কিংবা আইনজীবীরূপে কাজ করলে এবং হাইকোর্ট তাঁকে মনোনীত করলে রাজ্যপাল তাঁকে জেলা জজের পদে নিযুক্ত করেন।

বিচারকদের নিয়োগ ইত্যাদি

অঙ্গরাজ্যের অন্য বিচারপতি নিয়োগকালে রাজ্যপাল সেই অঙ্গরাজ্যের রাষ্ট্রকৃত্যকের (State Public Service Commision) সুপারিশ গ্রহণ করেন। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্ট সাধারণভাবে সমস্ত নিম্ন আদালতগুলির কার্যাবলী সুসংহত, সুসংবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত রাখার চেষ্টা করে।

রাজ্যপালের ভূমিকা

দেওয়ানী বিচার : আগে প্রত্যেক গ্রামে যে ইউনিয়ন বোর্ড (Union Board) কাজ করত, তারা গ্রামের দেওয়ানী বিচারের নিম্নতম আদালতরূপে কাজ করত। ইউনিয়ন বোর্ডগুলি অবলুপ্ত হবার পর এই কাজ সম্পাদন করে বিভিন্ন গ্রামের ন্যায় পঞ্চায়ত আদালত। ন্যায় পঞ্চায়ত যে সমস্ত দেওয়ানী মামলায় দাবি-দাওয়ার পরিমাণ সামান্য টাকা, সেই মামলাগুলির বিচার করে থাকে। এর ফলে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত আদালতে তাদের মামলার বিচারের জন্য যাতায়াত করতে পারে, এ বাবদ ব্যয়ও হয় অল্প। মুন্সেফী আদালত এই পঞ্চায়ত আদালতগুলির সিদ্ধান্ত

দেওয়ানী বিচার : ন্যায়পঞ্চায়ত

বাতিল করে দিতে পারে। ১ হাজার টাকা থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত মূল্যের সম্পত্তিসংক্রান্ত মামলার বিচার মুন্সেফী আদালতে হয়।

প্রত্যেক মহকুমা ও জেলা শহরে মুন্সেফী আদালত (Munsiff's Court) থাকে। যেখানে থানা আছে সেখানে, বা কোন বর্ধিষ্ণু গ্রামেও মুন্সেফী আদালত দেখা যায়। মুন্সেফগণ তাঁদের পদাধিকার অনুসারে বেশী বা কম গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচারকার্য সম্পাদন করে থাকেন। মুন্সেফী আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এদের উচ্চতর আদালতে, অর্থাৎ সাব্‌জজের আদালতে আপীল করা যায়।

মুন্সেফ

সাধারণতঃ জেলা শহরে সাব্‌-জজের আদালত (Sub-Judge's Court) থাকে। নিম্নতর আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করা ছাড়াও সাব্‌জজ আদালতের মূল বিচারের এক্তিয়ারও আছে। দেওয়ানী মামলায় দাবি-দাওয়ার মূল্য বেশী হলে সাব্‌-জজের আদালতে মূল বিচার শুরু হয়।

সাব্‌-জজ

সাব্‌-জজের আদালতের ওপরে রয়েছে জেলা জজের আদালত (District Judge's Court)। এই আদালতে মুন্সেফী বা সাব্‌-জজের আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করা যায়, যে-কোনও মূল্যের দাবী-দাওয়া নিয়ে মামলা দায়ের করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, জেলা জজের আদালতগুলিই সরাসরি হাইকোর্টের নীচে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু এদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা যায়।

জেলা জজ্‌

সাধারণতঃ, ভারতের প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের প্রত্যেক জেলায় একটি করে অথবা কোথাও কোথাও একাধিক জেলার জন্য একটি জেলা আদালত আছে। কলিকাতার মত বড় শহরে নগর দেওয়ানী আদালত (City Civil Court) দেওয়ানী মামলার বিচার করে থাকে। নগরের ফৌজদারী মামলার বিচার করেন নগর আদালত (Metropolitan Magistrate)। তা ছাড়া, ছোট ছোট মামলার বিচারের জন্য এখানে ছোট মামলার আদালত (Small Causes Court) থাকে। এই আদালতগুলির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও হাইকোর্টের দেওয়ানী বিভাগে আপীল করা চলে।

নগর দেওয়ানী আদালত

ফৌজদারী বিচার ঃ ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে দেওয়ানী মামলার মত পঞ্চায়েত আদালত সবচেয়ে নিম্ন আদালত। ইউনিয়ন্‌ বোর্ড অবলুপ্ত হবার পর গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন্‌ বেঞ্চের (Union Bench) পরিবর্তে ন্যায়পঞ্চায়েত আদালতই ছোটখাটো মামলার বিচার করে থাকে। শহরে ম্যাজিস্ট্রেট্‌ বা অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট্‌ (Honorary Magistrate) ফৌজদারী মামলার বিচার করে থাকেন। এঁদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্‌ থাকেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ওপরে থাকেন জেলা জজ, তাঁকে দায়রা জজ (Sessions Judge) বলে। এ ছাড়াও কোন কোন সময়ে অতিরিক্ত দায়রা জজ, (Additional Sessions Judge) এবং সহকারী দায়রা জজ নিযুক্ত করা হয়।

ফৌজদারী বিচার ঃ ন্যায়পঞ্চায়েত, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট্‌, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্‌, দায়রা জজ, জুরিব্যবস্থা

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপীল করা যায়। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এবং সহকারী দায়রা জজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়রা জজের কাছে আপীল করা যায়। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে যে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত আছে, সেখানেও ফৌজদারী মামলার বিচার হয়। এদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল চলে। দায়রা জজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও হাইকোর্টে আপীল করা চলে। ভারতের কোন কোন অঙ্গরাজ্যে জুরী প্রথা (Jury System) প্রচলিত। এঁদের সাহায্যে বিচারকগণ ফৌজদারী মামলার বিচার করে থাকেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতা হাইকোর্টে জুরীদের সাহায্য ফৌজদারী মামলার বিচার হয়।

মঁতেস্কিএর মত ও রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি ভারত অনুসরণ করেছে

ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনা সম্পর্কে যে নির্দেশাত্মক নীতিগুলি ঘোষিত হয়েছে, তদনুসারে বিচারবিভাগ এবং শাসনবিভাগের ক্ষমতা পৃথক করার নীতিটি অনুমোদিত সরকারী নীতি। এই নীতিটি মঁতেস্কিএ-র ক্ষমতা-বিভাজন নীতির অন্তর্গত একটি মূল্যবান সিদ্ধান্ত। এর ফলে বিচারবিভাগের মর্যাদা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ভারত সরকারও এই নীতিটিকে সরকারী নীতিরূপে গ্রহণ করেছেন এবং এটি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গেও সম্প্রতি এই নীতিটি কার্যকর হয়েছে। এই নীতি চালু হবার অর্থ শাসনবিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটগণের হাত থেকে বিচারকার্যের ভার তুলে নেওয়া এবং উচ্চ ও নিম্ন সব আদালতের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র বিচারকার্যে বিশেষজ্ঞ বিচারপতিদের দ্বারাই বিচারকার্য সম্পাদন।

সারাংশ

সরকারের ৩টি বিভাগ ঃ আইনসভা, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ।

মঁতেস্কিএ-র ক্ষমতাবিভাজন বা ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের ৩টি বিভাগের কাজ পৃথক করে রাখার পক্ষপাতী। আরিস্টটল থেকে শুরু করে ব্লাকস্টোন ও ম্যাডিসনও নানা কারণে নীতিটি সমর্থন করেন।

কিন্তু ক্ষমতাবিভাজন নীতি কাম্য নয়, এর ব্যবহারিক প্রয়োগও সম্ভব নয়। কারণ—(১) এ নীতি ছাড়াই স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। (২) সরকারের অঙ্গগুলি জৈবিক ঐক্যে বন্ধ। (৩) সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভাই প্রধান। (৪) এ নীতির ফলে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা। (৫) সরকারের জটিল কাজগুলি সহজে বিভাজ্য নয়। (৬) ৩টি বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা যায় না। (৭) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ইংলণ্ডে, ভারতে এ নীতি সম্পূর্ণ গৃহীত হয় নি। (৮) মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় ধনতান্ত্রিক সংবিধানে এ-নীতি থাকা না-থাকা দুই-ই সমান।

তবে ক্ষমতাবিভাজন নীতি অনুসারে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয়।

শাসনবিভাগের গুরুত্ব ঃ একক বনাম যৌথ শাসনবিভাগ। তাদের দোষগুণ বিচার গুরুত্বপূর্ণ।

শাসনবিভাগের কার্যাবলী জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে সুবিস্তৃত। কাজগুলি হল—আভ্যন্তরীণ শাসন, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র প্রভৃতি দপ্তর পরিচালনা, আইন, জরুরী, প্রত্যর্পিত আইন প্রণয়ন, বিচারবিভাগীয়, অর্থবিভাগীয়, সেবামূলক কাজ।

ভারতে একক ও যৌথ—এ দুইয়ের মিশ্র শাসন প্রচলিত।

ভারতীয় প্রশাসনব্যবস্থা: কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আছেন, অঙ্গরাজ্যে আছেন রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যমন্ত্রিসভা।

ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচনপদ্ধতি, এই পদপ্রার্থীর যোগ্যতা, রাষ্ট্রপতির কার্যকাল, বেতন, ভাতা ইত্যাদি নির্দিষ্ট।

ভারতের রাষ্ট্রপতির শাসনবিভাগীয়, আইনপ্রণয়ন বিষয়ক, জরুরী আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত, অর্থসংক্রান্ত, বিচারবিষয়ক ও জরুরী ক্ষমতা আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, তিনি সম্পূর্ণ নামসর্বস্ব শাসক নন। ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনে "জরুরী অবস্থায় দশ দফা রক্ষাকবচের" উল্লেখ থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে ইংলন্ডের রাজমুকুটের মত রাষ্ট্রপতির বিবেচনাধীন ক্ষমতা আছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের শীর্ষে প্রকৃত শাসক হলেন প্রধানমন্ত্রী। (১) মন্ত্রিসভার, (২) শাসনবিভাগের, (৩) আইনসভার, (৪) দলের, (৫) জাতির নেতা হিসাবে ও (৬) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁর ক্ষমতাও কোন কোন ক্ষেত্রে সীমিত। তিনি একনায়ক নন।

ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৩ প্রকার মন্ত্রী নিয়ে গঠিত। তাঁদের কার্য ও সংসদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক বিশ্লেষণসাপেক্ষ।

ভারতের অঙ্গরাজ্যের প্রশাসনব্যবস্থা: রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যমন্ত্রিসভার গঠন ও কার্যাবলীর পর্যালোচনা। রাজ্যপালের শাসনবিভাগীয়, আইনবিষয়ক, অর্ডিন্যান্স্ (জরুরী আইন) প্রণয়নবিষয়ক, অর্থসংক্রান্ত, বিচারবিভাগীয়, ও স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, তিনি নামসর্বস্ব শাসক নন। কেন্দ্রর প্রতি দায়িত্বশীল বলে তিনি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। বিধানসভায় মন্ত্রিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাইয়ের ও মন্ত্রিসভা বরখাস্তের অনেকগুলি নজির সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে নাইজিরিয়ার নজির। এ নিয়ে বিতর্কের অবসানকল্পে সংবিধান সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা: রাজ্যমন্ত্রিসভার, রাজ্যের শাসনবিভাগের, বিধানসভার নিজ দলের নেতারূপে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তবে তাঁর ক্ষমতা সীমিত।

অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রিসভার নিয়োগপদ্ধতি—৩ রকমের মন্ত্রী, তাঁদের কাজ, ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা।

সাধারণভাবে আইনসভার কার্যাবলী ও তার পরিপ্রেক্ষিতে লোকসভা, রাজ্যসভা ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার কার্যাবলীর ব্যাখ্যা করা হয়। সাধারণতঃ, সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার কাজগুলি হল— আইনপ্রণয়ন, শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ, সাংবিধানিক কর্তব্য পালন, জনমতগঠন।

আইনসভার দুটি কক্ষ থাকবে, না একটিমাত্র কক্ষ থাকবে, তা নিয়েও বিতর্ক হয়। দুটি কক্ষের গঠন পদ্ধতি: ইংলন্ড্, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নজির।

দ্বিতীয় কক্ষের সার্থকতা—(১) একটিমাত্র কক্ষের স্বৈরতা দূর করা, (২) ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা, (৩) সুচিন্তিত আইনপ্রণয়নের সম্ভাবনা, (৪) জনমত যাচাই, (৫) সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা, (৬) আইনের পুনরালোচনা, (৭) জ্ঞানীগুণীদের মনোনয়ন, (৮) বিশেষ প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা, (৯) যুক্তরাষ্ট্রে অপরিহার্যতা, (১০) জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষাবৃদ্ধি, (১১) একটি কক্ষ অপরের নিয়ন্ত্রক।

দ্বিতীয় কক্ষের বিরুদ্ধ যুক্তি—(১) ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা, (২) যুক্তরাষ্ট্রেও অনাবশ্যক (ল্যাস্কি), (৩) সংখ্যালঘুস্বার্থের জন্যও অনাবশ্যক, (৪) জনমতই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ, (৫) অযথা বিলম্ব, (৬) অনাবশ্যক অথবা অবাঞ্ছিত (আবে সিএ), (৭) দুটি কক্ষের রেষারেষি, (৮) জ্ঞানীগুণীদের অসুবিধা, (৯) ব্যয়বাহুল্য, (১০) জরুরী ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত, (১১) জাতীয় সংহতি ব্যাহত হয়।

বর্তমানে বেশীর ভাগ রাষ্ট্রেই আইনসভা দ্বিকক্ষযুক্ত।

ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা (সংসদ) দ্বিকক্ষযুক্ত—লোকসভা (নিম্নকক্ষ) ও রাজ্যসভা (উচ্চকক্ষ)। পশ্চিমবঙ্গে আইনসভার একটিমাত্র কক্ষ—বিধান সভা।

লোকসভা ও রাজ্যসভার গঠন ও কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত লোকসভা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত রাজ্যসভার চেয়ে বেশী শক্তিশালী। মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রণ ও বাজেট (বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ) অনুমোদন—এ দুটি ক্ষেত্রে লোকসভার প্রাধান্য সূচিত হয়।

লোকসভার কার্যাবলী—(১) আইনপ্রণয়ন, অবশ্য কিছু ক্ষমতা শাসনবিভাগে প্রত্যর্পিত, (২) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা, (৩) মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ, (৪) নির্বাচনী, (৫) সাংবিধানিক ও (৬) বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা।

রাজ্যসভার গঠন ও অন্যান্য সাংগঠনিক খুঁটিনাটি বিবেচ্য।

রাজ্যসভার বিশেষ ক্ষমতা—বিশেষ ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যের জন্য আইনপ্রণয়ন। রাজ্যসভার অন্যান্য ক্ষমতা—মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ, রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি সম্পর্কিত ক্ষমতা। রাজ্যসভার অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা নামমাত্র, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতা তার নেই।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিল কিভাবে আইনে পরিণত হয়—বিল উত্থাপন, ১ম পাঠ ও ২য় পাঠের পর নির্দিষ্ট কমিটিতে পাঠান হয়। তারপর ৩য় পাঠের পর সংসদের অপর কক্ষেও ঠিক একই পদ্ধতিতে বিল অনুমোদিত হবার পর রাষ্ট্রপতি তাতে স্বাক্ষর দেন। অর্থবিল ও বাজেট অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

ভারতীয় পার্লামেন্ট কি সার্বভৌম?—সংবিধান কর্তৃক সীমিত ক্ষমতার মধ্যে ভারতীয় পার্লামেন্ট সার্বভৌম।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সংগঠন : তার কাজ—(১) আইন প্রণয়ন, (২) অর্থসম্পর্কিত, (৩) শাসনবিভাগীয় ও অন্যান্য ক্ষমতা।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিল কিভাবে আইনে পরিণত হয়?—বিল উত্থাপন, ১ম পাঠ ও ২য় পাঠের পর নির্দিষ্ট কমিটিতে পাঠান হয়। ৩য় পাঠের পর বিলটি বিধানসভায় অনুমোদিত হলে রাজ্যপাল স্বাক্ষর দেন বা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সেটি আটকে রাখতে পারেন। বাজেট অনুমোদনের ব্যবস্থাটি একটু অন্য রকম।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সীমাবদ্ধতা—(১) রাজ্যপালের ভূমিকা, (২) রাজ্যসভার ক্ষমতা, (৩) জরুরী ক্ষেত্রে, (৪) যুগ্ম তালিকার ক্ষেত্রে, (৫) রাষ্ট্রপতির ভূমিকা, (৬) রাষ্ট্রপতির অনুমোদন, (৭) পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব।

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার গুরুত্ব। বিচারালয়ের কাজ—(১) আইনের ব্যাখ্যা, (২) "বিচারক প্রণীত আইনের" মূল্য (৩) পরামর্শদান, (৪) যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান রক্ষা, কেন্দ্র অঙ্গরাজ্য বিরোধ—মীমাংসা, (৫) নাগরিক অধিকার রক্ষা, (৬) অন্যান্য কাজ।

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা কি কি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল?—(১) বিচারক নিয়োগ পদ্ধতি, জনগণের বা আইনসভার দ্বারা নিয়োগ ত্রুটিপূর্ণ; শাসনবিভাগের দ্বারাই নিয়োগ সমর্থনযোগ্য। (২) বিচারকদের কার্যকাল, (৩) বেতন, ভাতা ইত্যাদির সুবিধা, (৪) পদোন্নতি, বদলি, পদচ্যুতির পদ্ধতি, (৫) ক্ষমতাবিভাজন, (৬) সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা।

ভারতের বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—(১) অখণ্ড, অবিচ্ছেদ্য, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্তরবিন্যস্ত, (২) দেওয়ানী, ফৌজদারী আইন সর্বত্র একই, (৩) ফরাসী ও ব্রিটিশ ঢঙে-এ প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল; (৪) উচ্চ পদাধিকারীদের বিশেষ সুযোগ, (৫) মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের শক্তি বেশী, (৬) পঞ্চায়েত ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে গণমুখী নয়; (৭) দীর্ঘসূত্রতা, ব্যয়বাহুল্য, (৮) দরিদ্রদের অসুবিধা।

ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণ (সুপ্রীম কোর্ট) সম্পর্কিত খুঁটিনাটি। ৫টি এক্তিয়ার—(১) মৌলিক, (২) আপীলবিষয়ক, (৩) পরামর্শদান, (৪) নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও (৫) অন্যান্য ক্ষমতার এক্তিয়ার।

সুপ্রীম্ কোর্টের অতীত রায়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা চলে। ১৯৮০ সালের মিনার্ভা মিল্‌সের মামলায় কোর্টের সিদ্ধান্ত—পার্লামেন্ট্ ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক রদবদল করতে পারে না। ফলে কোর্টের এক্তিয়ার রয়েছে ও থাকবে।

ভারতের অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন আদালত : মহাধর্মাধিকরণ (হাইকোর্ট্)। হাইকোর্টের সংগঠন, তার এক্তিয়ার ও ক্ষমতা—(১) মৌলিক, (২) নাগরিক অধিকার রক্ষা, (৩) আপীলবিষয়ক, (৪) অন্যান্য এক্তিয়ার (৫) প্রশাসনিক আদলতের ওপর ক্ষমতা, (৬) প্রাতিষ্ঠানিক স্তরবিন্যাস সাধন।

হাইকোর্টের ক্ষমতার (১) সাংবিধানিক ও (২) সামরিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা। ফলে, ভারতের অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা মার্কিন অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতের চেয়ে কম।

জেলা আদালত—এর বিচারকদের নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাজ্যপালের ভূমিকা।

জেলা আদালতের দেওয়ানী এক্তিয়ার—ন্যায় পঞ্চায়ত, মুন্সেফ্, সাব্‌জজ ও জেলা জজের ভূমিকা ও এক্তিয়ার। নগর দেওয়ানী আদালতের কার্য ও এক্তিয়ার।

জেলা আদালতের ফৌজদারী এক্তিয়ার—ন্যায় পঞ্চায়ত, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট্, দায়রা জজ, জুরিব্যবস্থা।

মঁতেস্কিএ-র মত ও রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি ভারত অনুসরণ করেছে।

—— ——

৫ জনমত ও দলব্যবস্থা

"...This incessant activity of popular opinion is the dynamic of democracy." —R. M. MacIver : The Ramparts We Guard

যত মত তত পথ। একই পরিবারে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে কত-না গরমিল! রাষ্ট্রের মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মতভেদ অনিবার্য। মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, রূপ ও রুচির মধ্যে তারতম্য থাকার জন্য এ-ধরনের পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু মানুষের পারস্পরিক মতবিরোধ থাকলেও সমষ্টিবদ্ধ সমাজজীবন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই সমষ্টিবদ্ধ জীবনের সামগ্রিক স্বার্থে সরকার পরিচালিত হয়। কিন্তু সমাজের অধিকাংশ লোকের মধ্যে মোটামুটি কতকগুলি সাধারণ ক্ষেত্রে মতৈক্য না ঘটলে এই আদর্শ সমষ্টিজীবন গণতান্ত্রিক প্রণালীতে গড়ে উঠতে পারে না। জনগণের এই মতৈক্যকেই সাধারণ ভাষায় জনমত (Public Opinion) বলে।

জনগণের মতৈক্যই জনমত

॥ জনমতের সংজ্ঞা : গণতন্ত্রে এর গুরুত্ব ॥

প্রখ্যাত মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লোওয়েল্ (Lowell) বলেন যে, শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই জনমত নয়, আবার সমাজের সকলে একমত না হলে জনমত গঠিত হতে পারবে না একথাও বলা যায় না। রাষ্ট্রে যদি অধিকাংশ লোক অসামাজিক হয়, তা হলে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে জনমত বলা যায় না। আবার, দেশের বিভিন্ন লোকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে, নানারকম ব্যক্তিগত ঝোঁক ও পছন্দের বশবর্তী হয়ে পরস্পরবিরোধী অনেক রকম মতামত প্রকাশ করতে পারে। তাই সমাজের সকলে একমত না হলে জনমত গঠিত হবে না—এই সিদ্ধান্ত বাস্তবানুগ নয়।

জনমত সংখ্যাগরিষ্ঠের মত নয়

লর্ড্ ব্রাইস্ জনমতকে সুনির্দিষ্ট অভিমত বলতে দ্বিধা বোধ করেছেন। জনগণের ভয়, ভাবনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, ধর্মবিশ্বাস বা নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি অস্পষ্ট ভাবের সমষ্টিবদ্ধ রূপ ছাড়া জনমতকে তিনি অন্য কিছু বলে ভাবতে পারেন না। তিনি এমনও বলেছেন যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, জনগণের নিজস্ব কোন মত নেই, অর্থাৎ জনমত বলতে সুস্পষ্ট কোন কিছু বোঝায় না।

ব্রাইসের মতে জনমত অস্পষ্ট

আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণও অনেকে মনে করেন যে, মানুষ সব সময় যুক্তিনির্ভর হতে পারে না। কখনও কুসংস্কার, কখনও বা শ্লোগান্‌ (Slogan) বা ধ্বনির চাপে, কখনও নিজের স্বার্থে মানুষ রাষ্ট্রের মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়, তার ব্যক্তিগত জীবনকে গোষ্ঠীগত জীবনের সঙ্গে একীভূত করে তোলে। তাই চিরাচরিত রীতি-নীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্যকে অনেক সমাজতত্ত্ববিদ্‌ জনমতের বহিঃপ্রকাশরূপে ব্যাখ্যা করেন।

সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞা : জনমত ও সংস্কারবোধ

কিন্তু জনমত সম্বন্ধে ব্রাইসের সিদ্ধান্তের মতই জনমতের আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞা সঠিক বলে মনে হয় না। মানুষ যেমন ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত মনোবৃত্তির সঙ্গে নিজের মতামতকে খাপ খাইয়ে নিতে চায়, তেমনি সে তার প্রগতিশীল সত্তাকেও অস্বীকার করে চলতে পারে না। শুধু প্রচলিত রীতিনীতি, সংস্কার-কুসংস্কারের মধ্যে জনমনের প্রকাশকে সত্য বলে স্বীকার করে নিলে সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের প্রগতিশীলতাকে অস্বীকার করতে হয়। জনমত হয়ত অস্পষ্ট বা অর্ধপরিস্ফুট হতে পারে, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার অর্থ গণতান্ত্রিকতার ঐতিহ্য সম্পর্কেই যেন ইচ্ছাকৃতভাবে একটা নেতিবাচক ধারণাকে প্রাধান্য দেওয়া।

এ দুটি সংজ্ঞাই ঠিক নয়

জনপ্রিয় মার্কিন সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপ্‌মান্‌ (Walter Lippmann) জন-মতকে বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থের ও চিন্তার মধ্যে একধরনের ভারসমতা বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর সংজ্ঞাটি অনেকটা বাস্তবভিত্তিক হলেও এর দ্বারা রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ জনমত গঠনে কে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তার আপেক্ষিক বা আনু-পাতিক আন্দাজ পাওয়া যায় না। জনমত রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের চিন্তাধারার মধ্যে সংঘর্ষ ও বিনিময়ের প্রভাবে প্রভাবিত হয় ঠিকই। কিন্তু মানুষ তার সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে যে মত প্রকাশ করে, সুবিধাবাদ ও স্বার্থপরতার প্রভাবে যেভাবে সে ভাবতে শেখে, সেটা রাষ্ট্রের সকলের সামগ্রিক স্বার্থের পক্ষে কল্যাণকর না-ও হতে পারে।

জনমত বিভিন্ন স্বার্থের ভারসমতা (লিপ্‌মান্‌) : এ মতটিও ত্রুটিপূর্ণ

জনমত সম্পর্কে এই সমস্ত সংজ্ঞাগুলি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, জনমত হল এমন মত, যা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হলেও সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থকেও রক্ষা করার চেষ্টা করে।

জনমতের সঠিক সংজ্ঞা

ইংরেজ শাসনতন্ত্রবিদ্‌ ফাইনার জনমতের তিনটি উপাদানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রথমতঃ, জনমত তথ্যভিত্তিক হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ, ঘটনাবলীর তালিকা থেকে সত্য এবং অসত্য প্রবণতাগুলির মধ্যে প্রকৃত মূল্যায়ন না করলে জনমত গঠন সহজ হয় না। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তি-চরিত্রের নিছক সুবিধাবাদকে নির্ভর করে জনমত গড়ে উঠতে পারে না, গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় নয়। অর্থাৎ, জনমত-গঠনে নীতিবোধেরও প্রভাব অনস্বীকার্য।

ফাইনারের ব্যাখ্যা

গণতন্ত্রে জনমতই হল সরকারকে নিজেদের ইচ্ছাধীনভাবে পরিচালিত করার প্রধান হাতিয়ার। দেশে হয়ত কুচক্রী দল সরকারের কর্তৃত্ব দখল করে নাগরিক স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে দিতে পারে। এ-ক্ষেত্রে সংবিধানে যত রকম গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থাই থাকুক না কেন, জাগ্রত জনমতই ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রীকে একাধিকবার কমন্স্ সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থাভাজন থাকা সত্ত্বেও প্রবল জনমতের চাপে পদত্যাগ করতে হয়েছে। সুতরাং সার্বভৌম শক্তিকে যদি লোকায়ত সার্বভৌমত্ব রূপে ধরে নেওয়া হয় এবং নির্বাচকমণ্ডলীকে, অর্থাৎ ভোটদাতাদের প্রাধান্যকে যদি স্বীকার করতে হয়, তাহলে এ কথাই ঠিক যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুগঠিত এবং সুচিন্তিত জনমতই সার্বভৌম শক্তির প্রকৃত উৎস।

সুগঠিত, সুচিন্তিত জনমতই গণশক্তি

আধুনিক রাষ্ট্রগুলি অত্যন্ত জনমত-সচেতন। তারা বিভিন্ন সময়ে নানা ভাবে দেশের জরুরী সমস্যাগুলি সমাধান করতে গিয়ে জনমত পরিমাপের চেষ্টা করে থাকে। আগে এ চেষ্টা বালির বাঁধ রচনার মতই মনে হত। কিন্তু বর্তমানে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের (Statistics) চরম উন্নতির ফলে জনমতের পরিমাপ ও তার প্রকৃতি-বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে মার্কিন সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ গেল্লাপ (Gallup) ও তাঁর সহকারীগণ পথিকৃৎ। এক একটি বিশিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে জনমত পরিমাপের জন্য তাঁরা সংবাদপত্র, বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রভৃতি উপায়ে এক ধরনের ভোটাভুটির আয়োজন করেন। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কোন নির্বাচনের ফলাফল, কোন ঘটনার গতিপ্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক মতামত আন্দাজ করা যায়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নির্বাচনী গতিশীলতার (Electoral Dynamics) গবেষণাগুলি এভাবেই পরিচালিত হয়।

জনমতের পরিমাপ ঃ সংখ্যাবিজ্ঞান ও নির্বাচনী গতিশীলতার গবেষণা ; গেল্লাপ্ পদ্ধতি

॥ জনমত সংগঠনের ও প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যম ॥

আধুনিক রাষ্ট্রনীতিবিদ্দের মতে (১) মুদ্রাযন্ত্র বা সংবাদপত্র, (২) বেতার, দূরদর্শন ও চলচ্চিত্র, (৩) রাজনৈতিক দল, (৪) সভাসমিতি, (৫) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং (৬) আইনসভা—এগুলিই হল জনমত গঠনের ও প্রকাশের প্রধান মাধ্যম।

জনমতের মাধ্যম

মুদ্রাযন্ত্র (Press বা Newspaper) জনমত গঠনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পঞ্চদশ শতাব্দীতে গুটেনবের্গ্ (Gutenberg) কাঠের হরফে বাইবেল্ ছেপে জ্ঞানানুশীলনের যে সিংহদ্বার উন্মোচিত করে দিলেন, তা পরবর্তী যুগে মানুষের জীবনে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। এর পর ক্রমে ক্রমে মুদ্রণ-ব্যবস্থার অনেক যান্ত্রিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। ফলে, বর্তমানে দৈনিক সংবাদপত্র পাড়ায় পাড়ায় বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে থাকে। ইউনেস্কো পৃথিবীর অর্ধেক নিরক্ষর অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষাপ্রসারের যে মহান্ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; তা সার্থক হলে ভবিষ্যতে সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন পুস্তকপুস্তিকা শুধু একটি বিশেষ দেশের জনগণের মধ্যে

মতৈক্য ঘটাতে পারবে, তা নয় ; এর ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রসারিত হবে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক জনমতও গড়ে উঠতে পারবে। সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, পাঠকপাঠিকাদের চিঠিপত্র এবং অন্যান্য রচনা জনগণকে চিন্তার খোরাক যোগায়। চায়ের টেবিলের তুফান অবশেষে সময়ের ব্যবধানে সংযত, প্রশান্ত জনমতের একটি উপাদানে পরিণত হয়। জনগণ স্বদেশ ছাড়াও বিদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। এই জন্য নাপোলিয় (Napoleon) বলেছিলেন যে, এক অক্ষৌহিণী সৈন্যদলের চেয়ে একটি বিরুদ্ধ সংবাদপত্র রাষ্ট্রনেতার কাছে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক প্রভাব ও মর্যাদার ক্ষেত্রে আধুনিককালে ইংলণ্ডে সংবাদপত্রকে চতুর্থ প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান (Fourth Estate) বলে বর্ণনা করা হয়। স্মরণীয় যে, ইংরেজগণ অন্য প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের মধ্যে গণনা করে থাকেন ধর্মযাজকতন্ত্র (Lords Spiritual), সামন্ততন্ত্র (Lords Temporal) এবং প্রজাপ্রতিনিধি (Commons)—এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে।

(১) মুদ্রাযন্ত্র

দুর্ভাগ্যক্রমে, সংবাদপত্রগুলি প্রায়ই বৃহৎ পুঁজিপতিদের কর্তৃত্ব ও মালিকানায়, অথবা একদলীয় সরকারের কঠোর শাসনে পরিচালিত হয়। অতি-আধুনিক যুগে কোন-কোন প্রখ্যাত সাংবাদিকদের বিদেশী রাষ্ট্রের দূতাবাসের প্রভাবে প্রভাবিত বলেও অনেকে অভিযোগ করে থাকেন। অনেক সময় এই অভিযোগ সত্য বলে লোকের ধারণা জন্মায়। ফলে, নির্ভীক, নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা অযোধ্যার রামরাজত্বের মতই সুখস্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায়। এ থেকেই সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার গণতান্ত্রিক তাৎপর্য অর্থবহ হয়ে দাঁড়ায়।

সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতার গুরুত্ব

বেতার, দূরদর্শন ও চলচ্চিত্র (Radio, T. V. বা Television, Cinema) বিজ্ঞানের ক্রমিক অগ্রগতির ফলে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ইউনেস্কো নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে তথ্য ও তত্ত্ব প্রচারের জন্য একাধারে দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যম (Audio-visual medium)-রূপে বেতার, চলচ্চিত্র ও দূরদর্শনের ব্যাপক ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এগুলির মারফত সরকার তার নীতি প্রচারের জন্য দেশব্যাপী আবেদন জানাতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর মত জনপ্রিয় নেতার বা নেত্রীর ভাষণই শুধু শোনা যায় না, দূরদর্শনে তাঁর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে তাঁর মতামতকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। জনমত গঠনের এই দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যমগুলির মারফত শিক্ষিত বা অশিক্ষিত নরনারী শুধু যে তাঁদের অবসর-বিনোদনের জন্য গান-বাজনা শুনেই আনন্দ পান, তা নয়। এগুলির মধ্যে দিয়ে নানা কথিকা, বিতর্কিকা, আলোচনাচক্র তাঁদের চিন্তাধারাকে আরও স্বচ্ছ, তথ্যনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানভিত্তিক করে তোলে।

(২) বেতার, দূরদর্শন ও চলচ্চিত্র : দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যম

কিন্তু বহু দেশে বেতার ও দূরদর্শন সরকারের জনসংযোগ মন্ত্রীর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হয়। সুতরাং গণতান্ত্রিক সরকারকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এই মাধ্যমগুলি সত্যিই দলনিরপেক্ষভাবে জনমত গঠন করে। চলচ্চিত্রের দ্বারা বহু উন্নত দেশে যে ধরনের হাল্কা আমোদপ্রমোদ পরিবেশনের আয়োজন করা হয়, তাতে চলচ্চিত্র-প্রযোজকদের ব্যবসাদারী মনোবৃত্তি চরিতার্থ হলেও জনমতকে বিভ্রান্ত করা হয়। সাংস্কৃতিক অবক্ষয় রোধ করা উচিত। আধুনিক প্রগতিশীল সরকাগুলির উচিত প্রকৃত তথ্যসমৃদ্ধ দলিলচিত্র (documentary films) নির্মাণের ক্ষেত্রে বেশী উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া। তবেই সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।

এ মাধ্যমগুলি নিরপেক্ষ থাকা চাই

সাংস্কৃতিক অবক্ষয় রোধ করা চাই

রাজনৈতিক দল (Political Parties) ছাড়া জনমতের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। একজন প্রখ্যাত মার্কিন বিচারক রাজনৈতিক দলগুলিকে অবাধ ভাববিনিময়ের ("Free Trade of Ideas") ক্ষেত্রে অনুঘটক (brokers) বলে বর্ণনা করেছেন। দলীয় নেতাগণ ভাষণ, বিবৃতি ইত্যাদির দ্বারা জনগণকে দেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত করে থাকেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিজ নিজ দলীয় সাময়িকপত্র থাকে। প্রাচীরপত্র ইত্যাদির সাহায্যেও দলগুলি তাদের মতামত ব্যক্ত ও প্রচারিত করে থাকে। সংসদীয় গণতন্ত্রে সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলি সরকারী ক্ষমতালাভের জন্য সচেষ্ট হয়। যে দল ব্যবস্থাপক সভায় নিরঙ্কুশ বা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা (absolute majority) লাভ করে অর্থাৎ, আইনসভার মোট সদস্যসংখ্যার অন্ততঃ অর্ধেকের বেশী আসন দখল করে, সেই দল মন্ত্রিসভা গঠন করে ও অন্য দল বা দলগুলি বিরোধী দলের (Opposition) ভূমিকা গ্রহণ করে। সংগঠনমূলকভাবে ও দায়িত্বশীল হয়ে বিরোধীপক্ষ সরকারী নীতির সমালোচনা করে, সরকারকে সৎ, সচেতন ও তৎপর হয়ে নির্বাচনে ঘোষিত দলীয় কর্মসূচী রূপায়নে বাধ্য করে। সংসদীয় গণতন্ত্রের মাতৃভূমি ইংলণ্ডে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেতা দুজনেই সরকারের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে পরিগণিত হন ও দুজনেই নির্দিষ্ট হারে সরকারী তহবিল থেকে বেতন লাভ করে থাকেন।

(৩) রাজনৈতিক দলগুলির, বিশেষতঃ, বিরোধী দলের ভূমিকা

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয় স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা, মুখরোচক সংবাদ পরিবেশনার চেষ্টা করে থাকে। এই ধরনের কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির ফলে জনগণ এমন একটা অসন্তুষ্টি এবং অনীহার সম্মুখীন হয় যার ফলে তারা রাজনৈতিক দলগুলির মতামত সম্পর্কে কোন কিছুই বিশ্বাস করতে চায় না। "যে যায় লঙ্কায়, সেই রাবণ হয়ে যায়" এ উক্তিটি এই দলবাজীর বিরুদ্ধে চরম গণধিক্কার।

সঙ্কীর্ণ দলবাজি নিন্দনীয়

সভাসমিতি (Platform বা Pulpit) জনমত গঠনের এবং প্রকাশের একটি প্রধান মাধ্যম। মানুষের মনোবৃত্তি একাধিক প্রবণতার প্রতি ধাবিত। তার বহুমুখী

ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য সে একাধিক সংস্থার সভ্য হয়ে ওঠে। এর ফলে গড়ে ওঠে ক্লাব বা শ্রমিক সংস্থা, শিক্ষকসংসদ, মঠ ও মন্দির। এই সমস্ত সংস্থার সভ্য হিসেবে নাগরিক সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার মতামত অভিব্যক্ত করতে পারে। তার স্বাধীন চিন্তাধারা সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করে থাকে। সভাসমিতির দ্বারা বিভিন্ন সংস্থা নিজ নিজ ক্ষেত্রে নানারকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সভাসমিতিতে হাজির হয়ে নাগরিক বক্তাদের কাছ থেকে নানাপ্রকার যুক্তি, উপদেশ ইত্যাদি লাভ করার সুযোগ পায়। সুতরাং সভাসমিতির দ্বারা জনমত গঠিত ও প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। এজন্যই বাক্‌স্বাধীনতা ও সভাসমিতির অধিকার গণতন্ত্রে নাগরিকদের অত্যন্ত মূল্যবান পৌর অধিকাররূপে বিবেচিত হয়। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলির যে নেতৃবৃন্দ সরকারের পরিচালনার ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়ে থাকেন, তাঁদের অনেককেই সুবক্তারূপে খ্যাতি অর্জন করতে হয়।

(৪) সভাসমিতির প্রভাব

কিন্তু একথাও ঠিক যে, জনগণ অনেক সময় প্রখ্যাত বক্তার বাক্‌চাতুর্যে বিভ্রান্ত হয়, তাঁর বক্তৃতার তোড়ে ভেসে গিয়ে উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল জনতায় পর্যবসিত হয়। ফলে সুচিন্তিত জনমতের বদলে উত্তেজিত আবেগচঞ্চল জনতার প্রাধান্য সূচিত হয়। গণতন্ত্রে এ ধরনের উন্মাদনার চাপ পড়তে পারে বলেই আরিস্টটল্‌ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্‌ একে নিকৃষ্ট শাসনতন্ত্র বলে নিন্দা করতেও দ্বিধা প্রকাশ করেন নি।

কিন্তু বাক্‌সর্বস্বতা নেতৃত্বের সূচক নয়

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি (Educational institutions) থেকে শিশু, বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী শুধু বিদ্যালাভই করে না, সেখানে অজ্ঞাতসারে তাদের নিজেদের চরিত্রও গঠিত হয়। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকার প্রভাবে তারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই ভবিষ্যৎ নাগরিকরূপে নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পায়। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, কারিগরী, বৃত্তিমূলক যে শিক্ষাই ছাত্র-ছাত্রীগণ লাভ করুক না কেন; শিক্ষকদের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা শিক্ষার্থীদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। এজন্যই ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকরূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) স্থাপিত হয় এবং অরবিন্দ ঘোষের (শ্রীঅরবিন্দের) অধ্যক্ষতায় "বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ" (Bengal National College) স্থাপিত হয়। পরিবারে যেমন মাতাপিতার প্রভাবে শিশুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীগণও সেইভাবে নতুন নতুন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়, জীর্ণ পুরাতনকে বর্জন করে নিত্য নতুনের আলোকে তারা তাদের মনকে উদ্দীপ্ত করতে শেখে। হিট্‌লার প্রমুখ একনায়কতন্ত্রী নেতাগণ তাঁদের পক্ষে এক ছাঁচে ঢালা জনমত সৃষ্টি করার জন্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর সরকারী কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করতেন। শিক্ষায়তনগুলিকে

(৫) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রভাব ঃ শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠন

জনমত গঠনের ও প্রকাশের প্রকৃত মাধ্যম করে তুলতে গেলে অবশ্যই এগুলিকে রাজনৈতিক ও দলীয় বা উপদলীয় প্রভাব থেকে সর্বদা মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক একনায়কতন্ত্রী বা সামগ্রিক রাষ্ট্রে কিশোর-কিশোরীদের মধ্য থেকেই ভবিষ্যৎ দলনেতা গঠনের ওপর চাপ দেওয়া হয় এবং রাষ্ট্রের প্রচলিত মতাদর্শে এই সব বিদ্যালয়ে কিশোর-কিশোরীদের স্তরেই সরকার পক্ষের দলীয় সংস্থার শাখাকেন্দ্র খোলার জন্য বাধ্য করা হয়। এভাবে তরুণ মনকে বিষাক্ত করার চেষ্টা হলে সুস্থ জনমত গড়ে ওঠা অসম্ভব।

শিক্ষাকে দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে রাখা চাই-ই

আইনসভাই (Legislature) আধুনিক রাষ্ট্রগুলিতে জনমতের প্রধান সংগঠক ও প্রকাশক। জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ আইনসভাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনমতের মুকুরস্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। সাধারণতঃ আইনসভায় সরকারী দল নির্বাচনে ঘোষিত কর্মসূচিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করে। তদনুসারে সরকার আইনপ্রণয়ন ও শাসনপরিচালনার ব্যবস্থা করে। বিরোধী দলগুলি সরকারপক্ষকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করে থাকে এবং সরকারের দোষত্রুটির সমালোচনা করে থাকে। ফলে সরকার অসৎ, দুর্নীতিপরায়ণ, অপদার্থ হয়ে উঠতে পারে না। সংবাদপত্র প্রভৃতিতে আইনসভার দৈনন্দিন ঘটনাবলীর বিবরণ প্রকাশিত হয়। তা থেকে জনগণ মতামত গঠন করতে সক্ষম হয়। ফলে গণতন্ত্রে আইনসভার মাধ্যমে জনগণ রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে থাকে।

(৬) আইনসভার গুরুত্ব

কিন্তু আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি উদারপন্থী এবং পরমতসহিষ্ণু না হয়, তা হলে বিরোধী দলগুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ অনাদৃত, অবহেলিত হয়ে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাবুক মেরে আইনসভায় সব কিছুই সম্পাদন করতে তাঁরা সক্ষম—সরকারপক্ষের সদস্যদের এ রকম সদম্ভ আস্ফালন সুস্থ জনমত গঠনের পথে বাধা সৃষ্টি করে বৈকি।

আইনসভা উদার, পরমতসহিষ্ণু হওয়া চাই

॥ জনমত গঠনের মাধ্যমগুলি কার্যকর করার উপায় ॥

লোওয়েল জনমতের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে সমর্থ হলেও তিনি জনমত গঠনের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সন্দিহান হয়ে মন্তব্য করেন যে, জনমত প্রকৃতপক্ষে জনগণের মত হতে পারে না, জনগণের মত হিসাবেও এটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না ("Public opinion is neither Public nor Opinion")। এ কথাটির তাৎপর্য বুঝতে গেলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগণের মতামত গঠনের পথে বাধা কোথায় তা জানা দরকার। জোড্ (Joad) প্রভৃতি গণতন্ত্রপন্থী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, আধুনিক রাষ্ট্রের বিশালতাই এই রাষ্ট্রের জনমতকে একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালাই করতে চেষ্টা করে। গণতন্ত্র বলতে সব সময়ে বোঝান হয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা। জনগণের রুচি, পছন্দ, ঝোঁক ইত্যাদি সূক্ষ্ম ও মার্জিত করার পেছনে অনেক সময় দৃষ্টি দেওয়া হয় না। সংবাদপত্রগুলি থাকে বিরাট পুঁজিপতিদের কর্তৃত্বে।

গণমাধ্যমগুলি কার্যতঃ ত্রুটিপূর্ণ : লোওয়েল, জোডের অভিযোগ

বেতার ও দূরদর্শন থাকে সরকারী কর্তৃত্বে। চলচ্চিত্রে ব্যবসাদারী স্বার্থে অশ্লীল, হাল্কা আমোদপ্রমোদ বিতরণের ব্যবস্থা হয়। রাজনৈতিক দলগুলি দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে দলাদলিতে প্রবৃত্ত হয় এবং দলীয় নীতিকে জাতীয় নীতির ঊর্ধ্বে রাখে। সভাসমিতি বিরাট রাজনৈতিক দলের দ্বারা দলীয় স্বার্থে সংগঠিত হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও দলীয় বা উপদলীয় দ্বন্দ্বের আওতায় বিপর্যস্ত হয়। আইনসভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজেদের সংখ্যাধিক্যের জোরে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে আমলই দিতে চায় না।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিরাপদ রাখার জন্য এবং সুস্থ জনমত গঠনের জন্য যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা দরকার, জনমত গঠনের ক্ষেত্রে বাধাগুলি থেকেই সে সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। সংবাদপত্রগুলিকে কায়েমী স্বার্থের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং নির্ভীক, নিরপেক্ষ সাংবাদিকতাকে উৎসাহ দিতে হবে। বেতার ও দূরদর্শন একটি স্বাধীন সংস্থার কর্তৃত্বে রাখা বাঞ্ছনীয়। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নিম্নস্তরের আমোদপ্রমোদের আয়োজন বন্ধ করে দিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলিকে জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে এবং দায়িত্বপরায়ণতার পরিচয় দিতে বাধ্য করতে হবে। সভাসমিতিগুলিও তার ফলে অনেক উন্নত মানের আলোচনার আসরে পরিণত হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দলাদলি কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ এই দুই দলকেই পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য বাধ্য করতে হবে। এই ব্যবস্থাগুলি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মূলতঃ নাগরিকদেরই দাবীতে গ্রহণ করার জন্য সরকার বাধ্য। কারণ গণতন্ত্র মানেই উন্নত, শিক্ষিত, সুগঠিত জনমতের একাধিপত্য।

জনমত যেন কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ না হয়: তার উপায়

॥ রাজনৈতিক দলব্যবস্থা ॥

রাজনৈতিক দল (Political Parties) জনমত গঠনের এবং প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। বলতে গেলে আধুনিক যুগের সংসদীয় গণতন্ত্র দলীয় শাসনব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনে জয়ী আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। মন্ত্রিগণ আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন, অর্থাৎ আইনসভা যদি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করে, তা হলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। নির্বাচনে পরাজিত দল আইনসভায় বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে, সরকারের নীতির দোষত্রুটি সম্পর্কে সমালোচনা করে এবং সরকারকে সৎ, দায়িত্বশীল এবং তৎপর হতে বাধ্য করে। সরকারপক্ষও জানে যে, বিরোধী দলগুলি যদি সত্যিই তাদের দোষত্রুটি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে না পারেন, তা হলে পরবর্তী নির্বাচনে ভোটদাতাগণ তাঁদের প্রত্যাখ্যান করবেন। সুতরাং শাসনক্ষমতাকে কেন্দ্র করে সংসদীয় গণতন্ত্রে যে গদির লড়াই চলতে থাকে, রাজনৈতিক দলব্যবস্থা সেই লড়াইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিভিন্ন পক্ষে একত্রিত করে। এজন্য রাজনৈতিক দল বলতে বোঝায় এমন একটি জনসমষ্টি যার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ কতক-

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের, বিশেষতঃ বিরোধীদের ভূমিকা: রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা

গুলি বিশেষ নীতি মেনে নিয়ে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে সেই নীতিগুলি প্রয়োগ করতে আগ্রহশীল হয়।

॥ রাজনৈতিক দলগুলির কার্যাবলী ও উপযোগিতা ॥

(১) দলের কাজ : নীতিনির্ণয়

সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে বোঝায় দলীয় শাসনব্যবস্থা। সুতরাং রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক কাজ হল একটি দলীয় নীতি স্থির করা। নীতি স্থির হওয়ার পর চাই দলীয় সংগঠন, দলীয় নেতৃবৃন্দ এবং দলের একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ।

(২) দলীয় নীতি প্রচার

রাজনৈতিক দলের দ্বিতীয় কাজ হল জনগণের মধ্যে দলীয় নীতি ব্যাপকভাবে প্রচার করা। নাগরিকদের মধ্য থেকে বিভিন্ন দল তাদের সভ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে, কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ইত্যাদি বাছাই করে, দলীয় নীতি সম্পর্কে এবং রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত ক্লাস প্রভৃতির মাধ্যমে কর্মীদের দলীয় নীতি সম্বন্ধে অবহিত রাখে। জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা এবং সহানুভূতি লাভের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণতঃ নানাপ্রকার সভাসমিতি পথসভা ইত্যাদির আয়োজন করে। তারা পূজা, পার্বণ, মেলা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে দলীয় পুঁথিপত্র, পুস্তকপুস্তিকার বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করে। জনগণের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ব্যয়ভার বহনের চেষ্টা করে। জনগণের মধ্যে দলীয় নীতিও বিপুলভাবে প্রসারিত হয়।

(৩) নির্বাচনে অংশগ্রহণ

তৃতীয়তঃ, সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সরকারী ক্ষমতালাভের জন্য চেষ্টা করে থাকে। আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে, সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধীদলের ভূমিকা পালন করে। কোন একটি দল আইনসভায় নিরঙ্কুশ বা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে সাধারণতঃ বহুদলীয় মন্ত্রিসভা (Coalition Cabinet) গঠিত হয়। সুতরাং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ হওয়ার ফলে নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচনী প্রচার চালানো প্রভৃতি কাজও রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

॥ রাজনৈতিক দলব্যবস্থার সুবিধা ॥

দলব্যবস্থার সুফল : (১) গণশিক্ষা

খুব উন্নত দেশেও নাগরিকদের মধ্যে নানা বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব হয় না। জনগণের মধ্যে অনেক বিষয়ে ধারণা থাকে অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নাগরিকদের বিভ্রান্তি এবং বিহ্বলতা দূর করার চেষ্টা করে। সুতরাং রাজনৈতিক দলব্যবস্থার প্রথম সুফল হল জনগণ এদের কাছ থেকে রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে।

(২) জনসংযোগ

দ্বিতীয়তঃ, সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকারপক্ষকে আইনসভায় বিরোধী দলগুলি নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। বিরোধী দলের প্রশ্নের এবং সমালোচনার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা থাকায় সরকার স্বৈরাচারী, দুর্নীতিপরায়ণ বা অপদার্থ হতে পারে না। জনগণের সঙ্গে সরকারের প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় জনগণকে রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে যেতে হয় না। নির্বাচকগণ অবাঞ্ছিত দলের সরকারকে পরবর্তী নির্বাচনে প্রত্যাখ্যান করে নতুন রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে।

(৩) শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর

চতুর্থতঃ, সুশৃংখল এবং সুস্থ মতাদর্শে গঠিত রাজনৈতিক দল জনমতের সংগঠন ও প্রকাশে সাহায্য করে এবং স্বাধীনতার রক্ষাকবচ রূপেও কাজ করে থাকে।

(৪) স্বাধীনতা রক্ষা

পঞ্চমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত যে দেশগুলিতে ক্ষমতা-বিভাজন নীতি অনুসৃত হয়েছে, সেখানে রাজনৈতিক দলের মারফতই সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে সরকারী কাজের মধ্যে সমন্বয় গড়ে ওঠে।

(৫) সরকারী কাজের সমন্বয়

॥ দলীয় ব্যবস্থার ত্রুটি ॥

দলীয় শাসনব্যবস্থার সর্বপ্রধান এবং প্রথম ত্রুটি এল এই যে, এখানে দলীয় নীতিই প্রাধান্য লাভ করে, জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা এবং কূপমণ্ডূকতা দেখা দেয়।

ত্রুটি : (১) সংকীর্ণতা

দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক দলগুলি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সদস্যকে বরদাস্ত করে না। বীরপূজার স্থান নেই, সভ্যগণ দলের মধ্যে কোন মতভেদ সহ্য করেন না। দলের নীতি মেনে না নিলে স্বাধীনচেতা সদস্যকে দলীয় শৃংখলাভঙ্গের অপরাধে দল থেকে বিতাড়িত করা হয়। যাতে অন্য কোনও দলের পুনরায় প্রাধান্য লাভের সম্ভাবনা না থাকে সেই আশঙ্কায় দলের সদস্যগণ দলীয় নীতিকে অন্ধভাবে অনুকরণ করতে বাধ্য হন।

(২) স্বাধীনচেতাদের অমর্যাদা

তৃতীয়তঃ, দলীয় স্বার্থে অনেক সময় স্বাধীনচেতা অথবা নির্দলীয় ব্যক্তির অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়। শুধু দলের সমর্থক হওয়ার জন্যই অনেক অযোগ্য ব্যক্তিকে বড় বড় পদে বসানো হয়। ফলে দেশের নৈতিক মান এবং যোগ্যতার মান অনেক অবনত হয়।

(৩) নৈতিক ও যোগ্যতার মানের অধঃপতন

চতুর্থতঃ, রাজনৈতিক দলের সবচেয়ে চরম অধোগতি ঘটে যখন দলটি কতকগুলি, "জোহুকুমের" লোক নিয়ে একটি কুচক্রী দলে (Coterie or Faction) পরিণত হয়। স্বার্থান্বেষী, সুচতুর একনায়ক রাষ্ট্রে এ ধরনের দলাদলির সুযোগ নিয়েই নিজের ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব কায়েম করার চেষ্টা করেন।

(৪) কুচক্রী দলে রূপান্তর

পঞ্চমতঃ, একাধিক দুর্বল রাজনৈতিক দল থাকলে সে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র কখনই সফল হতে পারে না। ফরাসী প্রজাতন্ত্রে এই দুর্ঘটনা প্রায়ই দেখা দিত। সেখানে এক একটি মন্ত্রিসভা একাধিক দলের নেতাদের নিয়ে গঠিত হত এবং তাদের মেয়াদও কয়েক মাস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকত।

(৫) অসংখ্য দল অবাঞ্ছনীয়

মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের (Mustafa Kamal Ata Turk) মৃত্যুর পর তুর্কী প্রজাতন্ত্রেও এই প্রবণতা দেখা দেয়।

॥ একদলীয় ব্যবস্থা ॥

সোবিয়েত রাশিয়ার শাসনতন্ত্রের ১২৬ এবং ১৪১ ধারা অনুসারে সেখানে সাম্যবাদী দলকে (Communist Party) একমাত্র স্বীকৃত রাজনৈতিক দল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। চীনের সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্রেও সোবিয়েত ব্যবস্থার মত একদলীয় শাসন-ব্যবস্থা (One-Party Rule) প্রচলিত। মার্কসবাদী রুশ এবং চীনা নেতৃবৃন্দ সাম্যবাদের আদর্শ অনুসারে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়তার (Democratic Centralism) নীতি অনুসরণ করার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে সাম্যবাদের আদর্শে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে সমভাবে শ্রেণী-বিহীন, শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য পরিচালনা করা শুধুমাত্র একদলীয় শাসনব্যবস্থাতেই সম্ভব। একনায়কতন্ত্রী সামগ্রিক বা সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রেও (Totalitarian Dictatorship) একদলীয় শাসনব্যবস্থা অনুসারে সরকার পরি-চালনা করা হয়।

সোবিয়েত ও চীনা প্রজাতন্ত্রে ও একনায়কতন্ত্রে একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত; মার্কসবাদী গণকেন্দ্রিকতার নীতির প্রয়োগ

একদলীয় ব্যবস্থার গুণ হল যে, এখানে একই আদর্শে রাষ্ট্র শাসিত হয়, জাতীয় ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, দেশবাসীদের দেশপ্রেম, স্বার্থত্যাগ, জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা যায়, স্বাভাবিক এবং জরুরী অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়।

একদলীয় ব্যবস্থার গুণ

কিন্তু একদলীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান অসুবিধা হল, এখানে বিরোধী দলের অস্তিত্ব না থাকায় একমাত্র সরকারী শাসকদল নিজেদের ভুলত্রুটি জানার বা সেগুলি সংশোধন করে নেবার সুযোগ পায় না। হিটলার প্রভৃতি একনায়কের কর্তৃত্বে একনায়কতন্ত্রী একদলীয় সরকার সব সময়ে বিরোধী দলগুলিকে অত্যাচার করত এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা পদদলিত করত। সোবিয়েত এবং চীনা সাম্যবাদী নেতৃবৃন্দ অবশ্য তাঁদের একদলীয় শাসনব্যবস্থাকে হিটলারী একনায়কতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী বলে ঘোষণা করে থাকেন। সোবিয়েত শাসন-তন্ত্রবিদ্ ভিসিন্‌স্কির (Vyshinsky) মতে সোবিয়েত সাম্যবাদী দলের সকল সভ্যই মেহনতী জনতার মুখপাত্র শ্রমিকগণ প্রধান। তিনি বলেন যে, এই দলের নির্বাচনপদ্ধতিও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। উপরন্তু তাঁর মতে পুঁজিবাদী দেশ-গুলির বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা কার্যতঃ একই ধনিক শ্রেণীর একচেটিয়া ক্ষমতার ব্যব-হারিক প্রয়োগ—তাদের এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে বিতাড়িত করে ক্ষমতালাভের চেষ্টা করে। চীনের পরলোকগত নেতা মাও সে-তুং (Mao tse-Tung) একাধিক মতামতের স্বচ্ছন্দ প্রকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে এক শত কুসুমের শোভাতেই যেমন উদ্যানের শোভা ("A hundred flowers must bloom") তেমনি হাজারো মতের প্রভাবেই গণচেতনা গড়ে ওঠে।

একদলীয় ব্যবস্থার দোষ : সোবিয়েত ও চীনা ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি

হিট্লারী একনায়কতন্ত্র থেকে মতাদর্শের দিক হতে উন্নত হলেও অনেকের মতে একদলীয় শাসনব্যবস্থায় কখনই ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না। গণতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য বহু ব্যবস্থা রাখার দরকার হয়। বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি সাম্যবাদী আদর্শকে গুণগতভাবে সমর্থন করলেও সাম্যবাদী একদলীয় ব্যবস্থাকে স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে নিন্দা করে থাকেন। মাওয়ের নেতৃত্বে চীনে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব (Cultural Revolution) অনুষ্ঠিত হয়, তার উদ্যোক্তাগণ অনেক ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছিলেন বলে অনেকে অভিযোগ করে থাকেন।

অনেকের মতে সব ক্ষেত্রেই একদলীয় ব্যবস্থা অবাঞ্ছনীয়

॥ দ্বিদলীয় শাসনব্যবস্থা ॥

ইংলণ্ড্ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পৃথিবীর এই দুটি প্রধান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রথাগত রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে ধীরে ধীরে দ্বিদলীয় শাসনব্যবস্থা (Double বা Two-Party System) গড়ে উঠেছে। ইংলন্ডে হুইগ্ (Whig) এবং টোরি (Tory) এই দুই গোষ্ঠী পরে যথাক্রমে উদারপন্থী (Liberal) এবং রক্ষণশীল (Conservative) দলে পরিণত হয়। রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে সুদীর্ঘকাল ধরে এই দুটি দলের নেতারূপে যথাক্রমে গ্লাড্স্টোন্ (Gladstone) এবং ডিস্রেলী (Disraeli) পর্যায়ক্রমে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীরূপে কাজ করেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে শ্রমিক দলের (Labour Party) আবির্ভাব ঘটলেও সেখানে এই দ্বিদলব্যবস্থার কোনও গুরুতর পরিবর্তন ঘটে নি, কারণ শ্রমিক দলের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে ইংলণ্ডে উদারপন্থী দলের ক্ষমতা বিশেষভাবে হ্রাস পেতে থাকে।

ইংলণ্ডে প্রথাগতভাবে দ্বিদল ব্যবস্থা প্রচলিত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আব্রাহাম্ লিংকনের আমলে ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন-তাকামী এবং যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষার সমর্থক এই দুটি দলে মার্কিন দেশবাসীগণ বিভক্ত হয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে রিপাব্লি-কান্ (Republican) এবং ডেমোক্র্যাট্ (Democrat) এই দুটি দলে ঐ মতভেদ অন্যভাবে রূপায়িত হল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলব্যবস্থা চূড়ান্ত রূপ নিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের সময় থেকেই দ্বিদলব্যবস্থা প্রচলিত

দ্বিদলব্যবস্থার প্রধান সুবিধাগুলি হল জনগণ দেশের রাজনৈতিক হালচাল অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিতে পারেন। দেশে দুটি দলের এক দল সরকার গঠন করে, অপর দল বিরোধী দলরূপে কাজ করে থাকে। নির্বাচনের সময় তাদের পক্ষে প্রার্থী নির্বাচন সহজ হয়। দলদুটির পক্ষেও পরস্পরের কর্মসূচীকে বুঝে নেওয়া সহজ হয় এবং প্রত্যেক দলই তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের কর্মসূচী সহজে ঠিক করতে পারে। সুতরাং দ্বিদল শাসনব্যবস্থায় শাসনক্ষমতার মেরুকরণ (Polarisation of Power) সবচেয়ে সরল ও সহজ হয়ে ওঠে এবং সেজন্য অনেকে দ্বিদলব্যবস্থাকে সংস-

দ্বিদলব্যবস্থার প্রধান সুবিধা : শাসনক্ষমতার মেরুকরণ : বামপন্থী বনাম দক্ষিণপন্থী

দ্বীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি প্রধান শর্ত বলে মনে করেন। একটি দলকে দক্ষিণপন্থী (Right) এবং অপরটিকে বামপন্থী (Left) বলে চিহ্নিত করলে গণতন্ত্রের গতিশীলতা বোঝা সহজ হয় এবং ঘন ঘন মন্ত্রিসভা বদলের সম্ভাবনা থাকে না।

কিন্তু **দ্বিদলব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি** হল যে অন্য কোনও বিকল্প দল না থাকায় মধ্যপন্থীগণ নিজেদের মতামত ঠিকমত প্রকাশ করার সুযোগ পান না। নির্বাচকগণ দুটি বিরুদ্ধ মতামত ছাড়াও তৃতীয় কর্মপন্থা কার্যকর করার সুযোগ লাভ করেন না। তা ছাড়া বহুদলীয় ব্যবস্থায় জনমতের নানা দিক প্রতিফলিত হবার যে সুবিধা থাকে, দ্বিদল ব্যবস্থায় তা থাকে না। দ্বিদলব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। স্বাধীনপন্থী ব্যক্তিদের কোনও ভূমিকা থাকে না।

দ্বিদলব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি : তৃতীয় পন্থার অনুপস্থিতি

বাস্তবের দিক দিয়ে আলোচনা করতে গেলে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক দেশের জনজীবন আজকাল এত জটিল ও সমস্যাবহুল যে কেবলমাত্র দুটি দলের অস্তিত্বের সম্ভাবনা কম থাকে এবং শাসনব্যবস্থা ঋজু ও দ্বিধামুক্ত হয়ে উঠতে পারে না। সুতরাং বহুদলীয় ব্যবস্থা আজকাল বাস্তবভিত্তিক, দ্বিদলব্যবস্থা একটা তত্ত্বগত রূপকল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

উপসংহার : বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রাধান্য

॥ বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা ॥

নাগরিকদের মতের বিভিন্নতাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলব্যবস্থায় চরম বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। বহুদলীয় ব্যবস্থা (Plural or Multiple Party-system) এই বিভিন্নতার বাস্তব প্রতিফলন।

বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রাধান্য

এই ব্যবস্থার **প্রধান সুবিধা** হল এই যে এখানে নির্বাচকগণ দুটির অধিক দলের কর্মসূচীর সঙ্গে পরিচিত হন। ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীরের সমান বিপজ্জনক আক্রমণ থেকে নির্বাচক রক্ষা পান। চীনের পরলোকগত চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর মত একনায়করাও আদর্শ হিসাবে শত কুসুমে শোভিত উদ্যানের মত হাজারো মতের সমাহারে সমৃদ্ধ আদর্শ জনজীবনের কথা ঘোষণা করেন। অনেক রাজনৈতিক দল থাকায় কোনও নির্দিষ্ট দলের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা কখনও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে না।

এর প্রধান সুবিধা : একাধিক মত থাকা গণতান্ত্রিক

কিন্তু বহুদলব্যবস্থার অনেক **ত্রুটি** দেখা যায়। রাষ্ট্রে অসংখ্য উপদল সৃষ্টি হতে পারে এবং তাদের আবির্ভাব শাসনব্যবস্থাকে অস্থায়ী করে তুলতে পারে। এদের সুবিধাজনক আঁতাত (Entente) বা জোট নৈতিক মান অবনত করে। ফরাসী প্রজাতন্ত্রে, ইতালীতে এবং কামালের লোকান্তরের পর তুর্কী প্রজাতন্ত্রে এই ধরনের বহুদলীয় কোন্দলে সংসদীয় গণতন্ত্র চরম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হত। ঘন ঘন মন্ত্রিসভা বদল হলে শাসননীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। একাধিক দল থাকায়

এর প্রধান অসুবিধা : জনমনে বিভ্রান্তি, অস্থায়ী শাসনব্যবস্থার উদ্ভব

কোনও একটি দল তেমনভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে না। জনগণ নির্বাচনের সময় এবং তার পরেও অত্যন্ত বিভ্রান্ত হন।

॥ গণতন্ত্রে কি ধরনের দলব্যবস্থা কাম্য এবং কেন ॥

দলব্যবস্থার নানা দোষত্রুটি থাকলেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। গান্ধীজী তাঁর বিখ্যাত সর্বোদয় নীতির অন্যতম কর্মসূচী হিসাবে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা অবলুপ্ত করে দেবার পক্ষে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেন। এমন কি ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রধান পুরোধা হিসাবে কংগ্রেস দলেরও ভারতের স্বাধীনতালাভের পর কোন প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করতে চান নি। তাঁর মতে, রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রায়ই অসত্য, অর্ধসত্য ইত্যাদির বেসাতি করতে হয়। ফলে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা ন্যায় এবং নীতির আদর্শের পরিপন্থী।

গান্ধীজী দলব্যবস্থার বিরোধী হলেও দলব্যবস্থা ছাড়া গণতন্ত্র অচল

কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রে শাসনব্যবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। ফলে সরকারকে সব সময় জনজীবনের জটিলতার সঙ্গে লড়াই করে চলতে হয়। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল না থাকলে শাসনব্যবস্থাকে বাস্তবানুগ করে তোলা চলে না।

জাতীয় চরিত্র মানেই সমষ্টিগতভাবে নাগরিক চরিত্র। দুটিরই উন্নতি হলে রাজনৈতিক দলগুলির কাজকর্মও অনেকটা দোষমুক্ত এবং উন্নত হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলি দুর্নীতিপরায়ণ, সেখানকার জাতীয় চরিত্রের মানও খুব উন্নত বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, নানাপ্রকার সাংবিধানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বহুদলীয় ব্যবস্থার দোষত্রুটি সংশোধন করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সের চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করার জন্য নানাপ্রকার সাংবিধানিক ব্যবস্থা রাখা হয়। অনেকে মনে করেন যে, রাজনৈতিক দলাদলির হাত থেকে রাষ্ট্রকে এবং জনগণকে রক্ষার জন্য সুইজারল্যান্ডের প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্গত পদচ্যুতি (Recall) প্রভৃতি ব্যবস্থা সংসদীয়, অর্থাৎ পরোক্ষ গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও রাখা দরকার। এর ফলে আইনসভার সদস্যগণ অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয় স্বার্থকে দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে রাখতে বাধ্য হবেন। তৃতীয়তঃ, ক্ষমতাসীন কোন দল নিজের খেয়াল খুশীমত শাসনতন্ত্রের মূল কাঠামো যাতে বদলাতে না পারে তার জন্য শাসনতন্ত্রের মধ্যে কিছুটা অনমনীয়তা থাকা দরকার। চতুর্থতঃ, রাজনৈতিক দলাদলি যতই নিম্নস্তরে উপনীত হোক না কেন, বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, মানমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকলে কুচক্রী দলগুলিও রাষ্ট্রিক বা শাসনতান্ত্রিক নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না। পঞ্চমতঃ, সমস্ত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারী কর্মচারীদের রাজনীতির বাইরে রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এঁরা কোন রাজনৈতিক দলের সভ্য হতে পারেন না এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন দলীয় স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন না।

আদর্শ দলব্যবস্থায় থাকা চাই (১) দুর্নীতিমুক্তি (২) পদচ্যুতির মত কিছু সাংবিধানিক ব্যবস্থা (৩) অনমনীয় শাসনতন্ত্র (৪) বিচারালয়ের স্বাতন্ত্র্য (৫) সরকারী কর্মীদের নিরপেক্ষতা

উপসংহারে বলা যায় যে, দ্বিদলব্যবস্থা একদলব্যবস্থার চেয়ে অনেক ভাল, বহু-দলীয় ব্যবস্থার চেয়েও ভাল। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক আদর্শের দিক থেকে বিচার করলে একদলীয় ব্যবস্থা ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী এবং যত বিরাট আদর্শের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, অত্যন্ত বিপজ্জনক। বহুদলীয় ব্যবস্থা আদর্শের দিক থেকে দ্বিদলব্যবস্থার চেয়ে খারাপ হলেও একদলীয় ব্যবস্থার চেয়ে ভাল। কিন্তু দ্বিদলব্যবস্থা সাধারণতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা ইংলণ্ডের মত প্রগতিশীল দেশে সেখানকার সুদীর্ঘ সাংবিধানিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে প্রথাগত ব্যবস্থারূপে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এই ধরনের সার্বিক বিবর্তন ঠিক অনুরূপভাবে পৃথিবীর সব দেশে ঘটে বা ঘটবে বলে আশা করাও অন্যায়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

দ্বিদলব্যবস্থাই সবচেয়ে ভাল

বা ইংলণ্ডে দুচারটি ছোটখাটো দল থাকলেও শাসনব্যবস্থা প্রধানতঃ দুটি দলকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। আবার, সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলিতে বাহ্যতঃ একদলীয় শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হলেও সেখানে যে উপদলীয় শাসনব্যবস্থা চলে না বা চলবে না এ সিদ্ধান্তও ঠিক নয়। অতএব সব কিছু চিন্তা করে বলা যায় যে, ফলিত ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা অবশ্যই চাই। আদর্শের দিক থেকে দ্বিদলব্যবস্থা শ্রেষ্ঠ হলেও কার্যতঃ রাষ্ট্রে অসংখ্য দল, উপদল ইত্যাদি থাকে। ফলে বহুদলীয় ব্যবস্থাই বেশী চোখে পড়ে। কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলী যদি সচেতন হন, জাতীয় চরিত্র যদি উন্নত, স্বাধীন থাকে, নানাপ্রকার নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা যদি বজায় থাকে, বিচারবিভাগ যদি স্বাধীন হয়, তা হলে একাধিক ছোটখাটো দল ক্রমে ক্রমে নির্বাচনী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজনৈতিক আসর থেকে আপনা-আপনি বিদায় নিতে বাধ্য হবে। এটাই রাজ-নৈতিক বিবর্তনবাদের পরম পরিণতি, চরম সত্য।

সারাংশ

জনগণের মতৈক্যই **জনমত**, সংখ্যাগরিষ্ঠের মত জনমত নয়।

ব্রাইস্ বলেন যে, "জনমত" স্পষ্ট নয়। সমাজতত্ত্ববিদ্রা বলেন যে, জনমত সংস্কারবোধ। কিন্তু
জনমতের এ দুটি সংজ্ঞাই ঠিক নয়। গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ সকলেরই স্বার্থের অনুকূল মত হল জনমত।
ফাইনার জনমতের ৩টি উপাদানের ওপর জোর দিয়েছেন—(১) জনমত তথ্যভিত্তিক হওয়া চাই, (২) তথ্য-
গুলির মূল্যায়ন হওয়া চাই, (৪) জনমতগঠনের ক্ষেত্রে সুবিধাবাদের স্থান নেই।

সুগঠিত, সুচিন্তিত জনমতই গণশক্তি।

আধুনিক সংখ্যাবিজ্ঞান জনমতের পরিমাপ ও গতিশীলতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে খুব সাহায্য করে ঃ এ
ক্ষেত্রে গেল্লাপ্ পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ।

জনমতের মাধ্যম—(১) মুদ্রাযন্ত্র, কিন্তু সংবাদপত্রগুলির নিরপেক্ষ থাকা দরকার; (২) বেতার, দূরদর্শন
ও চলচ্চিত্র ঃ দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যম—এ মাধ্যমগুলি নিরপেক্ষ ও শ্লীল হলে তবেই সাংস্কৃতিক অবক্ষয় রোধ
করা যায়; (৩) রাজনৈতিক দলগুলির, বিশেষতঃ, বিরোধী দলের ভূমিকা; কিন্তু সংকীর্ণ দলবাজি
নিন্দনীয়; (৪) সভাসমিতির প্রভাব—কিন্তু বাক্সর্বস্বতা জনমতের সূচক নয়; (৫) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের
প্রভাব—শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠন; কিন্তু শিক্ষাকে দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধে রাখা চাই; (৬) আইনসভা উদার,
পরমতসহিষ্ণু হওয়া চাই।

জনমত গঠনের মাধ্যমগুলি কার্যকর করার উপায়—মাধ্যমগুলির ত্রুটি সম্পর্কে লোওয়েল্ এর অভিযোগ : জনমত যেন কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ না হয় : তার উপায়।

রাজনৈতিক দল : তার সংজ্ঞা, গণতন্ত্রে তার স্থান ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণ।

রাজনৈতিক দলগুলির কার্যাবলী ও উপযোগিতা : দলের কাজ—(১) নীতিনির্ণয়, (২) দলীয় নীতি-প্রচার, (৩) নির্বাচনে অংশগ্রহণ।

রাজনৈতিক দলব্যবস্থার সুবিধা : (১) গণশিক্ষা, (২) জনসংযোগ, (৩) শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা-হস্তান্তর, (৪) স্বাধীনতা রক্ষা, (৫) সরকারী কাজের সমন্বয়।

দলীয় ব্যবস্থার ত্রুটি—(১) সঙ্কীর্ণতা, (২) স্বাধীনচেতাদের অমর্যাদা, (৩) নৈতিক ও যোগ্যতার মানের অধঃপতন, (৪) কুচক্রী দলে রূপান্তর, (৫) অসংখ্য দল অবাঞ্ছনীয়।

একদলীয় ব্যবস্থা : সোবিয়েত ও চীনা প্রজাতন্ত্রে ও একনায়কতন্ত্রে একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত : মার্কসবাদী গণকেন্দ্রিকতার নীতির প্রয়োগ।

একদলীয় ব্যবস্থার গুণ ও দোষ—সোবিয়েত ও চীনা ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি।

অনেকের মতে সব ক্ষেত্রেই একদলীয় ব্যবস্থা অবাঞ্ছনীয়।

দ্বিদলীয় শাসনব্যবস্থা : ইংলণ্ডে প্রথাগতভাবে দ্বিদলব্যবস্থা প্রচলিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের সময় থেকেই দ্বিদলব্যবস্থা প্রচলিত।

দ্বিদলব্যবস্থার প্রধান সুবিধা : শাসনক্ষমতার মেরুকরণ : বামপন্থী বনাম দক্ষিণপন্থী দল।

দ্বিদলব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি : তৃতীয় বা মধ্যপন্থার অনুপস্থিতি।

উপসংহার : বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রাধান্য। এর প্রধান অসুবিধা—জনমনে বিভ্রান্তি, অস্থায়ী শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব।

গণতন্ত্রে কি ধরনের দলব্যবস্থা কাম্য এবং কেন?—গান্ধীজী দলব্যবস্থার বিরোধী হলেও দলব্যবস্থা ছাড়া গণতন্ত্র অচল।

আদর্শ দলব্যবস্থায় থাকা চাই (১) দুর্নীতিমুক্তি, (২) পদ্ধতির মত কিছু সাংবিধানিক ব্যবস্থা, (৩) অনমনীয় শাসনতন্ত্র, (৪) বিচারালয়ের স্বাতন্ত্র্য, (৫) সরকারী কর্মীদের নিরপেক্ষতা।

দ্বিদলব্যবস্থাই সবচেয়ে ভাল।

৬ সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার

"To be free a people must be able to choose its rulers at stated intervals simply because there is no other way in which their wants, as they experience those wants will receive attention."

—Laski

আধুনিক গণতন্ত্র প্রায় সর্বত্রই পরোক্ষ গণতন্ত্র। নিয়মিতভাবে ভোটদাতাগণ নির্বাচকরূপে ভোট দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে আইনসভা গঠন করে থাকেন। কার্যতঃ, পৃথিবীর সর্বত্রই প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটদানের অধিকার (Universal Adult Franchise) বর্তমানে স্বীকৃত। এ বিষয়ে ইংলণ্ড অগ্রণী। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে সেখানে নির্বাচনী সংস্কার আইন (Second Reform Act) কার্যকর হওয়ার ফলে অশিক্ষিত শ্রমিকদেরও কমন্স্‌সভার নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার প্রদান করা হয়। পূর্বে সম্পত্তির মালিককেই ভোটদানের অধিকার দেওয়া হত। ক্রমে এই ব্যবস্থাটিও বাতিল হয়ে যায়। নারীগণকেও ক্রমশঃ সমানভাবে ভোটাধিকার দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বে এবং সংবিধানের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতার আদর্শ সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত ও সম্মানিত হতে পেরেছে। কিন্তু এই চিরস্মরণীয় ঘটনাটি কত বাদানুবাদ, কত সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। গণতন্ত্রের এই অগ্রগমন, ব্যক্তিস্বাধীনতার এই জয়যাত্রা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে হলে জানা দরকার সার্বিক ভোটাধিকার বা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার অর্জনের বিষয়টির সঙ্গে কি কি বিভিন্ন প্রশ্ন আংশিকভাবে জড়িত হয়েছিল। এই বিভিন্ন প্রশ্নগুলি নানা সময়ে বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করে সমগ্রভাবে সর্বজনীন ভোটাধিকারের নীতিটিকে স্বীকার করে নিতে সকলকে বাধ্য করেছিল। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতিটি ধীরে ধীরে যেভাবে স্বীকৃত হল, তার ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে জানতে হবে কিভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সম্পত্তির মালিক হবার যোগ্যতা ভোটাধিকার লাভের মাপকাঠিরূপে ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হল, অর্থাৎ কিভাবে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের নীতি (Limited বা Restricted Franchise) ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হল, কিভাবে মহিলাগণও ধীরে ধীরে ভোটাধিকার লাভ করলেন।

সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার লাভের ইতিহাস দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল

॥ সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের নীতি : শিক্ষা ও সম্পত্তির সীমা ॥

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দেবার বিরুদ্ধে পূর্বে অনেকে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের নীতি সমর্থন করতেন। **শিক্ষা** এবং **সম্পত্তি** এই দুটি বিষয়কে তাঁরা ভোটদানের যোগ্যতার মাপকাঠি বলে মনে করতেন। এঁদের যুক্তি ছিল এই যে, ভোটাধিকার নাগরিকের মৌলিক অধিকার নয়, এই অধিকার অর্জন করতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা দরকার এবং সম্পত্তির মালিক হওয়া দরকার।

সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার নীতি : শিক্ষা ও সম্পত্তির নিরিখ

শিক্ষাগত যোগ্যতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার নীতির সমর্থকগণ বলতেন যে, শিক্ষিত হলেই ভোটদাতার পক্ষে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ সার্থক হয়ে ওঠে। অশিক্ষিত ভোটদাতা অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ব্যক্তিগত অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে অযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে। চতুর নেতার বাক্‌চাতুর্যে মোহিত হয়ে বক্তৃতার তোড়ে ভেসে গিয়ে সে যুক্তির বদলে আবেগের প্রভাবেই ভোট দেবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে ভোটদাতা বিভিন্ন দলের পত্রপুস্তিকা, প্রাচীরলিখন প্রভৃতি পড়ে আরও সঠিকভাবে তার নিজের রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে পরিচালিত করার সুযোগ পাবে। শিক্ষার আলোকে তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আরও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে এবং ঘটনার পারম্পর্য বিচারে, বিভিন্ন দলীয় কর্মসূচীর তুলনামূলক মূল্যায়নে সে অধিকতর সমর্থ হয়ে উঠবে।

শিক্ষার সীমা রাখার পক্ষে যুক্তি

সম্পত্তির মালিকানাকে শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে সমতুল্য আর-একটি সীমারূপে রাখার পক্ষেও যুক্তি দেখানো হয়। বলা হয় যে, যে ব্যক্তির সম্পত্তি নেই অথবা যাঁকে কর দিতে হয় না, তাঁকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া উচিত নয়। কারণ, ভোটদানের অর্থ হল তাঁর মনোনীত প্রার্থী আইনসভায় রাষ্ট্রের বাৎসরিক বাজেট সম্পর্কে অর্থাৎ জাতীয় সম্পত্তির বা আয়ব্যয়ের ক্ষেত্রে মতামত প্রকাশের অধিকার পাবেন। যাঁর নিজেরই সম্পত্তি নেই, যিনি নিজে কর দেন না, রাষ্ট্রের আয়ব্যয়ের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যক্ষ পরোক্ষ, কোনরকমভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার থাকা উচিত নয়।

সম্পত্তির সীমা রাখার পক্ষে যুক্তি

॥ সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের নীতি : নারীদের ভোটাধিকার ॥

সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের নীতির সমর্থকগণ আর একটি প্রধান যুক্তির সাহায্যে সর্বজনীন ভোটাধিকারের নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতেন। তাঁরা বলতেন যে, মহিলাদের কোনরকম ভোটাধিকার দেওয়া উচিত নয়। এই নীতির সমর্থনে তাঁরা কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করতেন। প্রথমতঃ, নারীর একমাত্র কর্মস্থল তাঁর গৃহ। তাঁকে ভোটাধিকার দেওয়ার অর্থ দেশের রাজনীতির জটিল আবর্তে তাঁকে নিক্ষেপ করা। ফলে তাঁর গৃহকর্ম বিঘ্নিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, নারীগণ তাঁদের স্বামীদের পরামর্শে অথবা স্বামীদের মতের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন। প্রথম ক্ষেত্রে তাঁর কোনও স্বাধীন সত্তা থাকে না, অপর ক্ষেত্রে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কলহ সৃষ্টি হতে পারে। তৃতীয়তঃ, মহিলাগণ স্বভাবতঃই

নারীদের ভোটাধিকার না দেবার পক্ষে যুক্তি

অস্থির এবং ভাবপ্রবণ। তাই তাঁদের ভোটদানের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে সংশ্লিষ্ট করা উচিত নয়।

॥ সীমাবদ্ধ বনাম সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ॥

বর্তমানে ভোটাধিকার সর্বজনীন

সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার নীতি গণতন্ত্রের অগ্রগমনের ফলে ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং সার্বিক বা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি ক্রমশঃ স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের নীতির বিপক্ষে প্রদত্ত যুক্তিগুলি থেকেই সার্বিক ভোটাধিকারের নীতির সমর্থনে কেন সকলে একমত হয়েছেন তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতাকে ভোটদানের মাপকাঠিরূপে রাখার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক শিক্ষা এমন এক শিক্ষা, যা বিদ্যালয়ে অধীত জ্ঞানের সাহায্য ছাড়াও লাভ করা যায়। আকবর, অহল্যাবাঈ প্রভৃতি অনেকে খুব সুন্দরভাবে রাজকার্য চালিয়ে ছিলেন, যদিও তাঁদের পুঁথিগত জ্ঞান ছিল সামান্যই। দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক এখনও নিরক্ষর। পৃথিবীর অর্ধেক নিরক্ষর জনগণকে ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ঘোরতর অন্যায়। ইউনেস্কোর ব্যাপক গণশিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণের ফলে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে এই নিরক্ষরতা ধীরে ধীরে দূর হবে, আশা করা যায়।

শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রশ্ন অবান্তর

তৃতীয়তঃ, ভোটদান এমন একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্র, যেখানে পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে শ্রেণীসচেতনতা, দেশপ্রেম, উপস্থিতবুদ্ধি প্রভৃতি বেশী প্রয়োজন। ল্যাস্কি ঠিকই বলেছেন যে, যা কিছু সকলকে স্পর্শ করে, সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের মিলিত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হওয়া উচিত ("What touches all must be decided by all")। চতুর্থতঃ, জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ মনে করেন যে, নিয়মিতভাবে ভোটদানের ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়, তার দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পায়, কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়। তবে তিনি ব্যাপকভাবে গণশিক্ষা প্রসারের নীতিকে অগ্রাধিকার দেবার পক্ষপাতী। তাঁর মতে, অশিক্ষিত ভোটদাতার চেয়ে শিক্ষিত ভোটদাতাই অধিকতর কাম্য। তাই তিনি বলেছেন, "আগে চাই সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থা, তারপর থাকা চাই সর্বজনীন ভোটাধিকার" ("Universal education must precede universal enfranchisement.")।

নারীগণের ভোটাধিকারও স্বীকৃত

প্রথম মহাযুদ্ধেরপর পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে নারীগণ সেবিকা বা নার্স্‌রূপে এবং অন্যান্য চাকুরীতে অংশ গ্রহণ করে নানাভাবে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের এই সাহস, ত্যাগ এবং সেবার যুক্তি দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীপ্রগতি আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে, নারীগণকে অধিকতর অধিকার দেবার দাবী জানানো হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমে ইংলণ্ডে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নারীগণের ভোটাধিকারের দাবী স্বীকার করে নেওয়া হয়। এমন-কি, কয়েক বছর আগে সুইজারল্যাণ্ডের মত রক্ষণশীল দেশেও মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

নারীদের ভোটাধিকারের দাবী প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের দাবীকে জোরালো করে তুলেছে। রাষ্ট্রের জনসংখ্যার অর্ধাংশ নারী। সুতরাং রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশকে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়। নারীকে ভোটাধিকার দিলে গৃহিণীরূপে তাঁর দায়িত্ব তেমন কিছু ক্ষুন্ন হয় না। বরং রাষ্ট্রিক, সামাজিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করার ফলে তাঁর পক্ষে আদর্শ গৃহিণী হওয়া আরও সহজ হয়। নারীগণ ভোটদান উপলক্ষ্যে স্বামীদের প্রভাবে পড়বেন—এ সম্ভাবনাকে খুব বিপজ্জনক বলে মনে করা ঠিক নয়। স্বামীদের প্রভাব তাঁদের ভোটদানের দায়িত্ব এবং কর্তব্যপালন সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নারী—সুলতানা রিজিয়া, রাণী ভিক্টোরিয়া প্রভৃতি যেমন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তেমিন, অতি-আধুনিক যুগে ইস্রেলে শ্রীমতী গোল্ডা মইয়ার, ভারতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীলঙ্কায় শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক, ইংলণ্ডে শ্রীমতী মার্গারেট্ থ্যাচার প্রধানমন্ত্রীরূপে নিজ নিজ রাষ্ট্রকে সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছেন। সুতরাং নারীদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের নীতিকে আর সমর্থন করা হয় না।

মেয়েদের নেতৃত্বের স্বীকৃতি সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের দাবীরই বিশ্বজনীন স্বীকৃতি

সম্পত্তির মালিকানাকে আজকাল আর ভোটদানের মাপকাঠি-রূপে স্বীকার করা হয় না; বরং এই যুক্তিটিকে অতীত সামন্তযুগের যুক্তি বলে নিন্দা করা হয়। সমাজতন্ত্রের প্রভাবে আজকাল পৃথিবীর সর্বত্রইশই রাষ্ট্র প্রয়োজনমত সম্পত্তির অধিকারকে সকলের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ভারতের মত জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে সম্পত্তির অধিকার আজ মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকৃত নয়। তাছাড়া মেহনতী জনতার সজীব অংশরূপে প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিছু না কিছু দিয়ে থাকেন। সুতরাং ব্যক্তির সম্পত্তি থাকুক বা না-ই থাকুক, বিদেশী কিংবা উন্মাদ, দেউলিয়া বা আদালত কর্তৃক গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিচারে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভোটদানের অধিকারী।

সম্পত্তির মালিকানাও আজকাল ভোটাধিকারের মাপকাঠি নয়

সারাংশ

সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারলাভের ইতিহাস দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল। এর বিপরীত নীতি ছিল সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের নীতি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সম্পত্তির মালিকানাকে ভোটাধিকারলাভের মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করা হত। নানা যুক্তির সাহায্যে মহিলাদেরও ভোটাধিকার দেওয়া হত না।

বর্তমানে মহিলাদের ভোটাধিকার সর্বত্র স্বীকৃত। বর্তমান যুগ সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের যুগ—গণতন্ত্রের যুগ।

উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নাবলী ও উত্তরসঙ্কেত

বন্ধনীর মধ্যে মুদ্রিত সংখ্যাগুলি প্রশ্নোত্তরের জন্য আবশ্যক এই বইটির সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাসংখ্যার সূচক। **প্রথম পত্রের** প্রশ্নগুলির উত্তরের জন্য এ-বইয়ের **প্রথম ভাগের** নির্দিষ্টসংখ্যক পৃষ্ঠাসংখ্যা ও **দ্বিতীয় পত্রের** জন্য **দ্বিতীয় ভাগের** সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাসংখ্যা দ্রষ্টব্য।

গ বিভাগের বাস্তবভিত্তিক প্রত্যেক প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি সংশ্লিষ্ট বন্ধনীর মধ্যে মোটা হরফে মুদ্রিত হয়েছে।

১৯৮৫ : ১ম পত্র

১। যে কোন **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ২×১৬=৩২

(ক) সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা হিসাবে হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশোর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি আলোচনা কর (৯০—৯৪)।

(খ) "এক জাতি, এক রাষ্ট্র"—উক্তিটির মধ্যে যে মতবাদ নিহিত আছে তার মূল্য ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর (১১৫—১২১)।

(গ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার গঠন, কার্যাবলী ও ভূমিকা বর্ণনা কর (১৪২—১৪৭)।

(ঘ) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? ত্রিপুরা কি একটি রাষ্ট্র? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও (২৭—৩৪, ৩৭)।

২। যে কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর লিখ : ৪×১২=৪৮

(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি প্রকৃতই একটি বিজ্ঞান? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও (৬—১১)।

(খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিদ্যার সম্পর্ক আলোচনা কর (১৭—১৮)।

(গ) ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্গত মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও (২৪০—২৪৪)।

(ঘ) " অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সঙ্গে জড়িত"—ব্যাখ্যা কর (২২৭—২৩৩)।

(ঙ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছিব্যবস্থা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর (১৬৪—১৬৭)।

(চ) ভারতীয় সংবিধানের সংরক্ষিত সাম্যের অধিকারের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা ব্যাখ্যা কর (২৩৪—২৩৭)।

৩। যে কোন **চারটির** উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ : ৪×৫=২০

(ক) জনগণের সার্বভৌমিকতা (৫৯—৬১)।

(খ) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (২৩৭)।

(গ) নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য (১৯৪—১৯৬)।

(ঘ) অর্থনৈতিক অধিকার রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্তি (২২০—২২৪)।

(ঙ) রাষ্ট্রদর্শন (১১—১৩)।

(চ) শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব (১৪৫—১৪৭)।

১৯৮৫ : ২য় পত্র

১। যে কোন **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ২×১৬=৩২

(ক) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ বলতে কি বোঝায়? ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল্য ও সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা কর (১৭০—১৭৮)।

(খ) মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। এই ব্যবস্থার সাফল্যের অপরিহার্য শর্তগুলি কি কি? (৬৩—৭২)।

(গ) ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর (১৮৪—১৯৩)।

(ঘ) সার্বিক ভোটাধিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও (২৬৯—২৭২)।

২। যে কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর লিখ : ৪×১২=৪৮

(ক) সংবিধানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কোন্ কোন্ ভিত্তিতে সংবিধানকে শ্রেণীবিভক্ত করা যেতে পারে দেখাও (৩—৯)।

(খ) আধুনিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা কর (২৬৬—২৬৭)।

(গ) আধুনিক রাষ্ট্রে আইনবিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর (২০৭—২০৯)।

(ঘ) লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর (২২০—২২২)।

(ঙ) বিচারবিভাগের স্বাধীনতা কি কি উপায়ে রক্ষিত হতে পারে দেখাও (২৩৬—২৩৮)।

৩। ভারতীয় সংবিধানের যে কোন **চারটির** উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ : ৪×৫=২০

(ক) প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (৮১—৮৫)।

(খ) রাজ্যপালের নিয়োগ ও অপসারণ পদ্ধতি (১৯৯)।

(গ) জনমত গঠনের মাধ্যমসমূহ (২৫৫—২৫৯)।

(ঘ) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি (২১৯)।

(ঙ) ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ নং ধারা (১৮৮)।

(চ) ত্রিপুরা বিধানসভার গঠন (২২৩)।

১৯৮৪ : ১ম পত্র

ক বিভাগ

১। যে-কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১৫×৪=৬০

(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি? অর্থবিদ্যার সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা কর (১—৬)। ৮+৭

(খ) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বলপ্রয়োগ মতবাদটি আলোচনা কর (৭৫—৮০।

(গ) সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য কি কি? (৫২, ৬২—৬৬)। ৫+১০

(ঘ) জাতীয়তাবাদ বলিতে কি বোঝায়? ইহা কি আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী? (১০৬—১০৮, ১২৩, ১২৯)। ৮+৭

(ঙ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (ইউনাইটেড্ নেশন্স্) সাফল্য ও ব্যর্থতা সংক্ষেপে আলোচনা কর (১৮৩—১৮৭)। ৮+৭

(চ) সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা কি? ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর (২৪০—২৪২)। ৫+১০

খ বিভাগ

২। যে কোনও দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ ১০×২=২০

(ক) রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সঙ্ঘের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর (৪৩—৪৬)। ১০

(খ) "রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি।" এই ধারণা তোমার কতদূর গ্রহণযোগ্য মনে হয়? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও (৭১—৭৫)। ১০

(গ) রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্যসমূহ আলোচনা কর (২২৭—২৩৩)। ১০

(ঘ) ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর (২৪২—২৪৪)। ১০

গ বিভাগ

৩। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ ঃ ২×৫=১০

(ক) (হেগেল / **রুশো** / হব্স্) "সামাজিক চুক্তি" গ্রন্থটির প্রণেতা।

(খ) আন্তর্জাতিক বিচারালয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি (**অঙ্গ** / অঙ্গ নহে)।

(গ) কর্মের অধিকার একটি (রাজনীতিক / **অর্থনীতিক**) অধিকার।

(ঘ) ভারতের সংবিধান শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার সুনিশ্চিত (**করে** / করে না)।

(ঙ) ভারতের সংবিধানে শিক্ষার অধিকার একটি (**মৌলিক অধিকার** / নির্দেশমূলক নীতি)।

১৯৮৪ ঃ ২য় পত্র

ক বিভাগ

১। যে-কোনও **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ১৫×৪=৬০

(ক) দুষ্পরিবর্তনীয় ও সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের পার্থক্য নির্ধারণ কর এবং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের দোষ ও গুণাবলী আলোচনা কর (১৩—১৭)। ৫+১০

(খ) "ভারতীয় সংবিধান আংশিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং আংশিকভাবে এক-কেন্দ্রিক"—এই মতবাদ পর্যালোচনা কর (৫৫—৬৩)। ১৫

(গ) একনায়কতন্ত্র বলিতে কি বোঝায়? একনায়কতন্ত্রের গুণাগুণ আলোচনা কর (১৪৯—১৬০)। ৭+৮

(ঘ) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যাখ্যা কর। "পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভবও নহে, কাম্যও নহে"—এই মত কি তুমি সমর্থন কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও (১৭০—১৭৮)। ৭+৮

(ঙ) দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি পর্যালোচনা কর (২০৯—২১৫)। ৮+৭

(চ) ভারতের সুপ্রীম্ কোর্টের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর (২৪০—২৪৩)। ৫+১০

খ বিভাগ

২। যে-কোনও দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : ১০×২=২০

(ক) ভারতের রাষ্ট্রপতি কিভাবে নির্বাচিত হন তাহা বর্ণনা কর (১৮২—১৮৪)। ১০

(খ) রাজ্যসভা ও লোকসভার গঠন আলোচনা কর (২১৫—১৬, ২১৯)। ৫+৫

(গ) জনমত বলিতে কি বোঝায়? গণতন্ত্রে ইহার গুরুত্ব কি? (২৫৩—৫৫)। ৫+৫

(ঘ) দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার সুবিধাগুলির তুলনামূলক আলোচনা কর (২৬৪—২৬৮)। ১০

গ বিভাগ

৩। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ : ২×৫=১০

(ক) যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (**থাকে** / থাকে না)।

(খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (**রাষ্ট্রপতিশাসিত** / সংসদশাসিত) সরকার আছে।

(গ) ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁহার মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলিতে (**বাধ্য** / বাধ্য নহেন)।

(ঘ) ভারতের কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন (ভারতের রাষ্ট্রপতি / **সেই রাজ্যের রাজ্যপাল** / রাজ্য আইনসভার সদস্যগণ)।

(ঙ) প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (অপ্রয়োজনীয় / **একান্ত প্রয়োজনীয়**)।

১৯৮৩ : ১ম পত্র

ক বিভাগ

১। যে কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১৫×৪=৬০

(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত মনোবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক আলোচনা কর (১৯—২৩)।

(খ) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ কর (২৬—৩২)।

(গ) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবর্তনমূলক মতবাদ ব্যাখ্যা কর। মতবাদটির কোন মূল্য আছে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও (৯৭—১০২)।

(ঘ) রাষ্ট্রের সীমারেখা কি জাতীয় জনসমাজের সমানুপাতিক হওয়া উচিত? তোমার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দাও (১১৫—১২১)।

(ঙ) জাতিপুঞ্জের (ইউনাইটেড্ নেশন্স্) সাধারণ সভার গঠন আলোচনা কর। সাধারণ সভার ভূমিকার মূল্যায়ন কর (১৪২—১৪৭)।

(চ) ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। মৌলিক অধিকার সমূহের সহিত নির্দেশমূলক নীতি-সমূহের পার্থক্য দেখাও (২৪০—২৫০)।

খ বিভাগ

২। যে-কোন দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ ১০ × ২ = ২০

(ক) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ত্রুটিগুলি আলোচনা কর (৯৪—৯৭)।

(খ) নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর (১৯৬—২০০)।

(গ) অর্থনীতিক ও সামাজিক অধিকার বলিতে কি বোঝায়? কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতিক ও সামাজিক অধিকারের উল্লেখ কর (২২০—২২৬)।

(ঘ) অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর (২২৭—২৩৩)।

গ বিভাগ

৩। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ ঃ

(ক) একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক (রাষ্ট্রের, **সামাজিক প্রতিষ্ঠানের**) সদস্য হইতে পারে।

(খ) (অ্যারিস্টটল্, রুশো, হেগেল্, **মার্ক্স্**, গ্রীন) বলেন ঃ "রাষ্ট্র শ্রেণী-শাসনের যন্ত্র।"

(গ) সম্পত্তির অধিকার একটি (রাজনীতিক, **অর্থনীতিক**) অধিকার।

(ঘ) কর্মের অধিকার ভারতের সংবিধান কর্তৃক রক্ষিত (একটি মৌলিক অধিকার, **মৌলিক অধিকার নহে**)।

(ঙ) অছি পরিষদ জাতিপুঞ্জের একটি (**অংশ**, অংশ নহে)।

১৯৮৩ ঃ ২য় পত্র

ক বিভাগ

১। যে-কোনও **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ১৫ × ৪ = ৬০

(ক) ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর (১৭—২৪)।

(খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। ইহার সুবিধা ও অসুবিধা কি কি? (৫৬—৩৮, ৫৪—৪৮)।

(গ) সংসদীয় বা পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। সংসদীয় সরকারের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি? (৭৬—৮১)।

(ঘ) ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতা আলোচনা কর (১৮৪—১৯৩)।

(ঙ) ভারতীয় পার্লামেণ্টের কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর (২১৫—২২০)।

(চ) রাজনৈতিক দল বলিতে কি বোঝায় ? গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর (২৬০—২৬৪, ২৬৬—২৬৭)।

খ বিভাগ

২। যে কোন দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ ১০ × ২ = ২০

(ক) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলিতে কি বোঝায় ? প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের গুণাগুণ বিশ্লেষণ কর (১১৯—১২৪)।

(খ) ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ কিভাবে নিযুক্ত হন ? তাঁহাদের কিভাবে পদচ্যুত করা যায় ? (২৪০—২৪১)।

(গ) ভারতীয় অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের ভূমিকা আলোচনা কর (১৯৯—২০৪)।

(ঘ) সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বলিতে কি বোঝায় ব্যাখ্যা কর। এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করা হয় কেন ? (২৬৯—২৭২)।

গ বিভাগ

৩। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ ঃ ২ × ৫ = ১০

(ক) পূর্ণ ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ (সম্ভবপর, **সম্ভবপর নহে**)।

(খ) ভারতে (একদল ব্যবস্থা, দ্বিদলব্যবস্থা, **বহুদলব্যবস্থা**) আছে।

(গ) ভারতে (২০/২২/২৪ টি) অঙ্গরাজ্য আছে।

(ঘ) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত, **পরোক্ষভাবে নির্বাচিত** প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন)।

(ঙ) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা (**রাষ্ট্রপতি,** প্রধানমন্ত্রী, লোকসভা) কর্তৃক নিযুক্ত হন।

১৯৮২ ঃ ১ম পত্র

ক বিভাগ

১। যে-কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ১৫ × ৪ = ৬০

(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ইতিহাস ও অর্থবিদ্যার সম্পর্ক আলোচনা কর (১৩—১৭)। ৮+৭

(খ) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বলপ্রয়োগ মতবাদটি আলোচনা কর (৭৫—৮০) ১৫

(গ) সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য কি কি (৫২—৫৪) ? ৫+১০

(ঘ) জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলিতে কি বোঝায় ? আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির বিরুদ্ধে কি কি যুক্তি দেওয়া হয় (১১৫—১২১) ? ১০+৫

(ঙ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। সংক্ষেপে নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকার মূল্যায়ন কর (১৪৭—১৫২)। ১০+৫

(চ) ভারতীয় সংবিধান-প্রদত্ত যে-কোন **তিনটি** মৌলিক অধিকার সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর (২৩৪—২৪০)। ৫+৫+৫

খ বিভাগ

২। যে-কোন দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ ১০×২=২০

(ক) একজন নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর (১১৪—১১৬)। ১০

(খ) রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্যসমূহ আলোচনা কর (২২৭—২৩৩)। ১০

(গ) জাতীয়তাবাদ কি আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী? উত্তরের অনুকূলে যুক্তি দেখাও (১২৩—১২৯)। ১০

(ঘ) ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর (২৪২—২৫০)। ১০

গ বিভাগ

৩। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ ঃ ২×৫=১০

(ক) (পশ্চিমবঙ্গ, **বাংলাদেশ**) একটি রাষ্ট্র।

(খ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯১৯, ১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯৪৭) সালে।

(গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (**সামাজিক**, নৈতিক, প্রাকৃতিক) বিজ্ঞানের শাখা।

(ঘ) সম্পত্তির অধিকার বর্তমানে ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত একটি (মৌলিক অধিকার, **মৌলিক অধিকার নহে**।

(ঙ) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিক মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র (ঈশ্বরের সৃষ্ট, চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট, **মানবসমাজের বিরতিবিহীন ক্রমবিকাশের ফল**)।

১৯৮২ ঃ ২য় পত্র

ক বিভাগ

১। যে-কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ১৫×৪=৬০

(ক) সংবিধান বলিতে কি বোঝায়? লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের পার্থক্য যথোপযুক্ত উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর (৩—৪, ৯—১৩)। ৮+৭

(খ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি আলোচনা কর (৫৫—৬৩। ১৫

(গ) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিপক্ষে কি কি যুক্তি দেখানো হয়? গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলী কি কি? (১৩৩—১৪৩)। ৮+৭

(খ) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যাখ্যা কর (১৭৩—১৭৮)। ১৫

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার গঠন ও কার্যাবলীর বিবরণ দাও (২২৩—২৮)। ৫+১০

(চ) আধুনিক গণতন্ত্রে জনমত গঠনের বিভিন্ন মাধ্যমের বিবরণ দাও (২৫৫—৫৮)। ৫+১০

খ বিভাগ

২। যে কোন দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ ১০×২=২০

(ক) ভারতীয় পার্লামেণ্টে আইন পাসের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর (২২৬—৩১)। ১০

(খ) দ্বি-দলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার গুণাগুণের তুলনামূলক আলোচনা কর (২৬৪)। ১০

(গ) ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর (১৮২—১৮৩)। ১০

(ঘ) আধুনিক রাষ্ট্রে বিচারবিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর (২৩৫)। ১০

গ বিভাগ

৩। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ : ২ × ৫ = ১০

(ক) ভারতের প্রধানমন্ত্রী (সুপ্রিম কোর্ট, **রাষ্ট্রপতি**, লোকসভা) দ্বারা নিযুক্ত হন।

(খ) ভারতের শাসনব্যবস্থা (রাষ্ট্রপতি-শাসিত, **সংসদীয়**)।

(গ) লোকসভার কার্যকাল (চার, **পাঁচ**, ছয়) বৎসর।

(ঘ) (**ভারতবর্ষ**, গ্রেট্ব্রিটেন) একটি প্রজাতন্ত্র।

(ঙ) ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, **নির্বাচন কমিশন** এর তত্ত্বাবধানে।

১৯৮১ : ১ম পত্র

ক বিভাগ

১। যে-কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১৫ × ৪ = ৬০

(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু আলোচনা কর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য (১—১০) ? ৮ + ৭

(খ) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রের উপাদান হিসাবে সার্বভৌমিকতার গুরুত্ব আলোচনা কর (২৬—৩৪)। ৬ + ৯

(গ) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনমূলক মতবাদ আলোচনা কর। তোমার কাছে এই মতবাদটি কি গ্রহণযোগ্য (৯৭—১০২) ? ১০ + ৫

(ঘ) জাতীয় জনসমাজ গঠনের উপাদানগুলি কি কি ? ভারতকে কি একটি জাতি বলা যায় (১০৬—১১৫) ? ১০ + ৫

(ঙ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি আলোচনা কর। ইহার উদ্দেশ্য কি ব্যর্থ হইয়াছে (১৪১—১৪২, ১৪৩—১৮৭) ? ১০ + ৫

(চ) রাজনীতিক ও অর্থনীতিক অধিকার বলিতে কি বোঝায় ? ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত কয়েকটি রাজনীতিক অধিকারের উল্লেখ কর (২১৬—২২৪)। ১০ + ৫

খ বিভাগ

২। নিম্নোক্ত যে কোন **দুইটি** প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর : ১০ × ২ = ২০

(ক) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ত্রুটিগুলি আলোচনা কর (৯৪—৯৭)। ১০

(খ) জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার সম্পর্ক আলোচনা কর (১২৩—১২৯)। ১০

(গ) রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য আলোচনা কর (৪৩—৪৬)। ১০

(ঘ) কি কি কারণে নাগরিকতা বিলুপ্ত হয় ? (২০০—২০২)। ১০

গ বিভাগ

৩। বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত বিকল্পগুলি হইতে সঠিক উত্তরটি খুঁজিয়া বাহির কর এবং তাহা লেখ : ২ × ৫ = ১০

(ক) সার্বভৌমিকতা (হস্তান্তরযোগ্য, হস্তান্তরযোগ্য নয়)।

(খ) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐশ্বরিক মতবাদ একটি (বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক) মতবাদ।

(গ) বর্তমানে অর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা (১৫, ২৫, ৫৪, ৩২)।

(ঘ) ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক (বলবৎ যোগ্য, বলবৎযোগ্য নয়)।

(ঙ) ভোটদানের অধিকার একটি (সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক, অর্থ-নীতিক অধিকার)।

১৯৮১ : ২য় পত্র

ক বিভাগ

১। যে-কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১৫×৪=৬০

(ক) ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর (১৭—২৪)। ১৫

(খ) সংসদশাসিত (পার্লামেণ্টীয়) ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। সংসদ-শাসিত সরকারের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি ? (৬৩—৭৭)। ৫+১০

(গ) ভারতের পার্লামেণ্টের গঠন ও কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর (২১৫—২২০)। ৬+৯

(ঘ) ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর (১৮৪—১৯৩)। ১০+৫

(ঙ) রাজনৈতিক দল বলিতে তুমি কি বোঝ ? গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর (২৬০—২৬৪)। ৫+১০

(চ) সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও (২৬৯—৭২)। ৮+৭

খ বিভাগ

২। যে-কোন **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১০×২=২০

(ক) ভারতকে কি সাধারণতন্ত্র (রিপাবলিক) বলিয়া অভিহিত করা যায় ? (৯৮—১০২)

(খ) দ্বি-কক্ষসম্পন্ন আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর (২১০—২১৫)। ৫+৫

(গ) ভারতের কোন অঙ্গরাজ্যের মহাধর্মাধিকরণের ক্ষমতা বর্ণনা কর (২৪৪—২৪৭)। ১০

(ঘ) ভারতের সংবিধানে বর্ণিত কোন রাজ্যপালের ভূমিকা আলোচনা কর (১৯৯—২০৪)। ১০

গ বিভাগ

৩। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া সেই উত্তরসহ নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লেখ : ২×৫=১০

(ক) ভারতের রাজসভা হইতেছে (অঙ্গরাজ্যগুলির একটি কক্ষ, রাজ্যপালগণের একটি কক্ষ, ভারতীয় পার্লামেণ্টের একটি কক্ষ)।

(খ) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হইতেছেন (কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন সদস্য, রাজ্যসভার সভাপতি, লোকসভার অধ্যক্ষ)।

(গ) ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এমন একটি বিচারালয় যাহার (কেবলমাত্র মূল এলাকা আছে ; মূল ও আপীল উভয় এলাকাই আছে, কিন্তু অপর কোন এলাকা নেই ; মূল এলাকা, আপীল এলাকা এবং পরামর্শদান এলাকা আছে)।

(ঘ) ভারতের বর্তমান সংবিধানে 'শিক্ষা' বিষয়টি (কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত, যুগ্ম-তালিকার অন্তর্ভুক্ত, রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত)।

(ঙ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির সংখ্যা হইতেছে (২১, ২২, ২৩)।

১৯৮০ : ১ম পত্র

ক বিভাগ

১। যে-কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১৫×৪=৬০

(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সমাজবিদ্যার সহিত ইহার কি সম্পর্ক ? (১–৪, ১৭–২১)। ১০+৫

(খ) রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর (২৬–৩২)। ১৫

(গ) রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে বলপ্রয়োগ মতবাদ বিবৃত কর। মতবাদটির মধ্যে কোন সত্য নিহিত আছে কি ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর (৭৫–৮০)। ১০+৫

(ঘ) জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলিতে কি বোঝায় ? আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির বিরুদ্ধে কি কি যুক্তি প্রদর্শন করা যায় ? (১১৫–১২১)। ১০+৫

(ঙ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার কার্যাবলী আলোচনা কর। সাধারণ সভার ভূমিকার মূল্যায়ন কর। (১৪২—১৪৭)। ১০+৫

(চ) ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের বর্ণনা দাও। মৌলিক অধিকারসমূহের সহিত নির্দেশমূলক নীতিসমূহের পার্থক্য দেখাও (২৪২—২৫০)।

খ বিভাগ

২। নিম্নোক্ত যে-কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর : ১০×২=২০

(ক) সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য কি কি ? (৫২—৫৪)। ১০

(খ) নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর (১৯৬—২০০)। ১০

গ বিভাগ

(গ) অছি পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর (১৬৪—১৬৭)। ১০

(ঘ) অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর (২২৭—২৩৩)। ১০

৩। বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি খুঁজে নাও এবং তাহা লেখ:

(ক) একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক (রাষ্ট্রের, **সামাজিক প্রতিষ্ঠানের**) সদস্য হতে পারে।

(খ) "সামাজিক চুক্তি" গ্রন্থটির প্রণেতা (হবস্, লক্, **রুশো**)।

(গ) নিরাপত্তা পরিষদের (সব সদস্যদের, কেবল অস্থায়ী সদস্যদের, **কেবল স্থায়ী সদস্যদের**) "ভেটো" প্রয়োগের ক্ষমতা আছে।

(ঘ) কর্মের অধিকার একটি (রাজনীতিক, **অর্থনীতিক**) অধিকার।

(ঙ) ভারতের সংবিধানে বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার (একটি মৌলিক অধিকার, **মৌলিক অধিকার নয়**)।

১৯৮০ : ২য় পত্র

ক বিভাগ

১। যে-কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও: ১৫ × ৪ = ৬০

(ক) সংবিধানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কিভাবে তুমি সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ করবে? (৩—৯)। ৫ + ১০

(খ) যুক্তরাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কর এবং ইহার গুণাগুণ আলোচনা কর (৩৬—৩৮, ৪৬—৪৮)।

(গ) একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং ইহার গুণাগুণ বিশ্লষণ কর (১৪৬=১৬০)।

(ঘ) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যাখ্যা কর। "কঠোর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভবপরও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।" উদাহরণ সহকারে উক্তিটি আলোচনা কর (১৭০—১৭৮)। ৫ + ১০

(ঙ) ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর (১৯৩—১৯৮)। ১৫

(চ) জনমত বলিতে কি বোঝায়? গণতন্ত্রে ইহার গুরুত্ব নির্ধারণ কর (২৫৩—২৫৫)। ৫ + ১৫

খ বিভাগ

২। যে-কোন **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর দাও: ১০ × ২ = ২০

(ক) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলিতে কি বোঝায়? প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের গুণাগুণ বিশ্লেষণ কর (১১৯—১২৪)। ২ + ৮

(খ) একক পরিচালক ও বহু পরিচালক-বিশিষ্ট শাসনবিভাগ বলিতে কি বোঝায়? (১৭৫—১৭৮)। ৫ + ৫

(গ) ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও (১৮৬—১৮৭)। ১০

(ঘ) লোকসভা ও রাজ্যসভার পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে যাহা জান লেখ (২২০—২২৩)। ১০

গ বিভাগ

৩। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া সেই উত্তরসহ নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লেখ ঃ ২×৫=১০

(ক) ভাততবর্ষের শাসনব্যবস্থা (যুক্তরাষ্ট্রীয়, এককেন্দ্রিক, **আধা যুক্তরাষ্ট্রীয়**)।

(খ) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন (**সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল**, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী)।

(গ) পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা (**এককক্ষীবিশিষ্ট**, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট)।

(ঘ) ভারতবর্ষে (একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, **বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে**)।

(ঙ) প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার (অপ্রয়োজনীয়, **একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়**)।

অতিরিক্ত প্রশ্নমালা

॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ঃ ১ম পত্র ॥

১ম অধ্যায়

১। সূত্রনির্ণায়ক বিজ্ঞান কাকে বলে? রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি সূত্রনির্ণায়ক বিজ্ঞান? (৬—১১)।

২। সঠিকভাবে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলিকে লেখ ঃ (ক) নীতিশাস্ত্র মানুষের (বহির্জীবন **অন্তর্জীবন** নিয়ন্ত্রিত করে। (খ) (আরিস্টটল, উড্রো উইলসন, **মাকিয়াভেলি**) "রাষ্ট্র" কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।

২য় অধ্যায়

১। সামাজিক সংস্থা কাকে বলে? রাষ্ট্রে সঙ্গে তার মিল ও পার্থক্য কি (৪৩—৪৬)।

৩য় অধ্যায়

১। কোন দেশের সমগ্র জনগণকে বা সমগ্র নির্বাচকমণ্ডলীকে সেই দেশের সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলা কি ঠিক? আলোচনা কর (৫৯—৬১)।

২। বহুত্ববাদী কাদের বলা হয়? রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য কি? তাঁদের মত কি সমর্থনযোগ্য? যুক্তিসহ আলোচনা কর (৫৭—৫৯)।

৪র্থ অধ্যায়

১। কোন্ মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে ? সে সম্বন্ধে যা জানো লেখ (৯৭—১০২)।

২। সামাজিক বিবর্তনের অর্থ কি ? রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ? (৯৭—১০২)।

৫ম অধ্যায়

১। জাতিগঠনের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ উপাদান সবচেয়ে বেশী কার্যকর ? কেন ? (১০৮—১১২)।

২। "জাতীয়তাবাদের পথই আন্তর্জাতিকতার পথ"—এ উক্তিটির সত্যতা সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি ? তা ব্যাখ্যা কর (১২৩—১২৯)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। কবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয় ? এর প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক পটভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (১৩২—১৪০)।

২। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত যে-কোন একটি অর্থনৈতিক দপ্তরের সংগঠন, কার্যাবলী ও আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর (১৫৬—১৫৯, ১৬৮—১৭১)।

৩। ইউনেস্কো, আই. এম্. এফ্.—এগুলির সম্পূর্ণ নাম কি ? (১৬১—১৬৯)।

৭ম ঃ অধ্যায়

১। প্রাচীন ও আধুনিক যুগে "নাগরিক" কথাটির তাৎপর্য কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে ? (১৮৯—১৯৩)।

২। টীকা লেখ ঃ আঞ্চলিক বাসস্থান ; জন্মস্থানগত নাগরিকত্ব ; মানবাধিকার সম্পর্কে বিশ্বজনীন ঘোষণা ; অভিবাসন বিধি ; নাগরিকত্ববিহীনতা। (১৯৩—২০০)।

৩। বাক্-স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতির স্বাধীনতা, সামাজিক নিরাপত্তা, ভোটাধিকার—এগুলি কোন্ বিভাগের অধিকারের পর্যায়ভুক্ত ? কারণ দেখাও (২০৯—২১১)।

৮ম অধ্যায়

১। উদারনৈতিকতার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর (২৬০—২৬৩)।

২। উদারনৈতিকতার মুখ্য প্রবক্তাদের একজনের বক্তব্য ব্যাখ্যা কর (২৬৩—২৭২)।

৩। মার্ক্সবাদের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সম্পর্ক নির্ণয় কর (২৭৪—২৭৯)।

৪। মার্ক্সীয় ইতিহাসবিজ্ঞান বলতে কি বোঝায় ? এ বিষয়ে এঙ্গেল্স্ ও প্লেখানভের বক্তব্য ব্যাখ্যা কর (২৮৬—২৮৯)।

৫। বুখারিন্ কিভাবে মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন ?

৬। মার্ক্সবাদের তাত্ত্বিক ও ফলিত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে লেনিন্ ও স্তালিনের অবদান ব্যাখ্যা কর

৭। মার্ক্‌স্‌বাদ লেনিন্‌বাদকে মাও সে তুং, হো চি মিন্‌ ও চে গ্‌য়েভারা কিভাবে অ্যাক্‌সন্‌ধর্মী করে তুলেছেন ?

৮। "ইউরো-কম্যুনিজম্‌" বলতে কি বোঝায় ? এর সমর্থকদের যে কোন একজনের বক্তব্য স্থপরিস্ফুট কর

১০। মার্ক্‌স্‌বাদের অতি আধুনিক প্রবক্তাদের ঝোঁক কোন্‌দিকে ? নব্য বামপন্থার বক্তব্য কি ?

১১। গণসমাজতন্ত্রের প্রবক্তারূপে ল্যাস্কি ও বেয়ান্‌স্টাইনের বক্তব্য ব্যাখ্যা কর

১২। ফেবিয়ান্‌ সমাজতন্ত্রী কারা ? তাঁদের মুখ্য প্রবক্তাদের একজনের বক্তব্য সংক্ষেপে লেখ।

১৩। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ : টমাস্‌ পেন্‌ ; রেনেসাঁস্‌ ; মানবতাবাদ ; প্রোটেস্টান্ট্‌ আন্দোলন ; কোয়েকার ; লিওঁ ট্রট্‌স্কি ; রোজা লুক্সেমবুর্গ্‌ ; এম্‌. এন্‌. রায় ; টিটো ;
ওয়েব্‌দম্পতি ; গ্রাম্‌সি ; ফয়য়্যারবাখ্‌ ; প্রুধোঁ (৮ম অধ্যায়ের নির্দিষ্ট অংশগুলি দ্রষ্টব্য)।

১৪। "শ্রেণী" এবং "শ্রেণীসংগ্রাম" মার্ক্‌স্‌ কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ? এতে বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়তের ভূমিকা কি ?

॥ "শাসনতন্ত্র" বিভাগ : ২য় পত্র ॥

১ম অধ্যায়

১। ভারতীয়গণ কি কি কারণে ২৬শে জানুয়ারী ও ১৫ই আগস্ট্‌ এই তারিখদুটি স্মরণ করেন ? (১৭)।

২। "সব প্রজাতন্ত্রই গণতন্ত্র নয়, সব গণতন্ত্র প্রজাতন্ত্র নয়"—উদাহরণ সহযোগে উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর (১৪—১৫)।

৩। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কাকে বলে ? ভারত কি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ? কারণ দেখিয়ে উত্তর দাও (১৯, ২৩—২৪)।

৪। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটি সম্পর্কে আলোচনা কর। এর গুরুত্ব কোথায় ? (২০—২১)।

২য় অধ্যায়

১। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাফল্য কি কি শর্তের উপর নির্ভর করে ? (৪৮—৫২)

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারগুলিতে আধুনিককালে কি ধরনের ঝোঁক দেখা যায় ? (৬১—৬৩)।

৩। মার্কিনী ও কানাডীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও ? এদের কোন্‌টির সঙ্গে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মিল রয়েছে ? কারণ দেখাও (৪২—৪৪)।

৪। ভারত এদের কোন্‌টির মধ্যে পড়ে ?—এককেন্দ্রিক সরকার, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, মন্ত্রিসভাচালিত সরকার, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার। (৫৫—৬০)

৫। মন্ত্রিসভাচালিত সরকারকে নিয়মতান্ত্রিক, দায়িত্বশীল, প্রতিনিধিমূলক ও সংসদীয় গণতন্ত্রও বলা হয়। কেন ? কারণগুলি উল্লেখ কর। (৬৩—৬৪)।

৬। সুইজারল্যান্ডে প্রচলিত প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর (১২০—১২৪)।

৩য় অধ্যায়

১। আরিস্টটল্‌ গণতন্ত্রকে বিকৃত শাসনতন্ত্র বলেছেন। কেন ? কারণ উল্লেখ কর (১৩৩)।

২। নিম্নলিখিত বিখ্যাত মন্তব্যগুলি কে কি প্রসঙ্গে করেছিলেন ?
(ক) জনগণের, জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসনতন্ত্রই গণতন্ত্র (১১৪) ; (খ) নারীদের কাছে মাতৃত্বের মত যুদ্ধ রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাভাবিক পরিণতি (১৫৮) (গ) ; সুশাসন কখনই স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প হতে পারে না (১৬৪)। (ঘ) বহুজনের মধ্যেই প্রজ্ঞার প্রকৃত প্রকাশ (১৩১)।

৩। উদারনৈতিক ও পশ্চিমী গণতন্ত্র এবং জনগণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর (১২৫—১২৯)।

৪র্থ অধ্যায়

১। উদাহরণসহযোগে একক ও যৌথ শাসনবিভাগের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর ও তাদের গুণাগুণ বিচার কর। ভারতের শাসনব্যবস্থা একক না যৌথ ? (১৭৫—১৭৮)।

২। জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রাষ্ট্রপতি বর্তমানে কি ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন ? (১৮৬—১৮৯)।

৩। ভারতীয় পার্লামেণ্টে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর ভাষণদানের জন্য ধন্যবাদ জানানোর প্রস্তাবটির সাংবিধানিক গুরুত্ব কি ? (৬৪)।

৪। কে প্রকৃত শাসক—ভারতের রাষ্ট্রপতি না ভারতের প্রধানমন্ত্রী ? যুক্তি দেখিয়ে প্রশ্নটির উত্তর দাও (১৮৯—১৯৩)।

৫। রাজ্যসভার সভ্য কি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন ? (১৯৪)।

৫ম অধ্যায়

১। জনমত কি সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর (২৫৩)।

২। বহুদলীয় ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি থাকলেও কেন তাকে আধুনিক গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে সমর্থন করা হয় ? (২৬৫—২৬৭)।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

১। সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে ভোটদাতার (ক) শিক্ষাগত যোগ্যতার ওপর এবং (খ) সম্পত্তির মালিকানার যোগ্যতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত কেন ? এই সীমাবদ্ধতা কি এখনও স্বীকার করা হয় ? (২৬৯—২৭২)।

———

গ্রন্থপঞ্জী

Garner—Political Science and Government.

MacIver—The Web of Government.

Barker—Reflections on Government.

" —Principles of Social and Political Theory.

Laski—A Grammar of Politics.

" —Rise of European Liberalism.

" —Karl Marx.

Sabine—A History of Political Theory.

Sidney Hook—From Hegel to Marx.

Marx and Engels—Communist Manifesto.

V. I. Lenin—State and Revolution.

Lipson—The Great Issues of Politics.

Cornforth—Dialectical Materialism.

Durbin—The Politics of Democratic Socialism.

Elliott—The Pragmatic Revolt in Politics.

Regis Debray—Che's Guerilla War.

S. P. Verma—Modern Political Theory.

Joad—An Introduction to Modern Political Theory.

Nicholas—The United Nations As A Political Institution.

Finer—Theory and Practice of Modern Government, 2 volumes.

D. Basu—The Constitution of India.

" —An Introduction to the Indian Constitution.

J. C. Johari—Indian Government and Politics.

" —Contemporary Political Theory.

ডঃ শোভনলাল মুখোপাধ্যায় এম. এ., পি. আর. এস., পি. এইচ্. ডি., ডি. লিট্. রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং বেলজিয়ামের আন্তর্জাতিক আইন-সংস্থার প্রথম ভারতীয় ফেলো। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে একদিকে জ্ঞানের বিশাল ব্যাপ্তি ও অতলান্ত গভীরতা, এক কথায়, বিষয়টির ওপরে পূর্ণ অধিকার, অন্যদিকে আশ্চর্য-দুর্লভ সমন্বয়ী চিন্তা ও সরল সাবলীল ও সহজবোধ্য প্রকাশভঙ্গি তাঁর রচিত 'উচ্চ-মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান' গ্রন্থখানিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় রচিত গ্রন্থ-জগতের সর্বোচ্চ শিখরে স্থাপন করেছে।

গ্রন্থখানির সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো বিষয়টির সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ধারণা, উচ্চ-মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের গ্রহণ-ক্ষমতার উপযোগী অনবদ্য পরিবেশনা এবং সেইসঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর সাফল্যের পর্যাপ্ত উপকরণসহ উপযুক্ত দিক্-দেশনা। সেদিক থেকে গ্রন্থখানি উচ্চ-মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে নিঃসন্দেহে উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লক্ষ্য-বিন্দু হলো সমাজবদ্ধ মানুষ—সমাজবদ্ধ মানুষের সার্বিক কল্যাণ—'পৃথিবীর ক্রমমুক্তি'। গ্রন্থকারের অঙ্গুলি-সংকেত সেই দিকেই। প্রাসঙ্গিক সকল point-সহ শিল্পিত আলোচনা, অধ্যায়-শেষে প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত-সার সংযোজন গ্রন্থখানির অলংকার। আমাদের স্থির বিশ্বাস, গ্রন্থখানি উচ্চ-মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সফল পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে।